

প্রবোধ কুমার সান্যাল রচনাবলী

প্রবোধকুমার সান্যালের

রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :

ভবানী মুখোপাধ্যায় / মনীষী বসু

প্রকাশক :
মন্মথ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
রঞ্জনকুমার দাস
রাজরাজেশ্বরী প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

কুড়ি টাকা

ভূমিকা

প্রবোধকুমার বৈচিত্র্যের সাধক। তিনি গল্পকার। অজস্র জনপ্রিয় গল্প ও উপন্যাস রচনা করে তিনি অনেক মানুষের প্রিয়জনে পরিণত, তাঁর ভ্রমণ-সাহিত্যও তেমনই আকর্ষণমূলক। 'মহাপ্রস্থানের পথে'র লেখক প্রবোধকুমার একদিন একরকম আকস্মিক ভাবেই লিখেছিলেন 'মহাপ্রস্থানের পথে'। বয়স তখন ছিল অনেক কম, নতুন একটা জগৎ তাঁর চোখে সেদিন আশ্চর্য মোহজাল রচনা করেছিল। একদিন প্রবোধকুমারের ভ্রমণ-সাহিত্য আলোচনা কালে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

"যাহা চলিষ্ণু এবং স্থিতিশীল নয়, সেই সর্বদা প্রবহমান জীবনস্রোতে দুই চারিটি চিত্রকে যিনি চিরকালের জন্য ধরিয়া রাখিতে পারেন তিনি সার্থক রস-স্রষ্টা, কবি। • প্রবোধবাবুকে সেই শ্রেণীর কবি বলিয়া মনে হয় এবং সেজন্য তাহার বহু অনুরাগী পাঠকের মত আমিও তাঁহার প্রশস্তি করি। বিশ্বপ্রকৃতির যে গভীর প্রভাব মানুষের মনে পড়ে, কবি ও সত্যদর্শক কথাকারও তাহার দ্বারা অভিভূত না হইয়া পারেন না। ভারতের অন্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টাদের মত হিমালয়ের মহিমার দ্বারা প্রবোধবাবুও আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং হিমালয়ের সঙ্গে তাঁহার আত্মিক যোগকে তিনি সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। এইখানে তিনি ভারতের সাহিত্য ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ধারার পরিপোষণ করিয়াছেন।" আরেকবার 'দেবতাত্মা হিমালয়' পড়তে বসে এই কথাগুলি মনে এল।

কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর—ভারতের সংহতিমন্ত্রের কেন্দ্র ছিল। দীর্ঘদিনের বৈচিত্র্যময় ইতিহাস সুদূর কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীরকে একসূত্রে বেঁধেছিল—সেই সূত্র ধরে গড়ে উঠেছে একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ইতিহাস, একটা জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস। এই কাশ্মীর পট নিয়ে সুরু হয়েছে 'দেবতাত্মা হিমালয়ে'র দ্বিতীয় খণ্ড। প্রবোধকুমার সান্যালের রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'দেবতাত্মা হিমালয়ে'র প্রথমাংশ সংযোজিত হয়েছে। সেই অংশে ছিল 'ব্রহ্মপুরা গাড়োয়াল', 'হরিদ্বার', 'অমরনাথ', 'পশুপতিনাথ', 'দেরাদুন', 'সিকিম', 'দার্জিলিং' প্রভৃতি হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন রঙ্গভূমি। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে 'কাশ্মীর ও পীরপাঞ্জাল', 'জম্মু জ্বালামুখী', 'কাংড়া', 'হিমাচল', 'কুলু', 'মানালি', 'ইন্দ্রপ্রস্থ নৈনীতাল', 'নিষিদ্ধ তিব্বত', 'রানীক্ষেত', 'ভুটান', 'আলমোড়া', 'চাম্বা', এবং

'লাহুল ও স্পিতি' প্রভৃতি। হিমালয়ের প্রায় সকল অঞ্চলকেই তিনি এই অংশে বিধৃত করেছেন। অনেকের এই সব অঞ্চলের কিছু কিছু জানা থাকা সম্ভব, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সবটুকু জানা আছে এমন দাবী করতে পারবেন খুব কম সংখ্যক মানুষ। একথা সত্য, যে কোনো কারণেই হোক ইদানীং বাঙালী সমাজে হিমালয় সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, বাংলা সাহিত্যে একটা হিমালয়-সাহিত্য নামক বিভাগ গড়ে উঠেছে। নিঃসংশয়ে বলা যায় যে একদা জলধর সেন মহাশয়ের 'হিমালয়' ভিন্ন বাংলা ভাষায় হিমালয় প্রসঙ্গে বিশেষ কোনো সাহিত্য রচিত হয়নি,—'মহাপ্রস্থানের পথে' রচনা করে প্রবোধকুমার সেই পথ রচনা করেন, তিনি হিমালয় সাহিত্যের পথিকৃৎ। একথা আমরা প্রথম খণ্ডেই উল্লেখ করেছি, তথাপি সেকথার পুনরুক্তির প্রয়োজন বোধ করছি এই কারণে যে প্রবোধকুমার যে ধারায় হিমালয় চর্চা করেছেন, ঠিক অনুরূপ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে আর কাউকে সেই পথ অনুসরণ করতে দেখা যায়নি। এ ছাড়া প্রবোধকুমার আর একদিক থেকে তাঁদের অনেকের চেয়ে এক বিষয়ে বিশেষ গুণসম্পন্ন লেখক। তিনি একজন সার্থক সাহিত্যকার। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন—"কথাসাহিত্যের অন্যতম ধুরন্ধর প্রকাশক হইতেছেন প্রিয়বর প্রবোধকুমার সান্যাল। তাঁহার লেখায় কিছু পরিমাণ মেলোড্রামা অথবা গাপন-নাটন যে নাই তাহা বলিব না, কিন্তু তাহাকে অতিক্রম করিয়া একটি জিনিষ আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে--তাহা তাঁহার জীবনের সকল দিক আমাদের কাছে তুলিয়া ধরিবার প্রযাস। ইহার মধ্যে যে গুণ প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিবে তাহা হইতেছে –Sincerity অর্থাৎ ভাবশুদ্ধি।"

আচার্য সুনীতিকুমারের কথাগুলি আমাদের বক্তব্যের সমর্থনেই উদ্ধৃত করা হল। একদিক থেকে জীবনকে তুলে ধরার প্রয়াস ও অন্যদিকে সিনসিয়ারিটি বা ভাবশুদ্ধি প্রবোধকুমারের তূণীরে সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র। এই অস্ত্রেই তিনি সার্থক ভাবে ধনুর্ধর হয়ে উঠেছেন। 'দেবতাত্মা হিমালয়ে'র দ্বিতীয় খণ্ড তাই প্রথম খণ্ডের মতই একটানা আগ্রহ সৃষ্টি করে। ঈশ্বরের আকাশের সৌন্দর্য ব্যাহত হত অনেকাংশে যদি না তারকাখচিত হত, প্রবোধকুমারের ভ্রমণ কথা নীরস বিবরণীতে পরিণত হত যদি না তার মধ্যে পাওয়া যেত অজস্র মানুষের জীবনের খণ্ড চিত্র। এই যে সংমিশ্রণ, কাহিনী ও বিবরণীর এই যে যৌগিক রূপায়ণ এ শুধু প্রবোধকুমারেই সম্ভব। 'দেবতাত্মা হিমালয়' গ্রন্থের দুটি সুবৃহৎ খণ্ড মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করলে এই কথাটি বার বার মনে জাগবে। অনেক সময় মনে হবে যে চোখের ওপর হিমালয়ের উজাড়-করা সম্পদ, আশ্চর্য নৈসর্গিক দৃশ্য সবই যেন পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত। লেখক বলেছেন জলন্ত ধূপ এক

সময় শেষ হয় কিন্তু তার সুগন্ধ রেখে যায় তার পরিবেশে। 'দেবতাত্মা হিমালয়' পাঠান্তে সেই সৌরভ মনকে ভরে রাখে দীর্ঘক্ষণ।

'পিয়ামুখচন্দা' প্রবোধকুমারের অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলির মধ্যে পড়ে। প্রকাশিত হয়েছিল ফাল্গুন ১৩৭৩ সালে, সেই বছরই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রবোধকুমারের আর সবগুলি উপন্যাসের মতই যথারীতি আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এই উপন্যাস তিনি উৎসর্গ করেছেন স্বর্গতঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রবোধকুমার বদরী-বিশালের মন্দিরের অঙ্গনতলে পৌঁছেও আর মন্দিরে প্রবেশ করেননি। সেই ঘটনার জের টেনে তারাশঙ্কর একদিন মন্তব্য করেছিলেন—

"যে-পূর্ণতার দোরগোড়া থেকে সেদিন তিনি ফিরে এসেছিলেন তার আকর্ষণ আজো তাঁকে অহরহ অস্থির করে রেখেছে, বার বার তিনি দেবতাত্মা হিমালয়ে ছুটে যান। শুধু কি হিমালয়, রাজপুতানার মরুপ্রান্তর, সমুদ্রতট কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এক বিচিত্র তৃষ্ণায় তিনি ঘুরছেন। 'আমি কোথায় পাবো তারে? আমার মনের মানুষ যে রে?'

পান না, ঘরে ফিরে আসেন, তখন লেখেন "হাসুবানু", "বন-হংসী"। দেখা যায় আগের রচনা থেকে নূতন রচনা এগিয়ে গেছে। বুঝি প্রবোধকুমার এগিয়েছেন খানিকটা·

মনে ভয়হীন প্রবোধকুমারকে তারাশঙ্কর প্রশস্তি জানিয়েছিলেন। সতীর্থের প্রশস্তি। যতটা বলা উচিত ছিল বলতে পারেননি, সংযম এসে বাধা দিয়েছে, কিন্তু অন্তরে তিনি জয়ধ্বনি দিয়েছেন এ তাঁর উক্তি থেকে প্রমাণিত।

'পিয়ামুখচন্দা' একটি সমকালীন পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস, পাঠক সমাজে আলোড়ন জাগিয়েছে ঠিক, কিন্তু সমালোচক সমাজ খানিকটা মুখ ফিরিয়ে ছিলেন।

এর কারণ এই যে আমাদের দেশের সমালোচকদের চামচ দিয়ে খাইয়ে না দিলে তাঁরা কিছু গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁদের অনেক গুণ, কিন্তু ঠিক খুঁটে খাওয়ার সামর্থ্য অল্প লোকেরই আছে। ফলে সেই কাকে কান নিয়ে যাওয়ার মত তাঁরা অপরের কথায় নির্ভর করেন। কেউ যদি বলে এটা পড়া প্রয়োজন, জানা প্রয়োজন, তবেই তাঁরা নড়ে বসেন, নতুবা নয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই 'পিয়ামুখচন্দা'র যে মূল্যায়ন হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক, তা হয়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় একটা নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে, এটা নয়া ধনীদের জগৎ। রেবা পঁচিশে পা দিয়েছে। সে নতুন কালের

পাখি। রায়সাহেব একদা ওভারসিয়ার ছিলেন, তখন একজোড়া জুতোয় পাঁচটা তালি লাগাতে হত। সে যুগ পালটিয়েছে, এখন তিনি বিলিয়ে দিতে পারেন তাই অভাব নেই। রেবা এম. এস-সি পাশ করেছে। সাবালিকা। সেই এই কাহিনীর নায়িকা। হেমন্ত আর জয়ন্ত দুই ভাই। হেমন্ত ছোট, তার বিয়ে হয়েছে, তার একটি সন্তান। রেবার সঙ্গে হেমন্তর আলাপ ছিল, একসঙ্গে পড়ত। জয়ন্ত কর্মহীন। তাকে মনে মনে ভালোবাসে রেবা। রেবার বাড়িতে শোভনা, তিনি অতি-উগ্র আধুনিক। নাইটক্লাব, পার্টি ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকেন। যার সঙ্গে মেয়ের অনেকটা প্রতিযোগিতার সম্পর্ক,—বাৎসল্যের নয়। তিনি জয়ন্তর সঙ্গে রেবার মেলামেশা পছন্দ করেন না। রায়সাহেবের আপত্তি নেই, সে নতুন কালের কবি—তাই তাকে তাঁর পছন্দ। রায়সাহেব একদিন বললেন জয়ন্তকে, শোভনা রেবার মা নয়, কে যে ওর মা তা তাঁর জানা নেই। বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েও তিনি নিরভিমান। তিনি একদা অতিশয় দুঃস্থ ছিলেন আজ তিনি সাফল্যের শিখরে। কবি, সন্ন্যাসী প্রকৃতির জয়ন্ত শেষ পর্যন্ত রেবার কাছে পরাজয় স্বীকার করল কি! মৃত্যুর মাঝখানে বসে তার নবজীবনের কাব্য রচনার সূত্রপাতের ইঙ্গিতে কাহিনী শেষ।

প্রবোধকুমারের এ কাহিনী একটানা পড়ে যাওয়ার কাহিনী নয়, রোমান্টিক, স্নিগ্ধ অথচ বিস্ময়কর কাহিনী 'পিয়ামুখচন্দা' সেই অনন্যসাধারণ সংলাপে সমৃদ্ধ যা একান্তভাবে প্রবোধকুমারের নিজস্ব। বাংলা সাহিত্যে এমন তীক্ষ্ণ এবং তীব্র সংলাপ কদাচিৎ নজরে পড়ে।

বেহালা—কলিকাতা ৩৪

ভবানী মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় খণ্ডের সূচী ঃ

দেবতাত্মা হিমালয়

(ভ্রমণকাহিনী)

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

সূচীপত্র

॥ ১ ॥

পুরাণে দেবী ধরিত্রী প্রশ্ন তুলেছেন: প্রভু, তোমার আপন স্বরূপ লুকালে কোথায়? মানবাকারে তুমি প্রকাশ নও কেন? ওই উদার গিরিশৃঙ্গমালার বিশাল মৌনে কেন তুমি আপনাকে অভিব্যক্ত করেছ?

পদ্মনাভ শ্রীবিষ্ণু জবাব দিচ্ছেন: প্রিয়ে, মহাহৈমবতের ওই প্রসন্ন আনন্দ-স্বরূপ ক্ষুদ্র মানবাকারের মধ্যে কোথা? ওখানে প্রস্তর কাঠিন্যে দেবতাত্মার প্রকাশ। ওই বিরাট তুষারশৈলাধার সকল দুর্যোগ, শীতাতপ, ভয়, মৃত্যু, বেদনা, জরা ও জয়োল্লাসের অতীত। মহৎ স্থাণুর মধ্যে দেবতাত্মা যোগাসীন। তিনি অজর, অব্যয়, অমেয়।

ধরিত্রী তার শিখরে ধারণ ক'রে রয়েছেন মহাজট তুষারকিরীট দেবাদিদেবকে, যিনি চিরতন্দ্রায় নিমীলিতনেত্র যিনি আত্মস্থিত যোগাসীন। সুদূর দক্ষিণে ধরিত্রীর চরণচুম্বন করছেন মহাজলধি আপন তরঙ্গে।

এই ভুবনমনমোহিনী তুষারকিরীটিনীর দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রয়েছেন সম্রাট অশোক। তিনি ধ্যানস্থ, আত্মসমাহিত। ভারতবর্ষের সুদূর ভবিষ্যতের দিকে এই জগদ্বরেণ্য পুরুষশ্রেষ্ঠের দৃষ্টি নিবদ্ধ সাম্রাজ্যের [illegible]। দুই হাজার দুশো বছর আগেকার কথা।

পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলন হয়ে গেল। রাজধর্মকে কল্যাণধর্মে রূপান্তরিত করবার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন সম্রাট। পৃথিবীর প্রথম মানব সভ্যতা প্রবর্তনের প্রাথমিক নীতিকে উৎকীর্ণ করেছেন তিনি প্রস্তরশিলায় ভগবান বুদ্ধের জীবনাদর্শে। কিন্তু তবু তাঁর আনন্দ নেই মনে, ললাট চিন্তান্বিত, দৃষ্টি বিষণ্ণ। দেশদেশান্তরাগত সন্ন্যাসীগণ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, হে অমিততেজঃ, তুমি কি তুষ্ট নও? আসমুদ্রহিমাচল কি তোমাকে বরণ করেনি?

প্রিয়দর্শী ধর্মাশোক জবাব দিলেন, মহাত্মন্, আমি ভিক্ষু,- আমি বুভুক্ষু কল্যাণের। বিশ্বমানবের দুঃখ, মৃত্যুভয়, নিরানন্দ— এরা বিদূরিত না হ'লে কোথা আমার শান্তি, কোথা বা এই দেবভূমি ভারতের আনন্দ? সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি কোথা?

কর্তব্য আদেশ করুন, হে ভিক্ষুগণ।

গৈরিক বসনাবৃত নগ্নপদ দারিদ্র্যভূষণ সম্রাট-ভিক্ষু নতজানু হলেন সন্ন্যাসী

গণের পদপ্রান্তে। বিগলিত অশ্রুনয়নে নিবেদন করলেন, মহাগুরু ভগবান বুদ্ধের যোগধর্ম প্রচারিত হোক বিশ্বময়, সপ্তদ্বীপায় তাঁর বাণী নবকল্যাণচেতনা আনয়ন করুক, বুদ্ধের দৈবসত্তা প্রতি মানবের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হোক,—এই আমার জীবনের ব্রত। অহিংসার মন্ত্রে পৃথিবী দীক্ষা লাভ করুক, প্রেমের মন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হোক, ত্যাগের মন্ত্র ও মৈত্রী দিকে দিকে ছড়াক, শান্তি, সহমর্মিতার মন্ত্রে তারা নবজীবনবোধের ব্যাখ্যা লাভ করুক। আমার নির্বাণলাভের পূর্বে বিশ্বজীবনের এই সার্থকতা দেখে যেতে চাই মহাগুরু।

বান্দিভিক্ষুর সেই একান্ত বাসনা পূর্ণ হয়েছিল—ইতিহাসে এই সংবাদটি পাওয়া যায়। সম্রাট অশোক প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করলেন কাশ্মীরে। উত্তর-পশ্চিমে গান্ধারের দিকে এবং পরে তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার দিকে সন্ন্যাসী ভিক্ষুগণকে প্রেরণ করেন। তখন গ্রীস ছাড়া পৃথিবীর কেউ তখনও জাগেনি। ম্যাসিডোনিয়া ও মিশর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, বাকি দুনিয়া আসিরিয়া, ব্যাবিলন, চীন সবাই ঘুমিয়ে। ইউরোপের উপকূলে তখন গ্রীক বড় বড় নগর গড়েছে, আর সমুদ্রতীরে আমেরিকার দেখা হয়নি। সম্রাট অশোকের অনুপ্রেরণায় তখনকার মধ্য-এশিয়া ও গান্ধারে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বৌদ্ধসভ্যতার কীর্তি স্থাপন করেন। সেই কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে আফগানিস্তানে, গান্ধারে, তুর্কিস্তানে, সাইবেরিয়ার উত্তর প্রান্তে, মঙ্গোলিয়ার ইতিহাসে, খোটান ও কোরিয়া নামের এসব জায়গায়—বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি, গুহার উঁচু উঁচু আশ্রম ইত্যাদি। শত সহস্র বৎসরের বালুর স্তূপ এই সব ধ্বংসাবশেষগুলিকে আজও বিলুপ্ত করতে পারেনি। আজও সেখানে বালুর প্রাকার গৌতম বুদ্ধের বাণীকে বহন করছে।

সম্রাট অশোকের এই বিশ্ববৌদ্ধবাণী সাধনার প্রথম কেন্দ্র পত্তন হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল কাশ্মীর। প্রথম কাশ্মীর থেকে ভিক্ষুর দল প্রবেশ করেছিল সম্রাট অশোকের সময় গান্ধারে—এ-গান্ধার একদিন মহাভারতীয় চন্দ্রবংশের প্রভুত্বে ছিল। তাদের মতে সেদিনও গান্ধারের প্রধান প্রবেশপথ ছিল 'পুরুষপুর'। এখানে যে শহরটিকে বলা হচ্ছে পেশওয়ার। রাজধানী পুরুষপুরকে কেন্দ্র করে সমগ্র গান্ধারে বৌদ্ধ সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন সম্রাট ভিক্ষু অশোক।

ভারতের উত্তরে কাশ্মীর থেকেই বৌদ্ধসভ্যতা প্রথম দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেছিল। সেদিন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য সীমানা আজকের মত চিহ্নিত ছিল না। ওদিকে পারস্যের পথ এবং এদিকে তিব্বত মঙ্গোলিয়ার পথ সম্পূর্ণ অবারিত ছিল। মানবধর্মনীতি ও সুশাসনের প্রভাবে সকল জাতির মানুষ সেদিন

সহজে বশ্যতাস্বীকার করতো। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্য, লাদাক, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, এবং দক্ষিণে সিংহল ও সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্রাট অশোকের ধর্ম ও মানবতার নীতির নিকট আত্মসমর্পণ ক'রে আনন্দ পেয়েছিল।

এই কীর্তি ভারতের সংস্কৃতির—কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর ছিল এই সংহতিমন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র। শত শত উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে চ'লে এসেছে এর ঐতিহ্য আর সভ্যতা। মহাপ্রলয় ও ঝঞ্ঝা, সংহার ও সৃষ্টি, অগণিত দানবীযতার দংষ্ট্রাঘাত, অসুরের করালচক্ষু এবং সংখ্যাতীত সন্ন্যাসী ও দৈব-মানবের ভয়হীন প্রতিভার স্বাক্ষর—কাল-কালান্তের সকল ইতিহাস চিহ্নিত রয়ে গেছে এই সংস্কৃতির পর্বে পর্বে। কিন্তু একথা সত্য, আড়াই হাজার বছর আগে গৌতমবুদ্ধের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন ভারতেরও নবজন্মলাভ ঘটে।

কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম

ধবলাধার গিরিশ্রেণী দাঁড়িয়ে রয়েছে সোজা উত্তরে, উত্তর থেকে পূর্বদিকে তার শাখা-প্রশাখা। উলঙ্গ ফকিরের মতো সে উর্ধবাহু, বুভুক্ষায় বঞ্চনায় সে যেন চিরদরিদ্র আমাদের পথ ধবলাধারের দিকে নয়, আমরা যাবো উত্তর-পশ্চিমে,—ইরাবতী নদী পেরিয়ে জম্মুর দিকে পুরাকালে চাক নামক এক বর্বর পার্বত্য জাতি কাশ্মীরের উপর প্রবল অনাচার করেছিল, সম্ভবত তাদেরই নামানুসারে চাক্কি নামক একটি চেক-পোষ্ট পাশে রেখে আমরা পাঠানকোট থেকে বেরিয়ে মাধোপুর ও লক্ষণপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। গত রাত্রে আমরা জলন্ধর থেকে পাঠানকোট পর্যন্ত শতদ্রু এবং বিপাশা অতিক্রম ক'রে এসেছি। বস্তুত কাশ্মীর পরিভ্রমণকালে কোনো না কোনো সময়ে পঞ্চনদ এবং সিন্ধুনদ না পেরিয়ে উপায় নেই। নদীর সঙ্গে যোগাযোগ না করলে পার্বত্যভূমিতে আনাগোনা করা যায় না। আসামে ব্রহ্মপুত্র, ভূটানে রায়ডাক আর কালচিনি, সিকিমে তিস্তা আর রংগীত, দার্জিলিংয়ে মহানন্দা, নেপালে বাগমতী, কুমায়ুনে কোশী আর গঙ্গা-যমুনা,—যেখানে যাও, যে কোনো পাহাড়ে, যে কোনও হিমালয়ে। প্রভাতের প্রথম রক্তরশ্মির নীচে দিয়ে দেখে এসেছি শীতলসাগর হ্রদ, অতিক্রম ক'রে এসেছি বিপাশার গৈরিক স্রোত। দেখে এসেছি এই সুদূর উত্তরেও ছড়িয়ে রয়েছে বাংলা দেশ এখানকার পথে প্রান্তরে, শস্যক্ষেত্রে আর গুল্মলতায়—সমস্ত নীলাভ ঐশ্বর্যসম্ভার নিয়ে। দূরে দূরে ধূম্রাভ গিরিশ্রেণীর স্তবকে স্তবকে শ্রাবণশেষের বর্ষণক্লান্ত

মেঘের দল বিশ্রাম নিচ্ছে। প্রজাপতি পতঙ্গরা পথে বেরিয়ে পড়েছে সূর্যকিরণে।

পাঠানকোট থেকে জম্মুর পথ। আগে ছিল অব্যবহার্য, এখন সে পথ চিক্কন ও মসৃণ। শিয়ালকোট থেকে জম্মু ছিল রেলপথ, কিন্তু শিয়ালকোট এখন পাকিস্তানে। পাঠানকোট থেকে জম্মু মোটর বাসে গেল সাতষট্টি মাইল।

সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর কয়েক ভাগে বিভক্ত। পীর পাঞ্জালের এপার হোলো জম্মু উপত্যকা, ওপার হোলো কাশ্মীর। উপত্যকা কাশ্মীরের উত্তরে সিন্ধুনদ পার হলে গিলগিট ইস্কমান, বালতিস্তান ও লাদাখ। এরাও কাশ্মীরের অন্তর্গত। আমার 'উত্তর হিমালয় চরিতে" এই সকল বিচিত্র অঞ্চল ভ্রমণের আলোচনা করেছি। সে যাই হোক, জম্মু পাঞ্জাবের অন্তর্গত ছিল বহুকাল। জম্মু হিন্দুপ্রধান, এবং কাশ্মীর বর্তমানে মুসলীম প্রধান।

মাধোপর ছাড়িয়ে ইরাবতীর পুল পার হয়ে লক্ষণপুর পেছনে রেখে চললুম পশ্চিম দিকে। শাল সেগুন আর শিসমের ঘনচ্ছায়াময় পার্বত্য উপত্যকা পথ মধুর লেগেছে মনে মনে। দক্ষিণের হায়দ্রাবাদের মতো এদিকে পাঞ্জাবের সুদীর্ঘ কোন কোন অঞ্চল শালভূমির মতো। রুক্ষ বঙ্কিম পর্বতের সানুদেশ লতাগুল্মবিজড়িত তারই ভিতর দিয়ে কোথাও কোথাও পীর পাঞ্জালের বন্য নদীর বক্রবরণ প্রবাহ ছুটে চলেছে। এই পথ থেকে শিয়ালকোটের সীমানা বড় নিকট। এই গৈরিক প্রবাহ ইরাবতীরই শাখাপ্রশাখার অন্তর্গত। এরা আসছে ধবলাধার গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে,—এদের মূল উৎস সম্ভবত পীরপাঞ্জালে, যার উত্তর লোকে তোলা ধবলাধার কিন্তু এমনটি দেখিনি কেউ —ত লাগি, এত বক্রের স্রোত হয়ত একেই বলে বক্রগঙ্গা।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নকালে একটি গ্রাম পেরিয়ে গেল নাম শম্পা। শম্পা অর্থে বিদ্যুল্লতা, যদি শম্ব হয় তবে বজ্রদণ্ড। ছোট পাহাড়ী গ্রাম পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত, ডানদিকে পার্বত্য কাঠভূমি। বনময় উপত্যকা আর আঁকাবাঁকা গিরিনদীর উপলাহত স্রোত নিঃঝুম মধ্যাহ্নকে নিবিড় করে তুলেছে। দূর দিগন্তে ঠাহর করা যায় পাঞ্জাবের বিশাল সমতল, আর সেই সমতলের থেকে শিরদাঁড়া ও মেরুদণ্ডের মতো হিমালয়ের পার্বত্য শিরা উপশিরাগুলি উত্তরখণ্ডের দিকে প্রসারলাভ করেছে। এরাই হোলো হিমালয়ের ভিত্তি, এরাই হোলো তা'র ভূতাত্ত্বিক পঞ্জর বন্ধন।

কিছু অস্বস্তি ছিল মনে কিছু বা শঙ্কা। দিল্লী থেকে বের হবার কালে কোনো কোনো উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ভয় দেখিয়েছিলেন কাশ্মীরে রক্তারক্তি চলছে, ওদিকে নাই গেলেন। সেটা ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্টের মাঝামাঝি পাঁচ সপ্তাহখানেক আগে শেখ আবদুল্লা গদিচ্যুত হয়েছেন, এবং কয়েক সপ্তাহ আগে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীনগর প্রান্তে আটক অবস্থায় হঠাৎ মারা গেছেন। অজানা ভবিষ্যতের ভাবনায় সমগ্র কাশ্মীর উদ্বিগ্ন।

দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করি, রক্ত দেখতে দেখতেই আমরা মানুষ, কারণ আমরা বাঙালী। জীবরক্ত আমাদের খাদ্য, টাটকা মাছ-মাংসের হৃৎপিণ্ড ঝরানো রক্ত দেখলে আমাদের মুখ লালাসিক্ত হয়। রক্তাম্বর আমাদের চোখে পবিত্র পরিধেয়। রক্তলোভাতুরা মহাকালী আমাদের ইষ্টদেবী। বলিদানের পুণ্যরক্ত দেখলে আমরা ভাবাপ্লুত হই। রক্তাম্বরা অসুরনাশিনী চণ্ডীর স্তোত্র শুনতে শুনতে আমাদের আবেশ আসে। রক্তজবা আর রক্তচন্দন আমাদের পূজার উপচার। আমাদের মেয়ে পায়ে পরে আলতা, মাথায় ধরে সিন্দুর, রাঙাপাড় শাড়ী তাদের সকল উৎসবে পরিধেয়। বাঙালী কবি উদয়াস্ত গগনের রক্তচ্ছটায় কাব্যের প্রেরণা পান রাজনীতিতেও তাই ১৯০৫ থেকে অদ্যাবধি বাঙালীর রক্তক্ষরণের কাহিনী। শিবভারতের রাজনীতি বাঙালীকে অভিভূত করেনি রক্তবিপ্লবে তারা খোঁজে আনন্দ নেতাজী সুভাষচন্দ্র যেদিন সংহারমূর্তি নিয়ে দাঁড়ালেন বাঙালী সেদিন প্রাণের শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য সাজালো তাঁর উদ্দেশে। বাংলার সরকারী প্রতীক হোলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার। রক্তে বাঙালীর ভয় নেই এই সেদিনও এক পয়সা ট্রামভাড়া বাঁচাতে গিয়ে কলকাতার পথে পথে বাঙালী রক্তারক্তি করেছে। কিন্তু তবু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণ যে সময়টায় বিস্ময়বিমূঢ় এবং হতচকিত ঠিক সেই সময়টিতে কাশ্মীরে প্রবেশ করা দুর্ভাবনার কারণ বৈ কি। চারিদিকে চাপা উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে, কাশ্মীর মিলিসিয়ার কর্মতৎপরতা নানা দিকে প্রকট, কখন আগুন জ্বলে ওঠে কে জানে।

দেখতে দেখতে এসে পড়েছি অনেকদূর। অনেক পার ঘুরেছি, আঁকাবাঁকা আর পার্বত্যকার সর্পিল গতি আমাদের মোটর বাসকে অনেক চড়াই উৎরাইতে ঘুরিয়ে আনলো অপরাহ্নের চেহারায় মধ্যাহ্ন বিগতপ্রায়। সমতলের কোলাহল কলরব আর কোথাও শোনা যাচ্ছেনা। মাঝে মাঝে রাঙামাটির অধিত্যকায় শালশেগুন শিশমের ছায়ানিবিড় বনে পাখীসমাজের বিশ্রম্ভালাপ চলছে।

পার্বত্য পাঞ্জাব হিন্দুপ্রধান—শিব এবং শক্তির পূজারী। সেই কারণে জম্মু উপত্যকার প্রায় সর্বত্রই হিন্দুমন্দির। কোথাও রঘুনাথ, কোথাও রুদ্রেশ্বর, কোথাও বা ভৈরব। রাজপথের বাইরে নিরিবিলি বৃক্ষতলার মধ্যে চকিতে শোনা যায় পূজাপ্রহরের ঘণ্টারব। কোথাও দেবদেউলের বাইরে এসে দাঁড়ালো পট্টবস্ত্র পরিহিত পূজারী ব্রাহ্মণ, ছোট পাহাড়ের ওই অনেক উঁচুতে হয়ত চোখে পড়ছে ত্রিশূলীর মন্দিরে শ্বেত ও রক্তপতাকা উড্ডীন। কোথাও দেখছিনে একটিও মসজিদ, অথবা একটিও শিখ গুরুদ্বার। কাশ্মীরের ধমনীতে হিন্দু আর বৌদ্ধভারতের রক্ত বইছে চিরদিন।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। আমাদের মোটর বাস এসে দাঁড়ালো জম্মু শহরে। ঘণ্টাখানেকের মতো ছুটি পাওয়া গেল। জম্মু হোলো পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরের মিলনক্ষেত্র।

বড় শহর, মস্ত বাজার হাট। পাহাড়ের নাতিউচ্চ প্রশস্ত উপত্যকায় এই শহর খুবই প্রাচীন। একদিকে পাঞ্জাব এবং অন্যদিকে শ্রীনগর, সুতরাং এ শহরে আমদানি রপ্তানির কাজ প্রচুর। বাইরে থেকে নানা সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা এসে এখানে বাসাপাট বসিয়েছে বহুকাল আগে থেকে। পথঘাট অপরিসর-পার্বত্য শহরে যেমন হয়; কোনদিক ঢালু, কোনদিক উঁচু। এটি হোলো কাশ্মীর মহারাজের শীতকালীন রাজধানী। এখন মহারাজা হরি সিং তাঁর কুকর্মের জন্য সম্প্রতি নির্বাসিত, তার স্থলে আছেন তাঁরই তরুণ পুত্র করণ সিং—তিনিই এখন কাশ্মীরের সদর ই রিয়াসৎ, অর্থাৎ অনেকটা রাজ্যপালের মতো।

সমগ্র কাশ্মীর ও জম্মুতে চাউল হোলো প্রধান খাদ্য, গম নয়। কিছু বিস্ময় লাগে যখন দেখি বাঙালীর অতি পরিচিত ভোজ্য উপকরণ কাশ্মীরের পায় সর্বত্র। লাউ বেগুন থোড় কচু কাঁচকলা ঝিঙে উচ্ছে ডুমুর কুমড়ো নটে আর লাউডগা। যদি কেউ মনে করে কাশ্মীরের হিন্দুমুসলমান জনসাধারণ উগ্র এবং বলিষ্ঠ স্বভাব, সে ভুল করবে। ওদের প্রাণশক্তির প্রবলতার কোন পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। এমন নিরীহ জাতি ভূভারতে নেই। ওরা তাই মার খেয়ে এসেছে চিরকাল, কিন্তু মাথা তোলেনি একবারও। একবারও শোনা যায়নি, উৎপীড়িত কাশ্মীরীরা বিপ্লব ঘোষণা করেছে, অথবা দস্যুকে বিতাড়িত করেছে। এ 'দুর্নাম' ওদের নেই। শক্তিতে ওরা বাঙালী অপেক্ষা অনেক দুর্বল। ওরা হোলো প্রাচীন আর্যজাতির মহৎ বিনষ্টির সাক্ষ্য। ওরা শুধু মধুরস্বভাব, ওরা অতিথিপরায়ণ, ওরা পরম শান্ত,—কিন্তু না আছে ওদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, না বা আত্মপ্রতিষ্ঠা। যে-কোনো

শ্রেণীর শাসক বাইরে থেকে এসে ওদের ওপর প্রভুত্ব করুক, ওরা আত্মসমর্পণ করতে উৎসুক। এই অতি কোমল প্রকৃতির ভিতর থেকে বজ্রের কাঠিন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে আজ একদল কাশ্মীরী-শাসক।

জম্মুর চাউল হোলো ভারত প্রসিদ্ধ। এমন নধর সুস্বাদু ও শুভ্র তার শ্রী। একটি গুজরাটি হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে পথের ধারে এক মনোহারী দোকানে উঠে বসলুম। আমি বাঙালী শুনে দোকানদার সসম্ভ্রমে আসন দিল। কাশ্মীরের জন্য সর্বশেষ আত্মবলি দিয়েছে বাঙালী, অর্থাৎ ডা. শ্যামাপ্রসাদ। সমগ্র কাশ্মীর এখন বাঙালীর জয়গানে মুখর। এই বলতে বলতে মুসলমান ছোকরা অতিশয় উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তার ধারণা, শ্যামাপ্রসাদের অপমৃত্যুর জন্য 'শেখ সাব' সম্পূর্ণ দায়ী। হম কাশ্মীরী হু, কবভি ঝুট নহি বোলতা সাব। দুনিয়াভর ইনসানকো মালুম হো গৈ।

আমাদের মোটর বাস আবার জম্মু ছেড়ে চললো। বেলা অপরাহ্ন। আমরা এন. ডি বাধাকিষেণ কোম্পানীর গাড়ীতে যাচ্ছি। এটি লালমোটর অর্থাৎ ডাকগাড়ী। আমাদের ড্রাইভর অতি ভদ্র এক কাশ্মীরী সৌম্যদর্শন ব্যক্তি, নাম বক্সীজী। পার্বত্যপথের বিপদসঙ্কুল বাঁকে-বাঁকে গাড়ী চালাবার জন্য যে ধীর বিচারবুদ্ধি ও সচেতন দৃষ্টির প্রয়োজন, বক্সীজীর অনন্যসাধারণ যোগ্যতায় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল পদে পদে।

জম্মু থেকে উধমপুর বেশী দূরে নয়। সুপ্রশস্ত ও সুদৃশ্য উপত্যকা শহর উধমপুর। এবার আশে পাশে অল্পস্বল্প পাওয়া যাচ্ছে পার্বত্য প্রাচীর ধীরে ধীরে উঠছি চড়াই পথে। নিস্তব্ধ উধমপুর। অদূরে বট অশ্বত্থের ছায়াচ্ছন্ন লোকে একটি মন্দির দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় আজ সেখানে কোনও বিশেষ পর্ব ছিল। পথের বাঁকে, বাজার এক উদ্যানবাটির মস্ত তোরণ। তারই প্রত্যেক ঘাটিতে দেখা যাচ্ছে মিলিটারী পোসাকপরা সশস্ত্র প্রহরীর দল। উদ্যানটির আয়তন অতি বিস্তৃত, এবং দূর থেকে চোখে পড়ে একটি টিলা-পাহাড়ের উপরে একতলা রাজবাড়ী। ওখানে শেখ আবদুল্লা সাহেব বর্তমানে অন্তরীণাবদ্ধ। তিনি নিজে বন্দী, কিন্তু থাকেন সপরিবারে। দেশের নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য বক্সী গোলামের হাতেই বন্দী, কিন্তু শিষ্যের হাত থেকে গুরু দক্ষিণা পাচ্ছেন নিয়মিত। অর্থাৎ চূড়ান্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই তাঁকে আটক রাখা হয়েছে—সংবাদপত্রাদি এবং বেতার যন্ত্রসহ। তাঁর গতিবিধি প্রাসাদ উদ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই প্রাসাদের বারান্দা থেকে সমগ্র জম্মু উপত্যকা দৃষ্টিগোচর হয়।

উধমপুর ছেড়ে গাড়ী ছুটে চললো এবার চড়াই পথ ধরে। এবার যেন

শতদলের এক একটা দল মেলছে। পূর্বদিকে এবার ধবলাধারের বিস্তার—আমরা প্রবেশ করছি উত্তরে পীর পাঞ্জালের আঁকাবাঁকা চড়াই পথে। গোধূলির আর বিলম্ব নেই। এপাশে ওপাশে নামছে গিরিনির্ঝরিণীরা, ওদের নূপুরনিক্কণ কানে আসছে, শুনতে পাচ্ছি কলকণ্ঠীর গুনগুনানি। সমতল জগতে ওদেরকে কোথাও পাইনে, ওরা থাকে হিমালয়ের পারিজাত কাননের আড়ালে-আবডালে। আজ শুক্লা সপ্তমী। হিমালয়ের রাজসভা বসবে আজ চন্দ্রভাগার তীরে তীরে, তার জন্য তৈরী হচ্ছে ওরা, ওই 'সুন্দরী নগা তরলিত চন্দ্রিকা চন্দনবর্ণা।'

খদ নামক একটি পাহাড়ী বস্তির কাছে এসে চা পান করা গেল। স্থানীয় অধিবাসীরা একে বলে 'কুদ'। তৎকালে কিছু নেই কোথাও, অনেক উঁচু থেকে অনেক নীচু অবধি চলে গেছে এই বস্তি। তীর্থপথে একে সাধারণ 'চটি' বলা যেতো। ওখানে দুটি উল্লেখযোগ্য জলধারাপাত চোখে পড়ে। সমগ্র খদটি অর্ধচন্দ্রাকার অশ্বক্ষুরাকৃতি। যেমন দেখেছি, মুসৌরী ছাড়িয়ে কেম্পটি প্রপাত, যেমন দেখে এসেছি চেরাপুঞ্জির জলধারা। এতক্ষণে আমরা সমুদ্রসমতা থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উপরে উঠেছি। বাতাস লঘু, সুখচোরা স্নিগ্ধ হাওয়ায় আমরা সজীব হয়েছি। সন্ধ্যার ছায়ায় আমরা ছোট্ট শৈলস্বাস্থ্যনিবাস বাটোটে এসে পৌঁছলুম।

আমরা মোট জন পঁচিশেক যাত্রী। সবাই বলছে, এবার ট্যুরিষ্টের ভীড় কম। রাজনীতিক কারণে সকলেই ত্রস্ত। কারো কারো ধারণা, পাকিস্থানের পক্ষ থেকে আক্রমণ ঘটতে পারে। আমাদের গাড়ীতে স্ত্রীলোক ও শিশুও আছে দুচার জন। কেউ কেউ বমি করতেও আরম্ভ করেছে, অর্থাৎ 'চক্কর' লেগেছে। একজন আছেন মাদ্রাজী সরকারী কর্মচারী, নাম আয়ার। তার আর্থিক অবস্থার চাকচিক্য ঠিকরে পড়ছে আমাদের এপাশে আর ওপাশে। তিনি যাচ্ছেন কাশ্মীরে স্বাস্থ্যোদ্ধার কামনায়। যুবক বলা চলবে না, প্রৌঢ় বলতে বাধে। সম্ভবত কেউ তাকে ব'লে থাকবে, দুধ খেয়ো খুব, ফল খেয়ো তার চেয়েও বেশি। ফলে তার এহাতে ওহাতে কিছু না কিছু ফল, ঝুড়িতে ফল, দুই পকেটে ফল। গাড়ী কোথাও থামলেই তিনি ছোটেন কোনও দোকানে, যদি দুধ পাওয়া যায়। সকাল থেকে তিনি বার আটেক দুধ খেয়েছেন, ফলের রস ঝরছে তার কোটপ্যান্টে। বাটোটের ছায়ান্ধকারে তিনি কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য হয়েছিলেন। বক্সীজী বারম্বার হর্ন দিচ্ছিলেন গাড়ীতে তার জন্য। একসময় তিনি ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। মুখে হাতে জলের দাগ। বেশ হাসিখুশী। তাকে নিয়ে সারাদিন ধ'রে গাড়ীর

মধ্যে চাপা হাসি আর টুকরো কথার চোখ ঠারাঠারি ছিল। আমার ভ্রূক্ষেপ করেন নি। দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে আর্যাবর্তের আজও রুচির মিল হয়নি।

গাড়ী ছাড়লো। কিন্তু এবার ভয়ের সঞ্চার হচ্ছিল মনে মনে। পাহাড়ের পথ অন্ধকার হয়ে গেছে। গাড়ীর হেডলাইট জ্বলছে। রাত্রি তা'র দিগন্তজোড়া ডানা মেলে নেমে এসেছে পীর পাঞ্জালের চড়ায় চূড়ায়। দিনমানে যে হিমালয় শোভা ও সৌন্দর্যের প্রতীক রাত্রির অন্ধকারে তা'র দানবাকার মূর্তি হৃৎকম্প আনে। অনেক উঁচুতে উঠতে হচ্ছে, অথচ প্রশস্ত পথ নয়। একটু ভুল অমনোযোগ একটু বা দৃষ্টিবিভ্রম,—অমনি আমাদের অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবী অবলুপ্তি। সাধারণতঃ রাত্রের দিকে পার্বত্য পথে মোটর চালনা নিষিদ্ধ। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এ নিয়ম মানতে গেলে চলে না। বলা বাহুল্য বাইরের দিকে নিরুপায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমরা রুদ্ধশ্বাস ভয়ে গাড়ীর মধ্যে বসে ছিলুম।

যেদিকে গহ্বর সেইদিকে আমি। গাড়ীর চাকা আর মৃত্যুর মাঝামাঝি কয়েক ইঞ্চি মাত্র ব্যবধান, হেডলাইটের আলোয় তা'র পরিমাপ করছিলুম প্রতিক্ষণে। কিন্তু আতঙ্কময় বিমূঢ়তারও শেষ আছে একসময়ে। যদি হঠাৎ আসে এক ঝলক বনপুষ্পের গন্ধ, মৃত্যুভয় মধুর হয়ে ওঠে। যদি হঠাৎ চোখে পড়ে শুভ্র। সপ্তমীর মলিন জ্যোৎস্না বিশাল চিত্রক ছায়া ফেলেছে হিমালয়ের ওই কৃষ্ণাঙ্গ দৈত্যদলের বক্ষপটে, তবে হতচেতন বিস্ময়ের উপর দিয়ে অনন্তের স্বর্ণদ্বার খুলে যায়। একটি বিন্দুর উপরে দাঁড়িয়ে বর্তমান কাঁপতে থাকে থরথরিয়ে।

আমরা যাচ্ছিলুম চন্দ্রভাগার ধার পথ বেয়ে। ঘূর্ণী লেগেছে তা'র বঙ্কুরবর্ণ খরস্রোতে, সেই ঘূর্ণিজল মায়াচ্ছন্ন জ্যোৎস্না। শত শত চন্দ্রখণ্ডকে চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে। আমরা উৎরাই পথে রামবান সাঁকোর দিকে নেমে যাচ্ছি। বনতল অন্ধকার,—চন্দ্রহাস রাত্রি নেমে এসেছে চন্দ্রভাগায়। লক্ষ লক্ষ বৈদূর্যমণির মতো জ্যোৎস্না জ্বলছে খরতর তার প্রবাহে।

সম্মুখের বহুগিরিদলের চূড়ার উপর আকাশলোকে এসে দাঁড়ালেন সপ্তঋষির দল। পুরাণ মহাকাব্যের ভিতর থেকে একে একে বেরিয়ে এলো অপ্সরা,—জ্যোৎস্নারাত্রে লজ্জাবাস বিসর্জন দিয়ে যারা অবগাহন স্নানে নামে। বন্য কেশরীর বক্রমার্গ পদচিহ্ন অনুসরণ করে সিংহশিকারী বল্কলবাস কিরাত এসে দাঁড়ালো নদীর বালুবেলায়। নগ্নকান্তি বিদ্যাধরা ভূর্জপত্রে বঙ্কিম-স্বর্ণাক্ষরে লিখে চলেছে প্রণয়সঙ্গীত। হিমালয়ের গুহাচ্ছিদ্র-নিঃসৃত শীতলশ্বাস নিকটবর্তী বেণুবনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আপন মর্মরধ্বনিতে মধুর সুরযোজনা

করে। ময়ূরপক্ষী কিন্নরদল নৃত্য ক'রে যায় তা'র তালে তালে। আরণ্যক ঐরাবতেরা এসে তাদের গাত্র ঘর্ষণ ক'রে যায় বিশাল দেবদারুকাণ্ডে, সেই ক্ষতগাত্রের সুগন্ধে পর্বতশীর্ষ হয় সুবাসিত। হিমালয়ের বন্য জ্যোতির্লতার আভায় আলোকিত গুহাভ্যন্তরে অরণ্যচারী কিরাত ও যক্ষিণীগণের লজ্জা-হরণের বিলোল বিহ্বল রসরঙ্গলীলা, অবশেষে মেঘের দল নেমে এসে গুহামুখে যবনিকার আবরণ টেনে দেয়। প্রভাতে আসেন সপ্তঋষিগণ স্বর্ণপুষ্প-চয়নে। তাঁরা পদচারণা ক'রে যান তুষার প্রান্তরের ধারে শতদল সায়রে

সেই জ্যোতির্লতা আর স্বর্ণপুষ্পের সন্ধানে আমার উৎসুক দৃষ্টি ওই তারকা-স্পর্শী বিরাট হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় সেই জ্যোৎস্নারাত্রে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

বাসবান পেরিয়ে আমাদের গাড়ী আবার সেই ছায়ান্ধকার গিরিগাত্রের বিপজ্জনক পথ দিয়ে চড়াই ভেঙ্গে চললো।

আতঙ্কে আনন্দে সে পথ বিচিত্র। ঠিক ভয় নয়, বিস্ময় মিশ্রিত বিহ্বল। দুর্ভাবনায় কথা বলছে না কেউ। ঘাড় গুঁজে গাড়ী চলছে, তার অবিশ্রান্ত গোঁ গোঁ আওয়াজ কানে ভালো লাগছে। জ্যোৎস্নারাত্রে বিমানে চ'ড়ে যারা আকাশলোকে বিচরণ করেছে তা'রা জানে এ আওয়াজ। বিমান ভেসে চলেছে স্বপ্নসায়রে। ভয়ের চেতনা লোপ পেয়েছে। বিমানখানি বিকল হয়ে যদি প'ড়ে যায় নীচে, তা'র পরিণাম সম্বন্ধে মন অসাড়। কারণ নীচেকার পৃথিবী দেখা যাচ্ছে না। কুতুব মিনারের শীর্ষে উঠলে ভয় করে, কারণ পতনের ফলে যে শারীরিক সংঘাত ঘটবে—সেই কঠিন ভূমি আমরা দেখতে পাই। জ্যোৎস্না-লোকে দশ হাজার ফুট উঁচু শূন্যে বিমানে ব'সে আমরা দেখতে পাই একটা অবাস্তব মায়াচ্ছন্ন ব্যোমলোক,—সেটি শব্দজগতের ঊর্ধ্বে, সেখানে পাখী পৌঁছয় না,—প্রাণের কোনও চেতনা নেই। অনন্ত গগনে সেই আশ্চর্য শূন্য। ঘণ্টায় পাঁচশ' মাইল বেগে ভেসে চলেছে বিমান, কিন্তু অনুভব করছে না কেউ। প্রচণ্ড গতি, প্রচণ্ডতর বেগ,—অথচ বিমানটি স্থির, একটু নড়ছে না, একটু দুলছে না, সে অচঞ্চল গতিচেতনাহীন। চাঁদ নড়ে না, মহাশূন্য নড়ে না। আরামগদিতে শুয়ে আরোহীরা নিদ্রিত। কাচের জানলার ভিতর দিয়ে স্থির জ্যোৎস্না এসে পড়েছে হয়ত কোনও এক বিবশ, তন্দ্রালসার উপরের মুখচন্দ্রমায়।

এখানে অন্য কথা। পর্বতবক্ষে জ্যোৎস্না, নীচের খদ ভয় ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এপারে বিশাল দেওয়াল গাত্রে যে সূত্রপথ, তা'র উপর দিয়ে মোটর বাস চলেছে। চাকার পাশে দেখতে পাচ্ছি নীচের দিকে দু'হাজার ফুট কালো

গহ্বর—দেখতে পাচ্ছি মৃত্যুর মুখব্যাদান এবং তাকে পদে পদে এড়িয়ে পালাতে চাইছি।

রাত প্রায় সাড়ে নয়টায় বানিহাল বস্তির উৎরাই পথে গাড়ী এসে পৌঁছলো। শরীরের তন্ত্রে তন্ত্রে তখন অবসাদ জড়িয়ে ধরেছে।

কয়েকখানি দোকানে অল্পস্বল্প আলো জ্বলছে। আবছা জ্যোৎস্নায় আশ-পাশে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমাদের গাড়ী এসে থামলো একটি যাত্রীশালার ধারে। এখানে আজকের মত রাত্রিবাস। রক্ষক হোলো এক মাড়োয়াড়ী। দু'টাকা ভাড়ায় একটি ঘর নিলুম।

চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে এই বানিহালের অধিত্যকা। চাঁদের আলোয় আন্দাজে বোঝা গেল, কাছাকাছি রয়েছে এক গিরিনদী। এখানে ওখানে তেলের আলো জ্বালা কয়েকখানি দোকানদানি, সামনেই কোথাও আছে একটি ব্যাটারিচালিত বেতারযন্ত্র। আমার ঝুপসি ঘরখানার কোলে বারান্দা সেখানে নানালোকের নানা জটলা। ঠাণ্ডা পড়েছে বাইরে। আগামী প্রভাতে সাতটায় আবার আমাদের গাড়ী ছাড়বে।

বনময় গিরিনদীঘেরা পাহাড়তলীর অধিত্যকায় ওই পরম সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রিটি ওই বেতারযন্ত্রের চিৎকারের দ্বারা যেন ক্ষণে ক্ষণে সূচিকাবিদ্ধ হচ্ছিল। এমন বিরক্ত হইনি আর কোনওদিন ওই যন্ত্রটার প্রতি কিন্তু কতকটা অন্যমনস্ক ছিলুম ব'লেই আসল ব্যাপারটা অনুধাবন করিনি। ঠাহর ক'রে দেখি, এই পার্বত্য গ্রামটি কতকগুলি সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় পরিবেষ্টিত রয়েছে, এবং অদূরে একটি দোকানে ওই বেতারযন্ত্রের চারিদিকে অনেকগুলি লোক ভীড় করেছে। পাকিস্তানের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা ও রাজপুরুষ করাচী থেকে অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কাশ্মীরবাসীর উদ্দেশ্যে বেতারে বক্তৃতা করছেন।

বক্তৃতার ভাষাটি উর্দু। অল্পস্বল্প বুঝতে পারা যাচ্ছিল। 'শেখ আবদুল্লার গদিচ্যুতি এবং অবরোধের সংবাদে সমগ্র পাকিস্তান আজ মর্মাহত এবং অশ্রুভারাক্রান্ত। কাশ্মীরবাসীগণের প্রতি ভারতের অমানুষিক অত্যাচার যে কতখানি বর্বরোচিত তা পৃথিবীবাসীগণ জানে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় শেখ আবদুল্লার প্রতি ভারত যে প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং ভারতীয় সৈন্যরা সমগ্র কাশ্মীরে নরনারী ও শিশু নির্বিশেষে যে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে, তার প্রতিশোধ নেবার জন্য পাকিস্তান প্রস্তুত। অতএব আমরা পবিত্র কোরানের নামে শপথ করছি, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ

তোমাদের এই সর্বনাশা বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য শ্রীনগরের দিকে অভিযান করবে। ইসলাম আজ বিপন্ন, তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও। শেখ আবদুল্লা সাহেবের অপমানের প্রতিশোধ নাও।'

শেখ আবদুল্লার প্রতি এই পীতির সংবাদ শুনে হঠাৎ মনে পড়ে গেল পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী শত্রুনিহত জনাব লিয়াকৎ আলী খানের কথা,—যাঁকে রাওয়ালপিণ্ডিতে হত্যা করা হয়। তিনি একদা এক বক্তৃতাকালে ঈষৎ উত্তেজনার সঙ্গে শেখ আবদুল্লার উদ্দেশে কটূক্তি করে বলেন, 'কাশ্মীর আপকো বাপকা মিলিকিয়াৎ নেহি হ্যায়। –কাশ্মীর আপনার পৈতৃক সম্পত্তি নয়।

শেখ আবদুল্লা শ্রীনগরে দাঁড়িয়ে সহাস্যে জবাব দিয়েছিলেন, কথাটা ঠিক। তবে কাশ্মীরে আমার পুরুষানুক্রমিক বসবাস কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ থেকে গিয়ে যদি কোনও ব্যক্তি পশ্চিম পাঞ্জাবের উপরে অন্যায় প্রভুত্ব করে, তবে তাকেই অনুরূপ সম্ভাষণ করা উচিত, –আমাকে নয়।

নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খান এই মন্তব্যটি শুনে চুপ করে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁর বাড়ী ছিল উত্তর প্রদেশে পরবর্তীকালে আততায়ীর গুলীতে লিয়াকৎ আলী নিহত হন

সকালে উঠে দেখি নিস্তব্ধ পাহাড়পল্লী তখনও ঠিকমতো বাসিন্দাদের ঘুম ভাঙেনি। রঙীন পাখীরা পীর পাহাড় থেকে নেমে এসেছে অধিত্যকায়। বস্তির উত্তরপ্রান্তে উপলাহত গিরিনদীর কুলুকুলুধ্বনি শোনা যাচ্ছে চতুর্দিকে পাহাড়ের পর পাহাড়ের অবরোধ। ওরই মধ্যে একটু আধটু চাষবাস ও ফসলের কাজ চলছে। দোকান পাট এখনও খোলেনি। রাত্রে যে উত্তেজনাটুকু দেখা গিয়েছিল সকালে তার চিহ্নমাত্রও নেই। রাজনীতিক ভূমিকম্পের সঙ্গে কাশ্মীর চিরদিন পরিচিত, এই সামান্য বিপর্যয়ে তার বিশেষ কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

আমাদের গাড়ী প্রস্তুত হোলো সকাল সাতটায়। কিন্তু গাড়ী ছাড়বার প্রাক্কালে সেই যুবকটি এসে দাঁড়ালো হাসিমুখে—যাকে অ... এখনই হয়ত হত্যা করা হবে। অতি ভদ্র যুবক। মদ্যপায়ী যুবকটি ওরই 'চাচার' ছেলে, নাম শের গুল। শের গুলের উত্তেজনা অতি ক্ষণস্থায়ী, যুবকটি জানালো। চোরাখানা নাকি এই যুবকটির কাছেই জিম্মা রেখে শের গুল ঘুমোতে গেছে। আর কোনও ভয় নেই।

গাড়ী ছেড়ে চললো উত্তর পর্বতের চড়াই পথে। দেখতে দেখতে মধুর

রৌদ্রের দিকে উঠে এলুম। আমরা চলেছি বানিহাল গিরিসঙ্কটের দিকে। বাতাস ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ হচ্ছে। বর্ষায় ফল হয়েছে প্রচুর। ফুলশয্যা পাতা রয়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। ধবলাধার গিরিশ্রেণীতে যেমন কথায়-কথায় পাথরের হাড়পাঁজরা বেরিয়ে পড়ে, এখানে তা নয়। শ্রাবণের নূপুর-ঝুমুর শোনা গেলেই মৃৎপিণ্ডের থেকে বেরিয়ে আসে মৌসুমীফুল বর্ষার অভ্যর্থনায়। সমগ্র পীর পাঞ্জালেরই এই প্রকৃতি, এই অকৃপণদাক্ষিণ্য। হাভেলীয়ন, আবটাবাদ, মুজাফরাবাদ, মীরপুর,—যেখানে যাও, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। কোথাও ছায়া পড়েছে প্রাচীন বনস্পতির, কোথাও বা সকরুণ মায়া কাব্যব্যঞ্জনার। প্রতি গুহাগহ্বরে রেখে যাচ্ছি আমার প্রাণের সুর, প্রতি গুল্মলতায় জড়িয়ে যাচ্ছি আমার মর্মের বাঁধন, আমার মায়ার কাঁদন।

দেখতে দেখতে প্রসারিত হচ্ছে জ্যোতির্ময় দিগন্ত। অন্ধকারে নীচের দিকে পড়েছিলুম গত রাত্রে,—যেখানে মানুষের ক্ষুদ্রতার ইতিহাস নিত্য রচিত হচ্ছে। যেখানে চিত্তের বিদ্বেষ পারিপার্শ্বিককে বিষাক্ত করছে ক্ষণে ক্ষণে, স্বভাবের বিকারে, চরিত্রের গ্লানিতে, সংশয় ও ধিক্কারে যেখানে নরক সৃষ্টি হচ্ছে কথায় কথায়। কিন্তু এখানে পূর্ব দিগন্তের বহ্নিদ্বারে উঠে এলে সব তুচ্ছ। এখানে হিমালয়ের হাওয়া ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করছে মুহুর্মুহু। যত উঁচু তত বিস্তার ততই প্রসার। ক্ষতি নেই, যদি এখান থেকে ডাক দাও আরও বৃহত্তর দৈবজীবনকে হাত বাড়িয়ে যদি সমস্ত আকাশকে আলিঙ্গন করো, সমগ্র ক্ষুধার্ত প্রাণ যদি ডানা মেলে উড়ে যায় পীর পাঞ্জালের উপর দিয়ে হিমালয় ছাড়িয়ে কোথাও উধাও হয়ে। থামা চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে। যেমন আকাশপথে রাজহংসরা পাখা মেলে চলে যায় নিরুদ্দেশ লোকে, যেমন পরস্পর তারা কথা কয়, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

চড়াই উঠছে মোটর বাস, -প্রচণ্ড হাঁসফাঁস শব্দ হচ্ছে। অল্পোর মুণ্ডার দেওয়াল বেয়ে উঠছে,—সুদীর্ঘ জিগজ্যাগ পথ একবার পূবে এবং একবার পশ্চিমে প্রসারিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আজ ভয় নেই গতরাত্রির মতো। যা কিছু প্রচ্ছন্ন ছিল রাত্রের অন্ধকারে,—এখন সমস্তটা আলোকিত। কাল দেখেছিলুম মৃত্যুকে, আজ মৃত্যুর অতীতকে। মুখ ফিরিয়ে দেখছি অনেক দূরে রয়ে গেল বানিহাল গ্রাম, তারও চেয়ে অনেক দূরে সমতল ভারত প্রায় দশ হাজার ফুট নীচে। ক্রমে আমাদের গাড়ী এসে পৌঁছলো পর্বতচূড়ার কাছাকাছি স্বল্পপ্রসার একটি মালভূমিতে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা গেল সশস্ত্র সামরিক প্রহরী বানিহাল গিরিগহ্বরের প্রবেশ পথে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ করছে।

কাশ্মীর ও জম্মুর মধ্যে বর্তমানে এই একমাত্র সুড়ঙ্গপথ—অন্য পথ নেই। এটি আগে কাশ্মীরের মহারাজার নিজস্ব পথ ছিল। শীতের কয়েকমাস এই গহ্বর পথের এপার ওপার কঠিন বরফে আচ্ছন্ন থাকে, সেজন্য সম্প্রতি নীচের দিকে আরেকটি পথ নির্মাণের চেষ্টা চলছে। কাজ সমাপ্ত হ'লে কাশ্মীর অনেকটা সুগম হবে। আমাদের গাড়ী কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। অতঃপর একটি মিলিটারী গাড়ীর কনভয় পেরিয়ে যাবার পর আমাদের বাস ঢুকলো সেই অন্ধকার গহ্বরলোকে। দীর্ঘপথ সত্যই অন্ধকার ঘুটঘুটি। পিছনে জম্মু, সামনে কাশ্মীর।

ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় মিনিট তিনেক সত্যি বলবো, ঠিক এ প্রকার ধারণা আমার আগে ছিল না। অন্ধকার থেকে আলোয় আসামাত্র কাশ্মীরের দৃশ্য যে অবাক বিস্ময়ের ধাক্কা দেয়, সেটি বিচিত্র। কিছুক্ষণের জন্য যেন চেতনা লোপ পায়। সৌরবিশ্বলোকের কোনও বাতায়ন থেকে যদি সৃষ্টিকর্তা আপন আশ্চর্য সৃষ্টির দিকে নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে অভিভূত হন, তবে এটি সেই একমাত্র বাতায়ন। বায়ুস্তরের মধ্যে সূর্যরশ্মির যে কাঁপন উত্তর মেরুতে অরোরার আলিম্পনার সৃষ্টি করে, দুই চোখ মেলে তা বিশ্বাস করে যাচ্ছি। চতুর্দিকে শত শত শত মাইল পরিব্যাপ্ত চিরতুষারময় হিমালয়, তাদেরই কোলে কোলে ভাসছে মেঘের দল চিত্ররথের মতো। উপর থেকে দেখছি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে তারা, এবং তাদের ভিতরে-ভিতরে পলকে পলকে রামধনু তরঙ্গায়িত হচ্ছে নানা বর্ণে বায়ুলোকে পরিব্যাপ্ত সূর্যরশ্মি এই বিচিত্র ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করছে মুহুর্মুহু, ফলে দৃষ্টি আমাদের বিভ্রান্ত হচ্ছে পলকে পলকে। প্রায় দশ হাজার ফুট উপরে আছি ব'লেই এই দৃষ্টিবিভ্রম এবং এই অনির্বচনীয় বিস্ময়। সমতলে নেমে গেলেই দৃষ্টি স্বচ্ছ। পৃথিবীকে আমরা দেখছি একই চেহারায় লক্ষ লক্ষ বছর থেকে, বিপরীত দিক থেকে একে কখনও দেখিনি। কিন্তু ভিন্ন গ্রহের উপরে দাঁড়িয়ে যদি দেখতুম পরিচিত পৃথিবীকে, তবে, দৃশ্য-বৈচিত্র্য আবিষ্কার করতুম। পাশের বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে নিজের বাড়ীটি দেখলে বৈচিত্র্যবোধের আস্বাদ লাগে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বানিহালের এই সুড়ঙ্গলোক দিয়ে যদি কাশ্মীরে প্রবেশ করতেন, তাঁর হাত থেকে আমরা একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা লাভ করতুম। তিনি রাওয়ালপিণ্ডির পথ পেরিয়ে 'ঝিলমভ্যালি রোড' দিয়ে শ্রীনগরে গিয়েছিলেন।

মিনিট দুই হতচেতন হয়ে ছিলুম। ওইখানে নেমে একবার দেখে নিলুম দেবতাত্মার শীর্ষলোক। শ্বেতচূড়া একটির পর একটি পশ্চিম, উত্তর ও পূবে প্রসারিত। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অস্পষ্ট হিন্দুকুশ আর কারাকোরামের প্রত্যন্ত শীর্ষ, গিলগিটের পারে হুমানি, দেখতে পাচ্ছি নাঙ্গার তুষারশীর্ষ,

কোলের কাছে দেখছি হরমুখ, সোনামার্গ আর জোজিলা, বাল্‌তিস্তানের পূর্বলোকে গাসেরব্রুম আর মাসেরব্রুম, তা'র দক্ষিণে দেবশাহি, লাদাখ আর জাসকার গিরিশৃঙ্গমালার অন্তহীন তরঙ্গলোক।

গাড়ী এবার নামতে লাগলো আবার মুণ্ডার পথ বেয়ে। কিন্তু ওই যে দু'মিনিটের একটি বিন্দুর উপরে দাঁড়িয়ে অনাদি অনন্তকাল মূর্ছাহত হয়েছিল, ওটা যেন ভূতের মতো পেয়ে রইলো। শুধু আমার কাছে নয়, প্রত্যেক পর্যটকের কাছেই চিরকালের কাশ্মীর ওই দু'মিনিটের মধ্যে নির্ভুল সত্য হয়ে থাকে দেখতে দেখতে গাড়ী নেমে যেতে লাগলো নীচের দিকে। অনেক দূর নীচে সেই পৃথিবী প্রসিদ্ধ 'পপলার এভেন্যু' পথটি ছবির মতো চোখে পড়ে সমগ্র বিরাট উপত্যকা নীলাভ সবুজ, এবং বর্ষার শেষ প্রান্তে এসে সজল শ্যামল শোভায় ঝলমল করছে। বুঝতে পারা যায় কাশ্মীর কেন এত লোভের বস্তু, কেন এই মানহারা সবহারা অনাথিনীর সর্বাঙ্গে হাজার দু'হাজার বছর ধ'রে বিভিন্ন বর্বরের দল তাদের হিংস্র দাঁতের দাগ ও নখের আঁচড় রেখে গেছে।

উপর থেকে নেমে সমতল পথে গাড়ী চললো। চব্বিশ ঘণ্টার পর সমতল দেখলুম। আরও কুড়ি মাইল ওই পপলার শ্রেণীর মধ্যপথ ধ'রে এসে কাজিকুণ্ডে পৌঁছে বাস থামল। এখানে প্রাতরাশ সেরে নিতে হবে। কাজিকুণ্ড থেকে শ্রীনগর যতদূর মনে পড়ছে আন্দাজ চল্লিশ মাইল পথ।

এই পথ খানাবলে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়। একটি যায় উত্তরপূর্বে পহলগাঁওর দিকে,— অন্যটি উত্তরে অবন্তীপুরা হয়ে সোজা চ'লে যায় শ্রীনগরের দিকে ছোট ছোট পাহাড় এক পাশে, কিন্তু একদিকে অনন্ত ধানক্ষেত এবং আখের চাষ। সব্জি ও শস্যের বাগান এখানে ওখানে। গ্রামের বাড়ীগুলি ছবির মতো, প্রত্যেকটিতে শিল্পীমন কাজ করেছে। এ ধরনের ঘরদোর সমতল ভারতে দেখিনে। সস্তার বিভিন্ন নামের ফল পথেঘাটে দোকানে প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। এটা ভাদ্রের প্রথম, বাজারে আপেল আসছে অল্পস্বল্প। টসটসে আঙুরের গোছা নিংড়ে খাচ্ছে কাশ্মীরী মেয়ে। কালো চোখের প্রসন্ন চাহনির দ্বারা বিদেশীকে ওরা অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু ওরা কি জানে, অজানা বিদেশীর পৈশাচিক বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতে ওদের মাটির ঘরের গৃহস্থালী যুগে যুগে মাটি হয়েছে? এতকাল ধ'রে মার খেয়েও কাশ্মীরীদের স্বভাব-কোমলতা নষ্ট হয়নি, এটা ওদের পক্ষে গৌরবের কথা—এ আমি মনে করিনে।

বিতস্তার গৈরিক-রক্তিম আঁকা-বাঁকা স্রোত চলেছে পাশে পাশে। আশ্চর্য,

এত বড় পার্বত্য উপত্যকার পাথরের জটলা কোথাও দেখছিনে। চারিদিক মৃন্ময় আর কোমল। প্রথম দেখলুম 'চেনার' আর 'উইলো' গাছ। চেনারের বৃহৎ বৃক্ষ ছায়া ফেলেছে মসৃণ সুন্দর পথে। পাহাড়ে পাহাড়ে মেষ-ছাগল ও গরুর পাল চরছে। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি কাশ্মীরী পণ্ডিত আর পণ্ডিতানিকে।

গাড়ী ছুটেছে। ছুটেছে দূর থেকে দূরান্তরে মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ। এক সময় প্রখর রৌদ্রের ভিতর দিয়ে আমাদের মোটর বাস এসে পৌঁছলো আধুনিক শ্রীনগর শহরের এক মোটর স্ট্যাণ্ডে। সেখানে টাঙ্গাওয়ালাদের ভীড় জমেছে।

প্রায় আধমাইল দূরে কাশ্মীর প্যালেস হোটেলে গিয়ে উঠলুম

* *

*

হরমুখ পর্বতের পাদভূভাগে প্রাচীনকালে ছিল দিকচিহ্নহীন সুবিশাল জলাশয়। তার পৌরাণিক নাম হোলো সতীসর। দেবী পার্বতী নেমে আসতেন তুষারচূড়া থেকে, এবং এই জলাশয়ে তরণীবিহার করতেন। তারপরে গিয়েছিল কতকাল হরপার্বতী গেলেন অধিকতর লোভনীয় মানস সরোবরে। ইত্যবসরে জলোদ্ভব নামক জনৈক অসুর এসে অধিকার করলো ওই সতীসাগর। মানুষের উপরে দানবের অনাচার চললো বহুকাল। ওদিকে ব্রহ্মার পৌত্র কশ্যপমুনি এই অনাচারের প্রতিকারের জন্য হাজার বছর ধরে তপশ্চর্যা করছিলেন। সেই তপস্যায় খুশী হয়ে দেবী তাঁর নিকট এক পাখীকে পাঠিয়ে দেন। পাখীর ঠোঁটে ছিল একটি পাথরের টুকরো। ওই পাথরের টুকরোটি জলোদ্ভব-অসুরের শিরে ফেলা হয়, এবং ক্রমে সেই পাথর বৃহদাকার ধারণ করে। এর ফলে জলোদ্ভব সতীসাগরের নীচে সমাধিস্থ হয়, এবং বর্তমান হরিপর্বত দাঁড়িয়ে ওঠে। সতীসাগরের জল চ'লে যায় বরাহমূলের দিকে, মৃন্ময়ভূমি দেখা দেয় চতুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত অধিত্যকায়, এবং পরবর্তীকালে এই ভূভাগের নাম হয় 'কশ্যপ-মীর।'

ঠিক এমনি উপকথা শুনে এসেছি নেপালে কাঠমাণ্ডুতে। মঞ্জুশ্রীদেবের খড়্গাঘাতে বাগমতীর সৃষ্টি হয়। নেপাল উপত্যকার জন্ম তখন থেকে। ওদের পূজ্য মঞ্জুশ্রীদেব।

এই সমস্ত উপকথার পিছনে একটি সত্য আজও বিজ্ঞানীদের চোখে স্পষ্ট হয়ে আছে, কাশ্মীরের 'সুখী উপত্যকা' এককালে 'অনবতপ্তা' মানসের পদ্ম-সরোবরের মতো বিশাল জলাশয় ছিল। আজও এই বৈজ্ঞানিক যুগে পাহাড়ের

উপরে বহু অঞ্চলে সেকালের সেই সাগর-উদ্ভূত জীবাণুর নানাবিধ প্রাণময় কোষ আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। ভূতাত্ত্বিকরা চমৎকৃত।

খৃষ্টপূর্ব দুহাজার বছর আগে কোনও নির্দিষ্ট রাজশক্তির খবর পাওয়া না গেলেও রাজা দয়াকরণ ও রাজা রামদেবের কথা শোনা যায়। অতঃপর ঐতিহাসিক কালে আসেন রাজা প্রবর সেন এবং রাজধানীর নাম হয় প্রবরপুর। এইটিই বর্তমান শ্রীনগর। খৃষ্টপূর্ব আড়াই শো বছর আগে সম্রাট অশোক এসে বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রধর্মে রূপান্তরিত করেন। এই রাজভিক্ষুর মহৎ আদর্শকে বরণ ক'রে সনাতনীরাও বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। এর পরে আসেন রাজা জলক এবং তিনি পর্বতশীর্ষে একটি প্রস্তরমন্দির নির্মাণ করেন, সেটি আজও দাঁড়িয়ে,—কিন্তু তা'র নাম শঙ্করাচার্য। এই সময় তাতার দস্যুর দল কাশ্মীর আক্রমণ করে। ক্রমে সম্রাট কণিষ্ক এসে দাঁড়ান, এবং তাঁর রাজত্বকালে দস্যুদল বিতাড়িত হয়। কণিষ্কের কালেই কাশ্মীরের বৌদ্ধমঠে বৌদ্ধধর্মের কোনও একটি মহাসম্মেলনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান ঘটে। পরবর্তী শত শত বৎসর অবধি কাশ্মীর ছিল বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে শ্বেত হুনরা আক্রমণ করে এই ভূস্বর্গ, বীভৎস অনাচারের দ্বারা কাশ্মীরকে তারা শ্মশানে পরিণত করে। এই আক্রমণকারীদের মধ্যে প্রধান হলেন বৌদ্ধবিরোধী মিহিরগুল। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং কাশ্মীরের এই সর্বনাশ দেখে যান—মিহিরগুলের হাতে তখন বৌদ্ধবিহারগুলি প্রায় সবই একে একে ধ্বংস হয়েছে। বৌদ্ধভিক্ষুরা পলায়ন করেন তিব্বতের দিকে, সেখানে নির্মাণ করেন বহু বৌদ্ধমঠ। শ্রীনগর থেকে কয়েক মাইল দূর হরবনের প্রান্তে আজও সেকালের ভূপ্রোথিত বৌদ্ধবিহারগুলির উদ্ধার কায চলছে।

এর পর কাশ্মীরে হিন্দুরাজত্ব আরম্ভ। কবি কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী' বলছে, নৃপতিশ্রেষ্ঠ ললিতাদিত্য এলেন, এলেন অবন্তীবর্মণ, এলেন একে একে হিন্দু নরপতি। সমগ্র কাশ্মীরে অদ্যাবধি বৌদ্ধ ও হিন্দু ভিন্ন অপর কোনও জাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা ও স্থাপত্য-কীর্তি নেই। রাজা ললিতাদিত্য আজও কাশ্মীরে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। সম্রাট অশোক, এবং কণিষ্কের পরেই তাঁর আসন নির্দিষ্ট। এই উপত্যকায় তাঁর বিপুল কীর্তি সর্বজনস্বীকৃত। মার্তণ্ড জনপদে তাঁর মন্দির এবং কাশ্মীরভূভাগব্যাপী তাঁর স্থাপত্যকীর্তি আজও তাঁর চরিত্রমহিমার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাঁর জন্য অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ ছিল স্বর্ণোজ্জ্বল গৌরবের যুগ।

রাজা ললিতাদিত্য সমগ্র উত্তর ভারতখণ্ডে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ক'রে ক্ষান্ত হননি। বিস্ময়ের কথা এই, তুরস্কের ইতিহাসে পাওয়া যায়, ললিতাদিত্য তুরস্ক এবং মধ্য এশিয়ার একটি প্রধান অংশ আপন শৌর্যবলে জয় করেছিলেন।

সমগ্র মধ্যএশিয়ার অ সভ্য জাতিগণের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন হিন্দু ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতির কালজয়ী মহিমা। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক আল্‌বেরুনী বলেন, দিগ্বিজয়ী সম্রাট ললিতাদিত্যের আমলে তাঁর দিগ্বিজয়-মহিমা এতদূর গৌরবময় হ'তে পেরেছিল যে, প্রতি বৎসর কাশ্মীর জুড়ে মস্ত এক উৎসবের সাড়া প'ড়ে যেতো।

হিন্দুরাজত্বের চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে পার্বত্য উপজাতি দাম্‌ড়া ও তান্ত্রিয়রা কাশ্মীরের কল্যাণ-যজ্ঞ নষ্ট করতে চেয়েছে বারম্বার। অগ্নিসংযোগ, লুট, নরহত্যা, নারীহরণ—এই ছিল তাদের পেশা। কবি কহ্লন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এসব বর্ণনা করেছেন। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। 'রাজ-তরঙ্গিণী'তে তিনি বলেছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী হিন্দু রাজত্বের কালে কাশ্মীর ভারতের শ্রেষ্ঠ ভূভাগে পরিণত হয়। সাহিত্যে, কাব্যে, জ্যোতিঃশাস্ত্রে, ভগবৎদর্শনে এবং শৈব বেদান্ত সংস্কৃতিতে কাশ্মীর ছিল অদ্বিতীয়। জনসাধারণ সমগ্রভাবে ধর্ম ও মনুষ্যত্ববাদে শীর্ষস্থানীয় হয়ে ওঠে।

চতুর্দশ শতাব্দীর তাতার যোদ্ধা জুল্‌ফি কাদির খাঁন আসেন কাশ্মীরে। ভয়ানাম ভয়ম্ ভীষণম্ ভীষণানাম। তাঁর এক হাতে শানিত তরবারি, অন্য হাতে অগ্নিসংযোগের উপকরণ। তাঁর দানবিক লীলায় কাশ্মীর অগ্নিসিদ্ধ হয়। যাবার সময় তিনি পঞ্চাশ হাজার ব্রাহ্মণ নরনারীকে ক্রীতদাস স্বরূপ নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর সেই রক্তরাঙা পথে আসে প্রচণ্ড তুষার-ঝটিকা, তিনি নিজে তাঁর উপজাতীয় দস্যুদলসহ এবং ওই নিরীহ পঞ্চাশ হাজার নরনারী সমেত তুষার সমাধি লাভ করেন। আজও তাদের কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যায় হুন্‌জা পর্বতের প্রান্তে আর কোহিস্তানে, হিন্দুরাজ পর্বতমালার পাশে পাশে আর পামীরের মালভূমির তলায়-তলায়। সেকালে কাশ্মীরে ছিল জ্ঞান আর বিদ্যা, কাব্য আর সংস্কৃতি,—কিন্তু না ছিল ক্ষাত্রশক্তি, না ছিল রাজশৌর্য। তবে কাশ্মীরের ইতিহাসে অনাচার ওখানেই শেষ হয়নি। দেখতে দেখতেই আবার এলেন গজনীর মহম্মদ, এলো আবার তাতার যোদ্ধার দল। এই প্রকার পাঠান আক্রমণের যুগে সেই কালে কাশ্মীরে রাজত্ব করেছেন একাধিক হিন্দুসম্রাজ্ঞী,—তাতার ও পাঠানদের সঙ্গে বহুবার তাঁরা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চেয়েছেন। ওঁদের মধ্যে একজন রাণী অনেককাল কাশ্মীরে রাজত্ব করেছেন,—যখন তাঁর স্বামী প্রাণভয়ে পলায়ন করেন রাজ্য ছেড়ে। তিনি জনৈক পাঠানকে নিযোগ করেছিলেন তাঁর অন্যতম মন্ত্রীপদে। কিন্তু সেই মন্ত্রী শা মির্জা কৌশল-চক্রান্তের দ্বারা সিংহাসন দখল করে এবং রাজরাণীকে

পত্নীরূপে লাভ করার জন্য হাত বাড়ায়। বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা রাণী আত্মনাশের দ্বারা মুক্তি লাভ করেন।

আবার একশো বছর ধ'রে পাঠান সুলতানদের হাতে কাশ্মীর উৎপীড়িত হতে থাকে। দেব-দেবীর মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চলে, স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মন্দিরগুলিকে ভেঙ্গে ফেলা হয়। মার্তণ্ড, পাণ্ড্রেথান, গণেশবল, ব্রজবিহার প্রভৃতি জনপদ একে একে ধ্বংসস্তূপে ভ'রে যায়। সুলতান শিকান্দারের বীভৎসতা কাশ্মীরের পথে পথে আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাতার আর পাঠানের কলঙ্ককাহিনীতে কাশ্মীর ভরা।

কিন্তু এক সময় ওই দৈত্যকুলের ভিতর থেকে প্রহ্লাদ এসে দাঁড়ালেন। তিনি বাদশাহ জয়নুল আবেদিন। তিনি ছিলেন কাশ্মীরীদের অকৃত্রিম সুহৃদ। তিনি মন্দির মেরামত করলেন, খাল কেটে বন্যার তাড়না থেকে কাশ্মীরকে বাঁচালেন। কাগজ, রেশম, শাল—এদের কারখানা বসালেন। ফলের বাগান সৃষ্টি করলেন। কাশ্মীরীদের তিনি কোলে তুলে নিলেন। আজও অনেক অঞ্চলে জয়নুল আবেদিনকে নিয়ে লোকসঙ্গীত প্রচলিত, আজও শ্রীনগরে 'জয়না-কদলে' তাঁর ওই সমাধিস্তম্ভটি রাষ্ট্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের দ্বারা সযত্নে রক্ষিত আছে।

কিন্তু পাঠান ও তাতারের বহুশতাব্দীব্যাপী ধর্ষণকালের তুলনায় জয়নুল আবেদিনের রাজত্বকাল আর কতটুকু? দার্দ দেশ থেকে এলো গাজি খাঁন, এবং তার পরে পরে পাঁচসাতজন দস্যু নরপতি। আঘাতে আর অপমানে কাশ্মীরীদের পিঠ আবার কুঁজ হয়ে গেল। মনুষ্যত্বের শেষ দশায় এসে তা'রা দাঁড়ালো। কেঁদে কেঁদে অসাড় হয়ে এলো কাশ্মীর।

অবশেষে সম্রাট আকবরের হিন্দু সেনাপতিরা কাশ্মীরে তাঁদের জয়পতাকা তুললেন। 'সুখী উপত্যকায়' বহুকাল পরে শুভসুযোগ এলো। জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার উঠে দাঁড়ালো। আকবর পুনরায় হরিপর্বতের প্রাচীন দুর্গটির সংস্কার সাধন করলেন। প্রাকার তুলে দিলেন চারদিকে। তাঁর পুত্র সেলিম ওরফে জাহাঙ্গীর পুষ্পোদ্যান বানাতে বসলেন ভেরিনাগে, নাসিমে, শালিমারে, নিশাতে। চেনারের চারা এনে পুঁতলেন সর্বত্র। নূরজাহান বানালেন 'পাঁথর মসজিদ'। জাহাঙ্গীর-পুত্র শাহজাহানও পিতার অনুসরণ করেছিলেন। অতঃপর আওরঙ্গজেবের আমলে আবার কাশ্মীরে উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। পণ্ডিতদের উপর নানাবিধ নির্যাতন চলে, জিজিয়া কর দিতে তা'রা বাধ্য হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন মোগল দরবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, সেইকালে মোগলরাজের প্রতিনিধিগণের স্বেচ্ছাচার,

অনাচার ও উৎপীড়ন কাশ্মীরে দানবীয় আকার ধারণ করে। এমন সুযোগ ছাড়বে কেন আফগানীরা? অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এলো তাদের পাশবিক আক্রমণ। আহমদ শা দুরানি জয় করলেন কাশ্মীর। পরবর্তী ষাট বৎসরকাল অবধি সর্বব্যাপী ধ্বংস ও নারীর সতীত্বনাশ ক'রে চললো তা'রা। ওটা ওদের গৌরব, ওটাই ওদের ইতিহাস। ওদের পাশবিক অত্যাচার কোনও জাতিভেদ মানেনি, কিন্তু হিন্দুদের ধর্মনাশ করাই হোলো ওদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। হাজারে হাজারে কাতারে-কাতারে কাশ্মীরী নরনারীকে ধর্মান্তরিত করা হোলো; যারা রাজি হ'তে চাইল না তাদের আগুনে পোড়ানো, জীবন্ত সমাধি দেওয়া, শূলে চড়ানো, বন্যজন্তুর খাঁচায় ফেলা, অথবা জীবন্ত দেহকে চটের থলেতে মুড়ে দাল হ্রদে ডুবিয়ে হত্যা,—এই সব চললো।

দাল-হ্রদের এক কোণের একটি নামকরণ করা আছে, 'বাট-মাজার',—অর্থাৎ হিন্দুসমাধি। এমনি করেই কাশ্মীরে অহিন্দুর সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে এই হাজার হাজার 'হিন্দু' যখন লক্ষে লক্ষে পরিণত হোলো, সেই সময় তারা দলবলে ফিরে আসতে চাইল তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মে,—কিন্তু অনেক দেরি করেছিল তা'রা,—বারাণসীর সনাতনপন্থী হিন্দুরা তাদের আবেদন মঞ্জুর করলো না।

ইতিহাস নয়, কাশ্মীরের বুকের যে যন্ত্রণা এ তারই কাহিনী। কিন্তু এইখানেই শেষ হয়নি। আফগানী জব্বর খানের অত্যাচারে অস্থির হয়ে পণ্ডিত বীরবল ধর লাহোর থেকে ডেকে আনলেন রণজিৎ সিংহের সেনাপতি রাজা গুলাব সিংকে। তিনি পীর পাঞ্জাল পেরিয়ে এসে জব্বর খানকে বিতাড়িত করলেন। উনিশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক। জনৈক ইংরেজ ভ্রমণ করছিলেন কাশ্মীরে। তিনি বললেন, শিখরা আফগানীদের চেয়ে কম স্বেচ্ছাচারী নয়। হতভাগ্য দুর্ভিক্ষ কাশ্মীরীরা যোগাতে পারলো না রাজস্ব সুতরাং তারা নিশ্চিহ্ন হতে লাগলো। দেশে ভূমিকম্প, কলেরা, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন—কথায় কথায়। বিচার নেই, অন্যায়ের প্রতিকার নেই, হত্যার শাস্তি নেই, অন্ন-বস্ত্র কোথাও কিছু নেই,—চারিদিকে হাহাকার।

এমন সময় রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যু হোলো। শিখরা পরাজিত হোলো ইংরেজের হাতে। রাজা গুলাব সিংয়ের হাতে এলো কাশ্মীরের শাসনভার। হৃদয় তাঁর কঠিন বটে, কিন্তু শানিত যুক্তি এবং প্রখর ন্যায়বুদ্ধির গুণে কাশ্মীরে তিনি সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করলেন। গুলাব সিংয়ের পৌত্র প্রতাপ সিং অপুত্রক ছিলেন, সেই কারণে তাঁর ভাগিনেয় হরিসিং মহারাজা হন। হরিসিংয়ের পুত্র হলেন যুবরাজ করণ সিং।

দেখতে দেখতে দালহ্রদের তীরে সন্ধ্যা নেমে এলো। আলো জলেছে হাউস বোটে আর নেহেরু পার্কের তাঁবুর মধ্যে। ফিরে চললুম শহরের দিকে।

শ্রীনগর দুই পারে বিভক্ত,—মাঝখান দিয়ে বিতস্তা নদী প্রবাহিত। সাতটি সাঁকোর দ্বারা নগরের দুই পার সংযুক্ত। বিতস্তাকে দেখলে কালীঘাটের আদিগঙ্গাকে হঠাৎ মনে পড়ে। নৌকা, শিকারা ও হাউসবোটের ভীড় পদে পদে। আমি ছিলুম শহরের প্রায় নাভিকেন্দ্রে, জনতার কোলাহলে—ওটায় আমার প্রয়োজন ছিল। হাট-বাজারের ভীড়ের মধ্যে, নোংরা বস্তির আনাচে কানাচে, টাঙ্গা ও ঘোড়াওয়ালাদের আড্ডায়, ফলওয়ালা ফেরিওয়ালাদের পাড়ায় পাড়ায়,—আমার কৌতূহলের সীমা নেই। হরিসিং হাই ষ্ট্রীটের পাশে রাধা কিষণের মন্দির, পঞ্চমুখী হনুমানজী আর মহারানীর রামজী মন্দির—এরা রয়েছে নগরের কোলাহলমুখর পল্লীতে। বিতস্তার তীরে রাজা গুলাবসিংয়ের প্রাসাদের মধ্যে পাওয়া গেল গদাধরের মন্দির। এই প্রাসাদের একটি অংশে বসেছে আজ সরকারী দপ্তরখানা। প্রাসাদের পশ্চিমে হোলো গান্ধীময়দান। একদা মহাত্মাজী এখানে দাঁড়িয়ে কাশ্মীরবাসীকে সম্ভাষণ করেছিলেন। সেটি ভারতের স্বাধীনতা-লাভের প্রাক্কাল। এই প্রাসাদের তল বেয়ে চলেছে আপন মনে বিতস্তা। ওপারে দূরে হরিপর্বতের দুর্গ চোখে পড়ে।

শঙ্খঘণ্টারবে নদীতীর মুখর, সূর্যপ্রণাম করছে কাশ্মীরীপণ্ডিতের মেয়েরা। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করছে। নামহারা অজানা মন্দির অসংখ্য। কপালে চন্দন-তিলক, মাথায় লাল অথবা সাদা পাগড়ী, বর্ণ গৌর—এরা পণ্ডিত। সরকারী দপ্তরে, ডাকঘরে, টেলিফোনে, ব্যাঙ্কে, কাজকারবারে,—যেখানে যাও, সেইখানেই পণ্ডিত। মুসলমান মানেই শ্রমিক জগৎ। কোনও মুসলমানের দাড়ি নেই, নমাজ পড়ে না অধিকাংশ। গরু কাটে না কেউ কাশ্মীরে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের গন্ধও নেই কোথাও। হিন্দুপরিবারে অবাধে চাকরী করে মুসলমান, শিখহোটেলে নির্বিবাদে রাঁধে মুসলমান,—জাতিভেদ একটুও নেই। উভয় সম্প্রদায়ের একই সঙ্গে আহারবিহার, চালাও বাস করছে উভয়ে একত্র। চট করে মনে হতে পারে এটি আজব দেশ,—ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে। হিন্দু পণ্ডিত আর আর্যমুসলমান বাস করছে কাশ্মীরের ঘরে ঘরে।

ফিরছিলুম পথে পথে। শের ই-কাশ্মীর পার্কের আনাচে কানাচে, কিংবা বিতস্তার ধারে ধারে, ময়দানের আশে পাশে, ছায়ানিবিড় বাগানবাড়ীর পাড়ায় পাড়ায়। মনে অস্বস্তি ছিল দু'কারণে। পাকিস্তানের সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী কখন্ এসে পৌঁছয়, কখন বা শ্রীনগরে রক্তারক্তি আরম্ভ হয়।

ধারণাটা আমার ভুল। আমার আসবার কয়েকদিন আগে খালসা হোটেলের কাছে দুচারটি দোকানের সামনে একদিন একটু হল্লা হয়, দু'একটি লোক বুঝি পুলিশের গুলিতে মারা যায়, তার পরে সব শান্ত। যেমন চলছে তেমনি। পীরপাঞ্জালের চূড়া চেয়ে রয়েছে কাশ্মীরের দিকে, চেয়ে রয়েছে হরমুখের চূড়া শাশ্বতকাল থেকে,—নীচের দিকে ইতিহাস পালটে যাচ্ছে কথায়-কথায়। দরিদ্র কাশ্মীর, ভাগ্যহত কাশ্মীর,—আছে তার ঘরে বিদুরের খুদ, আছে সুশীতল জল। কিন্তু না আছে সোনা, না কয়লা, না তেল, না লৌহধাতু। সমগ্র জগৎ এসে কাশ্মীরে মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে যায়, রূপে আর গুণে সে লোভের বস্তু। পাঠান, তাতার, হুন, মোগল, এরা এসে পাত পেতে খেয়ে গেছে, যাবার সময় হতভাগ্যদের ঘরকন্না ভেঙ্গে দিয়ে মেয়ে লুট করে নিয়ে গেছে। সতীত্বনাশ আর ধর্মনাশ,- -এই হোল কাশ্মীরের মধ্যযুগের ইতিহাস। মেরুদণ্ডভাঙ্গা নিরুপায় দুর্বলের ঘরের দরজায় এসে দাড়িয়েছে বর্বর যুগে-যুগে। স্বভাবের কোমলতা তারা বোঝেনি, বোঝেনি ন্যায় ও নীতির মর্ম, বোঝেনি জ্ঞান বিদ্যা'স্মৃতির মহিমা, -কিচ্ছু বোঝেনি। চেয়ে-চেয়ে দেখছি সমস্ত মাঠের তৃণশয্যায় ফুল ফুটে রয়েছে বর্ণবাহার কার্পেটের মতো। নদীর তীরভূমি, পাহাড়ের গা, সরোবরের কোল,—সর্বত্র ফুল। পরিত্যক্ত জঞ্জালের স্তূপ, নালা নর্দমার ধার, বাসষ্ট্যাণ্ডগুলির ময়লা উঠোন, মাছি-ভনভনে দোকানের নোংরা জলের পাশ, ওদের মধ্যেই অজস্র অনামা ফুল। ফুটবলের মাঠে ফুল মাড়িয়ে ছেলেরা খেলা করে, মেষ ছাগল গরুরা ফুল মাড়িয়ে ওঠে পাহাড়ের গায়ে, ফুল মাড়িয়ে তীর্থযাত্রীরা অতি কষ্ট করে অমরনাথের দিকে দুর্গম পাহাড়. কাটাধানের মাঠ ফুলে ভরে যায় কথায় কথায়। তুলতুলে কাশ্মীরের মাটির তলা থেকে হাওয়ায়-হাওয়ায় ফুলের রাশি ওঠে দাঁড়িয়ে। এত ফুল ফুটলো ব'লেই নরম হয়ে রইলো কাশ্মীরী মেয়ে, -আঙ্গুরের গোছায় আর আপেলের শাঁসে রস এত নিবিড় হোলো বলেই তারা মদালসা হয়ে রয়ে গেল। এ ভালো নয়। খুশী হতুম, যদি দেখতে পেতুম কাশ্মীরে কাঁটালতার ভীড়, যদি দেখতুম প্রাচ্যের এই নন্দনকাননে পাওয়া যায় বিষাক্ত সর্প, যদি জানতুম অরণ্যে অরণ্যে দেখা যায় হিংস্র শ্বাপদ। আমরা বাঙ্গালী, কবিতার দেশে আমাদের জন্ম। গান গেয়ে গেয়ে আমরা ভাষা সৃষ্টি করেছি। কালো মেয়েকে আমরা বলি কৃষ্ণা, কালো পাথরকে বলি শালগ্রাম। আঙ্গুল টিপলে জল ওঠে বাঙ্গালীর চোখে, জ্যোৎস্না দেখলে আমরা যাই ফুলবাগানে, নদীর কল্লোলের সঙ্গে আমরা ধরি মাঝির গান। বাঙ্গালী ভালোবাসা জানে, কিন্তু অপমানের বিরুদ্ধে খড়গাঘাত করতেও সে জানে। অকল্যাণ ঘনিয়ে এলে সংহারমূর্তি

ধরে বাঙালী। রাষ্ট্রে অধর্ম দেখা দিলে বাঙ্গালী হিংস্র হয়ে ওঠে; উৎপীড়নে জর্জরিত হতে থাকলে বাঙ্গালী অপেক্ষা প্রতিশোধপরায়ণ জাতি আর কেউ নেই। ডান হাতে তরবারি ধরে বাঙ্গালী গীতাপাঠ করে।

সৌন্দর্যের সঙ্গে স্বভাবের দৃঢ়তা থাকলে কাশ্মীরকে মানিয়ে যেতো। কাশ্মীরে পাথর নেই তাই কাঠিন্যও নেই। ওদের ওই লাবণ্যলতাকে নিষ্পেষণ করলে রক্ত ঝরে না, আঙ্গুরের রস গড়িয়ে পড়ে। চাহনিতে ভদ্রতা, আচরণে নম্রতা, চলনে ভব্যতা। জাতিভেদ আছে, কিন্তু অস্পৃশ্যতা নেই, রুচিভেদ আছে, কিন্তু তার প্রকাশে রুক্ষতা নেই। ওদের এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক খাদ্য। ওদের রাজনীতির মধ্যে বিরোধীদলের ধ্বংসাত্মক চক্রান্ত নেই,— ওরা সবাই একাকার। যাদের সঙ্গে মতে মিলছে না, তাদের ডেকে আনে ঘরের মধ্যে বিরোধ মেটাবার জন্য। ওদের কোনও উগ্র রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক মতবাদ নেই। ওদের একমাত্র কাম্য হোলো যুগ যুগান্তরের দস্যুতার হাত থেকে কাশ্মীরকে বাঁচিয়ে রাখা। ওরা এবার বাঁচবার নীতি গ্রহণ করেছে।

দেখছি গানাবল, দেখছি অনন্তনাগ আর মার্তণ্ড, দেখছি আইশমোকাম আর গণ্ডারবল,—ভাবের বিরোধ নেই কোথাও। নিরীহ সংসারযাত্রা অনাহত শান্ত। মাঠে-মাঠে চাষ চলেছে ধানের, মন্দিরে শোনা যাচ্ছে ঘণ্টারব, বিতস্তায় স্নান ক'রে যাচ্ছে মেয়েপুরুষ, কলাবাগানের ধারে লাউমাচার পাশে খেলা করছে শিশুরা, বিছানা রোদে দিচ্ছে মেয়েরা। উপর দিকে দিগন্তে দেবতাত্মা হিমালয়ের আদি অন্তহীন অবরোধ। অনন্ত পর্বতমালা গগনের এ প্রান্ত থেকে চ'লে গেছে কোন প্রান্তে,—সে যেন দিশাহারা নিরুদ্দেশ। ওই পর্বতশ্রেণীর অজানা অনামা গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে চিরকাল ধ'রে দানব ও দেবতার আনাগোনা চলেছে। সব চেয়ে প্রাচীন, সব চেয়ে দুঃসাহসিক অভিযান চলে এসেছে ওই হিন্দুকুশের তলায় তলায়। প্রাচীন সভ্যতার বার্তা চলে গিয়েছে এপার থেকে ওপারে। ওরা পেরিয়েছে কৃষ্ণগঙ্গা আর সিন্ধু, পেরিয়ে গেছে টাঙ্গির, কোহিস্তান, হিন্দুরাজ, চিত্রল, পেরিয়ে গেছে অগণ্য পার্বত্য পথ, অতিক্রম ক'রে গিয়েছে দুঃসাধ্য গিরিসঙ্কট একটির পর একটি, সেই সব প্রাণীহীন তরুলতাহীন, জলচিহ্নহীন দুর্গম তুষারকান্তারের ভিতর দিয়ে। অগণিত নামহারা গিরিসঙ্কট আজও রয়ে গেছে মানচিত্রে। চিত্রলের ভিতর দিয়ে দোরান, পঞ্চশির পর্বতমালার ভিতর দিয়ে বলিয়ানপথ,—একটির পর একটি চ'লে গিয়েছে সেই কোথায় আমুদরিয়ার প্রবাহপথ ধ'রে তারমেজ এর দিকে।

তারমেজ! চমকে' উঠেছিলুম। মনে প'ড়ে গেল প্রাচ্যের মানবসভ্যতার তখন প্রথম জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষে। সেদিন স্মরণীয় কালেরও অতীত। আর্যরা জপে বসেছে হিমালয়ে, তাদের সেই বীজমন্ত্রে ভারতসভ্যতার প্রথম উদ্বোধন ঘটছে। কেউ ছিল না তখন পূর্বে আর পশ্চিমে। জন্তুর ছাল জড়িয়ে বেড়াতো মানুষ,—কি মেয়ে, কি পুরুষ, লজ্জা এসে তখনও পৌঁছয়নি তাদের অঙ্গে-অঙ্গে। তার পরে ক্রমে খবর রটে গেল মধ্যপ্রাচ্যের পাড়ায়-পাড়ায়, হিমালয়ের উপবনে আর তপোবনে সামগান মুখরিত হচ্ছে। বেদ রচনার পর বেদব্যাস ব'সে গেছেন বেদবিভক্তিতে। তার পরে দেখতে-দেখতে গেল অনেক কাল। জানিনে কত যুগ যুগান্ত। এমন এক কালে এই হিমালয়ের গহন রহস্যলোক থেকে উঠে এলো এক তরুণ সুকুমার রাজকুমার,--নাম তার শাক্যসিংহ। জীবন কি, মৃত্যু কি, পথ কি, ঈশ্বর কি,—এই প্রশ্ন তাকে সেদিন অস্থির করেছিল বলেই ভারতের ইতিহাস আবার ঘুরে দাঁড়ালো। সেই আড়াই হাজার বছর আগে তখনও জন্মগ্রহণ করেনি দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার, হেলাস, স্লাভ, মোঙ্গল, আরব,—এদের নাম শোনেনি কেউ, গান্ধার তখন ছিল, কিন্তু কণিষ্ক এসে পৌঁছয়নি, তখন অসভ্য জাতিতে ইউরোপ অধ্যুষিত, ইংলণ্ড তখন আদিম সামুদ্রিক জাতির এলাকা, বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ায় জলাজঙ্গলে। তখনকার দিনে এই হিমালয়ের অন্তর্গত কাশ্মীর আর হিন্দুকুশের শাখাপ্রশাখায়, সমগ্র গান্ধার ছাড়িয়ে কশ্যপহ্রদ পেরিয়ে ওই শাক্যসিংহের পৃথিবীবিজয়ী সভ্যতা আপন অপরাজেয় বীর্যবত্তাকে প্রকাশ করেছে সম্রাট অশোকের উদ্যমে।

এই আমুদরিয়ার সীমান্তেই ছিল ভারতসভ্যতার সীমানা। প্রায় আটশো বছর পরে চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ এখানে প্রথম পদার্পণ ক'রে দেখেছিলেন পৃথিবীর বিরাটতম বুদ্ধমূর্তি। এই সকল মহাকীর্তির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্রাট কণিষ্ক—ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের তিনি গৌরব। কণিষ্ক তাঁর রাজত্বকালে সম্রাট অশোকের আদর্শ পালন করেন এবং তিনি সমগ্র গান্ধারে অগণ্য বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। গান্ধার থেকে উত্তর ভারত এবং আর্যাবর্ত অবধি ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। ওই গান্ধারেরই এক বৌদ্ধমঠে হুয়েন সাঙ বাস করেছিলেন বহুদিন। এই হিন্দুকুশ আর আমুদরিয়ার মধ্যবর্তী প্রাচীন ব্যাকট্রিয়ার সভ্যতা এই সেদিনও জাজ্বল্যমান ছিল, কিন্তু মোঙ্গলদের হাতে সেই সভ্যতার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটেছে মাত্র ছয়শো বছর আগে। হুয়েন সাঙ বলেছেন, হুনদের প্রবল ধ্বংসাত্মক আক্রমণ সত্ত্বেও সপ্তম শতাব্দী অবধি ব্যাকট্রিয়ার রাজধানীর প্রান্তে শতাধিক বৌদ্ধগুম্ফায় প্রায় তিন হাজার বৌদ্ধভিক্ষু তখনও ছিলেন।

এই তারমেজ আর আমুদরিয়ার তীরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার। তাদের পরণে ছিল জন্তুর ছাল আর লতাপাতার আবরণ। এই তারমেজ আর আমুদরিয়ার প্রান্ত অবধি ছিল ভারতের রাজনীতিক সীমানা--যার উপরে প্রভুত্ব ছিল সমাট অশোকের। উত্তরে তেমনি ছিল বৃহৎ পামীর,—আলতাই পর্বতমালার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত। ইতিহাসের কাল এসেছে অনেক পরে. কিন্তু কাশ্মীরের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তে হিমালয়ের অন্তর্গত কারাকোরাম ওরফে কৃষ্ণগিরি স্তবকে-স্তবকে,—এবং আলতাই, হিন্দুকুশ, কো-হি-বাবা, কালা পাঞ্জা, হরিরুদ্র, হেলমন্দ, পঞ্চশিব, কপিশ, ত্রিচিমির, সেবক শিবরাগ,—ইত্যাদি অঞ্চল ভারতীয় ভূগোলের অন্তর্গত ছিল চিরকাল। অনেকে নাম বদলেছে, ভাষা ও আচার বদলেছে, জীবনের চল্‌তি নিয়মের ধারাও বদলেছে,—কিন্তু আজও রয়ে গেছে ওদের গুহায়-গুহায় বৌদ্ধ-সংস্কৃতি, পথে প্রান্তরে-উপত্যকায় মঠ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, পাথরে-পাথরে খোদিত অশোক আর কণিষ্কের অনুশাসন লিপি। আজকের আফগানিস্তান সেদিন আগাগোড়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত ছিল, ছিল গান্ধারের অন্তর্গত – যেখানে গ্রীক ও ভারত-সংস্কৃতির সংযোগের ফলে অভিনব শিল্পকলার জন্ম হয়। পরবর্তীকালে যার নাম শুনি, গান্ধারশিল্প। কিন্তু এই স্থাপত্য ও ললিতকলা বৌদ্ধসংস্কৃতি থেকে জন্মলাভ করে। সম্রাট অশোকের সুশাসনকালে বৃহত্তর কাশ্মীর ও গান্ধারে স্বর্ণযুগের ঐশ্বর্য দেখা দিয়েছিল। শ্রীনগর শহরটি প্রথম তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

ফিরে আসি ঐতিহাসিক যুগের কাশ্মীর প্রান্তে। ওই হিন্দুকুশের উপত্যকাপথে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদেছে গান্ধার নরনারী। ঝড় উঠেছে ওখানকার স্নিগ্ধ শ্যামল প্রান্তরে, বালুর আঁধি উঠেছে আমুদরিয়া থেকে হিন্দুকুশ পর্বতমালা পেরিয়ে মধ্যএশিয়ায়। রক্তমাখা তরবারি হাতে নিয়ে মোঙ্গলরাজ চেঙ্গিস খাঁ ছুটে এসেছে ভারতের বহিঃপ্রান্তে। ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে চেঙ্গিস। শত শত কোটি স্বর্ণমুদ্রামূল্যের জড়োয়া জহরৎ, পরমা-সুন্দরী অনন্তযৌবনা কাশ্মীরী উর্বশীর দল জলা বিল উপত্যকাবেষ্টিত শস্যশোভাময় কাশ্মীর ও ভারত,—চঞ্চল হয়ে উঠেছে তাতারসম্রাট চেঙ্গিস। পরণে ব্যাঘ্রচর্ম, কণ্ঠে শোণিত পিপাসা,—মৃত্যুর ঝড় তুলে সে আসছে এগিয়ে।

চেঙ্গিস খাঁ বলেছিল, শুধু চাই জয়ের উল্লাস। পদদলিত শত্রুর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে রক্তপতাকা তুলবো—এই আমার একমাত্র আনন্দ। ধ্বংস করবো, লুট করবো,—আর সেই ভগ্নস্তূপের জটলায় দাঁড়িয়ে কাঁদবে সবাই,—এই মনোহর দৃশ্য দেখতে চাই। আগুনে, রক্তে, লুণ্ঠনে, ধ্বংসে, হত্যায়—আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

সংখ্যাতীত নরবলি দিল চেঙ্গিস। জনশূন্য হয়ে চললো নানা ভূভাগ মধ্য এশিয়ায়। লেলিহান অগ্নিশিখা গ্রাস করলো নগরের পর নগর, ধ্বংসস্তূপে পরিণত রাজপ্রাসাদ আর ধর্মমন্দির। এর পরে আবার গেল অনেক কাল। অতঃপর আবার এসেছিল ওই চেঙ্গিসের বংশের তৈমুরলঙ্গ। সেও পেরিয়ে এসেছিল ওই আমুদরিয়ার তীরবর্তী তারমেজ। সে পৌঁছেছিল দিল্লী পর্যন্ত। সহস্র সহস্র নরমুণ্ড নিয়ে লোফালুফির পর সেও এক লক্ষ বন্দী ভারতীয়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। প্রকাশ, তৈমুরের এক একজন সেনাপতি নিজের সঙ্গে দেড়শত শিশু, নারী ও পুরুষকে ক্রীতদাস করে নিয়ে যায়। তারা সবাই সমরখন্দে ফিরে গিয়ে কোটি-কোটি স্বর্ণমুদ্রা, হীরা জহরৎ ও সুন্দরী নারীদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। হিমালয়ের গিরিগুহাবক্ষে তাদের কান্না অনেককাল প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আমুদরিয়ার অশ্রুনদী আজও বয়ে যায় তারমেজের তীরে তীরে। ওটি তুরমুজপ্রধান ভূভাগ বলেই ওর নাম হয়েছে তারমেজ।

হিমালয়ের গর্ভে সেই পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আবার ঘটে গেল কাশ্মীরে এই সেদিন—১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। সেই কথাই বলি।

কাশ্মীরে আমার নবলব্ধ সাংবাদিক বন্ধু এম কে ধার এর উৎসাহে এবং কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ক্যাপ্টেন শাবলে এলেন গাড়ী নিয়ে সকালবেলায়। জীপগাড়ীতে আরেক তরুণ বন্ধু আছেন মি. আচারি। আমাকে নিয়ে যাবেন ওরা যুদ্ধবিরতি সীমানার ধারে, যেটা এখন কাশ্মীরের 'সীজ্ ফায়ার লাইন।'

পীর পাঞ্জালের উত্তুঙ্গ গিরিলোক চিরদিন বিশ্বাসঘাতক। ওই গিরি-শিখরলোকের দিকে তাকিয়ে আজও প্রতি কাশ্মীরীর হৃৎকম্প হয়। মহিষাসুরের মুণ্ডের মতো পীর পাঞ্জালের এক একটি চূড়া করাল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কাশ্মীরের দিকে। অথচ সমগ্র কাশ্মীর বংশপরম্পরায় অহিংসমন্ত্রে দীক্ষিত। এরা শেখেনি যুদ্ধ করতে, শেখেনি আত্মরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গের অভিযান। সেই কারণে কোনওদিন কোনও শত্রুকে বাধাও দিতে পারেনি প্রাণপণে।

শ্রীনগর ছাড়িয়ে মাইল চারেক দূরে এসে পাওয়া যায় সালাটেং—এই পর্যন্ত এসে পৌঁছে সেদিন পাকিস্থানী উপজাতির পাঠানদের থামতে হয়েছিল। এখানে পথ দুইভাগে বিভক্ত। সামনে বিশাল ধানক্ষেত, আশে পাশে গ্রাম-বাসীদের নিরুদ্বিগ্ন জীবন। কিন্তু এই ধানক্ষেতের উপর থেকেই কাশ্মীরের

মিলিশিয়া পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবকের দল ওদের পথরোধ করেছিল। নগরে যেন ওরা প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু সেই প্রতিরোধশক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে তখন বিমানযোগে ভারতীয় সৈন্য ও সাহায্য শ্রীনগর এসে পৌঁছয়।

উপজাতীয় পাঠানদের সঙ্গে পাকিস্তানের সদ্ভাব কিন্তু নেই। এরা আফগানিস্তানের সীমান্ত সন্তান, কিন্তু পাকিস্তানের শিষ্য নয়। এরা ইংরেজ এবং পাকিস্তান—এই দুয়ের প্রতি বিরূপ। কিন্তু এদের মধ্যে যারা একান্তই হিংস্র প্রকৃতি, যেমন হাজারা জেলার অধিবাসী তুর্কী-রুশীয় 'কারগিজ কাজাকি'রা, তাদের উৎকোচে বশীভূত করা হয়েছিল। তারা ধনদৌলত পাবে, শস্যক্ষেত্র পাবে, পছন্দসই স্ত্রীলোক পাবে—এই আশ্বাস পেয়ে তবে তারা হামলা করে। পিছনে রইলো পাকিস্তান,—অস্ত্র ও রসদ পিছন থেকে অজস্র যুগিয়ে যাবে। সুতরাং দানবকায় মত্ত হস্তীর দল বিরাট এক দস্যু বাহিনীর আকার ধ'রে রাওয়ালপিণ্ডি, মারী, হাভেলীয়ান, নাথিয়াগলি, কোহাল ও দুমেলের পথে বিতস্তা নদীর তীর ধ'রে কাশ্মীরে ঢুকে অতর্কিত আক্রমণ চালালো। রক্ত, আগুন, লুট আর হত্যা চললো অবাধবেগে।

ক্যাপ্টেন পাবলে নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিলেন। জাতিতে তিনি শিখ। যেমনই শিক্ষিত ভদ্র, তেমনই শান্ত। আমরা সোজা বরমূলার পথ ধরেছিলুম। পথে পথে পাওয়া যাচ্ছে রাজা ললিতাদিত্যের কীর্তির অবশেষ, রাজা অবন্তীবর্মার নানা স্মৃতিচিহ্ন, সম্রাট অশোকের আমলের কিছু কিছু স্থাপত্য। অতি সুন্দর বাঁধানো পথে পড়েছে মধুর রৌদ্র, আশে পাশে টিলা পাহাড়ের গায়ে রঙিন পাখীরা ডাক দিয়ে যাচ্ছে আসন্ন শরৎকালকে। এখানে ওখানে আপেলের বনে একটু একটু রঙ ধরেছে।

পাবলে হাসিমুখে বলেছিলেন, এ পথে যাচ্ছি, এখানে কিন্তু এই সেদিন অনেক রক্ত গড়িয়েছে। তবে কি জানেন, পৃথিবীতে শান্তি ও অহিংসাবাদ প্রচার করা এক কথা, আর সামরিক রীতি-নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধিব্যবস্থার ওপর রাজনীতিক প্রভাব বিস্তার করা অন্য বস্তু।

গাড়ী চলছে। কথাটা বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। তিনি বললেন, আপনি বোধহয় শোনেননি, কাশ্মীরের এ যুদ্ধ আমরা সম্পূর্ণ জয় ক'রে এনেছিলুম। কিন্তু ভাগ্য আমাদের মন্দ। চরম আঘাত হানবো, এমন মুহূর্তে হঠাৎ আমাদের থমকে যেতে হোলো।

কেন?

ক্যাপ্টেন হাসলেন। কিন্তু তখনই ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, রাষ্ট্রের নীতি

অহিংসাবাদ এবং সাধুতার ওপর দাঁড়াতে পারে, কিন্তু যুদ্ধকালের একমাত্র নীতি হোলো বর্বরতার অবসান ঘটানো। আমাদের সেই নাটকীয় জয়লাভের কালে হঠাৎ রাজনীতিক নির্দেশ সামরিক অভিযানকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে বসলো। কাশ্মীরের জনসাধারণ হায় হায় ক'রে উঠলো আমাদের দুর্বলতা দেখে।

তার পর?

তারপর 'সীজ ফায়ার।' বুক ফুলিয়ে লাইনের ওপারে গিয়ে দাঁড়ালো রক্তমাখা দস্যুর দল, আর বুক ফুলিয়ে ইঙ্গ মার্কিন ষড়যন্ত্রকারীরা পাঠিয়ে দিল জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধিদলকে। চেয়ে দেখুন, তাঁবু ফেলে বসেছে তারা দুই পারে—চক্রান্ত চলছে এপারে ওপারে। ক্যাম্পে-ক্যাম্পে মদ আর মেয়ে। সমস্ত রাত ধরে হুল্লোড সাদা গাড়ী ছুটিয়ে ওরা আসে শ্রীনগরে—অসচ্চরিত্রা ইঙ্গ-মার্কিন মেয়েরা হোলো ওদের গোয়েন্দা। ওদের নোংরা কীর্তি সবাই জানে। আপনারা ত' জানেন, একটি ইংরেজ মেয়ের গোয়েন্দাগিরির কথা। বক্সী গোলাম সাহেব তাকে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করেছেন। কিন্তু আমাদের সমস্ত শক্তি থাকতেও আমরা নির্বোধ ব'নে রইলুম।

শ্রীনগর থেকে বরমূলা মাত্র চৌত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের পথ। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় শঙ্করাচার্যের মন্দিরটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে পথের দুই ধারে চেনার আর পপলারের সারি। যেদিকে চাই, যে পাশে ফিরি,—মৃণ্ময় কাশ্মীর, সুন্দর, নশ্বর পেলব। ছোট ছোট টিলা পাহাড় এখানে-ওখানে, এ মাঠে আর ও মাঠে, মনে হচ্ছে আগামী বর্ষায় গ'লে যাবে সব।

পাটান পেরিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ। এই একই পথ। এই পথে যেমন এসেছি পাঠানকোট থেকে জম্মু শ্রীনগর, তেমনি এই পথ সোজা গিয়েছে বরমূলা, উরি, দুমেল আর কোহালার ঝিলম নদীর পুল পেরিয়ে সানিব্যাঙ্ক হয়ে রাওয়ালপিণ্ডির দিকে। এ আমার সম্পূর্ণ জানা পথ। এই পথ আমাকে অস্থির করেছিল তরুণ বয়সে, —যখন আমার বসবাস ছিল রাওয়ালপিণ্ডির ওদিকে।

দুই পাশের শান্ত পল্লীপ্রকৃতি পেরিয়ে জীপ চলেছে। অজস্র ফসল দুইধারের ক্ষেতে। ফলের গাছগুলি এখন পরিপূর্ণ। তন্দ্রাজড়ানো বাতাস বয়ে চলেছে। কোথাও কোনও অশান্তি অথবা কোলাহল নেই।

এক সময় একটি মৃণ্ময় টিলাপাহাড়ের নীচে এসে ক্যাপ্টেন জীপগাড়ী

থামালেন। আন্দাজ পঞ্চাশ ফুট উঁচু। আমরা উপরে উঠে গেলুম। সামনেই একটি কালো পাথরের স্মৃতিফলক। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লেফটেনান্ট কর্নেল ডি-আর-রে এই পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে সদলবলে পাঠানদের প্রতিরোধ করেন। এইখানে ব'য়ে গেছে সেদিন রক্তের প্রবাহ, সে রক্ত গড়িয়ে গেছে ক্ষেতখামারে, গেছে অদূরবর্তী বিতস্তার গৈরিক স্রোতে। কিন্তু হাজারে হাজারে কাতারে-কাতারে দস্যুদলের সামনে কর্নেল যেমন দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি, তেমনি এক ইঞ্চি হ'টে যেতেও চাননি। ফলে, এইখানেই গুলীবিদ্ধ হ'য়ে তিনি মারা যান। সেই অসমসাহসিক প্রকৃত যোদ্ধার হৃৎপিণ্ড থেকে ঠিক এই স্থলে প্রথম রক্তবিন্দু ঝ'রে পড়ে, এই কারণেই এখানে তাঁর স্মৃতিফলকটি নির্মিত। তারিখটি লেখা রয়েছে পাথরে, অক্টোবর ২৭, ১৯৪৭।

মাইল দেড়েক দূরে বরমূলায় এসে পৌঁছলুম। ছোট শহর, প্রবেশপথটি পাহাড়ে বেষ্টিত। এই শহরের প্রাচীন নাম ছিল বরাহমূল। সংবাদপত্রে পড়া সেদিনের বীভৎস কাহিনীর কথা স্মরণ ক'রে পা দুখানা যেন ভারী হ'য়ে উঠলো। সামনেই সেই মিশনারীদের প্রসিদ্ধ সেণ্ট জোসেফস কনভেণ্ট। ক্যাপ্টেন বললেন, আসুন, ভেতরে ঢুকি।

ভিতরে হাসপাতাল ও বিদ্যালয়, আশেপাশে সুন্দর বাগান এবং বসবাসের ঘর। এরই মধ্যে ঢুকে দস্যুরা যে কয়জন শ্বেতাঙ্গ রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে, তাদেরই একজনকে ডেকে ক্যাপ্টেন আলাপ করিয়ে দিলেন। শান্ত নম্রমুখী মহিলা। তাঁর চোখে চশমা, মুখের ভাবটিতে বুদ্ধি ও মাধুর্য একসঙ্গে মিলেছে। মহিলা সেই ভয়াবহ দিনগুলির নানা বীভৎস কাহিনীর বর্ণনা ক'রে একসময় বললেন, আমাদের এক বন্ধু জনৈক ইংরেজ কর্ণেল-স্ত্রী এখানে তখন সদ্য একটি সন্তান প্রসব করেছিলেন এবং সেদিন পাঠান আক্রমণের সংবাদ পেয়ে স্বয়ং কর্ণেল এসে তাঁর স্ত্রী ও সদ্যপ্রসূত সন্তানকে বিলাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। দস্যুরা স্বামী-স্ত্রীকে এই কনভেণ্টের মধ্যেই হত্যা করে এবং শিশুটিকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে আনন্দে নাচতে থাকে। তাদের সাংঘাতিক আক্রমণে সমস্ত কনভেণ্ট ছারখার হয়। এ যা দেখছেন, এ সব আবার নতুন ক'রে সাজানো হয়েছে। আমি একমাত্র সেদিনকার 'প্রেতিনী' হ'য়ে বাস করছি।

মাথা নীচু করেছিলেন ক্যাপ্টেন। মহিলা এবার চুপ করলেন। আমি ঘুরে ঘুরে চারিদিক দেখতে লাগলুম। পীর পাঞ্জালের দূর সীমানায় এসে এই সব আমাকে দেখে যেতে হোলো।

কন্‌ভেন্টের একটি অংশে প্রসূতি আগার। সেখানে কাশ্মীরী রোগিণী রয়েছে কয়েকজন। একটি কারিগরী বিদ্যালয়ে কয়েকটি মেয়ে হাতের কাজ শিখছে। শিশুরা একস্থলে ঔষধপত্রাদি নিচ্ছে। একধারে কয়েকটি পরিত্যক্ত নবজাত শিশুকে রাখা হয়েছে। সমগ্র ভারতের ও কলকাতার অন্যান্য কন্‌ভেন্টের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

ভারাক্রান্ত মনে আমরা কন্‌ভেন্ট থেকে বেরিয়ে শহর পরিদর্শনে বেরোলাম। না দেখলে বিশ্বাস করতুম না। মনে হচ্ছিল, মাত্র গতকাল সমস্ত শহর জ্বলে পুড়ে কাঠকয়লার মতো হয়ে গেছে। পথে পথে সর্বত্র স্তূপাকার ধ্বংস। ক্যাপ্টেন দেখাচ্ছিলেন, অবারিত লুণ্ঠন ও হত্যার কেন্দ্র, শত শত নরনারী পুড়েছে একই অগ্নিকুণ্ডে, পথের এক একটি কেন্দ্রে সংখ্যাতীত রমণীকে উলঙ্গ ক'রে দস্যুদল উল্লাসরঙ্গে নৃত্য করেছিল। স্বামীর দুই হাত আর দুই পা কেটে নিয়ে সেই কাটা হাত পা দ্বারা নগ্ন স্ত্রীকে প্রহার করা হয়েছিল। অগণ্য উৎপীড়িতা আতঙ্কিতা নগ্না রমণী ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে বিতস্তায়. সংখ্যাতীত রক্তমা . নারীর অচেতন দেহ নালার ধারে প'ড়েছিল পরিত্যক্ত অবস্থায়। পাথর দিয়ে ছেঁচে এবং পথের উপর আছাড় মেরে শিশু বালক বালিকাকে হত্যা করা হয়েছে,—তাও অসংখ্য। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে বরমুল।। যেদিন মৃত্যুর মতো অসাড় শান্তি ফিরে এলো, দেখা গেল বরমূলার অন্ধকার শ্মশানে কাঁদবার কেউ নেই। যাবার সময় দস্যুরা নিয়ে গেছে শত শত নারী ও বালিকা। বরমূলার আগাগোড়া এই ইতিহাস।

বরমূলায় একটি মসজিদও চোখে পড়ছে না। এগিয়ে গিয়ে দেখি, সঙ্কীর্ণ বিতস্তার ওপারে প্রাচীন রঘুনাথজীর মন্দিরে তখনও বাজছে শঙ্খ ও ঘণ্টা। একটি বৃহৎ চেনারবৃক্ষের ছায়া পড়েছে মন্দিরের স্বর্ণ কলসে। কলসের গায়ে কালো দাগ। শুনলুম ওপারেও আগুন জ্বলেছিল। মন্দির অঙ্গনে পণ্ডিতদের আনাগোনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। বিতস্তার তীরে অবগাহন স্নান ও পূজাপাঠ চলছে।

বাজারের জনবহুল পথের এক স্থলে এসে ক্যাপ্টেন দাঁড়ালেন। সামনেই কাশ্মীর-কেশরী মকবুল শেরওয়ানির বালিধ্বসা দোতলা বাড়ী, এবং তার ইঁটের দেওয়ালে আজও রয়েছে গুলীর দাগ। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীরের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে তাঁর সামনে তাঁর পরিবারের প্রত্যেকটি নারী ও শিশুকে এনে একে একে হত্যা করা হয়। অতঃপর দস্যুরা শেরওয়ানিকে প্রশ্ন করে, এখনও তিনি পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি আছেন কি না। শেরওয়ানি ঘৃণার সঙ্গে এই নরহত্যাকারী দস্যুদলের প্রত্যেকটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

তাঁর অপমানজনক তিরস্কারে ক্রুদ্ধ দস্যুরা তাঁরই বাড়ীর দেওয়ালে তাঁকে পেরেক পুঁতে ঝুলিয়ে তাঁর দেহকে গুলীবিদ্ধ ক'রে শতচ্ছিন্ন করে।

শেরওবানির উদ্দেশে আজ নিত্যপ্রণাম জানায় কাশ্মীর।

ফিরবার পথে 'সংগ্রামা' হয়ে 'সোপোর'। এর প্রাচীন নাম ছিল, সুইয়াপুর। অনেকে বলে, রাজা অবন্তীবর্মার কালে সূরীথ অর্থাৎ সূর্য ওরফে 'সুইয়া' নামক এক ইঞ্জিনীয়ার ঝিলমের বন্যার গ্রাস থেকে কাশ্মীরকে বাঁচাবার জন্য এখানে এক নদীপথ কেটে দেন। যাই হোক, সোপোরেরও ওই এক ইতিহাস। নদীর ওপার থেকে আসে উপজাতীয় পাঠানরা, এবং পিছন থেকে এগিয়ে আসে বরমুলা থেকে দস্যুদল। উভয়েরই উদ্দেশ্য লুণ্ঠন ও নারীহরণ। সেই চূড়ান্ত সঙ্কটকালে কয়েকটি পরিবারের পুরুষ আপন আপন হাতে নিজ পরিবারের নারীগণকে হত্যা করে অবশেষে নিজেরা নদীতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সেই নাটকীয় সঙ্কটকালে চারিদিক থেকে ভারতীয় সেনাদল দস্যুদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন শান্তকণ্ঠে বললেন, মুসলমানের উপরে মুসলমানের এই অমানুষিক বর্বরতা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।

সোপোরের বাজার বেশ বড়, পথঘাট জনবহুল। বুঝতে পারা যায়, মহাজনতা চিরকাল বিস্মৃতিপরায়ণ। ক্ষয় ক্ষতি ও ক্ষত মানুষ আবার ভুলতে বসেছে। নতুন কালে আবার নতুন ফসল ফলেছে, নতুন মানুষ জন্ম নিয়েছে, গাছে গাছে নতুন কিশলয় দেখা দিয়েছে।

যদি কেউ এই মৃত্তিকার লাবণ্যের উপর কান পেতে থাকে, কাশ্মীরের কান্না শুনবে। রক্তপিচ্ছল ভূস্বর্গ এবার হয়ত মৃত্যু আর অপমান থেকে ভীষণামূর্তিতে উঠে আসতে চায়। বিবশা বিস্রস্তা মৃন্ময়ী এবার তার ধূলিধূসর এলোচুল ফিরিয়ে বাঁধুক। অগ্নিক্ষরা করাল দৃষ্টি তুলে এবার ডাক দিয়ে বলুক, "হে বিধাতা, আমারে রেখোনা বাক্যহীনা, রক্তে মোর বাজে রুদ্রবীণা।" ওর প্রাণের ইতিহাসের পর্বে পর্বে হূন তাতার মোঙ্গল পাঠান সবাই এসে ওর সর্বাঙ্গে নখরাঘাত হেনেছে বর্বরের মতো, হিংস্র দস্যুর দল যুগে যুগে ওর তনুলাবণ্যের পরে পাশব প্রবৃত্তির খেলা খেলেছে। এবার উঠে দাঁড়িয়ে মুছুক চোখের জল, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহে ডাক দিক ওই হরমুখ হিমালয়ের বজ্রপাণিকে,—পশুহননের জন্য পাশুপত অস্ত্র হাতে তুলে নিক

*

* *

গুহাতীর্থ অমরনাথ থেকে ফিরে দিন তিনেক পুনরায় বাস করেছিলুম পহলগাঁওয়ে। শহর ফুরিয়ে যায় বড জোর মাইল খানেকের মধ্যে। ওইটুকুর মধ্যেই চলাফেরা, ওইটুকুর মধ্যেই কাজকারবার ব্যবসা বাণিজ্য। এপাশের উপত্যকা পথে উঠে গেছে পাইনের সুদীর্ঘ বনরেখা, আর দক্ষিণ নীলগঙ্গার তীর ধ'রে চলে গেছে চিরগাছের অরণ্য। নদীর ওপারে সমগ্র পশ্চিম উত্তুঙ্গ পর্বতমালায় অবরুদ্ধ। এদের ভিতর দিয়ে মাইল পনেরো অভিযান করলে কোলাহাই হিমবাহ এবং লিডারবৎ,—গুজরজাতির যাযাবরের দল ওই পথ দিয়ে আনাগোনা করে। মহাকাব্য যেন আসন পেতে বসেছে এখানে।

আবহমান কাল এখানে মন্থরগতি। প্রাণীজগতে কোথাও চাঞ্চল্য নেই। আপন মনে কাজ ক'রে চলেছে হিমালয়ের প্রকৃতি। সূর্যাস্তকালে পশ্চিম পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি রাখলে সন্ধ্যা কেটে যায়, ধীরে ধীরে মেঘের টুকরো নেমে আসে নীলগঙ্গার নীলাভ জলের ধারে,—তার পর যেন ঘুমিয়ে পড়ে। জ্যোৎস্না-রাত্রে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ডুক্‌রে-ডুকরে ওঠে নীলগঙ্গা।

পহলগাঁও থেকে একদিন বেরিয়ে পড়লুম।

ছায়ানিবিড় রোমাঞ্চ ছিল কোনো এক পাহাড়তলীর বস্তিতে, তারই চূড়ার দিকে পশ্চিমমুখী এক মসজিদ এতদিন পরে প্রথম দেখতে পাওয়া গেল। প্রকৃত নাম হোলো জনকমহল, কিন্তু নাম বদলেছে ইদানীংকালে—যেমন আষেশ-মোকাম। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত কাশ্মীরে বৌদ্ধ ও হিন্দু স্থাপত্যকীর্তিই প্রধান,—এদের সঙ্গে মিশেছে কোথাও কোথাও আরও দুটি শিল্পকলার প্রভাব। একটি হোলো গ্রীক, এবং অন্যটি তিব্বতী, যার মূল ছাঁচ হোলো মঙ্গোলীয়। সাম্প্রতিক তিন চারশো বছরের মধ্যে অবশ্য একটু-আধটু মোগল স্থাপত্যের ছাপ পড়েছে সন্দেহ নেই। শ্রীনগরের সন্নিকটে যেটি বড় মসজিদ—অর্থাৎ শাহ হামদান,—এটিকে বৌদ্ধ-'মসজিদ' বলা চলে। এই মসজিদ যেখানে দাঁড়িয়ে উঠেছে, সেই স্থলটি হোলো দেবী কালীশ্বরীর প্রাচীন মন্দিরের প্রাঙ্গণে। কাশ্মীরের সর্ববৃহৎ জুমা মসজিদও তাই, প্রাচীন দেবদেউলের কোলেই তার ভিত্তি। কিন্তু এ ছাড়া কি আর কোনও জায়গা ছিল না? ছিল বৈকি। কিন্তু হিন্দুস্থাপত্য স্থান-নির্বাচনে চিরকাল পারদর্শী। পুরীর জগন্নাথ, সমুদ্রবেলায় কোনারক, পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত ঝিলম শহরের নদীতীরবর্তী বিশাল শিবশক্তির মন্দির, পূর্ব বঙ্গে সমুদ্রশোভা-সমন্বিত চন্দ্রনাথ, করাচীর মহাকালীর মন্দির, বেলুচিস্তানের অঘোর নদীর তীরে জ্যোতির্লিঙ্গ হিঙ্গুলা দেবী, অগ্নি-তীর্থের

সোমনাথ, ব্রহ্মপুত্রের পারে কামাখ্যা, বোম্বাইয়ের মহালক্ষ্মী, কাশীর বেণীমাধব আর আদিকেশব,—বলে যেতে পারি একটির পর একটি। বলতে পারি রাজগৃহ, যশলমের, যোধপুর, পুণা আর রামেশ্বরম্—বলতে পারি আরও অনেক। পাহাড়ে, সমুদ্রে, অরণ্যে, নদীতীরে—প্রত্যেক হিন্দু-স্থাপত্যের স্থান নির্বাচনটি হোলো সৌন্দর্যবোধের প্রতীক। এই প্রথম কাশ্মীরে দেখলুম, পাহাড়ের চূড়ায় মসজিদ। কিন্তু এর কারণ অনুমান করতে বিলম্ব হয় না। কাশ্মীর হোলো অতর্কিত বন্যাপ্লাবনের দেশ, হঠাৎ আসে বন্যা,—ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব। উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ। কিন্তু নগরের উপান্তে সর্বাঙ্গসুন্দর ও পরম পবিত্র উপাসনাস্থল হলো 'হজরৎবাল' মসজিদ দালহ্রদের এক প্রান্তে।

মার্তণ্ড শহরে এলুম। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের দেখেছি, এবার দেখছি পাণ্ডাদের। এদেরই পূর্বপুরুষ একদা ধর্মান্তরিত কাশ্মীরী হিন্দুকে নিজেদের কোলে ঠাঁই দেয়নি। যেমন গয়ায়, যেমন কাশী আর বৃন্দাবনে, যেমন মথুরা, হরিদ্বার আর কলকাতার কালীঘাটে,—এরা ঠিক তেমনই ছিনেজোঁক। সেই একই ব্যবসা পুণ্যবিতরণের। এখানে সরোবরের তীরে সূর্যনারায়ণের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ,—নাম হোলো মার্তণ্ড মন্দির। এর স্থাপত্য, কারুকলা এবং অবস্থিতি সত্যই প্রশংসার যোগ্য। মার্তণ্ড শহরের বর্তমান নাম ইসলামাবাদ কেন হোলো খোঁজ নিইনি, কিন্তু মার্তণ্ডকে অনেকে আবার বলে মাটান্। এখান থেকে অল্প দূরে রাজা ললিতাদিত্যের সর্বপ্রধান স্থাপত্যকীর্তি দেখে আসা যায়। কাশ্মীরকে তিনি নিজের হাতে গড়েছিলেন।

অনন্তনাগের শান্ত পল্লীতে এসে পৌছলুম। উঁচু নীচু গলিঘুঁজি বন বাগান-ঝোপে-ঝাড়ে ঘেরা গ্রাম। কাছেই একটি গন্ধক ঝরণার পাশে একটি দেবস্থান। সত্যি, যেখানে যাও, যেদিকে চাও—দেবস্থান ছাড়া কিছু নেই। আসতে আসতেই দেখে নিচ্ছি বিষ্ণু আর রাধাকিষেণ, রামলছমন আর সীতা, সত্যনারায়ণ আর সূর্য। গিরিশ্রেণীর দিকে তাকাও—অধিকাংশ নাম হোলো, হরমুখ, হরমহেশ, কৃষ্ণগিরি শঙ্করাচার্য, হরিপর্বত, শ্রীশনাগ, ভৈরবঘাটি, অমরনাথ ইত্যাদি। নদীর দিকে তাকাও,—বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, কৃষ্ণগঙ্গা, নীলগঙ্গা দুধগঙ্গা, রোমহর্ষী, ভৃঙ্গা, সহস্রা, রামবিহারা, মদমতি ইত্যাদি। নগরগুলির দিকে তাকাও—সূর্যনাগ, নরনাগ, নাগমার্গ, অবন্তীপুর, ব্রজবিহার, আণ্ডনাগ, রামপুর, রামঘাট, চণ্ডীগাঁও ইত্যাদি। হ্রদের কথা যদি বলো, তবে কৃষ্ণসাগর, বিষ্ণুসাগর, গঙ্গা ও মনসাবল, উল্লহর—যাকে বলে উলার—বুদ্ধবল, গান্ধারবল, নরবল, অমরসাগর, তারসাগর, ইত্যাদি দেখিয়ে দেবো। সংস্কৃতি, সভ্যতা ও

স্থাপত্যে কাশ্মীর হোলো আগাগোড়া আর্যহিন্দু, এবং আর্যবৌদ্ধ। মুসলমান জনসাধারণ যাদের দেখা যাচ্ছে, তাদের প্রকৃতি, আচরণ, অভ্যাস, জীবন-যাত্রা, খাদ্য, শরীরের গঠন, আকার, মুখের ভাব, চক্ষু ও নাসা, সামাজিক মেলামেশা,—সমস্তটাই মুসলমান-বিরোধী। উত্তর ভারতের অথবা পাকিস্তানের মুসলমান এসে ওদের সামনে দাঁড়ালে ওরা অবাক হয়, তাতার মোঙ্গল কিংবা পাঠান মুসলমান এলে ওরা ঘরের দরজা বন্ধ করে। মোগল আমলের মুসলমানদের সঙ্গে ওদের আজও মিল হয়নি। ওদের সর্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয় হোলো কাশ্মীরী হিন্দু। যেমন পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের পরমাত্মীয় হোলো পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু। উভয়ের মধ্যে আত্মিক পরিচয় অতি নিবিড়। একই রক্তের যমজ সন্তান। রাজনীতি হোলো বহিরঙ্গ, শোণিতনীতি হোলো অন্তর অঙ্গ।

সাতটি সাঁকোর দ্বারা শ্রীনগরের এপার ওপার সংযুক্ত। প্রথম সাঁকোর নাম, 'আমিরা কদল'। কদল মানে সাঁকো। আমিরা কদল-এর উভয় পার হোলো নগরের প্রায় নাভিকেন্দ্র। ওরই কাছাকাছি খালসা হোটেলে এর আগে বাসা নিয়েছিলুম। এবার এসে উঠলুম, ইম্পিরীয়ল্ ব্যাঙ্কের বাগানে তাঁবুর মধ্যে। কাশ্মীরে এসে তাঁবুতে বাস করা আনন্দদায়ক। নিরাপদ স্বাধীনতার স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায়।

সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে একখানা নিমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁছলো সদর ই রিয়াসতের ওখান থেকে—সোনালি লাল কালিতে ছাপা। বুঝতে পারা গেল, সাংবাদিক বন্ধু মিঃ ধারের উৎসাহ আছে এর পিছনে। অপরাহ্ণ সাড়ে চারটের সময় যুবরাজ করণ সিং জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করতে চান।

শ্রীনগরের দক্ষিণ অংশটি হোলো ঘিঞ্জি শহর। বাজার অংশ পেরিয়ে গেলে আধুনিক আবহাওয়া। শেখ আবদুল্লার গদিচ্যুতির পর এখন তিন সপ্তাহ কেটে গেছে, থমথমে ভাবটি আর এখন নেই, অবস্থা স্বাভাবিক। 'প্রধান' মন্ত্রী হিসাবে সরকারী শাসনভার হাতে নিয়েছেন কাশ্মীরের 'লৌহমানব' বক্সী গোলাম মহম্মদ। সমগ্র কাশ্মীরে দেশনিষ্ঠ অক্লান্ত কর্মী ও ভয়হীন নেতারূপে তিনি পরিচিত। অথচ এই সেদিন অবধি তিনি শেখ আবদুল্লার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু রাজনীতির পাশা খেলা বিচিত্র। দেশদ্রোহিতার অপরাধে শেখ আবদুল্লাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে একরাত্রের মধ্যে সরানো হয়, এবং পরদিন তিনি যখন গুলমার্গ থেকে তাঁর সহকর্মী মীর্জা আফজল বেগকে

সঙ্গে নিয়ে কোনও এক পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন পথের মাঝখান থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার ক'রে আনা হয়।

কথাটা এখানেই পরিষ্কার হওয়া দরকার। রাজনীতি অথবা ইতিহাস গবেষণা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কাশ্মীরের একটি বিশেষ সঙ্কট-সন্ধিকালে ওখানে গিয়ে পড়ি ব'লেই ওটাকে এড়ানো কঠিন ছিল। শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন। তাঁকে বলা হয়, কাশ্মীরের 'ব্যাঘ্র'—শের-ই-কাশ্মীর! কিন্তু ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলের পর থেকে সহসা তাঁর রাজনীতিক অভিমত ঘুরে দাঁড়ায় এবং কাশ্মীরকে 'স্বাধীন' ব'লে ঘোষণা করার একটা অদ্ভুত চেষ্টা তিনি করতে থাকেন। বহুলোকের ধারণা, তিনি জনৈক আমেরিকান নেতা ও দুই একজন পাকিস্তানী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চাপা চক্রান্তে প'ড়ে যান। প্রকাশ, এমনি সময় কাশ্মীরেব প্রজা-পরিষদের নেতারা এই দুষ্ট চক্রান্তের খবর পান এবং তাঁদের হাতে তৎকালীন কাশ্মীরী-মন্ত্রী মীর্জা আফজল বেগ লিখিত কয়েকখানি চিঠিপত্রের নকল ধরা পড়ে। প্রজা-পরিষদ আমন্ত্রণ করেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে। প্রকাশ, শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে গিয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হন এবং অন্তরঙ্গ মহলের ধারণা এই, তিনি কয়েকখানি চিঠি নেহরুকে দেখান। নেহরু এতে আস্থা স্থাপন করেননি। শেখ আবদুল্লা তাঁর বিশ বছরের বন্ধু, এবং নেহরু বন্ধুবৎসল। বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা না ক'রে তিনি মতামত স্থির করবেন না। ইতিমধ্যে শেখ আবদুল্লার বিরুদ্ধে প্রজা পরিষদের প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের সম্মানজনক নিষ্পত্তির জন্য শ্যামাপ্রসাদ শ্রীযুক্ত নেহরু ও আবদুল্লার সহিত চিঠিপত্র আদানপ্রদান করতে থাকেন। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তিনি স্বচক্ষে পরিস্থিতি পরিদর্শনের জন্য কাশ্মীর প্রবেশের সিদ্ধান্ত করেন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমগ্র ব্যাপারটির নিষ্পত্তি সম্ভব কিনা, এজন্য শেখ আবদুল্লাকে জানান। আবদুল্লা এতেও আপত্তি করেন। তখন শ্যামাপ্রসাদ স্থির করেন যে, তিনি ভারতের এলাকাভুক্ত কাশ্মীরে বিনা ছাড়পত্রেই প্রবেশ করবেন। কাশ্মীর গভর্নমেণ্টের নিজস্ব কোনও ছাড়পত্র নেই, এটি ভারত গভর্নমেণ্টেরই প্রবর্তিত। বস্তুত, শ্যামাপ্রসাদকে কাশ্মীর প্রবেশে কোনও প্রকার বাধা দেওয়া হয়নি, এমন কি মাধোপুর চেক্‌পোস্ট থেকে ইরাবতী নদীর পুলের ওপার পর্যন্ত অনেকটা যেন অভ্যর্থনা করেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। "To see that his entry into the state without permit was facilitated'—এটি ছিল ভারত সরকার অধীনস্থ গুরুদাসপুরের কর্তৃপক্ষেরই নির্দেশ। স্থানীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামাপ্রসাদের

শুভযাত্রা কামনা করেছিলেন। সেটি ১১ই মে, ১৯৫৩। পুলের ওপারে পৌঁছবামাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোলো। বিচিত্র সেই গ্রেপ্তার। কাশ্মীর অথবা ভারত কোন্ পক্ষ কোন্ আইনে এই ভারতপ্রসিদ্ধ আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করলো ঠিক বোঝা গেল না। তবে শ্যামাপ্রসাদকে মাত্র 'দুমাসের জন্য' আটক ক'রে রাখার সিদ্ধান্তটা একটু নতুন ধরনের, কারণ পরবর্তী ওই দুমাস কাল পণ্ডিত নেহরু ছিলেন বিশেষ ব্যস্ত। তাঁকে যেতে হচ্ছিল ইংল্যাণ্ডে রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের আমন্ত্রণে এবং ইউরোপ ভ্রমণে।

কিন্তু পণ্ডিতজীর মনে বোধ করি স্বস্তি ছিল না। তিনি গেলেন কাশ্মীরে আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু শেখ সাহেব এবার যেন একটু ভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বললেন। পণ্ডিতজীর অভ্যর্থনা হোলো না এবার শ্রীনগরে। এর পর বক্সী গোলাম মহম্মদ এবং শ্যামলাল শরফ—এই দুই মন্ত্রীর সঙ্গে শেখ সাহেবের মনোমালিন্য ধূমায়িত হতে থাকে, এবং তিনি কাশ্মীরের নানা স্থানে নানাবিধ অসংলগ্ন এবং হিন্দুস্থানবিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান।

গ্রেপ্তারের একমাস এগারোদিন পরে ২৩শে জুন তারিখে হঠাৎ শেষ রাত্রে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ঘটে। এ মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে ঘটেছে কিনা, এই নিয়ে প্রশ্ন তুললো সমগ্র ভারত। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, শ্যামাপ্রসাদ একেবারেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন নেতা ছিলেন না। পূর্ববঙ্গ থেকে জনাব ফজলুল হক ঘোষণা করলেন, এমন মহৎ এবং উদারপ্রাণ দেশনিষ্ঠ কর্মী তিনি দেখেননি—তিনি সহোদর বিয়োগের বেদনা অনুভব করছেন। এমন সময় খবর এলো, শ্যামাপ্রসাদের স্বহস্তে লিখিত ডায়েরীখানি কাশ্মীরের পুলিশ হস্তগত করেছে, সেটি আর পাওয়া যাবে না।

ফিরে এলেন নেহরু। তিনি সান্ত্বনা দিলেন শ্যামাপ্রসাদের জননী শ্রীযুক্তা যোগমায়া দেবীকে। কিন্তু বাংলার শার্দূল স্বর্গত স্যর আশুতোষের সহধর্মিণী সেই সান্ত্বনা গ্রহণ করেননি,—সন্তানবিচ্ছেদকাতর মহীয়সী মহিলা, অভিযোগ আনলেন ভারত গভর্নমেণ্ট ও পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই অভিযোগের যথাযথ জবাব দেওয়া অথবা শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সরকারী ও বেসরকারী লোক নিযুক্ত করা, এই দুই কাজই পণ্ডিতজীর পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল। সম্ভবত তাঁর মনে এই ভয় ছিল যে, এই তদন্তের ব্যাপার নিয়ে পাছে ভারতে পুনরায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দেয়। কিন্তু ততদিনে শেখ আবদুল্লার গভর্নমেণ্টের প্রতি ভারতের প্রায় সকল রাজনীতিক দলেরই একটি গভীর সন্দেহ দৃঢ়মূল হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের গ্রেপ্তার ও

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একথা সেদিন জানা গেল, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষেও একজন সত্যব্রতী, ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক দেশহিতসাধকের মূল্যবান জীবনও সকল সময় নিরাপদ নয়,—যদি তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতদ্বৈধ ঘটে।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুপুরী সেদিন দেখে এলুম নিশাতবাগের পিছনে।

বেলা চারটের সময় গাড়ী এসে দাঁড়ালো তাঁবুর সামনে। এবার নতুন পথ। শ্রীনগর সুন্দর হতে থাকে যদি শহর-বাজার ছাড়িয়ে যাওয়া যায়। চেনারউইলোর সারির মধ্যে প্রত্যেকটি পথ কোথা থেকে যেন কোন্‌দিকের ছায়ানিবিড় বনে বনে হারিয়ে গেছে আমার স্বপ্নজগতের মতো। দেখছি পাইন পপলার চেনার উইলো-ওয়ালনাটের নিকুঞ্জলোক আশে পাশে,- দেখছি, কিন্তু দেখছিনে। দেখে যাচ্ছে মন, চোখ বোধ হয় নয়। মহাকাব্যের পাতায় পাতায় মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে এই হিমালয়ের আত্মইতিহাস,—যখন ফিরে যাবো, বোবা দেওয়াল থাকবে চোখের সামনে, পাঠ করবো এই মহাকাব্য প্রতিটি পাতা উলটিয়ে। দৃষ্টির সঙ্গে মন যদি সংযুক্ত না থাকে, কিছু দেখা যায় না। অন্যমনস্ক চেয়ে ছিলুম—মানে দৃষ্টি ছিল, কিন্তু মন ছিল অন্যত্র, তাই কিছু দেখতে পাইনি,—অনেক লোক, এই কথা বলে। শকুন্তলা তাকিয়ে ছিল ক্ষুৎপিপাসাকাতর দুর্বাসার প্রতি, কিন্তু মনশ্চক্ষু নিবদ্ধ ছিল দুষ্মন্তের দিকে, তাই দুর্বাসাকে সে দেখতে পায়নি। ভূস্বর্গ হিমালয়ের দিকে আমার মন ছিল, তথ্য সংগ্রহের দিকে চোখ ছিল না।

শ্রীনগরের সমতা থেকে একটি উপত্যকার মতো উঠে গেছে যুবরাজ করণ সিংয়ের প্রাসাদের পথ। এখানে ওখানে পরিচ্ছন্ন উদ্যান। আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়ালো প্রহরীবেষ্টিত প্রাসাদপ্রাঙ্গণে। পশ্চিমে বিশাল ডাল হ্রদ—তার জলরাশি সূর্যকিরণ ও রঙিন মেঘের প্রতিফলনে ঝলমল করছিল। তার একাংশে হরিপর্বতের দুর্গ, অন্য অংশে পাহাড়ের চূড়ায় শঙ্করাচার্যের প্রাচীন মন্দির। উত্তর অঞ্চলে মহারাজা গুলাব সিংয়ের পুরাতন প্রাসাদ। কিন্তু যুবরাজের এই বাংলো প্যাটার্নের প্রাসাদটি নবনির্মিত। যেমন চারিদিকে আধুনিক সুরুচির শোভা, তেমনি সৌন্দর্যবোধের পরিচয়। নগরের কোলাহল থেকে দূরে একটি নিভৃত জীবনযাত্রা। আমরা যুবরাজের বৈঠকখানায় এসে প্রবেশ করলুম।

সমস্ত ঘরে কাশ্মীরী কার্পেট আর মখমলের কাজ। এখানে ওখানে পড়াশুনার উপকরণ। কোনো কোনো ফুলদানিতে মৌসুমী ফুলের নানাবর্ণের গুচ্ছ রাখা একটি টেবলে কয়েকখানি ছবি,—রাজেন্দ্রপ্রসাদ-নেহরু-গান্ধী

এই তিনজন। একদিকে স্বামী বিবেকানন্দের একটি সুশ্রী ছবি টাঙানো। রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাচ্ছিনে।

যুবরাজ এক সময় সস্ত্রীক এসে প্রবেশ করলেন। অতি সুশ্রী তরুণ যুবক। বড় বড় কালো কাশ্মীরী দুই চোখ। একটি পায়ে কিছু খুঁত আছে, সামান্য খুঁড়িয়ে চলেন। তাঁর পরনে সম্পূর্ণ সাদা প্যাণ্ট আর গলাবন্ধ কোট। হাসিমুখে আমাদের মাঝখানে এসে বসলেন। নমস্কার জানালেন।

তাঁর স্ত্রীর বয়স অতি অল্প, আন্দাজ বছর কুড়ি। যেমন সুশ্রী, তেমনি পরমসুন্দরী তিব্বতী মেয়ে,—তাঁর সঙ্গে এসেছেন জনৈকা ইংরেজ গভর্নেস। তাঁরা বসলেন একান্তে।

মোট দশ বারোজন আমরা ছিলুম। অন্য সকলেই তাঁর অল্পবিস্তর পরিচিত, আমি নতুন। নমস্কার বিনিময়ের পর তিনি বললেন, আজ আপনি আমাদের নতুন অতিথি। অনেক দূরের মানুষ আপনি। আপনার এই ধুতি পোষাক দেখলে আমরা অবাক হই।

বললুম, এই পোষাকই ছিল ভারত কবি রবীন্দ্রনাথের। কই, আপনার ঘরে তাঁর ছবি দেখছিনে ত?

হাসি মুখে যুবরাজ বললেন, তার বলবেন না, রবীন্দ্রনাথের ছবির এতই চাহিদা এখানে যে, বার বার যোগাড় করেও তাঁর ছবি আমার ঘরে রাখতে পারিনি। কেউ এসে তাঁর ছবি নিয়ে চলে যায়। আবার শিগগিরই তাঁর ছবি আনাবো।

আমরা চামচা দিয়ে খাচ্ছিলুম, যুবরাজ প্লেট থেকে হাতে তুলে নিয়ে শিঙ্গারা খাচ্ছিলেন। এক সময় বললেন, আপনার 'যাত্রিক' ছবিটি দেখে ভারি আনন্দ পেয়েছি, জীবিত লেখকের জীবন কাহিনী এর আগে কখনও ছবিতে দেখিনি। ছবি দেখে চিনেছি আপনাকে। সিনেমায় ভারতীয় ছবি আমার খুব ভালো লাগে।

গুহাতীর্থ অমরনাথের আলোচনা উঠলো। মাত্র গত মাসে তাঁরা স্বামী স্ত্রী মিলে সেখানে গিয়েছিলেন। পূর্ণ তুষারলিঙ্গের ছবি তিনি তুলে এনেছিলেন। বিস্ময়ের কথা, তাঁর স্ত্রী ওই দুঃসাধ্য পার্বত্যপথে সম্পূর্ণ হেঁটে গিয়ে যাত্রা পূর্ণ করেন। যুবরাজ নিজে গিয়েছিলেন ডাণ্ডিতে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা উঠলো। তিনি প্রত্যাদেশ পেয়ে এসেছিলেন ক্ষীরভবানীতে তারপর তিনি যান অমরনাথে। সেখানে এমনভাবে তিনি আত্মসমাহিত হন যে, তীর্থযাত্রীরা তাঁকেই শ্রীঅমরনাথ ব'লে পূজা দেন। আশ্চর্য সেই মহাপুরুষ, তাঁর পদস্পর্শে কাশ্মীর ধন্য হয়েছিল।

উচ্ছ্বসিত যুবরাজ এক সময় বললেন, দুঃখ এই, সেই বিবেকানন্দের বাঙলা আমি আজও দেখিনি। মানচিত্রে দেখি বাঙলা অনেক দূর। বাঙলা দেখবার সাধ আমার অনেক দিনের। যদি কখনও যাই, আগে যাবো বেলুড় মঠে, আগে দেখবো শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির। বাঙলা দেশ হোলো ভারতবর্ষের গৌরব।

বললুম, বাঙলাদেশে গেলে আপনার মনে হবে না যে, আপনি কাশ্মীরের বাইরে এসেছেন। এর বন-বাগান ক্ষেত-খামারের এতই মিল দেখছি বাঙলার সঙ্গে।

যুবরাজ তাঁর মনের একাগ্র বাসনা প্রকাশ করে বললেন, জানিনে, কোনোদিন বাঙলাদেশ দেখতে পাবো কিনা।

গল্পগুজব চললো প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। কিন্তু তার মধ্যে একটিও রাজনীতির কথা ছিল না—যেটি নিয়ে তখন সারা কাশ্মীরে তুমুল ঝড় বইছে।

জলযোগের পর আমরা বাইরে এলুম। যুবরাণী সহাস্য নমস্কার জানিয়ে ভিতরে গেলেন। কিছুক্ষণ অবধি ফটো তোলাতুলি হোলো। অতঃপর বন্ধুবান্ধব একে একে বিদায় নিলেন। বাগানের একান্তে গেলুম যুবরাজের সঙ্গে,—প্রায় অন্দরমহলের দরজার কাছাকাছি। সেখানে বারান্দার রোয়াকে তিনি একস্থলে উবু হয়ে বসলেন। তাঁর এই সাধারণ স্বাভাবিক ভাবে বসাটা দেখে খুব আমোদ পেলুম। এটি যুবরাজজনোচিত নয়।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুর কথাটা আমিই তুললুম। তাঁর এই অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যুর সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষ ক'রে বাঙালী জাতি, অত্যন্ত শোকার্ত অবস্থায় রয়েছে—একথা তাঁকে জানালুম

যুবরাজ বললেন, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন মানুষ ছিলেন—এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। তাঁর মতো ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠ নেতা অতি বিরল। আমি নিজে তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ আজও জানতে পারিনি, কিন্তু এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদে আমরা বাড়ীশুদ্ধ সবাই শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়েছিলুম। কখনও ভাবিনি এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটতে পারে। সেই মর্মবেদনা আজও আমাদের বাড়ীর কেউ ভুলতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুতে যেন আমাদের পরমাত্মীয় বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।

আমার নোটবইটি তাঁর হাতে দিলুম। তারই একটি পৃষ্ঠায় তিনি এই বাণীটি লিখে দিলেন :

"I have been asked by Shri P. K. Sanyal to send a

message to the people of Bengal. All I can do is to send the people of that great land my best wishes. I hope to some day visit your State which has played such a noble and dynamic role in the history of our nation.

Karan Mahal, Srinagar   Karan Singh."

29th August, 1953

যুবরাজের এই বাণীটি যথাসময়ে দিল্লী ও কলিকাতার 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে' প্রকাশিত হয়।

মাত্র তিন সপ্তাহ আগে সারা পৃথিবী উচ্চকিত হ'য়ে উঠেছিল কাশ্মীরের একটি নাটকীয় সংবাদে। এই তরুণ রাজকুমার মাত্র এক রাত্রির মধ্যে একটি চলতি গভর্নমেণ্টকে বিশেষ ক্ষমতাবলে নিজের হাতে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে আরেকটি নূতন গভর্নমেণ্টকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর পিছনে দিল্লীর সহায়তা কতখানি ছিল, অথবা ছিল কিনা, সে আলোচনা এখানে ওঠে না।

সে যাই হোক, এই সময়টায় আমার লেখা কয়েকখানি 'কাশ্মীরের চিঠি' 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে' বেনামিতে নিয়মিত ছাপা হ'তে থাকে। তাদের মধ্যে শেষ পত্রে যুবরাজ করণ সিং সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র ছিল: [অনুবাদ]

"His eagerness for visiting Bengal has led me to think that we ought to bring him down to Bengal and give him a befitting reception. I hope such a visit would help to clear up the misunderstanding between Bengal and Kashmir that has cropped up as a sequel to Dr. Mookherjee's sudden death in Kashmir. Perhaps the Yuvaraj also knows this. If the west Bengal Governor Dr. H. C. Mookherjee and Dr. B. C. Roy can consider this suggestion it will be better still."

অতঃপর চার মাসের মধ্যে যুবরাজ করণ সিংকে সাদরে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তিনি বেলুড় মঠ এবং এখানে ওখানে কিছু দিন পরিভ্রমণ ক'রে বিশেষ আনন্দলাভ করেন। যুবরাজের পক্ষে সেই প্রথম কলিকাতায় পদার্পণ।

'দেবতাত্মা হিমালয়'র প্রথম খণ্ডে জনৈক বাঙ্গালী মহিলার উল্লেখ আছে। পহলগাঁওর হোটেলে তিনি এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেন। হিমাংশু বসু

ছিলেন আমার সঙ্গে। তরুণীটি আধুনিক কালের মেয়ে। নাম শ্রীমতী মায়া। তিনি বিশেষভাবে তাঁর শ্রীনগরের বাসায় আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যান। অতএব অমরনাথ থেকে ফিরে পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো তাঁর ঠিকানা নিয়ে শ্রীনগরের শহরতলীর এক বাড়ীতে তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল। সে-বাড়ীতে চার পাঁচটি পরিবারের মধ্যে দুটি বাঙ্গালী। তিনি আমাদের নাটকীয় আবির্ভাব দেখে সেই সন্ধ্যায় সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর স্বামী বিমান-বিভাগে চাকরি করেন, এবং বর্তমানে আছেন দক্ষিণ ভারতে।

একটি বাগানবাড়ীর দোতলায় উনি থাকেন। শহর থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে বডজেলা নামক পল্লীতে। রামবাগের পুল পেরিয়ে মহারাজা গুলাব সিংয়ের সমাধি-উদ্যান ছাড়িয়ে যে পথটি গিয়েছে বিমানঘাঁটির দিকে, সেই পথের ধারে পগলাবের বনময় পাহাড়তলীর দিকে এঁদের বাগানবাড়ী। পল্লীটি অতি নিভৃত,—বাড়ীর গা দিয়ে গ্রামের দিকে একটি পথ চ'লে গেছে, অরণ্যতলা গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের দিকে।

শ্রীমতী মায়া পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিতে ভুললেন না যে, তাঁর এখানে আমি কয়েকদিনের জন্য আতিথ্য নিতে বাধ্য। সঙ্গে যদি হিমাংশুও থাকেন তবে তিনি পরম কৃতজ্ঞ থাকবেন। কিন্তু হিমাংশু তখনই জানিয়ে দিলেন যে, হাউস বোটে কিছুদিন বাস করার বাসনা নিয়ে তিনি এসেছেন কাশ্মীরে. তাঁর সেই সাধ পূর্ণ হওয়া একান্তই দরকার। হাউসবোট আমার নিজের ভালো লাগেনি। দাল হ্রদের আনাচে কানাচে এবং বন্দকলার দলজড়ানো নোংরা জলে হাউসবোটের বাহ্যিক চেহারা দেখে মানিকতলার খালের মহাজনী নৌকার কথা আমার মনে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, মাঝিমাল্লার হাতে স্বাধীনতা তুলে দিয়ে জলের মাঝখানে গিয়ে হাত পা গুটিয়ে থাকা পছন্দসই হয়নি। অবশ্য প্রত্যেক বোটের অধীনে 'শিকারা' নামক ছোট ছোট সেরাটোপের ডিঙ্গি মোতায়েন আছে বটে, যখন খুশি পারাপার হওয়া চলে। কিন্তু যতই হোক, যত কারাই ওর সঙ্গে যুক্ত থাকুক, স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা পদে পদে কুণ্ঠিত হয়—এই আমার বিশ্বাস। শাবুতে থাকতে গেলে পাহারা লাগে। সুতরাং হোটেল সর্বাপেক্ষা স্বাচ্ছন্দ্যকর।

যাই হোক, পরদিন সকাল প্রায় ন'টায় আমাদের তাঁবুতে এলেন মায়া এবং কুণ্ডু স্পেশালের শ্রীমান শঙ্কর। তাঁবুর সামনে আমাদের বসিয়ে শ্রীমান্ ছবি তুলতে লাগলো একটির পর একটি। শ্রীমতী মায়ার সাদা রেশমের শাড়ীর উপযুক্ত ছবি কিছুতেই রৌদ্রের আভায় ওঠে না, এই ছিল মস্ত সমস্যা। তাঁবুর সামনে বাগানে সকালের চায়ের আসর ব'সে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে

স্থির করা গেল, আজ আমরা মোগল গার্ডেনস্ দেখতে যাবো। শঙ্কর জিদ ধ'রে এই প্রস্তাব করলে', আর আমরা তিনজনে তার সারাদিনের অতিথি। তার আতিথেয়তা স্মরণ ক'রে রাখার মতো।

শহরের যে অংশটা জনবহুল সেটি নোংরায় আর সঙ্কীর্ণতায় অপরিচ্ছন্ন, ছোট ছোট অন্ধকারের খোপের মধ্যে অপরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা—ওর মধ্যেই বহু ধিকৃত জীবন কিলবিল করে। গলি ঘুঁজি নোংরা জলে বস্তির যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ভারতের প্রায় প্রত্যেক শহরের আশে পাশে, এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেজন্য ক্ষয়রোগ স্থানে স্থানে প্রবল। এর বাইরে গেলে তবে ভূস্বর্গ। যারা কাশ্মীর দেখতে চায়, তারা কিন্তু কাশ্মীরীদের প্রকৃত জীবনযাত্রার চেহারা দেখতে চায় না। তারা গিয়ে টাকা ছড়িয়ে আমোদ কিনে নিয়ে আসে। ময়লা ঘরে, নোংরা সজ্জায়, ছেঁড়া বিছানায়, উচ্ছিষ্টের আনাচে কানাচে, শিকারা আর হাউসবোটের পাটাতনের আড়ালে, দোকানের তলায়, হাটবাজারের অলিগলিতে, গাড়ীর আড্ডায়, বিতস্তার ঘাটে ঘাটে, সাকো-গুলির পাশে পাশে কুটিরশিল্পকেন্দ্রগুলির আড়ালে আবডালে,—যে ক্ষুধার্ত দরিদ্র ও হতাশ নরনারী এবং শিশুরা চলাফেরা করে, তারা হোলো প্রকৃত কাশ্মীরী,—তারা ভিক্ষে করে টুরিস্টদের কাছে হাত পেতে। যেখানে যাও ভিক্ষে, যেখানে যাও বকশিস। ছুটে গিয়ে গাড়ী ডেকে দিল, দাও বকশিস্। রাস্তাটা দেখিয়ে দিল, দাও ভিক্ষে। চললো সঙ্গে সঙ্গে—যদি পায় ছিটে-ফোঁটা, যদি পায় একটা কড়া। গৃহস্থ ঘরের বউ, বাড়ীর গৃহিণী, ক্ষেত-খামারের চাষী,—এরা ছুটে এলো পথের ধারে—কেননা টুরিস্ট যাচ্ছে, যদি দুচার পয়সা 'বকশিস' পাওয়া যায়। রান্না করতে করতে ছুটে এলো, বিছানা ছেড়ে রোগী ছুটে এলো, খেলা ছেড়ে বালকবালিকা ছুটে এলো, খামারে জলসেচনের কাজ ফেলে শ্রমিক ছুটে এলো। এলো বাঁকা-নয়না, এলো মধুরভাষিণী এলো লজ্জাবতী, এলো হাস্যমুখ বালক, এলো অশীতিপর বৃদ্ধ—এলো চারিদিক থেকে হিমালয়ের সন্তান। ওরা শুনতে পেয়েছে এই পথ দিয়ে যাবে ইউরোপীয় টুরিস্ট, ভারতীয় শেঠ আর মহাজন,—ওরা আশায় আশায় পথের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা ভূস্বর্গ-বাসী, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধার ধারে না। বোঝে না রাজনীতি, জানে না সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। ওরা জেনে এসেছে চিরকালের মারখাওয়া দৈন্য দারিদ্র্যের নরককুণ্ড কাশ্মীরকে। ক্ষুধার অন্নে ওরা খুশী, নিরুপায় জীবনযাত্রায় একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্য পেলেই ওদের আনন্দ। ওদের ওই ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখলে যেন কান্না পায়।

শ্রীনগর থেকে বেরিয়ে মাইল তিনেক এগিয়ে গেলেই একে একে মোগল-গার্ডেনগুলি পাওয়া যায়। পাশেই বিস্তৃত দাল হ্রদ। জলজ লতাদলে আচ্ছন্ন থাকে, তাই এই বিশাল জলাশয়ের নাম দাল, কিংবা দল, কিংবা ডাল। কমবেশী পনেরো বর্গ মাইল এর পরিধি। কোথাও ঘনসন্নিবিষ্ট লতাদলের উপর রাশি রাশি মাটি ফেলে এক একটি ভাসমান বাগান প্রস্তুত করা হয়েছে। ফুলে-ফলে সেগুলি আচ্ছন্ন। কোথাও কোথাও ভেসে চলে শ্বেত ও রক্তপদ্মের দল,—তাদেরই উপর দিয়ে চারিদিক থেকে হ্রদের উপর ছায়া পড়ে এক একটি পর্বতচূড়ার। সূর্যাস্তের নানাবর্ণ জলের উপরে নিবিড় হতে থাকে।

আমরা একটির পর একটি উদ্যান দেখে বেড়ালুম। পাহাড়ের কোলে এই উদ্যানে নানা কৌশলে আনা হয়েছে এক একটি ঝরণা। এ বাগানগুলি মোগল আমলের। চশমাশাহি, শালীমার, নিশাতবাগ নাসিমবাগ ইত্যাদি। এগুলি মোগল আমলের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের প্রতীক। শ্রীনগর থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে একটি নিরিবিলি বনময় অঞ্চলে এসে আমরা পেলুম হরবন। এটি সংরক্ষিত এক বিশাল জলাশয়। এখান থেকে রাজধানীতে পানীয়জল সরবরাহ করা হয়। এর চেহারা দেখেই মনে প'ড়ে যায় জামশেদপুর থেকে আট মাইল দূরের 'ডেমনা' হ্রদটি,—কেউ বলে, ডেম্‌লা। দুটি হ্রদের একই উদ্দেশ্য। এখানেও পর্বতবেষ্টিত উপত্যকা ও শস্যক্ষেত্র, সেখানেও তাই--দলমা পাহাড়ের কোল। আমরা হরবনের বাঁধের উপর থেকে নেমে এসে অদূরে একটি সরকারী 'ট্রাউট্' মৎস্য চাষের ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলুম। অরণ্যতলার ছায়াকুঞ্জ-লোকে পাহাড়ী পাখীদলের কূজন গুঞ্জন চলছে। শঙ্কর ছবি তুললো আবার আমাদের দাঁড় করিয়ে।

শ্রীমতী মায়ার এসব অভিজ্ঞতা নতুন। বন্ধুমণ্ডলের সঙ্গে একবার মাত্র বেরিয়ে তিনি গিয়েছিলেন পহলগাঁওয়ে মাত্র দিন পনেরো আগে। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিল একটি দম্পতি তাদের শিশুকন্যাসহ। তারা হোলো মদন-লাল আর সৎবতী। এ ছাড়া, আরেকটি যুবক, নাম বাহাদুর সিং। ওদের সঙ্গে আমারও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আজ বাইরে এসে তিনি মুক্ত বিহঙ্গী। পাহাড়ের ঝরণা ছিল অবরুদ্ধ, এবার যেন সেটি ঝরঝরিয়ে নেমে এসেছে। স্বামী সঙ্গে নেই, সেজন্য তিনি কিছু ক্ষুণ্ণ, কিছু বা আনমনা, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ উল্লাসপ্রিয়তা ওতে বাধা পায়নি। আমাদের সঙ্গে তাঁর নতুন আলাপের সংবাদটি তিনি ইতিমধ্যে ভারতের দূরদূরান্তরে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুমহলে প্রচার ক'রে দিয়েছেন। স্বামীকে জানিয়েছেন সর্বাগ্রে।

সকাল থেকে সারাদিন মোটরবিহার চলেছে আমাদের। মোটর প্রায়

সর্বত্রগামী, পথ অতি মনোরম। হাজার হাজার বর্গমাইল হিমালয়ে ঘুরেছি, কিন্তু এখানে যেন পথ ভুলে এসে পড়েছি নাচের আসরে, গানের মজলিসে। এখানে শুনি নূপুরের ঝনক হিমালয়ের নীচে নীচে, পদে পদে শুনি ঠুংরীর বোল। হিমালয়ের সেই মহাগম্ভীর অরণ্যালোকের প্রশান্ত উদার গাম্ভীর্য চোখে পড়ছে না, সেই কলমন্দ্রমুখরা জননী জাহ্নবীর পুণ্য পার্বত্যালোক ব্রহ্মপুরা নয়, জটাভস্মমাখা নগ্নদেহ সন্ন্যাসীদলের সেই বেদমন্ত্রধ্বনিমুখরিত পার্বত্য গুহাগহ্বর দেখছিনে কোথাও,—এ যেন সহস্র ভোগবিলাসে, উল্লাসে, আলসে, লালসে বিবশা মদিরেক্ষণা রসরঙ্গীন উপত্যকা। এখানে টাকা ছড়াছড়ি যায়, আমোদ গড়াগড়ি যায়। প্রতিটি পাহাড়ের আনাচ কানাচ হোলো প্রমোদ কানন, প্রতিটি তাঁবুর রহস্য অন্তরালে প্রাণ নিয়ে খেলা, চেনার উইলো-পাইনের বনান্তরালে মধ্যরাত্রির ছায়ানিবিড় জ্যোৎস্নায় কোথাও কোথাও উচ্ছ্বসিত অনুরাগ আপন বাসনার অসহনীয় যন্ত্রণায় মাতাল হতে থাকে। রূপের আর লোভের এমন দেশজোড়া আয়োজন হিমালয়ের আর কোথাও নেই। সেই কারণে কাঁচা পয়সা হাতে নিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে যে সব রঙ্গীন প্রজাপতি এখানে বেড়িয়ে যায়, তাঁরা কাশ্মীরকে বলে, প্রাচ্যের নন্দন কানন।

ক্লান্ত সন্ধ্যা নেমে আসছে দাল-হ্রদে। হরিপর্বতে আর শঙ্করাচার্যের চূড়ায় আরক্তিম আভা লেগেছে। হরমুখের দিকে বাদলের মেঘ দেখা দিয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস হু হু ক'রে বইছে ওদিক থেকে।

শঙ্কর হাসিমুখে এবার বিদায় নিল। এই মহিলাকেও যেতে হবে অনেকদূর।

আমিরা-কদল পেরিয়ে বাঁ দিকের বস্তিবাজার ছাড়িয়ে ময়দানের ধার দিয়ে আমাদের টাঙ্গা চলেছে রামবাগের দিকে শ্রীমতী মায়া বললেন, আজ রাত্রে আবার চিঠি লিখবো ওঁর কাছে, আমাদের বেড়াবার কথা জানিয়ে। আপনি কাল সকালে আমার ওখানে আসছেন ত?

সকালে নয়, দুপুরে।

বেশ, তাই আসুন। আমার বড় দুর্ভাগ্য, আপনি আর মাস দেড়েক আগে এলেন না। উনি ছিলেন,—আমরা সকলেই খুব আমোদে থাকতুম। উনি সকালে যান আপিসে, খাবার সময় আবার আসেন। ব্যস, সমস্ত দিন ছুটি।

বললুম, টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আসতে হুকুম করুন।

তবেই হয়েছে!—মায়া বললেন, এ যে মিলিটারির চাকরি, নিয়ম-নীতি অন্যরকম। উনি গিয়েছেন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে। এই পরীক্ষায় উৎরে গেলে একটু উন্নতির আশা আছে।

কাশ্মীরের তথা ভারতের বিমান বিভাগে বাঙ্গালী আছেন, এ সংবাদটি উৎসাহজনক। সত্যি বলতে কি, ভারত সরকারের দুটি বিশেষ বিভাগ প্রধানত বাঙ্গালীর হাতের তৈরী। একটি বিমান বিভাগ,—এটি প্রথম একদল সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর চেষ্টায় গোড়ার দিকে বেসরকারীভাবে বাঙ্গলাদেশে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। সে প্রায় ত্রিশ বছর হতে চললো। দ্বিতীয়টি হোলো, বেতার বিভাগ। এ বিভাগটি অনেকাংশে বাঙ্গালীর সৃষ্টি, এবং এটির জন্ম হয় কয়েকজন বেসরকারী বাঙ্গালীর চেষ্টায়,—তাঁরা সরকারী লাইসেন্স নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তোলেন। কিন্তু এর প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য ক'রে তৎকালে ইংরেজ শাসকদের টনক নড়ে, এবং তাঁরা একটি বিশেষ আইনবলে এই বেতার প্রতিষ্ঠানকে হস্তগত করেন।

রামবাগের পুল পেরিয়ে গাড়ী ঘুরলো ডান দিকে। এ পথটা সোজা গেছে শ্রীনগরের বিমানঘাটির দিকে। নীচে দিয়ে নদীর ধারা পাহাড়তলীর পাশ কাটিয়ে অন্ধকারে কোথায় চ'লে গেছে ঠাহর হচ্ছে না। যেখানেই যাক্ এ ধারা মিলেছে মূল বিতস্তায়।

মহারাজা গুলাব সিংয়ের সমাধি এবং শঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ মঠ'-এর পাশ কাটিয়ে টাঙ্গা এক সময় এসে পৌছলো সেই বসতি-বিরল বাগানবাড়ীর গেটের সামনে। গাড়ী থেকে নেমে শ্রীমতী গুপ্তা কথাটা পাকা করে নিলেন,—কাল জিনিসপত্র নিয়ে দুপুরের দিকে সোজা চ'লে আসবেন। কোনও সঙ্কোচ করবেন না।

আমাকেও একথা পাকা করে নিতে হোলো তিন চারদিনের বেশী আমার পক্ষে কাশ্মীরে থাকা আর সম্ভব হবে না। তাড়াতাড়ি আমাকে হিমাচল প্রদেশ ঘুরে দিল্লী ফিরতে হবে।

টাঙ্গা-গাড়ীর আলোটুকুতে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, সব কথার ওপরেও আরেক কথা আছে। সত্যি বলছি আপনাকে, লেখক মানুষকে কখনও দেখিনি। তারা কেমন, কিচ্ছু জানিনে। কেমন করে তারা বই লেখে, কেমন করে কল্পনায় সব আনে—ভাবলে অবাক লাগে। দাঁড়ান একটু, আগে আমি ভেতরে যাই। এই বলে তিনি ভীরু পদক্ষেপে ছুট দিলেন অন্ধকার বাগান পেরিয়ে ভিতর মহলে। সেখানে দোতালার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা—এবার যান—কাল কিন্তু আপনার জন্যে রান্না ক'রে রাখবো!

টাঙ্গা ছেড়ে দিল। আশ্চর্য, তখন আমার একটিবারও মনে হয়নি,

হিমালয়ের একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমার এই ভ্রমণে একটি নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি করবে।

*

* *

কাশ্মীরের আকাশে বাদলের ছায়া দেখা দিয়েছে। মেঘেরা ভেসে চলেছে পীর পাঞ্জালের কোলে কোলে, হরমুখ আর হরমহেশের চূড়ায় চূড়ায়, জাস্কার আর দেবশালীর স্তবকে স্তবকে। ছায়া পড়েছে বিতস্তায় আর সতীসায়রে—যার আধুনিক নাম হোলো ডাল হ্রদ।

হরমহেশের কৃষ্ণজটার অন্ধকারে গুরু গুরু ডম্বরুধ্বনি শোনা যাচ্ছে, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চিরকালের সর্বহারা সন্ন্যাসী নাঙ্গার রুদ্রনয়নের কচিৎ কালকটাক্ষ। অসুরনাশিনী চণ্ডী আর মহিষাসুরের রণডঙ্কা বেজে চলেছে হরমুখের কোলে কোলে। পাইন আর পপলারের অরণ্য মেঘের মধ্যে দিশাহারা হয়ে গেছে।

আজ জন্মাষ্টমী। আগস্ট ৩১, ১৯৫৩।

বাগানবাড়ির তাঁবু তুলে দিলেন হিমাংশু ওর মধ্যে আমাদের দুদিনের অনির্দিষ্ট এলোমেলো সংসারযাত্রা হ'ল একটু হাস্যকর। হিমাংশু চাকরি করেন কলকাতার ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে, সুতরাং তাঁর এই শাখা আপিসের বাগানে তাঁর যেন কতকটা নৈতিক অধিকার ছিল। কিন্তু এবাড়ীতে তিনি ভাত পেয়েছেন যত, বাজারের ফল ছিঁড়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী। এবার তাঁবুর কারবার বন্ধ করতে হোলো। আমরা পুনরায় খালসা হোটেলে গিয়ে বাসা বাঁধলুম। কথা চলছে, সুবিধামতো হাউসবোটের ঘর পেলেই হিমাংশু ডাল হ্রদের অগাধ জলে গিয়ে পড়বেন। কিন্তু আজ এবেলা আমি হিমাংশুর অতিথি, অপরাহ্নে চ'লে যাবো শ্রীমতী মায়ার ওখানে। ঠাণ্ডায় কনকনিয়ে উঠেছে শ্রীনগর।

ভ্রাম্যমাণ জীবনে হিমাংশুর মতো সুহৃদ সচরাচর মেলে না। সাধু ও সজ্জন ব্যক্তি রেলগাড়ীর কামরায় উঠে একটুখানি আরামের লোভে সহসা স্বার্থপর হ'তে থাকে—এ দেখা আছে। সর্বত্যাগী নাঙ্গা সন্ন্যাসী আগে ভাগে এগিয়ে একটি ঘাঁটি আগলানো বটবৃক্ষের নীচে আসন নেয়,—এও দেখা। এসব ছোট ছোট লোভ, ছোট ছোট স্বার্থ,—এসব ক্ষুদ্র দৈন্য অনেক বরেণ্য মানুষের প্রকৃতির মধ্যেও জড়ানো থাকে, যথাসময়ে এসব ত্রুটি ধরা

পড়ে দৃষ্টির অনুবীক্ষণে। এই প্রকার ক্ষুদ্রতা থেকে হিমাংশু অনেকটা মুক্ত। দুঃসাধ্য এবং দুস্তর পাহাড়ে তীর্থযাত্রাপথে মানুষের স্বার্থপরতা যেখানে অবশ্যম্ভাবী, সেখানেও এই ব্যক্তিকে দেখেছি। হয়ত তিনি সংসারধর্মী হ'লে এইসব গুণপনা কমে যেত।

অল্প অল্প বৃষ্টি নামলো মধ্যাহ্নের আগেই। কাশ্মীরে বৃষ্টির পরিমাণ বাংলা দেশের মতো নয়। মৌসুমী বায়ু আসে বটে পশ্চিম পাকিস্তান আর রাজস্থানের উপর দিয়ে। কিন্তু মরুভূমি ও শুষ্ক ভূভাগের উপর দিয়ে আসবার কালে সেই বায়ু যায় শুকিয়ে। সুতরাং অবশিষ্ট বায়ু পীর পাঞ্জালের দক্ষিণ কোল পেরিয়ে উত্তরপথে পৌঁছয় সামান্য। সেই কারণে পঁচিশ থেকে ত্রিশ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি কাশ্মীরে নেই। আজ দেখতে দেখতে বৃষ্টির সঙ্গে ঝাপসা আকাশ থেকে নেমে এলো ঠাণ্ডা হাওয়া। সে-ঠাণ্ডা আকস্মিক,—যেমন পাহাড়ে সচরাচর ঘটে,—কিন্তু তার ঝলক বড়ই উপভোগ্য। উপভোগ্য হলেও ভাবনার কারণ আছে বৈকি।

আমাদের হোটেলের ঠিক পশ্চিমে কয়েকটি দরিদ্র ঘরকন্নাযুক্ত একটি বস্তিপল্লী চোখে পড়ে প্রায় সারাদিন। সেখানে প্রতিবেশীমহলে বিবাদ বেধেছিল সকাল থেকে। ঘরোয়া বিবাদে মেয়েদের ভূমিকা যেমন সর্বত্রই প্রধান, এখানেও তাই কিন্তু সর্বপ্রকার উত্তেজনার মধ্যে কোনো কোনো মেয়েকে হাসতে দেখছি, এইটি হোলো কৌতুকের বিষয়। কাশ্মীরী 'বোলি' কাশ্মীরের বাইরে বিশেষ কেউ বোঝে না। কিন্তু এই 'বোলি'র উৎপত্তি হোলো মূল ব্রাহ্মী ও পরবর্তী 'শারদা' বা 'শার্দি বোলি' থেকে। এঁর সঙ্গে হিন্দি আর উর্দু দুই মিলেছে, যেমন মিলেছে ফার্সী। বাঙ্গলা দেশেও এই। 'মগ' বাঙ্গালাভাষা মিলেছে চট্টগ্রামে এসে। চাটগাঁর বাঙ্গালী পাশে দাঁড়িয়ে যদি পরস্পর আলাপ করে, আমার পক্ষে বোধগম্য হয় না। ব্রহ্মদেশে বসবাসকালে আমার এই অভিজ্ঞতা ঘটে। ময়মনসিংহ থেকে মেদিনীপুর অবধি বাঙ্গলা ভাষা বহুবার বদলায়। দার্জিলিংয়ে এবং দক্ষিণ নেপালে কান পেতে থাকলে শোনা যাবে বাঙ্গলা ভাষা বলছে হিন্দির মিশ্রণে। পশ্চিম-দক্ষিণ আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর আর মিথিলা, উৎকল আর মগের মুলুক, কোচবিহার আর দক্ষিণবিহার, তেজপুর আর ভোজপুর —বাঙ্গলা ভাষাই হেঁটে বেড়িয়েছে এর-ওর সঙ্গে গলা ধরাধরি করে। ভাষার স্বাস্থ্যসবলতা থাকলেই সে হাঁটে, পাঁচজনের হাত থেকে সে পাঁচরকম শব্দ নিয়ে নিজেকে অলঙ্কৃত করে। সেখানেই তার প্রাণশক্তি। যে-ভাষা তার জাতিচ্যুতির ভয়ে আলোবাতাসের পথরুদ্ধ ক'রে নিজের গণ্ডীর

মধ্যে মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকে, এককালে গিয়ে সে ভাষা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। ইংরেজ শুধু যে ইউরোপ আমেরিকায় ঘুরে-ঘুরে নিজের ভাষার শব্দসম্পদ বাড়িয়েছে তাই নয়, ভারতবর্ষীয় শব্দও সে আহরণ করেছে। ইংরেজি অভিধানে এর নমুনা আছে ভূরি ভূরি। বাঙ্গলা ভাষায় যে শতকরা প্রায় তেত্রিশ ভাগ আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দি এসে জায়গা পেয়েছে, এবং সাহিত্যে তাদের স্থান নির্দিষ্ট,—অন্ধ প্রাদেশিকতার আত্মাভিমানে সেকথা আমরা ভুলে যাই।

কাশ্মীরী 'বোলি' থেকে কাশ্মীরের কাব্যসাহিত্য এবং লোকসঙ্গীতের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল এককালে। এর থেকে মেয়েরা সৃষ্টি করেছে নাচের গান আর প্রণয়গীতি,—সেই গান অনেক সময় অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনায় পরিণত হয়েছে। ধানের মাঠে, দর্জির পাড়ায়, গয়লাদের ঘরে, মাঝিমাল্লার দলে, পসারিনীদের মজলিসে, ছুতোরের আড্ডায়, মজুরদের বস্তিতে,—দলবদ্ধ হয়ে লোকসঙ্গীত গায় মেয়ে আর পুরুষ। গান গাওয়া হয় আঁতুড় ঘরে আর অন্নপ্রাশনের উৎসবে। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে শিশু দোল্‌নায়।

বিরহিনী মেয়ে আকণ্ঠ অনুরাগে ডাক দেয় বিতস্তার এ প্রান্ত থেকে; "অরণ্যে অরণ্যে ধরেছে প্রস্ফুটিত মুকুল, হে প্রিয়, তুমি কি শোনোনি শুধু আমার সংবাদ? গিরিউপত্যকার তরসায়রে অগণ্য রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো,—তুমি কি আমার সংবাদ শোনোনি কিছু?"

ও প্রান্তের অরণ্য থেকে দয়িতের ডাক শোনা যায়, "মুক্তা এনেছি সাগর মথিয়া তোমার দন্ত সাজাতে, তোমার অধরে রক্তিম আভা আমার প্রাণের শোণিতে।"

বৃষ্টি নেমে এলো মধ্যাহ্নের পর থেকে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়-প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে,—যেমন শীলংয়ে, যেমন দার্জিলিংয়ে। তফাৎ এই, এখানে তুষারচূড়ারা খুব সন্নিকট, সেজন্য হু হু ক'রে বরফানি বাতাস নেমে আসে। নগরের উপরে তুহিনের একটি ছায়া পড়ে। অপরাহ্নের দিকে ফিরে এসে হিমাংশু প্রস্তাব করলেন, আকাশের চেহারা ভালো নয়, আপনার এখনই বেরিয়ে পড়া উচিত। দেরি করলে ভদ্রমহিলা বিব্রত বোধ করবেন।

বন্ধুবর মিঃ ধারের সঙ্গে বন্দোবস্ত হোলো এই যে, আগামীকাল সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন বক্সী গোলাম মহম্মদের ওখানে। তাঁর বাড়ীতেই আলাপচারী হবে। দু একজন মন্ত্রী ও কয়েকজন সরকারী

কর্মচারীও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। অতএব আজ আমার ছুটি। সুতরাং অধিককাল বিলম্ব না ক'রে আমি বেরিয়ে পড়লুম রামবাগের পথে। সন্ধ্যার তখন বিলম্ব নেই। সাপটে বৃষ্টি নেমেছে। ভিজে ভিজেই যেতে হবে।

রামবাগের পুল পেরিয়ে গুলাব সিংয়ের সমাধি ছাড়িয়ে যখন বড়জেলায় এসে পৌছলুম, তখন মেঘেরা নেমে এসেছে বিস্তৃত বন বাগানের পপলারের জটলায়। পথে জনমানব কোথাও নেই, বাগানবাড়ীর দরজা জানলা সব বন্ধ। দোতলার সামনের ঘরখানার সমস্তগুলি জানলাই কাঁচের শার্সির। তারই একটির সামনে শ্রীমতী মায়া দাড়িয়েছিলেন। টাঙ্গায় আমাকে আসতে দেখে নেমে এলেন। টাঙ্গার গাড়োয়ানের সাহায্যে মালপত্র গিয়ে উপরের ঘরে উঠলো। ঠাণ্ডায় হাত পা অবশ।

অভ্যর্থনাটা উচ্ছ্বাসপ্রবণ। সে কথা থাক। দুটি শিশুকে দেখছি, আর কেউ কাছাকাছি নেই। বাড়ীর নীচের পিছনদিকের ফ্ল্যাটে থাকেন আরেকটি বাঙ্গালী পরিবার, এ শিশু দু'টি তাঁদেরই। উপরতলার একটি অংশে থাকেন এক মারাঠি পরিবার, তাঁদের সাড়াশব্দ কম। এ ফ্ল্যাটে শ্রীমতী মায়া একা। তাঁর হেপাজতে এই দুটি ঘর। এ ঘরটি প্রায় একেবারেই শূন্য থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে এ ঘরে এসেছে একটি চারপাই, তার উপরে একটি তোষক এবং একখানা লেপ ও বালিশ।

শিশু মেয়ে দুটিকে খুব ভালো লাগছিল। তারা যেন এ তল্লাটে মরুভূমির মধ্যে এনেছে স্নেহছায়া। শিশুর মতো এমন নিঃসঙ্গতার অবলম্বন আর কিছু নেই। ওদের সঙ্গে বসে গল্প জুড়ে দিতে হোলো। শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, এখানে আপনার আড়ষ্ট হয়ে থাকার কিছু নেই। দাড়ান, বড্ড ভিজে এসেছেন আপনি, আমি চা ক'রে নিয়ে আসি।

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে ঝমঝমিয়ে। মেঘের দল নেমে এসেছে নীচের বাগানে,—ঝাপসা হয়ে গেছে সব গাছপালা। তখনও অতি সামান্য পরিমাণ দিনের আলো অবশিষ্ট রয়েছে, কিন্তু তার চেহারাটা ধূমল,—কেমন একটা অনৈসর্গিক আভা। যেন আদি সৃষ্টির উষাকাল। ঠাণ্ডা প্রচুর পড়েছে বাইরে। জানলার শার্সিগুলি ঝড়ের ঝাপটায় মাঝে মাঝে ঝন ঝন ক'রে উঠছে,—কিন্তু এত ঝাপসা যে, বাইরে কিছু দেখা যায় না। এ বাড়ীর উত্তর দিকে মাত্র একঘর বস্তি,—তার বাইরে চতুর্দিকে মাইলের পর মাইলের মধ্যে ঘনমেঘলুপ্ত পপলারের বিস্তৃত অরণ্যজটলা। সামনেই পাহাড়তলীর গা বেয়ে গেছে জলানদী বাবলাবনের নীচে দিয়ে। কোথাও জনমানব নেই।

দুরন্ত বায়ুর বেগ এবং মুষলধারা বৃষ্টি বেড়েই চললো। অন্ধ মূঢ় দিগ-

দিগন্ত সব একাকার। আকাশ ডাক দিচ্ছে মুহুর্মুহু তার বিদ্যুৎলতার ঝলকে। শিশু দুটির সঙ্গে গল্প জ'মে উঠলো।

এক পেয়ালা গরম চা এবং টোস্ট-অমলেট্ সহ শ্রীমতী গুপ্তা এসে ঢুকলেন। পরে ওঘর থেকে একখানা হালকা চেয়ার এনে নিজে বসলেন। বললেন, গুপ্ত সাহেব আমারই মতন সাহিত্যের খুব ভক্ত, শুনে রাখুন। তিনি থাকলে আজ ধেই-ধেই ক'রে নাচতেন। আপনার কথা জানতে চেয়ে আজও তিনি চিঠি লিখেছেন। সত্যিই বলছি, লেখক আমরা কখনও দেখিনি। এখন দেখছি আপনি ত' আমাদেরই মতন মানুষ।

উচ্চ হাস্যে তাঁর ঘর এবার মুখরিত হোলো।

ঝড়ের ঝাপটা লাগছে শার্সিতে। ঘড়িতে দেখছি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। সমগ্র কাশ্মীর বাইরে যেন লণ্ডভণ্ড হচ্ছে। পপলারের ঘন অরণ্য মহারাক্ষসীর মতো অন্ধ আক্রোশে মাথার চুল ছিঁড়ছে, তারই সেই হিংস্র নিশ্বাস ঝাপট দিয়ে যাচ্ছে শার্সির বন্ধ জানলায়।

এই হোলো হিমালয়ের দানবীয় বিপ্লব। ভয়াল করাল তুহিন ঝটিকা সর্বব্যাপী মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে ছুটে আসে চারিদিক থেকে,—গর্জনে, স্বননে, রণনে তার প্রলয় নাচন চরাচরের কোনও বস্তুকে ক্ষমা করে না। উড়িয়ে ভাসিয়ে তাড়িয়ে মাড়িয়ে যেন লক্ষ লক্ষ মত্ত হস্তীর মতো পর্বতে পর্বতে অরণ্যে অরণ্যে দাপাদাপি করতে থাকে। ভীত মানুষ আতঙ্কিত চোখে ওর দিকে তাকায়।

পরপদে মায়া আবার এলেন।—আপনাকে একলা বসিয়ে রেখেছি। বৃষ্টিতে সব মাটি হোলো। গতকাল আপনাদের ওখানে সারাদিন কাটলো, —ঘরকন্নার খোঁজ রাখিনি। আজ এই বৃষ্টি, পণ্ডিতের পাত্তাই নেই। কী যে অসুবিধে, বলতে পারিনে। কত যে কষ্ট হবে আপনার।

যে শার্সিটা এতক্ষণ বাতাসের ঝাপটে মাঝে মাঝে নাড়া দিচ্ছিল, এবার সহসা সেটি সশব্দে খুলে গেল। ঝড়বৃষ্টির যে উদ্দাম রণরঙ্গ বাইরেটা তোলপাড় করছিল, এবার হঠাৎ তারই একটা প্রবল ঝলক উন্মত্ত চেহারায় ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে আছাড় খেয়ে। উভয়েই আমরা হতবুদ্ধি,—পরক্ষণেই ছুটে গিয়ে শ্রীমতী গুপ্তা দুই পাল্লা এক ক'রে চেপে ধরলেন। বললেন, আপনার খাট-বিছানা একদম ভিজে গেল। কাঠের ছিটকিনিটা ভেঙে গেছে ঝড়ের ধাক্কায়,—এটা যা হোক ক'রে আটকে দিন ত? ওকি করছেন, খাটখানা দাঁড় করাচ্ছেন কেন? ওতে কি হবে?—তিনি প্রায় বিদীর্ণ হাস্যে ভেঙে পড়ছিলেন। বললেন, আপনি চেপে ধরুন, আমি দেখছি।

আমি গিয়ে জানলা চেপে ধরলুম। তিনি ছুটলেন ওঘরে। কিন্তু সহসা কোনো উপায় হোলো না। হাতুড়ি-পেরেক—কোথাও কিচ্ছু নেই। ইতিমধ্যে বায়ুর ঝাপটায় কতকগুলো চিঠিপত্র ছড়িয়েছে এখানে ওখানে, তাড়াতাড়ি পা লেগে চায়ের পেয়ালা ভেঙেছে ঝনঝনিয়ে—ঘর একেবারে ছত্রখান্। অবশেষে আমার নিরুপায় অবস্থা দেখে তিনি হেসে গড়াতে গড়াতে গিয়ে এনেছেন উনুন জ্বালাবার কাঠের টুকরো, আলুকাটা ছুরি, রান্নার খুন্তি এবং কাগজের কুটি। শার্সি বন্ধ করতে গিয়ে একেবারে নাস্তানাবুদ। এবার রাগ ক'রে বললুম,'এর পর আর কোনও অতিথিকে ডেকে আনবার আগে ছুতোর মিস্তিরিকে ডাকবেন!

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তিনি গা ঢাকা দিলেন।

কিন্তু খোলা জানলার ওই অবসরটুকুর মধ্যে বাইরের উদ্দাম অন্ধ চেহারাটা একবার দেখে নিলুম। ঝড়ের সমুদ্রে একদা ভ্রমণ করেছি বঙ্গোপসাগরের জাহাজে। নৈশসমুদ্র ছিল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। কালিঝুলিমাখা সেই দিগন্ত দোলার বিভীষিকা দেখে জ্ঞান হারিয়েছিল অনেকে. অনেকে সেই রেলিংএর মধ্যে শুয়ে প'ড়ে, অবশ্যম্ভাবী জাহাজডুবির প্রহর গুণেছে। আজ রাত্রে দেবতাত্মার চেহারায় দেখছি নটরাজের সেই রুদ্রতাণ্ডব,--তিনি তার এক অভিনব স্বরূপকে প্রকাশ করছেন। সমস্ত আকাশজোড়া অসুরশক্তির দাপাদাপি,—যক্ষ রক্ষ প্রেত পিশাচ দৈত্য দানব ডাকিনী শঙ্খিনী-সবাই নাচছে উন্মত্ত বিভীষিকায়। রাক্ষসরূপিণী রাত্রি এসেছে রুদ্রাক্ষ মহেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে। এপারে ওপারে পীর পাঞ্জাল আর হরমুখের কোলে-কোলে সর্বনাশিনী সেই মহাকালী আপন কালো এলোচুলের রাশি ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে পিশাচীনৃত্যের উন্মাদনায় দিগবিদিক জ্ঞানশূন্যা। ছিন্নমস্তা আপন মুণ্ড নিয়ে অন্ধকারে ছিনিমিনি খেলছে।

প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বেলা তিনটার সময় একখানা জীপগাড়ী এসে বাগানের দরজায় থামলো, এবং বর্ষাতি চড়িয়ে মিঃ ধার ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে এলেন। গাড়ীখানা সরকারী, এবং আসছে 'নারপিরস্থান' নামক এক পল্লী থেকে।' আমাকে এখনই যেতে হবে তাঁর সঙ্গে।

খবর পেলুম বৃষ্টির অবস্থা ভালো নয়, বিতস্তা আজ মধ্যাহ্ন থেকে ফুলতে আরম্ভ করেছে এবং পীর পাঞ্জালের সংবাদ উদ্বেগজনক। বাজার হাট আজকে

সবই বন্ধ। গতকাল কোন প্লেন আসেনি দিল্লী থেকে, এবং আজও এখান থেকে কোনও প্লেন ছাড়েনি। ডাক বন্ধ।

আন্দাজ তিন মাইল পথ। প্রতাপ সিং কলেজ ছাড়িয়ে ময়দানের পাশ দিয়ে গাড়ী এসে দাঁড়ালো সরকারী বার্তাবিভাগের আপিসে আমাদের পূর্ব পরিচিত বন্ধু মিঃ শর্মার ঘরের সামনে। তিনি এই বিভাগের সর্বময় কর্তা। এখানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করতে এঁরা বাধ্য করলেন। ঘণ্টা দুই পরে সেই বৃষ্টির মধ্যেই আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে আন্দাজ দেড় মাইলের মধ্যে একটি নিরিবিলি পথে ঢুকে বক্সী গোলাম মহম্মদের বাড়ীতে গিয়ে পৌছলুম। প্রহরা মোতায়েন রয়েছে আশে পাশে, কিন্তু সমস্তটাই বিস্ময়জনকভাবে অবারিত। সাধারণ ভদ্রলোকের একটি উদ্যানবাটী। যে কোনও শ্রেণীর লোক ঘুরছে যে কোনও ঘরে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপিসের এক বড়বাবুর কোনও পার্থক্য নেই। গাড়ীওলা, মজুর, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবক, মন্ত্রী—সব একাকার। আমরা বাঙ্গালী, ইংরেজ আমল থেকে লাট বেলাট আর মন্ত্রীর সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষী দেখে অভ্যস্ত। এখানে তার চিহ্নও নেই। শেখ আবদুল্লা মাত্র তিন সপ্তাহ আগে গদিচ্যুত হয়েছেন,—তিনি ছিলেন শের-ই কাশ্মীর। বক্সী গোলামকে বলা হয়, কাশ্মীরের 'লৌহমানব'। ইতিমধ্যে খবর শুনেছি, বক্সীজি চোখের জল ফেলতে ফেলতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃতদেহ নিজের কাঁধে নিয়ে গেছেন বিমানঘাঁটি পর্যন্ত এবং তাঁর নিজের একটি কন্যার নাম রেখেছেন, শ্যামা। তিনি বললেন, কাশ্মীর মানেই ভারতের একটি অংশ—যেমন হায়দরাবাদ, যেমন মণিপুর, যেমন ভূপাল। জম্মু কাশ্মীরে হিন্দু মুসলমান ব'লে কিছু নেই, আছে শুধু কাশ্মীরী। প্রজাপরিষদে অনেক মুসলমান আছেন,— যেমন ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সে ডোগরা আর পণ্ডিতের ছড়াছড়ি। সমগ্র কাশ্মীর তাঁর নখদর্পণে। মাঠে ঘাটে বাজারে--তিনি সর্বত্রগামী। কোথাও ঝগড়াঝাঁটি হ'লে তিনি আগেই গিয়ে হাজির, আপিসের কেরানি অসুস্থ হ'লে তিনি ওষুধ কিনে নিয়ে যান,—দোকানদারদের আড্ডায় গিয়ে তিনি একবেলা হয়ত গল্পই ক'রে এলেন। ফষ্টিনষ্টিতে তাঁর জুড়ি নেই, তিনি মাঠে গিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করলে সুরসিক শ্রোতারা হেসে লুটোপুটি। তিনি চিরদিন কর্মী আর স্বেচ্ছাসেবক ব'লেই সকলের কাছে পরিচিত। আজ হঠাৎ অতি পরিচিত ঘরের লোক প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, সেজন্য সবাই এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে।

রাত আটটার সময় বক্সীজির ওখান থেকে হাতচিঠা বেরুলো, সমগ্র

শ্রীনগর বন্যায় বিপন্ন। সাতটি অঞ্চলে বাঁধ ভেঙেছে, জল আসছে চারিদিক থেকে। কাশ্মীর সভ্যজগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কাশ্মীরের বেতারকেন্দ্র থেকে এই অশুভ সংবাদ ঘোষণা করা হোলো। শ্রীনগরের দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চল সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। শস্যক্ষেত্র ও গ্রামাঞ্চল জলে পরিপূর্ণ।

সেদিন সবান্ধবে পাশে দাঁড়িয়ে দেখলুম, কাশ্মীরের লৌহমানবকে। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি, অন্ধকার শ্রীনগর, তিনদিকের পাহাড় থেকে নেমেছে বন্যা, নদীনালা ও জলাশয় স্ফীতি বিস্তার লাভ করেছে, নগরের চারিদিকে বাঁধ ভেঙেছে। সেই শক্তিপরীক্ষার কালে অসীম আশ্বাস আর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পথে নেমে এলেন বক্সী গোলাম আর শ্যামলাল শরফ। বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝমিয়ে। না, মোটর নয়, জীপ নয়,— দলবল নিয়ে সেই তুহিন শীতার্ত রাত্রের অন্ধকারে পায়ে হেঁটে চললেন বক্সীজি,—পরণে তাঁর সামরিক পোষাক। আমরাই বা আশ্রয়ের মধ্যে থাকবো কেমন করে? আমরাও বেরিয়ে এলুম তার সঙ্গে এর নাম উদ্দীপনা, এরই নাম নেতৃত্বের প্রেরণা। পথে বেরিয়ে দেখি, চারিদিক জনহীন, যানবাহনবিহীন,—দুর্যোগের রাত্রে ঘরবাড়ীর জানলা দরজা সব বন্ধ। কিন্তু নগরবাসী কেউ জানলো না, তাদেরই প্রধানমন্ত্রী ছুটলো তাদেরই নিরাপত্তার জন্য। বৃষ্টিতে ভিজছেন বক্সী গোলাম, কিন্তু ওরই মধ্যে কাছে দাঁড়িয়ে দেখলুম, লৌহমানবের মুখে প্রতিজ্ঞার কাঠিন্য, দেখে নিলুম কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ। সুখ্যাতি করতে ভয় পাই, কারণ শেখ আবদুল্লা আমাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সে রাত্রের সেই বন্যাদুর্গতির নাটকীয় মুহূর্তকালে মনে হয়েছিল, এমন বলিষ্ঠচেতা, স্বাস্থ্যবান, ভঙ্গীহীন ও অশান্তকর্মা জননেতা সমগ্র ভারতে কম। লৌহমানবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য আমার পক্ষে এই প্রকার দুর্যোগেরই দরকার ছিল।

ছুটতে ছুটতে চললুম গাড়ির আড্ডায়। বৃষ্টি পড়ছে। গায়ে পটুর কোট এবং গরম প্যান্ট ভিজে থকথক করছিল। শেষ টাঙ্গাখানা অনেক তোষামোদের পর পাওয়া গেল। ওর ভয়, আমাকে পৌঁছে দিয়ে ওকে একা ফিরতে হবে এই অন্ধকার দুর্যোগে। সুতরাং তিনগুণ ভাড়া কবুল করলুম। গাড়ী ছোটে না, পাছে ঘোড়ার পা পিছলায়। আমিরা কদলের উপরে উঠে দেখি, পুলের পাশের দোকানগুলি জলে ডুবে গেছে, ঝিলমের জল উঠেছে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে। নদীর ধারের পাড় ভেঙে পড়ছে। আমার গাড়ী চললো পাশের বস্তির পথ ধরে ময়দানের দিকে।

সহসা অন্ধকারে দেখি, গাড়ীর দুই ধারে আতঙ্কিত জনতা ছুটছে বিপরীত দিকে। সঙ্গে গরু বাছুর ছাগল ভেড়া পুঁটলী বিছানা বাক্স। শিশুর দল নিয়ে ছুটছে মেয়ে, বালক বালিকা ছুটছে, বোঁচকা নিয়ে ছুটছে পুরুষ। শত শত, সহস্র সহস্র। কারো মাথায় কাঠের বোঝা, কারো কাঁধে ঘরবাঁধার সরঞ্জাম। প্রাণভয়ে ছুটছে বন্যার তাড়নায়—পাগলের মতো।

হাত অবশ হয়ে আসছে ঠাণ্ডায়। আরও এক মাইল এসে টাঙ্গাওয়ালা রামবাগ পুলের এপারে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ী আর যাবে না। পিছন ফিরে দেখি অনেকগুলো পেট্রোমাক্স জ্বলছে দূরে দূরে। বিপুল জলস্রোতের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একটি সম্পূর্ণ নূতন নদীর জন্ম হয়েছে। একশত বর্গমাইলব্যাপী গ্রামাঞ্চল ভেসে এসেছে। বক্সী গোলাম আর মন্ত্রী শ্যামলাল সর্বাগ্রে এসে পৌঁছেছেন। খবর পাওয়া গেল পূর্তবিভাগের দুইশত লোক, এবং পাশে আটশত কর্মী এখানে কাজে নেমেছে।

ওপারে যাবার আর কোনও উপায় নেই। [illegible] র অফিসার বললেন, আপনাকে মাথায় তুলেও পার করা যাবে না। [illegible] মাথা ছাড়িয়েও দশ ফুট জল। আপনি চলে যান, জল আসছে এদিকে।

কিন্তু আমাকে বড়জেলা[illegible] যেতেই হবে।

অসম্ভব। বড় লোক উপদেশ দি[illegible] [illegible] ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে নদী বইছে। আপনি আর দাঁড়াবেন না।

পা উঠছে না। উত্তেজনা চাপা [illegible] [illegible] [illegible] আমার লোক [illegible] ওদিকে।

ভদ্রলোক দৌড়ে গেলেন যাবার [illegible] [illegible] বলা হল না। ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিলেন। [illegible]

ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিলুম। হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইলুম।

রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে এমন সময় হঠাৎ আবার জলের ধাক্কা এলো। জল ছুটে আসছে সামনে। গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি আমাকে নিয়ে গাড়ীতে তুললো এবং আর একবার বিলম্ব না ক'রে এবং আমার আপত্তি না শুনে গাড়ী ছোটালো বিপরীত দিকে। তার জানা আছে এরকম ঘটনা। নিরুপায় হয়ে খাদ্যসামগ্রীগুলি তাকেই এক সময় উপহার দিলুম। সে যেন আমার আড়ষ্ট দেহটাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চললো।

ফিরে এসে খালসা হোটেলে উঠে হিমাংশুর ঘরের দরজা যখন ঠেললুম, রাত তখন বারোটা বেজে গেছে।

ঘুম চোখে দরজা খুলে তিনি অবাক।—এ কি, আপনি? ফিরে এলেন যে? মালপত্র কই? ইস— এত ভিজেছেন বৃষ্টিতে?

বন্যার খবর তাঁকে দিলুম। তিনি বললেন, বন্যা? সে কি? কোথায়? কই, কোনো খবর পাইনি ত? আসুন, আসুন—ভেতরে আসুন। ভিজে একেবারে গোবর। যত দুর্যোগ কি শুধু আপনার কপালেই ঘটে?

হিমাংশু আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ পশ্চিমের পথে আটাশ মাইল। পথ অতি মসৃণ এবং প্রাকৃতিক শোভায় মনোরম। কিন্তু মোটরপথ পাহাড়ে ওঠে না, টানমার্গ পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে চড়াইপথে ঘোড়া কিংবা পায়ে হাঁটা। চারিদিকে পীর পাঞ্জালের পাইন বন,—মাঝখানে নিরিবিলি গুলমার্গ। এই ক্ষুদ্র জনপদটি গলফখেলার জন্য পৃথিবীখ্যাত এবং সমস্ত চেহারাটা সংকেবী ধরনের, এবং এই নয় হাজার ফুট উঁচুতে যারা আসে, তারা ইউরোপীয় রুচি ও প্রকৃতি নিয়েই থাকে। বস্তুত কাশ্মীরের প্রকৃত সৌন্দর্যের পরিচয় আরম্ভ হয় শ্রীনগরের সমতা থেকে যত উঁচুতে ওঠো। সোনামার্গ, গঙ্গাবল, গান্ধারবল, মহাদেবচূড়া, বিষ্ণুসাগর, গড়সাগর, বলতাল জোজিলা অথবা কোলাহাইয়ের পথ, পহলগাঁও,— এরা হোলো নির্ভুল স্বর্গলোক। গঙ্গাবলহ্রদ কাশ্মীরী হিন্দুর গঙ্গাতীর্থ, —এটি ঠিক শেষনাগের মতো। তুষারনদী নেমে আসে উপর থেকে, সরোবরের বর্ণ নীলাভ থেকে সবুজে পরিণত হয়, সূর্যের আলোয় রঙ্গীন মেঘের টুকরো নেমে এসে ওর জলচুম্বন করে। জ্যোৎস্নায় অপার্থিব মায়ালোকে পরিণত হয়। কাশ্মীর এখানেই ভূস্বর্গ।

হরিপর্বতের দুর্গপ্রাকারের নীচে দিয়ে মোটরে যাচ্ছিলুম ক্ষীরভবানীর দিকে। সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী মায়া। অদূরে গান্ধারবল পর্বতের চূড়া, তার নীচে একদিকে ফতেপুর বস্তির দক্ষিণে আনছার হ্রদ—ওখান থেকে একটি প্রণালী চ'লে গেছে ডালহ্রদের দিকে। আমাদের পথের দুধারে সবুজ শস্যক্ষেত্রগুলি ফসলে এখন পরিপূর্ণ। মায়া আছেন অনেকদিন কাশ্মীরে, কিন্তু পহলগাঁও ছাড়া আর কোথাও তাঁর যাওয়া হয়নি। রৌদ্র ঝলমল করছে পথে ও প্রান্তরে। সেদিনের দুর্যোগে পাহাড়ে পাহাড়ে তুষারপাত ঘটেছে। মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে গেলেও বাতাস অতি স্নিগ্ধ।

বনময় একটি গ্রামের ভিতর দিয়ে গাড়ী এসে পৌঁছলো ক্ষীরভবানীর মন্দিরের কাছাকাছি। ভিতরে চেনার বৃক্ষগুলির ছায়া ঝিলমিল করছে। আশেপাশে সিন্ধুনদীর শাখা-প্রশাখা নানা প্রণালীপথে বয়ে চলেছে। ভিতরে

ঢুকে সহসা দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর দৃশ্য চক্ষে ভেসে ওঠে। মন্দিরপ্রাঙ্গণের তিনদিকে ক্ষীরসাগরের জলের প্রবাহ চলেছে। কোন কোন স্ফীতকায় চেনারবৃক্ষের কোলে বেদী বাঁধানো। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর হিমালয় পরিভ্রমণ কালে প্রত্যাদেশ পেয়ে এখানে আসেন এবং তাঁরই পরিচালনায় ও মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের চেষ্টায় এই তীর্থস্থানটি প্রতিষ্ঠালাভ করে। এখানে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্তি স্থাপিত, তার সঙ্গে আছেন পার্বতী, গণেশ ইত্যাদি। অনেকের ধারণা যুগলমূর্তিটি পাওয়া যায় মন্দিরসংলগ্ন কুণ্ডটির তল থেকে। কুণ্ডটি রেলিং দিয়ে ঘেরা। শোনা গেল, তিথি মাহাত্ম্য অনুযায়ী এই কুণ্ডের জল আপন বর্ণ পরিবর্তন করে। কখনও সাদা, কখনও বা লাল। মন্দিরের উত্তরপূর্বে একটি যাত্রীশালা। ক্ষীরভবানীর উত্তরে বিরাট পর্বত-প্রাকার।

আমাদের অপরাহ্ণকাল কেটে গেল সেদিন এখানে ওখানে। অনেক দেখা বাকি রয়ে গেল, অনেক দৃশ্য পিছনে প'ড়ে রইলো। এবার স্বর্গ থেকে বিদায় নেবার কাল উপস্থিত হয়েছে।

পরদিন হাউসবোটে গিয়ে হিমাংশুবাবুর নৌকাবাস দেখা গেল। একটি দিন কাটাবার পক্ষে বেশ ভালো। দূরে ও নিকটে পাহাড়, প্রাকৃতিক শোভা, ভাসমান দ্বীপ, শঙ্করাচার্যের মন্দির, হরিপর্বতের দুর্গ,— সব মিলিয়ে চমৎকার কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী বসবাস শান্তি আনে—এই আমার ধারণা। সেদিন হিমাংশুবাবু প্রচুর পরিমাণে অতিথিসৎকার করলেন, এবং আমরা 'শিকারা' ক'রে ফিরলুম। হাউসবোটের বন্দীদশার চেহারাটা আমার ভালো লাগেনি।

একদিন সন্ধ্যা ইম্পীরিয়ল ব্যাঙ্কে সাহেব আমন্ত্রণ ছিল। কয়েকজন স্থানীয় বন্ধু সেখানে জড়ো হয়েছেন মিঃ শরৎ শাস্ত্রধার ইত্যাদি। সেখানে পাওয়া গেল দুজন বিশিষ্ট বাঙ্গালীকে। একজন হলেন কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টেরই শিল্পবিভাগের পরিচালক, ডাঃ কানাই গাঙ্গুলি। ইনি আমার পুরাতন বন্ধু। তাঁকে পেয়ে কাশী ও কলকাতার পুরনো আড্ডার কথা উঠলো। তিনি যে এখানে আছেন জানা ছিল না, জানলে তাঁরই ওখানে হয়ত উঠতুম। অপরজন হলেন দামোদর ভ্যালী-কর্পোরেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, শ্রীএস মজুমদার, আই-সি এস। এঁর অমায়িক মিষ্ট আলাপে সেদিন সকলেই আনন্দ পেয়েছিলুম। এঁরই ভগ্নী হলেন শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী। শ্রীমতী মায়ার গল্প শুনে সেদিন দুঃখের মধ্যেও সবাই হাসছিলেন। পরে কানাইবাবু সেদিন সস্ত্রীক আমাদের হোটেলে এসে সুমধুর গল্পের আসর জমিয়ে তুললেন। ইম্পীরিয়ল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট মিঃ রায়সহ চার পাঁচটির বেশী বাঙ্গালী পরিবার সেদিন কাশ্মীরে ছিল

না। কোনও এক নিয়োগী পরিবার ওখানে আছেন, তাঁরা মোটর কলকব্জা ইত্যাদির ব্যবসায়ী।

কানাইবাবু সস্ত্রীক বিদায় নেবার পর জিনিসপত্র গোছগাছ আরম্ভ হোলো। চললো অনেক রাত পর্যন্ত। পরদিন আমরা বিদায় নেবো।

॥ ২ ॥

পীর পাঞ্জালের নীচে নীচে পথ। পথের নানা শিরা উপশিরা, নানান শাখা-প্রশাখা। এ গিরিশ্রেণীর মৃৎপ্রকৃতি বড় কোমল,—মাটির মোহমদির গন্ধে বিবশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বিবিধ বর্ণের পুষ্পসম্ভার। ওরা তৃণশয্যার নধর কোল পেয়ে আর জেগে থাকতে পারেনি। রঙ্গীন প্রজাপতি আর পতঙ্গরা প্রলাপগুঞ্জন করে চলেছে ওদের কানে কানে।

পীর পাঞ্জাল এত নরম ব'লেই পা প'ড়ে গিয়েছিল অনেকের। তারা কেউ ইন্দো ব্যাকটিরিয়া কেউ বা ইন্দো পার্থিয়। তার পর মার মার শব্দে এসেছে শক হুন তাতার, এসেছে গোটানি-ইসারকন্দি, উজবেকি আর কাজাক, এসেছে তুর্কি আফগান রক্তমাখা অস্ত্র হাতে নিয়ে—কিন্তু এই পীর পাঞ্জালে তাদের বিজয়রথের চাকা গিয়েছে ব'সে। তারা কেউ নেই আজ। সর্বগ্রাসী রাহু তাদের গিলেছে। সেই রাহু হোলো ভারতের চিরকালীন সংস্কৃতি। সেই রাহু আজও গিলছে একে একে সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিবাদ, ফাসিস্তবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ.—এদের ধাক্কায় ভারতসভ্যতার একখানি ইঁটও খসেনি। মোগলরা গেছে একশো বছর এখনও হয়নি, ইংরেজ গেল এই সেদিন, - মাথা ঠুকে গেল সবাই একে একে। কেউ সমাধিলাভ করলো মাটির তলায়, কেউবা পালিয়ে বাঁচলো। শক্ত ধাতু আসে বাইরের থেকে, কিন্তু এখানে এসে তারা গ'লে যায়। এবার সাম্যবাদের পালা। অধিকাংশ পৃথিবী যার ভয়ে কম্পমান, —ভারতের মাটিতে হয়ত তার এবার সমাধিলাভ ঘটবে। এরই মধ্যে 'পঞ্চশিলায়' মাথা ঠুকে রক্তগঙ্গা হচ্ছে সাম্যবাদ। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' পথ ভুলে যদি কেউ এসে পৌঁছয়, তার আর রক্ষা নেই। পীর পাঞ্জাল তার সকল বড় সাক্ষ্য।

উপরে হিন্দুকুশ আর কারাকোরাম, নীচের দিকে পীর পাঞ্জাল আর জাস্কার,—এই দুইয়ের মাঝখানে ভূস্বর্গ যেন মদালসা বিবশা দেহের বিহ্বলতা নিয়ে শয়ান—সাংঘাতিক প্রলোভনের মতো। ডাক দিচ্ছে সবাইকে ডাকিনীর মন্ত্রে। তার ফাঁদে পতঙ্গের দল এসেছে যুগে যুগে, কিন্তু পুড়ে খাক

হয়ে গেছে। এই মহাশ্মশান পীর পাঞ্জাল দাঁড়িয়ে দেখছে সেই অপমৃত্যু একটির পর একটি। অভিশপ্তা কাশ্মীর,—এর ওপর লোভের হাত যারা বাড়িয়েছে, তারা কেউ বাঁচেনি। চতুর ইংরেজও একদা ভয় পেয়ে একটু সরে দাঁড়িয়েছিল, এবং রণজিৎ সিংয়ের হাত থেকে কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিয়ে সে মহারাজা গুলাবসিংকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি ক'রে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়।

যেদিকে তাকাই, শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের স্বভাব আবহমান কাল থেকে। লোভ নয়, আসক্তি নয়, ধ্বংস ও দস্যুতা নয়,—সবাই এখানে এসে আসন নিয়ে ব'সে যাও তপোবনের নিভৃত শান্তিতে,—যেখানে হোমকুণ্ড জ্বালিয়ে ওঙ্কারধ্বনি উঠছে অবিরাম। এখানকার গবেষণাগারে চলেছে সকল দর্শনশাস্ত্রের পরীক্ষা। বৈদিক, বৈদান্তীয়, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, জৈন, খৃষ্টীয়, জরোথ্রুষ্টীয়, কনফুসীয়, ইসলামীয়—কেউ বাদ যায় নি। দিব্যজ্ঞানের মহা পরীক্ষায় ভারত হোলো পথ নির্দেশক। এখানে এসে শুধু জেনে যাও জীবনের ব্যাখ্যা, সত্যের ভাষ্য, ধর্মের নিহিতার্থ।

পাঠানকোট থেকে রেলপথ চ'লে গেছে যোগিন্দর নগরের দিকে অনেক দূর। এটি হিমালয়ের পশ্চাৎপথ, ছোট ছোট পাহাড়ের অধিত্যকার ভিতর দিয়ে রেলপথ গেছে। প্রথম অংশটা সমতল, তারপর লুপ-এর জটিলতা আরম্ভ হয়েছে।

রৌদ্রদীপ্ত প্রখর মধ্যাহ্ন। আমাদের বসনে ভূষণে লেগেছে পথের ধূলি ধূসরতা এবং ক্লান্তি। ওরই মধ্যে এক সময় প্রচুর পরিমাণ লটবহর গচ্ছিত রাখতে হোলো পাঠানকোট স্টেশনের ক্লোকরুমে। আহারাদি যেমন তেমন। অতঃপর মধ্যাহ্নে গাড়ী ছাড়লো। অজস্র ভোজ্যবস্তু ও মেওয়াফল জোগাড় করেছে নিত্য উৎফুল্ল মদনলাল। আমার জন্য এনেছে ধূমপানের ব্যবস্থা। এদিকে সৎবতী ও মায়া বসেছেন একরাশি আখরোট আর 'বাগুগোসা' নিয়ে, —ওদিকে মদনলাল সর্বদাই স্বাচ্ছন্দ্যসৃষ্টির জন্য ব্যস্ত। শিশুটি আছে দুই নারীর মাঝখানে,—আজ সে সুস্থ। ওরা ঠাণ্ডা সইতে পারে অনেক, কিন্তু গরমে কষ্ট পায়। মদনলালের পিতা হোলো বুঝি লুধিয়ানার এক রেশম ব্যবসায়ী মস্ত শেঠ। ছেলেটি অবাধ্য। বউ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশের সর্বত্র। বাপের কাজকারবারে ওর মন নেই। ছোট লাইনের গাড়ী চলেছে ধীর গতিতে। পাহাড়তলীর গরমে গুমোট দেখা দিয়েছে প্রখর রৌদ্রে।

ছোট ছোট বনময় পাহাড়ের চূড়ায় বাইরে আর কিছু দেখা যায় না। অনেকটা যেন নীচের দিকে প'ড়ে গেছি। মাইল পঁচিশেক পেরিয়ে পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। তবু পাহাড়তলীর খেতখামার নীলাভ আস্তরণ পেতেছে এখানে ওখানে। অপরাহ্ণ গড়িয়ে যাবার পর গাড়ী এসে পৌছলো জ্বালামুখী রোড স্টেশনে। এইখানে আমরা এ যাত্রায় রেলপথকে ছেড়ে দিলুম।

এ অঞ্চল পাঞ্জাবের মধ্যে। কিন্তু এর ভৌগলিক সীমা বড় জটিল। কাংড়ার উত্তরে হিমাচল প্রদেশ, কুলুর উত্তরে কাশ্মীর এবং দক্ষিণে হিমাচল প্রদেশ। শিমলা অঞ্চল পাঞ্জাবে অথবা হিমাচলে,—আজও স্থির হয়নি। যেমন ধরো ডালহাউসী। সবাই জানে, চাম্বার মধ্যে ডালহাউসী,—কিন্তু এই শৈলশহরটি পাঞ্জাবের শাসনাধীন। পেপসু, হিমাচল, কাংড়া, কুলু, চাম্বা,—এদের পরস্পর পৃথক মানচিত্র ছাড়া এদের সীমানা বোঝবার উপায় নেই।

স্টেশন থেকে জ্বালামুখী গ্রাম তেরো মাইল পথ। পথ নিরিবিলি। উঁচু-নীচু খোলার রাস্তা সঙ্কীর্ণ। এটা পাঞ্জাব, কিন্তু জনসাধারণ 'পাঞ্জাবী' নয়। মেয়েদের কপালে সিঁদুর, পুরুষের মাথায় লাল পাগড়ী। এরা জাতিতে শাক্ত। কুলুতেও এই, মণ্ডিতেও এই। পাঁচ ছয় শো বছর আগে পূর্বরাজপুতরা, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশে রাজনীতিক ভাঙন ধরেছিল। তাতার, পাঠান, আর মোগল,—এরা রাজপুতগণকে মাতৃভূমিতে স্থির থাকতে দেয়নি। তাই ওরা আপন সংস্কৃতি শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থাকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে আসে হিমালয়ের আনাচে কানাচে। হিমালয়ের আদিবাসী মহলে তখন ঠিক কি প্রকার চেহারা ছিল জানা যায় না। কিন্তু এই শত সহস্র রাজপুত পরিবার হিমালয়ের বহু অঞ্চলে গিয়ে আপন আপন সমাজ সৃষ্টি করে, এবং রাজ্যপাট বসায়। পেপসু হোলো প্রকৃত পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ হোলো প্রকৃত রাজপুত। এদেরই অংশ আবার ছড়িয়ে পড়েছে, কুমায়ুনে আর নেপালে। কাংড়ায় এসে দাঁড়ালে মনে পড়বে পার্বত্য উত্তরবঙ্গ কিংবা আসামের উপত্যকা। সেই মন্দির, সেই শক্তি পূজা, সেই শিবের আর ভৈরবের আরাধনা, সেই মেয়েদের কপালে সিঁদুর আর হাতে শাঁখা-নোয়া!

মাত্র তেরো মাইল পথ। কিন্তু বট আর অশ্বত্থের এমন সশ্রদ্ধ পূজা আগে দেখিনি। প্রতি বটের নীচে দেবস্থান, প্রতি অশ্বত্থের নীচে শিব। অতি যত্ন অতিশয় পরিপাটি। ছোট ছোট গ্রাম, কিন্তু কী শান্ত। রানীতালের ছোট্ট একটি হাট,—তাইতেই স্থানীয় লোকেরা খুশী। বেশী চায় না, উচ্চাভিলাষী

নয়, বিরোধ কোথাও নেই,—প্রাচীনের হাওয়া বইছে পাহাড়ী প্রান্তরের নীচে, আর শস্যক্ষেত্রের উপান্তবর্তী সরোবরে। পশ্চিম আকাশে রৌদ্র ম্লান হয়ে এসেছে।

আমাদের মোটরবাস মাড়োয়ারি ধর্মশালার প্রাঙ্গণে এসে থামলো। সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে জ্বালামুখীর 'কালীধর' পাহাড়,—ভারতের অন্যতম প্রধান পীঠস্থান। আশে পাশে সামান্য কয়েকটি দোকান, দুচার ঘর বস্তি। এদিকটা নিরিবিলি। গাড়ী থামতেই পাণ্ডা এসে দাঁড়ালো। এদিকটা নাকি শহরের বাইরে,—মন্দিরের ওদিকে না গেলে জনসমারোহ পাওয়া যাবে না। মায়া ধ'রে বসলেন, তিনি থাকবেন শহরের মধ্যে, সকলের আগে তিনি ধুলো পায়ে মন্দিরে প্রবেশ করবেন।

পাণ্ডা এইটিই চেয়েছিল। সেই সোৎসাহে নিজেরই উদ্যোগে কুলির সাহায্যে জিনিসপত্র নিয়ে অগ্রসর হোলো।

ঠিক সুনির্দিষ্ট একটা আশ্রয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম এমন কথা বলতে পারবো না। আমার আশঙ্কা ছিল, অপরিচিত পাণ্ডার কুক্ষিগত না হই। কারণ এসব স্বার্থের ক্ষেত্রে নানাবিধ অবাঞ্ছিত পরিণতি ঘটে। কিন্তু মুস্কিল এই আমি ঠিক পুণ্যকামী তীর্থযাত্রী নই। আবার এও অসুবিধা, সঙ্গী হিসাবে আমি একটু বেমানান শ্রীমতী মায়ার চেহারায় ও পরিচ্ছদে কিছু অতি আধুনিকত্ব। বর্তমান, চট ক'রে যেখানে সেখানে তাঁর পক্ষে গিয়ে ওঠা অসুবিধাজনক। পাণ্ডা চললো পথ দেখিয়ে। আন্দাজ আধ মাইল দূরে পাহাড়ের নীচে একটি ক্ষুদ্র জনপদ,—বাজারের ভিতর দিয়ে আমরা এক সময় এসে পৌঁছলুম এক গোলকধাঁধার মধ্যে এইটি পাণ্ডার বসতবাটী। যা ভেবেছিলুম তাই। অন্যের মুখ চেয়ে এখানে থাকা ভিন্ন গতি নেই। চারিদিক শুকনো, কোথাও জল নেই। অতি পুরনো ঘর-দোর,—আগল নেই, আব্রু নেই, আয়ত্তের মধ্যে কিছু নেই। সামনের উঠোনে ব'সে একজন স্ত্রীলোক—সম্ভবত বাড়ীর গৃহিণী,—কি যেন সেলাই করছিলেন। বাড়ীর উত্তর ও পূর্বাংশটা যেন সুড়ঙ্গের মতো। পিছনে সরু ছায়াচ্ছন্ন পথ।

জিনিসপত্র একটি ঘরে রেখে মন্দিরের দিকে চড়াইপথে অভিযান করলুম। 'কালীধর' পাহাড়ের উপরে মন্দির। ওখানে আছেন দেবী অম্বিকা এবং উন্মত্ত ভৈরব।

দক্ষযজ্ঞের বিপর্যয়ের পর সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে এ পথেও এসেছেন দেবাদিদেব শিব। বিষ্ণুচক্রের আঘাতে সতীর জিহ্বা এখানে খসে পড়ে। সেই জিহ্বা আজও জ্বলছে জ্বালামুখীর পাহাড়ের কয়েকটি ছিদ্রে এবং কুণ্ডের

মধ্যে। ছোটবেলায় মায়ের মুখে শুনেছিলুম গল্প। কিন্তু স্ত্রীলোকের জিহ্বায় যে এত আগুন জমা থাকে তা জানতুম না!

সরু একটি চড়াইপথ ধ'রে পাহাড়ের উপরে মন্দিরের অঙ্গনে উঠে এলুম। সূর্যাস্ত হয়নি, রাঙা রৌদ্র এসে পড়েছে মন্দিরে। মন্দিরের পারিপার্শ্বিক প্রাচীন নয়, সর্বত্রই নবনির্মাণের চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু যেটি মূল মন্দির, সেটি অনেককালের, তার অনেক ইতিহাস। কাছেই এক গুহার মধ্যে ঝরণার স্বচ্ছ জল এক কুণ্ড রচনা করেছে। রাজগৃহ কুণ্ডের কথাটা মনে পড়ে যায়। কুণ্ড পেরিয়ে অগ্রসর হলেই মূল মন্দিরে প্রবেশ দ্বার। এটিও গুহালোক এবং তারই মধ্যে পীঠস্থান। দেওয়ালে ছোট ছোট গর্ত,—এক একটিতে অগ্নিশিখা জ্বলছে। একটি দুটি নয়, অনেকগুলি। এখানে ওখানে এবং আরেকটি সুড়ঙ্গে কয়েকটি শিখা জ্বলছে। ভিতরের আবহাওয়াটি পবিত্র, এবং সন্দেহ নেই—একটি রহস্য অনুভূতি আনে। দেখতে পাচ্ছি সমগ্র পাহাড়টি অন্তরে অন্তরে ধাতবপদার্থে পরিপূর্ণ। গন্ধক, খড়িপাথর, ফসফোরাস,—এবং বিশ্বাস করি, আরও নানারকম ধাতব পদার্থ রয়েছে এর পাথর আর মাটির ভিতরে ভিতরে আমাদের দেশে আগ্নেয়গিরি নেই বটে অনেক পাহাড়ে তার উপাদানের অভাবও নেই। বদরিকাশ্রমে, গৌরীকুণ্ডে, রাজগৃহে, এবং আরও বহু জায়গায় অতি উত্তপ্ত প্রস্রবণ বেরিয়ে এসেছে পাহাড়ের সুড়ঙ্গলোক থেকে। কোথাও না কোথাও ধকধক ক'রে আগুন জ্বলছে পাথরের গভীর অন্তরে,—কেউ তার খোঁজ রাখে না।

একটি শিখা হাত দিয়ে নিভিয়ে দিলুম। কিন্তু ভিতরে যখন দাহ্যবস্তু সঞ্চিত রয়েছে, তখন সেই শিখা আবার জ্বলবে। বাইরের দিকে এক পাশে আরেকটি জলকুণ্ডের মধ্যে পাণ্ডা কি যেন নিক্ষেপ করতেই দপ ক'রে জলের মধ্যে একটি শিখা জ্বলে উঠলো। এটি কৌতুকজনক। ঠিক পেট্রলে যেমন আগুন লাগে, এও তেমনি। ওদের মধ্যে শ্রীমতী গুপ্তা ছেলেমানুষের মতন একটা নতুন কৌতুক পেয়ে গেলেন। তিনি বারম্বার শিখাটা জ্বালিয়ে দেখতে লাগলেন।

বাইরে পাহাড়ের রেখা চ'লে গেছে দূরদূরান্তর পর্যন্ত। দক্ষিণে অস্পষ্ট সমতল, তার পরে বিপাশা নদী চলে গেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। ভালো লাগছে এই অপরিচিত পৃথিবী,—এরা হিমালয়ের সর্বশেষ নিম্নস্তর। এরা হোলো তোরণ দ্বার, এখানে যাত্রা শুরু। উত্তরে রয়েছে বিশাল ধওলাধার পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণে বিপাশার পরপার থেকে সোলাসিঙ্গি অর্থাৎ শূলশৃঙ্গ গিরিমালা। এই দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যভাগ দিয়ে চলেছে বন্য বিপাশা। তার উত্তর ভূভাগ হোলো কাংড়া উপত্যকা এবং দক্ষিণ ভূভাগটি সুবিশাল পার্বত্য

মণ্ডিরাজ্য। উত্তর থেকে দক্ষিণপূবে শূলশৃঙ্গ গিরিশ্রেণী এক সময় বিলাসপুর রাজ্যকে নানাদিকে বেষ্টন করেছে।

মন্দিরের অঙ্গনটি অতি পরিচ্ছন্ন আধুনিক। একপাশে পাণ্ডাদের গদি, সেখানে পুণ্যকামীরা শ্রাদ্ধতর্পণের ব্যবস্থাদি করে। ওটা ব্যবসায়, ওটার রস পাইনে। সমগ্র মন্দিরের অঞ্চল তন্ন তন্ন করে দেখতে সময় গেল। সন্ধ্যা আসন্ন।

কিঞ্চিৎ পূজা দিতে হোলো বৈ কি। তবে প্রণামীটা এখন বাকি রইলো। পাণ্ডার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না বটে, তবে অল্পে মুক্তি পাওয়া যেতো না এখানে থাকলে। জিনিসপত্র পুনরায় নিয়ে পথে নেমে এসে কতকটা যেন স্বস্তি পাওয়া গেল। সন্ধ্যার পরে আবার এসে উঠলুম ধর্মশালায়।

অরণ্যসমাকীর্ণ কাংড়া উপত্যকার একটি অংশ হোলো জ্বালামুখী অঞ্চল। অতি ক্ষুদ্র এই জনপদটি গড়ে উঠেছে তীর্থমন্দিরটিকে কেন্দ্র ক'রে। এর বাইরে সময় চাষা-বর্ষাত এই অরণ্যলোকের কোনও নির্দিষ্ট সীমানা এদিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভীষণতায় জনশূন্যতায় এ অরণ্য প্রসিদ্ধ। হিংস্র শ্বাপদের অবাধ চলাফেরার পথ চলে গিয়েছে পাহাড়ের নীচে নীচে বিপাশার তীরে তীরে,—মণ্ডি আর বিলাসপুর রাজ্য। পশ্চিমে শূলশৃঙ্গ গিরিশ্রেণীর ভয়াল অরণ্যলোক, দক্ষিণে চলে গেছে হামিরপুরের পথ, সেখান থেকে 'আঘার' এবং অত পর সুন্দরনগর রাজ্যের শেষ সীমানা,—যেখানে বিলাসপুর ছেড়ে বন্য শতদ্রু শূলশৃঙ্গের দক্ষিণে এসে মিলেছে। এ হোলো অখণ্ড অবিভক্ত ভারতের হিমালয়ের সেই দুই হাজার মাইলব্যাপী তরাই অঞ্চল,—হিন্দুকুশের দক্ষিণ থেকে যার আরম্ভ, আসামসীমান্তের পূর্বাঞ্চলে, ব্রহ্মদেশ ও চীনসীমানায় যার শেষ। এখানে কেবল এই নিঃসঙ্গ বিজন অরণ্যের শীর্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অম্বিকা,—যিনি দুর্গা,—মহাচণ্ডী, যিনি অস্ত্রধারণ করে রয়েছেন অসুরনাশনের,—শত্রুহননে যাঁর দয়া নেই, ক্ষমা নেই, কৃপা নেই, মোহকজ্জল নেই। ওই অন্ধকার 'কালীধর' পাহাড়ের চূড়ার উপর থেকে তিনি ডাক দিচ্ছেন মহাভারতকে যুগ থেকে যুগান্তরে। সভ্যতার যজ্ঞ যারা পণ্ড করতে এসেছে, যারা ভারতের জনসংস্কারকে কলুষিত করতে চেয়েছে, তপোবনের দর্শনতত্ত্ব সাধনাকে যারা ইতিহাসের পর্বে পর্বে হিংস্রতার দ্বারা আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা পেয়েছে, ঐতিহ্যের অমৃতস্বভাবকে যারা আক্রমণ করেছে বারম্বার,—মহাচণ্ডী ডাক দিচ্ছেন যেন এখান থেকে,—তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করো। দৈব অহিংসাবাদের উপরে দাঁড়াও,—হিংস্রতাকে হনন করো। সেই হবে তোমার

সভ্যতার রাজসূয় যজ্ঞ, সেই হবে কল্যাণব্রতের শেষ বাণী। সংহারসাধিকা সেই দেবী অম্বিকার রণপিপাসা নিয়ে যিনি এই আদি অন্তহীন হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় ফিরছেন, তিনি এখানে শিব নন, সর্বমঙ্গলার কল্যাণের প্রতীক নন,—তিনি উন্মত্ত ভৈরব, তিনি দেবাদিদেব নন, মহারুদ্র, তিনি রুদ্রাণীর অমাকুন্তলরাশির সঙ্গে মিলিয়েছেন আপন মহাজটা ওই অরণ্যে অরণ্যে। এখানেও শিব ও শক্তির প্রকাশ।

তন্দ্রাজড়ানো এক প্রকার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলুম আকাশের ওই জ্বলজ্বলে বড় তারাটার দিকে—সম্মুখের কালীধর পাহাড়ের চূড়ায় যেটা জ্বলছে। সম্ভবত আমি জীবিত নই, চোখ দুটোর মৃত্যু ঘটে গেছে। ইচ্ছার আকারে দেহ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে প্রাণ,—আত্মার অশ্রান্ত ভ্রমণ-পিপাসা নিয়ে, নীলপদ্মের বিশ্বজোড়া অন্বেষণে ভ্রমর যেমন একাকী বেরিয়ে পড়ে। অন্ধকার থেকে অন্ধকারে সাগরে, প্রান্তরে স্বর্গে মর্ত্যলোকে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, সপ্তর্ষির সীমানায়, মহাব্যোমে, ব্রহ্মচেতনায়। ক্ষুধার্ত ভ্রমর ফিরছে একা একা আপন রহস্যপিপাসায়। বন্ধনহীন কিন্তু মুক্তিবিহীন—অস্তিত্বের আর চৈতন্যের কল্পে কল্পে তার নীলপদ্মের অন্বেষণে চলছে।

পরদিন প্রভাতে মোটরযানে বেরিয়ে পড়েছি।

বাণগঙ্গার তীরে তীরে পার্বত্যপথ। প্রাচীন পাথরের জটলা নেমেছে নীচের নদীতে। শরৎপ্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ বয়ে চলেছে দেওদারের বনে বনে। রাঙ্গারৌদ্র স্পর্শ করেছে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। নীচের দিকে এখনও ছমছমে ছায়ারবণ। আলো এসে পৌঁছয়নি।

আমাদের গাড়ী চলেছে পাহাড় পেরিয়ে এক অজানা থেকে ভিন্ন অপরিচয়ের দিকে। পৃথিবীকে নতুন ক'রে পাই নতুন পাহাড়ে এলে। বৃহতের দিকে যাবার আগে একেকটি তোরণদ্বার পেরিয়ে যেতে হয়। হঠাৎ পাওয়া যাচ্ছে শালের জটলা, হঠাৎ এসে দাঁড়াচ্ছে দলছাড়া শেগুন আর চীড়। দেখতে দেখতে একটির পর একটি গিরিসঙ্কট, দেখতে দেখতেই আকাশ তার দিগন্তের দ্বার খুলে দিচ্ছে। দক্ষিণ থেকে আমরা যাচ্ছি উত্তরে—যে দিকে ধবলাধার।

পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার সীমানা থেকে দক্ষিণ ভূভাগে আরম্ভ হয়েছে শিবলিঙ্গ পর্বতমালা,—এসেছে সোজা দক্ষিণে, এবং প্রসারিত হয়েছে পূর্ব হিমালয়ে। মধ্যোত্তর ভারতীয় হিমালয়ের প্রধান প্রবেশপথ খোলা এই

শিবলিঙ্গশ্রেণীর ভিতর দিয়ে,—এটি হোলো হিমালয়ের প্রথম স্তর। কাশ্মীর, উত্তর পাঞ্জাব, হিমাচল, যুক্তপ্রদেশ, নেপাল—সমস্ত ভূভাগই এই পর্বতশ্রেণীর দ্বারা প্রাকাররুদ্ধ। এই শিবলিঙ্গ পর্বতমালারই দ্বিতীয় স্তরে হোলো ধবলাধার গিরিশ্রেণী। কাংড়া, পালামপুর, ধরমশালা এবং যোগিন্দর নগরের উত্তরে হঠাৎ এসে দাঁড়াব অতি নিকটে এই ধবলাধার,—শ্মশানচারী উলঙ্গ সন্ন্যাসী যেন লোকসমাজে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। দেখলে ভয় করে—ওর সর্বাঙ্গে কোনও স্নেহ নেই, ছায়া-মায়া কিছু নেই—জন্মের থেকেই যেন সর্বহারা। সবুজের আভা নেই যেন ওর সর্বাঙ্গে, বর্ষায় বসন্তে ওর ভাবান্তর ঘটে না, ওর গোপনতা কিছু নেই, অরণ্যের কৌপীনও ধারণ করেনি। ও যেন আপন রুক্ষজটার ভিতর থেকে করালচক্ষু মেলে দুর্বাসার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কালের প্রহর গুণছে,—রুদ্রাক্ষের মালায় জপ করছে, কবে আসবে কালান্ত, কবে প্রলয়, কবে আবির্ভূত হবে দশম অবতার, তবে ছারপার হবে সৃষ্টি। ধবলাধারের বিশাল নগ্নতা দেখলে ভয় করে।

পাহাড়ের পর পাহাড় ছেড়ে এলুম, পিছনে রেখে এলুম বাণগঙ্গার অতলস্পর্শ খদ, আর অশ্রান্ত স্রোতগর্জন, রেখে এলুম দুর্ভেদ্য বনভূমির নৈঃশব্দ্য,—রেখে এলুম ওদের স্তবকে স্তবকে আনন্দের শিহরণ, প্রাণের জয়বার্তা।

পূর্বাহ্নে এসে পৌঁছলুম কাংড়ার মস্ত শহরে।

এটি একটু বড় শহর। সমতলের উপর অবস্থিত। কোর্ট কাছারি, ডাক ও তারঘর, আপিস-ইস্কুল, দোকান বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য,—নগর সভ্যতার প্রত্যেক উপকরণ বর্তমান। তবে সকলেরই আকার ছোট। আমরা শহর-সভ্যতার মানুষ,—এসব আমাদের চোখে পুরনো। বরং হিমালয় ভ্রমণকালে যদি সুযোগ-সুবিধা ও উপকরণের অভাবে অসুবিধায় পড়ি, সে সহ্য হয়, উপযুক্ত আহার এবং আশ্রয় না জুটলে দুঃখবোধ করিনে। কিন্তু শহরে এসে পৌঁছলে আমাদের দাবি বেড়ে ওঠে, আমরা সব চাই,—এবং না পেলে ক্ষুন্ন হই। শহরে কোনও উপকরণের অভাব ঘটলে আমরা রাগ করি।

একজন পাণ্ডা এলেন। বয়স্ক লোক, নাম মোতিরাম। জ্বালামুখীর পাণ্ডার নাম ছিল মোতিলাল। তার প্রতি খুব খুশী ছিলুম না। কিন্তু এই ভদ্রলোকের প্রসন্ন ব্যবহারে ভারি আনন্দ পেলুম। শ্রীমতী মায়া বললেন, মোতিরামজীর বাড়ীতেই চলুন, স্নান না ক'রে আর থাকা যাচ্ছে না। বড্ড রোদ।

আমাদের স্নানাদির পর মোতিরাম তাঁর খাতাপত্র এনে বসলেন। কোনও দাবি তাঁর নেই, প্রণামী পাবার জন্ম তিনি হাত বাড়াতে প্রস্তুত নন। আমরা

তাঁর এখানে আনন্দ পেলেই তিনি খুশী থাকবেন। খাতা খুলে তিনি একস্থলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর মাতাঠাকুরাণীকে নিয়ে একদা এই পাণ্ডার এখানেই উঠেছিলেন। সেটি সবিস্তারে লেখা রয়েছে দেখে ভারি আনন্দ পেলুম।

পাণ্ডাজী অতঃপর আমাদের নিয়ে চললেন মন্দিরদর্শনে। পথ একটুখানি চড়াই। এঁকে বেঁকে এদিক ওদিক ঘুরে আমরা বৃহৎ এক মন্দিরের চত্বরে উঠে এসে দাঁড়ালুম।

বাণগঙ্গা পেরিয়ে আসার পর থেকে একটি বিশেষ চেহারা লক্ষ্য করছি। সমগ্র কাংড়া উপত্যকাকে বাংলা দেশের আত্মিক বন্ধু বলে মনে হচ্ছে। পূজার্চনার রীতি পশ্চিমী নয়, ব্যবহারে, আলাপে সামাজিকতায়—বাংলাকেই দেখতে পাই। সাধারণত আমরা পাঞ্জাবে দেখি প্রধান দুটি দল। একটি বৈষ্ণব, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের উপাসক, অন্যটি শৈবশাক্তে মেলানো। শিখ ধর্মটা নতুন, ওটার বয়স কম। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ দীক্ষার মধ্যে ওটি সীমাবদ্ধ। মুসলমানধর্মে যেমন দেখা যায় বাইরের লোকের প্রবেশ অবাঞ্ছনীয়,—শিখধর্মেও তেমনি, প্রবেশ পথটি সাধারণের পক্ষে প্রশস্ত নয়। হিন্দুদের ব্যাপারটা ভিন্ন রকমের। যিনি বেদ বেদান্ত-উপনিষৎ-ষড়দর্শন পুরাণ পাঠ করেন, যিনিই ডুবে যান যোগ দর্শনে, জ্ঞানে ও সাধনায়,—তাঁকেও আমরা বলি, তুমি পরম হিন্দু। গায়ের জোরে কিংবা পুস্তক প্রসারে, করে হিন্দুরা তাদের স্বধর্মীর সংখ্যা বাড়াতে চায় না, ওটা তাদের ধাতেও নেই, জাতেও নেই। তুমি আমেরিকান, কিংবা রুশ, কিংবা ইংরেজ,-যেই হও, হিন্দুদর্শনের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ আছে, এই কারণেই তোমাকে হিন্দু মনে করি। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙকে পরম হিন্দু বলে অনেকেই মনে করে। গৌতমবুদ্ধ ছিলেন হিন্দুদর্শনের একটি পরমাশ্চর্য উদাহরণ—একথা কে অস্বীকার করবে? সমগ্র কাংড়ায় ঘুরে দেখছি বাঙ্গালীর শাক্ত ও বৈষ্ণব সংস্কৃতি পথে পথে ছড়ানো। উভয়ে আশ্চর্য মিল, একই সুরে বাঁধা। সুতরাং বাজারে, হাটে, আদালতের পাড়ায়, বস্তিপল্লীর আশে পাশে, খেলার মাঠে আর গৃহস্থ ঘরে,—কোথাও ঘুরে একথা মনে হয়নি, বিদেশে এসেছি। যেমন কাশ্মীরে। গ্রামের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াও—ঠিক বাঙ্গলার গ্রাম। কলাগাছে মোচা কিংবা কলার কাঁদি ঝুলছে। মাচানের ওপর লাউ,—ওলা। তার কাঁচালঙ্কার চারা। রোদ্দুরে ব'সে কাঁথা সেলাই,—একেবারে বাঙ্গলাদেশ। উনুন-পাড়ে মেনিবিড়াল, খামারে ছাগল, গরুর সামনে খুদসিদ্ধ পাত্র, ওপাশে গাঁদা আর সন্ধ্যামণির ঝাড়, সরোবরে শালুক, ছেঁচাবাঁশের বেড়ায় গোবরের

চাপড়া,—অবিকল বাঙ্গলা দেশ। কাংড়াতেও তাই। মেয়েরা কুয়ার পাশে মাথা ঘষতে বসেছে, পেয়ারাগাছে চড়ছে ছেলেমেয়ে, ছিপ নিয়ে জলের ধারে বসেছে কেউ, ধান ভানছে চালাঘরে, মুদির দোকানে জটলা চলেছে,—মনে হবে আমি ওদেরই একজন। পথে ঘাটে মানুষের চেহারায় কোনও উগ্রতা নেই,—সমস্তটাই যেমন নিরীহ, তেমনি নির্বিরোধ। পাঞ্জাবের অন্যত্র যাও,—যাও অমৃতশহরে, গুরুদাসপুরে, জলন্ধর কিংবা লুধিয়ানায়, ফিরোজপুরে কিংবা ভাতিন্দায়,—চেহারা অন্যরকম। কাংড়ায় এসে যেন পাঞ্জাব কোমল হয়েছে, প্রকৃতিতে এসেছে পেলবতা, মানুষের স্বভাবে এসে পৌঁছেছে শালীনতা।

সন্দেহ নেই, এরা রাজপুতনার রসবোধ এনেছে, কিন্তু পাঞ্জাবের রুক্ষতা পায়নি। সভ্যতার থেকে যতদূরে সরেছে মানুষ, তত সে সরল, ততই সে স্বকীয়। যান্ত্রিক সভ্যতা যে পোষাক পরিয়েছে মানুষকে, সেই পোশাকটি মানানসই হয়নি তার প্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে সকলের বড় ষড়যন্ত্র হোলো, একই ছাচে পৃথিবীকে ঢালাই করা। ভদ্র জাপানী আর ভদ্র মিশরীয়কে পাশাপাশি দাঁড় করাও,—একই জীবনযাত্রা, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক শিক্ষা, এক আশা আকাঙ্ক্ষা। দাঁড় করাও আমেরিকানের পাশে অস্ট্রেলিয়ানকে, ইংরেজের পাশে রুশীকে জার্মানের পাশে ফরাসীকে,—বিজ্ঞান সভ্যতা ওদের মধ্যে পার্থক্য রাখেনি কিছু। এসো ভারতবর্ষে,—অনন্ত বৈচিত্র্য আজও দেখতে পাবে। এসো হিমালয়ের পাদপর্বতে,—এই কাংড়ায়। এখানে মানুষ আপন স্বভাবধর্মে বিদ্যমান। এই দেওদার আর ঝাউবনের তলা দিয়ে, পাইনের আশ্চর্য নন্দনকাননের ধার দিয়ে—পথ যেদিকে হারিয়ে গেছে শৈলমালার ভিতরে ভিতরে, মানুষের স্বভাব সৌন্দর্য দেখে নাও। সভ্যতার স্পর্শ এদের মনে আজও লাগেনি ব'লেই প্রকৃত মানুষকে দেখতে পাওয়া যাবে। পোষাকে ব্যবহারে সামাজিক জীবনে—প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র।

একটি টিলা পাহাড়ের উপর ব্রজেশ্বরীর মন্দির। কয়েক রশি চড়াইপথ। সামনের মন্দির দ্বার একটু উঁচুতে। আমরা এসেছি গঙ্গার দেশ থেকে। ফুল আর চন্দনের সুগন্ধ যদি পাই, ত্র্যম্বকের বীজমন্ত্র যদি পূজার্থীর কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনি—আমাদের মনে প'ড়ে যায় দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গার কূল-প্লাবিনী তটসীমান্ত,—যার তীর থেকে উঠে গেল গৈরিকবাসা ভৈরবী জপ সেরে, ব্রাহ্মণ যার তীরে ব'সে মন্ত্রপাঠ করছে নিত্য, যেখানে ভারতসভ্যতা যুগযুগান্ত অবগাহন ক'রে পুণ্যময় হয়েছে।

পাণ্ডাজির পিছনে পিছনে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলুম। চূড়ার উপরে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। ইনি হলেন দেবী বজ্রেশ্বরী। সমগ্র কাংড়ায় জ্বালামুখীর পরেই বজ্রেশ্বরী হলেন প্রধান। পাহাড়ের নীচে খরতরা বাণগঙ্গা যেমন এই বজ্রেশ্বরীর পর্বতপাদ চুম্বন করেছেন, তেমনি এই মন্দিরের উত্তরলোকে তুষার-মৌলী ধবলাধারের কৃষ্ণাভ শৈলমালা প্রসারিত থাকার জন্য এই মন্দিরের উদার মহিমা ব্যক্ত হচ্ছে। মন্দির চত্বরে প্রবেশ করতেই চারিদিক থেকে হিমালয়ের মধুর বাতাস সর্বাঙ্গে তার স্নিগ্ধসান্ত্বনা বুলিয়ে দিয়ে গেল।

জ্বালামুখীতে দেখে এসেছি পাহাড়ের উপরে মন্দির রক্তবরণ,—অম্বিকা, তিনি শক্তির প্রতীক্। তাঁর উজ্জ্বলন্ত লোলাগ্নি রসনা সমস্ত ধাতব পাহাড়ের ফাটলের ভিতর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্চে। তাঁর মন্দির আছে, কিন্তু মূর্তি নেই। অগণ্য অগ্নিজিহ্বা যার,—তার বিগ্রহকে কল্পনা করো, চিত্রাঙ্কন করো মনে মনে। তাঁকে দেখে নাও সমস্ত পর্বতে, দেখে নাও তাকে চূড়ায় চূড়ায়। এখানে ভিন্ন কথা। এখানে বিগ্রহ রয়েছে, কিন্তু তার অভিব্যক্তি শান্ত। রুদ্রাণী নয়, পার্বতী। এখানে শান্ত শিব, শক্তি তাঁর বামে। এখানে ওখানে সেখানে—সর্বত্র দেবস্থান। যেমন কাশীর অন্নপূর্ণা। একবার প্রবেশ করো, অনেককে পাবে। যেমন উজ্জয়িনীর মহাকাল। একবার একটু নীচের দিকে নেমে যাও,—দেখবে অনেককে পাশাপাশি। যাও রাজস্থানে, কিংবা হরিদ্বারে, পুরীতে কিংবা দ্বারকায়, মান্দুবার কিংবা শিবসাগরে, অযোধ্যায় কিংবা গঙ্গাসাগরে, করাচীতে কিংবা চট্টগ্রামে। সবাইকে ধরে রেখেছে ভারত, কেউ বাদ যায়নি। কাংড়াতেও তাই। ইতিহাস বলেছে যাদের কথা — যারা ছিল সনাতন ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার যুগে, যারা ছিল বৌদ্ধ আর জৈন আমলে, তারা আছে কাংড়ার পাহাড়ে পাহাড়ে। কেউ আছে পাহাড়ের গায়ে খোদিত, কেউ রয়েছে গুহাগর্ভে, কেউ বা আছে মন্দিরে। মৌর্যবৌদ্ধ আমলে, গুপ্ত যুগে, হর্ষবর্ধনে, শক হুন-গ্রীকদের কালে, পাঠানে মোগলে, ওলন্দাজ-পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরেজের আমলে,—কাংড়া নিঃসঙ্গ থেকে গেছে আপন মহিমায়, আপন স্বকীয়তায়, আপন সম্মাননায়। কাংড়ার এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা'র চিত্রকলায়—যার নাম 'কাংড়া স্কুল অফ আর্ট।' স্থাপত্য আর ভাস্কর্যকে তারা সুন্দর করেছে, ললিতকলার ব্যাখ্যায় এনেছে আপন লাবণ্য, যার স্বাতন্ত্র্য সর্বদেশে স্বীকৃত। ভারতের অনন্ত বৈচিত্র্য, এখানেও তা'র অভিনবত্ব। কন্যাকুমারী থেকে পামীর; গান্ধার থেকে কৈলাশ, দ্বারকা থেকে ব্রহ্ম আর ইন্দোচীন; নেপাল থেকে যবদ্বীপ আর সুমাত্রা, ব্রহ্মপুত্র থেকে সিংহল,—এর নাম মহাভারত। এই অখণ্ড, অবিভাজ্য, অব্যয় ভূভাগকে আপন

ক্রোড়ভূমিতে ধারণ করে আছেন দেবতাত্মা হিমালয়, যাঁকে কাব্যে ও পুরাণে বলা হয়েছে কুলপর্বত, বলা হচ্ছে মেরু মান্দারমালাশোভিত হিমবান।

একা বসেছিলুম একটি নিরিবিলি পাথরের আসনে। শ্রীমতী মায়া ঘুরছেন এখানে ওখানে। পূজো দিচ্ছেন তিনি মন্দিরে, দক্ষিণা দিচ্ছেন ব্রাহ্মণকে। মোতিরাম আছেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। হঠাৎ সামনে আবির্ভূত হলেন সৌম্যকান্ত এক ব্যক্তি,—পরণে তাঁর কোটপ্যাণ্ট। আমাকে দেখেই তিনি কোলাহল করে উঠলেন সবাঙ্গবে। ইনি আমাদের বন্ধু এবং প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ। অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ, সন্দেহ নেই।

আপনি যে এখানে?

ঘোষ মশায় বললেন, বাঃ, আমি নেই কোথায়? যেখানেই যান, আমি আছি। আমার সরকারী চাকরিই তোলো, আমি সর্বত্রগামী। আসুন, আসুন, এ মন্দিরের পাথরের কাজগুলি একবার দেখে যান, আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

জন দুই অবাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন তাঁর সঙ্গে। নতুন মানুষ দেখে খুব উৎসাহ লাভ করা গেল। হরিচরণবাবু নিজে পণ্ডিত এবং সুরসিক। এখান থেকে বেরিয়ে তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করবেন। শ্রীমতী মায়ার সঙ্গে তিনি খুব গল্প আরম্ভ করে দিলেন। সাবার দল বাঁধলুম আমরা।

মন্দির চৌহদ্দির মধ্যে আরও কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঘোষ মশায় বললেন, থাক আর না। দেখেছেন বেলা হয়েছে কত? চলুন, একেবারে খাবারের দোকানে গিয়ে বসা যাক।

॥ ৩ ॥

বর্ষাশেষের বাদল ছুটে বাচ্ছে বণিশকাম্ব ধবলাধারের তুষারচূড়ায়,—মেঘে আর তুষারে একাকার। এমন বিস্তৃত হিমালয়ের কোথাও নেই। মাটির পথের অদূরে হঠাৎ উঠেছে ধবলাধার, যার উচ্চতা কমবেশী ষোল হাজার ফুট। ওই শৈলমালার ঠিক নীচে অন্তহীন ফসলের ক্ষেত, সমগ্র কাংড়ায় যেন সবুজ মখমল বিছিয়ে রেখেছে। তারই মাঝে মাঝে মিহি জরির ফিতের মতো চলেছে অসংখ্য স্রোতস্বিনী এঁকে বেঁকে, মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ছোট ছোট চাষীর ঘরকন্না আর দেবস্থান। পৃথিবী আশ্চর্য মনে হচ্ছে। পাইন আর দেওদারের বনরেখা যেন হৃৎপিণ্ডকে টেনে নিয়ে যায় বহুদূরে,—যেদিকে

উত্তর, পূর্ব আর পশ্চিম—তিনদিকে জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধবলাধারের বিশাল গিরিচূড়াদল। এখানে যেন ভারতের একটি ক্ষুদ্র মানচিত্র এঁকে রয়েছে।

পথ সমতল। একদিকে পাহাড়তলীর কোলে অফুরন্ত ফলের বাগান, অন্য দিকে প্রান্তর আর শস্যক্ষেত্র। কোথাও ছায়া নেমেছে অরণ্যের, কোথাও স্রোতস্বতীর নির্জন তীরে বটের ঝুরি নেমে এসেছে—মহাপ্রাচীন মুনি আপন মনে যেন গণ্ডূষ ভ'রে জলপান করছেন। কোথাও নেমে আসছে লাঙ্গুলের পাখী,—যারা হিমালয় ছেড়ে যায় না কোথাও। আমাদের দীর্ঘ ঋজু পথ বনবীথিকার মতো দূর থেকে দূরান্তরে চ'লে গেছে। রেলপথটি এসেছে পাঠানকোট থেকে জ্বালামুখী রোড এবং যোগিন্দরনগর হয়ে নাগরোটা পর্যন্ত। নাগরোটার পরে আর রেলপথ নেই। কিন্তু এ পারে বৈজনাথের পথ থেকে তার কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। আমরা চলেছি ছায়াবৃত বনময় পথ দিয়ে। মিসেস গুপ্তা স্থির হয়ে বসে রয়েছেন।

অপরাহ্ণ ম্লান হয়ে আসছিল। জনসমাগম এত কম যে বিস্ময় লাগে। মাঝে মাঝে পুরুষ দেখা যাচ্ছে,—মাথায় তাদের লাল পাগড়ি। স্কুল বালকের দল গান গেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দেখা পাওয়া যাচ্ছে তাদের, যাদের নাম 'গদ্দি'। তারা এখানকার মাটির সন্তান নয়। আপেলের রক্তিমাভা 'গদ্দি' মেয়ের গালে আর অধরে, বাঁকা নয়নে যেন বন্য অপরাজিতার কটাক্ষ, নধর পেলব কণ্ঠে প্রবালের মালায় পথিকের মৃত্যুর ফাঁস জড়ানো। সর্বাঙ্গে অলঙ্কার, কিন্তু সর্বাঙ্গ আবৃত। মাথায় রাঙ্গা ওড়না। কেউ বলে এরা মোঙ্গল রক্তের ধারা, কেউ বলে আদিম আর্যের অবশেষ। ছেলে ছোকরা পুরুষও তাই। রঙীন টুপি মাথায়, সাদা কম্বলের জোব্বা সর্বাঙ্গে, পশুলোমের ফেটি বাঁধা তাদের কোমরে। একটু সাবান মাখিয়ে একটু পরিচ্ছন্ন ক'রে দেখো, প্রত্যেকে রূপবান। অরণ্য থেকে ওরা পেয়েছে স্বভাব, ধবলাধারের কাঠিন্য থেকে পেয়েছে স্বাস্থ্য, পার্বতী নদীর বানক ঝঙ্কার থেকে পেয়েছে হাসির উল্লোল, এবং সভ্যতা-চিহ্নলেশহীন পার্বত্য প্রকৃতি থেকে ওরা পেয়েছে চিত্তের সরলতা। গরু ছাগল মেষ ও মহিষ—এদের চরানো হোলো ওদের পেশা। ওরা ফসল কাটতে আসে কাংড়ায়, কুটিরশিল্পের কাজ নেয়, রূপার অলঙ্কার নির্মাণ করে, পশুর লোম থেকে পশমের গুটি বানায়। এসব ছাড়াও ওরা মজুরী ক'রে যায় এদিকের নানা অঞ্চলে। তারপর আবার বেরিয়ে পড়ে অন্যত্র। ওরা যায় জাস্কার আর ধবলাধার গিরিমালার ভিতর দিয়ে লাহুল উপত্যকায়, কিংবা লাদাখ অথবা তিব্বত সীমানার পার্বত্য লোকে। ওরা কঠি 'গুজর'দের মতো। বাধাবন্ধ কিছু নেই, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার ছাড়পত্রের তোয়াক্কা

রাখে না। ওরা চিরকাল চেনে হিমালয়কে, রাষ্ট্রকে চেনেনা। কোন্ দেশ থেকে কাদের শাসনদণ্ড খ'সে পড়লো, কোন্ রাষ্ট্রের কোন সীমানা, কোন রাজশক্তির কি পরিচয়,- ওরা তাই নিয়ে মাথা ঘামায় না। পাহাড়কে ওরা চেনে, চেনে শুধু দুস্তর পথের সন্ধান— যেখানে সভ্যতার আনাগোনা কম। সূর্যের দক্ষিণায়ন ঘটতে থাকলে ওরা দেশ বদলায়, ঘরের খুঁটি উপড়ে নেয়, তল্পিতল্পা বেঁধে তুষারের গতি-প্রগতি লক্ষ্য ক'রে ওরা দল বেঁধে চলতে থাকে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। ওদের ওই যুগযুগান্তরের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ ক'রে সভ্য ও শিক্ষিত মানুষ পাহাড় অঞ্চলে জরীপ করতে লেগে যায় এবং মানচিত্র প্রস্তুত করে। ওরা ওই হিমালয়ের সংখ্যাতীত শাখাপ্রশাখার মধ্যে শত সহস্র মাইলব্যাপী যে সকল ঊর্ণনাভের মতো জটিল পথ চিহ্নিত ক'রে রেখেছে, তারই উপর দিয়ে চিরকাল ধ'রে অভিযাত্রীরা চলে। মুনিঋষি গিয়েছে, গিয়েছে দার্শনিক আর কবি, গিয়েছে তীর্থপথিক আর রাজভিখারীর দল,- গিয়েছে সবাই যুগ থেকে যুগান্তরে। ওদের পায়ের দাগ দেখে দেখে এসেছে তাতার আর মোঙ্গল এসেছে তুর্কী, ইরানী আর পাঠান, এসেছে শক আর হুন,—এসেছে উত্তর তিব্বতের মরুলোক আকলা মাকানের অগণ্য বিলুপ্ত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের প্রান্ত থেকে কত অনির্ণীত জাতির মানুষ। ওদেরই পায়ের দাগ পাহাড়ে পাহাড়ে খুঁজে বের ক'রে এসেছে ইরাবগন্দি আর সমর খন্দির দল। ওরা শীতে কাঁপে, তুষারঝঞ্ঝার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়, বরফের তলায় ওদের মুখের অন্ন আর কোলের শিশু চাপা পড়ে, পশুর লোমের অভাবে ওদের হাড় চামড়া বেরিয়ে আসে তুষার ক্ষত দেখা দেয় সর্বাঙ্গে,—কিন্তু তবু ওরা চন্দ্রভাগা আর বিপাশার নীচে নীচে ভারতের সুশ্যাম সমতলে নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রার মধ্যে নামতে চায় না, পাছে নিম্নলোকের বাতাবরণের চাপে ওরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে। কিন্তু আবার ওই বরফের রাজ্যে শ্বেতচ্ছায়াময় মৃত্যুলোকে যখন নব বসন্তের সংবাদ আসে কোনও অচেনা রঙ্গীন পাখী যখন ঋতুরাজের বার্তা বহন ক'রে হঠাৎ ডাক দিয়ে যায় নিস্তব্ধ পাহাড়ের কোলে, দেবতাত্মার জপ। শিথিল হয়ে নির্ঝরিণীরা দল বেঁধে নামতে থাকে,—একটি তৃণফলকের ডগায় যখন একটি কুঁড়ি বুকভাঙা যন্ত্রণায় মাথা নাড়া দেয়, তখন আসে ওদের জীবনে মিথুনলগ্ন। সুনীলনয়না ফেনবর্ণা কটাক্ষবতীরা আবার কানে তুলে নেয় ধাতব অলঙ্কার, রাশীকৃত কম্বল সরিয়ে কটিবাসখানি তুলে নেয় আপন মেখলায়, এবং পুরুষকে টান দিয়ে টেনে নেয় আপন স্বর্ণবৃক্ষের মরণশয্যায়। তারপর আবার দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে ভিন্ন পথে।

শ্রীমতী গুপ্তা স্তব্ধ চক্ষে ওদের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন। বাণগঙ্গা

পেরিয়েছি একাধিকবার। দূরে কাংড়ার দুর্গ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। যতদূর মনে পড়ছে, বেলা প'ড়ে এলো নাগরোটায় পৌঁছতে। ছায়াবৃতা নাগরোটা—তার ছায়ায় আর মায়ায় ছোট ছোট কবিতা যেন উচ্ছ্বসিত। এখান থেকে অরণ্যের শুরু,—এ অরণ্য চ'লে গেছে কাংড়ার প্রধান কেন্দ্র ধরমশালা পেরিয়ে। চেয়ে দেখছি স্বপ্নের মতো,—এ পথ সৌন্দর্যপিপাসুর পক্ষে অমরাবতীর মতো। বহুবার মনে করেছি যদি মৃত্যু হয় এই পথের কোথাও কোনও কোণে—সেই হবে আদর্শ মৃত্যু। কেউ জানবে না, বিশ্বাস করতে চাইবে না কেউ,—মৃত্যুর পক্ষে সেই হবে মহিমা। ওই অপরিচিত পৃথিবীর ওক আর পাইনবনের তলায়—যেখানে অন্তিম দিনমানের রক্তের আলপনা আঁকা হচ্ছে বনকুসুমের রঙে রঙ মিলিয়ে, পতঙ্গ প্রজাপতির দৌত্যগিরির পথে পথে। অপরিচয়ের মধ্যে মৃত্যু গৌরবের হয়তো নয়, কিন্তু আনন্দের। দেওদার বনের হাওয়ায়-হাওয়ায় ছড়িয়ে যাবে সেই বিরহপ্রলাপ, ঝাউ পাইনের শাখায় শাখায় উচ্ছ্বসিত হবে তাদেরই পরমাত্মীয়ের বিচ্ছেদ বেদনা। কেউ শুনবে না সেই মৃত্যুর ইতিহাস, কিন্তু তুষার তিত্তির আর শৈল-পারাবতের কণ্ঠে কণ্ঠে সেই বার্তা ধ্বনিত হবে, ধবলাধারের বিগলিত তুষারের শীর্ণ অশ্রুধারা নেমে আসবে ওই বাণগঙ্গায়। আমি ওদেরই অন্যজন। ওই যেখানে অবেলার করুণ ছায়া নেমেছে কান্নার মতো, যেখানে ঘুরে ঘুরে গেল ঘূর্ণী হাওয়ারা, নীলপাখী উড়ে গেল অরণ্য সচকিত ক'রে, ডাহুক যেখানে ওই শিশমের নিভৃত শাখায় বসে বিদীর্ণ কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে, আর ওই যেখানে শ্লেটপাথরের ছাদের নীচে 'গদ্দি'রা তাদের অস্থায়ী গৃহস্থালি বসিয়েছে,—ওদের সকলের মধ্যে আমি। আমার মধ্যে ওরা বাসা বেঁধেছে চিরকাল। আমার শাখাপ্রশাখায়, শিরাউপশিরায়, অন্ত্রে মন্ত্রে, শোণিতে-ধ্বনিতে আমার অস্তিত্বে আর সত্তায়—ওদের চৈতন্য কাজ ক'রে গেছে কাল-কালান্ত।

পালামপুরের চা-বাগান পেরিয়ে চলেছি। এবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মানুষের আনাগোনা, দোকানপাট আর কাজ-কারবার। এক-একটি মানুষ—যাদের দেখছি দুজনে একান্ত অনিমেষচক্ষে, তারা যেন অনাদি-অনন্ত কৌতূহলের প্রতীক। ওরা যেন বহন করছে ধবলাধারের অনন্ত রহস্য, সমস্ত কাংড়ার বিস্ময় প্রকৃতি। বিরোধ কোথাও নেই, কিন্তু স্বচ্ছ আনন্দে মুখর। অদূরে একটি ছায়ানিভৃত জলাশয়ে একই সঙ্গে ফুটেছে শ্বেত ও রক্তপদ্ম। একটি 'গদ্দি' শ্রমিক মেয়ে ঘাটের ধারে লজ্জাবরণগুলি রেখে অবগাহন ক'রে উঠে এলো। ভ্রূক্ষেপ করলো না কোনও দিকে, কিন্তু আপনাতে আপনি

উৎফুল্ল। মাথা ডোবালো না, পাছে বেণী বিপর্যস্ত হয়। এমনি ক'রে স্নানই ওদের সাধারণ রীতি। রাজস্থানে, কাশ্মীরে, গুজরাটে, গাড়োয়ালে, নেপালে,—যেখানেই শ্রমিকনারী, সেখানেই এই। একটি মাত্র মোটা পোষাক ওদের সম্বল,—সেটি জলে ভেজালে কোনমতেই ওদের চলে না।

বহুদূর পর্যন্ত সমতল, তারপর পথ উঠছে ধীরে ধীরে। সবুজ প্রান্তরকে বাঁ দিকে রেখে এগিয়ে যাচ্ছি। চোখ ছাড়া পেয়েছে। এবার দেখতে পাচ্ছি বহুদূর, মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ধবলাধারের পাদভূমি। বন ও কান্তার ওরই কোলে গিয়ে মিশেছে। ওখান থেকে বেরিয়ে আসে নানা জন্তু,—তুষারবাসী পার্বত্য চিতা, পিঙ্গল কৃষ্ণ ভল্লুকের পাল এবং দাঁতাল হরিণ। ওখান থেকে নেমে আসে বনহংস, পাথরের কোটরে যারা বাসা বাঁধে। আর আসে শৈল-পারাবত আর পাহাড়ী মোরগ। আমাদের গাড়ী ঘুরে চলেছে অনেক দূর।

বন্যা এসেছিল কিছুদিন আগে ধবলাধারের পাঁজর থেকে। সেই বন্যায় ভাঙন ধরেছে যোগিন্দরনগরের রেলপথে, গ্রাম ভেসে গেছে, পাহাড় ধ্বসেছে, ফসল নষ্ট হয়েছে। পাহাড়ের বন্যা বিশ্বাসঘাতিনী। আগে থেকে নোটিশ নেই, হয়তো আকাশ জ্যোৎস্নাহসিত তারকাখচিত, হয়তো বা দিনমানের নির্মেঘ আকাশে সূর্য জ্বলছে—এমন সময় হঠাৎ এলো বন্যা সর্বনাশা। এর কারণ, পাহাড়ে বৃষ্টি হয়ে গেছে পূর্বদিন সে খবর কেউ রাখেনি। সমস্ত পাহাড়ের ইতিহাস এই। বর্ষা নামেনি, কিন্তু বন্যায় বিধ্বস্ত হচ্ছে পাহাড়তলীর গ্রাম ও শহর যেমন নেপাল থেকে নামে কোশীর বন্যা, ভূটান থেকে শঙ্কোস, সিকিম থেকে তিস্তা, পীরপাঞ্জাল থেকে বিতস্তা, কুমায়ুন থেকে সরযূ, তিব্বত থেকে ব্রহ্মপুত্র এই সকল ভূভাগের ঠিক নীচে যারা থাকে তারা চিরদিন ত্রস্ত। শুধু যে পর্বত প্রমাণ জলের দেওয়াল নীচের দিকে ছুটে আসে তাই নয়—এর সঙ্গে ভেসে আসে এক একটি গ্রাম, বিরাটাকার পাথরের চাংড়া হাজার হাজার টন ওজনের পাহাড়ের ধ্বস, উন্মূলিত বড় বড় বৃক্ষ। ধ্বংস আর মৃত্যুর সেই ভয়াবহ বজ্র গর্জনের মধ্যে শোনা যায় নিরুপায় পাখীর আর ঐরাবতের অন্তিম ডাক, বাঘ আর ভালুকের কান্না, অজগর সাপের দাপট এবং তাদেরই সঙ্গে ভাসমান মানুষের বুকফাটা চীৎকার। কেউ বাঁচে না সেই বিভীষিকায়, কিন্তু যদি কোন কোন জন্তু সেই প্রকৃতির সাংঘাতিক তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়—তবে সে ক্ষিপ্তোন্মত্ত হয়ে নিকটবর্তী গ্রাম ও বস্তিকে আক্রমণ করে এবং নিরীহ গ্রামবাসীর উপরে প্রতিশোধ নেয়। সেই বন্যা যখন চ'লে যায়, এবং পার্বত্য

প্রপাত যখন শান্ত হয়ে আসে, দেখা যায় শত শত বন্য জন্তুর গলিত বিকৃত মৃতদেহ স্রোতের পাথরের আশেপাশে ছড়ানো। হস্তী গণ্ডার ব্যাঘ্র ভল্লুক হরিণ,—কেউ বাদ যায়নি। তাদের সঙ্গে মেলানো আছে মানুষের আর অজগর ময়ালের শবদেহ। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভূটানের ভাঙনে প্রায় দুই হাজার বড় বড় জন্তু, মানুষ এবং সংখ্যাতীত সরীসৃপ বিনষ্ট হয়েছিল।

বৈজনাথে এসে পৌঁছলুম। তখনও ঠিক সন্ধ্যা হয়নি।

বাজারের কাছে এসে বাস থামলো। পথের দুই পারে কয়েকটি সাধারণ দোকান, দুচারটি ব্যবসায়ীর গদী। শহরটি ছোট, এবং এই রাজপথটির বাইরে গেলে কয়েকঘর বসতি ছাড়া আর বিশেষ তেমন কিছু নেই।

অদূরে বৈজনাথের প্রাচীন মন্দির। কিন্তু মন্দির দর্শনের আগে আমরা মদনলাল ও সংগতীর খোঁজখবর করতে করতে মালপত্রসমেত ডাক বাংলোয় এসে পৌঁছলুম। ডাক বাংলোটি হোল পাহাড়ের নিরিবিলি একটি কোণে। এটির স্থান নির্বাচনটি বড়ই মনোরম। বারান্দার ঠিক নীচে ক্ষীরগঙ্গা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। পার্বত্য নদী পাহাড়ে পাহাড়ে মাথা কোটে, কিন্তু সে জানে না তার এই আঘাতে আর অপঘাতে কী অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি হতে থাকে। এটি অনেকটা পাহাড়ের চূড়ার উপরে মালভূমির মতো। ক্ষীরগঙ্গা ঘুরেছে উত্তর থেকে পশ্চিম এবং অবশেষে দক্ষিণে। ওপারে একটি পাহাড়ের উচ্চ শিখর এবং দূর পূর্বে গিরিশ্রেণীর গা দিয়ে চড়াই পথে উঠে গেছে মণ্ডিরাজ্যের সীমানা। কাংড়া উপত্যকা এখানে প্রায় শেষ।

মালপত্র নামিয়ে কুলি যখন বিদায় নিল, লক্ষ্য ক'রে দেখা গেল এই ডাক বাংলোরই উদ্যানের অপর প্রান্তে একখানা প্রাইভেট মোটর দাঁড়িয়ে। সম্ভবত কোন রাজকর্মচারী হবে। কিন্তু ওদিক থেকে কিছুমাত্র সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এমন সময় চৌকিদার এসে দাঁড়ালো সেলাম ঠুকে। যেমন সর্বত্র, এখানেও তাই। বসবাসের বিলাস কলকাতার গ্রাণ্ড হোটেলের মতো। এই নিঃসঙ্গ এবং নিভৃতলোকে যারা এমন সুন্দর আবাসগৃহ বানিয়েছে, তাদের সুরুচি এবং সুবিবেচনার প্রশংসা করি। ঘরগুলির কোলে সুন্দর বারান্দা।

আকাশে আবার মেঘ করেছে। কোন কোনো পাহাড়ের উপর বিদ্যুতের ঝলক দেখা যাচ্ছে। অদূরে সেই মালভূমিরই প্রান্তে একদল ছেলে খেলা করছিল, আকাশের চেহারা দেখে তারা মাঠ ছেড়ে ঘরের দিকে রওনা হোলো। বারান্দার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বাগানের সেই ওদিকে মোটরখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু কোথাও মানুষের সাড়াশব্দ নেই। বাস্তবিক, পাহাড় ও নদীর ধারে এমন নিভৃত এবং নিঃসঙ্গ ডাকবাংলো খুব কমই

দেখেছি। ওই খেলার মাঠের প্রান্তভাগে একটি সরুপথ একে-বেঁকে বৈজনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে গিয়ে পৌঁছেছে। মেঘের চেহারা দেখে মন্দিরের দিকে যাবার উৎসাহ আসছে না।

অনেক রাত্রে চৌকিদার ওরফে খানসামা ওরফে বাবুর্চি বাসনপত্রগুলি মেজে-মুছে গুছিয়ে রেখে বিদায় নিয়ে গেল। ওরা সবাই যে যার নেয়ারের খাটিয়া আশ্রয় ক'রে ঘুমিয়েছে। একটু আগে বৈজনাথের মন্দিরে ঘণ্টার শব্দ থেমে গেছে। আজ আর মন্দিরে ঢোকা হোলো না, কাল যথাসময়ে যাবো।

পাহাড়ে পাহাড়ে শব্দজগৎ একেবারে স্তব্ধ। সামনের বড় পাহাড়টা দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধকারে অতিকায় দানবের মতো। অমাবস্যার কাছাকাছি,—শুধু তারকারা জ্বলছে। সন্ধ্যার দিকে মেঘলা ছিল, এখন আকাশ পরিষ্কার। ক্ষীরগঙ্গা নীচে দিয়ে চলে গেছে অনেক দূর,—দুদিকের দুই অংশ তার মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে,—অনেকটা যেন আমার অতীত ও ভবিষ্যতের মতো। বুঝতে পারা যাচ্ছে শক্তি এসেছে ক'মে, বয়স যাচ্ছে ফুরিয়ে। বাকি রয়ে গেছে এখনও অনেক পাহাড়,—অনেক স্বর্গ আজও দেখা যায়নি। ক্লান্ত পা টেনে-টেনে চলছি, কেমন যেন উপলব্ধি করছি, সময় এবার ফুরিয়ে এলো। অনেক বাকি রয়ে গেল, অনেক ক্ষুধার তাপ গেলো না। পাথরের পাঁজরে পাঁজরে আমার নিশ্বাস আর নৈরাশ্য ছুঁয়ে রইলো, চিরতুষারের প্রত্যেকটি ধবলশিখরে প্রণাম রেখে গেলুম, ওরা মনের সামনে রয়ে গেল দেবসিংহাসনের মতো। একথা ব'লে যেতে পারবো, আমার পথহারা প্রাণ হারিয়ে গেছে হিমালয়ে বারম্বার। হারিয়ে গেছে কালী আর কর্ণালীর তীরে তীরে, শারদা সরযূ আর অলকানন্দার কূলে কূলে, বিষ্ণুগঙ্গা-মন্দাকিনী আর ভাগীরথীর তটে তটে। অমরাবতী থেকে সিন্ধু, অরুণ থেকে সপ্তকোশী, নীলধারা থেকে নীলগঙ্গা, চন্দ্রভাগা থেকে রামগঙ্গা, আমার অণুপরমাণু ছড়িয়ে রইলো সকল হিমালয়ে। আগামীকালের যারা তীর্থপথিক, যারা অভিযাত্রী, যারা মুমুক্ষু, যারা আত্মার অভিব্যক্তিলাভের ক্ষুধায় অস্থির হয়ে চ'লে এসেছে, যাদের দৃষ্টি চিরবিরহ-বেদনায় বিষণ্ণ, পরম পিপাসার জন্য সংসারের কোনও ক্ষেত্রে যারা মানানসই হয়নি,—তাদের জন্য রইলো আমার ওই চূর্ণবিচূর্ণ বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ। তারা পদদলিত ক'রে যাবে, এই আমার আনন্দ।

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লুম ডাকবাংলোর খেলাঘর ফেলে। ওরা আঘাত না পায় সেদিকে চোখ ছিল। ভয় ছিল মনে, পাছে আমার তিলমাত্র

বিরক্তি প্রকাশ পায়। ঘরকন্নাটা অস্থায়ী বটে, এবং ওটার আয়ু বড় জোর ছত্রিশ ঘণ্টামাত্র, কিন্তু ওটা বেমানান ব'লেই ভালো লাগছিল না। আমি চাইছিলুম বুনো পাথরের গন্ধ, যে গন্ধটা জড়িয়ে থাকে লতাগুল্মে আর চীড় দেওদারের বনে, যেটা মিলিয়ে থাকে গিরিনদীর শৈবালাচ্ছন্ন পাথরের তলায় তলায়,—সে গন্ধ ডাকবাংলোর ঘরের অজস্র তৈজসপত্রে আর বিলাসসামগ্রীর মধ্যে নেই।

ডাকবাংলোটি যারা নির্মাণ করেছে, তাদের সৌন্দর্যবোধ এবং সুরুচির তারিফ করি। এটি পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু একটি ত্রিকোণ পেয়েছে। তলা দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীরগঙ্গা, এবং ওপার দিয়ে এসেছে রেলপথ। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন আগে প্রবল বন্যা নেমেছিল ক্ষীরগঙ্গা এবং বাণগঙ্গায়—তারই জলের ধাক্কায় ভেঙেছে পাহাড়ের গা এবং লোহার লাইন। ফলে লাইন ঝুলছে উঁচুতে সঙ্কটজনকভাবে, গাড়ী চলাচল বন্ধ। এখান থেকে যোগিন্দরনগর নিকটেই। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় মাইল পনেরো হবে। যোগিন্দরনগর তার জল বিদ্যুৎ সৃষ্টির জন্য একপ্রকার পৃথিবীপ্রসিদ্ধ বলা চলে। ধবলাধার পর্বতের ভিতর থেকে বহুদূর বিস্তৃত সুড়ঙ্গপথ ধ'রে এই জল পায় সাড়ে হাজার ফুট পাহাড় থেকে সবেগে নীচে নেমে আসে। সেই জল থেকে বিদ্যুৎ সৃষ্টির কাজ চলছে সর্বক্ষণ। 'উইল' নামক একটি ভিন্নপথগামিনী নদীর থেকে এই জল নিত্য সরবরাহ হচ্ছে। এক শতদ্রু, হিমালয়ের বিশেষ অপর কোনও নদীকে নিয়ে এভাবে কাজে লাগানো হয়নি। যোগিন্দরনগর এজন্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

পাঠানকোট থেকে রেলপথটি পাহাড় পর্বতের উপত্যকা পেরিয়ে নদী ডিঙিয়ে এঁকেবেঁকে এসেছে যোগিন্দরনগর পর্যন্ত। কিন্তু এখানেই তার শেষ। মোটরপথ বরাবর এসেছে নাগরোটা পালামপুর বৈজনাথ হয়ে যোগিন্দরনগরে, এবং সেখান থেকে চ'লে গেছে দক্ষিণের মণ্ডিরাজ্যের দিকে। যারা দক্ষিণলোক হয়ে কুলু যাবার জন্য ঘুরে যেতে না চায়, তাদের জন্য একটি শর্টকাট এখানে আছে। কিন্তু এটি সুগম পথ নয় এবং মোটর যায় না। পাহাড়ে যেমন সর্বত্র ঘোড়া, এখানেও তাই। তীর্থপথ হলে হেঁটে যেতো অনেকে, কিন্তু এখানে সেকথা ওঠে না। পাহাড়ীলোকেরা হাঁটে, পর্যটকরা ঘোড়া নেয়। এই পথ ধ'রে যোগিন্দরনগর থেকে কুলু অর্থাৎ সুলতানপুর হোলো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল,—ঘোড়ায় গেলে দুদিনের কম হয় না। এই পথের মাঝখানে পড়ে ভাবুগিরিসঙ্কট,—সেখানে নয় হাজার ফুটেরও বেশী দুস্তর চড়াই পেরোতে হয়। চড়াই তখনই কষ্টকর, যখন সে হঠাৎ সামনে

এসে হাজির হয়। যেমন খিলানমার্গ থেকে লাডাখের পথ কিংবা টানমার্গ থেকে গুলমার্গের চড়াই। ভাবুগিরিসঙ্কটের আগে আসে জাতিংরি, তারপর আরও মাইল বারো গেলে শীলভাদোয়ানী। শীলভাদোয়ানী থেকে ভাবুর চড়াই আরম্ভ। এখানে চারিদিক থেকে ধবলাধারের বিশাল চূড়ারা যেন বেষ্টন করতে থাকে। ওরই ভিতর দিয়ে পথও হারিয়ে যায়, মানুষও অদৃশ্য হয়। মাঝে মাঝে এমন নৈশব্দ্য যে, চমক লাগে, এমন অপার্থিব যে, হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হয়। আমাদের অভ্যস্ত চক্ষু শহর নগরে স্বাচ্ছন্দ্য পায়, বড় জোর একটু বন বাগান, বা নদী প্রান্তর। কিংবা ওরই মধ্যে একবার বিন্ধ্যাচল, অথবা একবারটি শীলং দার্জিলিঙ। এখানে সে রাজ্য নয়, এরা পৃথিবীকে চেনে ধবলাধারের উপত্যকায়,—তার বাইরে সভ্যতার সংবাদ কমই শুনেছে। কিন্তু মানুষের অধ্যবসায় কোথাও থেমে নেই। মানুষ জানতে যায় এবং চিনতে চায় ওরই ভিতর দিয়ে, -অসাধ্য এবং দুস্তর ব'লে ফিরে আসে না। রেলপথ আজ পর্যন্ত হিমালয়ে পৌঁচেছে সমুদ্রসমতা থেকে আট হাজার ফুট পর্যন্ত, মোটর পথ প্রায় গেছে দশ হাজার ফুট অবধি,—কিন্তু প্রকৃত হিমালয় এই সীমানা থেকে আরম্ভ দার্জিলিঙের ঘুম, হিমাচলের শিমলা এবং কাশ্মীরের বানিহাল গিরিসঙ্কট - রেলপথ এবং মোটর এদের উচ্চতা থেকে আর এগোয়নি।

শীল ভাদোয়ানী থেকে কারেওন হিমালয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মানুষের চেহারা নতুন, নতুন ধরনের সাজসজ্জা, নরনারী অতিশয় সুশ্রী,—কিন্তু মুখের কাটুনিতে আসে মঙ্গোলীয় ধরনের ছাপ, এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের সংসারযাত্রার চেহারাও বদলাতে থাকে।

কারেওন থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উৎরাই পথে নেমে কুলু উপত্যকায় পৌঁছানো যায়

বস্তি-বাসিন্দা বৈজনাথ শহরটিতে কম। কিন্তু সমতল ক্ষেত্র পাওয়া গেলেই মানুষের বসতির সংখ্যা বেড়ে ওঠে। পাহাড়ীরা সমতল পেলে ভারি খুশী। সমতল পেলেই ওরা আগে বানায় মন্দির, একটি শিলস্থাপনা করে, তারপর পাথরের ডেলা সরিয়ে নরম মাটি বার করতে থাকে। এ কাজে মেয়ে-মরদ বালক-বালিকা—সকলের স্বার্থ সমান, সুতরাং কেউ ব'সে থাকে না। বলদ যদি না জোটে, নিজেরাই মাটি আঁচড়ায়। ঝরনা কাছাকাছি পেলে সেখান থেকে বিশেষ কৌশলে জল টেনে আনে,—তারপর শস্য ফলায়। পাহাড়ী ছাগল ওদের মাল বয়, ভেড়ার পাল পোষে,—তার লোম কেটে বানায় কম্বলের পোষাক। কিন্তু একটিমাত্র ভয় ওদের জেগে থাকে, সেটি হোলো

বন্যার ভয়। সমতল ক্ষেত্রে বন্যা স্ফীতিলাভ করে, তখনই ওদের সর্বনাশ। বন্যা এলে ঘরকন্না ক্ষেতখামার সব ফেলে ওরা উঁচু পাহাড়ে গিয়ে ওঠে, এবং কখনও কখনও দেখা যায়, দিনে অথবা রাত্রে মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যে একটি সম্পন্ন গৃহস্থ সর্বহারা হয়ে পথে বসেছে। তারপর চোখের জল মুছে আবার নতুন জীবনের শুরু। অদম্য উৎসাহে নরনারী আবার কোমর বেঁধে কাজে লেগে যায়।

বৈজনাথের আশপাশ ঘুরে এসেছিলুম, কিন্তু রাত্রের দিকে শয়নারতি দেখার আকর্ষণ ছিল। মিসেস গুপ্তা যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। চৌকিদার লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে চললো।

মোটর রোড পর্যন্ত যেতে হয় না, মাঠের ও প্রান্তে মন্দির। রাত এখনও ন'টা বাজেনি, কিন্তু এরই মধ্যে পাহাড়তলী নিঃঝুম। পার্বত্য জীবনযাত্রা সন্ধ্যার সঙ্গেই নিঃসাড় হয়ে আসে। মেঘ জমেছে আকাশে। চৌকিদার লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে এসে মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকলো।

মন্দির দেখে এমন সম্ভ্রমবোধ জাগেনি অনেকদিন। আমি যা খুঁজে বেড়াই, এখানে ঠিক তাই। বজ্রেশ্বরী দেখে এসেছি, কিন্তু তার গাঁথনির চেহারা অনেকটা আধুনিক, তার সাজসজ্জার হাল আমলের চিহ্ন। ছবি, ফটো, ঝাড়লণ্ঠন, মার্বেলপাথরের কাজ, এখানে ওখানে বংবাহার, তাতে ছাপ পড়েছে মাড়োয়ারীর। এখানে কিছু পৌঁছয়নি, একটি আলোও নয়। এমন দরিদ্র মন্দির সহসা চোখে পড়ে না, প্রাচীনের এমন বিশাল সৌন্দর্য বোধ করি সমগ্র পাঞ্জাবে কম। সামনেই বড় দেউড়ী,—সমস্তটাই প্রাচীন পাথরের। রংটা যেন ঘষা পয়সা। পাথরের সঙ্গে পাথরের জোড় আলগা,—ফাটল বেরিয়ে পড়েছে ভিতর থেকে। ধূপধুনাচন্দনের গন্ধ নয়,—গন্ধটা যেন প্রাগৈতিহাসিক, যে গন্ধটা পাথরে-পাথরে, বট অশ্বত্থের শিকড়ে, আনগ্ন দারিদ্র্যভূষণ সন্ন্যাসীর ধুনি জ্বালনে, মুনি কি রেত্তির তপোবনে, চীরবাসা ভৈরবের মহিষমর্দিনীর গুহাদেউলে,—যে গন্ধ বারম্বার পেয়ে এসেছি।

ছমছমে অন্ধকার, কিছু ভালো দেখা যায় না। কিছু অস্পষ্ট, কিছু ছায়াচ্ছন্ন, কিছু বা অজ্ঞাত,—কিন্তু ওরই ভিতর দিয়ে বৈজনাথের বিগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। সামনেই পাথরের বিশালকায় বলিবর্দ। কোলের কাছে নাটমন্দির, বিশাল উঁচু তার খিলান,—সমস্তই প্রাচীনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কোনো সজ্জা নেই, অন্নবস্ত্র জোটে না বৈজনাথের, দান-ভিক্ষা কিছু মেলে না,—তিনি নিত্য উপবাসী।

শয়নারতির আয়োজন চলছে। দর্শনার্থীর সংখ্যা অতি কম। দুচারজন

পাহাড়ী স্ত্রীলোক, এক-আধজন শ্রমিক, দু একটি ভক্ত। পূজারী ঠাকুরকে সাজাচ্ছেন গর্ভমন্দিরে বসে।

স্থানীয় লোক বলে, দু'হাজার বছর আগে মহারাজা বিক্রমাদিত্য এই মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দির হিমালয়ের প্রাচীনতম দেবস্থানের অন্যতম। কেউ বলে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই মন্দির নির্মিত হয়। এর প্রকৃত নাম হোলো, বৈদ্যনাথ। ইনি শিবেরই প্রতীক। পূজারী যিনি আরতির আয়োজন করছেন, তাঁর পূর্বপুরুষরা নাকি তিনশো বছর আগে বাঙ্গলাদেশ থেকে এসেছিলেন।

শ্রীমতী গুপ্তা গিয়ে বসলেন গর্ভমন্দিরে দরজার কোণে। তিনি পরেছিলেন চওড়া কালাপাড় শাড়ী, তারই আঁচল গলায় জড়িয়ে হাতজোড় ক'রে বসলেন। তাঁকে যারা শ্রীনগরে এবং পহলগাঁওয়ে দেখেছে, তারা এই পূজারিণীর চেহারাটি দেখলে একটু অবাক হয়ে যেতো। আমার বিশ্বাস, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তিনি শ্রদ্ধায় এবং অনুরাগে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন এবং তখন থেকে একটি কথাও তিনি বলেননি।

শঙ্খ, ধুনার পাত্র, কিছু ফুল এবং প্রদীপ এই নিয়ে পূজারী আরতি করলেন। ধীরে ধীরে গুরুগুরু ডম্বরুধ্বনি করতে লাগলেন একজন সহকারী। দর্শনার্থী শান্ত, স্তব্ধমুখ। সেই ধ্বনিমহিমা গুরুগুরুরবে চলে যাচ্ছিল সমগ্র হিমালয় পেরিয়ে যেন মানবসংসারের দিকে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে। উনি বৈদ্যনাথ, নিরাময় করবেন ধন্বন্তরির আশীর্বাদে। ধিকৃত বিকলচিত্ত হিংসাশ্রয়ী বৃহত্তর যে মানসভ্যতা পাশব প্রকৃতিকে আজ খুঁচিয়ে তুলতে চাইছে,—এই আরতির বীজমন্ত্র ওই ডম্বরুধ্বনির সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে যাবে বৈদ্যনাথের আশীর্বাদ ও মঙ্গলবার্তা নিয়ে। মানুষের চিত্ত বিশুদ্ধ ও নির্মল হবে, প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটবে।

সকলের পিছনে দাঁড়িয়েছিলুম। আরতি শেষ হোলো, কিংবা তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল, ঠিক বুঝতে পারা গেল না। এমন আত্মবিস্মৃতি সচরাচর ঘটে না। সবাই যেন বহুদূরে কোনও অজ্ঞাত লোকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, এবার যেন সবাই আপন আপন দেহের মধ্যে ফিরে এলো। চেয়ে দেখি, শ্রীমতী গুপ্তা মন্দিরের পাথরের চৌকাঠে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করছেন দীর্ঘক্ষণ থেকে। সেই সহকারী ছোট পূজারীটি প্রদীপের পাত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে সকলের মাথায় অগ্নির তাপ বিতরণ করছেন। নতমস্তকে সবাই গ্রহণ করছে সেই তাপ। শ্রীমতী গুপ্তা তাঁর আঁচলের গেরো খুলে যা কিছু সঙ্গে এনেছিলেন, সবাই প্রণামী দিয়ে দিলেন। দৃশ্যটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। তাঁর চোখে মুখে যেন দীপ্তি ফুটেছে।

নগরের সভ্যতায় আমরা মানুষ। প্রতি পদে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ওপর আবরণ টেনে বেড়াতে হয়। চলতি কাল নিত্যই তার পাওনা আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। ফ্যাশনের সঙ্গে চলতে হচ্ছে, নিত্য নতুনের ঘূর্ণীপাকে ঘুরে বেড়াচ্ছি, প্রতিদিন নিজেকে নতুন ছাঁচে ঢেলে মানানসই করছি হাসিমুখে কথা বলছি তার সঙ্গে যাকে একেবারে পছন্দ করিনে, দুঃখ জানাচ্ছি তার কাছে, যে-ব্যক্তি কপট। গুণগান গাচ্ছি এমন ব্যক্তির, যে অপদার্থ, তোষামোদ করছি তার, যাকে কুচক্রী ব'লে বিশ্বাস করি। নৈতিক আলোচনা করছি তারই সঙ্গে, যার লোভ এবং আসক্তি সুবিদিত। মেয়েদের বেলাতেও তাই। হীনতা জড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে,—উপরে সরলতার আবরণ পড়েছে। কুরুচি এবং স্বভাবের বিকার পরিচ্ছদের পারিপাট্যে ঢাকা অহঙ্কার এবং আত্মাভিমানে জরোজরো, উপরে মিষ্টিমুখের পালিশ। যথার্থ বিবেচনাকে লুকিয়ে রেখেছে সঙ্গোপনে, বাইরে প্রতিপদে প্রতারিত করছে পারিপার্শ্বিককে। একটু স্নেহ, একটু অনুরাগ, একটু রঙিন কটাক্ষ, এই সব ছোট ছোট উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করছে অনুগ্রহপ্রার্থীদের, চাতুরীর দ্বারা কায হাসিল করছে, কিন্তু এদেরই নাম দেওয়া হচ্ছে সামাজিকতা। যে যত আত্মগোপনশীল, সে নাকি ততই সামাজিক যার প্রতারণা যত নিখুঁত সে নাকি ততই বুদ্ধিমতী। তথাকথিত সভ্যসমাজে সরলতা সাধুতা আড়ম্বরহীনতা নিস্পৃহতা,—এরা পরিহাসের বস্তু। শ্রদ্ধা, অনুরাগ, স্নেহ, ভালবাসা,—এদের বাজার-দর নেই। নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব মহৎ আত্মত্যাগ, অকৃত্রিম সেবা, অকৃপণ দাক্ষিণ্য, —এরা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর জীবনের এই সর্বনাশা বিকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যদি কেউ সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশে, তাকে আমরা বলি বাতুল সে আমাদের হাসি এবং উপেক্ষার পাত্র হয়ে ওঠে।

আমরা ডাকবাংলোর বারান্দায় এসে উঠলুম। দুচার ফোঁটা বৃষ্টি আমাদের মুখে চোখে লাগছিল। রাত এগারোটা।

কখন বৃষ্টি নেমেছিল মুষলধারে বুঝতে পারিনি। প্রত্যূষে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, আকাশ মেঘমলিন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হচ্ছে। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়বার কথা, কিন্তু মদনলালদের কোনও তাড়া নেই। আগের দিনের ব্যবস্থামতো ভোরে উঠে মান্না প্রস্তুত হচ্ছেন, এবং আমার পক্ষেও আর

অপেক্ষা করা চলবে না। বুঝতে পারা যাচ্ছে মদনলাল এবং সৎবতী এখানে দুচারদিন থেকে যেতে চায়।

জিনিসপত্র বেঁধে নিয়ে আমরা যাবার জন্য প্রস্তুত হলুম। চৌকিদারের কল্যাণে চা ও প্রাতরাশ ভাগ্যে জুটে গেল। এখানে মদনলাল তার বউকে নিয়ে রইলো। আগামী কাল ওরা যাবে মণ্ডি, সেখান থেকে কুলু। 'যদি ভাগ্যে থাকে, আবার দেখা হবে। এর পর পা ছোঁওয়া, প্রণাম ও কটূক্তি বিনিময়ের দ্বারা মায়াদেবীর সঙ্গে ওদের সহাস্য বিদায়সম্ভাষণ,—এতেও গেল মিনিট দশেক। আমরা চৌকিদারকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিলুম। সৎবতী তার স্বভাবমধুর আলাপের দ্বারা বড় আনন্দ দিল।

বৃষ্টি কমেছে একটু, কিন্তু পড়ছে। ছাতা—বর্ষাতি কোনোটাই আমাদের নেই। ঠাণ্ডা প'ড়ে গেছে প্রচুর। এখন সকাল সাড়ে ছটা, সাতটায় মোটর বাস ছাড়বে। সুতরাং মদনলালের কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হোলো। চৌকিদার এবং কুলি দুজন সঙ্গে চললো।

সামনের মাঠ এবং ঝোপ-ঝাড়ের পাশ কাটিয়ে যখন বাসস্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছলুম, তখন গাড়ী ছাড়তে আর মিনিট দশেক বাকি। ওরা মালের ওপর তেরপল চাপা দিল। আমরা গাড়ীতে উঠে বসলুম।

॥ ৪ ॥

হিমাচল প্রদেশে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ চলছিল। বৈজনাথ ছেড়ে এলেই কাংড়া উপত্যকা শেষ হয়ে গেল। হিমাচল প্রদেশের যোগিন্দরনগরের এলাকায়, একটি শিখর পেরিয়ে তার শিরদাঁড়াপথ ধরে নতুন রাজ্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললুম। বর্ষামেঘের ফাঁকে ফাঁকে এবার আকাশের নীলাভা দেখছি।

বর্ষায় আর শরতে মেলানো পার্বত্যলোক। প্রভাতের কোমল রৌদ্রের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টির ঝালর, রামধনুর রঙীন ঝিলিমিলি। উত্তর থেকে দক্ষিণে আমাদের গতি। পিছনে দাঁড়িয়ে রইলো ধবলাধারের তুষার-শুভ্র চূড়া,—মহাকালের অতন্দ্র প্রহরীর মতো। কানামেঘের বৃষ্টির ঝাপট লাগছে আমাদের মুখে চোখে,—এলায়িতকুন্তলা রমণীর ঝুরুঝুরু ভিজাচুলের রাশি যেন বুলিয়ে যাচ্ছে মুখে চোখে। প্রকৃতির এই পরিহাসের সংবাদ পেয়েছে পাখীসমাজ, তারা ওই রৌদ্র-বৃষ্টির খেলার মধ্যেও ডাক দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে হিমালয়ব্যাপী বিশাল শরৎবন্দনাসভায়।

বনচ্ছায়ার পাশ দিয়ে নির্ঝরিণীরা নেমে যাচ্ছে পাহাড়তলীর দিকে,—যেদিকে এখনও ছমছমে ছায়া রয়েছে দেওদারের বনে-বনে; যেখানকার সংসারযাত্রা এখনও তন্দ্রাজড়ানো। আমাদের গাড়ী চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ক্রমশ উপর দিকেই চলেছে।

গত কয়েকদিন খররৌদ্র ছিল কাংড়া উপত্যকায়। বৈজনাথ থেকে পেয়েছি স্নিগ্ধতা। কাংড়ার বনকান্তারের নিভৃত নিকুঞ্জে যেন কুসুমশয্যা রচনা করেছিলুম, কিন্তু সেখানে বাতাস ছিল অবরুদ্ধ,—সেজন্য ওখানকার বিহ্বল প্রকৃতির বালকশয্যায় দরদর ঘাম ঝরেছিল কপাল বেয়ে, নিবিড় তৃপ্তির মাদকতা লাগেনি দুই চোখে। এখানে এলো অন্য চেহারা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রভাত-কালেই আসছিল দুই চোখে সুখের তন্দ্রা—গত রজনীর ক্লান্তিশেষের মধুর অবসাদের মতো।

হিমালয় যেন তার অন্তঃপুরের দ্বার খুলে দিচ্ছে ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টিপথে। সেখানে তার প্রাণের ভাষা আছে গোপনে,—পরমাত্মীয় এসে না দাঁড়ালে সেই ভাষা অপর কারো কানে কানে বলা চলে না। আমরা সেই পথে চললুম, যেটি তার গহনলোক, যেখানে বিপাশা নদীর তীরে নিভৃত শিলাসনে ব'সে চিরবৈরাগী ভারত আপন জপের মালায় বীজমন্ত্র পাঠ করছে। জরা, জন্ম ও জাতকের অতীত যে—ভারত—যার আবহমানকালের ইতিহাসের প্রতিটি পব প্রতি রুদ্রাক্ষদানার জপের সঙ্গে ফিরে-ফিরে চলেছে। এবারে আকাশ তার নির্মল নীল শোভা বিস্তার করেছে। উপত্যকায় নেমে এসেছে রঙীন পাখীরা,—যাদের সচরাচর চোখে পড়ে না সমতল ভারতে।

সমতল রাজ্যের যাঁরা অধিবাসী তাঁরা পার্বত্যরাজ্যগুলির রাষ্ট্রীয় সমস্যা অনুধাবন করতে অসমর্থ হন। যে কারণেই হোক, হিমাচল প্রদেশ এতকাল ধরে নানা কারণে ছিল দুর্বল এবং প্রবলতর প্রতিবেশী পাঞ্জাবের সঙ্গে সে এঁটে উঠতে পারত না। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হিমাচল প্রদেশের রাষ্ট্রীয় আয়তনের কঠিন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করেছেন। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হিমাচল প্রদেশ তার সম্পূর্ণ অধিকার অর্জন করতে পেরেছে। বলা বাহুল্য, ভারতের মানচিত্রে জটিলতা দেখা দিয়েছিল হিমাচল প্রদেশের এলোমেলো সীমানায়। স্বাধীন ভারতে এ প্রদেশটি নতুন, এখনও এর শৈশব কাটেনি। কিন্তু এর মর্মে মর্মে এসে প্রবেশ করেছিল পাঞ্জাব; এবং এর সীমা-নির্দেশ করতে গেলে পাঞ্জাবের মধ্যে ভ্রমণ ক'রে বেড়াতে হত। একটি অঞ্চল আরেকটির থেকে বিচ্ছিন্ন। একটির ছিট্‌মহল আরেকটির কোলে প্রবেশ করেছিল। উভয়ের মধ্যে ভৌমিক সংলগ্নতা ছিলনা। কুলু উপত্যকা পাঞ্জাবের অন্তর্গত কিন্তু হিমাচলের

এক অংশ থেকে পাঞ্জাবের মধ্যে না গেলে কুলু পৌছনো যেত না। চাম্বা এবং ডালহাউসী হোলো হিমাচলের অন্তর্গত, কিন্তু ডালহাউসী সেদিনও কেন পাঞ্জাবের শাসনাধীন ছিল, এর জবাব কেউ দিতে চায় না। তবে এর কৈফিয়ত সম্প্রতি একটা পাওয়া গেছে। গল্পটা অবশ্য সেই পুরানো আমলের। পাঠান, তাতার এবং মোগলদের সঙ্গে রাজপুতনা কোনদিন পুরোপুরি হাত মেল্যাতে পারেনি। এর ওপর ছিল আবার রাজস্থানীদের ঘরোয়া বিবাদ। কেউ কারো প্রাধান্য সইতো না, কেউ কারো বশ্যতা স্বীকার করতো না। অসমসাহসিক বীর্যবত্তা এবং মহৎ আত্মত্যাগে রাজপুতনার ইতিহাস যেমন গৌরবগর্বিত,—অন্তর্দ্বন্দ্ব, গৃহবিবাদ, স্বজাতিদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং আত্মঘাতী অদূরদর্শিতাতেও সেই ইতিহাস কলঙ্কমসীলিপ্ত। এদের মধ্যে যারা ছিল অনেকটা নির্বিরোধ এবং স্বকীয়তাসম্পন্ন,—তারা তাদের ধনরত্নসম্ভার আত্মীয়-পরিবারবর্গ এবং লোকলস্কর নিয়ে একে একে চ'লে যায় হিমালয়ের দিকে। সেখানে গিয়ে তারা পার্বত্য আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে হাত মিলোয় এবং এক-একটি অঞ্চলে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করে। ঔপনিবেশিক পাঠান এবং মোগলরাজশক্তি ওদের নিয়ে তেমন আর ঘাঁটাঘাঁটি করেনি, কারণ ততদিনে মুসলমানশক্তি সমতল ভূভাগে যতখানি আধিপত্য পেয়েছিল, ততখানিই তাদের বিনামূল্যের লাভ ব'লে মনে করেছিল। যাই হোক, রাজপুতরা হিমালয়ে গিয়ে ক্রমে ক্রমে কুড়ি পঁচিশটি রাজ্য সৃষ্টি করে এবং পাঞ্জাবী রাজ্যগুলির সঙ্গে মোটামুটি সদ্ভাব রেখে পাশাপাশি বাস করতে থাকে। বিশাল এক-একটি পর্বত এবং তৎসংলগ্ন এলাকা উভয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। উভয় পক্ষের এই সমুদয় পার্বত্য অঞ্চল এবং রাজপুতনার উত্তর, উত্তরপূর্ব, উত্তরপশ্চিম, এবং পশ্চিম,—এই বিরাট ভূভাগ এই সেদিন অবধি অখণ্ড ও অবিভক্ত পাঞ্জাবের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু ভারত-স্বাধীনতার সঙ্গে সমগ্র পাঞ্জাব প্রকাশ্যত চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পশ্চিম পাঞ্জাব যায় পাকিস্তানে, এবং ভারতের অধীনে আসে বাকি তিন ভাগ। একটি পূর্ব-পাঞ্জাব, একটি হোলো পেপসু, এবং তৃতীয়টি হোলো হিমাচল প্রদেশ। পূর্ব পাঞ্জাব এবং পেপসু হোলো হিন্দু-শিখপ্রধান, হিমাচল প্রদেশ হোলো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-রাজপুত প্রধান। এ ছাড়া হিমাচল প্রদেশে মিলেছে নানা পার্বত্যসম্প্রদায়। এই প্রদেশে সমতলভূভাগ একেবারে নেই বললেই চলে, এবং এটি প্রধানত উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত। এই পার্বত্য প্রদেশটির ভিতর দিয়ে পাঞ্জাবের তিনটি প্রধান নদী প্রবাহিত,—শতদ্রু, বিপাশা এবং ইরাবতী। উত্তরে ইরাবতী, দক্ষিণে শতদ্রু, মধ্যভূভাগে প্রবাহিত বিপাশা।

আমরা বিপাশার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। বস্তু শতদ্রুকে ছেড়ে এসেছি একদা কিন্নর ও বুশাহর রাজ্যে।

ছোট ছোট বস্তি পার হয়ে যাচ্ছি। কোনোটা উঁচুতে, কোনোটা বা অনেক নীচে। জানতে পাচ্ছিনে ওদের সুখদুঃখ, ওদের ঘরকন্নার ইতিহাস। পায়ে হাঁটলে তবেই পর্যটন, নৈলে ছবি দেখে যাওয়া হয় মাত্র,—জীবনদর্শন ঘটে না। যারা বিমানে চ'ড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে,—তাদের প্রশ্ন করো, কিচ্ছু জানা যাবে না। পৃথিবী তাদের জন্য, যারা হাঁটতে হাঁটতে প্রতি পদক্ষেপ গুনেছে। মানুষের কাছে গিয়ে তারা বসেছে, আতিথ্য নিয়েছে, মন মিলিয়েছে, হাসিকান্নায় ব্যথা-বেদনায় অংশগ্রহণ করেছে। অতিথিকে নারায়ণ বলেছি তখন, যখন সে সেবা করেছে, আনন্দের প্রদীপ তুলে ধরেছে, শোকে সান্ত্বনা দিয়েছে, চোখের জল মুছে দিয়েছে। সে নারায়ণ, কেননা সে নিঃস্বার্থ, সে নিরপেক্ষ। পর্যটক হয় তীর্থপথিক, যখন সে বিশেষ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। যে ব্যক্তি তীর্থের পর তীর্থ পায়ে হেঁটে পর্যটন করে তাকে আমরা বলি, পুণ্যাত্মা। তার পায়ে যে শুধু তীর্থধূলি লেগে থাকে তা নয়, সেই ধূলির মধ্যে মিলিয়ে থাকে মানুষের ইতিহাস,—দুঃখের, ঝড়ের, সঙ্কটের, দারুণের ইতিবৃত্ত. সেই ধূলির মধ্যে পাওয়া যায় ছোট ছোট মানবতা, ছোট ছোট মহত্ত্ব আর হৃদয়ানুরাগ, আত্মোপলব্ধি এবং দিব্যজ্ঞানের ছোট ছোট বিস্ময়াবিষ্কার। পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে যে-পাণ্ডিত্য অর্জন করা যায়, সে হলো মুষ্টিভিক্ষার ঝুলি,—উপুড় করলেই তার শেষ হয়। কিন্তু অন্তর দিয়ে যা দেখছি পায়ে-হাঁটা পথের দুই প্রান্তে,—সেই তো পরম দর্শন দরিদ্র দিনশ্রমিকের ঘরে বিদুরের অন্নগ্রহণকালে চারিদিকের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ভিতর দিয়ে যা জেনেছি, সেই তো পরম জ্ঞান বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে দেখেছি আমরা, জীবের মধ্যে দেখেছি শিব, নরের মধ্যে নারায়ণ। ধর্মাধর্মের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে উপলব্ধির কথা। বস্তুকে সত্য ব'লে জানি, তাই বস্তুর ভিতর দিয়ে বিশেষ উপলব্ধির মধ্যে পৌঁছতে চাই। মাটির পুতুল সরস্বতী, কিন্তু তাকে কেন্দ্র ক'রে জ্ঞান ও বিদ্যার উপলব্ধি। ঐশ্বর্যকে লাভ করি—লক্ষ্মী থাকেন আমাদের কল্পনায়। ঋষিকে দর্শন করি,—অনুভব করি দর্শনতত্ত্বকে। মানুষের অন্তর্নিহিত দৈবসত্তার সংস্পর্শে আসি, তাই ঈশ্বরকে কল্পনায় আনি। বস্তুকে ধারণ করি, ধারণ করি আকারকে,—তার ভিতর দিয়ে পৌঁছতে চাই বিশেষ লক্ষ্যে। জানাটাকেই সঠিক জ্ঞান বলে না,—উপলব্ধ সত্য হোলো জ্ঞান।

মানুষকে ফেলে যাচ্ছি পিছনে, তাই পদে পদে বঞ্চিত বোধ করছি। জানতে এসেছি হিমালয়কে, কিন্তু মানুষকে জানা হচ্ছে না। ওই চীড়বনের

তলায় আসন পাতো, কিংবা ওই জামবনের ওপাশে যেখানে প্রস্তরজটলার ভিতর দিয়ে নেমে চলেছে গিরিপ্রপাত,---ওখানে আসন বিছিয়ে প'ড়ে থাকো। বাকি জীবন,—দেখে নাও এই হিমালয়ের জীবনধারা। একটি শিশু বালক দাঁড়িয়ে গেছে থমকিয়ে পথের ধারে, দেখে নাও ওর চোখে হিমালয়ের পরম বিস্ময়। কাঠুরিয়া চলেছে মাথায় তার বোঝা নিয়ে, দেখে নাও অরণ্যের আশ্চর্য রহস্য। একটি আত্ম-অচেতন পাহাড়ী মেয়ে যৌবনসমাজ্ঞীর মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে,—ওর মধ্যে হিমালয়ের অনন্ত সৌন্দর্যসত্তার আবিষ্কার করে নাও। ডালিম আর আপেলের বনের উচ্ছ্বসিত রক্তিম প্রগল্‌ভতা যেন এসে ওর গণ্ডে গ্রীবায় ললাটে অধরে আপন স্পর্শ রেখে যাচ্ছে। কিন্তু কী জীবনযাত্রা ওদের পিছনে। কতটুকু সীমা, কতটুকু বা প্রয়োজনের জগৎ। পাথরখণ্ড একটি একটি সাজিয়ে তারই দেওয়াল, শ্লেট পাথরের ছাদ, মাটির হাঁড়ি, লোহার বাসন, কম্বলের সজ্জা, আগাছার দড়ি-পাকানো চারপাই, দু একটি টুকরির মধ্যে খাদ্যের দানা, পুঁটলির মধ্যে ভেলিগুড়, ভাঁড়ের মধ্যে নুন, লোহার গাগরায় পানীয় জল। ওরই মধ্যে চিরদরিদ্র রাজকন্যার গৃহস্থালি, ওরই মধ্যে সর্বহারা রাজশিশুর জন্ম। এক টুকরো ক্ষেত, দু'তিনটি গরুমহিষ, পাঁচ সাতটি ভেড়া, গৃহপালিত একটি কুকুর, গোটা দুই চার মুরগী, দু একটি পোষা তিতির,—এরাও মিলে রয়েছে ওদের সঙ্গে। সুখী সেই পরিবার,— মালভূমির উপরে যাদের ক্ষেত খামার,—যেখানে বন্যার ভয় নেই, সর্বনাশের আশঙ্কা নেই। যারা পাহাড়ের নীচের দিকে থাকে,—নিত্য উৎকণ্ঠায় তাদের দিন কাটে। এখানে পথের ধারে কেউ বা দিয়েছে ছোট্ট একটি দোকান-- যারা ওরই মধ্যে একটু সম্পন্ন গৃহস্থ। ছোলার বরফির একটি পাত্র,—তার উপর বসেছে অসংখ্য রঙীন বোলতা, কিংবা মাটির সরায় কয়েকটি শুকনো প্যাড়া, -যার রস টেনে শুষে নিয়েছে পতঙ্গের দল। কড়াইতে মহিষের দুধ জাল দিচ্ছে ঘরের মধ্যে ব'সে কাজলনয়না গৃহস্থবধূ,—কাঠের তাড়ু ঘোরাচ্ছে ক্ষীরের পাকে পাকে,---ওর থেকে প্রস্তুত হবে কালাকাঁদ। গৃহপালিত মার্জার পরম নিশ্চিন্তে প'ড়ে আছে বধূর চরণপদ্মে আপন গা ছুঁইয়ে—সেই পা দুখানি মেহেদী পাতার রসে রঙীন। সংসার এখানে মন্থরগতি, কর্মচক্রের ঘর্ঘরতা কোথাও নেই! শান্ত নিরিবিলি নিষ্কম্প পাহাড়ী জীবন,—উদ্দামতার চিহ্ন দেখিনে কোথাও। এখানে লোভের পিছনে মদমত্ত মানুষ ছোটে না, দ্রুতগতির দ্বারা কেউ উর্ধ্বশ্বাস নয়। ধান, গম ও যবের ক্ষেত দেখতে পাচ্ছি, কোথাও দেখছি চা-বাগানের টুকরো, কোথাও বা আলু ও আখের চাষ। একদিকে খদ, অন্যদিকে মালভূমি। দূরে উত্তুঙ্গ ধবলাধার,—তার কোলের কাছে শিশুপাহাড় সম্প্রদায়।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের আর অরণ্যের ছায়া পড়ছে সেই গিরিসঙ্কটে। যেখানে ছায়া, সেখানেই শীতল বাতাস। সেই ছায়া-ছমছমে জঙ্গল-জটলার মধ্যে ঝিল্লির ডাক বেড়ে ওঠে। ওরা তারস্বরে ডাকছে রাত্রিকে, ঘনতমসাচ্ছন্ন রজনী ওদের প্রিয়। কাঁচা ডালিম আর কমলার গন্ধ পেয়ে ছুটেছে পতঙ্গের পাল্। প্রজাপতিরা কিছু বিমর্ষ; ফুল ঝ'রে গেছে দ্রাক্ষাকুঞ্জে,—ওদের পাখার বিচিত্র বর্ণে তারই বেদনার রং জড়ানো। ধবলাধারের তলা দিয়ে আসে নীলগাই আর তুষারচিতা, অজগর আসে কাংড়ার অরণ্য পেরিয়ে, কুলুর ওপার থেকে আসে তিব্বতী পীতাভ ভালুক, আলুর ক্ষেতে ঘুরে যায় বন্য শূকর।

আমাদের গাড়ী ছুটেছে অনেক দূর। এই গাড়ী সারাদিনে দুবার আনাগোনা করে: পাহাড়ে-পাহাড়ে এইটি হোলো আধুনিক সভ্যতার সংবাদ। বিচিত্র সামগ্রী মাঝে মাঝে এসে পাহাড়ীদের কাছে পৌছয়, সেই সব মনোহারী সামগ্রী-সম্ভার পাহাড়ী গৃহস্থের চোখে বিস্ময় আনে। এই একটিমাত্র পথ,—এর বাইরে শত শত মাইলের মধ্যে অপর কোনও প্রকার যান্ত্রিক যানবাহন নেই। সেই কারণে সভ্যতার স্বাদ ওরা পায় না, যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন ওদের কাছে পৌছয় না। হাট বসে ওদের পার্বত্য কোনো কোনো গ্রামে, সেই হাটে ফল কিনতে আসে দূরের মহাজন, সেই ফল সমতলে চালান যায়। ওই হাটেই বিক্রি হয় জন্তুর আব সরীসৃপের ছাল, পিতল অথবা রূপার অলঙ্কার, বিভিন্ন ওষধি শিকড়, হাড়ের অথবা রঙীন পাথরের মালা, লোহার বিবিধ অস্ত্র, ভেড়ার লোমের টুপি—কিম্বা মখমলের, তুলোর জামা, টিনমোড়া আয়না, কাঠের চিরুনী, আর হয়ত নাম-দা। আশ্চর্য, মেটে সিঁদুর ওখানে বিক্রি হয়, কিংবা রাঙা রুলি আর আলতা। ওরা শিবের পাশে শক্তিকে বসায়, রামের পাশে সীতা, বিষ্ণুর সঙ্গে লক্ষ্মী। সর্বাপেক্ষা পূজ্য সংহাররূপিনী মহাকালী। জন্তু আর পাখীর মাংসে ওদের অরুচি নেই। সর্বপ্রধান উৎসব পালন করে দুর্গাপূজার দশমীর দিনে—যেটাকে ওরা নাম দিয়েছে 'দশহরা'। সেদিন সমগ্র হিমাচল প্রদেশের প্রধান পাঁচটি জনপদ,—মণ্ডি, চাম্বা, মাহাসু, শিরমুর ও নব-সংযুক্ত বিলাসপুর,—এরা আনন্দে উদ্দীপনায় কর্মতৎপরতায় এবং প্রাচুর্যে নৃত্য করতে থাকে।

পার্বতী নদীকে ছেড়েছি, এখন বিপাশা নদীর দিকে নেমে চলেছি। ওপারের পাহাড়ের কোলে-কোলে পাকাবাড়ী দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট

বাসা,—ছোট ছোট স্বর্গ। এখানে ওখানে পায়ে চলা পথ চ'লে গেছে,—কোথায় গেছে, কোনদিন তাদের ঠিকানা জানা যায়নি। আমরা মুখ বাড়িয়ে সবটা দেখছি উৎসুক চোখে। কোনও অভ্যাগত কিংবা পর্যটক আশা করে না, এখানে শহর পাওয়া যাবে। হিমালয়ের এমন জটিল গহনলোকে এসে পড়েছি যে, মনে হচ্ছে, বোধহয় হাজার বছর পিছিয়ে গেছি। সভ্যতার মেলা বসেছে জগৎ জুড়ে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা চন্দ্রলোকে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, দশ হাজার মাইল দূরের মানুষ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, পারমাণবিক এবং হাইড্রোজেন বোমা পৃথিবীর বায়ু, বৃষ্টি, আবহ-স্বভাব ও শীতাতপকে পরিবর্তিত ক'রে দিচ্ছে—এ সকল খবর এদিকে কেউ জানে না। কিন্তু আমাদেরই ভুল। ওই বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষ গৌরীশৃঙ্গের চূড়ায় উঠে নিশ্বাস নিতে পেরেছে, নিশ্চিত মৃত্যুকে পরিহার করেছে, সুমেরু প্রদেশে সভ্যতার স্বাদ পৌঁছে দিয়েছে,—সুতরাং এখানেও সেই জগৎজোড়া আধুনিকের ছিটেফোঁটা ঠিকরে আসবে বৈ কি। আমরা উদগ্রীব হয়ে দেখছিলুম, শহর আসছে।

গাড়ী নেমে এলো উৎরাই পথে। একটি বাঁক পেরিয়ে পাওয়া গেল বিপাশা নদীর সাঁকো। অনেক নীচে বিপাশার গৈরিক স্রোত প্রবল উচ্ছ্বাস তুলে আবর্ত রচনা ক'রে চলেছে। দেখলে ভয় করে। আমাদের গাড়ী সাঁকোর উপরে উঠলো। এটি সেই একই ডিজাইনের সাঁকো ক্যানটিলিভার ব্রীজ। দুই দিক থেকে পাহাড়ের দেওয়াল দিয়ে লোহার কাছি দিয়ে টানা। এটি নিরাপদ ওই কাছিগুলির জন্য। নীচের দিকে এর ভিত্তি থাকে না, কারণ পার্বত্য স্রোতের প্রচণ্ড ধাক্কা ভিত্তিকে চূর্ণ ক'রে দেয়। এই সাঁকো হিমালয়ে অসংখ্য। তিস্তায়, রঙ্গীতে, লছমনঝুলায়, বিষ্ণুগঙ্গায়, ইরাবতীতে, আরও নানান অঞ্চলে

নদী পার হয়ে আমাদের মোটরবাস মণ্ডির মস্ত শহরে এসে প্রবেশ করলো, শহর একটু দূরে। এপারে ওপারে বিশাল পাহাড়ের প্রাকার। বৃহতের দিকে তাকালে মানুষের সমস্ত কীর্তিকে অতি ক্ষুদ্র মনে হ'তে থাকে। চারিদিকের এই বিরাট পটভূমিতে মণ্ডি শহর দাঁড়িয়ে। অজানা থেকে অজানায় এসে পৌঁছলুম।

সামনেই চতুষ্কোণবিশিষ্ট ক্লক টাওয়ার। সেখানে সময় নির্দেশ করছে বেলা সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। কিন্তু উপরদিকে কানমোড়া ওই চতুষ্কোণ গম্বুজটি প্রথম প্রবেশপথে মণ্ডির পরিচয় বহন করছে। আমরা এসেছি উত্তর হিমালয়ের প্রান্তে,—যেখানে তিব্বতী স্থাপত্যের প্রকৃতি স্পর্শ করেছে। পশ্চিম

তিব্বতের প্রভাব এখানে এসে পৌঁছেছে ভারতীয় মেজাজ নিয়ে ; যেমন উত্তর কুমায়ুনে, সিকিম-ভূটানে, দার্জিলিং কালিম্পঙে, পূর্ব ও উত্তর কাশ্মীরে এবং উত্তরপূর্ব পাঞ্জাবে। নেপালে এই স্থাপত্যের আদর্শ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এমন কি কাশীর গঙ্গার কূলে সেই ছোট্ট পশুপতিনাথের মন্দিরটিও এই গঠনতন্ত্রকে ধারণ ক'রে রয়েছে। সমগ্র উত্তর হিমালয়ে তিব্বতী ও মঙ্গোল স্থাপত্যের প্রভাব অতি প্রবল।

শহর-বাজার জনবহুল ; সমতল পথ ঘাট রৌদ্রঝলোমলো। নানা পথ চ'লে গেছে নানান দিকে। ডাকবাংলো এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে, সুতরাং আমাদের পক্ষে একটি ভদ্র হোটেল পাওয়া দরকার। কুলির মাথায় লটবহর চাপিয়ে আমরা একখানা টাঙ্গা ভাড়া করলুম।

টাঙ্গা চললো দোকান বাজার এবং জনতার ভিতর দিয়ে হোটেলের দিকে। আমরা ছিটকে এসে পড়লুম বাস্তব জগতে।

হঠাৎ সন্দেহ হয় তিব্বত এসে ছুঁয়েছে মস্তিকে। শুধু ওই চীন-তিব্বত স্থাপত্যের প্রতীক ঘড়িঘরটি নয়,—ওরা অনেক মন্দির ও দেবদেউলকেও ছুঁয়েছে। প্রায়ই দেখছি সেই ড্রাগনের মূর্তি,—সেই তীব্র দাঁত আর মুখব্যাদান, দুদিকে দুই ডানা। সিংহের কেশর, বাঘের দংষ্ট্রা, কুমীরের লেজ, গরুড়ের ডানা এবং মানুষের ভঙ্গী। শিরা-উপশিরায় প্রচণ্ড তীব্রতা। সমগ্র গঠন, সমস্ত আয়তন,—সমস্তটা যেন বহির্ভারতীয়। কাঠের উপরে আশ্চয কারুকার্য, —তার আঙ্গিক ও সুষমা, তার সুসঙ্গতি ও ছন্দ,—সারাদিন ধ'রে দেখলেও ইচ্ছা মেটে না। এর ছোঁয়াচ এড়াতে পারেনি বহু হিন্দু মন্দির। উখীমঠ, ত্রিযুগীনারায়ণ, তুঙ্গনাথ, যোশীমঠ, বদরিনাথ,—প্রায় সমগ্র উত্তর গাড়োয়ালে এই। সমস্ত নেপালে এ ছাড়া কিছু নেই। সিকিমে ভূটানে এই। আলমোড়া নৈনীতালের অনেক অঞ্চলও এর প্রভাব এড়াতে পারেনি।

বিচিত্র-পোষাক পরিহিত এক-আধজন লামা পথ পেরিয়ে যাচ্ছে। সৌম্য-দর্শন লামাকে দেখলে শ্রদ্ধা জাগে। ওরা এসে অনায়াসে এই ভূখণ্ডে মিলে গেছে। অনেক লামা পুরুষানুক্রমে বাস করে ভারতে,—যেমন অনেক চীনা। নৈনীতাল অঞ্চলের কোনো কোনো পার্বত্য ভূখণ্ডে একদল চীনার প্রচুর জায়গা জমি ছিল এই সেদিন অবধি,—পাহাড়ে পাহাড়ে ছিল কারো কারো জমিদারি,—আজ তারা আছে কিনা জানিনে। এ ছাড়া হুন, আরব, তাতার, এমন কি চেঙ্গিস খাঁর প্রশাখা বংশের ছিটেফোঁটা, এরা আজও আছে ভারতে। সেদিনও তাদের দেখে এসেছি পশ্চিম রাজস্থানের মরুভূমিতে। পৃথিবীর আর

কোনও ভূভাগে ভারতের মতো বোধ করি এমন জাতি-বৈচিত্র্য নেই,- আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা,—কোথাও না।

অবশেষে যেমন-তেমন একটি হোটেল পাওয়া গেল। নামটি ঠিক মনে নেই, বোধ হয় 'স্বরাজ হোটেল' কিংবা অমনি কিছু। হোটেলের নীচেই বড রাস্তা, এইটিই প্রধান রাজপথ,—শহরকে বেষ্টন করেছে। পূর্বদিকে পথের ওপারে ময়দান, তার ওপারে একটি টিলা পাহাডের গায়ে সরকারী দপ্তর ইত্যাদি। এটি আগে ছিল রাজধানী, এখন এটি জেলা শহর। সামন্ত রাজার অধিকার দখল করেছেন ভারত সরকারের নিয়োজিত ডেপুটি কমিশনার। রাজা আছেন, প্রিভি পার্স-ও তিনি পান। কিন্তু এখন তাঁর দখলে সৈন্যসামন্ত অথবা অস্ত্রসজ্জা কিছু থাকার হুকুম নেই। বোধ হয দুই চার বডিগার্ড তাঁব আছে, হয়তো বা এক-আধটা পাখীমারা গাদা বন্দুক,—ওটা সঠিক জানিনে!

হোটেলে জিনিসপত্র নামিযে আমরা খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পডলুম। দুধ, মিষ্টি আর শিঙ্গাডাব দোকান পাওযা গেল। বলা বাহুল্য, ক্ষুধা এবং অধ্যবসায় দুই আমাদের প্রচুর। আহার্যের পরিমাণ দেখে হয়তো স্বয়ং দোকানদারও আডচোখে ঈষৎ বিস্মিত হয়ে থাকবে। ভোজনান্তে পানের দোকান দেখে খুশী হলুম। এব পর আমাদেব সময ছিল কম। ওখানে মস্ত বড কলেজ আব ইস্কল—সমস্তই একে একে দেখা দবকার। ঘুরে ঘুরে দেখা গেল এপাডা আব ওপাডা। সরু সরু ঘিঞ্জি গলিপথ, ওরই মধ্যে বসবাস করে রাজপুত বংশেব মেযে আর পুরুষ। মেয়েরা সুশ্রী, পুরুষ শ্যামবর্ণ, মাথায রাঙা পাগডী, পরনে চুডিদার। মেযেদের পরনে সাধাবণত শাডী নয়,—পাযজামা, পাঞ্জাবী আর উত্তরী। গতকাল অবধি নাকি মস্ত হাট বসেছিল, আজও সেই ভাঙাহাটের রাশি রাশি সামগ্রীসম্ভার পথে-পথে থৈ থৈ করছে। ঘুরতে ঘুরতে আমরা গেলুম অনেক দূর। কিছুদূর এগিয়ে গেলে দুটি নদীব সঙ্গমস্থল দেখা যায়। যারা দেখেছে গাডোয়ালের দেবপ্রযাগ আর রুদ্রপ্রয়াগ—যেখানে অলকানন্দা মিলেছে এসে নীলধারায, অথবা মন্দাকিনী মিলেছে অলকানন্দায়,—তারা এ ছবি সহজে কল্পনা করবে। একটি নদী বিপাশা, অন্যটির নাম মনে নেই। শেষেরটি এসেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, ওরই পথ ধ'রে দক্ষিণে গেলে 'সুকেত' তথা সুন্দরনগরের বিশাল উপত্যকা। তারপর সেই পথটি আবার

গিয়েছে দক্ষিণে,—শতদ্রু নদী 'অতিক্রম ক'রে বিলাসপুর রাজ্যে। অধুনা বিলাসপুর হিমাচল প্রদেশেরই অন্তর্গত।

অনেক পথ রইলো বাকি, অনেক ছায়াবীথিকা রইলো অনাবিষ্কৃত, অনেক নিভৃত নিকুঞ্জলোক যেন পাহাড়ে পাহাড়ে হাতছানি দিল। চারিদিকে পাহাড়ের অবরোধ, কিন্তু তারা দূরবর্তী। বাইরের পৃথিবী চোখে পড়ে না, কিন্তু এই হিমালয়ের প্রাকারঘেরা অবরোধের মধ্যেও এখানকার নিজস্ব জগৎটি সুপ্রসারিত।

বনময় পাহাড়তলীর পটভূমি,—তারই মাঝখানে মহাকালীর মন্দির। ওখান থেকে ডাক দিচ্ছে শক্তিকে পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে-অরণ্যে, উন্মাদিনী বিপাশার তরঙ্গরণরঙ্গে। এদিকে ত্রিলোকনাথ, শহরের মধ্যে ভূতনাথ। এরা বহু প্রাচীন, সন-তারিখ হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। আরও আছে নানাবিধ দেবস্থান, আছে মূর্তি, আছে বিচিত্র স্থাপত্য—কিন্তু তাদের সেই অভিব্যক্তির সঙ্গে নিজের প্রকৃতিকে মেলাতে পারছি নে। এরা ওই তিব্বতী-চৈনিক-মঙ্গোলীয় নয়, এরা যেন আবার আগাগোড়া ভিন্নগোত্রীয়। এদের দেখিনি আগে, এরা ভারতের অন্য কোথাও নেই। সিকিমে-ভূটানে নেই, গাড়োয়ালে নেপালে ওদের দেখিনি, উত্তর কুমায়নে-কিন্নরদেশে এ ধরন নয়,—এরা নতুন। এরা আভাস দেয় অতি প্রাচীনের—যখন নদীতীরে ব'সে মানুষ প্রথম জপ করতে শিখেছে, শিলাতল ছেড়ে যখন মন্দির নির্মাণ কল্পনা করেছে,—হয়তো বা এরা সেই যুগের। সেকালের ভাস্করের মধ্যে যে ভাষ্য থাকতো, যে-ব্যাখ্যা তারা ক'রে যেতো, পরবর্তী কালে সেই ভাস্কর্য হারাতো আপন অর্থ। কোনও শিল্পীর নাম নেই কোথাও, কেউ কখনও আপন স্বাক্ষর রেখে যায়নি। মহাকালের হাতে তুলে দিয়ে গেছে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজেকে বিলুপ্ত ক'রে গেছে। অজন্তায় দাঁড়িয়ে দেখছি পদ্মশিথানশয়ান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ মূর্তি, বোম্বাই সমুদ্রগর্ভে হস্তীগুহার ত্রিমূর্তি, নেপালের স্বয়ম্ভূ, সৌরাষ্ট্রের সোমনাথ, পূর্বলোকে কোনারক,—কোথাও কোনও শিল্পী রেখে যায়নি আপন স্বাক্ষর। অনেক স্থাপত্য আপন অর্থ হারিয়েছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে বিস্ময়ের মতো। মণ্ডিতে এসে চমক লাগে, এ একেবারে নতুন, এর জ্ঞাতিগোত্র সমতল ভারতে চোখে পড়ে না। পৃথিবীর কোনও দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মানুষের এই আত্মনিবেদন নেই, আনন্দ এবং সৌন্দর্যবোধের দিকে বৃহত্তর মানবতাকে অনুপ্রাণিত করবার এমন দেশজোড়া স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের আয়োজন কোথাও নেই, মহাজনতার আনন্দ আর উদ্দীপনার জন্য তারা উৎসর্গীকৃত।

পাহাড়ী দেশে সর্বত্র যেটি লক্ষ্য করেছি এখানেও তাই। বিরোধ কোথাও

নেই। সংসারযাত্রা নিরীহ। মানুষের মুখে কোনো উত্তেজনা দেখিনে, ছুটছে না কেউ, তাল ঠুকছে না কোনো প্রতিযোগী, কর্মব্যস্ততায় সংঘর্ষ বাধছে না, সমগ্র শহর যেন আনন্দের হাটে মিলেছে। হিমালয়ের হাওয়া মালিন্যকে দাঁড়াতে দেয় না।

বেলা প'ড়ে এলো। আমাদের যাবার সময় হয়ে আসছে। আমাদের গাড়ী ছাড়বে অপরাহ্ণে।

মণ্ডি অবধি যাত্রীর ভিড় থাকে। কারণ শহরটি বড়, এবং হয়তো বা শিমলার পরে দ্বিতীয় রাজধানী হয়ে ওঠার অপেক্ষা রাখে। এই শহরটি থেকে পথ গিয়েছে নানা পাহাড়ে এবং উপত্যকায়। পূর্বদিকে বিপাশা নদীর তীর ধ'রে গেলে প্রসিদ্ধ লারজি উপত্যকার দিকে যাওয়া যায়। এই লারজির পথটি আগে ছিল না। এটি শুধু অগম্য নয়, অসম্ভবও ছিল। একদিকে ছয় হাজার ফুট উঁচু পাথরের পাহাড়,—এবং সেই মনুষ্যত্বহীন পাথুরে পাহাড় অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় ঝুঁকে থাকতো বিপাশাব স্রোতের উপর। সে দৃশ্য আশ্চর্য, এবং প্রকৃতির এই অদ্ভুত চেহারার মধ্যে মানুষ প্রবেশ করতে সাহস পেতো না। সেদিন লারজিব এই বিপাশা পথ ধ'রে পায়ে হেঁটে কুলু উপত্যকায় যাওয়াটাও ছিল অতীব কষ্টকব। সেই কারণে কুলু যেতে গেলে যোগিন্দরনগব থেকে বেবিয়ে গুমা ও ঘাটাসানি হয়ে যাওয়াটাই ছিল অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। হিমালয় এখানে যেন তার আদিম অভিব্যক্তির দিকে পর্যটকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করছে। আমবা অবাক হয়েছিলুম।

আমাদের গাড়ী ছাড়লো অপবাহ্ণে যথাসময়ে। কুলুর খ্যাতি ইদানীং কম নয়। অনেকে বলে, কাশ্মীরের পরেই কুলু। এর কৈফিয়ত আছে। ভূস্বর্গের সঙ্গে শোভা সৌন্দর্যের তুলনা নয়, এ ছাড়া অন্য কিছু,—যেটি পথিকের পক্ষে পবম বিস্ময়। আসামেব উত্তরপূর্ব কোণে মিসমির অজানা অনামালোক ছাড়িয়ে যেখানে নিবাট নামচা বাবোযাব সীমানা, চমলহরির নীচের দক্ষিণপূর্বে যেখানে ভূটানেব অনাবিষ্কৃত এবং মানবচিহ্নহীন রহস্যগর্ভ হিমালয়, শতদ্রু যেখানে পথ কেটেছে শিপকির গিরিসঙ্কট রংচুং এলাকায়— যে-পথ গিয়েছে কিন্নরলোক পেরিয়ে 'ধবলশিঙ্গে'র শিখরে-শিখরে, অথবা উত্তর নেপালের জগৎপ্রসিদ্ধ অরুণ নদ যে-পথ দিয়ে বিশ হাজাব ফুট উঁচু পাথর কাটতে-কাটতে নেমে এসেছে,—লারজি এবং কুলুর পথে সেই ধরণের অতিপ্রাকৃত বিস্ময় প্রসারিত। আমরা তন্ময় হয়ে ছিলুম।

বোধ হয় স্থান কালের প্রভাব পড়েছিল মনে। যে-ভারতবর্ষে বাস ক'রে এসেছি এতদিন, এখানে সেই ভারতবর্ষের ছায়া পড়েনি। অতি প্রাচীনের

সঙ্কেত রয়েছে এই 'সর্বকাল এবং সর্বলোক বিচ্ছিন্ন হিমালয়ের অন্তঃপুরে। আমি আধুনিক ভারতের সংবাদ এনেছি ওর সামনে, কিন্তু কে শুনছে? অগণ্য শতাব্দীর যোগতন্দ্রায় যেন ওর নিমীলিত দৃষ্টি,—চোখে মুখে অনাদি অনন্ত কালের ক্ষমাস্নিগ্ধ শান্ত প্রসন্নতা। মাথা নত হয়ে আসে ওর দিকে তাকালে। একালের রুচি এনেছি সঙ্গে, এনেছি এযুগের বিজ্ঞানের অহঙ্কার, এনেছি আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার আবর্জনাকুণ্ড থেকে অধঃপতিত প্রকৃতি-বিকার, এনেছি জীবনের অনেক মালিন্যের ধিক্কার,—কিন্তু ওই প্রাচীন অচলায়তন ঋষির ধ্যানভঙ্গ হচ্ছে না। পুরুষপরম্পরায় এসেছে অনেক মানুষ, ওর স্নেহচ্ছায়ায় একটির পর একটি শতাব্দী ধ'রে দলে দলে তারা চ'লে গেছে, কত আধুনিক মিলিয়েছে কত অতীতে, কত ভবিষ্যৎ কতবার ঘুরেছে ওর চক্রতীর্থপথে,– কিন্তু নির্বিকার সুপ্রাচীন চেয়ে রয়েছে অপলকচক্ষু মহাকালের মতো ভ্রূক্ষেপ তার কিছুমাত্র নেই। বিপাশার শিলাতলে, প্রাচীন মন্দিরের সোপানে, দেওদারের অরণ্যে, অমিতকায় পাষাণপৃষ্ঠের ভাস্কর্যে, প্রাগ্‌বৈদিক ভারতের ছায়াসুনিবিড় অতীন্দ্রিয় চেতনায়—দেখে গেলুম ওই মহাযোগীর চকিত পদসঞ্চার, নিয়ে গেলুম আমার মর্মের রোমাঞ্চ শিহরণে তাঁর নিত্যকালের বাণী : শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।

ঠিক মনে নেই, আন্দাজ মাইল খানেক দক্ষিণে এসে একটি ঘাঁটি পাহারা, অর্থাৎ চেক পোষ্ট পড়ে। এখানে একটি পুরাতন সাঁকো পেরোবার কালে ড্রাইভারকে সতর্ক করা হয়। একটি লোক পিঠে একটি নোটিশ ঝুলিয়ে গাড়ীর আগে আগে হেঁটে চলে, অর্থাৎ স্পীড্ একেবারেই দেওয়া চলবে না। যদি স্পীড দাও, তবে লোকটিকে চাপা দিয়ে যাও। নীচের দিকে কাঠের ফাঁকে ফাঁকে প্রবল পরাক্রমে মাতামাতি করছে মদমত্ত বিপাশা,—গৈরিক তরঙ্গ তার চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে পাথরে পাথরে। এটি হোলো দুই নদীর সঙ্গম। সম্ভবত যে বৃষ্টি হয়ে গেছে গত দুদিন পাহাড়ে-পাহাড়ে, তারই দুরন্ত স্রোত সংহার-মূর্তিতে নামছে দুই ধারায়। ওদের আঘাত প্রতিঘাতে, সংঘর্ষে, তাড়নায়, হিংস্রতায় এবং বিপ্লব-বিক্ষোভে উৎক্ষিপ্ত শিকরকণায় মুহুর্মুহু ধূম্রজাল সৃষ্টি হচ্ছে। ওদের ওই আত্মঘাতী প্রাণযন্ত্রণার দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল আরোহীরা।

সাঁকো পেরিয়ে গাড়ী ঘুরলো ডানদিকে এবং ডানদিকেই বিপাশার তীরে-তীরে চললো অতি সংকীর্ণ পথ লারজির দিকে। কুলু উপত্যকায় যাবার এইটিই একমাত্র মোটরপথ।

পথের চেহারা ভালো নয়,—সরু এবং কর্কশ। এমন অসমান যে, মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়। মোটরবাসটি আরামদায়ক নয়। যত বেগে চলে, শব্দ

হয় তার চেয়ে বেশী। পথটি একতরফা, অর্থাৎ বিপরীত দিক থেকে কোনও গাড়ী আসবে না। বিপাশা এখানে ঘুরেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে পূর্বে, তারপব পুনরায় গেছে উত্তরে। আমাদের গতি স্রোতের বিপরীত দিকে।

গাড়ীর মধ্যে উঠেছেন একজন বর্ষীয়সী মহিলা এবং তাঁর পাশে একটি যুবক। নিঃসন্দেহে, মাতা ও পুত্র। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। এবার ভালো ক'রে না তাকিয়ে পারা গেল না। মহিলাটি বয়সে প্রবীণ, কিন্তু তাঁর আবজনোচিত দৈর্ঘ্য, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য, শরীরের ধবধবে রং, মিহি বেগুনী মখমলের গাত্রাবরণ, তাঁব আগুল্‌ফলম্বিত শুভ্রবর্ণের গাউন, মাথায় রেশমী ওড়না এবং পায়ের দিকে সাদা মোজা ও ক্যাম্বিশের জুতো,—এদের সঙ্গে তাঁর স্থির শান্ত এবং নির্বিকার চাহনি, সবগুলি মিলিয়ে এমন একটি সম্ভ্রমসূচক ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, যেটি এমন ক'রে আগে দেখিনি। পাশের যুবকটির বয়স অল্প, সে গলাবন্ধ কোট এবং চুড়িদার পরেছে। সবাই মিলে গাড়ীর মধ্যে বসেছি, কিন্তু মহিলার মাথাটি উঠেছে সকলেব মাথা ছাড়িয়ে। সকলেই আমরা তাঁব কাছে যেন ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে গেছি। দীর্ঘ বাহু, বিস্তৃত স্কন্ধদেশ, চওড়া মুখের চোযাল, মাথার উচ্চতা, ছাড়ালো দুই পা, —আব কেউ না হোক, আমি নিজে অবাক। আবেকটি বস্তু ছিল তারিফ করার মতো। তাঁব সমস্ত পোশাক পবিচ্ছদে লাল, সবুজ, পীত, কৃষ্ণনীলাভ, গৈরিক,—ইত্যাদি বিবিধবর্ণের এমন সুন্দর সমাবেশ ছিল যে, আমার কৌতূহলেব সীমা ছিল না। তাঁর এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের গুণে সমগ্র গাড়ীখানা যেন অভিনব গৌরব লাভ করছিল।

পথ ক্রমশঃ সঙ্কটাপন্ন হচ্ছে। একখানি মাত্র ছোট বাস যাবার মতো অতি সঙ্কীর্ণ পথ। একদিকে গভীর খাদ—আমাদের পায়ের নীচে। বিপাশার প্রচণ্ড রণরঙ্গস্রোত বয়ে চলেছে সেই খাদের তলায়। একটি অসতর্ক মুহূর্ত, ব্যস—আমাদের গাড়ী ছিটকে পড়বে দেশলাইয়ের বাক্সের মতো পাচশো কিংবা হাজার ফুট নীচে,—অবধারিত মৃত্যু। পাহাড়ের পাথর ঠিক যেন অতিকায় সর্পের ফণার মতো মাথার উপরে ঝুলছে। সামান্য খোঁচা যদি লাগে, চলন্ত গাড়ী সেই ধাক্কা কোনমতেই সামলাতে পারবে না,—টাল খেয়ে ছিটকে যাবে বিপাশায় তলিয়ে। মাইলের পর মাইল এই বিপজ্জনক পথ ধ'রে গাড়ীখানা হোঁচট খেয়ে খেয়ে চললো, এবং আমরা আকণ্ঠ উদ্বেগ, শঙ্কা, অস্বস্তি এবং আতঙ্ক নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে কাঠ হয়ে রইলুম।

কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য উদ্বেগ ও ভয়ের কথা ভুলে যেতে পারলে এমন একটি

রূপজগৎ তার রহস্য আবরণ উন্মোচন করতে থাকে যে, আপন অস্তিত্বকে অবাস্তব মনে হয়। হঠাৎ এসে পড়েছি একটি মায়াচ্ছন্ন লোকে। প্রত্যেকটি পার্বত্য গুহা পেয়েছে মন্দিরের আয়তন, এবং অজস্র বিচিত্র পুষ্পলতা ও গুল্মে আকীর্ণ সেই সব গুহালোকের ভিতরে যে নিঃশব্দে পূজার্চনা চলছে, এটি বিশ্বাস করতে মন প্রবৃত্ত হয়। বিশাল প্রাচীন এক একটি পাথরের স্তবক অবিকল ঋষির আকারলাভ করেছে, এবং আকাশের মেঘস্তূপের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে আমরা যেমন নানাবিধ অতিকায় জন্তু এবং বিরাট দেব ও দানবের ছবি চিনে-চিনে বার করি,—এখানেও তাই, স্পষ্ট চক্ষে দেখতে পাচ্ছি মুনি ঋষি যোগী এবং অতি-মানবকে। ওরা সবাই যেন স্থির হয়ে আছে, চেয়ে দেখছে নতুন কালের মানুষকে। অসংখ্য প্রপাত এবং নির্ঝরিণী নামছে ওদেরই জটা থেকে ওদেরই বুকের উপর দিয়ে। এই অতি-প্রাকৃত বিস্ময় একবার মাত্র দেখে এসেছি অমরনাথের তীর্থপথে মহাগুনাস গিরিসঙ্কটে—যেখানে পথের পাশেই একজন 'যোগিশ্রেষ্ঠ' দাঁড়িয়ে। প্রবাদ, তিনি নাকি ছয় হাজার বছর আগে ওদিকে গিয়েছিলেন, এবং পথের শোভা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যান। তাঁর শরীর হিম-তুষারে আচ্ছন্ন হয়, এবং কালক্রমে সেটি প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। অজস্র ফুলের বিবিধ বর্ণে ও গুল্মলতায় তাঁর বিশাল দেহ ছিল আকীর্ণ। অবাক হয়ে দেখছিলুম অনেকক্ষণ। এখানে ভিন্ন কথা। সমস্তটাই যেন জীবন্ত, প্রাণময়। বুঝতে পারছিনে ওদের ভাষা, জানতে পারছিনে ওদের ওই নিঃশব্দ সমাজকে। ঠিকমতো ধরতে পারছিনে আমার অস্তিত্বটা সত্য, কিংবা ওদের ওই নিত্য জাগ্রত অবস্থানটাই বাস্তব। আমি নিজে রূঢ় বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ, আমার এই অতিভ্রম দেখে হাসবে সবাই,—যারা বিজ্ঞানী। কিন্তু এখান দিয়ে পেরোবার সময় তারা সত্যি হাসবে কি? যেটা আমার জ্ঞান এবং বুদ্ধির অতীত, সেটাই কি অবিশ্বাস্য। যেটি আজও জানতে পারিনি, সেইটিই কি অশ্রদ্ধেয়? এ অহঙ্কার কেন?

আত্মা সর্বব্যাপী,—বিজ্ঞানের এইটি শেষ আবিষ্কার। প্রাণ আছে পাথরে, হাওয়ায়, পরমাণুতে, চৈতন্যবিন্দুতে, এই হোলো বিজ্ঞানের সর্বশেষ আলোক-সম্পাত। সেই বিন্দুর বিদারণ মানেই সেই প্রাণের বিস্ফোরণ। সবাই বলছে, থামাও পারমাণবিক আর হাইড্রোজেন বোমা,—নৈলে সৃষ্টি রসাতলে যায়! যে অণুর দ্বারা মানুষের সৃষ্টি, সেই অণুতেই পাথর তৈরি। প্রথমটায় পেয়েছি সৃষ্টির পরম বিস্ময়, দ্বিতীয়টা অনাবিষ্কৃত। পাথর কথা কইবে, গাছের ভাষা শুনবো—এরই জন্য আজ প্রস্তুত হচ্ছি। একশো বছর আগে কেউ ভেবেছিল মানুষ উড়বে, বেতারে গান গাইবে, পর্দায় মানুষের চেহারা

নড়বে এবং তার প্রকৃত কণ্ঠস্বর শুনবো? যাদের এতকাল ধ'রে বলা হয়েছে জড, তারা কি জড়তা ঘোচায়নি? 'অসম্ভব' কথাটা কি আজও থাকবে অভিধানে?

বন্য গোলাপের ঝাড, আপেল ডালিমের বন, শ্লেটপাথরের পাহাড, কর্কশ শিলাসম্ভার, রহস্যগর্ভ গুহাপথ এবং আতঙ্কসঙ্কুল বিপাশার খদ,—এদের ভিতর দিয়ে কুলুর দিকে গাড়ী চললো।

॥ ৫ ॥

প্রাচীন ঋষিকুলের মধ্যে প্রধানত আমরা দুজনকে পাই যারা প্রচুর পরিমাণে হিমালয়ে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মহাভারত রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস, অন্যজন সূর্যবংশের রাজগুরু মহামুনি বশিষ্ঠ। মহর্ষি বেদব্যাস প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য খুঁজে ফিরতেন, এবং পছন্দসই একটি অঞ্চল পেলেই তিনি নদীতীরের শিলাসনে, কিংবা ছায়াচ্ছন্ন গুহাভ্যন্তরে, অথবা কোনও নির্জন তুষারচূড়া নির্বাচন ক'রে নিতেন। রাজগুরু বশিষ্ঠ ত্রেতাযুগের মানুষ ছিলেন। তিনি ভালোবাসতেন তপোবন, পুষ্পাঙ্গন,—এবং একখানি কুটীর। বশিষ্ঠ ছিলেন আশ্রমিক, সুতরাং তিনি যেখানেই গেছেন, একটি ক'রে আশ্রম সৃষ্টি করেছেন। আসামের হিমালয় থেকে কাশ্মীরের হিমালয় অবধি রাজগুরু বশিষ্ঠ মোট বারোটি আশ্রম পরিচালনা করেছিলেন। নবতম একটি আশ্রমসৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়ে তিনি একদা আসেন হিমাচলের এই অন্তঃপুরে, কুলু উপত্যকার উত্তর প্রান্তে। এখানকার হিমালয়ের অত্যাশ্চর্য নিসর্গশোভা দেখে তিনি ভাবস্থিত হয়ে যান এবং হিমালয়ের কঠোর তপস্যায় যোগস্থবির হন। সেই তপস্যার সিদ্ধিলাভ করে তিনি উত্তর কুলুর একটি অতি মনোরম নিভৃত অঞ্চলে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কুলুর অন্তর্গত মানালি জনপদ থেকে দুমাইল দূরে রাজগুরু বশিষ্ঠের কুণ্ড ও আশ্রম আজও বিদ্যমান।

ত্রেতা এবং দ্বাপরের মধ্যে কালের ব্যবধান কত, আমার জানা নেই। পাঁজিতে যাই থাক, অন্তত হাজার দশেক বছর হবে সন্দেহ কি। দ্বাপর যুগে মহর্ষি বেদব্যাস একদা বেরোলেন হিমালয়ে। কিন্তু কূর্মাচল তথা কুমায়ুন গিরিশ্রেণীর এখানে-ওখানে ছাডা মহর্ষি তাঁর স্মৃতিচিহ্ন আর বিশেষ কোথাও রেখে যাননি। ব্রহ্মপুরার ভূখণ্ডে ব্যাসদেব সর্বত্র নিত্যস্মরণীয় হয়ে আছেন।

দ্বাপর যুগের স্মরণাতীত কালে হয়তো মহর্ষি বেদব্যাসের মনে এ কৌতূহল এসে থাকতে পারে যে, রাজগুরু বশিষ্ঠ কোন্ স্থলে গিয়ে হিমালয়ের

দেবতাত্মাকে এমন ভাবে আবিষ্কার করলেন! হয়তো পুরাকালের মনস্তত্ত্ব ছিল ভিন্ন রকমের। সেকালে হয়তো মানুষের সর্বাঙ্গীন যোগ্যতা প্রমাণিত হোতো অতিমানবতার অভিব্যক্তিতে। তপস্যার কঠোরতা এবং সিদ্ধিলাভ এই ছিল হয়তো নেতৃত্বের প্রকৃত কষ্টিপাথর। মহর্ষি বেদব্যাস সম্ভবত তাঁর পূর্বাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে এই হিমালয়ের পরমাশ্চর্য এবং অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু মানালি থেকে দুমাইল দূরে যেখানে বশিষ্ঠের নামে একটি গন্ধকমিশ্রিত উত্তপ্ত জলের প্রস্রবণ বিদ্যমান, সেই পর্যন্ত গিয়ে মহর্ষি থেমে যাননি। হিমালয়ের মায়াবিনী প্রকৃতি এবং আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ তাঁকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায় আরও দূর উত্তরের ভূস্বর্গলোকে। সেই লতাগুল্মহীন প্রাণীচিহ্নবিহীন তুষারশৃঙ্গে আরোহণ করে তিনি দেবলোকের এবং ব্রহ্মলোকের সন্ধিদ্বার উন্মোচন করেন। পরবর্তীকালে সেই তুষারচূড়ার নাম রাখা হয় ব্যাসঋষিশৃঙ্গ।

ঠিক মনে নেই, মণ্ডি থেকে সুলতানপুর অর্থাৎ কুলুশহর বোধ করি আটত্রিশ মাইল পথ। পথ শুধু নতুন নয়, পৃথিবী নতুন, মানুষও নতুন। এদের কাংড়ায় দেখিনি, হিমাচলেও দেখিনি,—এরা সাজসজ্জা সম্পূর্ণ বদলিয়ে অভিনব চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। কিন্নরদেশকে মনে পড়ছে, কিন্তু এরা তারা নয়। এমন শিরোভূষণ দেখিনি আগে,—তিব্বতকে যেন কোমল ক'রে এনেছে। রঙের বৈচিত্র্য মাথায় ধ'রে এনেছে সবাই। আকাশ থেকে রং পেয়েছে, রক্তগোলাপের থেকে ধার করেছে, এনেছে বাসন্তীবর্ণ শৈলউপত্যকার বসন্তবাহার থেকে, মেয়েদের চোখ থেকে পেয়েছে অতল কৃষ্ণাভা, আনারকলি থেকে ধার করেছে রক্তবরণ। মাথার টুপি দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলুম।

তিব্বতী গুম্ফার চতুষ্কোণ গম্বুজের চারটি কোণ যেমন একটু উপর দিকে মোড়া,—এই সুন্দর টুপিগুলির দুই 'কোণ' উপরদিকে ঠিক তেমনি ক'রে একটু মোচড় দেওয়া। তার উপর বর্ণাঢ্যতার ওই বাহার। বর্ণ-সমন্বয় ও সুষমাছন্দে অনেককে ওরা যেন হার মানিয়েছে। পথের মেয়েরা অকারণ হেসে আপন মনে চলেছে। কারো মাথায় কালো, কারো বা লাল কাপড়ের টুকরো কপাল ঘিরে ফেট্টি বাঁধা। পোশাক প্রায়ই সাদা কম্বলের, একটু শীত পড়লে সূতিবস্ত্র ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

ডালিমের বন পাশে পাশে চলেছে। অপরাহ্ণ পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু

পথহারা রঙীন প্রজাপতিরা এখনও বাসা খুঁজে পায়নি। ডালিম আর আনারের বনে তারা এখনও ঘুরছে।

পথ সঙ্কটসঙ্কুল। গাড়ী চলছে অতি সতর্ক হয়ে। পাহাড়ের অতিকায় পাথর এক-এক স্থলে এমন ক'রে ঝুলছে যে, দেখলে ভয় করে—পাছে গাড়ীর চালের সঙ্গে তাদের ঘর্ষণ লাগে। পায়ের নীচে বিপাশার খরস্রোত পাথুরে পাথরে প্রবল কলহ বাধিয়ে ছুটে চলেছে। কাশ্মীরের সেই পণ্ডিতানী এবং তাঁর যুবক পুত্র বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রয়েছেন। গাড়ী চলেছে এঁকেবেঁকে। আমার গন্তব্য এখনও অনেক দূর।

শুধু বিপাশা নয়। আরও দুটি নদী তাদের প্রথম ধারাপথ পেয়েছে এই পার্বত্য ভূখণ্ডে। একটি ইরাবতী, অন্যটি চন্দ্রভাগা। কুলু উপত্যকার দক্ষিণ পাহাড়ের পিছন দিয়ে বন্য শতদ্রু উত্তরপূর্ব থেকে দক্ষিণে আর পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে গেছে। সুন্দরনগরের উপত্যকা থেকে কুমারসাঁই যাবার পথে শতদ্রু পেরিয়ে যেতে হয়। কুমারসাঁই থেকে কোটগড় হয়ে নারকাণ্ডা পৌঁছতে পারলে হিন্দুস্থান-টিবেট্ রোড পাওয়া যায়। অতঃপর রামপুর, ওয়াংটু ও চিনি-কিন্নর হয়ে বুশাহর রাজ্যের ভিতর দিয়ে শিপকির গিরিসঙ্কটে পৌঁছনো চলে। শিপকি থেকে রংচুং উপত্যকার প্রধান ক্যারাভান পথ গারটকের দিকে চ'লে গেছে। গারটক থেকে কৈলাস পর্বতমালার ভিতর দিয়ে ক্যারাভান পথ সোজা দক্ষিণে পৌঁচেছে মানসসরোবরে। এই পথ পনেরো থেকে ষোলহাজার ফুট উচ্চ মালভূমি আর পাহাড়তলী অতিক্রম ক'রে চলে গেছে। এ পথ অতি প্রাচীন। একশো বছরেরও আগেও কাশ্মীর মহারাজার প্রসিদ্ধ সেনাপতি জোরোয়ার সিং—এই অঞ্চলে সংগ্রাম ক'রে লাদাখ প্রভৃতি পশ্চিম তিব্বত ভারতের পক্ষে জয় করেন এবং এই অঞ্চলেই তাঁকে হত্যা করেছিল তিব্বতীরা।

'আউট' নামক একটি পাহাড়ী গ্রামে এসে আমাদের মোটর-বাস থামলো। এ গ্রামটি মণ্ডি আর সুলতানপুরের প্রায় মাঝামাঝি পড়ে। রাস্তাটা একতরফা ব'লে বিপরীত দিকের একখানা গাড়ী ব্যারিয়রের ওপাশে এতক্ষণ আমাদের গাড়ীর জন্যই অপেক্ষা করছিল। এবার সেখানা ছেড়ে গেল মণ্ডির দিকে। ঐ দুখানা ছাড়া আর কোনও গাড়ী আজ আর চলবে না।

কয়েকটি দোকান এবং পুলিশের ফাঁড়ি নিয়ে ছোট্ট একটি গ্রাম। ছোট ছোট কাঠের বাড়ী,—কিন্তু তাদের উপরে খোদাইয়ের কাজগুলি অতি সুন্দর এবং মনোজ্ঞ! পাহাড়ী দেশের বাড়ীমাত্রই কাষ্ঠপ্রধান। কাঠের দেওয়াল, কাঠের মেঝে, কাঠের সিঁড়ি এবং কাঠের সিলিং। কিন্তু ছাদগুলি

অধিকাংশই স্লেটপাথরের। এ পাশের পথ গিয়েছে পাহাড়ী বস্তির মধ্যে। পশ্চিম পাহাড়ের অধিত্যকা অঞ্চলে অল্পস্বল্প ক্ষেত খামার চাষবাস চলছে। অনেক ক্ষেত্রে হঠাৎ মনে হ'তে পারে, কাশ্মীরের কোনও একটি মনোরম অঞ্চলে এসে পড়েছি। ওপাশের একটি ছায়াঢাকা অরণ্যপথ যেন আমারই উদ্বিগ্ন চিত্তের ক্ষুধার বাণী নিয়ে উপরে উঠে গিয়েছে এঁকেবেঁকে। কিন্তু ওই পথটি যে কত দুর্গমে গিয়েছে তার খোঁজ আমরা রাখিনে। নদী পেরিয়ে ওইটি গিয়েছে লারজি উপত্যকায়, সেখান থেকে উঠে গিয়েছে দক্ষিণ পর্বতের গহনলোকে,—গুহায়, গহ্বরে, জলধারার শিরা উপশিরায়, শ্বাপদভয়ভীত আদিম পার্বত্য অধিবাসীর আনাচে কানাচে, অনাবিষ্কৃত ওষধি পর্বতের লতাশিকড়ের বিচিত্র বন্যগন্ধ পেরিয়ে এই পথ উঠেছে এক সময় বিশাল পর্বতের চূড়ায়,—যেখানে 'সানজার' নামক জনপদের প্রান্তে 'বাসলেও' এবং 'জলোরি' গিরিসঙ্কট পরস্পর সংযুক্ত হয়েছে। অবশেষে এই পথ সুদূর দক্ষিণে গিয়ে শতদ্রু অতিক্রম ক'রে কুমারসাঁইতে গিয়ে মিলেছে। বুশাহর রাজ্য থেকে বণিকের দল এই পথ দিয়ে কুলুতে এসে প্রবেশ করে। এই পথে বন্য কুকুর, ভয়াল সর্প, হিংস্র চিতা এবং পীতাভ ভল্লুক অসতর্ক পথিককে অতর্কিত আক্রমণ করে। পাহাড়ী ছাগল এবং অশ্বতরের ক্যারাভান ছাড়া এ পথে আগে চলতো অশ্বারোহী পর্যটক, এখন পথ কতকটা সুগম হওয়ায় ছোট জীপ গাড়ী অতিক্রম ক'রে যায়। শীতের দিনে এ পথ কঠিন তুষারে আবৃত থাকে।

মোটর পথে বিপদের সমূহ আশঙ্কা ছিল,—সুতরাং আমরা আড়ষ্ট হয়ে এতক্ষণ বসে ছিলুম। 'আউট'-এ এসে গাড়ী থামতেই মায়াদেবী এবার গা ঝাড়া দিলেন। সামনে একটি দোকানে বেশ রুচিকর জলযোগের আয়োজন দেখে আমরা যেন সোৎসাহে মরজগতে ফিরে এলুম। ওপাশ থেকে সেই বর্ষীয়সী পণ্ডিতানী প্রসন্ন নয়নে আমাদের এক একবার লক্ষ্য করছিলেন্। তাঁর চাহনির নির্বিকার স্নেহশীলতা যেন আরামদায়ক।

যাত্রীদের জলযোগের সুবিধার জন্যই গাড়ী এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। শরীরতত্ত্ব অনুসারে শোক তাপ দুঃখ ভয় ভালোবাসা অথবা বিচ্ছেদ-বেদনা যখন নিবিড় হয়, তখন ক্ষুধা বাড়তে থাকে। এখানে আতঙ্কের থেকে আমাদের ক্ষুধাবৃদ্ধি ঘটেছে। অন্ত্রতন্ত্র ও স্নায়ুমণ্ডলী ভয়ের মধ্যে এতক্ষণ অবধি প্রবল পরাক্রমে আপন-আপন কাজ করেছে সন্দেহ নেই।

গাড়ী ছাড়লো এক সময়ে। এখনও বেশ বেলা দেখা যাচ্ছে আকাশে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এরপর থেকে পথ কিছু প্রশস্ত হবে। কুলু টুপি

মাথার দিয়ে চলেছে কত লোক, হাসিমুখীরা চলেছে ওদের পাশে পাশে। পিঠে বোঝা নিয়ে চলেছে লাহুলের ব্যবসায়ী। বস্তুত, কুলু উপত্যকা বলতে যা বোঝায় তা হোলো বিপাশা নদীর দুই পার মাত্র। সেটি কখনও সঙ্কীর্ণ, কখনও বা দীর্ঘ। শেষের দিকে কতকটা সমতল, নচেৎ—চড়াই এবং উৎরাই। কোনো কোনো স্থলে এই দুই পার প্রশস্ত হয়ে দুদিকে একমাইল থেকে দুমাইল আন্দাজ প্রায় সমতল ভূভাগে পরিণত হয়েছে,—এই মাত্র। সেখানে চাষবাস চলছে। মাঝে মাঝে এক একটি ক্যান্টিলিভার অর্থাৎ ঝুলাপুলের দ্বারা বিপাশার এপার ওপারের উপত্যকাকে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আবার বলি, পৃথিবী এখানে আশ্চর্য। এ কথা ব'লে যাবো চেচিয়ে, এ অঞ্চলের যেখানে সেখানে স্বর্গের পারিজাত কাননের যবনিকা যেন উত্তোলন করা হয়েছে। সংখ্যাতীত স্বর্গলোকে বিচরণ ক'রে চলেছি,—ব'লে যাবো একথা গলা বাড়িয়ে। সমগ্র সত্তার সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে কে যেন অদৃশ্য হস্তে খুলে ধরেছে অমরাবতীর দ্বার। দেখে নাও প্রাণ ভ'রে,—যা স্বপ্নলোকের দিশাহারা পথেও কোনোদিন দেখো নি। ওই নদীর নীচে শিলাসনে কোথাও ব'সে যাও, কিংবা এসো বনচ্ছায়ায়,—ওক, জুনিপার, চীড়, কিংবা স্প্রুসের তলায় গিয়ে নির্জনে ব'সো তপস্যায়, আর নয়ত আনন্দের বুকফাটা কান্না কেঁদে বেড়াও ওই গুল্মলতাকীর্ণ প্রাচীন পাথরের আনাচে কানাচে, শুধু যে তোমার জীবন কেটে যাবে তা নয়— ঈশ্বরকেও হয়তো বা পেয়ে যাবে সহজে।

ঈশ্বর। মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে গেলুম। ঈশ্বরকে ভাবলেই মনে প'ড়ে যায় নানা দৃশ্য। তপোবনে তপস্যায় বসেছেন ঋষি, শাক্যসিংহ অধ্যাত্মক্ষুধায় কেঁদে বেড়াচ্ছেন আর্যাবর্তের পথে পথে, মৌর্যসম্রাট অশোক অসীম পিপাসা নিয়ে পরিভ্রমণ করছেন আসমুদ্রহিমাচলে, তত্ত্বসন্ধানী দার্শনিক চেয়ে রয়েছেন অনন্ত প্রশ্ন নিয়ে,—এরা ভিড় ক'রে আসে মনে। এর পরে আবার পট পরিবর্তন ঘটে। চেয়ে দেখি, মানুষ রুদ্ধশ্বাস হচ্ছে অপমানে, অলজ্জ মালিন্যে তার জীবন বিকৃত, নৈতিক অধঃপতনে একটি জাতির ভয়াবহ পরিণাম, হাস্যকর দম্ভে সভ্যতার কদর্য স্বরূপ। ফিরে তাকাও আবার অনেক নীচে। নোংরায় মুখ থুবড়ে রয়েছে কেউ, আর্তনাদ শুনছি নিরন্নের, নিরুপায় শরণার্থীর বীভৎস অপমৃত্যু ঘটেছে চোখের সামনে,—ঈশ্বর যেন রয়েছে ওদের মাঝখানে। যন্ত্রণায় দুঃখে সঙ্কটে বেদনায় অপমানে ঈর্ষায় ঘৃণায় পাশবিকতার ধিক্কারে পলকে পলকে দেখে নিয়েছি ঈশ্বরকে।

পৃথিবীর মধ্যে যে-মন্দিরটি সর্বশ্রেষ্ঠ, দেবতা সেখানে নিত্য জাগ্রত,—

সেটি হোলো মানুষের প্রাণ। ওই প্রাণের মূল দণ্ডের থেকে কতবার আমার বাসাছাড়া পাখী রাত্রির অন্ধকারে ব্যোমলোক পেরিয়ে উড়ে গেছে দুর্লভ নীলপদ্মের সন্ধানে, ডাক দিয়েছে অনেকবার ওই মহাশূন্যপথে, তার বিদীর্ণ কণ্ঠে রক্ত ঝরছে অনেক,—ঝড়ের হাওয়ায় অশ্রু উড়ে গেছে অনেকবার। কিন্তু আজ বিপাশার তটভূমিপথে যেতে যেতে তার হিসাব নিতে মন কেন চাইবে? তবু এখানে এই অভিনব পটভূমির মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি অমরাবতীর সেই আশ্চর্য ছায়া। যদি বলো, এই স্বর্গ—আপত্তি নেই। যদি বলো, উনি আনন্দস্বরূপ—প্রতিবাদ করবো না। উনি আমাকে নিয়ে আনন্দ করেছেন বৈকি। মধ্যরাত্রের ভয়াবহ অরণ্যালোকে উনি আমাকে বহুবার ডেকে নিয়ে গেছেন, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত্রির সমুদ্রে উনি দেখিয়েছেন করাল মৃত্যুস্বরূপ, সমগ্র ভারতের পথে-পথে রৌদ্র ঝড়ে বন্যায় উনি আমাকে বানিয়েছিলেন লীলাসহচর। -তারপর এই হিমালয়ের হাজার হাজার বর্গমাইলে পোষমানা জন্তুর মতো প্রতি পাথর শুঁকে শুঁকে অর্থহীন অন্বেষণে পরিভ্রমণ ক'রে ফিরেছি। কাঁদিয়েছেন উনি অনেক, মুখে অন্ন তুলতে দেননি, দুর্যোগের দ্বারা আশ্রয় ভেঙে দিয়েছেন, সঙ্গীকে নিয়ে গেছেন ছিনিয়ে, মৃত্যুকে লেলিয়ে দিয়েছেন পদে পদে।

আজ আবার নতুন চেহারা এসে দাঁড়ালো বিপাশার দুই তটে। নতুন ক'রে আমার চোখের সামনে স্বর্গ রচনা চলতে লাগলো। ওপারের মায়াকানন ডাক দিচ্ছে অমর্তলোকে, এঁকে যাচ্ছে বর্ণের আলিম্পনা। বিপাশার উৎক্ষিপ্ত শিকরকণার ধূম্রজালের ভিতর দিয়ে দেখছি, অকাল বসন্তের রুদ্ধ সুরভিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হচ্ছে বনে-বনে। প্রতি বৃক্ষচ্ছায়ায় তপোবনের শান্তশ্রী, প্রতি প্রস্তরের গুল্মজড়িত গাত্রে অলক্ষ্য মুনির অবয়ব, প্রতি পার্বত্য নির্ঝরিণীর ঝুমুর-ঝনকে বেদমন্ত্রধ্বনি, প্রতি রঙীন পাখীর কলস্বনে ঋষিকন্যার কলকাকলী। ওরা আমাকে যেন স্থির থাকতে দিচ্ছে না।

উপত্যকা ঈষৎ প্রসারিত হচ্ছে। দেবভূমে আমরা প্রবেশ করেছি। কলু উপত্যকার ভিন্ন নাম হোলো, 'দেবভূম,'—**Valley of Gods.** চেতনার উপরে এসে পৌঁছয় শান্ত গভীর একটি প্রসন্ন আনন্দের অনুভূতি—এটিকে বলা হয়েছে দৈব। এখানে এলে মন ভাবতে থাকে দেবতার কথা, সুতরাং এটি দেবভূম। দেখতে দেখতে আমাদের বাস্ এসে পৌঁছলো 'বাজৌরার' একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। এখানে বহু শতাব্দীকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব শোভাময়

বাজৌরার প্রাচীন মন্দির—এখানে শৈব ও শাক্তের উপাসনা চলে। মন্দিরের বর্ণ হোলো গৈরিক, এবং এর অনন্যসাধারণ ভাস্কর্য উত্তর ভারতের যে কোন শ্রেষ্ঠ মন্দিরের সমতুল্য। এককালে চান্দেল্লা রাজপুত গোষ্ঠী যে কালজয়ী প্রতিভা ও সৌন্দর্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে বিন্ধ্যপ্রদেশে 'খাজুরাহোর' মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিল, এ-মন্দিরে যেন তাদেরই ছায়া পড়েছে। 'বাজৌরার' প্রাচীন মন্দির সমগ্র 'দেবভূমকে' যেন পরমার্থদান করেছে।

এই দেবভূমের আলোচনায় আরেকটি অঞ্চলের কথা মনে প'ড়ে গেল। সেটি হোলো 'পার্বতী উপত্যকা'। মানালি থেকে 'পার্বতী উপত্যকা'র দিকে অগ্রসর হওয়াই সুবিধা, কেননা এখান থেকে বাহনের ব্যবস্থা করা যায়। 'ভুন্তারগাঁও' থেকে 'পার্বতী' পৌঁছতে দুদিনের কম লাগে। এই অঞ্চল কুলুরই অন্তর্গত, কিন্তু কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। এর বন্যাতেই হোলো শোভা, সভ্যতার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রার মধ্যে যে সুপ্রাচীন স্বভাবকৌমার্য আমরা কল্পনা করি, -সম্ভবত সেই বস্তুর চিহ্ন এখানে মেলে। চারিদিকে গগনচুম্বী বিরাট গিরিচূড়াদলবেষ্টিত এই বহুবর্ণা নন্দনসুশোভিতা উপত্যকাকে যারা নাম দিয়েছে 'পার্বতী', তাদের নমস্কার জানাই। এই পার্বতীর ভিতর দিয়ে প্রস্তরসঙ্কটসংঘর্ষ অতিক্রম ক'রে যে দুরন্ত নদী নেমে এসেছে, তার দুই পারের জনশূন্যহীন অরণ্যালোকে হিমালয়ের আদিম অতিপ্রাকৃত স্বরূপটি চোখে পড়ে। পার্বতী নদী এসে মিলেছে বন্য বিপাশায়।

বাজৌরা থেকে কয়েক বর্শি পথ দক্ষিণে এগিয়ে গেলে একটি পথ উত্তরপূবে 'মণিকরণের' দিকে চ'লে গেছে। কিছুদূর গিয়ে নদীতীরে তীরে দুইপারে উত্তুঙ্গ গিরিশিখরলোকে। কোথাও কোথাও শস্যক্ষেত্র, এবং তারই পাশে পাশে চড়াই উৎরাই। এমনি ক'রে অগ্রসর হয়ে গেলে পর্বতপ্রাকারের কোলে 'মণিকরণে' পৌঁছনো যায়। চিত্রপটের মতো এই ছোট জনপদ। গ্রামের নরনারী অতি সদাশয় এবং অতিথি বৎসল। মানুষের তঞ্চকতা, দুষ্প্রবৃত্তি অথবা নৈতিক অধোগতির সঙ্গে এখানকার স্বল্পতুষ্ট অধিবাসীর কোনও পরিচয়ই নেই। দেবদেউল রয়েছে এখানে-ওখানে। অধিবাসীরা সুশ্রী ও ভদ্র। এখানকার প্রসিদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করা বিশেষভাবে স্বাস্থ্যকর। বাতব্যাধি, পক্ষাঘাত, চর্মরোগ এবং অজীর্ণরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। পার্বতী উপত্যকাটি 'মণিকরণের' জন্যই সুবিখ্যাত। কুলু থেকে প্রথম যাত্রারম্ভে পথের ধারেই পড়ে একটি 'শক্তি' মন্দির। উপত্যকার মেয়েরা এখান থেকে সিন্দুর নিয়ে আপন-আপন ললাটে লেপন করে। সিন্দুরশোভিত

নারী দেখে চলেছি পথে পথে। বাঙালী মেয়ের স্বভাব ছুঁয়ে রয়েছে ওদের সর্বাঙ্গে।

সায়াহ্নকালে এসে পৌঁছলাম 'সুলতানপুরে'। এইটি আমাদের গন্তব্য। এরই আধুনিক নাম কুলু শহর। বিপাশা নদীর তীরে এখানে উপত্যকা বেশ সুপ্রশস্ত,—একটি ছোটখাটো পার্বত্য শহর নির্মাণের পক্ষে স্থান সঙ্কুলান হয়ে যায়, এর শহর প্রধান সরকারীকেন্দ্র। কাংড়া, ধরমশালা, পালামপুর এবং গোবিন্দনগরের পরেই সুলতানপুর, ওরফে কুলু। গাড়ী থামলো এসে একটি সুন্দর নাতিবৃহৎ ময়দানের সামনে, যার পশ্চিম সীমানায় ডাকবাংলো। আমাদের সঙ্গেই গাড়ী থেকে নামলেন কাশ্মীরের পণ্ডিতানী এবং তার যুবক পুত্রটি।

এবার একটি স্থূল বিষয়ে আলোচনা করব। ১৯৫৩ সালের সে চত্বরেও এ অঞ্চল অনুন্নত ছিল। বাইরে গিয়ে কুলু উপত্যকা সম্বন্ধে যে-প্রকার প্রচারকার্য চালানো হত, সেটি সত্য নয়। হোটেল ছিল না বললেই চলে। খাদ্যাদি একেবারেই সুলভ ও সহজপ্রাপ্য ছিলনা। সারাদিনে দুখানা বাস ছাড়া অপর কোনও প্রকার যানবাহনাদি থাকতনা। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বহু সামগ্রী পেতে গেলে দুদিন আগে থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে লোক পাঠাতে হত। ফলে কুলু উপত্যকায় সমগ্র বসবাসকালটিতে অসংখ্য কাঁটা পদে পদে বিঁধতে থাকত।

ডাক বাংলোয় জায়গা পাওয়া গেল না যাত্রীশালাও বহু দূরবর্তী। অবশেষে একটি লোক জানালো, অনুমতিপত্র আনালে 'রেষ্ট হাউসে' আশ্রয় মিলতে পারে। তাই করা হোলো। কিন্তু 'রেষ্ট হাউস' অন্ধকার। না আছে ইলেকট্রিক্, না কেরোসিন, না বা কোনো আহার্যলাভের সুবিধা। 'রেষ্ট হাউসটি' আবার ওরই মধ্যে একটি টিলা পাহাড়ীপথের বনময় অঞ্চলে। অনেক চেষ্টার পর হারিকেন লণ্ঠন জোগাড় করা গেল। কিন্তু কিছুকাল আগে থেকে পণ্ডিতানীর সম্পর্কে আমরা যে সন্দেহ করেছিলুম, দেখা গেল সেটি সত্যে পরিণত হোলো। তিনি এবং তাঁর ছেলে কোথাও থাকার জায়গা পাননি। অতএব আমি সেই যুবকটিকে এবার আমন্ত্রণ করলুম। মায়াদেবী এগিয়ে গিয়ে সেই মহিলার সঙ্গে ভাঙা ভাঙা কাশ্মীরী 'বোলিতে' আলাপ করলেন। ওঁরা তীর্থে বেরিয়েছেন এবং মানালির বশিষ্ঠ আশ্রম দর্শন করতে যাবেন। আগামীকাল অপরাহ্ণে ফিরবেন মণ্ডিতে। সেখানে তাঁদের লোক আছে। মহিলা মায়াদেবীর কাছে যখন শুনলেন আমি ব্রাহ্মণ, তখন তিনি 'রেষ্ট হাউসে' এসে রাত্রিবাস করতে সম্মত হলেন। আমরা খুশী হলুম,

কেননা এই নির্জন বনচ্ছায়াময় বাংলোটিতে আরও দুজন সঙ্গী পাওয়া গেল। দুটি ঘরে আলো জ্বালা হোলো।

আমার স্বর্গতা জননীর মুখের সঙ্গে পণ্ডিতানী মহাশয়ার কেমন যেন একটি সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু সেকথা মায়াদেবীকে জানাবার সময় পাইনি। সন্ধ্যার পরে একটু বাহাদুরির লোভে যখন পণ্ডিতানীর পূজার জন্য বিপাশা থেকে পিতলের পাত্র ভরে জল এনে দিলুম, আমার সেই পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য ক'রে মায়াদেবী একটু কৌতুকও বোধ করছিলেন। তারপর ওই যুবকটিকে এখানে পাহারা মোতায়েন রেখে আমি যখন চৌকিদারের অলক্ষ্যে অন্ধকার বন বাগান থেকে মহিলার পূজার জন্য কতগুলি ফুল তুলে আনলুম তখন তিনি পরিহাস করতে ছাড়লেন না। বললেন, যাক বুড়ো হ'লে মেয়েদের একটা সুবিধে — পথে ঘাটে ছেলে কুড়িয়ে পাওয়া যায়।

কি যেন জবাব দিয়েছিলুম, আজ আর মনে নেই। ফুলগুলি হাতে নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দেখি, মহিলা তাঁর পূজার আয়োজন করছেন। আমাকে দেখে প্রসন্ন হাস্যে উঠে এসে ফুল নিলেন। ভাঙা হিন্দুস্থানীতে বললেন, বেটা জিন্দা রহো।

তিনি আরও জানালেন তাঁর সন্ধ্যাহ্নিকের কিছু বিলম্ব হয়ে গেছে। একটু দূরের থেকে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলুম। তাঁর প্রশস্ত উন্নত এবং দীর্ঘ দেহ যেন প্রণামলাভেরই যোগ্য।

চৌকিদারের সাহায্যে সেই রাত্রে যেমন তেমন আহার্য সংগ্রহ করা গেল এবং আমরা ওই স্বল্পভাষী লাজুক এবং নম্রস্বভাব যুবকটিকে আমাদের আহারের আসরে একপ্রকার জোর ক'রেই এনে বসালুম। সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার্য বলেই অবশেষে সে রাজি হোলো। রাত্রের দিকে মায়াদেবী পণ্ডিতানীর ঘরে জায়গা পেয়ে গেলেন। যুবকটি রইলো আমার কাছে।

পাখীর ডাকে ঘুম ভাঙলো। গত রাত্রির অন্তিম প্রহরে অরণ্যশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নার দাগ লেগে ছিল — পাখীরা ভুল করে ভেবেছিল ওইটেই বুঝি প্রভাত। ভুল ধরা পড়েছে পরে। এখন ডাক দিচ্ছে সেই থেকে। পাখীর দেশে পৌঁছেছি।

বেলা বেড়ে গেছে বৈকি। রেস্ট হাউসটি এত নিরিবিলিতে যে, শহরের কোন শব্দ এসে পৌঁছয় না। ঝিল্লিরব চলছে পিছনের বনে। কিন্তু নদীর আওয়াজের সঙ্গে সেই রব মিলে এমন একাকার হয়ে গেছে যে, ও দুটোর সাড়া আর কানে পৌঁছয় না।

এক সময় বাইরে এসে দেখি, পাশের ঘরটি শূন্য। সকালের দিকে মানালির গাড়ীতে পণ্ডিতানী এবং তাঁর স্বল্পবাক ছেলেটি চ'লে গেছে। মিনিট পাঁচেক পরেই মায়াদেবী এসে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে তিনি স্নানাদি সেরে নিয়েছেন। বিশেষ কুণ্ঠার সঙ্গেই তাঁর কাছে মার্জনা চেয়ে নিতে হলো।

চৌকিদারের পক্ষে সকালের চায়ের আয়োজন করা সম্ভব হোলো না, কারণ কিছুই এদিকে পাওয়া যায় না। শহর থেকে এ অঞ্চল নাকি একটু দূরে। অতএব যেমন-তেমন ভাবে প্রস্তুত হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

গতকাল সন্ধ্যায় দেখে গেছি মাঠের পূর্বপ্রান্তে বিপাশা ও পার্বতী। এদিকে অনেকটা পাহাড়ের অবরোধ। পথঘাট নিরিবিলি, লোকজন তেমন চোখে পড়ে না। আমরা রাজপথ ধরে কতকটা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ডানদিকে ঘুরে এক আধটি দোকান পেলুম। থমকে দাঁড়ালেই বুঝতে পারা যায়, স্থানীয় অধিবাসীদের দরিদ্র জীবনযাত্রা। এর পরে অরণ্যজটলার ভিতর দিয়ে বিপাশা চ'লে গেছে অদৃশ্য হয়ে। উপত্যকা এখানে অনেকটা সমতল প্রান্তরে প্রসারিত। এটি হিমালয়ের উত্তর ভূভাগ, সুতরাং উপত্যকার উচ্চতা অল্প হলেও শীতের দিনে এখানে প্রচুর তুষারপাত হয়। এই শরৎকালে এখন এখানে পাখী শিকারের আয়োজন চলছে। অরণ্যমোরগ, প্রস্তর ও তুষার পারাবত,—এরা নেমে আসবে উত্তর হিমালয় থেকে। সময় থাকতে এবার কুলুর অধিবাসীরা শাক্‌সব্জি শুকিয়ে নিয়ে ঘরে উঠবে। কাঠ আনছে অরণ্য থেকে। এখন থেকে ভেড়ার লোম নিয়ে শীতবস্ত্র বোনা চলছে। ছেলে বুড়ো সকলের হাতেই তকলি ফিরছে। হাওয়া নামতে আর দেরি নেই।

শহরের মাঝখানে এলুম। কিন্তু আঙুলে গুনে বলতে পারি, শহরের অধিবাসী কয়জন। কাজকারবার কিছু নেই, শহর গড়বে কি দিয়ে? ভেড়ার লোম পাওয়া যায় অনেক, কিন্তু তাই নিয়ে কল কারখানা বসাবে—কার এমন বুকের পাটা? শুধু মাল আমদানি করবে,—টাকা পয়সা কই? শুধু রপ্তানি করবে,—ভাঁড়ার কই? সুতরাং গ্রামের দারিদ্র্য নিয়ে গ্রাম পড়ে আছে চোখের আড়ালে। পর্যটকদের লোভ দেখিয়ে ডেকে এনে দু-দশ টাকা যদি ওদের হাতে আসে, তবে তাই ওদের লাভ। সেইজন্য পাঁচজন যাত্রী গিয়ে যদি গাড়ীর থেকে নামে, তবে পঁচিশজন কুলি ছুটে আসে। কুলিগিরি কিন্তু তাদের পেশা নয়, তারা হোলো স্থানীয় বেকার-সম্প্রদায়। চাষবাস করে, ঘর বানায়, জন্তুর লোম থেকে কম্বল বোনে।

চায়ের দোকান আছে দু একটি। কিন্তু খাদ্যসামগ্রী পেতে গেলে কাঠখড় পোড়াতে হবে অনেক। এবেলায় ব'লে রাখলে ওবেলায় মিলতে পারে।

গোটা দুই ডিম হঠাৎ পেয়ে যেতে পারো, কিন্তু গোটা দশেক একসঙ্গে চাইলে গ্রামে গ্রামে খবর দিতে হবে। মাংস পেতে গেলে আগে জন্তুটা কেনা দরকার। সর্বাপেক্ষা লোভনীয় মাছ হচ্ছে 'ট্রাউট',—যেমন কাশ্মীরে,—কিন্তু খাবারের প্লেটে সেই 'ট্রাউট'—পৌঁছবার আগে মৎস্যশিকারী হতে হবে। এ আর তোমার দার্জিলিং-শিলঙ নয় যে, হাটবাজার আলো ক'রে মৎস্যগন্ধারা সেখানে জাঁকিয়ে ব'সে আছে।

প্রাতরাশ সারা হোলো পূর্বাহ্ণে। তারপর চা ওয়ালার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের চুক্তি ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। মানালির গাড়ী যাচ্ছে। এখান থেকে মানালি দূর নয়,—মাত্র চব্বিশ মাইল। পথটি পাকা, এবং এই প্রায় সমতল উপত্যকা ছেড়ে ধীরে ধীরে উত্তরে চলে গিয়েছে বনময় পার্বত্য উপত্যকার অন্তর্লোকে। যেমন সর্বত্র—এখানেও পাহাড় যত দুদিকে উঁচু হয়েছে, নদীর গহ্বর ততই নেমেছে নীচে। প্রকৃতি যতই তার রহস্যযবনিকা উত্তোলন করেছে, মানুষের সংখ্যা ততই কমে এসেছে। কুলু থেকে ধীরে ধীরে চড়াই পথে মাইল আষ্টেক গেলে 'রাযসন' নামক জনপদ। ছোট ছোট গ্রাম, কিন্তু ছবির পর ছবি। আমাদের চোখে সমস্তটা অবাস্তব, কেননা আমরা এদের অভ্যস্ত সংস্কারের মধ্যে পাইনে। দিল্লী কলকাতা-বোম্বাই, এদের সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ, চোখ আমাদের তৈরি হয়েছে, ওদেরই মাঝখানে। বড় শহরের নক্সায় ইদানীং আর কোনও বৈচিত্র্য নেই। নতুন ভুবনেশ্বর তৈরি হচ্ছে নতুন দিল্লীর ছাঁচে,—চণ্ডীগড়ও তাই। পুরনো দিল্লীর সঙ্গে আগ্রা-মথুরার তফাত কম। বোম্বাই-কলকাতার লোক মাদ্রাজে না গিয়েও জানে তামিল শহরটি কেমন। এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ একই। গয়া-কাশীতে সামান্য তফাত। লণ্ডনের লোক নিউইয়র্কে কোনও বৈচিত্র্য পায় না, প্যারিস আর বার্লিনের নক্সায় কতটুকুই বা পার্থক্য। কিন্তু এখানে এই দূর হিমালয়ের গহনলোকে অনন্ত বৈচিত্র্য। নীলাভ জলধারার ধারে একটি রক্তকরবী সমগ্র পার্বত্য প্রকৃতির পরমার্থ বহন করে। তুষারচূড়ায় যখন পঞ্চমীর শীর্ণ শশিকলা এসে দাঁড়ায়, মহাকাব্যেও সেই সৌন্দর্য প্রকাশ পায়নি কোনদিন। একটি বাড়ীর সুন্দর কাঠের কারুকার্য—সমস্ত জনপদের স্বভাবকে প্রকাশ করে। পাহাড়তলীর ছোট একটি বাঁক, একটি গাছের একান্ত ছায়া, একটুকরো বনান্তরাল, একটি নির্ঝরিণীর মৃদু ঝঙ্কার,—এরা যেন সমস্ত জীবনের নিরুদ্ধ পিপাসাকে জাগিয়ে তোলে।

পর্বতপ্রাচীর এবং অল্পস্বল্প সমতল সংযুক্ত নিঃঝুম বনভূমি। মাঝখানে বিপাশা। পশ্চিমে 'কাটরাইন' এবং পূর্বপারে 'নাগর'। নাগরের রাজবাড়িটি অতি প্রাচীন। এখন ওর ভিতরটা টুরিস্ট লজ। নাগরের কিছুদূর চড়াই পথে উঠে গেলে প্রাক্তন চিত্রাভিনেত্রী দেবিকারানী ও তাঁর স্বামী সোয়েৎলাভ রোয়েরিখের অট্টালিকাটি দেখা যায়। কাটরাইনে নদী পার হয়ে নাগরে পৌঁছতে হয়। এ পথে আসে তিব্বতী ব্যবসায়ীরা। পূর্বদিকে বিরাট পর্বতশ্রেণী পার হয়ে গেলে স্পিতি উপত্যকা। নাগর থেকে পর্বত আরোহণ করা যায় বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্গম পথ হোলো মানালির পথ। নাগরের জনপদটি আপন শোভা আর সৌন্দর্য নিয়ে নদীর অপর পারে তপস্যার আসনে বসেছে যেন স্বভাবসৌন্দর্য নিয়ে। সভ্যতার থেকে অনেক দূর।

এই 'নাগরে' একটি অতি সম্ভ্রান্ত রুশ পরিবারের কাহিনী গচ্ছিত রয়েছে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশবিপ্লবকালে একটি ধনী পরিবার ভারতের তদানীন্তন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। এরা বোধকরি সাম্যবাদী বিপ্লবীদলের হাত থেকে নিজদিগকে বাঁচাবার চেষ্টা পান। এই বিত্তশালী জমিদারের নাম ছিল, মিঃ নিকোলাস রোয়েরিখ। তিনি ছিলেন জগৎপ্রসিদ্ধ শিল্পী এবং সুনামধন্য পর্যটক। তাঁরা এই কলু উপত্যকায় আসেন, এবং নাগরে জায়গাজমি কিনে ঘরদোর তৈরি করেন। এঁর পুত্র সোয়েৎলাভ রোয়েরিখ একজন প্রকৃত পণ্ডিত, গুণী এবং চিত্রশিল্পী। এঁর চরিত্রবত্তা, স্বভাবমাধুর্য এবং নম্রসৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে পরলোকগত চিত্র নির্মাতা হিমাংশু রায় মহাশয়ের পত্নী ভারতপ্রসিদ্ধা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী দেবিকারানী দ্বিতীয় পক্ষে মিঃ রোয়েরিখকে বিবাহ করেন। বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় বছর দুই হ'তে চললো। একদা শ্রীমতীর আমন্ত্রণক্রমে তাঁর বোম্বাইয়ের অস্থায়ী বাসস্থানে গিয়ে তাঁদের দাম্পত্যজীবনের আনন্দময় চেহারাটি দেখেছি, এবং সৌম্যদর্শন রোয়েরিখের শান্ত ও সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। বেশ মনে পড়ে, হাসিমুখে দেবিকারানীকে প্রশ্ন করেছিলুম এ-জীবন কেমন মনে হচ্ছে? কেমন মানুষ রোয়েরিখ্?

দেবিকারানী মুগ্ধকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, সত্যি বলবো, যদি কোনদিন মাথা ধ'রে চুপ ক'রে বিছানায় প'ড়ে থাকি, উনি সেদিন অন্নজল মুখে তোলেন না! আবার উনি সতর্কও থাকেন,—সে-খবর যেন আমার কানে না ওঠে। শান্তিই আমার কামনা ছিল। এমন স্বামী অনেক ভাগ্যে মেলে।

'দেবভূম' কুলু উপত্যকার অপার্থিব সৌন্দর্য এবং অন্যান্য বিষয় আলোচনা

করে যেদিন ফিরে আসি, তার পরের দিন বোম্বাইয়ের 'তাজমহল' হোটেল থেকে দেবিকারানীর একখানি চিঠি পাই।

"... It was an honour and a privilege – such contacts in life make one feel that there is still a purpose, that there are values of a deeper nature in this very materialistic age, which makes it so much easier to enrich one on the way ... "

দেবিকারানীর অভিনয় দুচারবার দেখেছি বৈ কি, কিন্তু মানুষটি ভিন্ন প্রকারের। স্বচ্ছ আনন্দের মধ্যে তাঁর একটি সহজাত অধ্যাত্মপিপাসা আমাকে বিস্মিত করেছিল। অতঃপর দিল্লীতে প্রথম ভারতীয় ফিল্ম 'সেমিনার' উপলক্ষ্যে আমার ডাক পড়ে, এবং সেখানে গিয়ে রোয়েরিখ দম্পতির সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে। 'নাগর' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা উত্তর হিমালয় চরিত গ্রন্থে করেছি।

'নাগরের' পর থেকে একটি ইউরোপীয় পরিবারের নাম সর্বত্রই শোনা যায়। বস্তুত, সমগ্র কুলু ও মানালির সঙ্গেই সেই নামটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই নামটি হোলো 'বেনন' পরিবার। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক বিভাগের জনৈক কর্মচারী মি. বেনন প্রথম আসেন কুলুর পথে দুর্গম ও দুস্তর হিমালয় পেরিয়ে। সঙ্গী ছিলেন তার আরেক বন্ধু ক্যাপ্টেন লী [illegible] এই ভূভাগের আকর্ষণ তারা সামলাতে [illegible]। কর্ণেল [illegible] হওয়ার পর তারা এসে মানালিতে বাস [illegible] সমগ্র [illegible] সৃষ্টি করলেন। সেই সব বাগান [illegible]

পরবর্তীকালে [illegible] বেনন [illegible] পরিবার এখানে সমৃদ্ধ। [illegible] মানালিতে [illegible] বহুজনপরিচিত। প্রত্যেক পাহাড়ীর কাছে [illegible] চিনে [illegible] গ্রামে ওরা সুখ্যাত। পার্বত্য নারীকে [illegible] বিবাহ করেছেন [illegible] শিক্ষাবিস্তারেও সহায় হয়েছেন। অত্যন্ত বিস্ময় লাগে হিমালয়ের গহনলোকে [illegible] যখন এই সাহেব গোষ্ঠীটি পর্যটকের সম্মুখে আবিষ্কৃত হয়। এদের বাগানের 'সেও' এবং নাশপাতি সদৃশ 'বাগুগোসা' অতি মধুর।

মন্দির প্রধান হোলো সমগ্র কুলু উপত্যকা। বিভিন্ন পাল পার্বণে নানা দেবদেবীকে সমারোহ সহকারে বাইরে আনা হয়। মানালি নাগর কাটারাইন, রায়সন, বড়াগাঁও এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে আদিবাসীরা নেমে

এসে উৎসবে মাতে। এ ছাড়া লাহুল, তিব্বত, লাদাখ, ইয়ারকন্দ, গোটান, স্পিতি পার্বতী— ইত্যাদি নানা অঞ্চল থেকে বিচিত্র পণ্যসম্ভার নিয়ে বণিকরা কুলুতে এসে পৌছয়। সমগ্র উপত্যকায় তখন বসে নাচগানের আসর। আমোদ প্রমোদের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সম্প্রতি পূজা আসন্ন, বিজয়া-দশমীতে ওদের সর্বপ্রধান উৎসব হোলো দশহরা। তখন চারিদিক থেকে দেববিগ্রহরা এসে পৌছবে এবং সর্বপ্রধান পূজা পাবেন রঘুনাথজী। কুলু উপত্যকায় সেদিন বিপাশার কূলে-কূলে কুলনাশিনীদের নাচের দোলায় অনেকের জীবন-তরী কূল ছেড়ে চ'লে যাবে অকূলের দিকে।

উচ্চ মালভূমির উপর মানালি গ্রাম। পাইন এবং দেওদারের শোভায় চিত্রিত মানালি। উত্তুঙ্গ গিরিমালা স্তরে-স্তরে চ'লে গেছে একদিক থেকে অন্যদিকে। তুষারের চূড়া অতি সন্নিকট ব'লে মনে হয়, কিন্তু সেটি দৃষ্টিবিভ্রম। মানালির উত্তর প্রান্ত দেবরাজ গিরিশ্রেণীর বিরাট প্রাকারের দ্বারা অবরুদ্ধ। সম্প্রতি কুলু ও মানালির উন্নতি ঘটেছে প্রচুর। মানালির বশিষ্ঠ আশ্রমের উষ্ণ জলের ঝরণাটিকে নিয়ে একটি অট্টালিকার ন্যায় স্নানাগার নির্মিত হয়েছে। মানালির মাউণ্টেনিয়ারিং ইনষ্টিটুট এখন খুবই প্রসিদ্ধ।

কিছুদূর এগিয়ে পথ চ'লে গেছে উত্তরে বিপাশার তীরে তীরে। এর পর ক্রমেই রয়ে গেল হিমালয়ের স্বাভাবিক জনবিরলতা। পথ চলে গেছে দূর দূরান্তরের চড়াইয়ের দিকে— যেদিকে 'রেহলা' হয়ে 'রোহটাং' গিরিসঙ্কট।

দশহাজার ফুট ছাড়িয়ে গেলে তৃণফলকের দেখা পাওয়া কঠিন, কিন্তু তুষারধবল গিরিশৃঙ্গদলের শান্ত গম্ভীর প্রকাশটি অনন্তবিস্ময় বহন করে। এই 'রোহটাং' গিরিসঙ্কটের উত্তরে সমুদ্রসমতা থেকে পনেরো হাজার ফুট উচ্চ ব্যাসঋষিশৃঙ্গ। এই শৃঙ্গেরই তল থেকে রোহটাং গিরিসঙ্কটের আশে পাশে জন্ম নিচ্ছে পাঞ্জাবের দুটি প্রধান নদী—একটি ভাগা, অন্যটি চন্দ্রা। বিপাশাকে অনেকে বলে বিয়াস, হিমাচলপ্রদেশীরা বলে, 'বিয়াসা'। ব্যাসঋষির নামটিই হয়তো তারা ধ'রে রাখতে চায়। রেহলার পর থেকে সমগ্র গিরি-শিখর এবং অধিত্যকা অঞ্চল বৎসরের অধিকাংশ কাল তুষারে সমাচ্ছন্ন থাকে। দশ-এগারো হাজার ফুটের পরে ঋতু ব'লে বিশেষ কিছু নেই। বরফ জমে এবং বরফ গলে এইমাত্র। শীতের কালে অগম্য, আর কিছু নয়। তুষারঝঞ্ঝা বইতে থাকলে সব ঋতু একাকার। বাতাস যদি না থাকে এবং পরিষ্কার আকাশে থাকে রৌদ্র,—তবে হোক না কেন পাহাড় তুষারমণ্ডিত। কর্ণেল হাণ্ট-এর বইতে পাই, গৌরীশৃঙ্গ বিজয়কালে মে মাসের শেষের রৌদ্রে 'এভারেস্ট' অঞ্চলে তাঁরা এক-এক সময়ে রীতিমতো গরম বোধ করেছিলেন।

রোহটাং গিরিসঙ্কট অতিক্রম ক'রে চন্দ্রভাগা ছাড়িয়ে সোজা উত্তরপথে গেলে পাওয়া যায় উত্তুঙ্গ শিখরলোক 'বড়ালাচা' গিরিসঙ্কট। এ পথ গিয়েছে লাহুলের ভিতর দিয়ে আঠারো থেকে কুড়ি হাজার ফুট উচ্চ গিরিমালা ভেদ করে—যেদিকে 'হানলে' এবং 'রূপস্থ' উপত্যকার কোলে পাওয়া যায় লবণাক্ত বিরাট 'মুরারি' হ্রদ। লাহুল উপত্যকার উত্তরাঞ্চল দিয়ে জাস্কার পর্বতমালা নেমে এসেছে দক্ষিণে—যেখানে ধবলাধারের পূর্বসীমায় পীরপাঞ্জাল গিরিশ্রেণীর শেষপ্রান্তভাগ সংযুক্ত। সুতরাং রোহটাং গিরিসঙ্কট এখানে ত্রিমূর্তি সঙ্গমের কাজ করেছে। ভারতীয় সীমানা এখানে অনির্ণীত।

মানালি হোলো এই সকল দুর্গম ও দুরারোহ হিমালয় পথের প্রথম তোরণদ্বার। এখানকার বাতায়নে মুখ রেখে দেখে নেওয়া যায় বিচিত্র দেশের অজানা অনামা অধিবাসীকে। অনেক সময় তারা নামহারা, পরিচয়হারা—তারা শুধু পার্বত্যসন্তান। চিরকাল ধ'রে তারা নিশ্চিন্ত, চিরদিন নিস্পৃহ,-এবং সভ্যতার পর সভ্যতা এসেছে আর চলে গেছে,—কিন্তু তারা ভ্রূক্ষেপ করেনি। সভ্য জগতে তারা পৌছয়নি কোনওকালে, সভ্যতার স্বাদ কেমন জানেনি, পরখ করেনি, চোখে দেখেনি। ওদের দুর্গ প্রাকারের বাইরে নীচের তলায় ভারত ইতিহাসে শত শত বছরের বিবর্তন ঘটে গেছে। গৌতম বুদ্ধের পরে আর কোনও মহাপুরুষের সংবাদ হয়তো বা ওদের কানে পৌছয়নি।

যেমন 'বাজৌরায়' তেমনি মানালিতে—মন্দির অতি প্রাচীন। কিন্তু বাজৌরার হিন্দু স্থাপত্য এইটুকু দূর মানালিতে এসে মঙ্গোলীয় বৌদ্ধস্থাপত্যের শৈলীতে মিলিয়ে গেছে। এ একেবারে নতুন,—দক্ষিণের সঙ্গে উত্তরের গোত্রের মিল নেই। হিন্দু বটে, কিন্তু সাজপোশাক বদল করেছে। মানালির একটি মন্দিরের সন্ধান দিয়েছিলেন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেটি হোলো 'হিডিম্বা'র মন্দির। মানালির গ্রাম ছাড়িয়ে দেওদারের গহনবনবেষ্টিত পাহাড়ের প্রাচীন বনস্পতির শাখা-প্রশাখার অন্তরালে এই মন্দিরটি যেন মনোরম দারুশিল্পের প্রতীক। জনশূন্য বনভূমির মাঝখানে এ মন্দির অনেকটা প্যাগোডার মতো। ছায়াচ্ছন্ন বনে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে চায় না,—চারিদিক নিস্তব্ধ। কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করলেই দেখা যাবে, রুদ্ধদ্বার মন্দিরের ভিতর থেকে গড়িয়ে এসেছে দরদর রক্তের ধারা। চমকে উঠলে চলবে না,—ভয় পেলেই পরাজয়। অপেক্ষা করলেই দেখা যাবে, একটি সুন্দরী রমণী আসছে এগিয়ে,—মাথায় তার কাঠের বোঝা। অধরে তার মধুর হাসির রঙ্গিমা, তার চেয়েও রঙীন

তার বেশভূষা। বড় বড় চোখে সর্বনাশা দৃষ্টি মেলে সেই সুন্দরী সহাস্যে তাকালো। এ মন্দিরের পূজারী কই—এ প্রশ্নের উত্তরে সে জানাবে, সেই পূজারিণী। তারপরে আর কোনও কথা নেই। মেয়েটি একটি গুপ্তদ্বারের ভিতর দিয়ে মন্দিরে ঢুকবে এবং সম্মুখের দ্বার খুলে দেবে। প্রদীপ জেলে নম্রহাস্যে একটি কোণের দিকে নির্দেশ করবে। প্রদীপের আলোয় আর আবছায়ায় দুরুদুরু বুকে এদিক ওদিক অন্বেষণ করে অবশেষে দেখা যাবে, একখানা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণের শিলা। উনিই দেবী,—ওঁরই উদ্দেশ্যে পশুবলি দেওয়া হয়। দরজার বাইরে তাজা রক্তে এখনও হয়তো তার হৃৎপিণ্ডের উত্তাপ জড়ানো।

রহস্যময়ী পরমাসুন্দরীর হাসি দেখে আত্মবিস্মৃত হলে চলবে না, ওই হাসিতে হয়তো বা রক্ত অপেক্ষাও গুরুতর বিপদের সঙ্কেত নিহিত,—সেই কারণে রহস্য আরও নিবিড় হয়েছে। নম্রনতমুখে অর্ঘ দান ক'রে শান্তভাবে বেরিয়ে এসো ওই অন্ধকার মন্দিরের বাইরে, তারপর জটাজটিল অরণ্যভূমি পেরিয়ে আবার নেমে যাও মানালির দিকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুটবে তোমার পিছনে পিছনে,—কিন্তু তাদের কোনও মীমাংসা নেই। সেই প্রশ্ন তোমার মধ্যরাত্রির তন্দ্রার মধ্যে হয়তো দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলবে, হয়তো বা সেই প্রশ্ন ওই আদিঅন্তহীন হিমালয়ের শতসহস্রমাইলব্যাপী গুহায় গহ্বরে মঠে মন্দিরে অরণ্যে তপোবনে উপত্যকায় তুষারশৃঙ্গমালায় সর্বত্র একটি বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্নের আকারে ক্ষুধাতুর চারিণীর মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াবে।

এ যাত্রায় আমাদের ভ্রমণের শেষ পর্বে পৌঁছেছিলুম। মায়াদেবীর মুখে চোখে দেখছি ক্লান্তির ছায়া, অবসাদ এসে তাঁকে ঘিরেছে। আমি নিজে অস্থির ক্ষুধা নিয়ে ঘুরেছি নানাস্থানে, তিনি চুপ ক'রে দেখছেন হিমালয়কে। মন্দির দেখে প্রণাম করেছেন, নৈবেদ্য সাজিয়েছেন নিঃশব্দে।

স্থানীয় একটি কিশোর বালক তাঁর বড় অনুগত হয়েছিল। মায়াদেবী তাকে গত দুদিন ধরে নানাবিধ ফাই-ফরমাস করছিলেন। উদ্দেশ্য এই, ওই ছেলেটি যেন কিছু উপার্জন করে। কথায় কথায় তাকে বকশিশ দেবার জন্য মায়াদেবী বিশেষ ব্যস্ত। ছেলেটির নাম সুখনলাল। তার মা নেই, ঘরে আছে বাপ, ছোট ভাই, আর রুগ্ন বোন। সামান্য চাষবাস, যেমন-তেমন ঘরকন্না, সারা বছরের অন্নবস্ত্র চলে না। মায়াদেবী একবার সুখনকে একটি টাকা ভাঙাতে দিলেন, এবং পালায় কিনা পরীক্ষা করার জন্য অপেক্ষা ক'রে

রইলেন। কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে ছেলেটা ফিরে এলো।—এত দেরি কেন? ছেলেটা জবাব দিল, তিন মাইল তাকে হাঁটতে হয়েছে টাকা ভাঙানোর জন্ম। এদিকে কারো এত পয়সা নেই যে ভাঙিয়ে দেয়। মায়াদেবী বললেন, আমার কাজ হয়ে গেছে, আর ভাঙানো চাইনে। টাকাটা তুই নে।

ছেলেটা ভয়ে বিবর্ণ। দুআনা পেলেই সে মহাখুশী, একটাকা তার পক্ষে অনেক। আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে টাকাটা তার পকেটে দিলুম। কিন্তু তখন থেকেই আমাদের একটা কাজ জুটলো। ছেলেটার কাপড় চোপড় নেই, হয়তো ওর বোনের অসুখে ওষুধ জোটে না, হয়তো খাওয়াও জুটছে না, হয়তো বা রাত্রে গায়ে দেবার কম্বলও নেই। সুতরাং একটা মস্ত কাজ আমরা পেয়ে গেলুম। ছেলেটা আগাগোড়া অবাক। পেয়ে গেল গন্ধতেল আর সাবান, খাদ্যসামগ্রীর একটা অংশ, একখানা শীতবস্ত্র এবং মোটামুটি কিছু অর্থ। ছেলেটা শীর্ণ, বং কশা, ভাবে অকিঞ্চন এবং অল্পে তুষ্ট

যে-ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট, তাকে কিছু বেশি দিতে পারলে আমরা সুখী হই। ভিখারীকে কিছু দেবার হাত সহজে ওঠে না, কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীকে ভোজন করিয়ে আমরা আনন্দ পাই। যে চায় না কিছু সেই সহজে পায়। যে ভোগী নয় তার চারিদিকে আমরা সম্ভোগের উপকরণ সাজাতে বসি। অর্থের প্রতি যার কিছুমাত্র আসক্তি নেই, তার চারিদিকে টাকা জড়ো হয়। চাইনে বললেই কাছে আসে, কামনা করলেই দূরে পালায়। স্বপনলাল কিছু চায়নি আমাদের কাছে, তাই সে পেয়ে গেল আশাতীত। যতটুকু সে গ্রহণ করেছে, ততটুকুই যেন আমরা কৃতার্থ হয়েছি। দুদিন ধরে সে আমাদের কাছে কাছে ছিল, এবং একজন অপরিচিতা ও ভিনদেশিনী নারীর করুণ স্নেহচ্ছায়ায় তার জীবনের ওই দুটি দিন নিত্যস্মরণীয় হয়ে রইলো।

বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো। অপরাহ্নের আলো সুদীর্ঘ ছায়া ফেলেছে পাহাড়ের নীচে। ডাহুকের ডাক শোনা যাচ্ছে পাহাড়ে পাহাড়ে। আশে-পাশে ছোট ছোট বস্তির জীবনযাত্রা রয়ে গেল অনাবিষ্কৃত। ওদের সঙ্গে রয়ে গেল আমারও প্রাণের কিছু ভাষা, রয়ে গেল ওই প্রাচীন দেওদারের নীচে আমার ছোটখাটো করুণ আনন্দের সুর কবিতার ব্যঞ্জনার মতো। বনভূমির ভিতরে-ভিতরে ঝিল্লির ঝনক ঝনকে রেখে গেলুম—যা কিছু আমার অপ্রকাশিত।

মালপত্র একে একে উঠলো গাড়ীর চালে। গাড়ী ছাড়বে, এমন সময় স্বপনলাল এসে দাঁড়ালো মায়াদেবীর উদ্বিগ্ন দৃষ্টির সামনে। কিশোর বালকের মনে কি সেই বেদনাটুকু জন্মেছে, যেটির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের বিধুর

বর্ণটুকু জড়ানো? আত্মার অনন্ত রহস্যের তলায় রাজকন্যার সঙ্গে রাখাল বালকের কোথায় ঘটে গেল এই আত্মিক যোগ? এ কি মায়া মহামায়ার?

আমি ঈষৎ হাসলুম উভয়ের দিকে লক্ষ্য ক'রে। আরো দুটি অহেতুক টাকা হাতে পেয়েছে সুখনলাল। নির্বোধ মূঢ় চাহনি অকিঞ্চনের আর অর্বাচীনের,—অন্যদিকে চিরকালের সেই অনাদি অনন্ত আবেদনের সকরুণ চাহনি,—'মনে রাখিস, সুখনলাল।'

গাড়ী ছেড়ে দিল এক সময়ে। বাইরে আর ভিতরে চারটি অপলক চক্ষু মিলে রয়েছে পরস্পর। কিন্তু আমি জানি, গাড়ীর ভিতরের দুটো চোখ তখন বাষ্প-থরোথরো। রবীন্দ্রনাথের দুটি ছত্র মনে পড়ে গেল: "গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়, হে বন্ধু বিদায়।"

* * *

এর পর কুলু উপত্যকা আমাকে বারম্বার আকর্ষণ করে। কিন্তু ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে যখন 'দশহরা' উপলক্ষে কুলুর তিনদিনব্যাপী সামগ্রিক উৎসবে যোগদান করি, সেটি স্মরণীয়। সেই রংযের বৈচিত্র্য বর্ণের বাহার প্রতিমাদলের প্রদর্শনী এবং উৎসব কেন্দ্রিক বিরাট মেলা আমাকে মুগ্ধ করে। অতঃপর বিপাশা নদীর উৎসটি দেখার জন্য আমি গিয়ে পৌছই মানালিতে এবং সেখানে কয়েকদিন সেই দেবরাজ গিরি শ্রেণীর নিচে একটি পান্থশালায় কয়েকদিনের জন্য বাস করি। মানালি ও কুলুর আনুপূর্বিক বর্ণনা 'উত্তর হিমালয় চরিত' গ্রন্থে করেছি।

॥ ৬ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্যে নেমে এসেছেন অনেকবার। স্বর্গে অথবা মর্ত্যে তিনি দেবতা অপেক্ষা মানবিক চেহারায় অধিকতর প্রকট। তিনি ছিলেন কৌতুক ও পরিহাসপ্রিয় এবং তিনি নৈতিক রক্ষণশীলতার ধার মাড়াতেন না। দেবতা অপেক্ষা মানুষের দিকে টান ছিল তাঁর বেশী। অনেক সময় সক্রিয় কৌতুক-পরিহাসের ভিতর দিয়ে তিনি মানুষের মহত্ত্ব, দাক্ষিণ্য, সততা, আত্মবিশ্বাস এবং ভয়হীন অধ্যবসায়কে পরীক্ষা করতেন।

সৃষ্টিলোকে প্রতিপালকের আসনে ব'সে আছেন শ্রীবিষ্ণু। আনন্দ বেদনা জরা জয়োল্লাস ভালোবাসা ও স্নেহমমতা— এদের ভিতর দিয়ে তিনি এই অনন্ত সৌরবিশ্বলোকের মধ্য থেকে পৃথিবী নামক একটি ছোট্ট গ্রহলোকে তাঁর প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মানুষের স্বভাববৃত্তিকে তিনি কোনও

আইনে বাঁধেননি। তিনি জানেন, মানুষ হোলো স্বেচ্ছাতন্ত্রী, আপন প্রবৃত্তির দাস, আপন প্রকৃতির ক্রীড়নক এবং আপন বিকৃতিরই অন্ধ স্তাবক। দেবরাজ ইন্দ্র আনন্দ পেতেন রাজ্যপাল বিষ্ণুর এই প্রশাসনপদ্ধতিতে। সেই আনন্দলাভের জন্য তিনি মর্ত্যে নেমে আসতেন প্রায়ই ছদ্মবেশে। তিনি হতেন বহুরূপী। মানুষের দরজায়-দরজায় বিভিন্ন বিচিত্র বেশে তিনি এসে দাঁড়াতেন। তাঁর হাতে মানুষের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হয়েছে বার বার।

তিনি স্বর্গলোকবাসী বটে, কিন্তু স্বর্গলোকে বৈচিত্র্য কোথায়? নিত্য আনন্দময় স্বর্গ,—কিন্তু তার মধ্যে দুঃখ-বেদনার স্পর্শে মধুর কাব্যের আস্বাদ নেই। দেবতামাত্রই পুণ্যময়, কিন্তু পাপের মনোহর রঙীন রূপ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। পারিজাত কাননের কোনও কুসুমে কীট নেই, সিংহ-শার্দূলরা সম্পূর্ণ অহিংস, সর্পের দল সর্বদা নৃত্যশীল, নগ্নকান্তি চিরযৌবনা অপ্সরাদের লীলায়িত তনুলতার সঙ্কেতে আসঙ্গলিপ্সা নেই। শোকে, অনুরাগে, দুঃখে, নৈরাশ্যে, মহত্ত্বে ও ভালোবাসায় ইন্দ্রের স্বর্গ উদ্বেলিত নয়। শ্রীবিষ্ণু তাই শত সহস্র-অযুত-নিযুত ভূস্বর্গ রচনা করেছেন এই পৃথিবীতে। ঈর্ষান্বিত দেবরাজ একদা স্থির করলেন যে, স্বর্গ এবং মর্তের কোনও এক সন্ধিস্থলে তিনি তাঁর নিজস্ব একটি রাজধানী নির্মাণ করবেন। অতএব ছদ্মবেশে তিনি পৃথিবীতে নেমে ভ্রমণে বাহির হলেন।

শিবলিঙ্গ গিরিমালার মধ্যকেন্দ্রে যেখানে 'মহাভারতীয়' পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম প্রান্ত, সেই অঞ্চলে আলুলায়িতকেশা যোগভ্রষ্টা 'শারদা' নেমে এসেছেন উত্তর থেকে দক্ষিণে। তাঁর উন্মত্ত তরঙ্গের আঘাতে পাথর লুটিয়েছে পায়ে পায়ে; অরণ্য-অটবীর শ্বাপদের দল পরিত্রাহি আর্তনাদ করতে করতে আত্মদান করেছে তাঁর দাপটের কাছে। তাঁর রাশি রাশি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের সংঘাতে বৃদ্ধ বনস্পতির অবলুপ্তি ঘটেছে। শারদার উন্মত্ত নাচনে সৃষ্টি রসাতলে গেছে অনেকবার।

কিন্তু 'মহাভারতীয়' শৈলশ্রেণীর প্রান্তে টনকপুরের কাছে এসে শান্ত হয়েছে শারদা। তখন শোনা যায় ঝনক-ঝনক নূপুর নৃত্য—সেই নাচনে তারই অঞ্চলে ব'সে গেছে শস্যশ্যামলতার আসর। ভৈরবীর আত্মঘাতী উন্মাদনা উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণাবতীর উত্তরপ্রান্তে পৌঁছে শান্ত হয়েছে।

টনকপুর হোলো মধ্য হিমালয়ের একটি প্রধান তোরণদ্বার। এই অঞ্চলের পূর্বে নেপালরাজ্যের সীমানা, এবং পশ্চিমে হোলো দক্ষিণ কুমায়ুন—অর্থাৎ

নৈনীতাল। এই দুইয়ের মাঝখানে সীমারেখা টেনেছে শারদারই শিরস্রোত কালীনদী। সুদূর উত্তরের হিমালয়-লোকে ধবলীগঙ্গা ও কালী,--উভয়ে আসকোট নামক পার্বত্য শহরে মিলিত হয়ে দক্ষিণে নেমে এসে শারদা নামে প্রখ্যাত হয়েছে।

ইন্দ্র এসে থমকে গেলেন এই দক্ষিণ কুমায়ুনের এক প্রান্তে। না, এ দৃশ্য তাঁর সুখের স্বর্গে নেই। সৃষ্টি এখানে পরমাশ্চর্য, এই হোলো স্বর্গ মর্ত্যের সন্ধিস্থল। এখানকার নিভৃত মায়াকাননে গোপনে নেমে আসে অলকাবাসিনী অপ্সরার দল, এই উদার অনন্ত গিরিশৃঙ্গমালার নীচে বিচিত্র আরণ্যকপুষ্প-শোভিত উপত্যকায় জ্যোৎস্নালোকে বসে যায় তাদের নৃত্যসভা। না, এমন জ্যোৎস্না নেই স্বর্গে,--সেখানে কেবল আছে নিত্যজ্যোতির্ময়তা। সেখানে নদী আছে মন্দাকিনী মধুরভাষিণী, কিন্তু এ নদীর মতো আত্মঘাতিনীর বুকফাটা হাহাকার মন্দাকিনীতে নেই। এখানকার ছায়ালোকের অন্ধকারের সঙ্গে মায়ালোকের জ্যোৎস্নার যে রঙ্গ রহস্য, এ যে নিখিল বিশ্বেরই বিস্ময়! এর তুলনা স্বর্গের কোথাও নেই। সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ ক'রে এসে অবশেষে এইখানে দাঁড়িয়ে দেবরাজ স্থির করলেন, রাজধানী নির্মাণের পক্ষে এই অঞ্চল শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তিনি বন উপবন তপোবন গিরিগুহালোক শৈবালাচ্ছন্ন শিলানির্ঝর ব্যাঘ্রভল্লুকাদির অবাধ বিচরণক্ষেত্র পেরিয়ে অগণ্য গিরিনদীপথ ছাড়িয়ে এসে পৌঁছলেন এক নীলনয়না সরোবরের প্রান্তে। সরোবরের সলিলগহ্বরে বহুকাল ধ'রে বাস করছিলেন নয়নাদেবী। তিনি সেই পাতালগহ্বর থেকে উঠে এসে জ্যোৎস্নাহসিত গগনের নীচে দাঁড়িয়ে দেবরাজকে অভ্যর্থনা করলেন। ইন্দ্র সহাস্যমুখে জানালেন, ভূস্বর্গেই তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হবে!

নয়নাদেবীর নামে নৈনীতাল হয়েছিল বটে, কিন্তু নৈনীতালের প্রাচীন আর একটি নাম ছিল 'ইন্দ্রপ্রস্থ'। ইন্দ্রপ্রস্থের বিলুপ্তির পর নয়নাদেবী পাষাণ হয়ে যান। সেই জন্য হ্রদের পশ্চিম পাহাড়ের দেওয়ালে অদ্যাবধি পাষাণদেবীর মূর্তি খোদিত রয়েছে। তিনি শক্তিরূপিণী, সেই কারণে তিনি সিন্দুর শোভিত থাকেন। পাহাড়ের কোলে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরও দেখা যায়।

'তাল' শব্দের অর্থ হোলো সরোবর। নৈনীতাল প্রধানত দুই অংশে বিভক্ত। একই হ্রদের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ,—একটি হোলো মল্লিতাল, যেদিকে নন্দাদেবী, শিব ও গণেশ, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদির মন্দির, অন্যটি দক্ষিণাংশ,—যেটি নৈনীতালের প্রবেশপথ। সমগ্র নৈনীতালের শোভা ও সৌন্দর্যের প্রধান কেন্দ্র হোলো নৈনীহ্রদটি। নৈনীতাল জেলা ভিন্ন দক্ষিণ হিমালয়ের অন্য কোথাও এতগুলি জলাশয় সহসা চোখে পড়ে না। সেজন্য

এগুলি হিমালয়ের উপগিরি অঞ্চলে প্রচুর বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। এই হ্রদগুলির মধ্যে প্রধান হোলো ভীমতাল, খুরপাতাল, গরুড়তাল, নল-দময়ন্তী-তাল, সুখতাল, রামতাল, লক্ষ্মণতাল, নওকুচিয়াতাল ইত্যাদি। সুন্দর শতদলের শোভা এবং শালুকের গলাগলি 'নওকুচিয়াতালের' একটি প্রধান আকর্ষণ।

একদিকে শতদ্রু এবং অন্যদিকে কালীগঙ্গা, এই দুই নদীর মধ্যভাগ নিয়ে সমগ্র কুমায়ুন। কুমায়ুনকে যদি তিন ভাগে ভাগ করা যায় তবে নৈনীতাল পড়ে দক্ষিণ অংশে। মধ্য অংশে হোলো আলমোড়া, উত্তর অংশে গাড়োয়াল। তবে গাড়োয়াল এবং আলমোড়ার উত্তরপূর্ব সীমানা তিব্বতের সঙ্গে মিশেছে। গাড়োয়াল আগে ছিল পৃথক, কারণ সমতল ভারতে কোথাও গিয়ে তার এলাকা পড়েনি,—সে থাকতো বিচ্ছিন্ন। ইংরেজ আমলের পর টিহরী গাড়োয়াল এসে মিলেছে কুমায়ুনে। আসাম থেকে কাশ্মীরের মধ্যে হিমালয়ের অন্য কোনও বিভাগে এতগুলি তুষারাবৃত চূড়া আর কোথাও এত কাছাকাছি দেখা যায় না। সমগ্র ভারতের কোটি কোটি নরনারী হিমালয়ের অপর কোনও খণ্ডকে তাদের জীবনে এবং তাদের অধ্যাত্মচিন্তায় এমন শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গেও ঠাঁই দেয়নি। পশ্চিমে যমুনা পর্বত—যেদিকে বলা হয় 'বন্দরপঞ্চ', সেখান থেকে এই শ্বেতগিরি শিখরগুলিকে জনৈক জার্মান পণ্ডিত বলেছেন, 'দেবগণের সিংহাসন।' যমুনা পর্বতের পর শ্রীকান্ত, গঙ্গোত্রি, কেদারনাথ, বদরিনাথ, শতোপন্থ, কামেত, দ্রোণগিরি, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, পঞ্চচুলী, নন্দকোট প্রভৃতি শিখরগুলি জগৎপ্রসিদ্ধ। এদের মধ্যে নন্দাদেবী, কামেত, ত্রিশূল, বদরিনাথ—এগুলি সর্বোচ্চ। এদের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে সংখ্যাতীত গিরিসঙ্কট এবং ক্যারাভান পথ—যাদের ভিতর দিয়ে পশ্চিম তিব্বত এবং মধ্য এশিয়ার দিকে অভিযান করা চলে। প্রধান ও প্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কট ঠাগা মানা, নিতি, কাংড়িবিংড়ি দরমা, লিপুলেক ইত্যাদি পথে পথে ভারতীয় ও তিব্বতী বাণিজ্যের চলাচল হয়ে আসছে বহুকাল থেকে। বদরিনাথ থেকে মানা গ্রাম হয়ে শতোপন্থ ও কামেতের তলা দিয়ে সোজা উত্তরে গেছে 'মানা' গিরিসঙ্কটের পথ, সেই পথ গেছে শতদ্রু নদের দিকে। শতদ্রুর পরপারে গারটকের পথ পাওয়া যায়।

নৈনীতালের পূর্ব সীমানা হোলো কালীগঙ্গা ওরফে শারদা এবং পশ্চিম সীমানা হোলো কোশী নদী। এই কোশীনদীর মূল নাম সম্ভবত কৌশল্যা এবং যতদূর আমার জানা আছে এই নেপাল-বিহারের অন্তগত সূর্যকোশী, সপ্তকোশী অথবা অরুণকোশীর শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না।

নৈনীতাল প্রবেশের পক্ষে তিনটি প্রধান পথ পাওয়া যায়। পশ্চিম

অংশে হোলো মোরাদাবাদ-রামনগর-রানীক্ষেতের পথ। এটি চ'লে গেছে নৈনীতাল শহরের নীচে দিয়ে আলমোড়ার অভিমুখে। মধ্যপথটি সর্বাপেক্ষা সহজ,—বেরিলি থেকে কাঠগোদাম হয়ে মাত্র একুশ মাইল মোটর পথ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ পথ যেটি সেটি সহজসাধ্য নয়—সেটি হোলো টনকপুর থেকে নৈনীতালের পথ। এই পথে নদী নালা, উপত্যকা, জলপ্রপাত, গহন অরণ্য অসাধ্য পার্বত্যলোক এবং প্রকৃতির পরম ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার অভিযানকারী পর্যটককে নিত্য অভ্যর্থনা জানায়। টনকপুর থেকে মোটর বাসের পথ গেছে সোজা উত্তরে—চম্পাবত, লোহাঘাট ছাড়িয়ে পিথোরাগড পর্যন্ত। এই অঞ্চলে জগৎপ্রসিদ্ধ শিকারী ও ভারতপ্রেমিক 'জিম করবেট্' বহুকাল ধ'রে তাঁর বহু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর নামে সমগ্র কুমায়ুন এখনও কৃতজ্ঞতা জানায়। প্রতি বৎসর তাঁরই নামে রুদ্রপ্রয়াগে আজও একটি মেলা বসে। নৈনীতালে 'সংরক্ষিত অরণ্যের' নামকরণ করা হয়েছে 'জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক।'

নৈনীহ্রদটিকে কেন্দ্র ক'রে আধুনিক নৈনীতাল শহরটি গ'ড়ে উঠেছে। উত্তপ্ত ভারতের সমতলে দাঁড়িয়ে সাহেবরা খুঁজে বেড়াতো ঠাণ্ডা অঞ্চল। বস্তুত, ইংরেজের আনুকূল্যেই ভারতে একটির পর একটি সুন্দর শহর গ'ড়ে উঠেছে। ডালহাউসী, ল্যান্সডাউন, শিমলা, মুসৌরী, শিলং, এমন কি দার্জিলিঙেরও প্রায় ওই একই ইতিহাস। ইতিহাস বলে, ব্যারন নামক এক সাহেব সাজাহানপুর থেকে বেরিয়ে মাছ ধরবার জন্য এসে পৌছন নৈনীতালে —সেটি ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি এই মনোরম পার্বত্য এলাকাটির সংবাদ দেন কর্তৃপক্ষ মহলে। অতঃপর সিপাহী-বিদ্রোহের পর থেকে নৈনীতাল সাহেবদের পক্ষে একটি আঞ্চলিক শাসনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। হ্রদের চারিপাশে নৈনীতালের যে শহরটি আমরা দেখি, সেটি হোলো অনেকটা নীচের তলা। এখানে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে বাজার, বাসস্থান ও হোটেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত। নানাবিধ কাজ কারবার বাণিজ্য বেসাতি এখানেই দেখতে পাওয়া যায়। উপরতলায় রাজধানী এবং সরকারী দপ্তর। আজকে অত্যন্ত প্রয়োজন না ঘটলে প্রাদেশিক সরকার গ্রীষ্মকালে আর লক্ষ্ণৌ থেকে স্থানান্তরিত হয় না। নীচের তলায় শীতের বাতাস কিছু কম বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা প্রচুর। উত্তরপূর্বের একটি অংশ অনেকটা অবারিত থাকার জন্য শীতের দিনে ঠাণ্ডা নেমে আসে, এবং তখন নগরের কাজকারবার বন্ধ ক'রে স্থানীয় অধিবাসীদের মোটা অংশটা নীচের দিকে চ'লে যায়। শীতের দিনে পশ্চিম পাহাড়ের পিছন থেকে জন্তু-জানোয়াররা হ্রদের

চৌহদ্দির বনময় অঞ্চলে নেমে আসে। এই জলাশয়টি নৈনীতালের প্রধান আকর্ষণ।

শহরের নীচের তলাটা চৌবাচ্চার মতো কিনা, ওখানে দাঁড়িয়ে একথা ভেবেছি অনেকবার। জলাশয়ের শোভা অপরূপ, কিন্তু হিমালয়ের সুদূর-ব্যাপকতার স্বাদ নীচের তলায় নেই। কাশ্মীরের শেষনাগ, গঙ্গাবল, উলার হ্রদ,—এদের চারিদিকে অনন্তের পরিব্যাপ্তি। জগৎপ্রসিদ্ধ হিমালয়বিশেষজ্ঞ স্বামী প্রণবানন্দ বলেন, মানস সরোবরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে মানুষের পথহারা কল্পনা কৈলাসশৃঙ্গের চারিদিকে সমস্ত আকাশে আর তিব্বতে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার তুলনায় নৈনীতালের এই জলাশয় যেন অবরোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে। স্থানীয় অধিবাসীরা জানে এই হ্রদের জল স্বাস্থ্যকর নয়, সেইজন্য মাঝে মাঝে এর জল কতকটা নিকাশ ক'রে দেবার জন্য একটি নালীপথ বানানো আছে, কিন্তু নালীর দক্ষিণে যে প্রবাহ পথটি দেখি, সেটি প্রাকৃতিক। এরই আশে পাশে স্থানীয় বস্তির জটলা। পুরনো বাড়ীঘর, গলিঘুঁজি, নোংরা আর নর্দমা। পাহাড়ী শহরের বস্তি অঞ্চল কোথাও সুশ্রী নয়। যেখানে যাও—দার্জিলিঙে, মুসৌরীতে, শিমলায়, আলমোড়ায়—এরা সেই একই পরিচয় বহন করে। বছরে মোটামুটি ছয়মাস হোলো 'সীজন', বাকি ছয়মাস তারা দারিদ্র্য ভোগে।

চারিদিকের অবরোধ সম্বন্ধে যে কথা তুলছি, তাদের প্রত্যেকটি হোলো এক-একটি পাহাড়ের শীর্ষ। কোনোটির নাম 'আয়ারপট্ট', কোনোটি 'দেওপট্টি'। উত্তর অঞ্চলে হোলো 'চায়নাপীক', এদিকে আল্মা, লারিকান্টা, শের-কি ডাণ্ডা,—এরা চারিদিক থেকে ওই হ্রদটিকেই যেন ঘিরে রয়েছে। কিন্তু হাজার খানেক ফুট উপরে উঠলেই পৃথিবী অনেক বড়। যতদূর তাকাও—উত্তরে অনন্ত গিরিশিখর শ্রেণী—পূর্বেও তাই, পশ্চিমেও তাই। কেবল দক্ষিণে ঠাহর করলে দেখা যায় অন্তহীন হিন্দুস্থানের ধূসর অস্পষ্ট সমতল। পূর্ব-পর্বতের 'টিফিন্ টপের' উপরে উঠে সমস্ত দিনমান ধরে কেবলমাত্র হিমালয়ের পরমাশ্চর্য মহাশ্বেত শোভা দেখতে দেখতেই দিন কেটে যায়। যারা নৈনীতালে আসে তারা জলের ধারে তলিয়ে থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করবে সন্দেহ কি।

. ছোট্ট গল্পটি মনে পড়ছে। নৈনীহ্রদে নৌকাবিহারকালে মাঝি বলেছিল: বছর পঞ্চাশেক আগে এক সাধু এখানে আবির্ভূত হয়ে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে এক হৈ চৈ বাধিয়েছিল। সে নাকি স্বপ্নাদিষ্ট হয় যে, এখানে হ্রদের ধারে নয়নাদেবীর মন্দির নির্মাণ না করলে তার নিস্তার নেই। সাধু এই দাবি করে যে, এখানে নগরের সম্প্রসারণ কিছুতেই চলবে না। তৎকালীন ইংরেজ

গভর্নর বাহাদুর সাধুর কান ধরে এখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা পান, এবং সাধুর পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দেন। সাধু ভয় পাননি। সে বিনামেঘে এমন এক বজ্রাঘাত ঘটায় যে সমগ্র নৈনীতাল থরথরিয়ে ওঠে। চোখ রাঙিয়ে সে বলে, এমন ভূমিকম্প সে আনবে যে লাটপ্রাসাদ ধূলিসাৎ ক'রে দেবে! বোধ করি সেই সাধুর কিছু অলৌকিক শক্তি ছিল, সেইজন্ত ইংরেজ তার দাবি স্বীকার করে এবং নয়নাদেবীর মন্দির নির্মাণের জন্ত কতকটা জায়গা জমি ছেড়ে দেয়। কিন্তু এর পরও আবার নানা কারণে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ বেধে ওঠে, এবং সাধুকে সমুচিত শাস্তি দেবার জন্ত গভর্নর স্বয়ং যখন পুলিশ ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হন তখন অকাল বর্ষণের ফলে পাহাড়ের গা থেকে এক বিরাট ধ্বস নেমে আসে নীচের দিকে,—চারিদিক ছত্রখান হয়ে যায়। সাধু সেই সময় অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু যাবার সময় এই অভিসম্পাত দিয়ে যায় চল্লিশ বছরের মধ্যে ইংরেজ সাম্রাজ্য পৃথিবী থেকে রসাতলে যাবে। সাধু মিথ্যে বলেননি।

নৌকার মাঝি সগৌরব উদ্দীপনার সঙ্গে মোটামুটি গল্পটা শোনালো। ওখানে আজও একটি সাধু দেখছি বৈকি। তবে সে এক ভক্ত শিষ্যসহ হ্রদের তটের নীচে জলের কোলে একটি গুহার মধ্যে থাকে। জলের ওপরেই তার বাসা; এবং ওরই মধ্যে লতাপাতার ছায়ায় গুহাটি ঢাকা,—গাঁদাফুলে ভরা সেই গুহামুখ। ওরা নিজেদের সংসারটি বানায় ঠিক সেইখানে, যে-স্থানটি সর্বপরিত্যক্ত। গাছের তলা, নদীর তট, পাহাড়ের গুহা, মন্দিরের পাশ, পথের ধার—যেখানে কারো প্রয়োজন নেই, যেখানে কোনও নিষেধ নেই। ভিক্ষে করে না, কিন্তু আকর্ষণ করে। কথা বলে না,—রহস্য ঘনিয়ে তোলে। চোখ তুলে তাকায়,—যেন আত্মার নিগূঢ় জিজ্ঞাসার শেষ জবাব। চুপ ক'রে থাকে,—সৃষ্টিতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্তটা বুঝে নাও। চরসের কল্‌কেটায় দম ভরে টান দিল,—ওই সঙ্গে ফুঁকে নিল জীবনটা। এক সময় হঠাৎ ধুনির থেকে ভস্মতিলক তুলে দিল তোমার ললাটে,—ব্যস, আর চাই কি, ভাগোযানকো, মিল গিয়া। নমস্কার জানিয়ে চলে যাও।

নৌকা আমাদের ভেসে চললো। 'সন্ধ্যা-সকাল করছিল শুধু এঘাট ওঘাট।' সমস্ত দিনমান সুন্দর রৌদ্র আর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটি পাহাড় ছায়া ফেলেছে হ্রদের জলে—যেমন ওর মধ্যে, প্রতিফলিত হচ্ছে নীলকান্ত আকাশ। ছবি আসে না ওদের,—কেননা ছবি অপেক্ষাও মনোরম। অপরিসীম আনন্দের সঙ্গে নিবিড় অতৃপ্তি যেন জড়িয়ে আছে পাহাড়ে আর ছায়াচ্ছন্ন জলাশয়ে। এখানে শহর বটে,—কিন্তু সমস্তটা শান্ত। জলে আকাশে পাহাড়ে বাতাসে যেন সমস্ত দিন ধ'রে একটা প্রশ্নোত্তরের মীমাংসা চলেছে,—

আমরা যেন তার নিঃশব্দ শ্রোতা এবং দর্শক। জ্যোৎস্নালোকে জলাশয়ের তীরে আড়ালে-আবডালে ব'সে আছে সবাই। যেন এবার ইন্দ্রসভার নাচের আসর ব'সে যাবে। আমাদের স্তব্ধ নিমেষহত দৃষ্টির পিছনে নিরুদ্ধ উৎকণ্ঠা।

গির্জায়, 'গুরদোয়ারে', রাধাকৃষ্ণ ও নয়নার মন্দিরে, কিছু যেন খুঁজে ফিরছি। কিছু দেখে যেতে চাই এখানে ওখানে—কিন্তু তার সংজ্ঞাটা সঠিক জানিনে। কৌতূহল আছে, কিন্তু সংশয় আছে অনেক বেশি। সমস্ত জীবন ঘষেছি পাহাড়ের পাথরে-পাথরে,—অরণিকাষ্ঠ যেমন ঘষে আগুন জ্বালাবার জন্য। ছমছমিয়ে এসেছে দিনান্তের অন্ধকার, এসেছে অরণ্যতলের ছায়া রাহুর মুখব্যাদান ক'রে, শুষ্ক পত্রদলের সরসরানির মধ্যে পায়ে পায়ে লেগেছে রোমাঞ্চ কৌতুক, লেগেছে কম্প, লেগেছে হর্ষ—বুঝিনি অনেক সময় নিজের মধ্যে এমন অধীর উদ্দীপনা কেন, কেন অকারণে প্রাণ এমন ক'রে থরথরিয়ে ওঠে। তখন দ্রুতপদে চ'লে এসেছি ছায়ালোকের বাইরে। যে বস্তু খুঁজতে গিয়েছিলুম, তাই যেন পাবার ভয়ে পালিয়ে এসেছি।

চিত্তের এই দিকটা এবং বৈলক্ষণ্য বুঝিনি কোনোদিন।

জলে স্থলে পাহাড়ের কোলে কোলে আজ সকালে নৈনীতালের হাসি উচ্ছ্বসিত। নীল আকাশের মাঝখানে মেঘেরা এসে দাঁড়িয়েছে যেন শ্বেত ঐরাবত সামনের দুই পা তুলে। হেমন্তের নীলিমার নীচে বিরাটের স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে পর্বতের শিখরে-শিখরে। চাঞ্চল্যের বেগ আসছে মনে ক্ষণে ক্ষণে।

বারান্দার নীচে দিয়ে মাঝে মাঝে পেরিয়ে যাচ্ছে বায়ুবিলাসী ঘোড়-সওয়ার। মোটরও যাচ্ছে এক আধখানা। পাহাড়ী শহরে এলে পাওয়া যায় ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে। ছত্রিশটি জাত ছড়ানো থাকে সমতল ভারতে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাদের সহসা খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু এখানকার স্বল্প পরিধির মধ্যে তারা স্বপ্রকাশ। এখানে এলে ঘরের চেয়ে বাহির হয় প্রধান। বাইরে আসতে হবে সবাইকে। ধরা দিতেই হবে সকলের মাঝখানে। সেই কারণে হেমন্তের স্নিগ্ধ হাওয়ায় আর মধুর রৌদ্রে সর্বব্যাপী আনন্দের যে আসর বসেছে, সেখানে এসে পৌঁছেছে মারাঠী আর মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী আর রাজস্থানী, গুজরাটী আর ওড়িয়া। বালক বালিকারা এসেছে লক্ষ্মৌ থেকে তাদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে,—তারা যাবে পাহাড়ে পাহাড়ে 'একস্‌কারশনে।' এদের পাশে বাঙালী ছেলেমেয়ের নির্জীব

চেহারা কল্পনা ক'রে লজ্জা পাই। স্বাস্থ্যে শিক্ষায় কর্মক্ষমতায় বাঙালী আজ ভারতের কোথাও সুদৃঢ় হয়ে নেই। আজ দেশের চারিদিকে—ভিতরে ও বাইরে—যখন দুরন্ত জীবনের অভিযান ডাক দিচ্ছে তারস্বরে, তখন বাঙালী লক্ষে লক্ষে দাঁড়িয়ে ভিক্ষাপাত্র বাড়াচ্ছে। বদ্ধজলায় বাঙালীর পা পুঁতে ব'সে গেছে, রাজনীতি এনেছে ওদের জীবনে যক্ষ্মা, দারিদ্র্য এনেছে ওদের জীবনের দৈন্য, অন্তর্দ্বন্দ্ব এনেছে ওদের জীবনে পাশব প্রকৃতি। বাইরের সরল বৃহৎ, উদার ও সর্বপ্লাবী প্রাণশক্তির দিকে বাঙালীর চোখ নেই। ওরা আগে চায় চাকরি, পরে চায় ধর্মঘট। স্বাধীনতালাভের জন্য যে-বাঙালী চেয়েছিল মৃত্যু, স্বাধীনতা লাভের পর সেই বাঙালী যেন চাইছে অপমৃত্যু!

সুশ্রী বালকবালিকাদলের আনন্দোজ্জ্বল কোলাহলের দিকে চেয়ে থাকলে ঈর্ষাকাতর চক্ষু এক সময় বাষ্পাচ্ছন্ন হ'যে আসে। ওই অবাঙালী ওরা আমাদেরই সন্তান এবং আমারই ভারতের ভবিষ্যৎ—এ সান্ত্বনা মন যেন মানতে চায় না।

ভদ্রসমাজের তথাকথিত আবহাওয়াটাকে ছাড়িয়ে মাটির তলায় গিয়ে নামলে দেখতে পেতুম স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রা। বাইরে থেকে এসেছে অনেকে, যারা ছোট ছোট ব্যবসায়ী। আরও আছে যারা নেপালী কিংবা গাড়োয়ালী। তারা মোট বয়, দোকানে কাজ করে, ঘোড়া রাখে, অলিগলিতে প'ড়ে থাকে। নেপালী এসে হোটেলের চাকরি নেয়, ড্রাইভারি করে, কিংবা বায়ুসেবীদের কাছে দাসখৎ লেখে। কুমায়ুনীরা ঘরে কম্বল বোনে, দর্জিগিরি করে, ফল আর সব্জি বেচে, আর নয়ত খাবারের দোকান দেয়। ওদের পিছনে যে-গৃহস্থের জীবনযাত্রা, সেটির দিকে চোখ না পড়াই উচিত। শীতকালের তিন চার মাস ওরা কুঁকড়ে ঘরের মধ্যে পড়ে থাকে। শাকসব্জি শুকিয়ে রাখে ঘরে, ক্ষেত-খামারের কাজ থাকে না, রোগে ভোগে ওষুধ জোটে না, বাইরের বাড়ীওয়ালারা ওদের কাছে জুলুম ক'রে ঘরভাড়া চায়। চৈত্রমাস পড়লে তবে ওদের মনে আশার সঞ্চার হয়,—'চেঞ্জার'দের প্রতীক্ষায় দিন গোনে। যারা খোঁজ রাখে তারা জানে পাহাড়ী শহরের নীচের তলাটা রোগে আর দারিদ্র্যে পঙ্গু। দার্জিলিংয়ে, মুসৌরী-আলমোড়ায়, শ্রীনগরে—সর্বত্র প্রায় একই ইতিহাস। গভর্নমেণ্ট দেশের খবর রাখেন, পাহাড়ের খবর সকল সময় তাঁদের কানে ওঠে না।

মহাদেবের চূড়ায় গঙ্গা যেমন বন্দিনী হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি চেহারায় নৈনী হ্রদটি রয়েছে নৈনীতাল শহরে। ওখান থেকে মাইল সাতেক নীচে নেমে এলে 'ভাওয়ালীর' ছোট শহর। ওপাশ দিয়ে উঠেছিলুম, এপাশ দিয়ে

নেমেছি। এটি সেই প্রধান রাজপথ—যেটি রামনগর থেকে এসে আলমোড়ার দিকে চলে গেছে। পথটি অতি চমৎকার এবং বনময় পার্বত্য অঞ্চলের আলোছায়ায় অপরূপ। এ আমার পরিচিত পথ। তবু আবার এসেছি অনেক দিন পরে। পুরাতন বন্ধুদের প্রাচীন স্নেহ যেন ডাক দিচ্ছে ওক আর দেওদারের বনে-বনে। ঝাউবনে বাতাস উঠেছে, অতীত কাহিনীরা যেন আমায় কাছে পেয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছে। একালের নতুন পাখীরা এসে বাসা বেঁধেছে নির্ঝরের আশে পাশে, গিরিনদীর প্রাণধারা শুকিয়ে এসেছে, পাথরের থেকে শৈবাল ঝরে গেছে—দীর্ঘশ্বাস ফেলছে যেন সর্বগ্রাসী মহাপ্রাচীন। এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি—আমার সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়ে গ্রহণ করে নিচ্ছে সব। প্রতি গ্রানাইট পাথরে, প্রতি অর্কিডের চারা, প্রতি পুষ্পের স্তবক, প্রতি নিকুঞ্জের কুসুমলতা, ওরা থাকে এ পাড়ায় আমার অতিপরিচিত মহলে। কিন্তু সমস্ত পরিচয়ের বাইরেও ওরা আমার চোখে চিরকালের অচেনা। ভালোবাসার পাত্রকে নিবিড় ক'রে বুকের মধ্যে টেনে নিই,—যেন সে নিজের সমস্ত অনাবিষ্কৃত পরিচয় নিয়ে আমার কাছে ধরা দেয়। আলিঙ্গনের মধ্যে পাই যতটুকু, তার চেয়ে অনেক বেশি প'ড়ে থাকে বাইরে। সেই কারণে বড় প্রেম হোলো বড় তপস্যার মতো। হাত বাড়ালেও যা পাইনে, হৃদয়ের একূলে ওকূলে যাকে ধরে না,—সেই অলভ্য অনাস্বাদিত অমৃতলাভের আশায় প্রেমের চক্ষে অশ্রু গড়িয়ে আসে। এদের বুকের মধ্যে নিয়েছি একদিন, কোলে নিয়ে কেঁদেছি, কতদিন। যেন জন্ম-জন্মান্তরে দেখেছি, হাজার হাজার বছর ধ'রে জেনেছি। অগণ্য বংশপরম্পরায় মহাকালের কল্পে কল্পে আমি ওদের দেখে চলেছি বিবর্তনবিধির ভিতর দিয়ে। আমার শিরা-উপশিরাদলের রক্তপ্রবাহে বয়ে গেছে শত-সহস্র গিরি-নির্ঝরিণীরা, আমার অস্থিপঞ্জরের স্তরে স্তরে সংখ্যাতীত শিলাসনে প্রাচীন মুনিঋষির যোগাসন পেতে রেখেছি, আমারই হৃদয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি ধারণ ক'রে রয়েছি দেবসিংহাসন হিমালয়ের অগণিত শৃঙ্গমালা. জন্ম আর মৃত্যুর অতীত অখণ্ড চৈতন্য সেই আমি,—সেই আমার আদি চৈতন্য কল্পান্তরে, দেহান্তরে, জন্মান্তরে, যুগান্তরে বিবর্তিত। পুরাণে ইতিহাসে অতীতে আধুনিকে ভবিষ্যতে,—সেই আমি অজর অক্ষয় অব্যয় ভারতাত্মার নিত্যপ্রতীক। আমার ক্ষয় নেই, লয়ও নেই। আমার অহঙ্কার,—ওরা আমাকে এনে ওদের মাঝখানে বসিয়েছে বারম্বার। ওরা ভাষা দিয়েছে আমার মুখে, প্রাণ দিয়েছে আমার দেহে, নিশীথরাত্রির তারায় পাঠিয়েছে আমন্ত্রণ, হেমন্তের হাওয়ায়-হাওয়ায় সুরভিশ্বাস নিয়ে গেছে আমার বাতায়নে কতবার।

ভাওয়ালীর পাহাড়ের কোলে নিভৃত বনচ্ছায়াময় অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে ভারতপ্রসিদ্ধ যক্ষ্মারোগী-নিবাস। ভাওয়ালী শহরটি ছোট, কিন্তু এই রোগী-নিবাসটির জন্য শহরটি সর্বত্র সুপরিচিত। অসুস্থ না হ'লে এমন একটি মধুর কাব্যপরিবেশ কপালে জোটে না—এ যেন জীবনের একটি পরিহাস। কলকণ্ঠী পাখী আর সরীসৃপের ডাক ছাড়া সমগ্র অঞ্চল যেন প্রাণিচিহ্নহীন। রোগী-নিবাস থেকে সামান্য উৎরাই পথে আন্দাজ আধ মাইল নেমে এলে ভাওয়ালীর ক্ষুদ্র জনপদ। এখানে পথের চৌমাথা,—সামনে পাহারাদার দাঁড়িয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রিত করছে। অদূরে মোটরবাসস্ট্যাণ্ডের অঞ্চলটি কতকটা প্রশস্ত। গিরিশ্রেণীর সান্নিবদ্ধ জটলার বাইরে দৃষ্টি বেশিদূর পৌছয় না। পাহাড়ের গা বেয়ে একটি ঝিরিঝিরি ঝরণা নেমে এসেছে।

এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল পথ 'ভীমতাল।' পথ পার্বত্য, কিন্তু অনেকটা উপত্যকাপথ। ডানদিকের একটি পাহাড়ের নীচে গা বেয়ে-বেয়ে পথ চ'লে গেছে দক্ষিণ অঞ্চলে। ভাওয়ালীর ক্ষুদ্র জনপদটিতে আবার যথাসময়ে ফিরে আসতে হবে।

ভীমতালের পথটি তেমন মসৃণ নয়, কিছু কর্কশ। এখানকার উঁচু কোনও পাহাড়ের শিখরে উঠলে দক্ষিণ কুমায়ুনের তরাইয়ের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সে অনেকটা ওই কার্সিয়াং অঞ্চলের ন্যায় ধূসর একটা ছায়ার মতো. এ পথটি ভীমতাল হয়ে এঁকেবেঁকে উপত্যকাপথে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আমাদের গাড়ী যখন এসে পৌছলো তখন মধ্যাহ্ন পেরিয়েছে।

ভীমতালের হ্রদটির বর্গ পরিমাপ নৈনীতাল অপেক্ষা একটু বড, এই আমার ধারণা। কিন্তু নৈনীতাল অপেক্ষা প্রায় দু হাজার ফুট নীচে হওয়ার জন্য এখানে রৌদ্রের উত্তাপ বেশী। উঁচুতেই হোক আর নীচেই হোক, পাহাড় অঞ্চলে রৌদ্রের তাপ অতি প্রখর। হেমন্তকালে হরিদ্বার বাতাসের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কিন্তু হৃষিকেশ লছমনঝুলা অঞ্চলে গরম। মাত্র পনেরো ষোলো মাইলের মধ্যে এই তারতম্য ঘটে। শুধু এখানে নয়, তুষার রাজ্যেও এই। পঞ্চচুলীর শৃঙ্গবিজয় অভিযানে যিনি প্রথম সাফল্যলাভ করেন, দিল্লীর সেই ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পি. এন. নিকোর বলেন "সাড়ে বাইশ হাজার ফুটের উপরে উঠে প্রখর উত্তপ্ত সূর্যরশ্মি তাঁকে যেন ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ করছিল। কিন্তু বাতাস উঠলেই সর্বনাশ। সেই বাতাসে আসবে কুহেলী, এবং অতঃপর তুষারঝটিকা।"

ভীমতাল নাকি অতলস্পর্শ গভীরতার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে এসে দেখি

হ্রদটি বড নির্জন, বড়ই একা। ওপারে একটি বৃহৎ পর্বতচূড়া, এবং ওটির নাম 'হিডিম্বা' পাহাড়। এ অঞ্চলে কেবল এই হ্রদটি নয়, এখান থেকে মাত্র তিন মাইলের মধ্যে পর পর সাতটি 'তাল' পাওয়া যায়। তাদের কথা আগে বলেছি। কাছাকাছি এসে দেখি, ভীমতাল সরোবরের দক্ষিণ-পূর্বে একটি প্রাচীন শিব-মন্দির। নাম, ভীমেশ্বর মহাদেব। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম দেখা যাচ্ছে হিমালয়ে পরিভ্রমণ করেছেন প্রচুর। আসামে হিড়িম্বাপুর (ডিমাপুর) কো-হিমা অর্থাৎ হিডিম্বা পাহাড, নেপালে ভীমপেডী, হরিদ্বারে ভীমগোড়া, —এর পরেও পাঞ্জাবে আর কাশ্মীরে কি কি চিহ্ন যেন পাওয়া যায়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নামে উৎসর্গীকৃত একটি দেবস্থানও কই এযাবৎ চোখে পড়েনি। শ্রীরামচন্দ্র ছডিয়ে আছেন যেমন ভারতের সর্বত্র তেমনি হিমালয়েরও সবত্র। শ্রীনগরের উত্তরপথে সিন্ধু নদী অতিক্রম ক'রে গিলগিটে ঢোকবার তোরণদ্বারই হোলো রামঘাট। পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর এলাকার একটি জনপদের নাম রামপুর। পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বড শহরের নাম রামনগর—যেটি শিয়ালকোটের দক্ষি। অঞ্চলে চন্দ্রভাগার তীরে। সুতরাং 'রামঘাট' থেকে সেতুবন্ধ 'রামেশ্বরম্' পর্যন্ত ভারতবর্ষ একসূত্রে গাঁথা।

ভীমতাল হ্রদের ঠিক মাঝখানে একটি ক্ষুদ্রদ্বীপ বয়েছে চোখের সামনে,— কলকাতার লেক-এ যেমন দেখা যায়। গিবিলোকে নদীর সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু জলাশয়ের সংখ্যা বড কম। সেই দীঘি, হ্রদ, সরোবর—তাদের আকর্ষণ বেশী। এই হ্রদের পশ্চিম পাহাডে আদিবাসী পাহাডী মেযে ছিলেন পবমাসুন্দরী শ্রীমতি হিডিম্বা। তিনি বোধকবি ভীমেব অসমশক্তির কাহিনী শুনে মুগ্ধ হযে দ্বিতীয় পাণ্ডবকে এখানে আমন্ত্রণ কবেন। পাহাডী মেয়ের কঠিন যৌবন হয়ত খুঁজেছিল শক্তিমান পুরুষ। ভীম আসেন এখানে, এবং উভয়ে প্রণয়াসক্ত হযে বিবাহ করেন। সম্ভবত এই সরোবরের মাঝখানে ওই জনহীন দ্বীপকাননে তাঁবা মধুযামিনী যাপন কবেছিলেন। ঘটনাটি মহাভাবতে ঠিক এই ভাবে আছে কিনা মনে পডছে না।

একটি প্রাচীবের পিছন দিয়ে ভীমেশ্বর মহাদেবেব মন্দিবের চত্বরে উত্তীর্ণ হলুম। বৃক্ষচ্ছায়ামঘ মন্দিরেব অঙ্গন - অদূরে বস্তি ঝুক ঝুক বাতাস বইছে ছায়ালোকে। ছোট একটি পাণ্ডা পরিবার এখানে থাকে। শিবেব কাছেই পার্বতী। গণেশ থাকবেনই, এবং সিন্দুরমাখা 'মহাবীর' অবশ্যম্ভাবী। হনুমান হলেন শৈবভারতে শক্তির প্রতীক। বেদী বাঁধানো রয়েছে পাথরের, তারই এক পাশে ব'সে কতক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া গেল। মন্দিরের মতো এমন মধুর অনাহত বিশ্রামের ক্ষেত্র আর কোথাও নেই। গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় হিমালয়ের

হাওয়ায় নিভৃত মন্দিরের এক কোণে চোখ বুজে শুয়ে থাকা,—তার সঙ্গে যদি থাকে আকাশপথের পথিক পাখীর চূর্ণ কণ্ঠস্বর, আর যদি থাকে নিকটবর্তী নালাপথে সরোবরসলিলের কুলকুলধ্বনি—তাহলে সেই সৌন্দর্য-চেতনার শিহরণে আকাশের অনন্ত নীলিমাও শিউরে ওঠে বৈকি। বিশ্বাস করবে না অনেকে,— স্বর্গলাভ করি আমি কথায় কথায়।

ওরই মধ্যে এক সময় দেখে নিলুম ভীমতালের সঙ্গে নালীপথ সংযুক্ত করে স্লুইস গেট বানিয়ে জল নিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। এর পর জ্যামিতিক পদ্ধতি দেখতে সময় গেল। অতঃপর ভাওয়ালীতে ফিরে এসে চললুম এবার রামগড়ের দিকে। ভাওয়ালী থেকে রামগড় নয় মাইল কিন্তু অধিত্যকা পেরিয়ে ধীরে ধীরে চড়াই পথ উঠে গেছে। এ পথটি পাকা। নাম 'নেহরু রোড।' দক্ষিণপূর্ব দিক পেরিয়ে গাড়ী চলেছে উত্তর দিকে। এ অঞ্চলের যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ দেখে মন খুশী হয়। মোটরবাসের প্রথম যুগে মালিক এবং চালকের যে স্বেচ্ছাচার ছিল—যেমন ছিল কলকাতায়, এখন আর সেরূপ সহসা চোখে পড়ে না।

ডালিমের বন ঘেঁসে চলেছি। ছোট ছোট কমলা ধরেছে গাছে গাছে। 'বাসনার সেরা বাসা রসনায়'—ফলের বাগানের চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ ভীমেশ্বর মহাদেবের কথা ভুলে গেলুম। শুষ্ককণ্ঠে এখনই কিছু ফলের রস সঞ্চারিত না হ'তে পারলে জীবনটাই ব্যর্থ। দার্জিলিংয়ের ভুটিয়া মেয়ের দুটি গালের মতো টসটসে আপেলে রক্তের ছাপ পড়েছে,—মাথায় থাকুন। ভীমেশ্বর। কিন্তু ফলের বাগান নাগালের বাইরে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কোনো লাভ নেই। ওইসব রাঙা ফলের পিছনে আছে রক্তলোভাতুর মহাজনের দল। তাদের সঙ্গে আছে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য চক্রান্ত। ফল তারা পচিয়ে দেবে সে ভালো, কিন্তু অল্প দামে বেচে বাজার মাটি করবে না। প্রলোভনের ফাঁদ ওরা পেতে রেখেছে নগরে নগরে। কায়েমী স্বার্থের সাফল্যটা ফলের রসে সরস। আমাদের গাড়ী চলেছে চড়াই পথে।

পাহাড়ের নীচে নীচে দেখে যাচ্ছি, নতুন ধরনের ফলনের কাজ চলছে। কোথাও ফুলের বাগানে চলছে পরীক্ষা, কোথাও বা লতাপাতা নিয়ে নতুন পদ্ধতির গবেষণা। ওরই মধ্যে পেকে উঠছে ফলপাকড. ওরই মধ্যে চলছে আলুর চাষ। রেশমের গুটিপোকা ও মৌমাছির চাষ চলছে নানাস্থানে।

একটি চাষীপ্রধান গ্রাম লেগে রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। এর নাম বুঝি 'বিনায়ক'। হবেও বা। কিন্তু এখান থেকে একটি পথ গিয়েছে মুক্তেশ্বরে চৌদ্দ মাইল চড়াই আর উৎরাই পেরিয়ে। একথা লোকে বোধ হয়

ভুলতে বসেছে যে মুক্তেশ্বর হোলো একটি তীর্থস্থান। কেননা প্রায় ষাট বছর পূর্বে ভারত গভর্ণমেন্ট মুক্তেশ্বর পর্বতের শিখরে একটি পশুচিকিৎসা ও গবেষণাকেন্দ্র নির্মাণ করেন। আজ সেই প্রতিষ্ঠান বড হয়ে উঠেছে এবং ভারতের নানা অঞ্চল থেকে কর্মী ও ছাত্ররা বিভিন্ন কাজ নিয়ে আসে। মুক্তেশ্বরের চারিদিকে কুমায়ুনের মনোরম উপত্যকাগুলি বিস্তারিত ভাবে দেখে নেওয়া যায় এবং এই মুক্তেশ্বরে দাঁডালে হিমালয়ের চূডাদলের শত শত মাইল শোভা সমগ্র দিগন্ত জুড়ে দৃষ্টিগোচর হয়। 'বিনায়ক' অথবা 'রামগড' থেকে মুক্তেশ্বরের পথে এখনও গাডী চলে না। পায়ে হেঁটে অথবা ঘোডার পিঠে বারো চৌদ্দ মাইল পথ যাওয়াই সুবিধা।

আমাদের গাডী এসে পৌছলো 'রামগডে। এখানে একটি ডাকবাংলো রয়েছে অদূরে, কিন্তু আমাদেব পক্ষে ওটার প্রয়োজন ছিল না। এই রামগড একটি মস্তবড বাণিজ্যের কেন্দ্র। কিন্তু শহর নয়, সামান্য একটি জনপদ, উপরে ও নীচে কয়েকখানা কাঁচা-পাকা বাডীঘর দেখা যাচ্ছে। রামগডের শিখর লোকে একটি উপত্যকায় মোটরবাস এসে দাঁডালো, এব পব আর যাবে না। পাহাডেব অনেক নীচে দিয়ে চলেছে রামগড নদী। বেশীদিনের কথা নয়, বোধ হয় শ'দেডেক বছব আগে এ অঞ্চলে কযেকজন চীনার দখলে ছিল কযেকটি সম্পত্তি। তাবা এখানে চাযেব চাষ কবেছিল। আজ 'চায়না পীক' তাদের প্রতিপত্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ অঞ্চলটি যাঁর দখলে ছিল তিনি বোধ করি এখানকাবই 'হরতোলা' স্টেটেব রাজা কৃষ্ণপাল সিং। আজও রামগডের নীচে তাঁর নানাবিধ রাজকীর্তির স্থাপত্যচিহ্ন পডে রযেছে। এর পর একে একে আসেন ইংরেজ মিঃ কামারফোড এবং মিঃ ষ্যালেন। দেখতেই এসে পৌছে যান্ অজরগডের বাজা, ধনপতি বিডলা এবং যুগীলাল কমলাপতি। ক্ষুদ্র রামগডের আসর একেবারে গরম হযে ওঠে।

প্রশ্ন দেখা দেয়, এত পাহাড থাকতে এই অপরিচিত অজানা ও অখ্যাত রামগড় অঞ্চলে এঁরা এলেন কেন? একটি উপমার লোভ সামলাতে পারছিনে সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিই। রুধিরের গন্ধে বাঘ আসে। রামগডের মাটি সরস, পাথরের ভিড় কম, এবং অতিশয় ফলনশীল। সমগ্র উত্তরভারতে 'নৈনীতালের আলু' ব'লে যেটি প্রসিদ্ধ, এই অঞ্চল হোলো তার প্রধান জন্মভূমি। এ ছাডা কাশ্মীরের পরে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মেওয়াফল নাকি অন্য কোথাও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং প্রতি বৎসর এখান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার রপ্তানির খেলা চলছে। প্রত্যেকটি পাহাড়ের সানুদেশ বিরাট ও বৃহৎ এক-একটি ফলনক্ষেত্র। আলু আর আপেল হোলো প্রধান। সঙ্গে আছে আনার, ডালিম, নাসপাতি,

কমলা, টম্যাটো, মটরশুঁটি ইত্যাদি। এদেরই পাশে দেখতে পাচ্ছি, গভর্নমেন্ট-প্রতিষ্ঠিত ফল ও সব্জি সংরক্ষণ ক'রে রাখার জন্য একটি মস্ত কারখানা। মনে প'ড়ে গেল, আজকাল কয়েকজন লোভী ব্যবসায়ী আরম্ভ করেছে 'কোল্ড-স্টোরেজের' নামে একটি শোষণচক্রান্ত। কলকাতায় সম্প্রতি এর উৎপাত চলেছে। সময়কালের ফল ও সব্জি অসময়ে বেচতে পারলে দুপয়সার বদলে চার পয়সা লাভ,—সেগুলো মানুষের খাদ্যের উপযোগী থাক আর নাই থাক। শীতকালে আম, বসন্তকালে আনারস, গ্রীষ্মকালে কমলালেবু, বর্ষাকালে বাঁধা-কপি, শরৎকালে লিচু ইত্যাদি কিনে হাসি খুশী মুখে কেরানীবাবু যখন বাড়ী ফেরেন, তখন সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে পাচুর মা গদগদ কণ্ঠে এগিয়ে এসে 'নতুন' জিনিস স্বামীর হাত থেকে তুলে নেন। সেদিন সারারাত্রিব্যাপী উৎসব। পরদিন পাচুর জন্য ডাক্তারখানায় ছুটোছুটি।

তুষারের চূড়াগুলি অনেক দূর, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার ও সেই চূড়াগুলি মেঘময় না থাকলে এখান থেকে তাদের ছবিও নেওয়া চলে। সেইদিকে মুগ্ধ চক্ষে চেয়ে যখন একান্তে দাঁড়িয়েছিলুম তখন এক অকিঞ্চন ব্যক্তি এসে জানালো অদূরে ওই যে উঁচু পাহাড়ের গায়ে ঘরের মতো দেখতে পাচ্ছেন, ওরই একটি বাগানবাড়ীতে কিছুকাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

আমার মুখের চেহারা দেখে সে ব্যক্তি একটু সন্দিগ্ধকণ্ঠে পুনরায় বললে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শোনেননি?—জিন্‌কো 'ভারত-কবি' বোল য়্যাতা হ্যায়। দুনিয়াভর ইনসানকো প্যারে হেঁ!

সামান্য ব্যক্তির চোখে মুখে সে দিন ভারতকবির সম্বন্ধে যে গৌরববোধ দেখেছিলুম, সেটি অবিস্মরণীয়। রামগড় পাহাড়ের চূড়ায় সম্ভবত ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বাস করেছিলেন। এখানে বসে তাঁর সুদূর দৃষ্টির সম্মুখে তুষারচূড়াগুলিকে রেখে অনেকগুলি কবিতাও তিনি রচনা করেছিলেন। কেবল একবার নয়, কুমায়ুন পর্বতমালার মধ্যে মহাকবি বারম্বার এসেছিলেন। সেদিন একথা জেনে বিস্ময় এবং আনন্দ বোধ করেছিলুম, এখানকার অধিবাসীরা রবীন্দ্রনাথের সেই অবস্থান-কাহিনীকে অতি যত্নে পালন করে চলেছে। কবি যে বাড়িতে বসবাস করেছিলেন, সেটি তাঁর নিজের কিনা আমার জানা নেই। অনেকে এখন বলে, সেটি বিড়লার বাড়ী।

কাঠগোদম থেকে আলমোড়া পর্যন্ত মোটরপথ পঁচাশি মাইলের বেশী পড়ে এবং রাণীক্ষেত হয়ে যেতে হয়। কিন্তু এদিক দিয়ে যারা যায়,—অর্থাৎ

কাঠগোদাম, ভীমতাল, রামগড এবং ফিউড়া হয়ে যে পথটি গেছে আলমোড়ায়, সেটি মাত্র একচল্লিশ মাইল পথ। অসুবিধা এই, রামগড় থেকে 'ফিউড়ার' পথে আলমোড়া পৌঁছতে গেলে প্রায় কুড়ি মাইল পথ পায়ে হেঁটে কিংবা উচ্চমূল্য 'ডাণ্ডি'তে অথবা পাহাড়ী টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে যেতে হয়। এই পথটি বাঙালী জাতির নিকট অতি পরিচিত। এই পথটি দিয়ে একদা গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। দেশবন্ধু একা যাননি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, তাঁর পুত্র চিররঞ্জন ওরফে 'ভোম্বল' কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী ওরফে 'বেবি'। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দেশবন্ধু ভাগলপুর থেকে 'মায়াবতী আশ্রমের' উদ্দেশে রওনা হন এবং ভীমতাল ও রামগড়ের পথ ধরে আলমোড়া পৌঁছে আবার সেখান থেকে মায়াবতীর ভিন্নপথে অভিযান করেন। তাঁরা গিয়েছিলেন ঘোড়া, ডাণ্ডি ইত্যাদির সাহায্যে, কেননা তখন ভারতবর্ষের কোনও অঞ্চলে মোটর বাস জন্মগ্রহণ করেনি। মোটরপথও সেদিন ছিল না। দেশবন্ধুর সেই 'মায়াবতী আশ্রম' যাত্রার কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'মায়াবর্তী পথে' গ্রন্থে।

মোটরপথ অবশ্য আজও মায়াবতী পর্যন্ত নেই। কিন্তু আজ আলমোড়া পর্যন্ত এবং এদিকে রামগড় অবধি গাড়ী রয়েছে। আলমোড়া থেকে মায়াবতী পঁয়তাল্লিশ মাইলের বেশী। ইদানীং টনকপুর থেকে পিথোরাগড় পর্যন্ত মোটর বাস চলছে। এই মোটামুটি একশ' মাইল পথের মাঝামাঝি পড়ে 'চম্পাবত' এবং 'লোহাঘাট' নামক জনপদ। 'মায়াবতী বেদান্ত আশ্রম' লোহাঘাট থেকে আন্দাজ তিন মাইল পার্বত্য পথ। জনহীন বনভূমি, পার্বত্য ভূভাগের অত্যাশ্চর্য মহিমা, গিরিনদী এবং ঝরনার নয়নাভিরাম দৃশ্যের মাঝখানে 'মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত। এই জনবিরল পার্বত্য ভূভাগে আশ্রম-সংলগ্ন আধুনিক হাসপাতালটি দেখলে সত্যই মনে বিস্ময় জাগে। আমি মায়াবতী আশ্রমে গিয়ে পৌঁছই ১৯৫৭ সালের জুন মাসে। উপনিষদের ভাষ্যকার স্বামী গম্ভীরানন্দজি তখন ওখানে ছিলেন।

কাশ্মীরে পাঞ্জাবে হিমাচলে নেপালে,—যে-বিষয়টি কোথাও এমন সুস্পষ্ট-ভাবে চোখে পড়ে না—সেটি প্রত্যক্ষ করা যায় এই কুমায়ুনের তিনটি জেলার পর্বতশ্রেণীর ভিতরে ভিতরে ব্রহ্মপুরা গাড়োয়ালে কূর্মাচল আলমোড়ায় এবং ইন্দ্রপ্রস্থ নৈনীতালে। বন্য পার্বত্য প্রকৃতির সৌন্দর্য রয়েছে হিমালয়ের প্রায় সকল স্থানে,—কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন অধ্যাত্ম জীবনের স্বাদ, এমন ভগবৎ ভাবনা, এমন বিবাগী মনে বেদনা কুমায়ুন পর্বতমালার মতো আর কোথাও

নেই, যোগী, সন্ন্যাসী বৈরাগী, ভিক্ষু, তপস্বী, দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানী, বেদধ্যায়ী, বৈদান্তিক,—বোধ হয় হিমালয়ের অপর কোনও অঞ্চলে এমন অগণিত দেখা যায় না। বোধ হয় হিমালয়ের আর কোনও ভূভাগ থেকে এক-চাহনিতে এতগুলি তুষারশৃঙ্গও পাশাপাশি চোখে পড়ে না। এমন ক'রে হিমালয়ের আর কোথাও ডাকে না, এমন করে আর কোথাও সে কাছে টানে না। সমগ্র কুমায়ুনে অসংখ্য গঙ্গার আকুলি-বিকুলি চলেছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। গৌরীগঙ্গা, কালীগঙ্গা, ধবলীগঙ্গা, বিষ্ণুগঙ্গা, দুধগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, পাতালগঙ্গা, ভাগীরথীগঙ্গা, ঋষিগঙ্গা, কেদারগঙ্গা, গরুড়গঙ্গা, পিন্দারগঙ্গা,—আরও অনেক গঙ্গা। কিন্তু সব গঙ্গার জল মিলেছে গিয়ে আর্যাবর্তের মূল গঙ্গায়। ওই একেকটি গঙ্গাপথে সাধুসন্তরা বেঁধেছে আশ্রম লোকলোচনের অন্তরালে, কেঁদেছে অনেক তৃপ্তিহীন মন, ফুঁপিয়েছে অনেক জীবন অকারণ।

জনৈক আমেরিকান মহিলা শ্রীমতী সেভিয়ার তাঁর স্বামীর সঙ্গে একদা মায়াবতীর অরণ্যপ্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ান। তুষার পর্বতরাজির শোভা এখানে অপরূপ। কখনও লোহিতবর্ণ, কখনও স্বর্ণাভ, কখনও গৈরিক, কখনও বা তারা হীরকজ্যোতিষ্মান। ভারতবর্ষের আকাশ মেঘের মধ্যে প্রভাত, মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যায় যে বর্ণবৈচিত্র্যের অশ্রান্ত লীলা দেখা যায়, তারই অপরূপ ইন্দ্রজাল মেরু-মন্দার হিমালয়কে বোধ করি সেদিন মায়াচ্ছন্ন-লোকে পরিণত করেছিল। ওই মহিলা সেই দৃশ্য দেখে মায়াবতীর এই নিভৃত অঞ্চল ছাড়তে চাননি। এখানে তাঁরা দুজনে একটি বাসস্থান এবং একটি কুসুমকানন রচনা করেন। উভয়েরই বোধ করি এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁরা হিমালয়ের এক প্রান্তে ব'সে অধ্যাত্ম জীবন যাপন করবেন। এরপর তাঁরা দুজনে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে ও স্বামী স্বরূপানন্দের সাহায্যে একটি অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে যখন সেই মহিলা ভারত ত্যাগ করেন, তখন তাঁর এখানকার সমস্ত সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান ক'রে যান। মায়াবতী আশ্রমে অদ্যাবধি সেই মহিলা 'মাদার' নামে বিদিত। এই দানশীলা নারীর উদারতায় স্বামী বিবেকানন্দ মুগ্ধ হন, এবং সম্ভবত ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী প্রথম মায়াবতীতে যান। অতঃপর আনন্দমোহন বসু, ভগিনী নিবেদিতা, শিল্পী নন্দলাল বসু প্রভৃতি অনেকেই এক সময়ে মায়াবতী আশ্রমে গিয়েছিলেন।

নৈনীতাল এবং আলমোড়া উভয়ে সর্বত্রই প্রায় সংযুক্ত হয়ে রয়েছে এক-একটি সেতুবন্ধে,—কোনটি কোথায় পৃথক এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছি অনেক দূর। সন্ধ্যায় আকাশে কখনও জ্বলে উঠেছে

লক্ষ প্রদীপ, অন্তিম দিনমানকালে শ্বেতচূড়া থেকে গড়িয়ে পড়েছে গৈরিক স্রাব, প্রভাতকালে তাদের ললাট থেকে নেমে এসেছে ভলকে ভলকে শোণিতের প্রবাহ, কিংবা হঠাৎ মধ্যাহ্নে বিগলিত স্বর্ণস্রোত। জেনেছি চোখের ভ্রম, জেনে এসেছি বায়ুস্তরভেদের মায়া,--কিন্তু তারা মনের মধ্যে এনেছে মহিমা, এনেছে সৌরবিশ্বের আহ্বান, এনেছে সৌন্দর্যলোকের অপার আনন্দ। সমস্ত আকাশকে পেয়েছি আলিঙ্গনের মধ্যে, সমগ্র হিমালয়কে পেয়েছি আপন বক্ষে। সৃষ্টির পরমাশ্চর্য রূপ দেখেছি পথে পথে, -জলে, আকাশে, রৌদ্রে, নির্ঝরে, দেওদারের বনে বনে, বায়ুর মধুর স্বননে,—সেই অনন্ত বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে বর্ণের সুষমায়। 'রিচি' গ্রামের সেই সঙ্কটসঙ্কুল অবরোহণ, রামগঙ্গার অদূরে সেই 'ঘাটি' গ্রামের বিহঙ্গকাকলীভরা গ্রাম, তারপর সেই 'টেডমের' পাহাড়-ধসা কার্নিশপথ,—সেই আনন্দ আর আতঙ্কের চেতনা আজও বুকের মধ্যে ধকধক করে। 'সোয়াল' পেরিয়ে গেছি,—যেখানে নামহারা গিরিনির্ঝরিণী বনবালিকার মতো গান গেয়ে চলেছে অতিকায় পাথরের আড়ালে-আবডালে। তারপরে গিয়ে প্রবেশ ক'রছি বিজন গহন 'কুমবিয়াব' অরণ্যে। ওখানে আবার পেরিয়েছি কোশী 'মোহন' সেতুর উপর দিয়ে। একটি পথ আমার অনন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে হারিয়ে গেল 'সাকারে'র পথে, —আমার নিজের পথটি নদীর তীরে তীরে চলে গেল রামনগরের দিকে।

'গরজিধার' গভীর অরণ্যলোকের কথা অনেকেই জানে। শুনলুম কোন না কোনও সময় একটি-দুটি নরখাদক ব্যাঘ্রের ভয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা থাকে নিত্য তটস্থ। বাঘ হোলো শাসনকর্তা, তার একনায়কত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে গ্রামবাসী। বাঘের ভয়ে তারা শিবমন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানায়, এবং তাদের আক্রমণ ঘটলে তারা কপালের লিখন ব'লে বুক চাপড়ায়। ওদেরই গ্রামের ধার দিয়ে চলে যেতে হয়েছে অনেক দূর।

বিরাট পাহাড়ের মেরুদণ্ড নেমে এসেছে কোশীনদীর পথে। সেই পাহাড় বিরাটতর প্রাকার রচনা করেছে একদিকে, অন্যদিকে গত বর্ষায় তার পঞ্জর থেকে নেমে এসেছে লক্ষ লক্ষ টন ওজনের ধস। সেই বিপুল ক্ষয় ও ধ্বংসের মধ্যে যে-বিশালতা দেখা যায় তাতেও বিমূঢ় হ'তে হয়। আবার মনে পড়েছে, এমনি ধস নেমেছিল দার্জিলিং শহরে গত ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বোধ করি জুলাই মাসের বর্ষায়। একটি রাত্রির সেই ইতিহাস অতি ভয়াবহ। সেই ধসগুলির সঙ্গে অনেকগুলি বাড়ীঘর চূর্ণবিচূর্ণ হয় এবং কয়েকটির সমাধিলাভ ঘটে। নরনারী ও শিশু কতগুলির মৃত্যু হয়েছিল তার সঠিক খোঁজ পাওয়া যায়নি। মৃৎপ্রধান পাহাড়ের ঠিক নীচে বসবাস করা অনেক সময় বিপজ্জনক।

অরণ্যসমাকীর্ণ রামনগরের পথে যাচ্ছি। বাঁ দিকে কোশীর জলপ্রবাহের ঠিক মাঝখানে পাওয়া গেল মাটি আর পাথর মেশানো একটি মস্ত,—না মন্দির নয়, কিন্তু তারই মতো একটি আয়তন। ওটা নাকি ভগবতীর 'মন্দির'। ওর মধ্যে আছে উপাট্টাদেবী। ওই আযতনটির ভিতরে রযেছে একটি মস্ত গুহা-- নদীর বুকের উপর। ওই গুহায় অনেককাল ধ'রে থাকতো এক সাধু, নাম— 'বালক-বাবা'। সে ছিল মস্ত তপস্বী। কিন্তু যত বড তপস্বীই হও রক্তমাংসের দেহধারী মানুষকে প্রকৃতির শাসন, জৈবিক তাডনা এবং পার্থিব দাবি মেনে চলতেই হবে। 'বালক-বাবাও' মানুষ। একদা বর্ষারম্ভে এই কোশীতে ছুটে এলো পঁচিশ-ত্রিশ ফুট উঁচু জল। পশুপক্ষী মানুষ গ্রাম ক্ষেত খামার সমস্তই সেই সর্বনাশা জলের প্রবাহে ভেসে যেতে লাগলো। মাঝনদীতে রযে গেল ওই 'ভগবতীর গুহা' এবং ওই 'বালক-বাবা'। ওকে বাঁচাবার জন্ম কারো মাথা ব্যথা ছিল না। জলরাশি এসে গ্রাস করলো ওই ভগবতীগণ্ড, গুহা এবং বালক-বাবা নিশ্চিহ্ন হলো জলের তলায়।

এখানকার লোকে বলে, 'বালক-বাবা' সেই মৃত্যুকে স্বীকার করেনি। যতক্ষণ তার পক্ষে সম্ভব ছিল, উঁচু জাযগায় গলা বাডিয়ে সে প্রবল কণ্ঠে চীৎকার ক'রে বলছে বিশ্বাস করিনে। বিশ্বাসবাদীরা চিরকাল ধ'রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ ক'রে গেছে, তপস্বীর কাছে ধরা দিয়েছেন তিনি চিরকাল। সেসব সম্পূর্ণ মিথ্যে, এ আমি বিশ্বাস করিনে। 'বালক বাবা' চীৎকার ক'রে এই কথা জানাচ্ছিল অবিরত,—বিশ্বাস করিনে।

প্রাণিচিহ্নহীন বিপুল বন্যারাশির মাঝখানে কেবলমাত্র বালক-বাবার নিমজ্জিত দেহের উপর শুধুমাত্র তার মুণ্ডটি জলের উপরে বেরিযেছিল। জল যত উঁচু হয়, মুণ্ডটিও তত উঁচুতে ওঠে। জল উঁচু হ'ল পর্বতপ্রমাণ, মুণ্ডটি ওঠে তারও উপরে। সেই অটল স্থির মুণ্ডটি শেষ পর্যন্তই টিঁকে রইলো।

'বালক-বাবার' মৃত্যু হয়নি। বন্যা চ'লে গেল,—বালক বাবা স্থির হযে দাঁড়িযে। ওটা হোলো ভগবতীর গুহা!

দেখতে দেখতে রামগঙ্গার তীরে এসে গাডী থামলো। সামনেই রামনগর।

॥ ৭ ॥

সন্ন্যাসী বলছেন, জলন্ত ধূপ এক সময় শেষ হয়ে যায়, কিন্তু একটি সুগন্ধ রেখে যায় তার পরিবেশে। গিরিরাজের অপার বিস্ময়ের মাঝখানে তপস্বীরা যেখানে বীজমন্ত্র জপ ক'রে গেছেন সেই 'আসনের' আশে-পাশে এসে দাঁড়াও, তোমারও হৃদয় একটি আশ্চর্য অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হবে।

প্রশ্ন করলুম, সে আচ্ছন্নভাবটি কেমন, মহারাজ?

সন্ন্যাসী হাসলেন।—চুম্বকের আকর্ষণে লৌহচূর্ণ যেমন থরথরিয়ে কাঁপে, তেমনি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে তিব্বত ছিল বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত। যেমন ছিল গান্ধার, যেমন কম্বোজ আর যবদ্বীপ, যেমন সুমাত্রা আর শ্রীলঙ্কা। ওদের কারো নাম ছিল অমরাবতী, কারো বা স্বর্ণদ্বীপ। তিব্বতকে সেই পুরাকালে বলা হোতো কিম্পুরুষখণ্ড, তথা স্বর্গভূমি তথা স্বর্ণভূমি। স্বর্ণভূমি তো বটেই,—তিব্বতে আজও অপরিমেয় সোনা প্রায় সর্বত্র নদী আর পাথরের নীচে পুঞ্জীভূত। কিম্পুরুষখণ্ড নাম হয়েছিল হিমালয়ের জন্যই, কারণ হিমালয়ের অপর একটি পৌরাণিক নাম হোলো কিম্পুরুষপর্বত। প্রতি তুষারচূড়ায় পুরুষোত্তমের নিত্যকালের সিংহাসন পাতা। পুরাকাল থেকে ইতিহাসের কালে দেখি, একে একে ভারতের সীমানা-ভূখণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে ভারতের অবয়ব থেকে, —বনস্পতির থেকে শাখা-প্রশাখা ঝড়ের তাড়নায় যেমন ছিন্ন হয়ে ছুটে যায়। গান্ধার, পামীর, নেপাল, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা, কম্বোজ, সিয়াম, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ,—একে একে সবাই চ'লে গেছে। এই সেদিন গেল শ্রীক্ষেত্র ওরফে ব্রহ্মদেশ,—১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। আর যা গেল সম্প্রতি, তারও ক্ষতস্থান থেকে এখনও রক্ত ঝরছে। সেই হ'ল পাকিস্তান। এমনি করে যুগ যুগান্তর ধ'রে ভারত ছোট হচ্ছে, সীমানা তার সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে। শুধু আনন্দের কথা এই যে—ধর্মবোধে, অধ্যাত্মভাবে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজও তাদের সকলের সঙ্গে ভারতের সমগোত্রীয়তা বর্তমান। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় মনে। তবে কি সনাতন এবং বৈদিক ভারত বৌদ্ধদর্শনকে আজও গ্রহণ করতে পারেনি? তবে কি আর্য দ্রাবিড়ের সঙ্গে মঙ্গোলীয় রক্তের মিল ঘটলো না কোনও কালে? কে কাকে ত্যাগ করলো?

হিমালয়ের উদার প্রশান্তির মধ্যে এর জবাব কোনদিন মেলেনি। সন্ন্যাসী বললেন, হিমালয়ের মতো এতবড় রণক্ষেত্রও পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। কিন্তু সেই রণক্ষেত্র হোলো ধর্মবাদের, দর্শনমতের। সেই রণক্ষেত্রে রক্তপাত

ঘটেনি কখনও, কিন্তু যোগতন্দ্রায় আত্মসমাহিত অনেক তপস্বীর জীবনপাত ঘটে গেছে। সত্যকে যারা অক্লান্তভাবে খুঁজেছে, আলোকের সন্ধানে যারা সর্বত্যাগ ক'রে দুর্গমে আর দারুণের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে,—তাদের চেয়ে রণবীর আর কে আছে সংসারে! তারা নিঃশব্দে জয় করেছে মানুষের শ্রদ্ধা, নিভৃতে নির্ণয় করেছে মানবসভ্যতার নিয়তি। তাদের প্রশ্নোত্তর মীমাংসার পথ ধ'রে ভারত-সংস্কৃতি এগিয়ে গেছে তার জ্ঞানের জগতে। বুদ্ধিকে নির্মল করেছে, সভ্যতাকে সুন্দর করেছে।

তিব্বতের প্রবেশপথ এক হাজার বছরের মধ্যে কোনোদিন সহজ হয়নি। পথ দুঃসাধ্য বলে নয়, কিন্তু কোনো পর্যটক অথবা তীর্থযাত্রী তিব্বতবাসীর নিকট আজ তেমন কাম্য নয়। মৌর্যসাম্রাজ্যকালে সিথিয়ান যুগে, ব্যাক্ট্রিয়ের কালে, হর্ষবর্ধন-সমুদ্রগুপ্ত-স্কন্দগুপ্তের সময়ে—তিব্বত এবং চীনের দ্বার খোলা ছিল। কিন্তু মগধ সাম্রাজ্যের শেষ দশায় মুসলমান আক্রমণের কাল থেকে সেই অবারিত দ্বার বন্ধ হয়েছে। বিস্ময়ের কথা এই, লাসা নগরীর সীমান্তে 'জো-খাং' নামক বিরাট বৌদ্ধমঠে যে পঞ্চধাতুনির্মিত অতিকায় বুদ্ধমূর্তিটি পবিত্রতম ব'লে পূজিত হয় সেই মূর্তিটি ভারতের। কথিত আছে, গৌতম বুদ্ধের জীবনকালেই মগধে এই মূর্তিটি নির্মাণ করা হয়েছিল, এবং মুসলমান আক্রমণকালে চীনসম্রাট মগধের রাজাকে সাহায্য করেছিলেন, এবং সেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই মূর্তিটি চীনসম্রাটকে উপহার দেওয়া হয়। অতঃপর চীনসম্রাটের কন্যার সহিত যখন তিব্বতরাজের বিবাহ হয়, সেই সময় বধূবেশিনী সম্রাটদুহিতা এই মূর্তিটি তিব্বতে আনেন। তিব্বতের সেই রাজা এক বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে এই মূর্তিটি স্থাপিত করেন।

বুঝতে পারা যায়, ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে মুসলমান আমলে। ভারতের বৃহত্তর সমতল ক্ষেত্রে পাঠান-মোগল-পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-ফরাসী-ইংরেজ—এরা জায়গা পেয়ে প্রভুত্ব লাভ করেছিল,—কিন্তু এদের থেকে গোঁড়া বৌদ্ধ-তিব্বত একান্তে সরে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারা এতকাল ধ'রে ভূত-প্রেত-পিশাচ-রাক্ষসের সঙ্গে পর্যটককেও সরিয়ে রেখেছে যুগের পর যুগ। তিব্বত হয়ে গেল নিষিদ্ধ।

ওরা নাকি পৃথিবীর একমাত্র 'ব্রাহ্মণ' সম্প্রদায়। ওদের দেশব্যাপী গ্রন্থ ভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ পুঁথি আর ধর্মগ্রন্থ। ওরা জানে পৃথিবীর অন্তিম পরিণাম, সভ্যতার আদিঅন্ত ইতিহাস। হিমালয়ের ওপারে ওরা দাঁড়িয়ে আছে

ষোল হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে,—ওরা হোলো পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়। একটির পর একটি সভ্যতা এসে চ'লে গেছে, হাজার হাজার বছরে শত শত রাজ্যের অভ্যুত্থান এবং অবসান ঘটেছে,—ওরা ভ্রূক্ষেপ করেনি। চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান, কাশ্মীর, নেপাল, রুশিয়া, তুর্কিস্থান,—এদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে ঝড় আর বিপ্লব, অরাজকতা আর প্রলয়,—কিন্তু তিব্বত তাদের গ্রাহ্য করেনি। ওরা চিরকাল পুঁথি পড়েছে আর মন্ত্র জপেছে, 'মণিচক্র' ঘুরিয়েছে আর প্রেত-পিশাচ তাড়িয়েছে। মানুষের চেয়ে মন্ত্র ওদের কাছে অনেক বড়। ওরা মন্ত্র পড়তে-পড়তে মানুষের মৃতদেহকে তরবারির দ্বারা টুকরো-টুকরো ক'রে কাটে, এবং শৃগাল-শকুনি আর কুকুর যখন সেগুলি ভোজন করে—ওরা তখনও মন্ত্রপাঠ করতে থাকে। চীন ওদের উপর গায়ের জোরে প্রভুত্ব করতে চেয়েছে, ওদের ঘরে ঢুকে তম্বি করেছে, তাই ওদের সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রীয় মন-কষাকষি চিরদিনের। ওরা যে কেবল স্বাধীন থাকতে চায় তা নয়, ওরা পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতে চায়। বৌদ্ধভিক্ষু ছাড়া কেউ না ঢোকে ওদের সমাজে, সাহেব না ঢোকে, মুসলমান ছোঁওয়া হিন্দু না ঢোকে, বিজ্ঞান না ঢোকে, আধুনিক সভ্যতার হাওয়া না ঢোকে। দু'চারজন ব্যতিক্রম ছাড়া তিব্বতের ঘৃণা বয়ে বেড়ালো প্রায় সবাই চিরকাল

তিব্বতের বিরাট মালভূমির উপরে যেমন শত শত তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়া, তেমনি সংখ্যাতীত লবণহ্রদ। লক্ষ লক্ষ বর্গমাইলের মধ্যে মানুষ কিছু কিছু আছে, কিন্তু গাছপালা নেই বললেই ভালো হয়। ভারতের তুলনায় তিব্বত হোলো প্রায় জনশূন্য। প্রতি বর্গমাইলের হিসাবে মাত্র সাতজনের বেশি মানুষ নেই। খাদ্য খুঁজে পাওয়া যায় না,—ক্ষুধার্ত তিব্বত। পূব তিব্বতে বাঁচবার পথ আছে, যেখানে ব্রহ্মপুত্র সৃজন করেছে অরণ্য শস্যক্ষেত্র আর নিম্নভূমি। বালুপাথরে, কাঁকরে, লবণে, সোডায় এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থে তিব্বত পরিপূর্ণ,—কিন্তু স্নেহ নেই কোথাও, কুঞ্জ-কাননের মায়া নেই, তমাল-তালী-বনরাজিনীলার ছায়া নেই। আছে আত্মনিগ্রহী অন্ধকারাচ্ছন্ন ধর্ম, এবং অন্ধ আচার অনুষ্ঠানের কঠোরতা। পূর্ব তিব্বতে প্রকৃতির সঙ্গে ওদের স্বভাব কতকটা কোমল হয়ে এসেছে,—তাই রাজধানীও গ'ড়ে উঠেছে 'কাইচু' নদীর উত্তরে লাসায়। সেখানকার পোটোলা প্রাসাদে থাকেন সর্বাধিনায়ক দালাই লামা।

'মনিচক্র' ঘুরেছে লামাদের হাতে-হাতে যুগের পর যুগ,—আজও ঘুরছে কিন্তু কালের চাকা কিংবা গাড়ীর চাকা কখনও ঘোরেনি তিব্বতে। আজ

সভ্যতার ধাক্কা আসছে গণতন্ত্রী চীন থেকে। তারা গাড়ী চালাতে চায় তিব্বতে, তারা আলো ফেলতে চায় অন্ধকারে, ধর্মের উপরে মানবতার দাবিকে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই দাবি স্বীকার করবার জন্য তারা সৈন্যসামন্ত এনে ফেলেছে এই দুস্তর ভূখণ্ডে। এবার হয়তো কলের এবং কালের চাকা ঘুরবে।

মধ্যতিব্বত সম্বন্ধে কিছু জানবার চেষ্টা বৃথা। সেখানে আছে নুন, দামি পাথর, ভূগর্ভের স্বর্ণভাণ্ডার, আর জনবসতির এখানে ওখানে আদিমকালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন গুম্ফা। প্রচণ্ড হাওয়ায়, তুহিনের ঝাপটায়, প্রখর সূর্যে, নির্মল জ্যোৎস্নায়, ক্ষণমর্জি প্রাকৃতিক চটুলতায়, আকাশের অত্যুগ্র নীলিমায়, তিব্বত অপার্থিব রহস্যে আচ্ছন্ন। উত্তরে তার আদিঅন্তহীন 'তাকলামাকান' আর 'গোবি' মরুভূমি, দক্ষিণে হিমালয়ের সংখ্যাতীত তুষার চূড়া,—ধবলগিরি, মুক্তিনাথ, মানসলু, গোঁসাইথান, গৌরীশঙ্কর, এভারেস্ট, মাকলু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাঞ্চনঝাউ, পাউহুন্‌রি, চমলহরি, এমনি আরো অনেক। এই চূড়া থেকে বেরিয়ে গেছে অনেক নদী,—এরা তিব্বতের দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রকে বলশালী ক'রে তুলেছে। পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম তিব্বতকে ভারতের সঙ্গে পৃথক ক'রে রেখেছে কারাকোরাম, লাদাখ, জাস্কার এবং কৈলাস পর্বতমালা। কৈলাসপর্বতশ্রেণী নেপালসীমানা অবধি চ'লে এসেছে।

তেরোশো বছর আগে তিব্বতের রাজদূত আসেন ভারতে, এবং ভারতের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের নিকট উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। সেই কালে মগধে এবং বাংলাদেশে যে 'নাগরী' বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, সেই বর্ণমালা তিনি নিয়ে যান তিব্বতে। সংরক্ষণশীল তিব্বতে সেই বর্ণমালা আজও প্রচলিত রয়েছে, কেবল একটু আধটু চেহারা অদলবদল হয়েছে মাত্র। কিন্তু সম্পর্কটা ওখানেই থেমে যায়নি। বাঙলার সঙ্গে তিব্বতের নাড়ির যোগ সেই কাল থেকেই চ'লে এসেছে। এর পরে যশোরের রাজপুত্র সর্বত্যাগী 'শান্তরক্ষিত' বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ ক'রে তিব্বতে যান, এবং তৎকালীন নরপতি তাঁকে প্রথম তিব্বতীমঠের মোহন্তপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই গৌরব আজও আছে তিব্বতে। অদ্যাবধি তিব্বতীরা শান্তরক্ষিতকে আচার্য বোধিসত্ত্ব-মহাগুরু আখ্যা দিয়ে গৌতমবুদ্ধের মতোই তাঁকে পূজা করে। অতঃপর বাংলাদেশ থেকে কয়েকজন বৌদ্ধপণ্ডিতও যান তিব্বতে। তাঁরা গিয়ে যে কেবল ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাই নয়,—বৌদ্ধধর্মগ্রন্থগুলিকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদও করেছিলেন। রাজশক্তির আনুকূল্য ছিল ব'লেই সেকালে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল। হিন্দুদর্শনের একটি বিশেষ ব্যাখ্যাই যে বৌদ্ধদর্শন—এ কথা আজ

আমরা ভুলতে বসেছি। গৌতমবুদ্ধ তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যুকাল অবধি হিন্দু ছিলেন, এই সত্যও মনে রাখিনে।

এর পরে যে মহাপুরুষের কথা ওঠে, তিনিও বাঙালী। তাঁর বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে,—তিনি ঢাকার অন্তর্গত বজ্রযোগিনীর লোক। তাঁর নাম অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। আচার্য শঙ্করের প্রতিভায় একদা সমগ্র ভারত যেমন মুগ্ধ হয়েছিল, দীপঙ্করও তেমনি ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণকে তৎকালে অভিভূত ও মুগ্ধ করেছিলেন। বহু দেশ ও বিদেশে তিনি ভ্রমণ করেন, এবং তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় ভারতবর্ষে তৎকালে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। তাঁর বয়স যখন ষাট তখন তিব্বতের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে যান এবং বৌদ্ধদর্শনের অভিনব ব্যাখ্যা ক'রে সমগ্র তিব্বতের হৃদয় জয় করেন। তিনি বিশুদ্ধ 'মহাযান' মতবাদ প্রচার করেছিলেন এবং তিব্বতকে বহু কুসংস্কার এবং তান্ত্রিক পন্থা থেকে সরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। দীপঙ্কর সেখানে 'কদম্পা' নামক একটি নতুন লামা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন, সেই সম্প্রদায়টি অদ্যাবধি তিব্বতে সর্বপ্রধান। দীপঙ্কর তেরো বৎসরকাল তিব্বতে বসবাস করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এখনও তিনি সেখানে একান্তভাবে শ্রদ্ধেয় এবং পূজ্য। বুদ্ধের পরেই তিনি বোধিসত্ব স্বরূপ। তিব্বতীরা তাঁর মূর্তি পূজা করেন। যেখানে তার মৃত্যু হয়, সেখানে আজও রয়েছে তাঁর সমাধিমন্দির। ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দীপঙ্কর দেহত্যাগ করেন।

ভারতের সঙ্গে তিব্বতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বোধ করি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানেই শেষ হয়। এর পরে ইতিহাস অনেকটা যেন হারিয়ে গেছে। ভারতের হাত থেকে ওরা পেয়েছে ভাষা, শাস্ত্র, ধর্মদর্শন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। কিন্তু উভয়ের সম্পর্কের মধ্যাকার যেটি প্রাণধারা, সেটি পাঠান আমল থেকেই শুকোতে থাকে। যারা মুসলমান ও তাতারের আমলে সমতল ভূভাগ ছেড়ে হিমালয়ের নানা অঞ্চলে গিয়ে বাসা বেঁধেছিল, তাদের সঙ্গে তিব্বতীদের কিছু কিছু যোগাযোগ থেকে গেছে অনেককাল ধ'রে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক-ভাবে ভারতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি ব'লেই তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রাজশক্তির সহায়তার অভাব এবং ভারতে বিধর্মীর প্রভুত্ব—তিব্বতকে হারানোর মূলে এই কারণ দুটি প্রধান। যারা দূরে স'রে গেল, তারা অদৃশ্যলোকেই মিলিয়ে রইলো। তিব্বতের সঙ্গে আত্মীয়তা ঘুচে গেল।

প্রায় দেড়শো বছর আগে একজন মাত্র ইংরেজ তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তাঁর নাম টমাস ম্যানিং। অতি অল্প

কালের জন্য তিনি লাসায় থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কোনও বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তাঁর যাবার তেত্রিশ বছর পরে দুজন ফরাসী মিশনারী লাসায় স্বল্পকালের জন্য পরিভ্রমণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁদের ভ্রমণের বিবরণ কিছুকাল আগে পাওয়া গেছে। আত্মাভিমানী ইংরেজের মনে এই বিক্ষোভ বহুদিন অবধি ধূমায়িত হতে থাকে। এদিকে ভারতের উপরে ইংরেজের প্রভুত্ব তিব্বতের চক্ষুশূল ছিল, এবং যাদের সাহায্যে ইংরেজ ভারতসাম্রাজ্যে শাসন-ব্যবস্থা চালাচ্ছিল,—সেইসব ভারতীয়দের প্রতিও তিব্বতের প্রবল বিরাগ ছিল। কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে ভারতের এমন কোনও যোগাযোগ ছিল না, যার জন্য ব্রিটিশ ভারত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ বোঝাপড়া চলতে পারে। এ ছাড়া আরেকটি কারণ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে গোর্খারা তিব্বত আক্রমণ করে এবং গোর্খাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ভারতের ইংরেজ সৈন্যরা। গোর্খারা তিব্বতীদের নিকট পরাজিত হয়। পুনরায় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল এবং তিব্বতের মধ্যে লড়াই বাধে, এবং বহুলোকের ধারণা এর মধ্যে ইংরেজের উস্কানি ছিল। নেপাল পরাজিত হয়, এবং নিয়মিত 'ক্ষতিপূরণ' অর্থাৎ নমস্কারী পাঠাতে স্বীকার পায়। এর পর অপমানিত ইংরেজ দীর্ঘকাল চুপ ক'রে থাকে। কিন্তু ভিতরে জ্বালা করে তা'র মন।

শোনা যায় উনিশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন তিব্বতের দিকে অভিযান করেছিলেন, কিন্তু তার সঠিক বিবরণ আমার জানা নেই। সুদীর্ঘকাল পরে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং স্কুলের এক অসমসাহসিক শিক্ষক ৺শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁর এক 'লামা বন্ধুর' সহায়তায় তিব্বত প্রবেশের অধিকার পান। শরৎচন্দ্রের এই অভিযানের পিছনে ভারত গবর্নমেণ্টের সহায়তা ছিল। তিনি তাঁর অভিযানপথের পরিমাপ করবেন এবং খোঁজখবর আনবেন—এই ছিল শর্ত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও দুজন,—নয়ন সিং ও কিষণ সিং। আর্কিবাল্ড উইলিয়মস্ বলেছেন,—"These men were the emissaries of the Indian Government, their duty being to survey with all possible accuracy such parts of Tibet as they should traverse. The most extensive results came from expeditions of Kischen Singh...who in four years crossed Tibet from North to South, and from East to West...and managed to draw out a detailed plan of Lhasa. His survey is considered to be very accurate."

বলা বাহুল্য এঁরা সকলেই ছদ্মবেশে এবং অতি সাবধানে তিব্বত ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র এনেছিলেন তিব্বতের প্রকৃত পরিচয়। তিনি ছয়মাসকাল তিব্বতের অন্তর্গত 'তাসিলানপোতে' সংস্কৃত ও তিব্বতী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা অঞ্চলের অতি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ ক'রে আনেন। তাঁর সঙ্গে পানচেন্ রিন্‌পোচের প্রধান লামা পুরোহিতের ঘনিষ্ঠতা হয় এবং পুনরায় আমন্ত্রিত হয়ে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বরে তিনি আবার তিব্বতে যান। এবার তিনি বরাবর লাসায় উপস্থিত হন। শুধু লাসা নয়,—প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ তিনি বিভিন্ন তিব্বতীয় শহরে ভ্রমণ ক'রে প্রকৃত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিব্বতের কর্তৃপক্ষ ঘুণাক্ষরেও তাঁর মূল উদ্দেশ্য একটুও জানতে পারেননি। রাজনীতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, আধ্যাত্মিক এবং কূটনীতিক,—সর্বপ্রকার তথ্য এবার তিনি তাঁর ঝুলিতে ভ'রে এনেছিলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁকে এক বিশেষ উচ্চ উপাধিদ্বারা সম্মানিত করেন, এবং 'রয়াল জিয়োগ্রাফিকাল সোসাইটির' নিকট থেকে তিনি অর্থসাহায্যও পান। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনকালে,—'তাসিলানপো' থেকে ভারত প্রবেশের পথে,—সহসা লাসা কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁরা 'পানচেন্ রিনপোচের' প্রধান লামাপুরোহিত সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'সিনচেন্-লামাকে' গ্রেপ্তার করার জন্য পরোয়ানা পাঠান। এই কাহিনীটি নিয়ে আমি অন্যত্র কিছু কিছু আলোচনা করেছি, তবু এখানে সংক্ষেপে সেটুকু বললে বেমানান হবে না। 'সিনচেন্‌লামাকে' গ্রেপ্তার ক'রে তুষারগুহায় রাখা হয়েছিল। অতঃপর চাবুক মারতে মারতে তাঁকে মৃত্যুমুখে আনা হয়,—এবং তাঁর অন্তিমকালে তাঁর হাত দুখানা পিঠের দিকে বেঁধে ব্রহ্মপুত্রের তুষারগলা জলে নিক্ষেপ করা হয়। সিন্‌চেনের যে কয়জন ভৃত্য ছিল, তাদের শাস্তি আরও বীভৎস। প্রত্যেকের হাত এবং পা একটি-একটি ক'রে কেটে নিয়েও কর্তৃপক্ষ বোধহয় খুশী হননি, অধিকন্তু তাদের প্রত্যেকের চক্ষুও উপড়ে ফেলা হয়েছিল।—এখানে ব'লে রাখা দরকার, শরৎচন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'সিন্‌চেনও' জানতেন না। শুধু এরা নয়, আরও অনেকে শরৎচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য এইভাবে কঠোর শাস্তিলাভ করেছিল। তারা কেউ বাঁচেনি। এই সমস্ত ঘটনাগুলি নিয়ে পরবর্তীকালে দাস মহাশয় একখানি গ্রন্থ রচনা ক'রে যান—**"Narrative of a journey to Lhasa."**

এই ঘটনার পনেরো বছর পরে স্থইডেনের জগৎপ্রসিদ্ধ অভিযানকারী ডাঃ সোয়েন হেডিন্ মধ্যএশিয়ার 'তাক্‌লা মাকান' মরুভূমি পেরিয়ে তিব্বতে

ঢোকেন এবং লাসার দিকে অভিযান করেন। কিন্তু তৎকালীন দালাই লামার আদেশে তাঁকে লাসার নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে সদলবলে বিতাড়িত করা হয়। হেডিন সাহেব লাদাখ এবং কাশ্মীর হয়ে ভারতে আসেন (১৮৯৯ খ্রীঃ) এবং লর্ড কার্জনের আমন্ত্রণে তিনি কলকাতায় অল্পকালের জন্য পদার্পণ করেন। তাঁকে বহু সম্মানে ভূষিত করা হয়। অতঃপর হেডিন সাহেব বছর দশেকের মধ্যে হয়তো লাসায় গিয়ে উপস্থিত হ'তে পেরেছিলেন। কিন্তু ততদিনে তিব্বত ব্রিটিশ ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট বশ্যতাস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। অতএব হেডিনের সেই অভিযানের আলোচনা এখানে আর ওঠে না।

তিব্বত এককালে নামমাত্র চীনের অধীন ছিল। শুধু আজ নয়, চীনের নিকট কোনওদিন তিব্বত বশ্যতা স্বীকার করেনি। চীন একথা জানতো,—কিন্তু আপন অধিকারটুকু অব্যাহত রাখার জন্য তিব্বতের প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাকে বহুকাল অবধি হিংসার আশ্রয়ই নিতে হয়েছে। চীনবিরোধী তিব্বত পাছে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রিক ও সামরিক সংযোগ স্থাপন করে, সেই কারণে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন সামরিক বিভাগ তিব্বতকে একপ্রকার অবরোধ করে। এর কারণ ছিল। কম্যুনিস্ট চীন নেহরু-গভর্নমেণ্টকে প্রথম দিকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেনি। পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল, চীন-ভারত চুক্তি সম্পাদন করে নেহরু গভর্নমেণ্ট তিব্বত-অঞ্চলকে চীনদেশের অন্তর্গত—(Tibet region of China) ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন, সেইদিন থেকেই চীনের ভারত-প্রীতি বেড়ে উঠলো। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পরে চীন পুনরায় তিব্বতের উপর তার দখল ফিরে পেলো।

আগেকার আলোচনাটুকু শেষ করি। স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাশের তিব্বত সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণগুলি তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের অধিনায়ক লর্ড কার্জন কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁরই হাত থেকে পরোয়ানা নিয়ে সেনাপতি মিঃ ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র বর্ণিত পথঘাট দিয়েই তিব্বত অভিযান করেন, এবং তিব্বত তাঁর যথাসম্ভব 'মৃদু আক্রমণের' নিকট পরাভূত হয়। সম্ভবত এই সাফল্যের জন্যই মিঃ ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড পরবর্তীকালে 'নাইট' উপাধি লাভ করেছিলেন।

ব্রহ্মপুত্রের উপনদী কাইচুর তীর ধ'রে উত্তরে গেলে নদীর পরপারে লাসা। লাসা নিজেই প্রধান তীর্থ। বস্তুত তীর্থকেন্দ্রিক ব'লেই লাসার এত প্রাধান্য। এই রাজধানী একটি উপত্যকার ওপর দাঁড়িয়ে, এবং এরই মাঝখানে পাহাড়ের চূড়ায় দুর্গপ্রাকারের মতো 'পোটালা' প্রাসাদটি প্রতিষ্ঠিত। রাজপ্রাসাদ বলে

যে সকলে এটিকে সম্মান করে তা নয়, এটি তিব্বতের প্রধান ধর্মগুরুর বাসস্থান,—যাঁর নাম দালাই লামা। 'দালাই' শব্দটি মোগল শব্দ,—উৎপত্তি বোধ করি মঙ্গলীয়। এর অর্থ হোলো যিনি সর্বোচ্চ, সর্বপ্রধান। যেমন হলেন রোমের পোপ, যেমন জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ড মুফতি, ভারতের শঙ্করাচার্য, ইত্যাদি। কিন্তু এঁদের বাইরে রাষ্ট্র আছে,—তিব্বতে দালাই লামাকে বাদ দিয়ে সেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ কোনটাই লোকস্বীকৃত নয়। এককালে পাশ্চাত্ত্য দেশ এবং প্রাচ্যের বহু অঞ্চল এই রীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোতো। বিলাতে এটি আজও চালু আছে। ধর্মমন্দিরের পুরোহিত সম্মতিদান করেননি ব'লে অষ্টম এডোয়ার্ডকে সিংহাসন ত্যাগ ক'রে তবে স্বামীপরিত্যক্তা মার্কিন নারীকে বিবাহ করতে হয়েছিল, গির্জার সম্মতি না থাকার জন্য এই সেদিন রাজকুমারী মার্গারেটকে প্রণয় বিবাহ নাকচ করতে হলো। ধর্মদর্শনের আদিভূমি ভারতে কিন্তু এই মধ্যযুগীয় অন্ধতা নেই। ভারতের সনাতনী যুগেও মানুষের আত্মিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল স্বচ্ছন্দ। আজ থেকে একুশশো বছর আগে তক্ষশীলায় গ্রীক রাজত্ব ছিল। সেই রাজ্যের কুমার হেলিয়োডোরাস মালোয়ারাজ্যে আসেন হস্তীসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সেদিন ছিল মালোয়ায় বসন্তোৎসব। রাজকন্যা মাধবিকা সখীদল সহকারে ঝুলনের দোলনায় দুলছিলেন। তরুণ সুদর্শন হেলিওডোরাস মাধবিকাকে দর্শন করে মুগ্ধ হন এবং রাজকুমারকে দেখে মাধবিকাও অনুরাগে অভিভূত হন। অতঃপর নানা নাটকীয় ঘটনার ভিতর দিয়ে উভয়েরই বৈবাহিক মিলন ঘটেছিল। মধ্যভারতে গোয়ালিয়রের অন্তর্গত বিদিশায় দুহাজার বছরেরও আগে কুমার হেলিয়ো-ডোরাসের স্মরণে নির্মিত 'গরুড়স্তম্ভ'টি আজও তার সাক্ষ্যপ্রমাণাদি বহন করে।

একশো বছর ধ'রে গির্জাতন্ত্রী ইংরেজ সমস্ত পৃথিবীতে রটনা করেছিল, ভারতবর্ষ হোলো যোগী-ফকির, মারণ উচাটন, যাদু ভোজবাজি, বাঘ ভাল্লুক সাপ কুমীর আর কিম্ভূতকিমাকার রাজা রাজড়ার দেশ। এখানে সতীমেয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়, কাঁটার ওপর ঝাঁপ দেন ন্যাংটা সন্ন্যাসী, লতাপাতার সঙ্গে গোবর খায় দেশের লোক, সাপ নিয়ে খেলা করে সাপুড়ে, এবং নাগা ফকিররা শিরাসন ক'রে ক'রে ঠ্যাং দুখানা শূন্যে তুলে রাখে। কিন্তু এই কথাটা কোথাও তারা বলেননি—উল্কির ছাপ সর্বাঙ্গে মুদ্রিত করে ইংরেজ নরনারী অর্ধনগ্ন চেহারায় নর্মাণ্ডির তীরে তীরে নৌকো নিয়ে যখন 'বোম্বেটে' হয়ে ঘুরে বেড়াতো ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তখন জগতের শীর্ষস্থানীয়। মানবাত্মার অবারিত মুক্তিসাধনায় আজকের মতো সেদিনও ভারতবর্ষ সর্বাগ্রগণ্য।

প্রাচীন ভারতকে নিয়ে জাবর কাটতে বসিনি, কিন্তু এ কথাগুলি মাঝে মাঝে মনে করা ভালো।

তিব্বতের কথায় ফিরে আসি। শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় পাই, একটি বৌদ্ধমঠ মানে একটি ছোটখাটো লামা-নিয়ন্ত্রিত শহর। সেই শহরে যেন ভূত প্রেত পিশাচ না ঢোকে—এই চেষ্টা প্রধান। সোয়েন হেডিনকে তিব্বত থেকে তাড়াবার সময় এক প্রধান লামা বলেছিলেন, আমরা সভ্য হতে চাইনে, কারণ 'সভ্য' জগৎকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারিনে। আমাদের ধ্যানধারণা জপতপ বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে আমরা সকলের থেকে তফাতে থাকতে চাই, আমরা কারো সঙ্গে মেলা মেশা করতে চাইনে। দয়া করে একা থাকতে দাও।

শরৎচন্দ্রের বর্ণনা অনুসারে কয়েকটি কথার এখানে পুনরুক্তি করি। "তিব্বতের পথেঘাটে নগরে মঠে ও জনপদে প্রসন্ন বুদ্ধমূর্তি শত সহস্র। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সমগ্র জীবন বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত। দেবাসুরের সংগ্রামে দৈবশক্তির জয়, এই হোলো সাধনা। এই সাধনার জন্য তুহিন ঠাণ্ডা গুহাগহ্বরের অন্ধকারে সংখ্যাতীত ভিক্ষু লুকায়িত।"

'জো খাং' নামক প্রধান মন্দিরের কথায় শরৎচন্দ্র বলেছেন, দেড় হাজার বছর হ'তে চললো মন্দির। পুরাতন কাঠের মোহাচ্ছন্নকর প্রাচীন পৌরাণিক গন্ধ তার ভিতরে। অন্ধকার দেওয়ালগুলি অদ্ভুতভাবে চিত্রাঙ্কিত। পূজার স্বর্ণপাত্রগুলি দপদপ করছে ঘৃতপ্রদীপের ধূমেল শিখার আভায়।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে একদা কোনও এক অপরাহ্নে ইয়ংহাজব্যাণ্ড এই মন্দিরে প্রবেশ ক'রে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ান। এখানে বলে রাখি, ইয়ংহাজব্যাণ্ড যদিও সমরঅধিনায়ক ছিলেন--তিনি ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং একজন বিশিষ্ট অধ্যাত্মবাদী। আধুনিক কালের যোগীশ্রেষ্ঠ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরীতে তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ রক্ষা করে যোগনিমীলিত হন, সেই সংবাদের পর স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড বিলাতে শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতিসমিতির সক্রিয় সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্যর ফ্রান্সিস মাত্র কিছুকাল আগে বৃদ্ধবয়সে পরলোক গমন করেন।

স্যর ফ্রান্সিস তাঁর গ্রন্থে মুগ্ধকণ্ঠে বলছেন, এই মন্দিরে অধ্যাত্মবাদী তিব্বতের অন্তরাত্মার প্রকৃত স্বরূপ দেদীপ্যমান। মন্দিরের সুবিশাল প্রাঙ্গন অতিক্রম ক'রে আমি উদার উদাত্ত গম্ভীর ডম্বরুর গুরুদরুধ্বনি শুনলাম,—তারই সঙ্গে পূজারীগণের করুণ মধুর এবং ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ এবং পার্বত্য

উপত্যকার অসীম বিস্তারলোকে দূরদূরান্তরের শঙ্খঘণ্টারব। দেখলাম ভক্তিনম্র অনুরাগের ভাবাবিষ্ট বিহ্বলতা। সহসা আমারও সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করলাম, এই অপরূপ দৈবপ্রেরণার উৎস। তিব্বতের অন্তর্নিহিত দৈবসত্তাকে আবিষ্কার করলাম এই পরম বিস্ময়কর জরাব্যাধিবিকারবিহীন 'জোখা' মন্দিরে।

দেখে নিতুম সে কেমন দেশ, যেখানে মানুষ কোথাও স্বীকৃত নয়। দু একজন ভিন্ন এমন কোনও মানুষ তিব্বতে শ্রদ্ধালাভ করেনি, যে ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্মগত নয়। বুকের শিরা ছিন্ন করে একবার দেখে নিতুম সেই দেশকে যেখানে মানুষ অবিশ্রান্ত কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে বুদ্ধভগবানকে,—কিন্তু সাধারণ মানুষের নারায়ণ যেখানে শ্রদ্ধালাভ করছে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না সে 'লামা' হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, অস্থির ক্ষুধায় তিব্বতকে দেখতে চেয়েছি অনেকবার। মানাব গিরিসঙ্কটে, কুলুতে, কিন্নরে, জোজিলায়,—কতবার ঘাড় উঁচু করে তাকে দেখবার চেষ্টা করেছি। সিকিমে, ভুটানে, কুমায়ুনে,—তিব্বতের গন্ধ পেয়েছি অজস্র। দেখতে পেয়েছি কেমন সেই আশ্চর্য জগৎ—যেখানে পিশাচলোকের প্রতীকও পূজ্য,—কিন্তু গণদেবতা আরাধ্য নয়।

মনে পড়ে গেল একশো বছরেরও আগের থেকে একালের কথা,—১৮৪০ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ। মহারাজা গুলাব সিংহের প্রধান সেনাপতি আক্রমণ করেছিলেন পশ্চিম তিব্বত। সে আক্রমণ নৃশংস—তার মধ্যে দয়া ছিল না। তিনি মঠ গুম্ফা মন্দির জনপদ—কোনও কিছুকে ক্ষমা করেননি। তিনি বীর কিনা জানিনে, কিন্তু তিনি ইতিহাসপ্রখ্যাত জোরোয়ার সিং। ধ্বংসের পর ধ্বংস,—ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল পশ্চিম তিব্বতের বহু অঞ্চল। সেটি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ। জোরোয়ারের নির্মম হাতের মার খেয়ে তিব্বতের হাড় গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর সেই সাংঘাতিক আক্রমণের ফলে পশ্চিম তিব্বত ওরফে 'লাদাখ' এলো ভারতের মধ্যে। কিন্তু জোরোয়ারের উপরে ভাগ্যের বিদ্রূপ সঞ্চিত ছিল। পরের বছরে বিজয়ী জোরোয়ার সৈন্যসামন্তসহ 'তীর্থপুরী' থেকে গিয়েছিলেন 'তাকলাকোটে'। সেখানে তাঁর ক্যাপ্টেনের জিম্মায় সৈন্যদলকে রেখে জনকয়েক অনুচরসহ তিনি তাঁর স্ত্রীকে রাখতে গেলেন 'গারটকে'। ফিরবার পথে বিরাট চীনা সৈন্যদল তিব্বতীয়দের সহযোগে জোরোয়ারকে পথিমধ্যে আক্রমণ করে। জোরোয়ারের অতিমানবিক

শক্তি ও যুদ্ধপ্রতিভা দেখে সবাই ছিল হতবাক, এবং তিব্বতীদের ধারণা —জোরোয়ার একজন তান্ত্রিক জাদুকর,—পিশাচসিদ্ধ! ওরা সেই পথের উপরেই জোরোয়ারকে গুলীবিদ্ধ ক'রে মারে। সে-গুলীটি সিসার নয়, সেটি স্বর্ণমণ্ডিত। ওরা জোরোয়ারকে টুকরো টুকরো ক'রে কাটে এবং তাঁর শরীরের এক একটি মাংসখণ্ড নিয়ে তাঁরই স্মৃতিফলক ও সমাধিমন্দির নির্মাণ করে। আজও শিম্বিলিং ও শাক্যগুম্ফায় জোরোয়ারের দেহের একটি বিশেষ টুকরো এবং একখানা কাটা হাত সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত অস্ত্র আজও লোকে প্রদর্শনীতে দেখে। জোরোয়ার 'অসুর' ব'লেই তিব্বতে অভিখ্যাত। আমি নিজে জোরোয়ার সিংহের একটি সমাধি ফলক দেখে এসেছি তাকলাকোট পেরিয়ে 'তোয়ো' নামক অঞ্চলে।

এই ঘটনার তেষট্টি বছর পরে কর্নেল ইয়ংহাজব্যাণ্ড পূর্ব তিব্বত আক্রমণ করেন—একটু আগে যেকথা বলেছি। সেই আক্রমণের ফলে হাজার হাজার তিব্বতীর মৃত্যু ঘটে, এবং দালাই লামা 'পোটলা' প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যান। অতঃপর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, এবং ইংরেজ তিব্বতের উপর চীনের 'দখল' (Sezerainty) সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে। পঁয়তাল্লিশ বছর এইভাবে কাটে, ইংরেজ ভারত ছেড়ে যায় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। চীন পুনরায় এসে তিব্বতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং ইংরেজ সম্পাদিত সবপ্রকার চুক্তি নাকচ ক'রে নেহেরু গভর্মেণ্ট ইয়াংটুং, গেধানৎসী ও গারটকের ভারতীয় বাণিজ্যসংস্থাগুলি সহ সৈন্যরক্ষা ব্যবস্থাও প্রত্যাহার ক'রে নেন।

কয়েক বছর আগেকার আরেকটি গল্প বলি। সেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল—১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ। রাশিয়ার অন্তর্গত 'কারগিজ কাজাক' থেকে তিন হাজার মুসলমান যাযাবর চৈনিক তুর্কীস্থানের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে সমগ্র পশ্চিম তিব্বত আক্রমণ করে। মানস সরোবর অঞ্চলের আটটি প্রসিদ্ধ মঠ তাদের হাতে লুণ্ঠিত হয় এবং তীর্থপুরী গুম্ফা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, ভারতীয় অন্ধ্রপ্রদেশী সন্ন্যাসী প্রণবানন্দ সেই সময়ে উক্ত অঞ্চলে ছিলেন। সকল ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। দেশব্যাপী লুটতরাজের পরে দস্যুদল যখন লাদাখে পৌছয় তখন তাদের দখলে রয়েছে "এক লক্ষেরও বেশী ভেড়া ও ছাগল, চার হাজার ঝব্বু, দু হাজার ঘোড়া ও অশ্বতর, পাঁচ শত রাইফেল ও বন্দুক, হাজার হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত বিগ্রহ, অলঙ্কারাদি, মনিরত্নাদি এবং সোনা রূপা ও রৌপ্যমুদ্রা। তারা লাদাখের সীমানায় এসে পৌছলে কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট তাদের নিরস্ত্র ক'রে ভারত প্রবেশে অনুমতি দেন। তৎকালে ব্রিটিশ রুশ মৈত্রীচুক্তি বলবৎ থাকায় ব্রিটিশ ভারত গভর্নমেণ্ট

সীমান্তের 'হাজারা' জেলায় তাদের বসবাসের জন্য নির্দেশ করেন, এমন কি তাদের জন্য খরচপত্রেরও দায়িত্ব নেন। কিন্তু তৎকালে দুটি 'ঘরের শত্রু' ছিল ভারতে—তারা হায়দারাবাদের নিজাম ও ভূপালের নবাব। তাঁরা উক্ত দস্যুদলকে আপন আপন অঞ্চলে পরিপোষণ করার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু হাজারা জেলাই তাদের উপযুক্ত বাসস্থান ব'লে মনোনীত হয়। এই দস্যুদলই ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্থানের সাহায্যে প্রথম কাশ্মীর আক্রমণ করে।

পশ্চিম তিব্বতের উত্তর অঞ্চলটি হোলো লাদাখ। বৌদ্ধ হিন্দু সম্রাট ললিতাদিত্য—যিনি ছিলেন অত্যুত্তর ভারতের অধিপতি—তিনি মধ্য এশিয়া ও তিব্বতে অভিযান করেন। লাদাখসহ অধিকাংশ পশ্চিম তিব্বত তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। সেটি অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ। পরে সম্ভবত মুসলমান আমলে পশ্চিম তিব্বত ভারতের বাইরে যায়। এখন মাত্র লাদাখ ভারতের সীমানাভুক্ত। ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মালভূমি প্রদেশ হোলো লাদাখ। এর উচ্চতা অনেক স্থলেই পনেরো ষোল হাজার ফুট। লে-শহর এগারো হাজার ফুট উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রদেশ আগাগোড়া তিব্বতী। সংস্কার, সামাজিক চেহারার, আচার আচরণে ও ধর্মনীতিতে—তিব্বতের সঙ্গে লাদাখের পার্থক্য কম।

লাদাখ হোলো উত্তর ও দক্ষিণে প্রসারিত বিরাট পার্বত্যভূভাগ—যেটি মূল হিমালয় ও কারাকোরামের মধ্যবর্তী জাস্কার এবং লাদাখ গিরিশ্রেণীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। শিপকির গিরিসঙ্কটে বা চুং উপত্যকায় পা বাড়ালে হয়তো বা তিব্বতের এলাকা—যেটির ক্যারাভান পথ গারটক অবধি প্রসারিত। এটি তিব্বত-ভারতীয় বাণিজ্যপথ। কিন্তু রূপসু, হানলে, দোমেত ও রংচুং ইত্যাদি উপত্যকায় 'মা-বাপ' আছে কিনা বলা কঠিন। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে কর্নেল ল্যাম্বটন ভারতের প্রথম জরিপ করেন। তাঁর সেই পরিমাপটির অদ্যাবধি কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা, এবং ভারত গভর্ণমেন্টের এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক নীতি গ্রহণ করা আছে কিনা বলা কঠিন। উত্তর লাদাখ এবং উত্তর ও পশ্চিম কাশ্মীর আজ পাকিস্তানের দ্বারা অবরুদ্ধ। এর মধ্যে পড়ছে স্কার্দু-বালতিস্তান, ব্রালদা, হুনজা, গিলগিট, দারেল, টাঙ্গির সোয়াত, কোহিস্তান, চিত্রল কাফিরিস্তান ইত্যাদি। এগুলি এক-একটি বিরাট পার্বত্য ভূভাগ, অসংখ্য নদীপ্রবাহিত উপত্যকা এবং মালভূমি, অসংখ্য হিমাঙ্গ এলাকা, সংখ্যাতীত ছোট বড় পার্বত্য জনপদ—এবং এই সকল অঞ্চলে সর্বপ্রকার সংবাদ চলাচলের বাইরে বৌদ্ধ ও হিন্দুকীর্তির অগণিত ভগ্নাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে থাকলেও অনেক ভূভাগে

শত শত বছরের মধ্যে মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি। উত্তর লাদাখের বাল্‌তিস্তান উপত্যকার উত্তরপূর্বাঞ্চল আবহমানকাল থেকে হিমপ্রবাহের দ্বারা অবরুদ্ধ। পৃথিবীর উচ্চতম শিখর গৌরীশৃঙ্গের দক্ষিণবাহিনী নদীগুলি তুষারস্তূপে পরিণত হয়নি, কিন্তু মধ্যএশিয়ার সর্বনাশা তুহিন বাতাসের অবারিত পথ পেয়ে কারাকোরাম শৈলশ্রেণীর ক্রোড়ভূভাগে শত শত মাইল অবধি বিপুল পরিমাণ জলধারা কঠিন হিমবাহে পরিণত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বিয়াফো, হিসপার, সিয়াচেন, বাল্‌টোরো, রাইমো, বাটুরা চোগো ইত্যাদি বিশালকায় দেশজোড়া হিমবাহগুলি প্রধান। এগুলি কখনও গলে না। এই হিমবাহলোকের ভিতরে-ভিতরে একেকটি তুষারমণ্ডিত গগনচুম্বিত শিখরলোক, এবং তাদের প্রত্যেকটি কারাকোরাম ওরফে কৃষ্ণ-গিরিশ্রেণীর অন্তর্গত। এই অনধ্যুষিত মনুষ্যপদচিহ্নহীন হিমপ্রবাহের ভিতর দিয়ে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় অধ্যাপক 'দেশিওর' নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী 'গডউইন অস্টিনের' শিখরে (২৮,২৫০ ফুট) আরোহণ করতে সমর্থ হন। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্বতশৃঙ্গ। এই অভিযানে একাধিক অভিযাত্রীর অপমৃত্যু ঘটে। পাকিস্তান-অবরুদ্ধ কাশ্মীর এলাকা কেবল যে কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত তা নয়,—সিন্ধুনদের পরপারে সমগ্র কাশ্মীরের উত্তর এবং উত্তরপূর্ব এলাকাও তাদের দ্বারা অবরুদ্ধ। 'স্কার্দু' অঞ্চল থেকে তার আরম্ভ এবং 'চিত্রলের' দক্ষিণে 'অর্ণব' অঞ্চল ও 'কুনার' নদীর প্রান্তে তার শেষ। আমাদের সাধারণ জ্ঞান এবং কল্পনা অপেক্ষা কাশ্মীর ভূভাগ অনেক বড় এবং পূর্ব-পশ্চিমে অধিকতর প্রসারিত—যার সুনির্দিষ্ট জরিপ আজও অসমাপ্ত ও অমীমাংসিত।

পশ্চিম তিব্বতের 'গারটক' হোলো একটি অতি প্রধান সম্মেলনক্ষেত্র। লাদাখ থেকে এখানে এসেছে সিন্ধুর সীমানাপথ সোজা দক্ষিণে। টিবেট হিন্দুস্থান-পথ এসেছে পশ্চিম থেকে শিপ্‌কির ভিতর দিয়ে। পূর্বপথে তিব্বতের প্রসিদ্ধ সোনার খনি 'লোক্ জালুং' থেকে একটি পথ এসে এখানে যুক্ত হয়েছে। এই সবগুলি একত্র হয়ে সোজা দক্ষিণে ষোল হাজার ফুট উঁচু মালভূমির উপর দিয়ে মানস সরোবরের দিকে চ'লে গেছে! এ কথাগুলি হিমাচল শিমলা ও কিন্নরের আলোচনায় পূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ব'লে এসেছি। কিন্তু লাদাখের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত 'উত্তর হিমালয় চরিত' গ্রন্থে বর্ণনা করা আছে।

মানস সরোবর! সংশয়গ্রাহীকে থমকে দাঁড়াতে হোলো!

মানসের প্রাচীন পৌরাণিক নাম, 'অনবতপ্তা'—আবার কোথাও এর নাম 'পদ্মহ্রদ'। অনেকে বলেন, এ দুটি নাম প্রাচীন বৌদ্ধ এবং জৈনদের দেওয়া।* পরমাশ্চর্য আলোকের পরকলায় স্বর্ণকমলের দল চিরকাল মানসের উপরে টলমল ক'রে উঠেছে তীর্থযাত্রীর অশ্রুসজল দৃষ্টিতে! অথচ এটি নিছক চোখের ভ্রম—সবাই জানে। এটি আমি নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখতে এসেছি। কিন্তু উচ্চ ভূভাগের বায়ুস্তরে সূর্যরশ্মির বৈচিত্র্যহেতু এবম্বিধ দৃষ্টিবিভ্রম ঘটতে থাকে। কৈলাসের চূড়ায় আদি অন্তহীনকাল ব'সে রয়েছেন 'বজ্র-বরাহী',—শিব এবং পার্বতী,—পুরুষ ও প্রকৃতি। তাকলাকোটের পথ ধ'রে গেলে কুড়ি মাইল দূর থেকে ভূ-প্রকৃতির প্রধানতম বিস্ময় আলোক-বৈচিত্র্যবর্ণা মানস ও রাবণ-সরোবরের উর্মিতরঙ্গায়িত জল ঝলমল ক'রে ওঠে,—তার প্রগর স্বচ্ছতার মধ্যে আরও কুড়ি মাইল দূরবর্তী বজ্র বরাহী কৈলাসের ধবলমুকুট প্রতিবিম্বিত হয়। ভূ পৃষ্ঠের ইতিহাস কত লক্ষ বছরের জানিনে, কিন্তু মানব ইতিহাসের প্রথম আবিষ্কৃত হ্রদ হোলো মানস,—যেখান থেকে রাজহংসের দল স্বর্ণপক্ষ বিস্তার ক'রে অনন্ত নীলিমায় বলাকার আয়তনে উড়ে যায়। কোটি কোটি মানুষের চক্ষে এই সরোবর "সর্বাপেক্ষা পবিত্র বিস্ময়কর ও প্রেরণাদায়িনী, পৃথিবীর সকল হ্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, এবং প্রথম-মানব-বংশের জন্মকাল থেকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।" ভারতীয় জরীপ কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রাক্তন কর্ণধার হিমালয়ের ভূতত্ত্ববিদ্ মি. হেডেন বলেন, 'ভূগোলের প্রথম পরিচিত হ্রদ হোলো মানসসরোবর। হিন্দুপুরাণে মানস প্রসিদ্ধ। বস্তুত, সভ্য মানুষের কাছে ইউরোপের জেনেভা হ্রদ সুখ্যাতি লাভ করার বহু শতাব্দী পূর্বে মানস সরোবর মানবজাতির নিকট যশোলাভ করে। ইতিহাসের উষাকালেরও পূর্বে মানসসরোবর অতি পবিত্র প্রতিভাত হয়। এবং এই ভাবেই এই সরোবর রয়ে গেছে চার হাজার বৎসরকাল।"

আলমোড়া থেকে উত্তরপূর্বে দুস্তর গিরিমালার ভিতর দিয়ে গৌরীগঙ্গা, ধৌলীগঙ্গা ছাড়িয়ে কালীগঙ্গার তীরে তীরে এবং আসকোট, ধরচুলা প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম ক'রে 'গার্বিয়াং' নামক জনপদে পৌঁছতে হয় এখান থেকে তুষারসীমানা ও দুঃসাধ্য এবং জনবিরল পার্বত্য কালীনদীর উত্তরপথ নেপাল-সীমানার গা বেয়ে এঁকেবেঁকে চ'লে গেছে লিপুগিরিসঙ্কটের দিকে। গার্বিয়াং থেকে তিব্বতের তাকলাকোট বত্রিশ মাইল। সরকারী হিসাবে প্রায় ১৬,৭৫০ ফুট উঁচুতে (সমুদ্রসমতা থেকে) লিপুলেক গিরিসঙ্কটে তুষারমণ্ডিত হিমালয়ে আরোহণ করতে হয়। এখানে কোনও একটি বিশেষ স্থলে গিয়ে

দাঁড়ালে দেখা যায় দক্ষিণে অনন্ত গিরিমালাময় ভারতবর্ষ, এবং উত্তরে 'রৌপ্য-মণ্ডিত' শুভ্র তুষারাবৃত তিব্বতের গুরুলা মান্ধাতা উজ্জ্বলন্ত নীলিমার নীচে প্রখর সূর্যালোকে দেদীপ্যমান। আলমোড়া থেকে কৈলাস ও মানস সরোবরের দূরত্ব হোলো যথাক্রমে দুশো আটত্রিশ ও দুশো আঠারো মাইল, 'এবং লাসানগরী থেকে আটশো মাইল। কৈলাসের তিব্বতী নাম, 'কাং রিনপোচে।' মানস-সরোবর সমুদ্রসমতা থেকে পনেরো হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। এর গভীরতা হোলো তিনশো ফুট, পরিধি চুয়ান্ন মাইল এবং মোট দুশো বর্গমাইলে সীমাবদ্ধ।

কৈলাসের যিনি আদি দেবতা, তিনি 'ধর্মপাল'। ব্যাঘ্রচর্মাবৃত এবং নর-কপালভূষিত। এক হাতে তাঁর ডম্বরু, অন্য হাতে ত্রিশূল। যিনি শক্তি, তিনি 'বজ্রবরাহী'—তিনি ধর্মপালের সহিত ঘন অচ্ছেদ্য আলিঙ্গনের মধ্যে 'যৌন-সংযোগে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত হয়ে রয়েছেন।' পুরাণে বলে, কৈলাসের শিখরলোকে কান পেতে থাকলে শোনা যায় অপার্থিব শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ও খঞ্জনী করতাল এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রসহযোগে সঙ্গীতঝঙ্কার।

যিনি মানসরসিক সন্ন্যাসী, যিনি প্রকৃতভাবে যুক্তিহীন সংস্কার থেকে বর্জিত, যিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানভিক্ষু, ভাবাবিলতা থেকে যিনি সম্পূর্ণ মুক্ত— তিনি বলেছেন, বিশ্বাস করো,—"যত তীর্থ আছে হিমালয়ে, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হোলো কৈলাস মানস। চতুর্দিকব্যাপী সমগ্র অঞ্চল পরমাশ্চর্য লোক। হও তুমি অস্থির অসন্তোষে নিত্য চঞ্চল, তুমি যে কোনো ধর্মের, জাতির, সমাজের হও, তুমি সংশয়াচ্ছন্ন অবিশ্বাসবাদী হও, হও আস্তিক কিংবা নাস্তিক—এক সময় হয়তো তুমি উপলব্ধি করবে, অজ্ঞানে অচৈতন্যে অপ্রতি-রোধ্যভাবে কখন যেন তুমি একাগ্রমতি হয়ে উঠেছ। কেউ তোমাকে পিছন থেকে ঠেলেছে সম্মুখের মহাদেবতার নাটমন্দিরে,—সে হয়তো ঝড়ের হাওয়া, হয়তো অদৃশ্য শক্তি, হয়তো-বা বিশাল বিশ্বের কেন্দ্রানুগ মহৎ কামনা।"

সন্ন্যাসী বলছেন, 'আজন্ম যার ঘ্রাণশক্তি পঙ্গু,—গোলাপের গন্ধ কেমন, সে জানে না। বেতারযন্ত্রের কাঁটা বিশেষ বিন্দুর উপরে নির্দিষ্ট না থাকলে দূর দেশের কোনও সঙ্গীত-অনুষ্ঠান শোনা যায় না। কিন্তু এখানে এসে দাঁড়াও। পঙ্গুনাস মানুষ প্রথম 'গোলাপের' গন্ধ পেয়ে শিউরে উঠবে। তার সত্তার মধ্যে একটি নিগূঢ় অধ্যাত্মবাসনার কাঁটা একটি বিশেষ বিন্দুর উপরে এসে থরথর ক'রে কাঁপতে থাকবে।'

বুকফাটা আর্তনাদ ক'রে চলেছে সিন্ধু উত্তর-কৈলাসের পথে। সিন্ধুর আদিঅন্ত দিশাহারা। মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি ওর অনেক তীরে শত শত বছরে। সভ্যতার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না—এমন অজানা অনামা ভূভাগের ভিতর দিয়ে চলেছে সিন্ধু। সিন্ধু অপরিণামদর্শী। ভারতের ভৌগলিক সীমানাকে সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত করেছে সিন্ধুনদ। সিন্ধুর উৎপত্তি কৈলাস মানস অঞ্চলেই।

সিন্ধু চ'লে গেছে লাদাখের ভিতর দিয়ে। বহু উচ্চমালভূমির উপরে লে শহর। অনেকগুলি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগুম্ফা সমগ্র লাদাখে বর্তমান,—তাদের মধ্যে ফিয়াং, কাউচি, লিকির এবং হেমির প্রধান। হেমির গুম্ফা লে-শহর থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দুস্তর ও লোকশন্য পার্বত্যপথের উপরে অবস্থিত। এটি একটি ক্ষুদ্র জনপদ। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। এই গুম্ফার মধ্যেই মহামানব যীশুখ্রীষ্টের ভারতভ্রমণের প্রকৃত তথ্যাবলীসমন্বিত প্রাচীন পালি ভাষায় লিখিত পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন জনৈক রুশ পর্যটক ডাঃ নিকোলাস নটোভিচ। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তুর্ক রুশযুদ্ধের কালে তিনি একাকী ককেশাস ও মধ্যএশিয়া পেরিয়ে ভারত প্রবেশের পথে লাদাখের একটি অঞ্চলে পাহাড় থেকে প'ড়ে গিয়ে আহত হন। তাঁকে হেমিসগুম্ফায় এনে দীর্ঘকাল শুশ্রূষা করা হয়। সুস্থ হবার পর তিনি একখানি দুর্লভ গ্রন্থের সন্ধান সেই খানেই পান এবং দোভাষীর সাহায্যে তিনি পুঁথিখানি পাঠ করেন। তাইতে জানা যায় কিশোর বয়সে যীশুখ্রীষ্ট বিবাহবন্ধনে ধরা না দিয়ে মধ্যএশিয়ার বণিক দলের সঙ্গে বেরিয়ে গোপনে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি আবাল্য গৌতমবুদ্ধের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং ভারত ভ্রমণে তাঁর প্রায় ষোল বছর কাটে। তিনি পুরী, কাশী, কপিলাবস্তু, কুমায়ুন, নেপাল এবং কাশ্মীরে ভ্রমণ করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল কথা—জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষই সমান, এই নীতি প্রচার করতে থাকেন। সনাতনীদের সঙ্গে যীশুর বিরোধ বাধে। উনত্রিশ বৎসর বয়সে যীশুখ্রীষ্ট যেরুজালেমে ফিরে যান। অতঃপর ক্রুশবিদ্ধ হবার পর যীশুকে তাঁর ভক্তরা ক্রুশ থেকে নামিয়ে গুল্মলতাশিকড়ের রসের সাহায্যে তাঁর ক্ষতস্থানগুলি নিরাময় করেন এবং পুনরুজ্জীবিত যীশু পুনরায় চ'লে আসেন তাঁর স্বপ্নভূমি ভারতে। কাশ্মীরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। শ্রীনগরের নিকটবর্তী 'খানা-ইয়ারী' নামক স্থানে যীশুখ্রীষ্টের নামে একটি কবর আছে এবং আর একটি বিশ্বাসযোগ্য কবর আছে করাচী শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে। এই পুঁথিবর্ণিত আনুপূর্বিক চমকপ্রদ কাহিনী নিয়ে ডাঃ নিকোলাস নটোভিচ যে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম—"The

unknown Life of Jesus Christ." দুইজন মাত্র বাঙালী এই পুঁথিখানির একটি নকল হেমিসগুম্ফায় দেখে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ এবং অন্যজন অভেদানন্দজীরই নিত্যসেবক ব্রহ্মচারী ভৈরবচৈতন্য। মূল পুঁথিখানি লাসার ডো ং গুম্ফায় সংরক্ষিত আছে।

হেমিসগুম্ফার প্রধান পুরোহিত বলেন, যীশুখ্রীষ্ট পালিভাষা শিখে বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করেন এবং তাঁর ভারতে অবস্থানকালের শেষদিকে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। স্বদেশে ফিরে গিয়ে তিনি বৌদ্ধনীতিকে ভিত্তি করে একটি নূতন ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। যীশু খ্রীষ্টের "Sermon on the Mount" নামক ধর্মনীতি-কথনটি অবিকল এবং হুবহু বৌদ্ধ তথা হিন্দু ধর্মনীতিবাদের একটি নকল মাত্র।

হেমিস গুম্ফার বিশদ্ কাহিনী ও ইতিহাস 'উত্তর হিমালয় চরিত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আমি বর্ণনা করেছি আমার লাদাখ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে। স্বামী অভেদানন্দজী একদা লাদাখকে তিব্বতেরই একটি অংশ বিবেচনা ক'রে তাঁর 'কাশ্মীর ও তিব্বত' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। লাদাখ ভারতেরই অংশ তিব্বতের নয়,—এটি পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়। যেমন লাহুল ও স্পিতি উপত্যকা ভারত রাষ্ট্রের আয়তনের মধ্যেই পড়ে। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার' অনেক প্রকার ভ্রান্ত অভিমত ও জরীপকে লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছিল। একালের পরীক্ষা নিরীক্ষায় তার অনেকগুলি ধোপে টেঁকেনি।

সে যাই হোক, ১৯৫৭ সালের জুনমাসে আমি কৈলাস ও মানস সরোবরের উদ্দেশে যাত্রা করি। টনকপুর থেকে চম্পাবৎ, পিথোরাগড, ধরচুলা, পাঙ্গু, জিপতি, মালপা, বুদি, গার্বিয়ং ও লিপুলেক গিরিসঙ্কট পেরিয়ে তিব্বতের তাকলা কোটে পৌঁছই। তাকলা কোট থেকে গুরুলা মান্ধাতার তলায় তলায় অগ্রসর হ'লে আন্দাজ ত্রিশ মাইলের মধ্যে মানস সরোবর। মানস ও রাক্ষসের তীরে আমি এক সপ্তাহকাল বাস করেছিলাম। আমার শিয়রে ছিল অতি নিকটবর্তী কৈলাসের চূড়া—যার সম্মুখে পশুরাজ সিংহের মতো থাবা পেতে ব'সে রয়েছে গুরুলা মান্ধাতা।

কৈলাস ও মানস ভ্রমণের ইতিবৃত্ত আমার আজও লেখা হয়নি।

সিন্ধুর জন্ম কৈলাসে, ব্রহ্মপুত্রের জন্ম ব্রহ্মকুণ্ড মানসসরোবরে। এই নদের

দক্ষিণে হিমালয় উত্তরে কৈলাস ও 'নিয়েনচেনটাংলা'। গগনের অনন্ত নীলিমার ছায়া বক্ষে ধারণ ক'রে সন্ন্যাসী ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মলোক থেকে ছুটে চলেছে দেবভূমি ভারতের দিকে। শীতের দিনে অধিকাংশ নদ তুষারাচ্ছন্ন। ওর দুই পাশের পার্বত্যগুহাগহ্বরে থাকে শ্বেত পীতাভ ভল্লুক: নামহারা অতিকায় জন্তুরা ধূসরবর্ণ রাত্রির ছায়ায় এসে শ্বেতনীলাভ নদের গন্ধ শুঁকে চ'লে যায়। মাঝে মাঝে আসে ভয়াবহ তাড়কাপক্ষী, অনেক জন্তু তাদের ভয়ে পাহাড়ের ফাটলে লুকোয়। কখনও কখনও খুঁজে পাওয়া যায় তীর্থযাত্রী ও বণিকদলের কঙ্কাল--পর্বতবিচ্যুত হিমবাহের আক্রমণে তারা স্থির হয়ে আছে চিরকালের মতো। কখনও আসে ভয়াল পার্বত্য মহানাগ, কখনও বা পথভ্রান্ত ঈগল। ওরা আসে জলের পিপাসায় কিন্তু জল না পেয়ে রক্তের খোঁজে ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়ায়।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণাঞ্চল অগম্য। ভীষণাকৃতি পাতালপথ, শব্দ অন্ধকার গহ্বরলোক, বালুপাথরের কর্কশ প্রান্তর—এরা আচ্ছন্ন করেছে শত শত বর্গমাইল। পৃথিবী এখানে মৃদুগতি, মহাকালের জপের মালা ঘোরে অতি ধীরে, কর্মচাঞ্চল্য কোথাও নেই, মানববসতি চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে আসে মঙ্গোলীয় কিংবা তিব্বতী ঘোড়সওয়ার ডাকাতের দল, আক্রমণ করে উটের ক্যারাভান, রেখে যায় ওই লবণাক্ত বালু-কাঁকর পাথরের মরুভূমিতে রক্তের করুণ কাহিনী। আসে হিমালয় আর কৈলাস আর নিয়েনচেনটাংলার তলায়-তলায় লবণের ঝড়, আসে তুষারের ঝঞ্ঝা, আসে ঝাপটা আকস্মিক মেঘে, বিদ্যুতে, বজ্র অন্ধকারে ইয়ারখন্দে আর খোটানে, তাকলা মাকানে আর তুর্কিস্থানে, কৈলাসে আর মানসে।

রৌদ্রের প্রচণ্ড জলজ্বালার মধ্যে হঠাৎ প্রবল তুষারপাত ঘটতে থাকে তিব্বতে। হঠাৎ নেমে আসে করকা প্রবল বর্ষণের সঙ্গে। দিনান্তের তমসায় হঠাৎ ভলকে ভলকে লালাভ অগ্নিপ্রবাহ ওঠে কৈলাস আর মান্ধাতার শিখরে,—সেই অগ্নিপ্লাবনের পাশ দিয়ে ওঠে ঘনকৃষ্ণ ধূম্রপুঞ্জ। একটি দিনমানের মধ্যে অগ্নিক্ষরা রৌদ্র, প্রলয়নৃত্যরূপিণী বর্ষা, নির্মল নীলিমা শরতের, প্রচণ্ড শীতের সাংঘাতিক তুষার,—এবং তার সঙ্গে বসন্ত সমীরণের মধুর স্বগত প্রলাপ উদ্বেলিত মানসহ্রদয়ের রক্তকমলদলকে টলোমলো ক'রে তোলে। উপর থেকে নেমে আসে শুক্লপক্ষের অসহ্য প্রখর চন্দ্রচ্ছটা। সেই জ্যোতির্বিকিরণের নীচে কৈলাসশিখরস্থিত দেবাদিদেবের ক্রোড়বদ্ধা বজ্রবরাহীর নিবিড়-নিমীলিত মৈথুনযন্ত্রণা তীর্থবাসীগণের প্রাণসত্তাকে আবেগ-উদ্বেলিত ক'রে তোলে। তারা কম্পিত কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করে নব বিশ্বসৃজনের!

॥ ৮ ॥

গাগর গিরিশ্রেণীর নীচে-নীচে পথ চ'লে এসেছে অনেকদূর। কোথাও কোথাও ছোটখাটো উপত্যকা, সেখানে পথটি নানা শাখায় প্রসারিত। পাহাড়ের পর পাহাড়, তাদেরই ভিতর দিয়ে মানুষের পায়ের দাগ চ'লে গেছে শিরা-উপশিরার মতো। পাহাড়ের গায়ের ফসলের ক্ষেতগুলি এক-একটি ধাপের মতো উপর থেকে নীচে অবধি স্তরে স্তরে সাজানো।

'কাইঞ্চি' আর 'রাতিঘাট' পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। অরণ্যসীমানার গা বেয়ে 'গাধেরা' নামক গিরিনদী ঝিরঝিরিয়ে চলেছে। নানাবর্ণের পাথরের প্রদর্শনীতে নদীর সর্বাঙ্গ ভরা। লাল, নীল, হলদে, সবুজ, কালো,—সব রকমের পাথর। ওর মধ্যে কষ্টিপাথর খুঁজতে আসে নানান দেশের লোক। ওপারে বনখেজুরের অরণ্য, তারই সঙ্গে চীড গাছের জটলা। উপত্যকার রঙীন পাখীরা নদীতে নেমে এসেছে, পাথরের ফাঁকে ফাঁকে দল বেঁধে স্নান করতে ব্যস্ত। চাষী মেয়ে এখানে ওখানে পাথর সাজিয়ে নালীপথে জল নামিয়ে আনছে ছোট্ট খামারটিতে। ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ছোট ছেলে। নদীর কাছাকাছি নেমে এলে সংসারযাত্রার চেহারাটা দেখতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ে পাহাড়ে যেন বন্য কৌমার্য,—চারিদিকে সতেজ তারুণ্য। মুগ্ধচক্ষু কেবল যেন কিছু খুঁজে বেড়ায়,—এক বিস্ময় থেকে অন্য বিস্ময়ে মন বসাবার চেষ্টা পায়।

কুমায়ুন পর্বতমালা বিশ্ববিশ্রুত। অনেক পর্যটক আর পণ্ডিত বাইরে থেকে এসে ব'লে যায়, কুমায়ুন প্রাচ্যের ভূস্বর্গলোক! কেউ বলে, শোভা ও সৌন্দর্যের অমরাবতী,—ভারতের ললাটে কুমায়ুন যেন বৈদুর্যমনির মতো ঝলমল করছে। এই ভূখণ্ডের উত্তরে গাড়োয়াল, মধ্য-উত্তরে আলমোড়া, দক্ষিণে নৈনীতাল, দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগটি হোলো গাড়োয়ালেরই সীমানা। উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, প্রাণিশূন্য তুষার-উপত্যকা, ভয়ভীষণ অরণ্যানী, ভয়াল গভীর খদ, বন্য পার্বত্য নদীর উন্মত্ত রণরঙ্গ,—এরা এই ভূভাগকে পরমাশ্চর্য ক'রে রেখেছে। আবার অন্যদিকে পুরাণ মহাকাব্যের ভিতর থেকে উঠে এসেছে ঋষির তপোবন, নিঃসঙ্গ উপত্যকায় হরিণ আর ময়ূরের আনাগোনা,—পতঙ্গ সরীসৃপদলের বিশ্রম্ভালাপ! গিরিনির্ঝরিণীর সুস্বাদু জল, বনে বনে ফুলের শোভা, গাছে গাছে সুমিষ্ট ফল। জন-মনুষ্য যে-পথে নেই, হঠাৎ ফিরে

দেখো—সাধু ব'সে রয়েছে জপের আসনে, নয়ত, জ্বেলেছে ধুনি, আর নয়ত সংসারহারা বৈরাগী বানিয়েছে মনের মতন আশ্রম। কোনও গ্রামের প্রান্তে পাহাড়ের ধারে ডালপালা আর পাথরের সাহায্যে 'কুটরী' বানালো সন্ন্যাসী,—মাথার উপরে ছায়া বিস্তার ক'রে রইলো 'পিপল' গাছ,—সেখানে সে র'য়ে গেল অনেকদিন। অধিকার কিছু নেই, দাবিও জানায় না,—কিন্তু কোনও না কোনও অনুগত এগিয়ে এলো গ্রাম থেকে। 'ভূরা' কিংবা চরসের কলকেতে আগুন দিয়ে সন্ন্যাসীর দিকে এগিয়ে দিল। সেই চরস টানলো সন্ন্যাসী তার বুক ভ'রে। দেখতে দেখতেই 'অসারঃ খলু সংসারঃ'। জয় শিব শম্ভো। ভিজা 'সাঁপি' জড়ানো আঙুলের মতো সরু কলকেটি হাত ফেরতাই হয়ে চললো কিছুক্ষণ। কেউ বা বললে, 'আওর এক ছিলম্ বনা দে।' ওর মধ্যে কেউ নিয়ে এলো কাঁচা তামাক, কেউ বা কাঁচা সিদ্ধি। আগে 'মৌজ' হওয়া চাই, পরে মুখ খুলবে। আগে গৌরচন্দ্রিকা, পরে কীর্তন। নেশায় বুঁদ হওয়া চাই, নৈলে সংসারকে 'মায়া' ব'লে প্রতীতি হবে কেমন ক'রে? ছেলেপুলে কর্তা গিন্নী, ঘর-সংসার এদের স্বীকার করি, সেইটিই তো মায়া। তারই বাঁধন মনে মনে। চরসের ধোঁয়ায় এই মায়াময় মনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে, নাভিকেন্দ্র প্রলয় বিপর্যয় দেখা দেয়। সেই মধুর 'প্রলয়ের' মধ্যে হয়তো বা এসে বসলেন গ্রামের গৃহিণী সাধুর আকর্ষণে। তিনিও ওই কলকেতে গোটা দুই টান দিয়ে অনিত্য সংসারের মায়াবদ্ধ জীব সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনায় যোগ দিলেন। গ্রামে সাধু এসে পৌঁছলেই গ্রামের পুণ্য, গ্রামের যশ। গ্রামবাসীর সেইটিই হোলো বৈঠকখানা, সেইটি বৈচিত্র্য। সাধুর অবমাননা কুমায়ুনে নেই।

মেঘ করে এসেছে পাহাড়ের কোলে-কোণে, কিংবা চূড়ায়। মেয়েরা উতলা হয়ে উঠলো। ডাক দিল পাহাড়ে পাহাড়ে। ভেড়ী বকরিরা গিয়েছে অনেক দূরে, কিন্তু তারা ওই মেয়ের গলার আওয়াজ চেনে। মালভূমির তলা থেকে ডাক শুনে তারা মুখ তুলে তাকায়। মহিষের পিঠে চ'ড়ে উঠে এলো ছোট ছেলে মেয়ে। ঘণ্টা বেজে উঠলো ছাগলের গলায়। দেখতে দেখতে বৃষ্টি নেমে এলো এ পাহাড়ে আর ও পাহাড়ে

বয়েল-গাড়ী কোন দূর দেশ থেকে ছেড়েছে এক মাস আগে। শরৎকালের শেষ দিকে পাহাড়ী শ্রমিক তার সংসার নিয়ে উঠেছে ওই গাড়ীতে। দশবিশখানা গাড়ী একসঙ্গে যাত্রা করেছে এক মুলুক থেকে অন্য মুলুকে। ওরা চলেছে ফসল কাটতে ভিন দেশে। ছ'মাস ধরে চলবে ওদের গাড়ী। ওরা শ্রমিক। গাড়ীর ভিতরে থাকে শিশু কিংবা মেয়ে। পাহাড়ে-পাহাড়ে

রাত্রিবাস, গাছের ছায়ার নীচে রান্নাবান্না আর বিশ্রাম, গাড়ীর নীচে শয়ন-শয্যা পাতা। লাঠি আর সড়কি নিয়ে পুরুষ পাহারা দেয় রাত্রিকালে—পাছে জন্তু-জানোয়ার আসে। গোরু-ছাগল-কুকুর—সকলের গলাতেই ঘণ্টা বাঁধা। কোনটা আক্রান্ত হলেই ঘণ্টা বেজে উঠবে। সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হলে ওরা ওই পথে আবার ফিরবে। তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বছরের সংস্থান করে নিয়ে আসবে। যেতে-যেতে পথে দেখেছি একদল পর-পর গাড়ীর মধ্যে কয়েকটি পরিবার দিনের বেলায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে, এবং বলদগুলি আপন মনে গাড়ী টেনে-টেনে চলেছে পাহাড়ের সঙ্কটসঙ্কুল পথের বাঁকে বাঁকে। চালকের কোনও তোয়াক্কা তাদের নেই। বলদ চলেছে, চলেছে ওদের কাঁধে কাঁধে সংসার যাত্রা,—ওরই মধ্যে কোনও নারী প্রসব করেছে, কারো হয়তো মৃত্যু ঘটেছে, কারো পিঠে পাহাড়ী চিতা ধারালো নখের আঁচড় দিয়ে গেছে, হয়তো বা কোনও গাড়ীর একটি বয়েল হঠাৎ মারা পড়েছে,—ওরা দমেনি। দানা চিবিয়ে, বাজরা জোয়ারের ডেলা কিংবা 'মাক্কাই' পুড়িয়ে খেয়ে ওরা চলেছে আপন পথে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছি, ওদের ওই পথের উপরে চিরকালের একটি গতির স্পর্শ লেগেছে, জন্ম মৃত্যুর অবিশ্রান্ত বিবর্তনের ভিতর দিয়ে ওদের ওই মন্থর গতি কতদিন আমার ভাবনাকে দিশাহারা ক'রে দিয়েছে। আমার বক্ষোপটে ওরা রেখে গেছে আবহমান কালের পায়ের চিহ্ন।

পথের বাঁক একটু ফিরলেই আবার সেই নিবিড় স্তব্ধতা। কোনও একটি উড্ডীন পাখীর ডাক, সরীসৃপের সাড়া, ঝিল্লির ঝনক—সেই স্তব্ধতাকে আরও গভীর ক'রে তোলে। চারিদিকের ব্যাপক বন্যতায় ছমছমিয়ে ওঠে মন। কিন্তু যেন দেখছি আশেপাশে, কেউ যেন লক্ষ্য করছে আমাকে প্রতি পাথরের অন্তরাল থেকে। আমি যেন অনধিকার প্রবেশ করেছি একটি বিচিত্র সংসারে। প্রতি ঝোপের অন্ধকারে, প্রতি গুহার গহ্বরে, প্রতি বৃক্ষের কোটরে,—আছে কেউ, যাকে চিনিনে, জানিনে, বুঝিনে। একটি বিরাট শোভাযাত্রা সহসা যেন নিঃশব্দে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, কথা বলছে না কেউ, সাড়া পাচ্ছিনে কোথাও,—আমি যেন তাদেরই পাশ কাটিয়ে-কাটিয়ে চলেছি। পাছে ওদের ধ্যানভঙ্গ হয়, তাই সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়েছি।

কুমায়ুনের পশ্চিমসীমানা বোধ করি তমসানদীর দ্বারা চিহ্নিত। 'বন্দরপঞ্চ' পর্বতমালা থেকে নেমে দক্ষিণে হরিপুরে এসে তমসা নদী মিলেছে যমুনার

সঙ্গে। এই বন্দরপঙ্কেই হোলো যমুনোত্রীতীর্থ। হরিপুর থেকে একটি পথ গিয়েছে চক্রতায়, এবং সেখান থেকে সেই পথটি সোজা উত্তরে অন্তহীন গিরিমালা ও উপত্যকার ভিতর দিয়ে চ'লে গেছে 'রাওয়াইন' ও 'পাগডি' হয়ে কিন্নরদেশের দিকে শতদ্রুতীরবর্তী ওয়াংটুতে। পাখডি থেকে ওয়াংটুর পথ খুবই দুঃসাধ্য। কুমায়ুনের উত্তর ভূভাগ হোলো পশ্চিম তিব্বতের সীমানা। সমগ্র হিমালয়ের পর্বতমালার প্রায় দুই হাজার মাইল দৈর্ঘ্যের মধ্যে কুমায়ুনের মতো এত অধিক সংখ্যক ঘন সন্নিবিষ্ট তুষারচূড়া অন্য কোথাও নেই। এমন গৌরব গরিমা, এমন সৌন্দর্যশ্রী, এমন গিরিনির্ঝরিণীর শোভা, এমন অধ্যাত্ম আনন্দ এবং উপলব্ধির পটভূমি—অন্য কোথাও দেখিনে। কুমায়ুনের প্রতি পর্বত দেবতার মতো, প্রতি জলধারা গঙ্গার মতো, প্রতি প্রস্তরখণ্ড বিগ্রহের মতো, প্রতি গুহাটি মন্দিরের মতো। সাধু, মহাত্মা, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ভিক্ষু, সেবক,-এদের নিয়ে কুমায়ুন পরিপূর্ণ। প্রায় প্রতিটি অধিবাসী ধর্মসেবী, সত্যবাদী, সরল এবং অতিথিপরায়ণ। হিমালয়ের প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ কুমায়ুনেরই অন্তর্গত। কৈলাস মানসসরোবরের সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও নিরাপদ পথটি কুমায়ুনেরই ভিতর দিয়ে চলেছে। এই কুমায়ুনে উত্তরমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যে তুষারচূড়াগুলি প্রতিনিয়ত মানুষের পূজা পায় তাদের মধ্যে যমুনাপর্বত, শ্রীকান্ত, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ শতোপন্থ, বদরিনাথ নীলকান্ত, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, দ্রোণগিরি, কামেত, হাতীপর্বত, গৌরীপর্বত, পঞ্চচুলী, নন্দাঘুন্টি, নন্দকোট—এইগুলি অতি প্রধান। এর বাইরে আছে শত শত গিরিশিখর এবং শত সহস্র মন্দির। আছে তুষার উপত্যকার কোলে সাধুর আশ্রম, আছে সন্ন্যাসীর তপোবন, আছে বৈরাগীর কুটীর, আছে মৌনীর গুহা। দার্শনিক, পণ্ডিত তত্ত্বজিজ্ঞাসু, যোগী নাঙ্গা, ভাবুক, সত্যাশ্রয়ী, সর্বত্যাগী নৈরাশ্যবাদী, আশাহত ব্যর্থপ্রণয়ী, সন্তানশোকাতুর, পুণ্যকামী, তীর্থবাসী, মৃত্যুকামী, শিল্পী, কবি, রাজনীতিবিদ—কে নেই কুমায়ুনে? কুমায়ুনের আকাশ নিত্য 'শিবশম্ভো' নামে মন্দ্রিত, প্রতি গিরিনদীর কলতানে গঙ্গার স্তব মুখরিত, প্রতি পাখীর কণ্ঠে দেবতার মন্ত্র গুঞ্জিত,—কুমায়ুন ভারতের শ্রেষ্ঠতম তীর্থলোক। কামনায়, বাসনায়, বেদনায়, পিপাসায়, তুমি জরো জরো,-এসো কুমায়ুনে, শীতলশ্বাস মধুর সমীরণে তোমার সমস্ত দহনের উপরে শান্তির প্রলেপ যাবে বুলিয়ে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে তুমি পঙ্গু, এসো নীলধারার কোলে,—নবজীবনের আশ্বাস খুঁজে পাবে। এখানকার মৃত্তিকায় চন্দনের গন্ধ, তপোবনের কুসুমশয্যায় দেবসৌরভ, লতায় পাতায় বীজমন্ত্রের কানাকানি,

মন্দিরে-মন্দিরে উদাত্ত ওঙ্কারধ্বনি। প্রতি তুষারশিখরে দেবসিংহাসন। প্রতি পথের বাঁকে শিব ও শক্তি, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর বন্দনা।

কোশী নদীর তীরে-তীরে চলেছি। কেউ বলে এ নদীর নাম 'কৌশিক' কেউ বা বলে 'কৌশল্যা।' ছোট্ট রামগড় পেরিয়ে যাচ্ছি,—আশে-পাশে সামান্য পাহাড়ী বস্তি। তারপরে পাচ্ছি বিশ্রাম নেবার মতো গ্রাম—'গরমপানি।' আবার এগিয়ে যাচ্ছি সেখান থেকে। নালানদী ছাড়িয়ে আদিম অতিপ্রাকৃত বন্যতা দেখে যাচ্ছি ওপারের পাহাড়তলীর ছায়ায়-ছায়ায়। মন কেঁদে উঠেছে কতবার মায়ার কাঁদনে। ভিতরের পাখী আমার পোষ মানেনি কোনোদিন। হিমালয়ের বৃহত্তর প্রাকৃতলোকে এসে ভিতর থেকে সে ডানা ঝটপটিয়ে উঠেছে, ডাক দিয়েছে বিদীর্ণকণ্ঠে আকাশলোকের দিকে তাকিয়ে। পিঞ্জরের বিহঙ্গ নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েও স্থির থাকতে চায়নি। আপন জগৎকে সে আবিষ্কার করেছে থেকে থেকে।

দক্ষিণ বাঁকপথে ঘুরে সামনেই পাওয়া গেল 'খয়েরনা' সাঁকো। এপারে দক্ষিণ কুমায়ন, ওপারে মধ্যকুমায়ুন। 'খয়েরনা' হলো নৈনীতাল ও আলমোড়ার অন্যতম সংযোগ-সেতু। দেখতে দেখতে এসে পৌছলুম 'পিলখোলি'র ঘাটি পাহারায়। এখানে খাজনা দিয়ে সেলাম ঠুকে যেতে হবে। চড়াইপথ এখান থেকে চলে গেছে রানীক্ষেতের দিকে।

এ আমার পরিচিত পথ। পরিচিত, কিন্তু চিরকালের অচেনা। প্রতি পাহাড়ের বাঁক চব্বিশ বছর ধ'রে নতুন ভাষা দিয়েছে আমাকে। বৃক্ষ পরিণত হয়েছে বনস্পতিতে, নতুন কালের ঝরনা নেমে এসেছে, নদীর পাথর আরেকটু মসৃণ হয়েছে—মহাকালের ধারাবাহিকতা ওদের উপরে রেখে গেছে তার গতির দাগ—তবু অজানা রয়ে গেল যা কিছু প্রিয়। ওই পাথরে কান পেতে শুনে গেছি যেন কতবার কার পায়ের ভাষা, নদীতে নদীতে আগমনী, ঝাউ পাইনের বনে-বনে মন্ত্রপাঠ,—চারিদিকের অনাদি অনন্ত অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে কোথায় যেন কার পরম আহ্বান। জানিনে কিছু, ভাষা ছিল না কণ্ঠে, নির্দেশ দিল না কেউ, খুঁজে পেলুম না কিছু কোনোদিন,—কেবল মর্মলোকের বাসা ছাড়া সেই পাখী এক আকাশ থেকে অন্য আকাশ পথে রক্তঝরা কণ্ঠে ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে এলো।

চড়াইপথ উঠে এলো অনেক দূর। দিগন্ত এবার বিস্তৃত হয়েছে। অবরোধ স'রে গেছে। হেমন্তের স্নিগ্ধ হাওয়া উঠেছে গিরিশিখরে। উত্তর পথের বাঁক

পেরিয়ে 'রানীক্ষেত' শহরে এসে পৌঁছলুম। হিমালয়ের তুষারচূড়ারা আবার সামনে এসে দাঁড়ালো।

পুরনো বন্ধু যেন দুহাত বাড়িয়ে ডেকে নিল আপন আলিঙ্গনে। এবার এসে দাঁড়ালুম অনেক দিন পরে। প্রাচীন প্রসন্ন স্নেহের দ্বারা যেন মধুর অভ্যর্থনা জানালো 'রানীক্ষেত'—ভালো আছ তো?

মনে মনে জবাব দিতে হোলো—না, ভালো নেই। কোনোদিনও ছিলুম না। পায়ে কাঁটা ফুটেছে অনেক, মাথা ঠুকেছে তার চেয়েও বেশি। চোখ বেয়ে ঝরেছে অনেক রক্ত, বুক বেয়ে নেমেছে অনেক বেদনা। কপালে বলিরেখা, সর্বাঙ্গে জরা। চেয়ে দেখো মুখ তুলে।

"চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে অশ্রুজলের রেখা?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী আছে কি ললাটে লেখা?"

হঠাৎ ছিটকে এসে পড়লুম আধুনিক উপকরণের মধ্যে। ঠিক বলা কঠিন—বোধ হয় রানীক্ষেত সমস্ত কুমায়ুনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর শহর। মন নেচে উঠ্‌লো স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে। অনেক মানুষ দেখছি একত্র, পাকা ঘর বাড়ী সর্বত্র, পাইনের বনে বনে সাহেবসুবোর বাংলো, এখানে ওখানে সরকারি ব্যারাক। মস্ত বড় মার্কেট।

শহরের দক্ষিণ প্রান্তে মোটর স্ট্যাণ্ডের সামনে 'লতিফ মঞ্জিল' নামক বাড়ীটি আমার পরিচিত। আজ আমি রাজসিক চেহারা আর পোষাক নিয়ে এসেছি। একা নই, সঙ্গে আছেন বন্ধুবর শশাঙ্কমোহন চৌধুরী। তিনি দড়াদড়ি ছিঁড়ে এবার বেরিয়ে পড়েছেন। আমরা 'লতিফ মঞ্জিলে'র দোতলায় একটি ঘর নিলুম। সমস্তই এবার সহজলভ্য। এবার পাচক আসুক, চাকর আর চাপরাশি আসুক।

লোভের উপকরণ চারিদিকে সাজানো' চারপাই খাটিয়া জুটলো কপালে,—একেবারে স্বর্গরাজ্য। ভোজ্যবস্তু যখন যা কিছু চাই। কাঁচের প্লেট সাজানো হোটেল, পেয়ালা পিরিচের ঠুনঠুনানি. বেতারে বোম্বাই গান, দোকানে-দোকানে রঙীন পানীয় ফেনপুঞ্জে উচ্ছ্বসিত। সমস্তটাই সহজলভ্য এবং অনায়াস। কোথাও পরোয়া নেই, কেউ প্রশ্ন করছে না, কৌতূহল দেখছিনে কোথাও—চারিদিকে ভোগের উপকরণ থরে থরে সাজানো। বাজারে যা খুশি কেনো, যা চাও এনে দিচ্ছে, যাকে খুশি ডাক দাও, যখন খুশি বেরিয়ে পড়ো।

প্রশান্ত উপত্যকার টুকরো রানীক্ষেতে কোথাও নেই। এরা ঠিক উল্টো,—শিলং শহরে গিয়ে মনে হয় না যে, পাহাড়ে আছি। এমন কি দার্জিলিংয়ের ওই চাঁদমারী বাজারও অনেকটা প্রশস্ত সমতল, আরেকটু নেমে গেলে লেবং-এর ময়দান। সিমলাতেও পাওয়া যায় আনানদেলের মাঠ। রানীক্ষেত সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। হয় ওপরে ওঠো, নয়ত নীচে নামো। উত্তর দিয়ে উৎরাই পথে একটু নেমে গেলে সামান্য সমতল, নৈলে রানীক্ষেত শহর হোলো পাহাড়ের গা। পথের দুধারে দোকান, উপর দিকে অভিজাত পল্লী, নীচের দিকে জনবসতি। সমুদ্রসমতা থেকে রানীক্ষেত হোলো ছয় হাজার ফুট উঁচু, এবং কাঠগোদাম স্টেশন থেকে পঞ্চাশ মাইলেরও বেশী।

প্রশস্ত সমতলের ক্ষুধা চিরস্থায়ী হয়ে রানীক্ষেতে থেকে যাবে, ইংরেজ গভর্নমেণ্ট এটি বরদাস্ত করেনি। রানীক্ষেতের প্রচুর অরণ্য, জলের সুবিধা প্রাকৃতিক শোভা এবং জল বায়ুর স্বাস্থ্য গুণপনা লক্ষ্য করে এককালে লর্ড মেয়ো ভেবেছিলেন, সিমলার বদলে রানীক্ষেতে বড় লাটের পার্বত্য কেন্দ্র বানালে মন্দ কি? তাঁর সেই অভিপ্রায় অবশ্য কার্যে পরিণত হয়নি, তবে এই শহরটিকে প্রায় একশো বছর আগে ইংরেজ সৈন্যসামন্তের ছাউনিতে পরিণত করা হয়েছিল এবং এখানকার গোরা হাসপাতালটি ভারত বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। একান্তভাবে ইংরেজদের জন্যই অতঃপর রানীক্ষেতের উপর তলার দিকে কুচকাওয়াজের মাঠ, পোলো খেলা ও গলফ খেলার ময়দান নির্মাণ করা হয়। এ ছাড়া পাইনবনের মধ্যে স্বল্পনগ্না তরুণী মেমদের চলাফেরার জন্য পুষ্পবীথিকা, আমোদ আহ্লাদের জন্য নিকুঞ্জ, শীতের দিনে মধুরহাসিনীদের স্নানের জন্য স্ফটিকাধারে তপ্তধারাকুণ্ড, এবং গিরিশিখরচূড়ায় উন্মুক্ত আকাশতলে জ্যোৎস্নারাত্রি যাপনের আনন্দের জন্য 'রক্তকমল-দলকে' আনা হোতো অনেক দূরের থেকে। তাদেরই ছিন্ন পাপড়ির অবশেষ আজও খুঁজলে পাওয়া যাবে কোনো কোনও শূন্য বাংলোর আশে পাশে

'জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা,
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবেনা" —

রবীন্দ্রনাথ যাবার আগে পূর্বোক্ত বাণী রেখে গিয়েছেন। আজ অবশ্য তল্পিতল্পা নিয়ে ইংরেজ চ'লে গেছে বটে, কিন্তু রেখে গেছে তার রুচি। প্রত্যেক পাহাড়ী শহরকে ইংরেজ যেমন অতি যত্নে অলঙ্কৃত ক'রে গেছে, তেমন আর কেউ করেনি। মুসৌরী, নৈনীতাল, ডালহাউসী, শিলং, শিমলা সর্বত্র ইংরেজেরই রুচির পরিচয়। যেখানটিতে দাঁড়ালে হিমালয়ের শোভা সব চেয়ে ভালো ভাবে দেখা যায়, ইংরেজ ঠিক সেখানে 'আসন' নিয়েছিল। হিমাচলের 'মাসাত্রা', নৈনীতালের টিফিন্ টপ, মুসৌরীর লাণ্ডুর, দার্জিলিংয়ের রাজভবন, ডালহাউসীর উপর-তালাটা,—এমন কি ওই সোমেশ্বর থেকে এগিয়ে 'কৌসানী পাহাড়ের চূড়ায় ডাকবাংলোটি,—ইংরেজের রুচি সর্বত্র সমান ভাবে কাজ করছে। কৌতুকের বিষয় এই, ইংরেজের পক্ষে এ দেশে পার্বত্য শহরে বসবাসের ব্যাপারে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানরা সাহায্য করেছিল বেশী। হিন্দুরা ওদের শাসনযন্ত্রে থেকে মুন্সীর কাজ নিয়েছিল, আর মুসলমানেরা মোতায়েন ছিল ওদের ঘরোয়া জীবনে। হোটেলেই হোক, বাড়ীতেই হোক আর লাটপ্রাসাদেই হোক ওদের পাচক ভৃত্য, আরদালী চাপরাশি ইত্যাদি সবাই মুসলমান এর প্রধান কারণ হো'লো গোরু। গোরু খায় ওরা উভয়েই। সামাজিক জীবনে আহারের ব্যাপারটা খুবই প্রধান। সুতরাং গোমাংস ছিল উভয়পক্ষের রুচির সংযোগসেতু। ওদিকে হিন্দুরাও শূকর খায়। অনেক হিন্দু শূকর খান, এবং ইংরেজও শূকরভক্ত অতএব শূকরেরাও অনেক সময়ে হিন্দু আর ইংরেজের মিলন ঘটাতো। মুরগীর কথা বাদ দিচ্ছি। এটার ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সবাই পাশাপাশি পাত পেতে ব'সে গেছে। যাই হোক, আগে অতটা লক্ষ্য করিনি। কিন্তু প্রত্যেকটি আধুনিক পার্বত্য শহরে এলেই একটি মুসলমান সমাজের দেখা পাই। তাদের অধিকাংশই আগে ছিল মাংস বিক্রেতা, রুটিওয়ালা, হোটেল বয়, বাবুর্চি, আরদালী ইত্যাদি। সমগ্র ভারতীয় হিমালয়ে মুসলমানের দেখা মেলে খুবই কম, কিন্তু শহরে এলেই ওদের ওইসব কাজে নিযুক্ত দেখা যায়। ইংরেজ চলে যাবার পর মুসলমানদের অনেক কাজ চ'লে গেছে।

রানীক্ষেত শহরটি অনেকটা যেন বারান্দার মতো। উত্তর অংশটা সম্পূর্ণ অবারিত। এই বারান্দায় দাঁড়ালে তুষারমৌলী হিমালয়ের অনেকগুলি চূড়া পাশাপাশি দেখা যায়। নীলকান্ত, বদরীনাথ, হাতীপর্বত, গৌরীপর্বত, ত্রিশূল নন্দাদেবী, নন্দকোট—একটির পর একটি সাজানো। কখনও দুগ্ধশুভ্র, কখনও গৈরিক, কখনও স্বর্ণাভ, কখনও পীত-নীলাভ, কখনও বা মেঘময়।

রূপে, বর্ণে, সৌন্দর্যে, মহিমায়,—সে যেন নিত্যকাল ধ'রে রানীক্ষেতকে অনুপ্রাণিত ক'রে রেখেছে। বস্তুত, কুমায়ুনের আর কোনও শহর থেকে এমনভাবে দিগ্‌বলয়-প্রসারিত হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য দেখা যায় না। দিন দুই আমরা তন্ময় হয়ে ছিলুম।

রানীক্ষেত থেকে একটি পথ উত্তর পশ্চিম দিয়ে নীচের দিকে চলে গেছে, এটি বদরিনাথ যাবার প্রধান পথ,—'বদরিনাথ মার্গ'। একদা কেদার-বদরি পরিক্রমায় হৃষিকেশ থেকে হাঁটতে আরম্ভ ক'রে ঠিক এই পথের মুখে পৌঁছতে চারশো মাইল অতিক্রম করতে হয়েছিল। আজ এ পথ পরিত্যক্ত, কারণ 'কোটদ্বার' থেকে 'কর্ণপ্রয়াগ' হয়ে এখন 'চামোলি' পর্যন্ত মোটর বাস চলাচল করে। রানীক্ষেত থেকে কর্ণপ্রয়াগ হয়ে সোজা বদরিনাথ ছিল পায়ে হাঁটা একশো সাতাশ মাইল পাহাড়। আজ আর এপথে কেউ যায় না। পুরানো কথা স্মরণ করে আমি গেলুম কিছুদূর এবং দেখতে দেখতে অনেক নীচের দিকে পৌঁছলুম। কিন্তু চিনতে পারলুম না বিশেষ কিছু,—কেননা, চ'লে গেছে অনেককাল। পথ ভেঙে পাথর বেরিয়ে পড়েছে, শ্রী নেই কোথাও। বস্তির চিহ্ন নেই, এক-আধখানা পরিত্যক্ত চালাঘর। কাঠের খুঁটি গেছে ভেঙে, ছাদ ধসে পড়েছে। মানুষের সমাগম সহসা চোখে পড়ে না। নিতান্ত দেহাতী ছাড়া যাত্রীরা কেউ আর এপথ মাড়ায় না। মাইল দেড়েক ঘুরে গিয়ে পাওয়া গেল 'কোটুলি' আর 'কিলকোট' চটি। এক আধটি দোকান, দু-একটি লোক। এ আমার গত জীবনের পথ। জন্মান্তরে এসে আর কিছু চিনতে পারিনে। এই পথে ঝুলি কাঁধে নিয়ে একদা ফিরেছিলুম আনন্দে, ভাবনায়, নৈরাশ্যে, কৌতূহলে—এই পথে ছিল সেদিন অনন্ত বিস্ময় আকাশের অগ্নিবর্ষণে, জ্যোৎস্নাকিরণে, ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে, যন্ত্রণায় আর অগ্নি বাসনায় ভ্রান্তি-প্রমাদে আর আশীর্বাদে—এই দুই দুঃসাধ্য কর্কশ পিপাসার্ত পথ সেদিন ছিল প্রাণের প্রলাপে উদ্বেলিত।

পথ প্রশস্ত ও প্রসারিত কিন্তু তার 'বেণ্ড'গুলি বিপজ্জনক। একটির পর একটি বেণ্ড। শুধু ভয় করে না, সমস্ত মন ও শরীর ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে। একটু অসতর্কতা, একটু অসাবধানতা, হিসাববোধের ঈষৎ গরমিল,—আর রক্ষা নেই। এই বিপজ্জনক পথ আরম্ভ হয় 'মাজখালি' থেকে এবং 'কালিকা' এস্টেট পার হয়ে গেলে পথ সুন্দর, মসৃণ, চিক্কণ—কিন্তু উদ্বেগজনক। প্রতি বিপদ সঙ্কেতের মুখ থেকে গাড়ী যেন নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে। নীচের দিকটায়

অনেক সময় তল দেখা যায় না। যখন দেখা যায়, তখন শীতের দিনেও কপালে ঘাম ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে চিড় পাইনের অরণ্য, মাঝে মাঝে নদীর পাথুরে খাদ,—প্রকৃতি যেন সর্বত্র ইন্দ্রজাল বুনে রেখেছে। বাঁ দিকে মাঝে মাঝে তুষার-শৃঙ্গগুলির সুদূরবর্তী শোভা, মাঝে মাঝে অস্তিত্বের আবরণের বাইরে অমর্ত্য মহিমা, নন্দনের সিংহদ্বার।

দেখতে দেখতে আমরা আবার এলুম প্রায় কোশী নদীর তীরে। এখান থেকে পথ গিয়েছে উত্তর পশ্চিমে। সকালের তরুণ সূর্যের আলো পড়েছে নীল নদীতে। চারিদিকের পাহাড়ের নীচে নদীর সুবিস্তৃত দুই পারের উপত্যকায় চাষের কাজ চলেছে। সভ্যতার সীমানা থেকে অনেকদূর। মহাকাল যেন এখানে স্তব্ধ কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নদীর কোলে কোলে সেই বিচিত্র বর্ণের পাথর, দূরে দূরে চিরকৌমার্যব্রতধারী মহারণ্য দাঁড়িয়ে যেন অতিকায় কালপ্রহরীর মতো। তারই নীচে-নীচে শিশু মানব আর মানবী যুগ যুগান্তরে আপন আপন অন্ন খুঁটে খেয়ে চলেছে। প্রত্যেকটি গৃহপালিত পশুর চোখেও যেন সৌরবিশ্বের সৃষ্টিরহস্যের পরম বিস্ময়।

একে একে 'পাটলিবাজার' 'সাকাব' 'মানান' ইত্যাদি জনপদ পেরিয়ে যাচ্ছি। জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে নরনারী ও শিশুর মুখের প্রকার বদলাচ্ছে। গোরুর মুখের ও শিরদাঁড়ার ভঙ্গী, শিংয়ের আকার ও গঠন, মেয়েপুরুষের মুখের চোয়াল এবং গালের হাড—একে একে ভিন্ন চেহারা নিচ্ছে। দেখতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মঙ্গোলীয় রক্তের ধারা এখানকার হিমালয়ের দক্ষিণ সীমান্তে এসে পৌঁছেছে। পরিবর্তনের এই দ্রুতগতি দেখে অনেক সময় বিস্ময় বোধ করেছি। দেখতে দেখতে আমাদের গাড়ী 'রান্‌খান্‌' ও টানাগ্রাম পিছনে রেখে শিবের মন্দির আর ছোট ছোট বস্তি বেসাতি ছাড়িয়ে চললো অনেকদূর।

হিমালয়ের গহনলোকে এটি একটি বিস্তৃত অধিত্যকা এবং সমস্তগুলো পাহাড়ের দ্বারা অবরুদ্ধ। হিমালয়ের বন্যা এখানে অতি বিস্তারলাভ করে, এবং সেটি ভয়ের কথা। এখান থেকে গাছকাটা গুঁড়ি, পাথর এবং অন্যান্য উদ্ভিদ সম্পদ বাইরে চালান যায়।. সেগুলিকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। জ্বালানি কাঠ এবং পশুর খাদ্যও নিয়ে যায় এখান থেকে।

'সোমেশ্বরে' এসে পৌঁছলুম। এটি ক্ষুদ্র শহর এবং চারিদিকের এই অধিত্যকার মাঝখানে কোশীর প্রান্তে এটি অনেকটা নাভিকেন্দ্রের মতো। সোমেশ্বর হোলো স্থানীয় তীর্থ। নিকটেই সোমেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির। চারিদিকেই পাহাড়, শান্ত। মন্দিরের পিছনে ক্ষেতখামার।

কথায় কথায় আমরা মন্দির দেখতে পাচ্ছি, কথায় কথায় পাহাড়তলীর আশে পাশে শিবস্থাপনা। সোমেশ্বর জনপদের ভিতর দিয়ে আন্দাজ চার মাইল দূরে হোলো 'ছেন্দাগ্রাম'। পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শুভ্রায়তন শিবমন্দির। মাঝপথে পাওয়া গেল একটি 'গান্ধী আশ্রম'। তারপর ছাড়িয়ে চললুম কোশীর একটি পুল। আমরা কোশী ধরেই যাচ্ছি। নদী না পেলে জনপদ সহসা দাঁড়ায় না। জল হোলো জীবনের পরিচয়। একবার উঠছি একবার নামছি। বাঁকে-বাঁকে নদী, পাশে পাশে খদ, চলতে চলতেই চড়াই আর উৎরাই। আমরা 'কৌসানী' পাহাড়ের চূড়ার নীচে দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি। এ অঞ্চল বনময়। নির্জন বনের ভিতর দিয়ে দুই পাহাড়ের ফাঁকে হঠাৎ এক এক সময় দূর আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে তুষারচূড়া, ত্রিকোণাকার 'ত্রিশূলের' শোভা ঝলমলিয়ে উঠছে। ছবির মত মনে হচ্ছে, এ কথা বললে ঠিক বোঝানো যাবে না। নিজেদের চক্ষুকেও অবিশ্বাস করছি, কেন না প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে এমন সুষমামণ্ডিত, এরূপ কচিৎ দেখা যায়। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পাইনবনের কোলে কোলে নেমে গিয়েছে সুন্দর গভীর অধিত্যকা অন্তত পঁচিশ মাইল দূরে। এই পঁচিশ মাইল অধিত্যকা—প্রান্তর আমরা দেখতে পাচ্ছি—যেন এই 'বাতায়ন' থেকে। সেই শস্যপ্রান্তরশীর্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধবলতুষার-মৌলী ত্রিশূলশৃঙ্গের বিরাট সর্বকালজয়ী গৌরব। আনন্দে আমাদের কণ্ঠ শুকিয়ে উঠছে বার বার!

উৎরাই পথ ধ'রে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এক সময়ে আমরা এসে পৌঁছলুম 'গরুড়' শহরে। এইটি হলো এ অঞ্চলের শেষ শহর, এর পর কোনও চাকার গাড়ী তখন পর্যন্ত হিমালয়ের মধ্যে আর প্রবেশ করে না। পাহাড়ের অবরোধের মাঝখানে এই বিশাল 'কাত্যুরী' অধিত্যকা, কিন্তু সমুদ্রসমতা থেকে এটি প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু—সুতরাং একে মালভূমি বলতে অসুবিধা নেই। গরুড়ের বাজারটি বড়। এখান থেকে পশম কাঠ ইত্যাদি চালান যায়। কাছেই 'গরুড়' নদী। আমরা পায়ে হাঁটা পথ ধ'রে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলুম। কাত্যুরী রাজাদের আমল থেকে এই অধিত্যকাকে 'কাত্যুরী' বলা হয়।

তিনটি নদী হিমালয় থেকে নেমে এখানে এসে মিলেছে। 'গরুড়' ছাড়া আর দুটি হোলো 'কোশী' এবং গোমতী। আমরা যাচ্ছিলুম 'বৈজনাথ' মন্দির দর্শনে। প্রায় মাইলখানেক পথ। 'কোশী' পুলের পর এখানে আমরা গরুড় এবং গোমতীর সাঁকো পার হলুম। মানুষের সুখদুঃখ

হাসিকান্নার সংসার ফেলে এসেছি অনেক পিছনে, এসে পড়েছি বিরাটের কোলের মধ্যে—যেখানে দাঁড়িয়ে কোনও একটা মহৎ জীবকে ডাক দেওয়া যায়। উদার অনন্ত গিরিমালা, বিশাল এক একটি অতিকায় পাথর, উপলাহত নীলাভ স্রোতস্বতী, অনন্ত নৈঃশব্দ্যের মধ্যে রঙীন পাখীদলের কূজনগুঞ্জন, এদেরই মাঝখানে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছি। মুখ বুজে চারিদিকে যেন স্তবপাঠ চলছে। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে গোমতীর লৌহসেতু অতিক্রম ক'রে বৈজনাথের মন্দির এলাকায় এসে দাঁড়ালুম। চেয়ে দেখছি হিমালয় থেকে গোমতী প্রথম নেমেছে মর্ত্যে বিশাল গজের বাঁধন ভেদ ক'রে। এই সংযোগস্থলে বৈজনাথের গৈরিকবর্ণ প্রাচীন মন্দির দাঁড়িয়ে। এখানে নদীর দুই পারে মন্দির। বৈজনাথের তল্লীহাটে লক্ষ্মীনারায়ণ, সত্যনারায়ণ ও 'রাক্ষস দেউল'। এখানে মোট সতেরোটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। সমস্তই প্রাচীন পাথরের, জোড়জোড় একেবারে আলগা—বড একটা ভূমিকম্প, গোমতীর একটা বড় বন্যা, তারপর হয়তো আর কিছু থাকবে না। কিন্তু এইভাবেই নাকি চলে এসেছে প্রায় সাত-আট শো বছর। এ মন্দির প্রথম নির্মিত হয় চন্দ্রবংশের কোন এক রাজার আমলে। তার কোনও ইতিহাস আছে কিনা জানিনে। যেমন কাংড়ায় দেখে এসেছি বৈজনাথকে,—এখানেও ঠিক তেমনি। বৈজনাথকে 'বৈদ্যনাথ'ও বলা হয়। এ ছাড়া রয়েছে 'বামনী, ও কেদারনাথের' দেউল। ভিতরে একটি শ্বেতবর্ণা পার্বতীর মূর্তি, কেউ বা বলেন অন্নপূর্ণা—মূর্তিটি জয়পুরী ছাঁদে নির্মিত—কিন্তু এমন সুশ্রী সুন্দর ও পেলব শ্বেতপাথরের মূর্তি হিমালয়ের মধ্যে আর কোথাও দেখেছি কিনা মনে পড়ে না। বৈজনাথ এখানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। নিকটবর্তী পাহাড়ে এক মাইল থেকে দেড় মাইলের মধ্যে 'রানচুলকোট' দুর্গ, 'ভ্রামরীদেবী' ও 'নাগনাথের' মন্দির। বৈজনাথ থেকে বাগেশ্বর হোলো তেরো মাইল দক্ষিণ পূর্ব কোণে—সেই পথ গিয়েছে গাড়োয়ালে। চব্বিশ বছর আগে রুদ্রপ্রয়াগের আশ্রমে ব'সে সন্ন্যাসিনী নারায়ণগিরিমায়ি আমাকে 'বাগেশ্বর' হয়ে কৈলাসের পথ নির্দেশ করেছিলেন। এই পথ হোলো সেই। এখান থেকে সোজা উত্তরে দুস্তর গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে একটি পথ গিয়েছে কর্ণপ্রয়াগের দিকে—যেখানে 'পিন্দার' গঙ্গা অলকানন্দার সঙ্গম। 'বাগেশ্বর' জনপদটি হোলো এই গোমতী এবং সরযূর সঙ্গমস্থলে অতি রমণীয় অঞ্চল। সেই সঙ্গমের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বাগনাথ, ভৈরবনাথ, গঙ্গামাতা এবং দত্তাত্রেয় মন্দির। সরযূর উপরে অত্যাশ্চর্য প্রকৃতির শোভার মধ্যে রয়েছে লছমনঝুলার মতো কাছিবাঁধা

সাঁকো—তারই নীচে সরযুর গর্ভে রয়েছে অতিকায় 'মার্কণ্ডেয় শিলা', যেখানে তপস্থার আসনে বসে ঋষি মার্কণ্ডেয় রচনা করেছিলেন 'দুর্গাসপ্তসতী পুরাণ'। লোকপ্রবাদ এই, সরযুনদীর সঙ্গমস্থলে 'দক্ষ হিমবান' তাঁর কন্যা দুর্গার সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ দিয়েছিলেন। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে বাগেশ্বরে ভূটিয়াদের বিরাট মেলা বসে। বাগেশ্বর থেকে নদীর তীরে তীরে উত্তর পথ চলে গেছে 'কাপকোটের' দিকে প্রায় চল্লিশ মাইল। সেখান থেকে অভিযাত্রীরা যায় পিন্দারি হিমবাহের দিকে। বাগেশ্বরের মনোরম উপত্যকা পরবর্তীকালে আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তিব্বত থেকে বিপুল পরিমাণ সম্ভার এতকাল এখানে এসে পৌঁছত।

বাগেশ্বরের পরেই ওঠে 'পাতাল-ভুবনেশ্বর', এবং 'যজ্ঞেশ্বরের' কথা। যজ্ঞেশ্বর আলমোড়া থেকে আঠারো মাইল দূরে, এবং এটিও দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। এখানকার পাহাড়ে পাহাড়ে আছেন অনেক তপস্বী। মৃত্যুঞ্জয়, নবগ্রহ, মার্তণ্ড ইত্যাদির মন্দির এখানকার প্রধান আকর্ষণ, এবং শিবরাত্রি ও বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে মেলা বসে। একদা মুসলমানরা এই জনপদটিকে আক্রমণ করে, তাতে অনেক মূর্তি ধ্বংস হয়। 'পাতাল-ভুবনেশ্বর' এখান থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল পার্বত্য পথ। কয়েকটি প্রাচীন মন্দির ভিন্ন সেখানে আছে একটি মস্ত গুহা, তার মধ্যে নানা দেবমূর্তি খোদিত। অন্ধকার গুহার ভিতরকার কঠিন ঠাণ্ডায় অদ্ভুত রকমের প্রাচীন পাথর ও ধাতবের গন্ধ। তারই মধ্যে দেওয়ালে দেওয়ালে মহাভারতের কয়েকটি কাহিনীও উৎকীর্ণ।

বৈজনাথ থেকে কর্ণপ্রয়াগের দিকে যাবার যে পথটির কথা বলছিলুম, সেটি ক্রমশ দুস্তর গিরিমালার ভিতর দিয়ে উঠেছে। মাইল দশেকের পর গোয়ালদম নামক একটি পার্বত্য জনপদ পাওয়া যায়। 'গোয়ালদমের' উত্তরপ্রান্তে সম্ভবত মূল পিন্দার গঙ্গার ধারা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিয়ে পুনরায় উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এই পথটি ধীরে ধীরে চলে গেছে নদী পার হয়ে। পূর্বদিক থেকে পিন্দার গঙ্গারই অপর একটি প্রশস্ত উপনদী এসেও এখানে মিলেছে। উত্তুঙ্গ এবং প্রায় দুঃসাধ্য শৈলশ্রেণীর ভিতর দিয়ে এই দুর্গম পথ চলে গেছে চড়াইয়ের পর উত্তীর্ণ হয়ে ত্রিশূল পর্বতের তুষার হিমবাহের কোলে। এই অঞ্চল বৈজনাথ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল উত্তরে। ত্রিশূলের দক্ষিণে হোলো পিন্দার গঙ্গা ও হিমবাহ এবং উত্তরে ঋষিগঙ্গা,—যে গঙ্গা গিয়ে মিলেছে যোশীমঠের নীচে ধবলী গঙ্গা ও বিষ্ণুগঙ্গায়। ভারতের সীমানার অন্তর্গত হিমালয়ের যে কয়টি উচ্চতম চূড়াকে আমরা জানি, তাদের মধ্যে তিনটিকে পাই এখানে কাছাকাছি।

প্রথমটি ত্রিশূল,—উচ্চ ২৩,৫০০ ফুট, দ্বিতীয়টি নন্দাদেবী,—২৫,৬৪৫ ফুট এবং তৃতীয়টি হোলো দ্রোণগিরি,—২৩,১৮৪ ফুট। কাশ্মীরের নাঙ্গা ও কারাকোরামকে (কৃষ্ণগিরি) বাদ দিলে বর্তমান ভারতীয় হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর হোলো, নন্দাদেবীর চূড়া।

সম্প্রতি ত্রিশূল পর্বতের হিমবাহের প্রান্তবর্তী 'রূপকুণ্ড' নামক একটি তুষার সরোবরকে নিয়ে ভারত গভর্নমেণ্ট নাড়াচাড়া করেছেন। 'রূপগঙ্গার' তীরবর্তী এই তুষারাচ্ছন্ন রূপকুণ্ডের আশেপাশে বহুসংখ্যক নর-কঙ্কালের ভগ্নাবশেষ (Skeletal remains) সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কঙ্কালগুলি বছরের মধ্যে দশমাসেরও বেশী বরফের নীচে সমাধিস্থ থাকে; কেবল ভাদ্র-আশ্বিন মাসে তুষারবিগলনকালে তারা দৃশ্যমান হয়। এরা কতকাল আগের মানুষ কেউ জানে না। কবে এদের মৃত্যু ঘটেছে তা'ও অজ্ঞাত। অনেকের ধারণা, এরা পরাজিত সৈন্যসামন্তের দল,—পলায়মান অবস্থায় এদের উপরে অতিকায় হিমবাহের আক্রমণ ঘটে। আবার অনেকে বলে, এরা ছিল তীর্থযাত্রী। ত্রিশূল পর্বতের পাদদেশে 'হোমকুনি' তথা 'ত্রিশূলী' নামক অঞ্চলে গিয়ে এই তীর্থযাত্রীর দল নন্দাদেবী তথা গৌরী-দেবীর পূজা দিতে চলেছিল, এমন সময় তারা তুষারঝঞ্ঝা ও বর্ষণের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বৈজনাথ থেকে ত্রিশূল পর্বতের দিকে আজও প্রতি বৎসর একদল তীর্থযাত্রী নন্দাদেবীর মূর্তিসহ শোভাযাত্রা নিয়ে যায় 'ত্রিশূলী' তীর্থে। এদের নাম 'নন্দজাত'। রূপকুণ্ড হ্রদের নিকটবর্তী রূপগঙ্গার তুষারবিগলিত ধারায় অবগাহন করা এদের লক্ষ্য। এরা কখনও বা সেখানে পৌঁছয়,—পৌঁছয় অতি কম, কেননা তুষারবর্ষণের সঙ্কেত পেলেই অভিযানে বিরত হয়। বিগত ত্রিশ বছর আগে একটি যাত্রীদল সাফল্যলাভ করেছিল। তারপর আবার একটা প্রচেষ্টা হয় ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে—কিন্তু তারা সমর্থ হয়নি। এই 'ত্রিশূলী' তীর্থের অন্তর্গত 'রূপকুণ্ডের' ধারে শুধু যে ওই কঙ্কালগুলি প'ড়ে আছে তাই নয়, ওদের নিয়ে নানাবিধ প্রবাদ, জনশ্রুতি এবং লোকসঙ্গীতও নীচেকার অঞ্চলে প্রচলিত। ওরা যে তীর্থযাত্রী ছিল এ বিষয়ে স্থানীয় লোকের মনে কোন সন্দেহ নেই। সম্প্রতি ভারত গভর্নমেণ্টের নৃতত্ত্ববিভাগের পরিচালক ডাঃ এন দত্ত-মজুমদার মহাশয় সদলবলে দ্বিতীয়বার 'রূপকুণ্ড' এলাকায় গিয়ে কতকগুলি চর্মাবৃত কঙ্কাল সংগ্রহ ক'রে কলিকাতায় এনেছেন। এগুলি নাকি দুশো বছরের পুরনো, এবং তুষার আবরণের জন্য আজও নষ্ট হতে পারেনি। কিন্তু তিনি সর্বপ্রকার সংবাদ গবেষণা করে এইটি সিদ্ধান্ত করেন যে, রূপকুণ্ডের নরকঙ্কালগুলি 'ত্রিশূলী' তীর্থেরই অভিযাত্রী ছিল। দুই

শতাব্দী পূর্বে এই তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে ছিল সালঙ্কারা বহু নারী ও শিশু, কয়েকজন মেষপালক ও কয়েকটি জন্তু। তাদের সঙ্গে তীর্থযাত্রীর পক্ষে প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রাদি ও লাঠি ইত্যাদিও ছিল। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি তিনি অন্যান্য তথ্যাদিও প্রকাশ করেছেন। এই তদন্ত এবং গবেষণার ব্যাপারে ভারতীয় নৃতত্ত্ববিভাগের কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই অন্যান্য ব্যবস্থাদিও অবলম্বন করবেন শোনা যাচ্ছে। কৈলাস পর্বতের মধ্যে যেমন তুষারাবৃত সরোবর 'গৌরীকুণ্ড' দেখা যায়, এখানেও ঠিক তেমনি। রূপকুণ্ডও এক প্রকার চ'মে থাকে বছরের অধিকাংশকাল। তবে গৌরীকুণ্ডের উচ্চতা ১৮,৫০০ ফুট, রূপকুণ্ড ওর চেয়ে প্রায় দেড় হাজার ফুট কম। বৈজনাথ থেকে 'গোয়ালদম' হয়ে 'রূপকুণ্ড' পৌঁছতে পায়ে হাঁটা পথে তিন চার দিন লাগে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল উঁচু পথ। সম্প্রতি একটি সংবাদ শুনছি, এলাহাবাদের একটি অভিযাত্রীদল রূপকুণ্ডের কঙ্কালাকীর্ণ স্থলে পৌঁছে 'ব্রহ্মকমল' প্রমুখ শতাধিক বর্ণের দুষ্প্রাপ্য ফুল ওখান থেকে সংগ্রহ করেছেন।

'কৌসানীর' নীচে এসে আমরা দাঁড়ালুম। পথ চ'লে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। চারিদিকে নিঃঝুম পার্বত্য প্রকৃতি। সামনেই একটি ছোট পোস্ট আপিস, তার পাশে ছোট ছোট চালাঘরে দুটি দোকান। একটিতে চা পাওয়া যায়। তাদেরই পিছন দিয়ে পাহাড় উঠে গেছে উপর দিকে। দোকানের সামনেই একটি চশমাপরা শীর্ণকায় পথ-প্রদর্শককে পাওয়া গেল।

শশাঙ্ক এবং আমি চললুম চড়াইপথ ধ'রে। চড়াই সামান্য, হয়তো মোট শ' তিনেক ফুট উঁচু হবে। চিড়গাছের জটলার ভিতর দিয়ে দীর্ঘপথ চূড়ার দিকে উঠেছে। উপর দিকে উঠে গিয়ে আমরা যে বিপুল ঐশ্বর্যের সন্ধান পাবো, নীচের দিকে দাঁড়িয়ে আমরা ঠিক অতটা আন্দাজ করতে পারিনি। নীচের দিকে যে সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে ছমছমে ভাবটি ছিল, উপর দিকে উঠে ধীরে ধীরে আকাশ যেন তার সমস্ত অর্গল খুলে সামনে দাঁড়ালো। সেই আকাশপথ কুমায়ুনের গিরিশৃঙ্গচূড়ায় গিয়ে না দাঁড়ালে ঠিক বুঝতে পারা যাবে না। অবশেষে আমরা একটি মালভূমিতে এসে পৌঁছলুম, এবং সেই সমগ্র মালভূমিটি হোলো একটি বৃহৎ সুসজ্জিত এবং আধুনিক ডাকবাংলোরই প্রাঙ্গণ। মানুষের সমাগম কোথাও দেখছিনে। নীচে থেকে উপরে ওঠার আগে ছিন্নজীর্ণ পোশাকপরা যে কৃশকায় লোকটি আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল, তার চোখে মোটা চশমা,—এবং এত মোটা যে, চোখ দুটো খুব ছোট্ট দেখায়। চেহারা উপবাসে আর অভাবে শীর্ণ এবং অকালবার্ধক্যে একটু আনত। কথা

বলে কম, এবং অনেকটা যেন আত্মগত। লোকটি পথ দেখিয়ে যখন আমাদের ডাকবাংলোর সিঁড়ির উপরে তুললো, তখন জানলুম সে এখানকার খানসামা তথা চৌকিদার। লোকটি যেমনই শান্ত, তেমনই নিরীহ।

কিন্তু অনেক বড় বিস্ময় আমাদের জন্য সঞ্চিত ছিল যখন আমরা উত্তর দিকে ফিরে দাঁড়ালুম। বস্তুত, সমুদ্রে সাঁতার দিলে সমুদ্রের শোভা উপলব্ধি করা যায় না। হিমবাহ দেখেছি, তুষারনদী অতিক্রম করেছি, তুষারলোকের মধ্য রাত্রিবাসও করতে হয়েছে বার বার, —কিন্তু তখন তার শোভা-সৌন্দর্য উপলব্ধি করা অপেক্ষা আত্মরক্ষা করার দিকেই ঝোঁক থাকে অনেক বেশী। কতকটা দূরে দাঁড়িয়ে পরম রমণীয় চিত্রপট না দেখলে প্রকৃত রসের আস্বাদ পাওয়া যায় না। গগনচুম্বি ত্রিশূলশিখর যে আমাদের আলিঙ্গনের মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে, নীচে থাকতে আমরা বুঝতে পারিনি। কিয়ৎক্ষণের জন্য দুজনেই আমরা হতচেতন ও বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমরা যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। খানসামা আমাদের মানসিক অবস্থা অনুধাবন করে তখনকার মতো চ'লে গেল।

ডাকবাংলোর ভিতরে ঢুকে দেখি কলকাতার শ্রেষ্ঠ বোর্ডিং হাউসকেও হার মানায়। বড় বড় আলমারি, বড় বড় ড্রেসিং টেবল্, অনেকগুলি খাট পালঙ্ক, অসংখ্য কাবার্ড প্রেস, মস্ত বড় ডিনার টেবল্, ভালো ভালো কুশন্ চেয়ার, মাথার উপর টানা পাখা, সুসজ্জিত বাথরুম, বহুমূল্য কার্পেট দিয়ে প্রত্যেক হল এর মেঝে মোড়া। যেখানে যেটি দরকার। জানলা দরজা আসবাব—প্রত্যেকটি যেন ঝলমল করছে। আমরা দুজনে মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে বারান্দায় এসে দাড়ালুম। এটি গোলাকার পাকা বারান্দা এবং আমাদের বিশ্বাস, এই একটি বারান্দায় ব'সে বাকি জীবন অতি আনন্দে কাটানো চলে। কখনও দুঃখ পেয়েছি, কেউ ব্যথা দিয়েছে, কারও কথার আঘাতে কখনও বুকের মধ্যে ঘা লেগেছে, কারও নিষ্ঠুর বঞ্চনায় জীবনকে কখনও শূন্য মনে হয়েছে,—এই বারান্দা থেকে উদার হিমালয়ের দিকে চেয়ে একটি পলকের মধ্যে মানুষের বিরুদ্ধে সমস্ত নালিশ যেন মুছে নিয়ে গেল। নীচের পৃথিবী নীচেই প'ড়ে থাক, এই স্বর্গলোক থেকে বিদায় নেবার আর ইচ্ছা রইলো না।

খানসামা এসে চা দিয়ে আহারাদির ব্যবস্থা পাকা ক'রে গেল।

চূড়ার উপরে বারান্দায় ব'সে আমাদের সময় কেটে চললো। ঠিক এই বারান্দায় এবং এই ইজিচেয়ারে ব'সে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব এগারো দিন অতিবাহিত করেছিলেন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে—তিনি মহাত্মা

গান্ধী। এই বারান্দাটিতে ব'সে-ব'সে অতি যত্নে তিনি তার 'অনাসক্তি যোগ' গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছিলেন। বোধ হয় অনাসক্ত ভাবনার এমন একটি নিভৃত ক্ষেত্র হিমালয়ে আর কোথাও নেই, অন্তত এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ঈশ্বরকে যারা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়, এখানকার সন্ধান বোধ হয় তারা আজও পায়নি। যদি তাঁকে ডাকতেই হয়, তবে এখান থেকে ডাকামাত্রই তাঁর কানে উঠবে। সামনেই ঠিক বারো মাইল শূন্যপথে গেলে ত্রিশূলের শুভ্র চূড়া। পশ্চিম দিকে কেদার ও বদরিনাথ, গৌরী আর হস্তী, পূর্বে নন্দাদেবী, দ্রোণগিরি আর নন্দকোট। দেবতারা দল বেঁধে এক-একটি সিংহাসনে বসে রয়েছেন। সমগ্র হিমালয় ভ্রমণকালে এত স্বাচ্ছন্দ্য, এমন নিবিড় আনন্দ ও সীমাহীন অখণ্ড স্তব্ধতা আর কোনওদিন কোথাও পাইনি।

খানসামা এসে সামনে দাঁড়ালো। মালভূমির প্রান্তেই ওর বাসস্থান। ওর কে আছে আর কে নেই—প্রশ্ন করিনি। লোকটাকে এবার দেখলুম চোখ তুলে। বয়স কত ঠাহর করা যায় না। পঁয়তাল্লিশ থেকে পয়ষট্টি কিছু একটা হবে। গায়ের কোট আর পাজামা ছিন্নভিন্ন। চেহারায় কোনও চাঞ্চল্য নেই, কিছুমাত্র উদ্বেগের চিহ্ন নেই। মোটা চশমার ভিতর থেকে ছোট ছোট ধারালো চোখ দেখলে সমীহ হয়। অথচ চাহনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত, কপালে গভীর চিন্তার রেখা, এলোমেলো কাঁচাপাকা চুল, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। গান্ধীজির সম্বন্ধে প্রশ্ন করলুম, মুখে চোখে একটি চাপা গৌরব ফুটলো, কিন্তু ওর সংযম দেখে আমরা অবাক। গান্ধীজি এসেছিলেন, ওর বাবা তখন বেঁচে। কিন্তু ও থাকতো গান্ধীজির তদারকে। বারান্দায় গান্ধীজির আসন পেতে দিত, বিছানা করতো, দুধ আনতো নীচের থেকে, স্নানের জলের ব্যবস্থা করতো, বই কাগজ গুছিয়ে রাখতো, এবং রাত্রে পাহারায় থাকতো। ওর বয়স তখন কুড়ি-বাইশ। ওর কাঁধে হাত রেখে গান্ধীজি বেরিয়েছেন অনেকবার। লোকটা ধীরে ধীরে কথা বলছে, কিংবা কাঁদছে বলা কঠিন, ওর ওই আনম্র চেহারার মধ্যে কোথাও যেন রয়েছে একটি দার্শনিক আত্মগোপন ক'রে, আমরা মন দিয়ে তাকে স্পর্শ করতে পারছি। লোকটা চেয়ে ছিল 'ত্রিশূলের' দিকে। কৈলাসের হরপার্বতীর কথা তুলতেই সে ঈষৎ উৎসাহ পেলো। তীর্থযাত্রীদের প্রতি তার কী গভীর দরদ! দেখিয়ে দিল কেদারনাথ আর বদরীনাথ আর নন্দাদেবী। তারপর মৃদুকণ্ঠে নিজের ভাষায় বলতে লাগলো, মানুষ নিজের দুঃখ আর অভাব নিজেই সৃষ্টি করে, বেদনা পায়, বিবাদ বাধায়,

আবার অনুশোচনায় নিজেই কাঁদতে বসে। মানুষের জন্য মানুষ আত্মোৎসর্গ করছে, আবার মানুষই মানুষের দুর্গতি টেনে আনছে। গান্ধীজির পায়ের কাছে নৈবেদ্য দিয়ে মানুষ তাঁকে বললে, তুমি মহাত্মা, তুমিই দেশের পিতা! সেই মানুষই আবার মহাত্মাজীকে হত্যা করে সবাই মিলে কাঁদতে বসলো।

চুপ ক'রে লোকটার শান্ত আলাপ শুনছিলুম। ভাবছিলুম লোকটার বয়স হাজার-হাজার বছরেরও বেশী। সভ্যতার ছেলেখেলা যতদিন ধ'রে চলেছে লোকটা যেন তার চেয়েও বৃদ্ধ। যখন চ'লে গেল, আমরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলুম।

কৌসানীর চূড়া এবং স্বামী আনন্দের কথা শুনেছিলুম শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আলমোড়ায়। স্বামীজি থাকেন এখানে স্থায়ীভাবে তাঁর 'গঙ্গাকুটীরে'। খানিকটা অরণ্যপথ অতিক্রম ক'রে প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে তাঁর ওখানে গিয়ে হাজির হলুম। তাঁর দেখা পেলুম অতি সহজে। বয়স বোধ করি সত্তর হয়নি। ধবধবে চেহারা। তিনি বোম্বাইয়ের অধিবাসী, এবং প্রকৃত নাম হোলো 'অমৃতলাল শেঠ'। বাণিজ্য-জগতে তাঁর প্রচুর খ্যাতি। স্বামী আনন্দ গান্ধীজির একজন বিশেষ গুণমুগ্ধ অনুরাগী, এবং গান্ধীজির অপমৃত্যু কাল অবধি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধ'রে গান্ধীজির সঙ্গে তিনি ছিলেন। কিন্তু স্বামীজি রক্তের চাপের রোগী এবং গান্ধীজির পরামর্শেই তিনি এখানে রোগমুক্ত হবার জন্য আসেন। গান্ধীজির মৃত্যু-সংবাদে তাঁর শরীরের অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, তিনি শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন। অতঃপর তাঁর প্রিয় বন্ধু এবং গান্ধীদর্শনের সুযোগ্য ভাষ্যকার মাশরুওয়ালার মৃত্যুসংবাদ যেদিন তাঁর কানে এলো, সেইদিন থেকে স্বামী আনন্দ এই কৌসানীতে তাঁর চিরস্থায়ী বাসা বেঁধেছেন। হিমালয়ের এই পরমাশ্চর্য শোভা ছেড়ে তিনি আর কোথাও যেতে চান না। তিনি তাঁর বৈষয়িক জীবন সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন। অধ্যাত্ম আদর্শের দিক থেকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করেন। এখানে তিনি দুধ ছাড়া অন্য কোনও খাদ্য স্পর্শ করেন না। তাঁর বাকি জীবনের একমাত্র কামনা হোলো, শান্তি সাধনা। পড়াশুনোয় তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছেন।

অনেক গল্প তিনি করলেন আমাদের সঙ্গে তাঁর বারান্দায় এই ত্রিশূলের চূড়ার সামনে ব'সে। বোম্বাই থেকে তাঁর কয়েকজন আত্মীয় মহিলা ও

যুবক তাঁকে দেখতে এসেছিলেন, সেজন্য কিছু সোরগোল সেদিন ছিল। আমাদের জন্য চা বিস্কুট ইত্যাদি এলো। বললেন, এসব কিন্তু এ তল্লাটে পাওয়া যায় না, ওরা এসব সঙ্গে এনেছে—ওই ছেলেমেয়েরা। আমার এখানে কিছু নেই। কিছু সঙ্গে আনিনি, কিছু সঙ্গেও রাখবো না যাবার আগে।

স্বামীজি আসবার আগে আমাদের হাতে হিমালয়ের কয়েকখানি ছবি উপহার দিলেন। এমন সুশিক্ষিত, ভদ্র, আদর্শবাদী এবং অমায়িক সজ্জন সহসা কোথাও চোখে পড়ে না। মনে মনে বহুবার প্রণাম জানিয়েছিলুম।

আসবার সময় তিনি বললেন, ত্রিশূলের ওপরে মেঘ করেছে, সেজন্য মন খারাপ কোরো না,—ও মেঘ থাকবে না, ভোর রাত্রের আগেই স'রে যাবে।

সেদিন ছিল রাসপূর্ণিমা। দেওদারের অরণ্যের উপরে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে নীল আকাশে বড় বড় তারা। কয়েক টুকরো মেঘ যেন অলকাপুরীর দিকে ভেসে ভেসে চলেছে। চন্দ্র জ্বলছে। জ্যোৎস্নায় ফিন্ ফুটছে তুষারলোকে। সেই আনন্দলোকে পথ চিনে চিনে আমরা ডাকবাংলোয় ফিরে এলুম। সেই রাত্রি ছিল অতি শীতল। আমাদের বিবাগী মনের ভাবনা জ্যোৎস্নায় দিশাহারা হয়ে হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় কেঁদে বেড়াতে লাগলো। ঘুম এলো না পোড়া চোখে। মেঘ বোধ হয় আর কাটলো না এবার। আমাদের নিরাশ চক্ষে অবসাদ এলো।

তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলুম বিছানার মধ্যে। রাত যখন প্রায় দুটো বাজে, হঠাৎ শশাঙ্ক বারান্দা থেকে চীৎকার ক'রে ডাকলো। ধড়মড়িয়ে উঠে ছুটে এলুম বারান্দায়। কেন, কি হয়েছে? কোনও বিপদ?

সহসা দুজনে চুপ। মেঘের আবরণ স'রে গেছে। দেবাদিদেব ত্রিশূলী চোখ মেলেছেন মহাশূন্যের বিপুল জ্যোৎস্নালোকে। পলকের মধ্যে দেখে নিলুম, যা কখনও দেখিনি কোনও দিন।

উভয়ে আমরা স্তব্ধ, হতবাক। আনন্দের নিবিড় যন্ত্রণায় শুধু থরথর ক'রে কাঁপছিলুম। স্বামী আনন্দের শুভ কামনায় যাত্রা আমাদের সার্থক হয়েছে।

পরদিন বিদায় নেবার আগে খানসামা এসে দাঁড়ালো। আমরা তার হাতে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে পাওনা ইত্যাদি চুকিয়ে দিলুম। পাওনা পেলেই তার চলবে। বকশিশ চায় না, দাবি জানায় না। কিন্তু যখন নিতান্তই তার সুখ্যাতিতে আমরা

একটু উচ্ছ্বসিত হলুম, তখন সে একটি খাতা বার করে বললে, এখানে আপনাদের কেমন লাগলো, একটু লিখে রেখে যান্।

সেটি হোলো ডাকবাংলোর 'লগবুক'। লিখতে লিখতে একবার প্রশ্ন করলুম, তোমার নাম কি ভাই?

লোকটি সবিনয়ে বললে, হবিব আহমেদ।

তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা বিদায় নিলুম।

॥ ৯ ॥

শূন্যলোকে বিমানযোগে চলেছি কোচবিহারের দিকে।

আকাশপথে প্লেন থেকে দেখতে পাচ্ছিলুম দিগ্বলয়প্রসারিত হিমালয়ের অন্তহীন শুভ্র কেশরজাল। সংখ্যাতীত শ্বেতচূড়ার উপরে পড়েছে তরুণ সূর্যরশ্মি, গলিত গৈরিক স্বর্ণপ্রবাহ নামছে দেবাদিদেবের কপাল বেয়ে। ডিসেম্বর শেষের একটি প্রভাত। তখনও ঘুম জড়িয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গে। পৃথিবী আমাদের অনেক নীচে, রাত্রির শেষ প্রহর তখনও তার বিশাল ছায়া মেলে রয়েছে। মহাব্যোমের অনন্ত শূন্য থেকে শুধু চেয়ে ছিলুম শুভ্র নীল রক্তিম হিমালয়ের পরম বিস্ময়ের দিকে। ভেসে যাচ্ছিলুম আকাশপথে। নীচে অনন্ত নিদ্রা, পৃথিবীর পাখী তখনও ঢুলছে।

কোচবিহার বিমানঘাটি থেকে তুষারমৌলী 'সিংহচুলা'কে দেখা যায়। বেলা বেড়েছে। রৌদ্রে ঝলমল করছে তুষারের স্থির তরঙ্গ। কেউ ওটাকে বলে, 'চেনচুলা', কেউ বা বলে 'সিনচুলা'। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ওই সিনচুলার নীচে দাড়িয়ে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারত গভর্নমেণ্ট ভুটানের সঙ্গে সন্ধি করেছিল। ইংরেজ কেবল যে রাজত্ব জয় করেছিল তাই নয়, রাজ্যের আশপাশে বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বতকেও তারা বিশ্বাস করেনি। কে জানে কোথা দিয়ে কখন বাঘের থাবা বেরিয়ে আসে। সেই কারণে নিস্পৃহ প্রতিবেশীর শক্তির পরিমাণ পরীক্ষা করার জন্য তারা তার গায়ে খোঁচা দিয়ে দেখতো তার দৌড় কতদূর। নেপাল, তিব্বত, সিকিম, ভূটান, গাড়োয়াল, আফগানিস্থান,—সর্বত্র ওই একই কথা। সুবিধা ঘটলে রাজ্য কেড়ে নিত, আর নয়ত একপ্রকার অপমানজনক সন্ধিচুক্তি চাপিয়ে দিত তাদের ঘাড়ে।

ভুটানের দিকে যাচ্ছিলুম।

সেই সিনচুলা চুক্তি, তারপর থেকে ভুটানের খবর আর তেমন পাওয়া যায়নি। পূর্বোত্তর ভারতের সীমানায় আঠারো হাজার বর্গমাইল ব্যাপী এই

পার্বত্য ভূভাগ আজও এই বৈজ্ঞানিক যুগে অন্ধকারাচ্ছন্ন রয়েছে—এটি কৌতুকের বিষয় বৈকি। চাকার গাড়ী আজও ভূটানের কোনও অঞ্চলে ঘুরছে না, এটিও বিস্ময়। ভারতের সঙ্গে এতকালের মধ্যে তার কোনও প্রকার যোগাযোগও নেই, এর জন্য উদ্বেগও কিছু দেখা যায় না। শোনা যায় মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্র আজও সেখানে অব্যাহত। রাজা সেখানে সর্বাধিনায়ক। মন্ত্রী নেই, বিচারালয় নেই, রাজনীতিক দল নেই, শাসক সম্প্রদায় নামক কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই। শুধু আছেন রাজা, আছেন জনকয়েক রাজারই প্রতিনিধি,—আর আছে প্রজাসাধারণ। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে ভূটানরাজ মহামান্য 'জিগমা ওয়ান্‌চুক দোরজী' ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন জানিয়েছেন কয়েকটি বিষয়ে সাহায্যের জন্য। তাদের মধ্যে প্রধান হোলো শিক্ষা, যোগাযোগপথ এবং ঔষধপত্রাদি। রাজা মহাশয় ভূটানে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করতে চান। এতকাল অবধি ভূটানের সঙ্গে তিব্বতের আত্মীয়তা চ'লে এসেছে অব্যাহত ভাবে। উভয়ে একধর্মী। উভয়েই সমগোত্রীয়,—যেমন সিকিম। উভয়ের প্রাণের ভাষার সঙ্গে উভয়েই পরিচিত। ফলে, তিব্বত এবং ভূটানের মধ্যে এতকাল ধ'রে যে অন্তরঙ্গ রাজনীতিক, অর্থনৈতিক, এবং লোক ব্যবহারিক সম্পর্ক চ'লে এসেছে, সেটি দুই রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার দুইজনের মধ্যেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ, তার একজন হ'লেন দালাই লামা এবং অন্যজন হলেন ভূটানরাজ। ভাষায়, জীবনযাত্রায়, সমাজচিন্তায় ভারতের সঙ্গে ভূটান-তিব্বত সিকিমের মিল হয়নি মধ্যযুগে, এর ওপর দুস্তর পার্বত্য ভূভাগ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। সেই জন্য সামাজিক এবং রাষ্ট্রনীতিক ভারতের নিকট ওরা আজও একপ্রকার অপরিচিত রয়ে গেছে। সিকিমের মতো তিব্বতের সঙ্গে ভূটানের সম্পর্ক হোলো বৈবাহিক। আচার ব্যবহার, ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক রীতি প্রকৃতি,—এদের একটু আধটু ব্যতিক্রম ছাড়া,—তিব্বত, ভূটান এবং সিকিম প্রায় একাকার। কিন্তু আধুনিক জগতের সঙ্গে সিকিম যতটুকু ভয়ে ভয়ে মিশেছে, ভূটান তাও করেনি। ভূটান অনুসরণ ক'রে এসেছে তিব্বতকে। রাস্তাঘাট কোথাও বানায়নি, পাছে বাইরের লোক গিয়ে ঢোকে। কারো সঙ্গে সে লেনদেনের চুক্তি করেনি, কারো সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়নি, পাছে সামাজিক মেলামেশা ঘটে এবং বাইরে থেকে ভূত-প্রেত-পিশাচ ইত্যাদি গিয়ে ভূটানে বাসা বাঁধে। রুচি, প্রকৃতি এবং বিদ্যাবুদ্ধির সুর মেলে ব'লেই তিব্বতের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল নিবিড়। ভারতবর্ষ থেকে অত্যুগ্র আলোক

রশ্মিকণা যদি কখনও ঠিকরে গিয়েছে ভূটানে, তবে রাজার চোখে ধাঁধা লেগেছে, তিনি সযত্নে সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

কিন্তু সম্প্রতি ভূটানরাজ 'জিগমা দোরজি' মহাশয় তাঁর প্রাসাদভবনের উত্তরমুখী বাতায়ন থেকে উত্তরের হাওয়ায় কেমন যেন বিষাক্ত গন্ধ পাচ্ছিলেন। হাওয়া উঠেছে চীন থেকে তিব্বতে এবং তিব্বতের 'সান পো' উপত্যকা পেরিয়ে সেই হাওয়া আসছে ভূটানের উত্তুঙ্গ এবং ভয়ভীষণ বন্য পাহাড়ের আশে পাশে। তিব্বত থেকে ছোট বড় নানা পাথুরে নদী নেমে আসছে ভূটানের শিরা-উপশিরায়, কিন্তু বর্তমান তিব্বতের নদীর জলকেও সম্ভবত ভূটানরাজ বিশ্বাস করতে পারছেন না। কি জানি ওই সব নদীর জলেও হয়তো বা হিমালয়োত্তর রাজনীতির বিষাক্ত বীজাণু ভূটানের রক্তে প্রবেশ করতে পারে। এ কারণে মহামান্য ভূটানরাজ বরাবরই উৎকর্ণ ও সতর্ক জীবন যাপন করছিলেন। এবার সম্প্রতি একথা তাঁকে ভাবতে হচ্ছিল, তিব্বতের সঙ্গে তিনি তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করবেন কিনা।

কিন্তু সম্পর্কটা রয়ে গেছে তিনশো বছরেরও বেশী, এবং খুব সম্ভব এমন একটি যুগ থেকে যেটি মধ্যযুগীয় ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া কঠিন। এমন একটি কাল ছিল প্রাক-পাঠান তথা বৌদ্ধ হিন্দু আমলে,—বিশ্বাস করা যাক এক হাজার বছরেরও অনেক আগে—যখন রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ আঞ্চলিক সীমানা নিয়ে অতটা কেউ মাথা ঘামায়নি, এবং যে যুগে ভারত গান্ধার-তিব্বত-নেপাল সিকিম-ভূটান-ব্রহ্মাদি ছিল একটি অখণ্ড এবং অবিভক্তিবাদী রাজগোষ্ঠী —যারা আপন আপন রাজতন্ত্রকে একটি কেন্দ্রীয় চেতনায় মিলিয়েছিল,—সেটি হলো ভারত এবং বহির্ভারতীয় অধ্যাত্মধর্মের চেতনা। ঠিক জানা নেই, এই চেতনার যোগসূত্র বোধ হয় হারাতে থাকে অষ্টম শতাব্দীর শেষ থেকে। ভূটানের ইতিহাসও এই সব কারণে অনেকটা ধূমাচ্ছন্ন। জানা যায় না বিশেষ কিছু। যে সব ভূটানী মাঝে মাঝে দল বেঁধে কলকাতায় পড়াশুনো করতে আসে, তাদের অধিকাংশই দেশছাড়া। নিজের দেশের ইতিহাস নিয়ে তাদের অত মাথাব্যথা নেই। তারা সিকিমে, পূর্বনেপালে, দার্জিলিঙে ঔপনিবেশিক হিসাবে মানুষ হয়েছে, এবং ইংরেজ মিশনারীরা তাদের বহু সময়ে খ্রীষ্টানও করেছে, খরচও যুগিয়েছে। কলকাতার মিশনারী স্কুল কলেজগুলি ভূটানীদের শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।

বিমানঘাটি থেকে আমাদের জীপ গাড়ী ছেড়েছিল উত্তরদিকের মধুর

রৌদ্রপথে। পৌষ মাসের মাঝামাঝি, মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক পাওয়া যাচ্ছিল : দক্ষিণ হিমালয়ের তরাইয়ের দিকে আমাদের পথ, এই পথ আলীপুরদুয়ারের উত্তরপ্রান্তে পার্বত্য অরণ্য এবং মানবচিহ্নহীন গিরিজটলাময় নদীর সীমানায় শেষ হয়েছে।

বাঁদিকে পশ্চিম দুয়ারের উত্তর প্রান্ত। ওখানকার পথ উঠে গিয়েছে দুই শাখায়। একটি সিকিমে, অন্যটি কালিম্পঙে। যদি শিলিগুড়ি দিয়ে যাওয়া যায় তবে কালিম্পঙ-সিকিম একই পথ। পশ্চিম দুয়ারের ভিতর দিয়ে দুটি শাখাপথ অবশেষে মিলেছে একত্রে—যেখানে 'নাথুলা' গিরিসঙ্কট,—যেটি ভারত তথা সিকিম-তিব্বতের সংযোগস্থল, 'চুম্বি' উপত্যকার দক্ষিণপ্রান্ত। এটি অতি প্রাচীন ক্যারাভ্যান্ পথ,—তিব্বতের ভিতর দিয়ে নানাশাখায় বহু দূরদূরান্তরে চ'লে গেছে। 'ফারিজং' থেকে 'চমলহরির' বিশাল চূড়ার তলা দিয়ে, 'বামহ্রদ' এবং 'কালাহ্রদে'র মধ্যলোক ছাড়িয়ে 'গুরু' থেকে 'ত্রাংপো',—তারপর 'গিয়ান্সি' থেকে 'নাগারৎসির' পূর্বপথে—যেখানে 'যামদ্রোকের' বিশাল জলাশয় নীলকাচের মতো স্থির হয়ে রয়েছে ষোলহাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে। সেই যামদ্রোকের পশ্চিম সীমানা বেয়ে ক্যারাভ্যানপথ ব্রহ্মপুত্র তথা 'সানপো'র দক্ষিণ তীরে পৌঁছেছে, তারপর নদী পার হয়ে 'কাইচু' নামক আরেকটি নদীর তীরে তীরে উত্তরে লাসানগরীর পথ। এই পথে ব্রিটিশ-ভারত গভর্নমেণ্ট ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ডের নেতৃত্বে ১৯০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত আক্রমণ করেন, তারপর উভয়ের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পূর্বরচনায় এসব কাহিনী আলোচনা ক'রে এসেছি।

আমরা ডানদিকে হিমালয়ের পূর্বদুয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। এ অঞ্চল ভূটানের ঠিক দক্ষিণে। উত্তর ভূটানের সংবাদ কেউ জানে না; কিন্তু সেই অঞ্চলের গিরিশৃঙ্গমালার ভিতর দিয়ে ভূটান থেকে নানা পার্বত্যপথ তিব্বতের মধ্যে চ'লে গেছে। এই পথগুলিই ভূটান-তিব্বতের যোগাযোগ রক্ষা ক'রে এসেছে। এইগুলি প্রধানত ভূটানী চাউল এবং তিব্বতী লবণের বাণিজ্যপথ। কিন্তু 'নুন-ভাতের' সম্পর্ক ছাড়াও উভয়ের মধ্যে আরেকটি সম্পর্ক আছে যেটি কিছু বিস্ময়জনক। কমবেশী তিনশো বছর আগে জনৈক প্রসিদ্ধ ভূটানী লামা কৈলাসের পথে তীর্থযাত্রা করেন। ভূটান থেকে কৈলাস-মানসসরোবর অল্পবিস্তর এক হাজার মাইলের ব্যবধান বৈকি। সেদিনও চাকার গাড়ী ছিল না তিব্বতে, এবং আজও নেই। সেই লামা তাঁর তপস্যার স্থান খুঁজে পান কৈলাসচূড়ার নিকটবর্তী অঞ্চল 'তারচেন' নামক পল্লীতে। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, এবং পারিপার্শ্বিক নানা অঞ্চলে তাঁর ক্রমশ

প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে ওঠে। তিনি সেখানে কয়েকটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। কালক্রমে কৈলাস এবং মানস সরোবর অঞ্চলে ওই 'তারচেন্‌কে' কেন্দ্র করে অনেকগুলি বৌদ্ধমঠ, গুম্ফা, পল্লী এবং গ্রাম, তথা পশ্চিম তিব্বতের কয়েকটি অঞ্চল ভুটানরাজের অধীনে আসে। ওই স্থানগুলি সম্মিলিতভাবে এখন 'ক্ষুদ্র ভুটান' বলা হয়। ভুটানরাজের একটি অট্টালিকা রয়েছে এমন 'তারচেন' এবং জনৈক 'ভিক্ষু' ভুটানী শাসনকর্তা বর্তমানে 'ক্ষুদ্র ভুটানের'' সর্বপ্রকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

পশ্চিম এবং পূর্ব দুয়ারের সীমারেখার উপর দিয়ে আমাদের গাড়ী চলেছে। সমতল প্রান্তর পথ। প্রান্তরের পূবদিকে রেলপথ চলেছে কোচবিহার থেকে 'রাজাভাতখাওয়ার' ওদিকে, পশ্চিমে, মাদারিহাটের পথ। মাদারিহাট পশ্চিম দুয়ারের অন্তর্গত। মাদারিহাটের পূর্বপ্রান্তে নেমে এসেছে 'আমো-চু' নদী,- এ নদী নেমেছে 'চুম্বি' উপত্যকা থেকে।

পথ অনেক দূর। বোধ করি তিরিশ মাইলের কাছাকাছি। দূরে দূরে একটি আধটি চাষাগ্রাম চোখে পড়ে। ধানকাটা হয়ে গেছে, শূন্য প্রান্তর পড়ে রয়েছে ভালো লাগছে এই জনশূন্যতা মানুষ দেখছিনে ব'লেই আনন্দ। কেননা ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা জনবহুল অঞ্চলে আমরা বাস করি। মানুষের ঢেউ এসে আমাদের উপর আছাড় খায় কথায় কথায়, মানুষের বন্যা আমাদের সমাজ জীবনের দুই তট ভেঙে দিচ্ছে প্রায় প্রতিদিন, পরিপ্লাবিত করতে বসেছে চারিপাশ। নিত্য দুই হাতে প্রাণপণে ঠেলে দিচ্ছি মানুষের সেই ভিড়, জনতার সেই চাপ। মানুষের গন্ধে কণ্ঠরোধ হচ্ছে আমাদের, মানুষের ধাক্কায় আহত প্রতিহত হচ্ছি, ছিটকে যাচ্ছি হুমড়ি খেয়ে পড়ছি। আমাদের ঘরদোর, আনাচ কানাচ, নালা-নদমা-আস্তাকুঁড়, বন বাগান-মাঠ ঘাট ক্ষেত-খামার,--মানুষের চাপে ভ'রে গেল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসছে মানুষের, ধাক্কার পর ধাক্কা,—কোনোমতে গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই আবার দিচ্ছে মানুষের ধাক্কা। বাঁচবার পথ নেই, পালাবার স্থান নেই, নিশ্বাস নেবার বায়ু নেই,—মানুষের উৎকট দুর্গন্ধের দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে আমরা অস্থিমশয়ান যক্ষ্মারোগীর মতো আনন্দোজ্জ্বল মুক্তির মুহূর্ত গুনছি। আমরা বাঙ্গালী।

ভালো লাগছিল উদার শূন্য প্রান্তরের স্নিগ্ধ হাওয়া। গাড়ী ছুটে চলেছে। ক্রমে এসে পৌছলুম পথের শেষ দিকে। এই অঞ্চলের কয়েক মাইল প্রচুর ধূলিময়। কিন্তু নতুন দেশের আকর্ষণ এমন যে, ধূলিমালিন্যের দিকে দৃষ্টি থাকে না। সেই ধূলিময় গ্রামের পথ পেরিয়ে একসময় মোটর এসে দাঁড়ালো

কালজানি নদীর মৃন্ময় তটে। খেয়া নৌকায় আমাদের গাড়ীসমেত পার হতে হবে। রেলপথের একটি সাঁকো আছে, কিন্তু সেটি কিছু দূরে।

ছমছমে কেমন একটি আবছায়া নদীর এপার-ওপারে। জঙ্গল জটলায় কোথাও কোথাও আচ্ছন্ন। ফলনের প্রাচুর্যে চারিদিক পরিপূর্ণ, কিন্তু খুব নিরিবিলি নদীরা নেমেছে প্রথম পাহাড়ের জটাজটিলতা ছেড়ে সমতলে। সেজন্য শীতের দিনেও প্রবাহের প্রখরতা কম নয়। আলীপুর হোলো তরাই অঞ্চল, এবং মৃৎপ্রধান। আলীপুরদুয়ারে এসে পৌছলুম।

নদী পার হয়ে বৃক্ষচ্ছায়াময় গ্রামের পথ। এটি শহরের সীমানা। চালাঘরের নীচে-নীচে দোকান, এপাশে ওপাশে গৃহস্থপল্লী। পাকা ইমারত চোখে পড়ছে না কোথাও। করোগেটের চালা, কাঠের খুঁটি, ছেঁচাবাঁশের দেওয়াল, —কিন্তু দেখতে সুশ্রী। মাচানের উপর সব্জি, অথবা একটু ফুলবাগান,— প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতেই দেখছি। জীবন বড় নিরিবিলি,—সভ্যতার বিড়ম্বনা থেকে অনেকটাই যেন বিচ্ছিন্ন। আপন মনে একা থাকে আলীপুর - অরণ্য আর নদীকে কোলে নিয়ে। শিয়রে ব'সে রয়েছে অন্ধকার ভূটান,- বিরাট হিমালয়ের প্রাকারঘেরা।

বাবুপাড়ায় সুধীর বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নির্দিষ্ট ছিল। সেখানে অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটে গেল একে একে। এখানে একটি সাহিত্যসম্মেলন উপলক্ষ্যে এসেছি বটে, কিন্তু অরণ্য ও পর্বত অভিযানের কথায় আশে পাশে সাড়া পাওয়া গেল প্রচুর। ভ্রমণ এবং অভিযানের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত হয়ে গেল। এ সম্বন্ধে কিছুকাল আগে অন্যত্র কিছু আলোচনা করেছি।

আলীপুর হোলো জলপাইগুড়ির মহকুমা, এবং সমগ্র জলপাইগুড়ি, বিশেষ ক'রে আলীপুর,—চেয়ে থাকে ভূটানের দিকে ভীত নয়নে। যেমন অন্ধকার থেকে হঠাৎ লাফিয়ে এসে নরখাদক জন্তু আক্রমণ করে, তেমনি অতর্কিতভাবে উত্তুঙ্গ ভূটানের নদীরা ছুটে আসে আলীপুরের উপর,— তারপর সেই বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় যা কিছু সব। ভূটানের পাহাড়ে কালো মেঘ ঘনিয়ে এলে আলীপুরের গৃহস্থদের হৃৎকম্প হয়। ঘরকন্না, মাঠ-ময়দান, গোরু-মহিষ, ধান-চাল—ভেসে যায় সেই বন্যার তাড়নায়। পাকাঘর কেউ বাঁধে না,—বাঁশ আর খুঁটির সাহায্যে মাচান তুলে তার ওপর সবাই নির্মাণ করে বেড়াবাঁধা ঘরদোর। বন্যার কালে গৃহস্থদের বাসস্থানের তলা দিয়ে কেবল যে জলস্রোত যায় তাই নয়, জন্তু জানোয়ার এবং বড় বড়

সরীসৃপও হাবুডুবু খেয়ে চলে যায়। অনেক গৃহস্থের অনেকবার ঘর ভেঙেছে, ঘরকন্না ভেসে গেছে, এ পাড়া থেকে ওপাড়ায় লোক পালিয়েছে, লণ্ডভণ্ড হয়েছে গৃহস্থালি। সংসারযাত্রার এই অনিশ্চয়তায় উত্তরে ব'সে রয়েছে ওই পর্বতরাজ্য,—সে নিস্পৃহ, তার চক্ষু নিমীলিত,—দক্ষিণের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের দিকে তার ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই।

ভূটানের দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম, পূর্বে আসাম, পশ্চিমে সিকিম, উত্তরে তিব্বত। এই অবরোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভূটান কখনও এ কামনা করেনি, বাইরের লোকের সঙ্গে সে মিশবে। বাইরের আলো পড়েনি ভূটানে, বিদ্যুৎ নিয়ে যায়নি, কল কারখানা বসায়নি, এক ফোঁটা এলোপ্যাথি ওষুধও খায়নি, বিজ্ঞান ওদের দরজায় কখনও মাথা গলায়নি, এজন্য দুঃখও পায়নি। কারণ, তিব্বতের মতোই ওরা সভ্যতাকে সন্দেহ করে এসেছে চিরকাল। ভূত প্রেত পিশাচকে ওরা শ্বেতপতাকা তুলে পাহাড়ী রাজ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, যেমন দেখেছি নেপাল আর সিকিমের পাহাড়ে, যেমন কুলু আর উত্তর কুমায়ুনে, যেমন কিন্নরে-লাডাখে,—যদিও তাদের অনেকে সভ্যতার স্পর্শকে ভয় পায়নি। তারা গ্রহণ আর বর্জন দুই করেছে। কিন্তু ভূটানে ভিন্ন কথা। প্রশস্ত প্রবেশপথ এখানে কোথাও নেই। পথ আছে, কিন্তু সে পথ খোলে বন্য হস্তীর, সেই পথে পড়ে থাকে পাহাড়ী মরাল শিকারের অন্বেষণে, ভয়াল ভাল্লুক আর ক্ষুধার্ত চিতার। সেই পথে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। সেই পথে ভূটানে অভিযান করেছে অনেকে, অনেকে পৌঁছয়নি, অনেকেই ফেরেনি।

এতকাল পরে মন ফিরেছে ভূটানের। ওদের চোখ পড়েছে নীচের দিকে—যেখানে ভারতবর্ষ। ওরা রাজি হয়েছে ছেলেদের ভারতে পাঠাবে শিক্ষার জন্য, এবং ভারতের সঙ্গে যোগরক্ষার ব্যাপারে ভারতকে দিয়েই দুই একটি রাজপথ বানিয়ে নেবে। কিছুকাল আগে ভূটানরাজ এসেছিলেন দিল্লিতে ভারতের আমন্ত্রণে,—হয়তো তাঁর মনের সন্দেহ কতকটা ঘুচেছে।

যতদূর দেখা যাচ্ছে 'নাগরাকাটা' থেকে ভূটানের মধ্যে কয়েক মাইল অগ্রসর হওয়া যায়, এবং বিশেষ বাধাও দেয় না কেউ। কে যেন বলছিল 'রাঙামাটি' নামক একটি জনপদ ভূটানের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ রেখেছে। ওখানে এসে ওরা 'নুন' কিনে নিয়ে যায়, আর বোধ হয় অতি-আবশ্যকীয় কিছু কিছু সামগ্রী। দেওয়ানগিরি হোলো ভূটানের দক্ষিণ পূর্বের সীমান্ত শহর,—উপত্যকায় অবস্থিত। এতকাল ধরে এই ক্ষুদ্র শহর ছিল ভারতের এলাকায়, মাত্র সাত বছর আগে এই দেওয়ানগিরির বত্রিশ বর্গমাইল এলাকা

ভারত গভর্নমেণ্ট ভূটানকে ফেরত দেন। ভূটান ভারতের সঙ্গে কখনও শত্রুতা করবে না, এজন্য নেহেরু গভর্নমেণ্ট বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ টাকা ক'রে দিচ্ছেন। ওরা এখন ওদের পররাষ্ট্রনীতি স্থির করবে ভারতের পরামর্শে,—এই হোলো শর্ত। ওরা অস্ত্র আমদানি করবে ভারতের মাধ্যমে, এবং অস্ত্রাদি বাইরে চালান করতে পারবে না, ভূটান থাকবে ভারতের রক্ষা ব্যবস্থাদির মধ্যে,—ওর গায়ে কেউ না হাত দেয়। রাজনীতিক নিস্পৃহতা রক্ষার মূল্য পেয়েছে ভূটান।

কিন্তু দেওয়ানগিরি থেকে ভূটানের রাজধানী 'পুনাখা' অনেকদূর। এ গাড়োয়াল নয় যে, পথে পথে তীর্থমন্দির, কুলু অথবা কাংড়া নয় যে মানালি পর্যন্ত মোটর পথ গিয়েছে। নেপাল নয় যে 'নামচে-বাজার' আর 'থিয়াংবোচে' পর্যন্ত যাত্রীদল পাওয়া যাবে, এ হোলো অন্ধকার জলা পার্বত্য ভূমি। নীচের তলাকার উপত্যকায় জন্তু আর মানুষের নিত্য সংগ্রাম বেধে উঠছে কথায় কথায়। খাবার নিয়ে টানাটানি করছে বাঘে আর মানুষে। গাছ-পালা ক্ষেত খামার আক্রমণ করছে হাতীর দল, বিনা নোটিশে তারা হানা দিচ্ছে বস্তিতে-বস্তিতে। বর্শা বল্লম, টাঙ্গি আর কুক্রি নিয়ে বন্য ভূটানী উন্মত্ত হয়ে খুনী বাঘের পিছনে ছুটছে। হিমালয়ের তরাই অঞ্চল বড় ভয়ঙ্কর।

তামুলপুর থেকে এগিয়ে দেওয়ানগিরি পৌঁছতে প্রায় ষাট মাইল পড়ে। মাঝপথে পাহাড়ী নদী পার হয়। দেওয়ানগিরি থেকে তাসিগং একশো মাইল উপত্যকা পথ,—তারপর উঠে গেছে দুস্তর হিমালয় ভূটানের উত্তরদিকে। ওদের শহরে, জনপদে, বস্তিতে-পল্লীতে গিয়ে পৌঁছলে সহসা বুঝতে পারা যায় না, ওরা বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু। ওদের একদিকে বাঙলা, অন্যদিকে আসাম। আসামের একটা অংশ বৈষ্ণব, অন্যটা শাক্ত। ভূটান বৌদ্ধ, কিন্তু সে নিয়েছে বাঙ্গলার শাক্তনীতি। চণ্ডী, কালী, তারা, এরা ওদের পূজ্য। পশুবলি ওদের ধর্মাঙ্গ। সকল পাহাড়ীজাতির মতো ওরা সাধারণতঃ খর্বকায় এবং বলিষ্ঠ। ওদের প্রকৃতিগত সরলতা হিংস্রতায় রূপান্তরিত হতে বিলম্ব ঘটে না।

তাসিগং থেকে পশ্চিম উপত্যকাপথে বহু নদনদী ও দুর্গম পথ পেরিয়ে প্রায় তিনশো মাইল অতিক্রম করলে কৃষ্ণগিরির দক্ষিণে এসে পৌঁছনো যায়। কিন্তু এই পথে নানাবিধ জানোয়ারের এবং হিংস্র কুকুরের অবাধ রাজত্ব। মাঝ পথে 'খাস্কার' ও 'মিলি' গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে আসতে হয়। খাস্কারে এসে মিলিত হয়েছে দুটি বৃহৎ নদী—দুটি নদীর মূল উৎস হোলো তিব্বতে। সিন্ধুনদ যেমন দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র কাশ্মীরকে দ্বিখণ্ডিত

করেছে, 'অরুণ নদ' যেমন গৌরীশৃঙ্গ থেকে সোজা কুড়ি হাজার ফুট নেমে পৃথিবীর গভীরতম খদ সৃষ্টি করেছে, অথবা—মনে পড়ে গেল বন্য শতদ্রুকে—সে যেমন মানসসরোবর থেকে বেরিয়ে সমগ্র পাঞ্জাব আর বাহ্বালপুরকে কেটে অবশেষে গিয়ে মিলেছে সিন্ধুনদে, তেমনি এই দুটি নদী। এরা এত দীর্ঘ নয়, কিন্তু দুঃসাহসিকা। এদের সঙ্গে যোগ রয়েছে তিব্বতী ব্রহ্মপুত্রের—যার তিব্বতী নাম হোলো সাংপো। এরা কোথাও কোথাও বিশহাজার ফুট উঁচু পাহাড় দ্বিখণ্ডিত করেছে, পেরিয়ে এসেছে দুর্গম দুস্তর গিরিমালা,—তারপর এসেছে দক্ষিণ ভূটানের তাসিগঙ উপত্যকায়। সেখান থেকে সাজগোজ খুলে নিজের নাম নিয়েছে, 'ডাঙমে'। ওদিকে আবার কৃষ্ণপর্বতের গা ঘেঁষে ছুটে এসেছে 'টঙসা' উত্তর থেকে দক্ষিণে। এই দুই নদীর সঙ্গমক্ষেত্র থেকে নতুন নামে একটি বিস্তৃত ধারার জন্ম হোলো—তার নাম মানস। প্রতি বর্ষায় এই মানসের প্রবল বন্যাস্রোত আসামের গোয়ালপাড়ায় এসে নানা ধারায় ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়।

আমরা নদী প্রান্তর আর অরণ্যলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছি দিন তিনেক। দেখতে পাচ্ছি অন্ধকার ভূটান। তার মধ্যে প্রবেশপথ পাইনে। মাঝে মাঝে বন্যায় ভেসে ছুটে নেমে আসে ওখান থেকে গ্রাম, গাছ পালা পাথর গড়িয়ে আসে বজ্ররবে, পাহাড়ের চাংড়া ভেঙে এসে ছারখার ক'রে বিপ্লব বাধিয়ে দেয়, জলের স্রোতের মধ্যে মানুষে জানোয়ারে আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রবল সংগ্রাম বেধে ওঠে। কিন্তু ছায়াবৃত ভূটান। জানবার জো নেই, ওখানে মানুষের সংখ্যা কত। বোঝবার জো নেই। ওদের সংসারযাত্রার সত্য পরিচয়। অরণ্যে, তুষারে, জানোয়ারে, আকাশস্পর্শী পর্বতচূড়ায়—ওরা চিরদিন রয়ে গেল অজানা রহস্যের ছায়ার পাশে। শত শত বর্ণের পতঙ্গ-প্রজাপতির দল ওরা নীচের দিকে পাঠিয়ে দিল, ওরা ছড়িয়ে রাখলো হাজার হাজার বর্ণের বন্যলতা। অগাধ প্রাকৃতিক সম্পদ ওরা লুকিয়ে রাখলো গুহায়-গহ্বরে, পাথরে-কন্দরে এবং ওরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি টুকরোকে বেঁধে রেখে দিল ওদের অরণ্যে আর পর্বতে। বিদ্যুতের আলো ওরা জ্বাললো না, পাছে তার অত্যুগ্রতায় আরণ্যক ভূটান আপন স্বরূপকে দেখতে পায়। ওরা চাকার গাড়ী নিয়ে গেল না স্বদেশে, পাছে স্বজাতি তার জীবনে দ্রুতগতি লাভ করে। ভারতের যুগ-যুগান্তের উত্থান-পতন, প্রতি শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় বিপ্লবঝঞ্ঝা, সভ্যতা ও শিক্ষা,—এরা নীচের তলায় প'ড়ে

রইলো,—ভ্রূক্ষেপ নেই ভূটানের। রাজার ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে রাজনীতি নেই, তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কারা যেন এর মধ্যে কবে 'ভূটান কন্‌গ্রেস' বানাতে গিয়েছিল, রাজা মহাশয় তাদের টুঁটি টিপে দিয়েছেন। কিন্তু 'ভূটান কন্‌গ্রেস' অত সহজে রাজাকে ছাড়েনি। তারা শস্যের অংশ দিয়ে রাজস্ব পরিশোধ করতে আর প্রস্তুত নয়, নগদ টাকায় তারা রাজস্ব দিতে চায়। তারা বলছে, মন্ত্রিসভা যদি না করো, তবে প্রতিনিধিসভা বানাও,—তুমি থাকো অভিভাবক হয়ে,—মেনে নিচ্ছি তোমাকে। তারা বলছে, রাত্রির অন্ধকার নামলে কেউ আপত্তি জানায় না, কিন্তু চারিদিকে যখন আলো জ্বলে উঠছে, তখন আমাদের ঘরের অন্ধকার আমরা বরদাস্ত করবো না।' আলো চাই পথঘাট চাই, ঔষধ পত্র চাই শিক্ষাসভ্যতা চাই। ভূটানের 'হা' নামক অঞ্চলে এই নিয়ে হাহাকার ওঠে।

মহারাজা অত সহজে এসব কথায় কান দিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি একটি কারণ ঘটেছে। বছর দেড়েক আগে তিব্বতে ভূটানী চাউল রপ্তানির বাণিজ্য যোগ যেমন বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তেমনি তিব্বত থেকে ভূটানে লবণ এসেও আর পৌঁছয় না। এই লবণ-দুর্ভিক্ষই মহারাজাকে সচেতন করে তুলেছে। খাদ্য জগতে সর্বাপেক্ষা 'মিষ্ট' সামগ্রী হোলো লবণ। চিনি অথবা গুড় যত মিষ্টই হোক, লবণ তার চেয়েও 'মিষ্ট'। কেননা লবণ ভিন্ন মানুষের প্রাত্যহিক জীবন অচল। অতএব লবণভিক্ষার জন্য মহারাজা ভারতের দরজায় নেমে হাত পাতেন। কিন্তু পথঘাট না থাকার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট প্লেন থেকে লবণের বস্তা ভূটানে ফেলতে বাধ্য হন।

মোট নয়জন প্রশাসক আছেন ভূটানে—তাঁদের নাম পেন্‌লপ। তাঁরা মহারাজার অধীনে এক-একটি অঞ্চলের অধিনায়ক,—যেমন এককালে ভারত-সম্রাটের অধীনে থাকতেন 'ভাইসরয়'। এই নয়জন পেনলপ ও তাঁদের কর্মসচিব—যারা অধিকাংশই রাজপরিবারভুক্ত এবং মহারাজার অনুগত,—এদের সাহায্যেই মহারাজা তাঁর আঠারো হাজার বর্গমাইলব্যাপী পার্বত্য ভূভাগের শাসনকার্য চালান।

এখানেও ভূটান-কন্‌গ্রেস মহারাজাকে চেপে ধরেছে। কায়েমী স্বার্থের ব্যবস্থা বদলাতেই হবে। আইন-কানুন রাজার ইচ্ছানুবর্তী হলে চলবে না, লিখিত আইন চাই। আইন-আদালত চাই, বিচারশালা ও বিচারপতি চাই। শাসনব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী না হয় নাই রইলো, কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ না হলে চলবে না। রেখে দাও তোমার ওই তাঁবেদার 'পেন্‌লপ', স্বেচ্ছাতন্ত্রকে আর

আমরা স্বীকার করিনে। এবার চাই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, চাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।

ভূটান-কন্‌গ্রেসের অনেকগুলো দাবি মহারাজা স্বীকার করেছেন এবং শীঘ্রই ভূটানের রাষ্ট্রক্ষেত্রে কয়েকটি নতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার কথা চলছে। এবার তিব্বতকে ছেড়ে মহারাজা ভারতের সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত হয়েছেন। জনসাধারণ প্রথম মাথা তুলেছে ভূটানে।

উত্তর ভূটান পর্বতমালায় বেষ্টিত,—যেমন দুরারোহ, তেমন জনশূন্যপ্রায়। পশ্চিম ভূটানের চেহারা প্রায় একই প্রকার। দুঃসাধ্য পাহাড়, নদী এবং অতলগহ্বর খদের দ্বারা সিকিমের সঙ্গে তার প্রাকৃতিক ব্যবধান। উত্তর সিকিমের উত্তুঙ্গ পাউহুনরী পর্বতের থেকে নেমে এসেছে, 'আমোচু' নদী সোজা দক্ষিণে সিকিম পেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ভূটানের মধ্যে। এই নদীর ধারাপথে সিকিমে আর ভূটানে দুই ভূভাগ একত্রে জড়িত। দুয়ের মধ্যে সীমানির্দেশক কিছু নেই,—আছে শুধু পর্বতের পর পর্বত, এবং পাঁচ থেকে আট হাজার ফুট উচ্চ মালভূমি। আমোচু নদী দক্ষিণ পথে মাদারিহাট হয়ে কালজানির দিকে চ'লে গেছে। অপর দুটি প্রধান নদী হোলো রায়ডাক এবং মোচু। ঠিক মনে পড়ছে না 'রায়ডাক' নদীর ভিন্ন নাম 'কালচিনি' কিনা। এই রায়ডাক নদী নেমে এসেছে জয়ন্তী অরণ্যের উত্তর প্রান্তে—যে অঞ্চলের নাম হয়েছে 'ভূটানঘাট'।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলুম ওই ভূটানঘাটে রায়ডাক নদীর তটে। ওপারে ভূটান পাহাড়, নীচে নদীর নীল ধারা বাঁদিক থেকে ডানদিকে চ'লে গেছে অনেক দূর। সেই কোথায় যেন গুহালোকে পাওয়া যায় 'ফাঁসখাওয়া মহাকাল',—সেখানে আছে আশ্রম,—পথ গিয়েছে কালচিনি নদীর উপর দিয়ে। বাঁশের পুল বেঁধে তবে সেই অন্ধ গুহাশ্রমে প্রবেশ করা যায়। আছে তার আশপাশে আরণ্যক ভূটানী বস্তি। আর ওই দেখে নিয়ে গেলুম কালচিনির পুলের ওপারে ভূটানের অরণ্য, দিনের বেলাতেও ভয়ের বাসা,—ও অঞ্চলে নাকি রাজবোডারা হাতীর শুঁড় জড়িয়ে ধ'রে ফণা বিস্তার করে।

সামনে বন্য নদী পাথরে-পাথরে আকীর্ণ, ঘন বিশাল অরণ্য চতুর্দিকে। দিনমানেও এই নদীতটে একা আসতে অনেকে সাহস পায় না। চারিদিক রুদ্ধশ্বাস, গভীর নিস্তব্ধ। একটু আগে হাতী গেছে এই পথে, 'নাদ' ফেলে গেছে,—তার থেকে বাষ্প নির্গত হচ্ছে। নদীর ওপারে ভূটান পাহাড়ে উঠে

গেছে হাতীর পথ। পাহাড় থেকে নেমে ওরা যখন-তখন লুট করতে আসে শস্যভাণ্ডার। দরকার হ'লে ওরা গ্রাম লুট করে, বন-বাগানকে তচনচ করে, এবং বাধা দিতে গেলে মানুষকে পদদলিত ক'রে চ'লে যায়।

পলাশ বাড়ী থেকে শামুকতলার পুল, আর বাবুপাড়া থেকে 'মাঝের-দাবড়ি'—এদের মধ্যে ঘুরছিলুম। আছে মহকুমার আদালত আর আপিসপাড়া, আছে এখানে ওখানে পল্লী আর লোকযাত্রা,—কিন্তু শহর নগর একে বলে না,—সব মিলিয়ে এ যেন কতকটা আধুনিক গ্রাম। কিন্তু গ্রামের বাইরে সন্ধ্যার পর থেকে সংশয়াচ্ছন্ন। নরখাদক বাঘের উপদ্রব মাঝে মাঝে দেখা দেয়। কেননা বাঘ আসে কথায় কথায়। চারিদিকে নদী আর অরণ্য, পাহাড় আর জলাভূমি,—মাঝখানে ছোট্ট আলীপুর দুয়ার। কিছুদূর এগিয়ে গেলে দমনপুর, তারপর তরাইয়ের অরণ্যলোক আরম্ভ। হিমালয় প্রায় সর্বত্র তার উদার মহিমাকে প্রথম প্রকাশ করে ধ্যানগম্ভীর অরণ্যসম্পদে। দমনপুর থেকে চললো পথ 'বক্সাদুয়ারের' দিকে, আর বাঁ দিকে উত্তর-পশ্চিমে রেলপথ এবং বনপথ চ'লে গেল রাজাভাতখাওয়ার ওদিকে। রাজাভাতখাওয়া। থমকে গেলুম বটে। ঠিক মনে পড়ছে না গল্পটা। সমগ্র আলীপুর দুয়ার ছিল নাকি একদা ভূটানের অধীনে। একদিন এলেন এখানে কোচবিহারের মহারাজা ব্যাঘ্রশিকারের অভিযানে। বোধ করি তাঁর এই প্রবেশ ছিল বে-আইনী। অন্য ভাষ্য হোলো এই, আলীপুর দুয়ারের উপর উভয়পক্ষেরই নাকি দাবি ছিল। সে যাই হোক, ভূটান রুখে দাঁড়ালো কোচবিহারের বিপক্ষে। সন্দেহ নেই, রাজরক্ত আর রাজনীতি বড় ভয়ঙ্কর, —এবং এর চেহারা দেখে বেড়িয়েছি রাজস্থানে। ফলে, যুদ্ধ বেধে উঠলো এবং যথাকালে সন্ধিও হোলো। আলীপুর দুয়ার এলো কোচবিহারের অধীনে। বোঝাপড়াটা নাকি উভয়পক্ষেরই আনন্দের কারণ হয়েছিল। কিন্তু এই আনন্দকে স্মরণীয় ক'রে রাখা দরকার। সুতরাং ভূটান আর কোচবিহার স্থির করলেন, ভোজনের আসর বসিয়ে এই বন্ধুত্বকে পাকা করতে হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। দুজনে একাসনে বসে অন্নগ্রহণ করলেন যেখানে, সেই অঞ্চলের নাম রাখা হোলো 'রাজাভাতখাওয়া'। এই নামেই স্থানীয় রেলস্টেশনটি পরিচিত রয়েছে।

অরণ্যসমাকীর্ণ পথে আমাদের মোটর দ্রুত চলেছে অনেক দূর। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় মাইল চল্লিশেক পথ। সঙ্গে আছেন শ্রীযুক্ত

দে সরকার,—আলীপুর দুয়ারের সর্বপরিচিত মাস্টার মশাই। প্রবীণ বয়সে তাঁর পর্বতারোহণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনেক তরুণকে হার মানায়। তিনি পাহাড় আর নদী আর দুর্গমের গন্ধে মেতে উঠেছিলেন। সঙ্কোশ নদীর উপত্যকা পথ ধ'রে অরণ্য জলাভূমি আর পাহাড়তলী পেরিয়ে সোজা উত্তরে চলে গেছে দুঃসাহসীর পথ। বনময় জলাময় ভূভাগ, দুই ধারে হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গদল,—হাতীর দল নেমে আসে শীতকালে, বাইসন তাড়া করে ভূটানীকে, হরিণ আর বনশূকরের পাল এধার থেকে ওধারে ছুটে যায়, বন্য কুকুর খরগোসকে খুঁজে বার করে, হায়না এগিয়ে এসে জন্তুর কঙ্কাল শুঁকে চ'লে যায়,—ওদেরই ভিতর দিয়ে অভিযান-পথ 'চীরঙ' পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়। 'চীরঙ' হোলো ভূটানী জনপদ,—সেখানকার মানুষ দারিদ্র্যে আর ক্ষয়রোগে শুকিয়ে মরে,—জল আর জন্তুর সঙ্গে লড়াই চলে তাদের অহরহ। 'চীরঙ' থেকে 'সঙ্কোশ' নদীর নাম হয়েছে মো-চু,—যেমন ব্রহ্মপুত্রের নাম 'সান্‌পো।' এই 'মো চুর' পূর্বদিকে গগনচুম্বী কৃষ্ণপর্বতের অগণ্য শাখাপ্রশাখা প্রসারিত হয়েছে দূরদূরান্তরে। এই নদীর তীরে তীরে পথ চ'লে গেছে 'ওয়াংডু' জনপদ পেরিয়ে সোজা উত্তরে 'পুনাখা' শহরে। নামটি পুণাখা অথবা 'পুণ্যাক্ষ'—ঠিক জানিনে। মন্দির, গুম্ফা, বাজার, রাজভবন—সবই আছে। দারুময় মঙ্গোলীয় স্থাপত্যেরও অভাব নেই। পুণাখা থেকে একটি অশ্বপথ ফারোজঙ হয়ে চ'লে গেছে কালিম্পঙের দিকে। ভারতের সঙ্গে ভূটানের এটি অন্যতম সুদূরবর্তী যোগসূত্র।

গহন ভীষণ অরণ্যানীর শোভা দেখে চলেছি। দুই ধারে কেমন যেন অপ্রাকৃত অনৈসর্গিকের ইন্দ্রজাল বিস্তারিত। অরণ্যের নীচে দিয়ে এখানে ওখানে রহস্যপথ চ'লে গেছে। ওদের প্রত্যেকটি যেন সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্নের মতো। শীতের দিনে বিশাল শালপ্রাংশু আর সেগুনের পাতা ঝরছে অনেক। ক্বচিৎ এক-আধজন আরণ্যক কাঠুরিয়ার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। ছায়াচ্ছন্ন পথে হঠাৎ বেরিয়ে আসে কৃষ্ণকায় মাটির সন্তান,—চেহারায় জংলী, অর্ধনগ্ন,—হাতে একটা হাতিয়ার। তার পিছনে আরও এক আধজন। ওরা এ অঞ্চলে একা চলে না। মনে প'ড়ে যাচ্ছে শুক্‌না আর আমলেকগঞ্জের অরণ্য, মনে পড়ছে দেওদার পর্বতের নীচে দ্রোণভূমি, সোমনাথের পথে গিরনারের সিংহ-বন। দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলুম বক্সাপাহাড়ের নীচে 'সাঁতরাবাড়ীর' পুলিশ ফাঁড়িতে।

আশেপাশে দুচার ঘর বস্তি নিয়ে ছোট্ট একটি পল্লী। শুনলাম গতকাল

এখানে বাঘ এসে একটি নরহত্যা ক'রে গেছে। লাস পাওয়া যায়নি, ফসলের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে বাঘ পালিয়েছে। এ অঞ্চলে এসব গা-সওয়া। অনেক সশস্ত্র পাহারাদার আমাদের ব'লে দিল, পাহাড় এখানে নিরাপদ নয়। আপনারা পাহাড়ে যাচ্ছেন বটে তবে বেলা চারটের মধ্যে ফিরবার চেষ্টা পাবেন।

তার প্রস্তাব মেনে নিয়ে আমরা অগ্রসর হলুম। পায়ে পায়ে আমাদের উৎসাহ, মনে-মনে উদ্দীপনা। এ অঞ্চল এই সেদিন অবধি ছিল ভূটানে,—প্রায় বছর তিরিশেক আগে ইংরেজ রাজ এই অঞ্চলের মাইল পাঁচেক পাহাড়ী অঞ্চল জুড়ে একটি দুর্ভেদ্য কারাগার তৈরী করে। এই কারাগারের নাম দেওয়া হয় 'বক্সাদুর্গ'। চতুর্দিকে হিমালয়ের চূড়া, একদিকে শুধু দেখা যায় দূরদূরান্তর। এই পথে রয়েছে বিপ্লবী বাঙলার রক্তের ইতিহাস এখানে ওখানে ছড়িয়ে। স্বাধীনতার ইতিহাসে যারা স্মরণীয় এবং বরণীয়—এইখানে ব'সে ব'সে তারা নৈরাশ্যের দিন গুনেছে। প্রেনটিস, পোর্টার, জ্যাকসন্, এণ্ডারসন, হার্বার্ট, লীটন্, রেডিং, উইলিংডন, লিনলিথগো ইত্যাদি—এদের অমানুষিক আচরণ আজও এই পাহাড়ে রক্তের অক্ষরে লেখা। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় লর্ড রেডিংয়ের আমলে এই কুখ্যাত বন্দীশালা খোলা হয়, এবং তারই আদেশক্রমে বাংলার শত শত শ্রেষ্ঠ কর্মবীরকে গোপনে এখানে এনে রাখা হয়। লোক-লোচনের অন্তরালে মধ্যরাত্রে অথবা অরণ্যের ছায়াপথ ধরে বন্ধ গাড়ীর মধ্যে বন্দী অবস্থায় শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এবং লাঞ্ছনায় আর প্রহারে জর্জরিত ক'রে এই পাহাড়ের চড়াই ভাঙতে তাদের বাধ্য করা হোতো। না জানতো দেশবাসী, না জানতো বন্দীরা নিজে,—এই অঞ্চলের নাম ও পরিচয়। বহুদিন অবধি ইংরেজ এই সংবাদ জনসাধারণের কানে তুলতে দেয়নি এবং তাদের যথেচ্ছ বর্বরতা যখন বরদাস্ত করতে না পেরে শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই বন্দীরা মাথা তুলতে বাধ্য হয়,—তখন যতদূর মনে পড়ে, ওদের পিছনে সশস্ত্র গুর্খাকে লেলিয়ে দেওয়া হয়, এবং তার ফলে কয়েকজন বন্দীর মৃত্যু ঘটে। সেই মৃত্যুর প্রতিশোধ বাঙালী যে নেয়নি তা নয়, কিন্তু তার পরিমাণ বড় অল্প। অকল্যাণ, অন্যায় এবং অনাচারকে সংহার করার জন্য আমাদের দেশে গীতাধর্ম প্রচলিত। অসুরকে নিধন করার জন্য হাত যদি না কাঁপে, দয়া-মায়া-কৃপা-মোহ যদি অন্তরকে আচ্ছন্ন না করে, ফলাফল সম্বন্ধে হৃদয় যদি নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ থাকে,—তবে সার্থক সেই অসুরসংহার! বাঙালীর অনেক বীর সন্তান সেদিন অনেক ক্ষেত্রে এই গীতাভাষ্যকে জীবনের ব্রত ক'রে তুলেছিল। রোগে উপবাসে প্রহারে উৎপীড়নে আশাভঙ্গে

সেদিন বক্সাদুর্গের নির্জন প্রকোষ্ঠে অনেকের অপমৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু তাদেরই পুণ্যরক্তে কলম ডুবিয়ে লেখা হয়েছিল আজকের স্বাধীনতার কাহিনী।

আন্দাজ করতে পারি তিন মাইলের বেশী চড়াই পথ। প্রথম দিকের মাইলখানেক পথ কতকটা দুস্তর পাকদণ্ডি,—অনেকটা দম লাগে। একটি মস্ত ঝরণা নেমে এসেছে মাঝপথে,—পাহাড় বনময় এবং জনচিহ্নহীন। বুঝতে পারা যায় এখান থেকে কোথাও পালাবার পথ ছিল না সেদিন। সমতলের কোনও কোলাহল এখানে পৌঁছয় না, সভ্যজগৎ থেকে অনেক দূর হোলো এই পাহাড়ের সীমানা। দেশ ও জাতির সংস্পর্শ থেকে বিপ্লববাদীদলকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে অজানালোকে নির্বাসিত ক'রে রাখার মতো এমন আদর্শ জায়গা আর কোথাও নেই।

প্রায় দেড়ঘণ্টা লেগে গেল বক্সা ডাকঘরে এসে পৌঁছতে। ছায়াচ্ছন্ন পার্বত্য ভূমি, দূর পাহাড়ের গায়ে গায়ে অতি দরিদ্র কয়েক ঘর ভুটানীর বাস। একটি বাঙালী পোস্ট মাষ্টার আছেন ডাকঘরে, কিন্তু ম্যালেরিয়ায় তাঁর পরিবার জর্জরিত। নির্জন বনতল ছমছম করছে চারিদিকে। ভুটান পাহাড় অবরোধ ক'রে রয়েছে এই ক্ষুদ্র বস্তি অঞ্চলকে। আমরা চড়াই পথে আরও অনেকটা উঠে চললুম। শ্রমিক মেয়ে-পুরুষ চলেছে কাঠ বোঝাই নিয়ে। কান পেতে শুনলে বুঝতে পারা যায়, বাঙলা আর হিন্দির অপভ্রংশ নিয়ে তাদের ভাষা। শুনতে পাওয়া গেল এখানে নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ,—পেটের পীড়া অত্যধিক। খাদ্যসামগ্রী আনতে হয় বহুদূর নীচের থেকে।

দুর্গের সীমায় এসে উঠলুম। সারিবদ্ধ একতলা অনেকগুলি ঘর দেখা যাচ্ছে একটি মালভূমিতে। আজও তেমনি রয়েছে কাঁটাতারের বেড়া, তেমনি সুরক্ষিত প্রবেশপথ, তেমনি নানাবিধ বাসব্যবস্থা। মাঝখানে দু'-তিনটি কাঠের গম্বুজ, ওখানে সদাসতর্ক পাহারা থাকতো। আমরা ভিতরে যাবার আগে কিছু দূর এগিয়ে ফরেস্ট অফিসারের বাংলোয় এসে উঠলুম। এঁরা প্রায় সকলেই বাঙালী। এঁদেরই একজনের নিকট আমাদের জন্য পূর্বব্যবস্থা মতো ভূরিভোজনের আয়োজন ছিল। পথের বাঁক ঘুরলে প্রথমেই নজরে পড়ে একটি মস্ত বারান্দাওয়ালা খয়েরী রঙের সরকারী ভবন। বুঝতে পারা যায়, সরকারী তদন্তকালে ওটাই ছিল বড় কর্মচারীদের বাসস্থান। এখন সমস্তই জনশূন্য। ও অঞ্চলে বন্দীশালা, এ অঞ্চলে লাইব্রেরী, স্কুল, কর্মচারীদের কোয়ার্টার, খেলা-ধুলার জায়গা,—এবং যেখানে যেটুকু

অত্যাবশ্যকীয় স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন। একটি সরু পথ মাঝখান দিয়ে ভূটানের বিশাল পাহাড়ে উঠে গেছে।

এপারে এসে প্রবেশ করলুম বন্দীশালায়। মাঝখানে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। কাঁটাতারের বেড়া চতুর্দিকে, বাধার পর বাধা। কোনও দিন কল্পনা করিনি, এখানে পৌঁছতে পারবো। বক্সা মানে ছিল ভয়, বিভীষিকা, দেশপ্রেম, বিপ্লব, উৎপীড়ন, নির্বাসন,—মনের বিচিত্র চেহারা ছিল এই পাহাড়টিকে ঘিরে। ঘুরে ঘুরে দেখছিলুম সর্বত্র। নির্জন স্বল্পপরিসর প্রকোষ্ঠ কাকে বলে, তার ভিতরে ঢুকে লৌহকপাট বন্ধ করে দেখলুম। আজ সে মন নেই, সে-বেদনা বোধ নেই, সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ছায়ারা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। বুকের মধ্যে ধকধক করে জ্বলে না সেদিনের সেই আগুন আর ঘৃণা,—রাত্রির পর রাত্রি দাঁতের উপরে দাঁত ঘষা, একটি ইংরেজকে গুলিবিদ্ধ ক'রে মারলে সেই সংবাদ শুনে পথে পথে গান গেয়ে বেড়ানো, অন্তরে অন্তরে সেদিনের বীরপূজা,—প্রাণের সেই উত্তাপ জাতির মন থেকে আজ জুড়িয়ে গেছে।

ঘুরে বেড়ালুম আনাচে কানাচে অনেকক্ষণ। বোধ হয় কিছু খুঁজছিলুম। শুকনো রক্তের একটি ফোঁটা, হৃৎপিণ্ডের এতটুকু অবশেষ, জরো-জরো যন্ত্রণার এক ঝলক আর্তকণ্ঠ দধীচিদলের এক টুকরো বজ্রাস্থি, কোনও কাতর নয়নের শেষ চাহনি! কিন্তু কিছু নেই,—ইতিহাসের নতুন পরিচ্ছেদের পৃষ্ঠায় আজ এসে দাঁড়িয়েছি। স্বাধীন ভারতে আজ সেই তারা গল্পের মতো। সমগ্র পাহাড়শীর্ষের মালভূমিটি আজ বড় বড় অজগর সাপ এবং সরীসৃপের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

জীবহিংসা মহাপাপ ওকথা জানি বৈকি। ভালোবাসার দ্বারা পৃথিবী-বিজয়ের ভাষা ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা, সবাই জানে। ইংরেজের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ আজকে আর কোনোমতেই খুঁজে পাওয়া যায় না,—তারা চলে গেছে ইংরেজের সঙ্গে-সঙ্গেই। কিন্তু অপমানে উৎপীড়নে অরাজকতায় সেদিনের শাসকসম্প্রদায় বাঙালীর মনোজগতে যে দারুণ বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল, ইংরেজের সেই হিংস্রতাকে হিংসার দ্বারাই বাঙালী যোগ্য মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছে। লোহাকে কাটতে গিয়ে লোহার অস্ত্র ছাড়া উপায় ছিল না।

এবার পঁচিশ বছর আগের ইতিহাসে ক্ষণকালের জন্য ফিরে যেতে চাই।

ইংরেজ শাসকগণের প্রচণ্ড নিগ্রহের কালে বাঙালীজাতি সেই সময় আপন স্বভাবধর্ম অনুযায়ী একটি আত্মিক আনন্দের অবারিত মুক্তির পথ

খুঁজে ফিরছিল। রাজনীতিক জীবনে যে-অবরুদ্ধ গ্লানি, নৈরাশ্য এবং অবমাননা তাকে শাসকগণের বিরুদ্ধে তিক্তমতি ক'রে তুলেছিল, সেই রাহুচ্ছায়াকে অপসারিত করার জন্য বাঙালী চেয়েছিল একটি যুগজয়ী সাংস্কৃতিক ও চিৎপ্রাকর্ষিক অভিব্যক্তি—যেটি সর্বব্যাপী আনন্দ ও মুক্তিবোধের সাড়া তুলতে পারে। তৎকালে এই আনন্দ, আশ্বাস ও মুক্তির একমাত্র প্রতীক ছিলেন জাতির সর্বোত্তম ভাবনায়ক ও অভিভাবক মহাকবি রবীন্দ্রনাথ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে তখন একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন সুরু হয়ে গেল। সেটি প্রকাশ্যভাবে রাজনীতি থেকে মুক্ত হলেও অন্তরে অন্তরে রাজনীতিক চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। সে যাই হোক, এই আনন্দের হাটে এসে দাঁড়ালো সবাই,—সকল দল, সকল মত, সকল পথ, এবং দেশের সকল মনীষী ও সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়। তাঁরা একটি 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' সংস্থা গঠন করলেন, এবং তার অন্যতম কর্মসচিবরূপে মনোনীত করলেন শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়কে। হোম মহাশয়ের অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা, উদ্দীপনা এবং সংগঠনশক্তি সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে উৎসাহ সঞ্চার করতে সেদিন সমর্থ হয়, সেটি কেবল যে স্মরণীয় তাই নয়, সেটি ঐতিহাসিক ঘটনাও বটে। ফলে, দেশব্যাপী রবীন্দ্র-অনুরাগীগণের সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে কলিকাতায় 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী'র বিরাট অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বোধ করি পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্যাবধি কোনও কবি তাঁর জীবনকালে রবীন্দ্রনাথের মতো এমন জাতিধর্মনির্বিশেষে এই প্রকার বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেননি। মহাকবির তখন সত্তর বৎসর বয়স। বস্তুত, সেদিন পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ ও সর্ববরেণ্য মনীষীগণও এই উপলক্ষ্যে ভারতকবির উদ্দেশ্যে তাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। তাঁদের সকলের বাণী বহন ক'রে একখানি 'সুবর্ণগ্রন্থ' স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শত সহস্র—স্বদেশী ও বিদেশী—সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান তাঁদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা নিবেদন করেছিল মহাকবির পদপ্রান্তে। বাঙলার ঘোরতর দুর্দিনে সেদিন 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' অনুষ্ঠান কেমন যেন স্বস্তি ও মুক্তির নিশ্বাস ফেলবার সুযোগ দিয়েছিল। এই সময় বক্সাদুর্গের রাজবন্দীরাও চুপ ক'রে থাকতে পারেননি। তাঁরা কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁদের দাবি ও উপরোধ জানালেন, মহাকবিকে তাঁরাও অভিনন্দন জানাতে চান। কারণ মহাকবির অমোঘ স্বদেশীমন্ত্রে তাঁদের জীবন দীক্ষিত। কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি উপেক্ষা করতে পারলেন না। সুদূর ভূটানের হিমালয়চূড়া থেকে একদল পিঞ্জরাবদ্ধ রক্তাক্ত পাখীর আর্তকণ্ঠ অভিনন্দনের ভাষায় এসে পৌঁছলো

মহাকবির চরণপ্রান্তে! সেই আর্তকণ্ঠের ডাকে সেদিন মহাকবির হৃদপিণ্ডে লেগেছিল দোলা। অপমানিত এবং যন্ত্রণাদগ্ধ মানবাত্মার বেদনায় তাঁর দু চক্ষে নেমে এলো অশ্রু। তিনি তখনও ছিলেন হিমালয়ের আর-এক চূড়ায়,—দার্জিলিংয়ে। হিমালয়ের সেই শীর্ষস্থলে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ মহাকবির বজ্রকণ্ঠ যে-অভয়বাণী সেদিন উচ্চারণ করেছিল, সেই বাণীবাহিনী কবিতাটি সমগ্র বাঙলা ও ভারতের দিকবিদিক প্লাবিত ক'রে ছুটে গেল পৃথিবীর মর্মলোকে। বাঙালীর আর্তপ্রাণ সেদিন তাঁর ওই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল :

প্রত্যভিনন্দন

বক্‌সা দুর্গস্থিত রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হোতে
উন্মুখর ঊর্দ্ধ স্রোতে
বন্দী বারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন॥

মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি' অঙ্কুর আকাশে দিল আনি'
স্বসমুখ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্ত্য নরের রাজধানী॥

"অমৃতের পুত্র মোরা" কাহারা শুনালো বিশ্বময়!
আত্মবিসর্জ্জন করি' আত্মারে কে জানিল অক্ষয়!
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥

১১ জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দার্জ্জিলিং

সেদিনের শাসক ইংরেজরা কাব্যরসিক অথবা সাহিত্য-বিচারক ছিল না। সেইজন্য এই কবিতাটি বারম্বার গোপনে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়েও তারা এর প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হয়নি। কিন্তু প্রত্যেক বাঙালী সেদিন এই কবিতার প্রত্যেকটি শব্দের রাজনীতিক মর্মার্থ উপলব্ধি করেছিল। তামস-প্রকৃতি ইংরেজের বিরুদ্ধে অমৃতের সন্তান বিপ্লববাদীগণের উদ্দেশ্যে মহাকবি তাঁর এই কালোত্তীর্ণ কবিতায় আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।—যাই হোক, এই কবিতাটির মধ্যে বিপ্লববাদীগণের প্রতি মহাকবির আন্তরিক অনুরাগের গন্ধ পেয়ে তৎকালীন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এটি বক্সা দুর্গের বন্দীগণের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে রাজি হননি। কবিতাটি যথাসময়ে অমল হোম মহাশয়ের হাতে ফিরে আসে, এবং 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হয়।

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম এক নিরীহ জাতি বাস করে ভূটান পাহাড়ের গহনলোকে। ওদের নাম 'টোটো' জাতি। আপাতত এই 'টোটো বস্তিটির' দুস্তর অঞ্চল আলীপুরদুয়ারের অন্তর্গত। এই ক্ষুদ্র জাতির লোকসংখ্যা অল্পবিস্তর সাড়ে তিনশো থেকে চার শো'র বেশী নয়। এরা একদা পাহাড়পর্বতে কোথাও স্থায়ী আশ্রয় না পেয়ে প্রবাদমতো টোটো ক'রে ঘুরে বেড়াতো বলেই এদের নাম 'টোটো',—অর্থাৎ আশ্রয়চ্যুত ভবঘুরে। এরা চিরকাল মার খেয়েছে পাহাড়ে-পাহাড়ে নেপালী আর ভূটানীদের হাতে। পাথরে পাথরে মাথা ঠুকে বেড়িয়েছে অন্ন-বস্ত্রের অভাবে। দারিদ্র্যে কুষ্ঠব্যাধিতে অন্নাভাবে অনেকে বিকলাঙ্গ। ওদের ভাষা ওদের নিজস্ব,—না ভূটানী, না নেপালী, না বা সিকিমী। ওরা প্রায় এবার সবংশে ধ্বংস হয়ে এলো, আর দেরী নেই। হয়তো বা ওদের বাঁচাবার জন্য এক আধজন মানবপ্রেমিক ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়,—কিন্তু সে মার খেয়ে ফিরে আসে। পাহাড়ী নেপালী আর ভূটিয়া ওদের ভাগ থেকে জমি আর অন্ন কেড়ে নেয়, ভেঙ্গে দিয়ে যায় ওদের ঘরকন্না। কিছুদিন আগে একটি বাঙালী যুবক এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য গিয়েছিল 'টোটো' বস্তিতে, কিন্তু বাগে পেয়ে নির্মমভাবে বিরোধীপক্ষ তাকে হত্যা করে। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে আলীপুরদুয়ারের কর্তৃপক্ষ টোটোদের বাঁচাবার চেষ্টা করছেন,—তারা যেন দ্রুততর গতিতে নিশ্চিহ্ন না হয়। 'টোটো'দের জাতিপরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

'টোটো' পাহাড়ের বস্তি জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যেই পড়ে, কিন্তু তবু এটি ভূটানী অঞ্চল। সমস্ত প্রকৃতি হোলো ভূটানী। এখানে খরস্রোত 'আমোচু'-র

নাম হয়েছে 'তরসা'। এরই এক তটে 'টোটো' পাহাড়,—মানবসমাজের বাইরে। জলা জঙ্গল পাহাড়—এ ছাড়া আর কিছু নেই। এর বাইরে জগৎ আছে, টোটোরা জানে না। সভ্যসমাজের লোকেরা অনেকে হাতীর পিঠে চ'ড়ে টোটোবস্তির চেহারা দেখে আসে। ওই মানহারা মানবগোষ্ঠীর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে সভ্য মানুষের মাথা হেঁট হয় বৈকি।

খুঁটির সাহায্যে মাচান বানিয়ে ওরা তার ওপর চালাঘর তৈরি করে। যেমন আলীপুরে, যেমন শিলিগুড়ি আর আসামে। জলের ভয়, জন্তুর ভয়, সরীসৃপের ভয়। ওরা ডাকলেও আসবে না সভ্য জগতে, ওরা মিলতে চাইবে না কারো সঙ্গে,—পাছে ওদের ধর্মবোধ আপন স্বাতন্ত্র্যকে হারায়, এই আশঙ্কা। ওরা ভয়ানক আত্মকেন্দ্রিক, অতিশয় আত্মবাদী, জাতি অভিমানী স্বকীয়তার অনুরাগী,—সম্ভবত এই সব কারণে ওরা মার খেয়ে আসছে যুগে যুগে। ওই বস্তিতেই ওদের এক-একটি পাড়া,—তার কর্তা হোলো এক-একজন মোড়ল। মোড়লরাই ওদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ওদের দেবতা আছে, পালপার্বণ আছে। নাচ গান বিবাহ আছে, সমাজব্যবস্থাও আছে। ওদের প্রধান জীবিকা হোলো পরের জন্য খাটা। এ ছাড়া ক্ষেতখামার আছে কিছু কিছু। ওইতে ওরা শাকসব্জি বানায়, অল্পস্বল্প লাঙল চষে, এমনি করেই দিন যায়। সম্প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে ওদের বাঁচাবার জন্য নানাবিধ সাহায্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে শুনতে পাওয়া যায়। ঔষধ পথ্য পানীয় এবং আশ্রয়—এদের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, মানুষ ক'রে তোলার সাংস্কৃতিক দায়িত্বও পালন করা চাই।

সম্প্রতি ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর অঞ্চলে বিভিন্ন চা-বাগান দেখে বেড়াচ্ছিলুম। নদী বন জলা জঙ্গল এবং জনশূন্য একেকটি ভূভাগ পেরিয়ে একেকটি চা-বাগান। সেজন্য একে একে পেরিয়ে যাচ্ছিলুম তিস্তা, করলা, ময়নাগুড়ি, জলঢাকা, ধূপগুড়ি, দুদুয়া, কালুয়া, শুকৃতি, এবং তারপর মাদারিহাট ও বীরপাড়া ছাড়িয়ে রাম ঝোড়ার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গিয়ে পৌছলুম মুজনাই চা-বাগানে।

মুজনাই থেকে টোটোপাড়ার বস্তি ১১ মাইলের কিছু বেশী। আমরা যাচ্ছিলুম হাণ্টুপাড়া, হোলাপাড়া, লঙ্কাপাড়া প্রভৃতি গভীর জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে। মাঝে মাঝে শুকনো নদীপথ পার হচ্ছিলুম। এক ধারে ঘন অরণ্যলোক, অন্যদিকে ধানের মাঠে নেপালীরা ফসল কাটছে। একটির পর একটি চা-বাগান পেরিয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে বুনো হাতির দৌরাত্ম্যের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। অবশেষে এসে পৌছলুম ভূটান পাহাড়ের ঠিক ঢালুপথে

টোটোবস্তি। বাইরের পৃথিবী এই সেদিন পর্যন্ত এই মরণোন্মুখ আদিবাসী সম্প্রদায়টির খবর রাখত না। কিন্তু দুইজন ডাক্তারের চেষ্টায় এবং অপরিসীম আগ্রহে এই মৃত্যুমুখী সম্প্রদায়টি এখন বাঁচবার পথ খুঁজে পাচ্ছে। এরা সংখ্যায় ছিল মাত্র তিনশ, এখন প্রায় পাঁচশয় দাঁড়িয়েছে। সন্দেহ নেই এরা মিশ্র জাতি, এদের জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা—কোনোটাই নেই। এরা যে ভাষায় পরস্পর কথা বলে, সেটা অন্য কেউ বোঝে না। যাই হোক এই দুজন ডাক্তার হলেন পরলোকগত বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল। ডাঃ রায় এদের মধ্যে একটি হাসপাতাল, একটি শিক্ষা ও সেবা কেন্দ্র, খাদ্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা এবং জনৈক পরিদর্শক নিযুক্ত করেন এবং বাৎসরিক একটি Giant নির্দেশ করে দেন। সে টাকা সম্প্রতি নাকি বন্ধ হয়েছে। টোটোরা এতকাল ধরে বন্য শূকর মেরে জীবন ধারণ করত। এখন ধান চাল পাচ্ছে, এবং সুপারী আম কাঁঠালের চাষ করছে। এদের মধ্যে সামাজিক বা নৈতিক অপরাধ এখন ঢোকেনি। এদের সম্বন্ধে ডাঃ সান্যালের একটি প্রসিদ্ধ থেসিস এসিয়াটিক সোসাযেটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। টোটোরা এখন অল্পসল্প শ্রমিকের কাজ করে।

এতকাল পরে শিলিগুড়ি থেকে একটি মোটরপথ চলেছে ভূটানপ্রান্তে। এই পথটিতে সম্প্রতি ভূটান সরকারেব একটি মোটরবাস শিলিগুড়ি ও ফুন্তসোলিংযের মধ্যে যাতাযাত করে। শিলিগুড়ি থেকে কালচিনি, দলসিংপাডা ও হাসিমারা হয়ে এই মোটর বাসটি ভূটান পাহাড়ের পাদদেশে ফুন্তসোলিং নামক ছোট্ট ভূটানি জনপদটিতে গিয়ে পৌছয়। কিন্তু ওই পযন্তই, তারপরে ভূটানের ভিতর দিকে পৌছতে গেলে অনুমতির দরকার হয়।

ফুন্তসোলিং ভূটানের দক্ষিণপ্রান্তের শেষ জনপদ। শহর-বাজার ও মোটরের আড্ডা মিলিযে এই জনপদটি জলপাইগুডি ও দার্জিলিং জেলার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। জনপদের প্রবেশ পথে ভূটানি পাহারা নিযুক্ত রয়েছে। কযেক বছর আগে এখানেই ভূটানরাজের সহোদরকে হত্যা করা হয়েছিল। তাঁর একটি স্মৃতিচিহ্ন এখানে বর্তমান।

পাহাড়ি পথে আন্দাজ দুই ফার্লং এগিযে আমরা নবনির্মিত আধুনিক কালের একটি বৃহৎ গোম্ফা বা মন্দিরে এসে উঠলাম। এটি বৃহৎ একটি মালভূমি এবং অতিপ্রশস্ত ফুলবাগান দিয়ে এই গোম্ফা পরিবেষ্টিত। এর চারিদিক খোলা। উত্তরের দিগন্তলোক আড়াল ক'রে রয়েছে আদি অন্তহীন গিরিরাজ হিমালয়। দক্ষিণেও তেমনি, দূর দূরান্তর অবধি প্রসারিত সমতল জলপাইগুড়ির অরণ্য, জলাভূমি, অসংখ্য চা বাগান এবং একটির পর একটি

নদী—যাদের বন্যার তাড়নায় জলপাইগুড়ি জেলা আবহমানকাল থেকে উৎপীড়িত। সব নদী নামছে ভূটানে। আমাদের সামনে সুবৃহৎ সঙ্কোশ নদীও তাই। শুধু গোম্ফার উপর থেকে দেখতে পাচ্ছিলুম সঙ্কোশের ওপারে সেই টোটো বস্তী ভূটান পাহাড়ের ঠিক নিচে।

দেবাদিদেব হিমালয় তাঁর সহস্র জটা বিস্তার ক'রে চোখ বুজে রইলেন ভূটানের হিমালয়ে। রইলো চমলহরি আর কৃষ্ণপর্বতের গগনভেদী রৌপ্যচূড়া, রইলো 'মনিউল, কাংটো আর মাগোর' দুরতিক্রম্য গিরিসঙ্কট, রইলো পুণাখা থেকে সুদূর দুর্গমলোকে ক্যারাভান পথ,—যে পথ গেছে তিব্বতের অজানা অনামা বালুপাথরের প্রান্তরে,—কিন্তু তাঁর পায়ের নীচে রয়ে গেল সহস্র সর্বনাশা নদীর ধারা, অনধ্যুষিত অপরিচিত বিশাল জলাজঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ,—যেখানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী, হায়না, অজগর, শূকর, হরিণ, শম্বর, সরীসৃপ ইত্যাদির অবাধ স্বচ্ছন্দ রাজরাজত্ব। তিনি নিমীলিতনেত্র যোগাসীন তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই কল্পে কল্পান্তে। চরাচরব্যাপী পশুদল রইলো তাঁর আসনের নীচে,—প্রসন্নবদন পশুপতি রইলেন ধ্যানগম্ভীব।

॥ ১০ ॥

কোশীর সাঁকো আরেকবার পার হচ্ছিলুম। পাহাড়ের প্রাকার-চক্রান্ত ভেদ ক'রে সাঁকোর তলা দিয়ে কোথা থেকে যেন আলো এসে পড়েছে। পাহাড়ের শিরদাঁড়ার এটা পশ্চিম পার, আমরা যাবো পূর্বপারে। নদী পেরিয়ে গাড়ী চললো আবার চড়াইপথে।

যাচ্ছিলুম আলমোড়া শহরের দিকে। শশাঙ্কবাবু সঙ্গেই আছেন। আট মাইল চড়াইপথ আর বাকি। কিন্তু এবার একটু স্বস্তিব নিশ্বাস ফেললুম। পাহাড় জরিপ ক'রে একদা যারা মোটরপথ বার করেছিল তাদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদও জানাই, ক্ষুরে-ক্ষুরে নমস্কারও করি। মনে কৌতুক ছিল বটে কিন্তু ভয় আর অপঘাতের দুর্ভাবনা সর্বশরীরকে আড়ষ্ট ক'রে রেখেছিল ঘণ্টা কয়েক। যকৃতে মোচড় লেগেছে বার বার, কাঠ হয়েছে মেরুদণ্ড, বিপ্লব বেধেছে অন্ত্রেতন্ত্রে কতবার। আর হৃদযন্ত্র,—থাক হৃদয়ের কথা আর নাই তুললুম। পাহাড়ের প্রত্যেক বেণ্ডে মৃত্যুর ভয় পেয়ে আমার অন্তর্যামী বাঁধন কেটে পালাবার চেষ্টায় ছিল। শশাঙ্কবাবুর সুবিধা, এই ভয়-ভাবনা তাঁকে বিশেষ স্পর্শ করে না। গাড়ীর জানলা দিয়ে ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া পেলেই তিনি ঘুমিয়ে পড়তে জানেন।

'গাগর' গিরিশ্রেণী ছেড়ে 'কূর্মাচলে' এসে ঢুকেছি। এটি আলমোড়ার অপর নাম। কুমায়ুন নামটি এসেছে কূর্মাচল থেকে, লোকে বলে। নাম কেন বদলায় বার বার, জানিনে। কিন্তু বদলায়। দেশের নাম, নগর ও পাহাড়ের আঞ্চলিক নাম,—সবই বদলায়। হস্তিনাপুর থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ, তারপর দিল্লী। লক্ষ্মণাবতী হোল লক্ষ্মৌ। পাটলীপুত্র পাটনা। কাশী, 'জীশ্বরী' বারাণসী বেনারস, বানারস, -এখন আবার নাকি ফিরেছে 'বারাণসীতে'। পিটার্স বাগ, পেট্রোগ্রাড, লেলিনগ্রাড। সিন্ধু, হিন্দু, ইন্দে, ইণ্ডিয়া—অথচ 'ভারত' সকলের আগে। পাহাড়ের নামও বদলেছে যখন খুশী। গৌরীশিখর হয়েছে এভারেষ্ট। কৃষ্ণগিরি হোলো কারাকোরম। কালদণ্ড হলো লান্সডাউন। আরও আছে অনেক। কূর্মাচলকে কেউ আবার বলে 'কূর্মাঞ্চল'। কিন্তু নদীর নাম কথায়-কথায় বদলেছে এখনও শুনিনি। ওটা স্থাণু নয়, ধারাবাহিক—তাই হয়তো টি'কে আছে। গঙ্গা হোলো গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর, এই দুহাজার মাইলে হাত দিতে হয়তো কেউ ভরসা পায়নি। অনেকের নিজের নামটি বদলাবার শখ আছে, কিন্তু বাপের নামটি বদলাতে ভয় পায়। প্রথমত সম্পত্তি আর পরিচয় নিয়ে টানাটানি, দ্বিতীয়ত জননীর প্রতি অবিচার।

এলোমেলো কথা নিয়ে চ'লে এসেছি অনেকটা পথ। গাড়ী হাঁসফাঁস করতে করতে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। মধ্যাহ্নকাল সমাগত, দক্ষিণ পাহাড়ের প্রায় শিখরে হেমন্তের সূর্য। এবার দূরের থেকে দেখা যাচ্ছে আলমোড়া। কিন্তু শহর তখন অনেক উঁচুতে। আমাদের সামনে সুদীর্ঘপথের রেখা উত্তরে প্রসারিত। উত্তর দিয়ে ঘুরে আমরা যাবো পূবে।

মধ্যাহ্ন প্রখর, শীতের হাওয়া এখনও ওঠেনি আলমোড়ায়। আমরা উঠে এলাম আলমোড়া শহরের প্রধান রাজপথে—এটির নাম 'গান্ধীমার্গ'। শহর মস্ত বড। নৈনীতালকে ছেড়ে দিলে আলমোড়ার মতো বড শহর কুমায়ুনে আর নেই। কাঠগোদাম স্টেশন থেকে আলমোড়ার দূরত্ব হোলো পঁচাশি মাইল মোটরপথে,—বরং কিছু বেশী। কিন্তু রামগড়ের পথ দিয়ে এলে পথ অর্ধেক ক'মে যায়। তবে সে-পথটি বরাবর ছিল পায়ে হাঁটা, কিংবা ঘোড়া অথবা ডাণ্ডি। এখন মোটরবাস চলে।

'আনন্দময়ী' ধর্মশালা ছাড়িয়ে আমরা এসে উঠলুম 'রয়াল' হোটেলে। প্রথমেই যেটি চোখে পড়ে সেটি হোলো জলাভাব। জল আলমোড়ায় বড় কম—। মানে, আমি শহরের কথা বলছি,—জেলার কথা নয়। যেটি কালীগঙ্গা, ধবলীগঙ্গা, কোশী, গোমতী ইত্যাদির দেশ, সেখানকার সর্বপ্রধান শহরে

জলের অভাব—বৈজ্ঞানিক যুগে এটি মন মানতে চায় না। সম্ভবতঃ এর প্রধান কারণ, শহরের সঙ্গে উচ্চতর কোনও বড় পর্বতের ভূসংযোগ কম। জলের ব্যবস্থা করতে হয় নীচের থেকে। প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি, যে সমস্ত উঁচু পাহাড়ে ঝরণা নেই, কিংবা যে সকল শিখরলোকে জলের সংস্থান কম, তার ত্রিসীমানায় যায় না কেউ—সে সব পাহাড় ভীতিজনক। সেই কারণে সাধুসন্ন্যাসী হোক আর পার্বত্য অধিবাসীই হোক,—সবাই খোঁজে সুউচ্চ পাহাড়ের কোল। যেখানে ঝরণারা নামে, যেখানে গুহাগহ্বরের আশপাশ একটু বনময়,—যেখানে নির্মল জলের ধারা খুঁজে পাওয়া যায়। মনে রাখা দরকার, ঝরণামাত্রই নিরাপদ নয়। অনেক প্রকার বন্য এবং ঔষধিলতার ধোয়াট নামে অনেক ঝরণায়, অনেক প্রকার ধাতব মিশ্রিত থেকে যায়। বিশেষ ক'রে পাহাড়ের উপর দিকে যদি জনবসতি থাকে, তবে সেই পাহাড়ের নীচেকার ঝরনাগুলি অত্যন্ত দূষিত জল নিয়ে নামে। উদরের পীড়া হোলো পাহাড়ের মারাত্মক পীড়া। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকেও পাহাড়ে তিলে তিলে পেটের ব্যামোয় মরতে দেখেছি। সাধু সন্ন্যাসীদের কথা আলাদা। যানবাহনের প্রবল ভীড়ের মধ্যেও কলিকাতার স্বল্পবেতনভোগী হতভাগ্য কেরানীরা যেমন সহসা গাড়ীচাপা পড়ে না, সেইরূপ অর্ধাহারী অর্ধনগ্ন সাধু-সন্ন্যাসীরাও ঝরনার জলের হাত থেকে বাঁচে।

বেশ আছি 'রয়াল হোটেলে'। একটু বড় মানুষী, একটু বিলাস,—একটু বা ছড়ি ঘুরিয়ে পাহাড়ের 'রীজের' ওপর দিয়ে অনেক দূর চ'লে যাওয়া,—দিন কেটে যাচ্ছে ভালোই। শহর বড় আকর্ষণ নয়,—কেননা কলকাতার চৌরঙ্গী দেখা আছে, বহুবাজার ষ্ট্রীটও চিনি। এটি জেলার প্রধান কর্মকেন্দ্র, সুতরাং কোর্ট-কাছারি থেকে আরম্ভ করে গোরাছাউনী ও বাজার-হাট সবই আছে। আবহাওয়ার দিক থেকে নৈনীতাল অপেক্ষা এখানে ঠাণ্ডা বোধ হয় একটু কম। নৈনীতালে এরই মধ্যে কনকনানি এসে গেছে, কিন্তু আলমোড়ায় এখনও হাওয়া ওঠেনি। অনেক মন্দির এবং অনেক দেবস্থানে মঙ্গোলীয় স্থাপত্যের ছাপ পড়েছে। পশ্চিম তিব্বতের পথ এখান থেকে সর্বাপেক্ষা সহজ। তিব্বতের সঙ্গে আলমোড়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সর্বত্র বিদ্যমান।

আলমোড়ার একান্তে রয়েছে প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় রাজাদের একটি পুরাতন দুর্গ। মন্দির অনেকগুলি। তাদের মধ্যে নন্দাদেবী, ত্রিপুরাসুন্দরী, পাতালপুরী, কাসারদেবী, বদ্রীশ্বর—এগুলি প্রধান। এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন শহর থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটি অতি রমণীয় এবং নিরিবিলি

পাহাড়ের কোলে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে কোনো কোনো সময়ে অভ্যাগতরা বাসস্থান পেয়ে যান।

নানাপথ এখান থেকে নানাদিকে চ'লে গেছে। কিছুদূরে কাসারদেবী পাহাডের কোলে জনৈক আমেরিকান সাধু একটি পাইনের বনে তাঁর একটি আশ্রম বানিয়ে রয়েছেন। আরো রয়েছেন কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য দেশের শিক্ষিত এবং পণ্ডিত ও সংসারত্যাগী ব্যক্তি, এখানকার পাহাড়ে-পাহাড়ে তাঁরা অধ্যাত্মসাধনা করেন। আলমোডায় যে বন্য প্রকৃতির একটি প্রবল আকর্ষণ রযেছে, সেটি নৈনীতালে ঠিক তেমনটি নেই। আধুনিক জডবিজ্ঞানের সঙ্গে যে স্থূল উপকরণবাহুল্য দেখা যায়, তাব থেকে স'রে যেতে চাইছে সৌন্দর্যপিপাসু মন,—যে-মন দার্শনিক। সম্ভোগের প্রচুর উপকরণ দেখে ভয় পেযেছে অনেক চিন্তাশীল মন, পাছে তাদেব তলায় চাপা পড়ে মানুষের মহৎ বৃত্তি, পাছে সুখভোগের বিপুল বস্তুসম্ভার তাদের পরমার্থ পিপাসা ও তত্ত্বজ্ঞানের পথে বিঘ্ন ঘটায়। আলমোডা থেকে প্রায় কুডি-বাইশ মাইল দূরে পাহাড় প্রকৃতির একটি অতি মনোরম নিভৃত কোণে আরও কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিত ও সাধক অপব একটি আশ্রম বানিযেছেন। আশ্রমটির নাম হোলো 'উত্তর বৃন্দাবন'। ওখানে আছে শ্রীকৃষ্ণের একটি মন্দির। চিতোরের রাণাকুম্ভের পত্নী মহীয়সী মীরাবাঈ যে ধরনের সাধন-ভজনের পথে আপন জীবনকে সার্থক করে তুলেছিলেন, এখানকার সজ্জন সাধুগণ অনেকটা যেন সেই প্রকার আপন জীবন ও সত্তাকে বিলীন ক'রে রেখেছেন। এঁদের মধ্যে একজন সাধক তাঁর পাণ্ডিত্য, রসবোধ এবং অধ্যাত্ম তপস্যার জন্য বাঙালীর নিকট সুপরিচিত। তাঁর নাম কৃষ্ণপ্রেম, ওরফে রোনাল্ড নিক্‌সন্, আরেকজন আছেন, 'আনন্দপ্রিয়', ওরফে মেজর আলেকজান্দার। 'উত্তর বৃন্দাবনে' আরও অনেকেই আছেন তাঁদের সঙ্গে। বিস্ময়ের কথা এই, যে-কাশ্মীরকে কথায়-কথায় ভারতের 'ভূস্বর্গ' বলা হয়,—সেখানে সাধুসন্তসন্ন্যাসীর আশ্রম-সংখ্যা খুবই কম। হিমাচল প্রদেশে, পাঞ্জাবে,—অর্থাৎ হিমালয়ের দুস্তর উত্তর অঞ্চলে ঠিক সাধুর আশ্রম, তপোবন, কুটীর প্রভৃতি বলতে যা বোঝায় তার সংখ্যা খুব গণ্য নয়। সংসারত্যাগী, বৈরাগী, গৃহবিমুখ, সন্ন্যাসী—এঁরা সবাই আপন আপন আবাসস্থল নির্বাচন করেছেন প্রধানত কুমায়ুনে। আবার কুমায়ুনের মধ্যে নৈনীতালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাঁদের কম। তাঁরা আনন্দ পেয়েছেন ব্রহ্মপুরা গাড়োয়ালে আর কূর্মাচল আলমোড়ায়। এ দুটি অঞ্চলে এসে পৌছলে চিন্তা ও ভাবনার পথ সহজেই যেন অধ্যাত্মগতি লাভ করে। সভ্যতার থেকে দূরে, সকল প্রকার লোককোলাহলের বাইরে, বাস্তব

প্রয়োজনের অতিক্রান্ত যে-জীবন আপন সৌরবিশ্ব রচনার একটি স্বাচ্ছন্দ্য পায়, গাড়োয়াল এবং আলমোড়ার পাহাড়ে ও গিরিনদীতটে তার সন্ধান মেলে।

কুমায়ুনের দুই উত্তর সীমানায় দুটি প্রধান নদী। পশ্চিমে শতদ্রু, পূর্বে কালীগঙ্গা। দুইয়ের মধ্যে দুশো মাইলের ব্যবধান। এই দুশো মাইলব্যাপী সমগ্র উত্তরলোক কমবেশী পনেরো থেকে ষোলো হাজার ফুট উচ্চ পর্বত প্রাকারের দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাকারের ওপারে হোলো পশ্চিম তিব্বত। পশ্চিম তিব্বতের একটা বড অংশ একশো পনের বছর আগে ভারতীয় কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেটি হোলো লাদাখ পর্বতমালা এবং তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল। সেখান থেকে দক্ষিণে নেমে শতদ্রু পার হয়ে আবার ভারত তিব্বত সীমানা সোজা এসেছে দক্ষিণে। এখানে তিব্বতে প্রবেশকালে প্রথম যে গিরিসঙ্কট পাওয়া যায় তার নাম হোলো 'শিপ্‌কি'। শিপ্‌কি বুশাহর রাজ্যের শেষ সীমানা। শিপ্‌কির পর থেকে সুদীর্ঘ দুশো মাইল অতি দুর্গম পর্বতমালার দেশ। কিন্তু মানুষের অধ্যবসায় এই দুঃসাধ্য এবং ভয়ভীষণ প্রাণিশূন্যপ্রায় গিরিশৃঙ্গদলের ভিতরে ভিতরে আরও অনেকগুলি গিরিবর্ত্ম একে একে আবিষ্কার করেছে। তারা হোলো 'ঠাগা, মানা, নিতি, শল্‌শল্‌, আন্তধুরা, দরমা, লামপিয়া'—এবং অবশেষে হোলো লিপুলেক। লিপুলেকের পাশেই কালীগঙ্গার উৎপত্তিস্থল। ভারতের সীমানা আপাতত ওখানেই শেষ, অর্থাৎ কালীগঙ্গার পূর্বপারে হোলো নেপাল, কিন্তু কালীগঙ্গার ধারাটি ভারত সীমানারই অন্তর্ভুক্ত।

লিপুলেক থেকে টনকপুর—উত্তর থেকে দক্ষিণ—কমবেশী প্রায় দুশো মাইল হাঁটা পথ। এই দুশো মাইল দীর্ঘ হোলো কালীগঙ্গার ধারা। সম্প্রতি টনকপুর থেকে পিথোরাগড় অবধি মোটরপথ গেছে, এবং পিথোরাগড় থেকে আশকোট পর্যন্ত মোটরপথ নিয়ে যাবার আয়োজন দ্রুতগতিতে চলছে। শুধু আশকোট নয়, এ পথ গৌরীগঙ্গা পেরিয়ে ধরচুলা ছাড়িয়ে যাবে আরও অনেক দূর। যদি পথটি সম্পূর্ণ হয়ে যায় তবে কৈলাস-মানসের তীর্থযাত্রীর পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়। কেননা আলমোড়া থেকে 'আশকোট' অবধি সত্তর মাইল পায়ে হাঁটা পথ ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণের টনকপুর থেকে 'আশকোট' পর্যন্ত ১৩০ মাইল পথ তারা মোটরযানে অতিক্রম করতে পারবে। হয়তো শীঘ্র এমন অবস্থা দাঁড়াবে যে, আলমোড়া শহরকে ছেড়ে দিয়ে 'আশকোট' হবে কৈলাস-মানস যাত্রার প্রধান প্রারম্ভ কেন্দ্র।

কৈলাস এবং মানস সরোবর তীর্থযাত্রার আলোচনাটা বলা বাহুল্য, আলমোড়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ভারতবর্ষের যে কোনও অঞ্চল থেকেই কৈলাসের পথে যাওয়া চলে—এমন কি কাশ্মীর, পাঞ্জাব, গাড়োয়াল, সিকিম, দার্জিলিং ও আসাম থেকেও যাওয়া সম্ভব। এই সকল অঞ্চল দিয়ে কৈলাস ও তিব্বতে যাবার জন্য ক্যারাভান পথ আজও চালু আছে। অভিযাত্রিকের যাবার পথ চিরদিনই অবারিত। কিন্তু সেই অতিমানবিক কষ্টস্বীকারের ধৈর্য এবং অসীম অধ্যবসায় গৃহগতপ্রাণ সাধারণ বাঙালী চরিত্রে কম। যদি কেউ কাশ্মীর থেকে কৈলাস মানসে যায় তা'কে ছয়শো মাইলেরও বেশী অতিক্রম করতে হবে। পথ হোলো শ্রীনগর থেকে 'লে' (লাদাখ) এবং সেখান থেকে দক্ষিণে, 'তাসিগঙ', গাবটক, 'তীর্থপুরী' ও কৈলাস। হিমাচল প্রদেশ দিয়ে গেলে সিমলা, নারকান্দা, চিনি, শিপ্‌কি ও গারটকের পথ। এইসব দুস্তর অঞ্চলের ভিতর দিয়ে ক্যারাভানের সঙ্গে সঙ্গে অভিযান করলে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কেউ বাধা দিত না। পথ ডাকছে, কিন্তু সাড়া দিচ্ছে কে? সেই দুরন্ত যৌবনের আত্মবিদারণ সকলের জীবনে ঘটে না। আখড়ায় গিয়ে কুস্তি শিখলে মাংসপেশী ফোলে, ডন-বৈঠক-মুগুর ভাঁজলে সুন্দর দেহ তৈরী হয়,—কিন্তু ওতে কি দুর্জয় সৎসাহস বাড়ে? দুঃখ-দুর্যোগ-ভয়—এদের জয় করার মতো উদ্দীপনা ওতে আসে কি? ব্যায়ামের দ্বারা ধৈর্য ও অধ্যবসায় পাওয়া যায় কি?

'নিতি' গিরিসঙ্কট হোলো গাড়োয়ালের উত্তরে। 'হোতি-নিতি', 'গুন্‌লা নিতি' এবং 'দামজান নিতি'। যোশীমঠ থেকে অগ্রসর হ'লে এই তিনটি পথে তিব্বতে প্রবেশ করা যায় এবং এক একটি পথে প্রায় আড়াইশ' মাইল পর্যন্ত গেলে কৈলাস মানস। আহার, আশ্রয় এবং ঘোড়া—এ তিনটেই নিয়মিত মেলে না বটে, কিন্তু তবু অনেকে যায়। হিমালয়ের টান হোলো অপ্রতিরোধ্য টান। যে ব্যক্তি শোনে, সে ঘরে থাকে না। যে ব্যক্তি একবার যায়, সে ওখানকার ওই দুঃখে, দুর্গমে, দুর্যোগে গিয়েই আনন্দ পায়,—ঘরে তার সুখ নেই। ওই ছিন্নভিন্ন পোশাকপরা ধূলিমলিন পার্বত্যসন্তানদের দরিদ্র ঘরের কাঠের আগুনের আভায় ব'সে তারা আনন্দ পায়। ওই দুরারোহ গিরিমালার আশেপাশে, গুহাগহ্বরে, গিরিনদীর তটে-তটে, এক বিস্ময় থেকে অন্য বিস্ময়ে—তারা ঘুরে বেড়ায়। আনন্দের অসহ যন্ত্রণা, সুখের নিবিড় অশ্রুসজলতা, বেদনার বিচিত্র আনন্দ—এরা তাকে ফিরতে দেয় না, স্থাণু থাকতে বলে না—আঁচলের তলায় ফিরে যাবার পথ দেখায় না। কত কঠিন মন গ'লে গেছে হিমালয়ের পাথরে-পাথরে মাথা ঠুকে, কত

দস্যুরত্নাকর মহামুনি বাল্মীকিতে পরিণত হয়েছে,—কেউ তার খোঁজ রাখে না। জীবনের পণ্য হারিয়ে গেছে কত মানুষের, কত বিশ্বাস ভেঙে গেছে, কত ঈশ্বর কতবার পথের ধূলোয় আসন নিয়েছে,—কেউ কি তার খবর জানে? মেঘলোকে উধাও হয়েছে, তুষারদেশে হারিয়ে গেছে, কেঁদে-কেঁদে নিরুদ্দেশে পাহাড়ে মিলিয়েছে,—তাদের সংখ্যাও তো কম নয়? দার্শনিক তার জ্ঞানকে ঘষেছে হিমালয়ের কষ্টিপাথরে, কত নারী-তপস্বিনী তাদের কঠিন জপের মন্ত্র পাঠিয়েছে ওই রণোন্মত্তা পার্বতীনদীর সফেন ধূম্র-জটার স্তবকে-স্তবকে,—হিসাব রেখেছে কি কেউ?

কৈলাস-মানস কঠিনসাধ্য,—কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক পথ আলমোড়া। আলমোড়ার নীচে দিয়ে গেছে দু-একটি পথ,—কোনটি সরযূ, কোনটি বা গোমতীর তীরে তীরে,—কিন্তু বিশেষ একটি অঞ্চলে গিয়ে তাদের মিলতেই হয়েছে। প্রধান এবং সুবিধাজনক পথ হোলো আলমোড়া থেকে থাল, আশকোট, জওলজিবি, ধরচুলা, খেলা, মাল্‌পা, গারবিয়াঙ, লিপুলেক ও তাকলাকোট। কিন্তু মাঝখানে একটি শাখাপথ 'খেলা' অঞ্চল থেকে ধবলী গঙ্গার তীরে তীরে চ'লে গেছে 'পঞ্চোলী' ওরফে 'পঞ্চচূলীর' উত্তুঙ্গ শিখর-লোকের পূর্বপ্রান্ত ঘেঁষে সোজা উত্তরে 'দরমা' গিরিসঙ্কট পেরিয়ে। এই পথে পাওয়া যায় পশ্চিম তিব্বতের একটি প্রধান বাণিজ্য শহর। নাম, 'গিয়ানিমা মণ্ডি'। এই কেন্দ্র থেকে কৈলাসের দূরত্ব বোধ হয় প্রায় সত্তর মাইল, এবং মানস-সরোবরের দূরত্ব খুব সম্ভব পঞ্চাশ মাইলের বেশী নয়। কিন্তু এ পথটি ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাজনক,—তীর্থযাত্রীর পক্ষে দূর হয় একটু বেশী।

আলমোড়া থেকে কুড়ি মাইল দূরে সরযূ নদী পার হয়ে চলে গেছে 'থাল'-এর পথ। মাঝখানে পেরিয়ে যেতে হয় ভেরিনাগ। 'ভেরিনাগ' থেকে হিমালয়ের কয়েকটি তুষারচূড়া দেখে মন মুগ্ধ হয়ে যায়। নন্দাদেবী, নন্দকোট, ত্রিশূল ও পঞ্চচুলির শোভা এখানে হিমালয়ের চিররহস্যকে কথায় কথায় প্রকাশ করতে থাকে। এর পরে আশকোট, জওলজিবি ও ধরচুলার পথ। নদী, ঝরনা, উপত্যকা, অরণ্য, মন্দির এবং বিভিন্ন দেবস্থান—সমস্ত মিলিয়ে ধীরে ধীরে তীর্থযাত্রীকে কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন করতে থাকে। এ হোলো ডাকিনী মায়ার টান, স্নেহমমতার টান, সংসারের প্রতি আসক্তি, বিষয়-বৈভবের প্রতি আকর্ষণ, সুখ-দুঃখ—আনন্দ—বেদনার স্মৃতি, সমস্তই যেন লোপ পাচ্ছে ধীরে

ধীরে, গত-কালের কথা গত জীবনের মতো বিলীন হয়ে যায় যেন জন্মান্তরে। তুমি নিজে যাচ্ছ না, কোনও শক্তি তোমার নেই,—কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তি টানছে তোমাকে সামনের দিকে। হিঁচড়ে-হিঁচড়ে টানছে! ক্ষতবিক্ষত হচ্ছ, কিন্তু নিজে তুমি দায়ী নও। দুর্গম পার হয়ে যাচ্ছ, কিন্তু নিজের শক্তিতে নয়। মৃত্যু লেলিয়ে দিচ্ছে কেউ, মুখ দিয়ে রক্ত আর ফেনা তুলে দিচ্ছে, শরীরকে শীর্ণতর করছে। দুঃসহ দুঃখ, ভয়, বাধা—এরা পথরোধ ক'রে দাঁড়াচ্ছে, দুঃস্বপ্ন আর চিত্তগ্লানিতে ঘুলিয়ে উঠছে তোমার প্রতি পদক্ষেপ। পাহাড়ী সাপ দিচ্ছে ছেড়ে, কোথাও কোথাও তোমায় পায়ের তলায়, ঘোড়া কিংবা ঝব্বু থেকে-থেকে ফেলে দিচ্ছে তোমায় অসতর্কক্ষণে, অন্ন আর আশ্রয় কেড়ে নিচ্ছে কোথাও কোথাও। বিরাট খদের মৃত্যুগহ্বরের নীচে তোমার সাংঘাতিক অবলুপ্তির জন্য ডাকছে তোমাকে পিশাচীর করাল দৃষ্টি,—কিন্তু তবু তুমি সমস্ত অস্বীকার ক'রে এগিয়ে যাচ্ছো। তুমি নয়, অন্য কেউ। যে-ব্যক্তি গারবিয়াং-কালাপানির দিকে এগোচ্ছে, যে ব্যক্তি গৌরীগঙ্গা আর কালীগঙ্গার ধারে ধারে চলেছে,—সে তুমি নয়, তোমার থেকেই বেরিয়ে এসেছে আরেকজন,—তাকে তুমি চিনবে না। সে দুঃখের আগুনে জ্বলে-পুড়ে এবার খাঁটি হয়েছে, সে প্রকাশ করেছে তার দুঃখদীর্ণ প্রাণের একাগ্রতা, প্রমাণ করেছে তার প্রবল আন্তরিকতা। দৈত্য-দানব প্রেতিনী-পিশাচীর ভয়ে আপন যজ্ঞ সে পণ্ড করেনি, প্রবল প্রাণ এবং অটল বিশ্বাসকে শত দুর্যোগেও সে হারায়নি। আতঙ্কের ভিতর থেকে সে বীর্যলাভ করেছে, মত্যুভয়ের চক্রান্ত থেকে লাভ করেছে সে অভয়মন্ত্র। একথা সে প্রমাণ করার চেষ্টা পেয়েছে যে, দুর্গম তীর্থপথে যাত্রা করাই হোলো আত্মশুচিতা সম্পাদনের প্রধান পথ। তুমি তাকে চিনবে না। তার জন্য দ্বার খোলা হচ্ছে অলকায়, ডাক দিচ্ছে তাকে 'স্বর্ণভূমি'। সে এবার উঠে এসেছে মত্যুর থেকে জীবনে, জীবন থেকে চলেছে মহাজীবনে। কিন্তু সেখানেও হবে তার শেষ পরীক্ষা। তুষাররাজ্যে প্রবেশ ক'রে লক্ষ লক্ষ বৈদূর্যমণির জ্বলজ্বলায় তার চোখের মনি হয়তো অসতর্ক মুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত হবে। কিন্তু তারপরে তার দৃষ্টিতে আসবে প্রশান্তি। দর্শন করবে সেই দিব্য দীপ্যমান বিভা, যার ফলে পলকের মধ্যে তার যোগসমাধিলাভ ঘটবে, সমগ্র জীবন যার দর্শনমাত্র শ্রেষ্ঠ অনুভূতি লাভ করবে।

কৈলাস ও মানসসরোবর যাত্রাই হোলো তীর্থযাত্রার পরম সার্থকতা।

'চিতাই' রোড ধ'রে ফিরে আসছিলুম। 'নারায়ণ তেওয়ারি দেওয়াল' পেরিয়ে গণেশ মন্দির ছাড়িয়ে চলেছি। ভরা শুক্লপক্ষে মায়ারহস্য ফুটেছে পাহাড়ে এবং পূর্বপাহাড়তলীর উপত্যকায়। ডানদিকে সরকারী এক একটি কর্মকেন্দ্র। আরেকটু এগিয়ে এলে সরকারী জেল। জেলের ভিতরে কয়েদীদের জীবনযাত্রা জানার উপায় নেই বটে, কিন্তু এমন নিভৃত অঞ্চলে এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে জেলখানা দেখলে কয়েদীদের প্রতি একটু ঈর্ষা হয় বৈকি। দার্জিলিঙের কথা মনে পড়ছে। লুইস জুবিলীর বারান্দায় দাঁড়ালে নীচের দিকে জেল: চম্পাবতীর সেই ময়দানের ধারে দাঁড়ালে ইরাবতীর কোলে সেই জেল। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বিশেষ ক'রে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকটি জেলখানা দেখে খুবই আনন্দ পাওয়া যায়।

পথ নির্জন চন্দ্রালোকিত। কতকটা পরিশ্রমসাধ্যও ছিল। হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে বনবাগান ঘুরে শশাঙ্কর সঙ্গে ফিরছিলুম। শহরে এসে পৌঁছতে আর বাকি নেই। এমন সময় দূরের থেকে দুটি লোককে কাছে আসতে দেখা গেল। একজন কথা বলছে গলগলিয়ে, আরেকজন অসীম ধৈর্যসহকারে শুনছে। কাছাকাছি এসে পাশ দিয়ে চ'লে যাবার সময় বাক্যবাগীশ লোকটি সহসা থামলো, এবং আমাদের দিকে ফিরে বিনা ভূমিকায় পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করলো, আপনারা বাঙালী নিশ্চয়?

ঈষৎ বিস্মিত হলুম। ভদ্রলোকটি সুশ্রী এবং সৌম্যদর্শন। তাঁর পোষাকটি ঘোড়সওয়ারের মতো। পরনে 'ব্রীচেস'। নীচের দিকে বুট, এবং হাতে একটি ছড়ি। পল্টনের লোক মনে করেছিলুম। প্রশ্নের জবাবে বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ—

ভদ্রলোক বললেন, আমি বলদেও যোশী। বহুদিন বাঙলায় ছিলুম। ভারতের মধ্যে আমার সকলের বেশী প্রিয় বাঙলা দেশ।

প্রশ্ন করলুম, আপনি কি পাটের কারবার করেন?

হাসিমুখে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, একেবারেই না।

সবিনয়ে জানালুম, যাঁরা পাট, কাপড়, বনস্পতি কিংবা সরষের তেল এসব নিয়ে কারবার করেন—বাঙলা তাঁদের কাছে খুবই প্রিয়।

এ আপনার ভুল ধারণা!—যোশী কলরব ক'রে উঠলেন, তারাই সব চেয়ে বেশি হেনস্তা করে বাঙলাকে। তারাই বাঙলাকে নির্বোধ বানিয়ে লাখো লাখো টাকা নিয়ে যায়। দেখুন, এ নিয়ে অনেক কথা উঠবে, আমি বেশী বাড়াতে চাইনে। কিন্তু আমার কাছে বাঙালী নমস্য। বাঙালীর

পায়ের কাছে ব'সে একদিন আমি পলিটিক্স-এ দীক্ষা নিই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আমার পরম গুরু। গান্ধীজীর পরে তিনিই বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

ভদ্রলোক তাঁর সুদীর্ঘ রাজনীতিক জীবনের কাহিনী আরম্ভ করলেন। একটা সময়ে তিনি নাকি সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। সেটি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ,—'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'র জন্মকাল। বিরাট শোভাযাত্রাসহ আবেদন নিয়ে যাচ্ছেন সুভাষচন্দ্র সেবারকার কলকাতার কংগ্রেসমণ্ডপে। সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করছেন জওহরলাল। কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জওহরলালের পিতা পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু। সুভাষচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেস সভাপতির শোভাযাত্রার 'জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং ইন চীফ।' অশ্বারোহী সুভাষ, সৈনিকের পোশাকে সুভাষ,—এবং সেই পোশাকের সম্মান তিনি রেখেছিলেন পরে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সর্বাধিনায়ক হয়ে। যাই হোক, আমি সেই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'র প্রধান অফিসার ছিলুম।—মিঃ যোশী সোচ্ছ্বাসে গল্পটা বলতে লাগলেন।

ঘণ্টাখানেক ধ'রে তিনি আমাদের কারোকে কথা বলতে দিলেন না এবং এমন চমৎকার ক'রে তাঁর গল্প বলতে লাগলেন, যে, আমি আর শশাঙ্ক যেমন অভিভূত, তেমনই মুগ্ধ। চাঁদের আলোয় ভদ্রলোকর বয়সটি ঠাহর হচ্ছে না, মাথায় ছিল সৈনিকেব টুপি।—কিন্তু তাব সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান চেহাবার মধ্যে একজন বিশেষ বিক্রমশীল যোদ্ধা যে আজও বয়েছে, এতে ভুল নেই। তাঁর কথায় আমাদেব প্রতি এমন স্নেহ প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পাচ্ছিল যে, আমরা তন্ময় হয়ে ঘণ্টাখানেক সেখানে দাঁড়িয়ে বইলুম। আজ আমাদের সারাদিনের পরিভ্রমণটি যে সার্থক হয়েছে,—শশাঙ্ক একথাও স্বীকাব ক'রে নিল।

নমস্কাব, প্রতিনমস্কার এবং বিদায় সম্ভাষণের হিড়িকে আরও মিনিট দশেক লেগে গেল। দেড বছরের আনাগোনার ফলে যে প্রকার প্রণয়কাহিনী গ'ড়ে ওঠে, দেড ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের মধ্যে সেই অন্তরঙ্গতা জন্মে গেল। উভয় পক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলুম, প্রতি সপ্তাহে উভয়ের মধ্যে অন্তত একখানা চিঠি বিনিময় যদি না হয়, তবে পরস্পবেব জীবন ব্যর্থ মনে হবে।

পুরুষে-পুরুষে অথবা মেয়েতে মেয়েতে যখন প্রণয় হয় তখন সে-বস্তু বোধ করি বড়ই গভীর, উপরতলায় তার কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না। কিন্তু পরবর্তী চার বছরের মধ্যে চিঠিপত্র তো দূরের কথা, কেউ কারো খোঁজ-খবরও রাখিনি। চাঁদের আলোয় ভদ্রলোককে দেখেছিলুম, দিনের আলোয় তাঁকে আজ দেখলে চিনতেও পারবো না, এই আমার ধারণা।

এর মধ্যে আবার দিন তিনেক থেকে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে, তাঁর নাম নীলাম্বর পন্থ। তিনি এককালে কলকাতায় ছিলেন, সামান্য কাজকারবারও ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হোলো এই, বাঙলার গ্রামের দুঃখদুর্দশার সঙ্গে তিনি অনেকটা পরিচিত। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষকালে তিনি নিজের খরচে একটি 'খাদ্যবিতরণ কেন্দ্র' খুলেছিলেন শহরতলীতে। এখন তিনি থাকেন এখানে একটি পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে তিনি কয়েকটি গোরু পালন করেন, এবং দুধ ভিন্ন আর কিছুই খান না। বৈচিত্র্য হিসাবে একটু-আধটু ছানা, একটু-আধটু মালাই। তিনি অবিবাহিত। বয়স তাঁর প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। জাতিতে ব্রাহ্মণ। ভদ্রলোক প্রত্যেকদিনই শহরে আসেন বেড়াতে। এখানকার 'গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের' তিনি একজন সভ্য। অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক, এবং হাসিখুশী। এখানে আমাদের কোনও অসুবিধে হ'লে তাঁর ওখানে যে কোনও সময়ে গিয়ে আতিথ্য নিতে পারি, একথা তিনি বারম্বার জানিয়েছেন। তীর্থ এবং মন্দিরের গল্প তাঁর খুবই প্রিয়। তিনি মৃত্যুর আগে এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনকে তাঁর সামান্য যা কিছু আছে দিয়ে দিতে চান—একথা তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। ভদ্রলোক বাঙলা বলতে পারেন।

দূরের থেকে তাঁকে দেখে আমরা নমস্কার ক'রে বললুম, বহু ভাগ্যে আবার দেখা মিললো।

পন্থজী বললেন, মিলতেই হবে। সমস্ত আলমোড়ায় পাবেন দুটি প্রধান সম্প্রদায়—রাস্তায় ঘাটে সর্বত্র। এক হোলো যোশী, অন্য হোলো পন্থ। পন্থ আর যোশী শুনলেই জানবেন, ওদের বাড়ী আলমোড়া। ওরা হোলো পাহাড়ী।

আমরা বললুম, একজন যোশীর সঙ্গেও আমাদের খুব আলাপ হয়েছে। খুব চটপটে আর বাকপটু। মিলিটারী পোশাকে থাকেন। একদিন রাজনীতিতে ছিলেন। আমরা খুব রস পেয়েছিলুম।

পন্থজীর প্রসন্ন মুখখানি সহসা গম্ভীর হয়ে এলো। বললেন, কবে আলাপ হয়েছে?

কাল রাত্রে।

তিনি বললেন, বলদেও যোশীর কথা বলছেন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি চেনেন? কেমন লোক? কী ধারণা আপনার?

পন্থজী এ নিয়ে কথা বাড়াতে চান না। শুধু বললেন, আমার বয়স হয়েছে। আর ক'দিনই বা। অপরের নিন্দে করার আগে নিজের জীবনেই

তো দেখছি কত ত্রুটি 'কত ভুল। শুধু এইটুকুই বলি, বলদেও আপনাদের ওপর চোখ রেখেছে তার নিজেরই প্রয়োজনে। মানুষের বাহ্য পালিশ দেখে বিভ্রান্ত হবেন না।

তাঁর সাঙ্কেতিক ভাষা শুনে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হলুম। সেদিন যাবার আগে পন্থজী ব'লে গেলেন, দেশে ফিরে যাবার জন্য যদি আপনাদের টাকাকড়ির দরকাব হয়,—মনে হচ্ছে দরকার হবেই,—তাহ'লে আমাকে বলবেন। এখানে বেড়াতে এসেছেন, জুয়া-টুয়া খেলার ফাঁদে যেন পা দেবেন না।

পন্থজী চ'লে গেলেন। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাই বেড়ে গেল। তবে পরবর্তী যে কয়দিন আমবা আলমোড়ায় ছিলুম, বলদেও যোশীকে আব দেখিনি।

ভারাক্রান্ত মনে আমবা ফিরে এলুম আমাদেব সেই পরিচিত চায়ের দোকানটিতে। আজও দেখছি আসব জমিয়ে বসেছেন সেই বৃদ্ধ হরিশ্চন্দ্র মহাশয। তাঁব কৌতুক কাহিনী শোনাব জন্য দোকানে এবং দোকানেব বাইবে পর্যন্ত লোক জমে গেছে। তাঁব কীর্তিকলাপ হোলো আন্তর্জাতিক ধরনেব। লোকজন হেসেই অস্থির। বিগত ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধেব কালে তিনি সৈনিক হযে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইংরেজদের সঙ্গে ঘুবে বেড়ান। বাইশটি ভাষা তিনি শিখেছেন। তাঁব মুখে চীনা, জাপানী, জর্মান, মৈথিলী এবং চাটগেঁযে আলাপ শুনে আমরা সবাই আমোদ পাচ্ছিলুম। দুর্বোধ্য স্কচ এবং ফবাসী শুনে হেসে সবাই লুটোপুটি। পার্বত্য 'অহোম্' ভাষায তিনি পাবদর্শী। মিশবীয় আববী এবং মুরজাতির ভাষায় তিনি আশ্চর্য দক্ষ। তাঁব মুখে তামিল এবং তেলেগু শুনে আমাদের চায়ের আসর জমে উঠলো। তিনি এখন সরকারী পেনশন পান। অত্যন্ত সাধু এবং ঈশ্বরভীরু ব্যক্তি। তিনি আলমোড়ারই স্থাযী বাসিন্দা।

একজন বিশিষ্ট বাঙালীব নাম আমবা প্রাযই শুনছিলুম কথায কথায়। এখানে একটি পাহাড় তাঁব নিজস্ব। যেখানে তাঁর মস্ত বড় খেতখামার এবং গবেষণাগার। অনেক ছাত্র এবং শিক্ষক সেখানে মোতায়েন থাকেন। সেখানে নানা যন্ত্রপাতি, কলকব্জা এবং তার জন্য মস্ত অফিস। ফুলে ফলে ফসলে ফলনে সেই পাহাড়টি একেবারে পরিপূর্ণ। সেই পাহাড়ে বাগান যত বড় অট্টালিকা নাকি তারই অনুরূপ। ভদ্রলোকেব নাম বশীশ্বর সেন।

সাহস ক'রে একদিন সকালে তাঁর সেই পাহাড়েব ফটক পেরিয়ে শশাঙ্কর পিছনে পিছনে গেলুম। কুকুরের ভয়, দাবোয়ানের ভয়, এবং তার চেয়েও ভয় বেশী, যাঁদের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি। কেন? কী দরকার ছিল এখানে

আসার? যদি অনামুখো হয়? যদি সাহেবী মেজাজ দেখিয়ে দেঁতো আলাপ করে? আমরাই বা চড়াও হ'তে যাই কেন গায়ে প'ড়ে? থাক্, ফিরে চলো, শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক বললে, আরে এসোই না! মানুষ তো।

মানুষ! কিন্তু বনমানুষ যদি হয়?

ক্রমশঃ দেখা গেল পথ অবারিত। কুকুর অথবা দারোয়ানের দেখা মিলছে না। কোট প্যাণ্টপরা মালী কাজ করছে ফুলবাগানে। হাসিমুখে এগিয়ে এলো দুটি যুবক। দু-একটি কর্মচারীর প্রসন্ন মুখ। আমাদের সংবাদ গেল ভিতরে। এক মিনিটের মধ্যেই এসে দাঁড়ালেন বর্ষীয়সী মেম-সাহেব। সস্নেহ দৃষ্টিতে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি বাগানেই আমাদের বসবার জন্য দুখানি চেয়ার এগিয়ে দিলেন। তাঁর পরিচয় পরে আমরা পেলুম। তিনি সুপ্রসিদ্ধা আমেরিকান লেখিকা 'শ্রীমতী গার্টরুড্ ইমারসন্ সেন।' তাঁর অতি বিখ্যাত গ্রন্থ Voiceless India-র নাম আমাদের জানা ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের চমৎকার ভূমিকা লিখেছিলেন। মিসেস একজন বিশিষ্ট আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের ভগ্নীও বটে।

মিনিট দুই পরেই এলেন বশীশ্বর সেন মহাশয়! শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গ,—বয়স ষাট বছরের কম নয়। তিনি এসেই একেবারে উদার স্নেহে আমাদের দুজনকে আলিঙ্গন।—কী খবর? কি ভাগ্যি আমাদের! বসুন, বসুন,—অনেককাল পরে নতুন মানুষ দেখে আনন্দ পেলুম। আপনাদের কোনও কষ্ট হয়নি তো? কোথায় এসে উঠেছেন? এসব কাজের কথা নয়। আমার এখানে আহারাদি করতে হবে। লোকে আমাকে বলে 'বটানিস্ট', আসলে আমি চাষাভূষো। কিন্তু খবরদার, পালিয়ো না যেন ভাই,—পাহাড়ীলোকের খপ্পরে প'ড়ে গেছো। চুপ ক'রে ব'সে এখানে চা-বিস্কুট চালাও, তারপর আমার ঘরের ভাত-চচ্চড়ি! যদি অনুমতি করো তবে মালপো খাওয়াবো! রাত্রে মাংস-পোলাও। ওরে ওই, চুপ ক'রে আছিস কেন রে। দুটো প্রাণের কথা বলরে ভাই! হাঁপিয়ে উঠেছি যে!

আমরাও হাঁপিয়ে উঠেছি। অনেকটা যেন বন্যাস্রোতে ভেসে গেছি। মনে প'ড়ে গেল বহু বছর আগেকার কথা। তরুণ বয়সে একবার এলাহাবাদ কুম্ভ-মেলায় যাচ্ছিলুম। বোম্বাই মেল-এ থার্ড ক্লাসে একটি লোক আমাকে ডেকে অনেক ভীড়ের মধ্যে জায়গা দিল। বললে, বসুন গুছিয়ে, একটা রাত্রের তো মামলা।

বর্ধমানে পৌঁছে লোকটা বললে, এসো ভাই, খাবার খেয়ে নিই।

পরদিন সকালে মোগলসরাইতে পৌঁছে সে বললে, মাইরি, আমার পয়সায় কিন্তু তোকে চা খাওয়াবো। আপত্তি শুনবো না।

তারপর এলাহাবাদে পৌঁছেই সে এমন দু-একটি মধুর ঘরোয়া সম্ভাষণ করতে আরম্ভ করলো যে, আমি যেন দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলুম। এমন মানুষ কালে ভদ্রে জোটে বৈকি।

বশীশ্বর সেন মহাশয় কখন যে নিঃশব্দে আমাদের পরম প্রিয় 'বশীদা' হয়ে পড়েছেন, আমরা নিজেরাও জানতে পারিনি। তাঁর এই 'আপনি' থেকে 'তুমি', এবং 'তুমি' থেকে 'তুই'-এ পরিণত হ'তে ঠিক কয় মিনিট লেগেছিল, এখন আর মনে পড়ে না।

সব কাজ ফেলে স্বামী স্ত্রী এসে গল্পে মেতে উঠলেন। একটি সময়ে রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলো। বশীদার বহুকালের অনুরোধক্রমে মহাকবি প্রথম আলমোড়ায় আসেন তাঁর মৃত্যুর বছর চারেক আগে। তাঁর প্রথম পদার্পণের কাহিনীটুকু উপভোগ্য বৈকি। মহাকবি একবেলা রাগ ক'রে বশীদার সঙ্গে কথা বলেননি। যখন বললেন তখন প্রথম ভাষণ হোলো এই প্রকার,—তোমার সঙ্গে আমার কি কোনও শত্রুতা ছিল, বশী?

কবির গম্ভীর মুখচ্ছবি দেখে বশীদা ভয়ে আড়ষ্ট। আমরা প্রশ্ন করলুম, তারপর?

শোন্ ভাই কী কাণ্ড।—বশীদা আরম্ভ করলেন, কবির রাগ দেখে ভয় ভাবনায় আর কূল পাইনে, কি অপরাধ করলুম রে বাবা। কিন্তু তারপর আমার ভ্যাবাচাকা চেহারা দেখে কবি আবার বললেন, এখন বুঝতে পারছি বিদেশ বিভুঁয়ে এনে আমাকে জব্দ করাই তোমার উদ্দেশ্য ছিল।

নাও ঠ্যালা। ঠ্যালার নাম বাবাজি। কাঁদবো, কি পায়ে ধরবো, কি ডিগবাজি খাবো,—ভেবে ঠিক পাচ্ছিলুম না। কিন্তু কবি খুব রসিক ছিলেন তো। আমার কাঁচুমাচু চেহারাটায় উনি বেশ রস পাচ্ছিলেন। এবার বললেন, পাহাড় ঠেলে আমাকে এনেছো, কিন্তু পাহাড়ের 'বেণ্ড'গুলো সমান ক'রে কেটে রাখতে পারোনি।

তখ—ন ব্যাপারটা বুঝলুম রে, ভাই। এখানকার 'বেণ্ড'গুলো কী সাংঘাতিক দেখে এলি তো। আহা, বুড়ো মানুষ, নার্ভের ওপর স্ট্রেন হয়েছিল খুব। আমি তো আজও ভয়ে কাঠ হই। তোদেরও ভয় হচ্ছিল তো?

আর বলবেন না।

কবির গল্প শুনতে শুনতে মিসেস সেন এতক্ষণ খুব হাসছিলেন। এবার তাঁর পরম যত্নরক্ষিত একখানি বেতের আরাম চেয়ার বার

করে আনলেন। বললেন, এই চেয়ারখানি আমাদের এখানে মহাকবির আসন ছিল।

আমরা অতঃপর ঘুরে ঘুরে দেখলুম, বশীদার বৈজ্ঞানিক সব্জির ক্ষেত। একটি পেঁয়াজ ওজনে পাঁচপো, একটি বেগুন আড়াই সের। এই অনুপাতে অন্যান্য সব্জি। আমরা দেখে শুনে অবাক। এসব নাকি গবেষণালব্ধ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানসম্মত 'ক্রস্-ব্রীডিং'। বশীদা ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর প্রিয় ছাত্র। গুরুর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তিনি কায়মনোবাক্যে দুইজন ব্যক্তির শতায়ু কামনা করেছিলেন,—রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র। প্রসঙ্গ-ক্রমে বলা চলে, ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানে বশীদাই প্রথম 'ফলনবীজস্বত্ব' নিয়ে আণুবীক্ষণিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া (micro-manipulation) আরম্ভ করেন।

কবিকে ঘরে এনে আমি বলেছিলুম,—বশীদা আবার আরম্ভ করলেন,—মশাই, আমি লেখাপড়া তেমন শিখিনি, আপনার ওই সব কাব্য টাব্য আমার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু একশো বছর অন্তত আপনাকে বাঁচতে হবে, নৈলে শুনবো না। কবি বললেন, তোর এমন অহেতুক দাবী কেন রে, বশী?—বললুম, ঠাকুর সামনে আছে তাই তো কাজকর্মে জোর পাই। চোখের সামনে থেকে স'রে গেলে সবই তো অন্ধকার।—আহা, কী রূপ, কী চোখ, কী বিরাট পুরুষ। চারদিকে নেংটি ইঁদুরের দল, তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল পশুরাজ সিংহ। সত্যি নয়, ভাই?

বশীদার মুগ্ধ হৃদয় আর চক্ষুর দিকে আমরাও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলুম।

পুনরায় তিনি বললেন, আহা, আমাদের গর্বের ধন, অন্ধের নড়ি, শিবরাত্রির সলতে। মুনিঋষিকে দেখিনি, কিন্তু রবিঠাকুরকে দেখার পর মুনিঋষিকে আর না দেখলেও চলবে। কি বলিস ভাই?

রবীন্দ্রনাথ কেমন তা পৃথিবীবাসী জানে, বশীদা কেমন—একথা একান্ত করে জেনে গেলুম শশাঙ্ক আর আমি। আর সেই জানার সাক্ষী রয়ে গেল দিগন্তের কোলে ওই তুষারচূড়ারা,—গৌরীপর্বত আর নন্দাদেবী, ত্রিশূল আর পঞ্চচুলী। ওরা আজকে আমাদের এই আনন্দের নিত্য সাক্ষী হয়ে রইলো।

যাবার আগে আমরা মিসেস সেনের সঙ্গে আলাপ করছিলুম। বশীদা এক সময় ডেকে বললেন, ওরে ওই পাগলা, সন্ধ্যেবেলা ঠিক আসবি, এখানে না খেলে কিন্তু ফাটাফাটি হয়ে যাবে!

আমরা হাসিমুখে বিদায় নিচ্ছিলুম। তিনি পুনরায় বললেন, আর এক

পাগলা আসছে আজ বিকেলে। ছেলেটা বে-থা করেনি, কিন্তু খাঁটি সোনা। ওই যে আমাদের উমাপ্রসাদ রে। হিমালয়ের পোকা। ছেলেটাকে দেখলে আমার বুকের ছাতি ফুলে ওঠে।

বলতে বলতে চ'লে গেলেন বশীদা। আমরাও তখনকাব মতো বিদায় নিলুম। আমাদের বুক ফুলে উঠেছিল শ্রদ্ধায়।

*

* *

নিজেদের ধিক্কার দিচ্ছি শতবাব। সেদিন কেন অন্যমনস্ক ছিলুম, কেনই বা উত্তর পশ্চিম পাহাডেব একটি পথ আমাদের আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গেল,—ওই যেদিকে একদা নর্তকশ্রেষ্ঠ উদয়শঙ্কর তাঁব নাচেব শিক্ষালযটি গডেছিলেন একটি মালভূমিতে—এবং কেন আমবা মতিচ্ছন্নের মতো দুর্বার মোহেব টানে বনময় পাহাডেব আশেপাশে আত্মসন্ধানীর মতো ছোঁক ছোঁক ক'রে বেডালুম আজ আব সেসব কথা মনে নেই। কিন্তু বশীদাব ওখানে সেদিনকাব সান্ধ্যভোজে না যাওয়াব জন্য অনুশোচনার আর শেষ ছিল না। হয়তো আমাদের মনে একথা হয়ে থাকবে, স্বভাববৈষ্ণব বশীদার প্রাণখোলা আমন্ত্রণ এক জিনিস, এবং ওই প্রবীণা আমেরিকান মহিলা মিসেস গার্টরুড্ সেন,—ওঁকে মেহন্নত ক'রে সমস্তটা আয়োজন করতে হবে, সে অন্য বস্তু। কিন্তু আমাদেব এই অমার্জনীয উদারবুদ্ধিব পিছনে যে সূক্ষ্ম আডষ্টতাবোধ ছিল,—সেটির দিকে আমাদেব মনশ্চক্ষু সেদিন পডেনি,—সেটিব সম্বন্ধে বহুকাল আগে এক কবিতায রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য ক'রে গেছেন "সহজ কথা যায় না বলা সহজে।" একটু ঘুবিয়ে কথাটা এই ভাবে বললে কেমন লাগে?—সহজ হওয়া যায় না মোটেই সহজে।

এর জন্য আমাদের শাস্তি তোলা ছিল, সেই কথাই বলি। সেদিন আমরা গিয়েছিলুম হাঁটতে হাটতে সেই পাহাডের একটু নীচে—যেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের ফুলবাগানভরা নিরিবিলি আশ্রমটি পাহাডের গায়ে গেঁথে উঠেছে। সেখানে ছিলেন সদ্য পাশ্চাত্যদেশপ্রত্যাগত শচীন মহারাজ এবং পূর্ণ মহারাজ। তাঁদের মধুর আতিথেয়তাব অসীম আনন্দ পেয়ে সবেমাত্র হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছি, এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়লো। দরজা খুলতেই নিত্যপ্রসন্নবদন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেসে উঠলেন। এই অকৃত্রিম হিমালয়প্রেমিক সম্বন্ধে আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা বরাবর অটুট থেকে গেছে, আমার বিশ্বাস একথা তিনিও জানেন না। মধ্য হিমালয়ের একটি বিশেষ ভূভাগে তাঁর প্রায়শ আনাগোনার কথা আমার ভ্রমণকালে অনেক সময় শুনতে

পাই! কুমায়ুন পর্বতমালা তাঁর বিশেষ প্রিয়, এবং তিনি এই অঞ্চলকে তন্ন তন্ন ক'রে দেখার চেষ্টা পেয়েছেন। তাঁর কৈলাস ভ্রমণের গল্প তাঁর মুখ থেকে শুনে অনেকেই আনন্দ পান। তাঁর মতো হিমালয়োৎসাহী বাঙালীর মধ্যে সংখ্যায় কম।

ধমক দিয়ে উমাপ্রসাদ বললেন, শিগগির বেরিয়ে আসুন বাইরে, আপনার শমন এসে দাঁড়িয়ে। খাবার নেমন্তন্ন ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন, করেছেন কি? মানুষ চেনেননি?

বাইরে এসে দেখি মোটর থেকে নেমে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সহাস্যমুখে মিসেস গার্ট্রুড্ সেন। হাস্যমুখ হলে কি হবে, ভিতরে আগ্নেয়গিরি! কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দুজনে দাঁড়ালুম অনেকটা যেন নির্লজ্জের মতো। সন্তোষজনক কোনও কৈফিয়ত হাতে ছিল না, এমন কি হাতের কাছে এমন কোনও মিথ্যা গল্পও নেই যে তৎক্ষণাৎ ফেঁদে বসবো। নানা গঞ্জনার মধ্যে মহিলা একসময় বললেন, আমিই ব'কে মরছি, কিন্তু কই, তোমাদের মুখে চোখে অনুশোচনার ভাব তো দেখছিনে? বেশ, তাহ'লে এক কাজ করো, আমার শিঙাড়া আর মালপোর দামটি দিয়ে দাও, খুশী হয়ে চ'লে যাই।

উমাপ্রসাদ খুব হাসলেন। বললেন, বটে, আপনি মালপো বানিয়েছেন, তার প্রমাণ কিন্তু ওঁদের হাতে নেই। সুতরাং আর একবার খাইয়ে সেটা প্রমাণ করুন।

মিসেস সেন হাসতে হাসতে কি যেন বললেন, ঠিক মনে পড়ছে না। বোধ হয় উমাপ্রসাদের দিকে চেয়ে যেন ব'লে উঠলেন, "Oh you birds of the same feather!"

কথা রইলো, আজ সন্ধ্যায় তাঁর ওখানে গিয়ে জলযোগ না করলে মহা অনর্থ কাণ্ড ঘটবে। মহিলা যাবার সময় আবার হুমকি দিয়ে গেলেন, এবং আমরা সেই হুমকির মধ্যে জননীর মধুর তিরস্কারের আস্বাদ পেলুম। মোটর চ'লে গেল।

উমাপ্রসাদকে বহুদিন পরে পেয়ে আমরা আনন্দে মশগুল হয়ে গেলুম।

হাঁটতে হাঁটতে চলেছি তিনজনে। ওক আখরোট আর শিশমের ছায়াপথে পাহাড়ী সেগুনের ফাঁকে ফাঁকে আসন্ন সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে জ্যোৎস্নাময়ী। নীচের দিকে রেলওয়ে আউট-এজেন্সির পাড়া, উপরদিকে বসবাসপল্লী—উভয় অঞ্চলই এখন শান্ত। ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই বসীদার সঙ্গে দেখা। উমাপ্রসাদকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বললেন, ধ'রে এনেছিস দেখছি। ছোঁড়া-ছুটোর কান ধ'রে তুর্কিনাচন নাচিয়ে দে তো। শিঙাড়া-মালপো ফেলে পাহাড়ে পাহাড়ে কাব্য করতে ছুটেছিস, পাষণ্ড?

তাঁর তিরস্কারে সবাই হেসে লুটোপুটি। বশীদা বললেন, নে, এখানে ব'সে গল্পগুজব কর, আমি চট করে একবার 'গোপালের ব্যাগার' দিয়ে আসি।

গোপালের ব্যাগার।—শশাঙ্ক প্রশ্ন করলো, সে আবার কি, বশীদা ?

তবে শোন—বশীদা থমকে গেলেন,—আমি ভাই বাঁকড়ো জেলার লোক। গোপাল নামে আমাদের দেশে এক রাজা ছিল। তিনি বললেন, আমার রাজ্যে সবাই হবে বোষ্টম, হরিনাম জপ ছাড়া আর কিছু চলবে না। তারপর রাজা আর তাঁর গুপ্তচরেরা বেরিয়ে খবর নিতো, সবাই হরিনাম জপ করছে কিনা। কিন্তু ধরে বেঁধে কি প্রেম হয়? অথচ গুপ্তচরেরা গতিবিধির খবর পেয়ে এখানে ওখানে সবাই হঠাৎ চোখ বুজে মালা ঠকঠক করতো। আর যারা কেজো লোক, তারা কাজ ফেলো ছুটতো ঘরের দিকে। বলতো, যাই, 'গোপালেব ব্যাগার' দিয়ে আসি। আমারও ভাই তাই। তোরা বোস, একবারটি মালা ঠকঠক করে আসি।

সেই সন্ধ্যারাতটি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। শচীন মহারাজ, পূর্ণ মহারাজ প্রমুখ আবও দুজন সাধু এলেন। একটি ঘরেব ভিতব দিয়ে আরেকটি ঘরে এসে আমরা বসলুম। এ ঘরটি চাবদিকেই প্রায় বন্ধ,—শীত পড়েছে বাইরে, ভিতরে মধুব উত্তাপ জড়ানো। মেঝেয উপর মাদুর ও কার্পেট পাতা, ভিতবটি পাশ্চাত্ত্যরুচিতে সুন্দবভাবে সুসজ্জিত। পাশের ছোট্ট ঘরে স্বামীস্ত্রীর উপাসনাগৃহ, তাঁবা পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণেব পূজাবী। ওর মধ্যে ঢুকেই বশীদাকে 'গোপালের ব্যাগাব' দিতে হয। গোল হযে বসেছেন সবাই চেযারগুলিতে। চারজন গৈরিকবাসা সুপণ্ডিত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, আর এধাবে বশীদা, উমাপ্রসাদ, মিসেস সেন, এবং শশাঙ্ক। মাঝে মাঝে তাজা খাবার আসছে। আলো জ্বলছে ভিতবে। বাইরে নিবিড় হয়েছে জ্যোৎস্না। অনুভব করলুম পাহাড়ে পাহাড়ে আলমোড়া স্তব্ধ হযে গেছে, এবং বহুদূর দিগ্বলয়ের কোলে ত্রিশূলী আর নন্দাদেবীর তুষার চূড়াসনের উপর অনন্ত সৌরবিশ্বের মহামন্দিরে আরতির ঘণ্টাও হযতো শেষ হযে গেছে। সেখান থেকে চোখ ফিরে এল সন্ন্যাসীদের উপর। তাঁদের একজনের নির্বাক দৃষ্টির উপরে যেন অনন্ত গভীরতার একটি আশ্চর্য ছায়া পড়েছিল।

উমাপ্রসাদ তাঁর সর্বশেষ হিমালয় ভ্রমণকালের দুটি অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করছিলেন। মিসেস সেন সতর্ক করে দিলেন, যুক্তি ছাড়া কোনও কাহিনীর বাস্তবতা স্বীকার করবো না। তোমার চিন্তায়, কথনে, নিশ্বাসে, কণ্ঠে ও বর্ণনায় অলৌকিকতার প্রতি প্রশ্রয় দেবে না কিন্তু।

মিসেস সেনের প্রখর বৈজ্ঞানিক মন উমাপ্রসাদের কাহিনী বর্ণনার মাঝে মাঝে চুলচেরা বিচার করতে লাগলো।—

"উত্তরকাশীর সেই কৃষ্ণাশ্রম সাধু। বয়স একশো বছরেরও অনেক বেশী। চেহারা তাম্রবর্ণ, কিন্তু জ্যোতির্ময়। নিশ্চল, যোগাসীন—চক্ষু নিষ্পলক। সন্দেহ হয় বুঝি বা পাথরের মূর্তি। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাঁর সঙ্গে থাকেন এক ব্রহ্মচারী। চেহারাটি রুক্ষ, কিন্তু সুশ্রী। বয়স বাইশ অথবা বিয়াল্লিশ জানা যায়নি। কিন্তু এ কথা জানা গেল, সে মেয়ে,—বার দুই স্বামীপরিত্যক্তা মৌনী-সাধুকে ছেড়ে ঘরসংসারে তার মন বসেনি কোনদিন। ওই সাধু তাকে সংস্কৃত শিখিয়েছে পাথরের উপর জলের অক্ষর লিখে-লিখে। সাধু শুধু চেয়ে থাকে গঙ্গার দিকে, মেয়েটি দেখাশোনা করে।"

মিসেস সেন প্রশ্ন করলেন, অন্ধ মোহ?

উমাপ্রসাদ জবাব দিলেন, জানিনে। ঘটনা শুধু এই।

চুপ ক'রে গেলুম আমরা সকলে। দ্বিতীয় গল্পটা বদরিকাশ্রমের। উমাপ্রসাদ বললেন, আমার এক বন্ধু ধ'রে নিয়ে গেলেন আমাকে তপ্তকুণ্ডের ওদিকে। এখানে এক সাধু আছেন, তাঁকে কেউ না খাওয়ালে তিনি কিছু খান না। তপ্তকুণ্ডের কোলেই ছোট্ট একটি ঘরে তিনি থাকেন। আমি গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখি বয়সে তরুণ, সম্পূর্ণ এক উলঙ্গ সাধু—বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে। অনেকটা যেন যুবক পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের মতো চেহারা। একটুখানি দাড়ি আছে মুখে। হিন্দি এবং ইংরেজিতে আলাপ করেন, কিন্তু আমার ধারণা তিনি বাঙালী। তাঁর সেই নগ্নকান্তির যৌবনশ্রী দেখে যে কেউ চমকে উঠবে। পরীক্ষা ক'রে দেখলুম, তিনি পণ্ডিত এবং সুশিক্ষিত। ইংরেজি বলেন চমৎকার।

হঠাৎ মিসেস সেন প্রশ্ন ক'রে বসলেন, উলঙ্গ কেন? কাপড় জোটে না? নাকি effect নেবার চেষ্টা করে?

উমাপ্রসাদ বললেন, জানিনে, প্রশ্নও করিনি। দেখলুম, তাঁর আশ্রমটির খাঁজে-খাঁজে নানাবিধ কাগজপত্র, চিঠি, লেখাপড়ার সরঞ্জাম। তাঁকে নানা প্রশ্ন করলুম। তিনি জানেন, বিলেতের সর্বশেষ খবর; তিনি জানেন, দু'বছর পরে কোন ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টের জজ হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর পর যা ঘটবে, তা তিনি জানেন। তাঁর কথা অনেকগুলো সত্য হয়েছে, আমি মিলিয়ে দেখেছি। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে দেখলুম, দিল্লীর উচ্চতম শাসনকর্তা এবং বড় বড় কন্‌গ্রেস নেতাদের সাম্প্রতিক চিঠিপত্র। চীন, জাপান, ইউরোপ—এসব জায়গা থেকে তাঁর কাছে চিঠিপত্র এসেছে মাত্র আগের দিনে। অন্তরঙ্গ আলাপ হলো।

মুখ তুললেন শ্রীমতী গার্টরুড্।—হিমালয়ের কোনও ছদ্মবেশী গুপ্তচর? Trans-Himalayan guard? কিন্তু কাপড় পরে না কেন? খায় না কি অন্ন? ব্যাগ-বাক্স কিছু আছে দেখলে? কিছু পুঁজিপাটা?

কিছু নেই, সম্পূর্ণ নিঃস্ব। উমাপ্রসাদ বললেন, খোঁজ করলুম সেদিন অনেক, কিছুই জানতে পারিনি!

শীতকালে নেমে আসে?

শুনিনি সেকথা। তবে শীতকালে তুষারপাতের মধ্যে সে গভর্নমেন্টের আইন অমান্য ক'রেও থাকতে চায়!—ব্যস, সেদিন ওই পর্যন্তই আমার জানা।

আলোটা জ্বলছিল। উদ্বিগ্ন প্রশ্ন সকলের মুখে চোখে ফুটে উঠেছে। জ্যোৎস্নাহসিত হিমালয়ের অনন্ত গগনে সেই প্রশ্ন তারায় তারায় ঘুরে বেড়ালো নিরন্তর।

পরবর্তীকালে উমাপ্রসাদের কাছেই শুনেছি এই সুদর্শন নগ্ন সাধুকে কারা যেন হত্যা করেছে। এ ছাড়া বিগত ১৯৭১ সালে শ্রীযুক্ত বংশীধর সেন মহাশয় আশী বছর বয়সে পরলোকগত হন।

॥ ১১ ॥

দিল্লী মেল অনেকক্ষণ লেট। সেপ্টেম্বর হলেও শরতের আভাস এখনও তেমন পাচ্ছিনে। মেঘ রয়েছে উত্তর প্রদেশে। কানপুরে আকাশ ডাকলো, টুণ্ডলায় বৃষ্টি নামলো। আলীগড়ে রীতিমতো বর্ষা। গাজিয়াবাদে মুষলধারা! মনে করেছিলুম আরেক পেয়ালা চা চলবে,—কিন্তু বৃষ্টিতে গা ঢাকা দিয়েছে রেস্টুরেন্ট কার-এর 'বয়',—জলের ঝাপটায় 'মেটে ভাঁড়ের' চা-ওলাও পালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত শাহদারায় গাড়ী থামতে দেখা গেল আকাশ একটু ধরেছে। বড় নির্জন শাহদারা। যমুনার এ প্রান্তে ব'সে সে যেন করুণ নয়নে চেয়ে থাকে 'লাল কেল্লার' দিকে। রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।

ধীরে ধীরে শাহদারা থেকে গাড়ী ছেড়ে যমুনা পেরিয়ে লালকেল্লার প্রাকারের ওপর দিয়ে দিল্লীমেল ঢুকলো এসে রাজধানীর প্ল্যাটফরমে। দিল্লীমেলের আভিজাত্য ভিন্ন রকমের। বৃষ্টি এবার থেমেছে। আবার সেই দিল্লী।

দরজা ধ'রে দাঁড়িয়েছিলুম। সহসা প্ল্যাটফরম থেকে উচ্চকণ্ঠে আমাকে উদ্দেশ ক'রে হাঁক দিলেন শ্রীমতী মায়া। গাড়ী থামার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এলেন শ্রীমতী ও তাঁর তরুণ স্বামী। তাঁদের পিছনে আরেকজন পাঞ্জাবী বন্ধু। কথা বলার আর কোনও অবসর ছিল না, মুহূর্তের মধ্যে মিঃ গুপ্তর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলুম। স্বাস্থ্যবান, সুশ্রী, শ্যামবর্ণ যুবক। এমন সজ্জন এবং ভদ্র যুবক সচরাচর চোখে পড়ে না। পায়ে হাত দিতে গেলেন স্বামী-স্ত্রী,—হাত ধরে তুলে নিলুম। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি মধুরভাষণে আলাপ করলেন।

অপরিচিত ছিলেন বটে মিঃ গুপ্ত, কিন্তু সেই ব্যবধান কাটিয়ে গত এক বছরে চিঠি লিখেছিলেন আমাকে কয়েকখানি। চিঠির মতো মানুষটিও সুন্দর। শ্রীমতী মায়ার দিকে ফিরে বললুম, মেয়েদের সৌভাগ্যে কখনও ঈর্ষাবোধ করিনি, কিন্তু আপনার স্বামীভাগ্য দেখে বড হিংসে হচ্ছে।

তবে যে বড় তামাসা করেছিলেন?

হাস্যমুখর এবং মধুর হয়ে উঠলো দিল্লী স্টেশন। মিঃ গুপ্ত আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন্ বাইরে, টেনে তুললেন মোটরে।

দিল্লী স্টেশন থেকে তাঁদের বাসস্থান অনেকটা দূরে। সবাই জানে আরাবল্লীর জটলা এবং শিরাউপশিরা দিল্লীকে বহুক্ষেত্রে অসমতল ক'রে রেখেছে। আমাদের গাড়ী এদিক ওদিক ঘুরে আরাবল্লীর পাথুরে বনজঙ্গলের ডাঙা পেরিয়ে 'রাজেন্দ্রনগর' আর 'প্যাটেলনগর' ছাড়িয়ে সেই রাত্রে এসে ঢুকলো 'পুষা ইনষ্টিটিউটের' বৃহৎ বন-বাগানে। তার সুদূর পূর্বপ্রান্তে ফটকটি খোলা পাওয়া গেল, এবং সেই ফটক পেরিয়ে একটি অতি নির্জন ও নিষ্প্রদীপ অঞ্চলের প্রান্তরে গাড়ী প্রবেশ করলো। এটি আরাবল্লীর একটি মনোরম উপত্যকা, নাম ইন্দ্রপুরী, স্টেশন থেকে আন্দাজ মাইল দশেক। অন্ধকার রাত্রে কোথাও কিছু দেখা গেল না, বিদ্যুৎ এখানে আজও এসে পৌঁছয়নি,—তাদেরই ভিতর দিয়ে কোনও একটি ছোট্ট বাগানবাড়ীর ফটকে গাড়ী এসে দাঁড়ালো। কেশব আমাকে নামিয়ে নিয়ে এলেন, এবং ভিতরে প্রবেশ করামাত্র অনুভব করা গেল, আতিথেয়তার সমস্ত ব্যবস্থাদি গুছিয়ে রেখে তাঁরা স্টেশন থেকে আমাকে আনতে গিয়েছিলেন।

আবহাওয়াটি এতই উল্লাসপ্রধান যে, সে বর্ণনা বাহুল্য। বুঝতে পারা গেল, শ্রীমতী মায়া আমার অসংখ্য কাহিনী স্বামীকে আগে থাকতে ব'লে রেখেছেন। শ্রীনগরের বন্যায় তার ঘরকন্না ভেঙে যাওয়ার গল্প, জম্মুর

হোটেলের বর্ণনা, হিমাচল প্রদেশের অভিযান, কাংড়া ও কুলুর কাহিনী, ক্ষীরভবানী আর পহলগাঁওয়ের ইতিবৃত্ত,—এবং পরিশেষে আমার বিব্রত ও বিরক্তি ভাব, মেজাজ-মর্জির ঈষৎ রুক্ষতা,—কোনোটাই বাদ যায়নি। পাঞ্জাবী বন্ধুটি বিদায় নেবার পর রাত দুটো পর্যন্ত হ্যারিকেন লণ্ঠনজ্বালা ঘরে আমাদের গল্পের আসর মুখর হয়ে রইল। শ্রীমতী মায়া বোধ করি এবার আমাকে বাগে পেয়েছিলেন। তাঁর শ্রীনগরের বাসায় আমার হাতের রান্না যে তেমন ভালো হয়নি, এটি তিনি স্বামীর নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন, এবং আমিও ব'লে বসলুম, আমার স্বভাব প্রকৃতির অপবাদ বরং সইবে, কিন্তু আমার রান্নার নিন্দা একেবারেই অসহ্য।

ঘরময় হাসির তুফান উঠলো।

স্ত্রীর সর্বপ্রকার কাজকর্মে এবং আতিথেয়তার আয়োজনে কেশবের সর্বাঙ্গীণ সাহায্যদানের চেষ্টা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। এমন আনন্দময় দাম্পত্য জীবনের স্বচ্ছন্দ ও সুখী চেহারা দেখতে আমার বাকি ছিল। স্বামীস্ত্রীর জীবনে এমন শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধের সম্পর্ক আধুনিক কালে যখন-তখন চোখে পড়ে না। মায়াদেবীর গল্প বর্ণে বর্ণে সত্য।

পরদিন ছিল রবিবার। কেশবকে সারাক্ষণ পাওয়া গেল। খানিকক্ষণ তাঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো গেল পাহাড়ের আশেপাশে। এই পাহাড় পেরিয়ে তাঁকে সাইকেলে যেতে হয় পালাম বিমানঘাঁটিতে,—সেটি তাঁর চাকুরিস্থল। তিনি হলেন সার্জেন্ট, এবং অনেক গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়র। এখান থেকে বাজার-হাট বেশ খানিকটা দূর। মাঝে মাঝে শ্রীমতী মায়া সাইকেল চ'ড়ে ঘুরে আসেন প্যাটেল নগর থেকে। আগ্রায় থাকতে মায়া ঘোড়ায় চ'ড়ে খুব বেড়াতেন। মেয়েমহলে এখানে তিনি নাচ শেখান, এবং 'গীটার-বাজনায়' তিনি পারদর্শিনী। হারমোনিয়ম ছোঁন না, কিন্তু তম্বুরা তাঁর প্রিয়। কেশব বললেন, পুজোর সময় আপনি এখানে থাকলে ওর নাচ দেখতে পাবেন। বেশ নাম-ডাক আছে।

হাসিমুখে বললুম, ভ্রমণকালে তাঁর এই সব গুণপনার আভাসমাত্র পাইনি। দুঃখের কথা বৈকি। আমাকে উনি ঠকিয়েছেন।

আমার মন্তব্যে সরস পরিহাস বোধ ক'রে কেশব খুব হাসতে লাগলেন। তিনি ধ'রে বসলেন, এবার পুজোয় আপনাকে দিল্লীতে কাটিয়ে যেতে হবে।

অপরাহ্নের দিকে খানদুই সাইকেল-রিকশা যোগাড় ক'রে আনলেন কেশব

এবং আমরা পালাম-এর এয়ার-অফিসার্স ক্লাবের উদ্দেশ্যে রওনা হলুম। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধহয় মাইল দুই হবে। প্রসারিত বন-বাগান এবং সরকারী কোয়ার্টারগুলি একে একে পেরিয়ে গিয়ে আমরা অবশেষে এসে উঠলুম ক্লাবের বৃহৎ প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে ঘণ্টাতিনেক ব'সে গান বাজনা এবং 'পথের দাবী' নাটকের মহড়া দেখা গেল। আগামী পুজোয় এই নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে। কিন্তু এই 'পথের দাবী' নাটকে শ্রীমতী মায়া 'সুমিত্রার' ভূমিকায় আগাগোড়া যেমন চমৎকার অভিনয় করলেন,—আমি সেটি দেখে হতচকিত। মেয়েদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা সুশ্রী এবং দীর্ঘাঙ্গী। 'সুমিত্রার' ভূমিকায় তাঁর চেহারার লাবণ্য কাজ করেছে অনেকখানি। বাস্তবিকই, আমি যেন তাঁকে এই প্রথম আবিষ্কার করলুম। একত্র ভ্রমণ করেছি প্রতিদিন, কিন্তু কোনওদিন তাঁর সঠিক পরিচয় পাইনি। নিজেকে কখনও তিনি প্রকাশ করেননি যে, তিনি শিল্প ও ললিতকলার অনুরাগিণী,--তাঁর এই সংযমের কথা স্মরণ ক'রে আমি অভিভূতের মতো চেয়েছিলুম। কেশব আমার পাশে ব'সে তন্ময় হয়েছিলেন কতক্ষণ।

এ যাত্রা ভ্রমণের তালিকা ছিল কিছু দীর্ঘ। হিমালয়ের চাম্বা উপত্যকা থেকে ফিরে পশ্চিম রাজস্থানে পাকিস্তানের সীমানা অবধি যাবো। সেখান থেকে যাবো সৌরাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তে, এবং অতঃপর বোম্বাই ও পঞ্চবটী হয়ে ফিরবো। মোটামুটি সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল হিসাব করা আছে। হাতে দুমাস সময়। চিতোর উদয়পুর যাবার চেষ্টাও রয়েছে। সুতরাং মনে কিছু তাড়া ছিল। আগামীকাল আমাকে রওনা হ'তে হবে।

পরদিন সকাল থেকে দিল্লীর কয়েকটি কাজ সারতে প্রায় গেল সারাদিন। 'ইন্দ্রপুরীতে' ফিরে এলুম অপরাহ্ণে। কেশব উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। রাত সাড়ে আটটায় কাশ্মীর মেল আমাকে ধরতে হবে, তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা স্বামীজী ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু একটি নাটকীয় পরিস্থিতি আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিল, এবং সেটির জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না।

কেশব বললেন, আপনি বলছিলেন যে পাঁচ মিনিটে আপনি আপনার সকল ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির ক'রে নিতে পারেন। কথাটা কি সত্যি?

হেসে বললুম, বোধহয় পাঁচ মিনিটও লাগে না!

কেশব বললেন, সবিনয়ে জানাই, আপনি বোধহয় খবর রাখেন না, সংসারে আরও দু-একজন আছে—তারাও এটি পারে।

শুনে খুশী হলুম।

আমাদের চায়ের আসর বসেছিল। অনুভব করা গেল, পিছনে শ্রীমতী মায়া দাঁড়িয়ে হাসি টিপে স্বামীকে কি যেন ইশারা করছিলেন। আমাদের আলাপ চলছিল ছদ্মগাম্ভীর্যের সঙ্গে, এর পাশে হাসি পুঞ্জিত রয়েছে। কেশব বললেন, যদি অভয় দেন তাহলে একটি অনুরোধ করি।

এবার হেসে ফেললুম,—ভূমিকাটি একটু দীর্ঘ মনে হচ্ছে।

আপনাকে আর একবার আমরা জব্দ করতে চাই। মায়া যাবেন আপনার সঙ্গে।

মুখ তুললুম,—মানে? ঘর সংসারে ওঁর মন নেই?

কেশব বললেন, আপনার অসুবিধে যাতে না হয় সেদিকে উনি দেখবেন। হিমালয় ওর ভালো লেগেছে। আপনার সঙ্গে যাওয়াটাই ওর গৌরব।

থামুন দেখি।—প্রতিবাদ ক'রে উঠলুম,—আপনার ঘরকন্না, রান্না বান্না—এসব দেখবে কে?

কোনও অসুবিধে হবে না, আপনি বিশ্বাস করুন। আমাদের ক্যানটিন দেখেননি,—সেখানে খাওয়া খুব ভালো।—কেশব আশ্বাস দিয়ে বললেন, রাত্রে পাশের বাড়ীতে খাবো। ওরা আমার বিশেষ বন্ধু।

তেড়ে উঠলেন শ্রীমতী মায়া,—আপনাকে কষ্ট না দিলেই তো হোলো। এবার আমিই সব দেখাশোনা করবো, আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। ভয় নেই, আর কিচ্ছু আপনার কাছে খেতে চাইবো না। নিজের মোটঘাট নিজেই বইবো। যদি দরকার হয়, একখানা কম্বল শুধু আপনার কাছে ভাড়া ক'রে নেবো।

কেশব বললেন, আপনার জন্যই ওর হিমালয় বেড়ানো সম্ভব হোলো।

বুঝতে পারা গেল আগে থেকেই স্বামীস্ত্রী এ সম্বন্ধে পরামর্শ করে রেখেছেন এবং সেইমতো প্রস্তুতও হয়েছেন। সুতরাং ভালো ক'রে সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন ক'রে নেবার আগেই দেখতে পেলুম সেই পাঞ্জাবী বন্ধুটির সাহায্যে 'প্যাটেল নগর' থেকে একখানা ট্যাক্সি আনা হোলো, এবং তাঁদের সিদ্ধান্তের ঘণ্টা দুইয়েকের মধ্যেই আমরা চারজনে মিলে গাড়ীতে উঠে দিল্লী স্টেশনের দিকে রওনা হলুম। হয়তো একেই বলে, ঘটনাস্রোতে ভেসে যাওয়া। সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে দশ মাইল পথ গাড়ীর মধ্যে ব'সে রইলুম। অবশেষে টিকিট কিনে গাড়ীতে দুজনকে বসিয়ে দিয়ে গাড়ী ছাড়বার সময় জোর করে পায়ের ধুলো নিয়ে কেশব হাসিমুখে বিদায় নিলেন। কথা রইলো, পুজোর ঠিক আগে ফিরবো।

গাড়ী ছাড়লো। প্রবল ভীড় ইণ্টার ক্লাসে। নতুন ধরনের আজকালকার

বাক্স-আকৃতি গাড়ীগুলির মধ্যে যেন দম আটকায়। সেই ভয়ানক ঠাসাঠাসির মধ্যে কোনও মতে হাত দেড়েক স্থান পাওয়া গেল। একমাত্র এই কারণে যে অনেক সুশ্রী তরুণী আছেন সঙ্গে! আরও জনতিনেক মহিলা যাত্রী ছিলেন ওই বাক্সের মধ্যে, তাঁরা একবার তাকালেন মাথার প্রতি,—কিন্তু এক ইঞ্চি পরিমাণ ন'ড়েও তাঁরা বসতে রাজী হলেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে ঘুমের মধ্যে আমার নাকের কাছাকাছি পা ছড়িয়ে দিলেন।

ভীড়ের চাপে কষ্টের রাত্রি একসময় শেষ হোলো। সকালে যখন পাঠানকোটে এসে পৌঁছলুম, মনে হোলো কঠিন কারাগারের অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচলুম। খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিলুম কিছুক্ষণ।

সেই অতি পরিচিত পাঠানকোট। সকল দৃশ্য থেকে যেন চেনা জিনিসের ইশারা পাচ্ছি। প্রাচীন বন্ধুরা চারিদিক থেকে যেন দুজনকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রশ্ন করছে, ভালো আছো তো? এই নিয়ে এক বছরে ছয়বার ঘুরলুম পাঠানকোটে।

সেই পরিচিত হোটেলে এসে ঢুকলুম। হোটেলের সেই ছোকরা চেনামুখ দেখে হেসে নমস্কার জানালো। সেই ভিতর দিকের ছমছমে ঘরটিতে সেই ময়লা টেবিল—যার পাশেই হোলো হাত ধোবার কল। ছেলেটা টোস্ট আর চা আনলো। টোস্টে মাখন লাগিয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

মায়াদেবী বললেন, বড্ড জব্দ হয়েছেন, না?

কোনটা শুনলে খুশী হন?

তিনি খুব হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, সত্যি বলছি, ভ্রমণের কষ্ট লোকে ভুলে যায়, আনন্দটাই মনে থাকে। আজ অদ্ভুত লাগছে, যেন গেল বছরের ভ্রমণের সূত্রটাই ধরে আছি,—মাঝখানের এক বছরটা হারিয়ে গেছে।

বললুম, এবার কিন্তু আপনার গুপ্তসাহেব আমাকে অবাক করেছেন।

স্বামীর উল্লেখমাত্র মায়াদেবী উচ্ছ্বসিত হলেন। বললেন, উনি ভাবেননি আপনি রাজি হবেন। ওঁর আনন্দ বলবার নয়। 'এই এক বছর ধ'রে উনি আমার কাছে আপনার গল্প শুনেছেন। কিন্তু আমার ভয় ছিল, আপনি রাজী না হলে উনি হয়তো একটু আঘাত পেতেন।

এবার প্রতিবাদ জানালুম,—কিন্তু স্ত্রীর মনে হিমালয়ের নেশা ধরলে তাঁর ঘরকন্না সামলাবে কে?

মায়াদেবী হেসে উঠলেন, কিছুক্ষণ পরে বললেন, ভ্রমণে যে এত আনন্দ আগে জানতুম না।

মোটর বাসে গিয়ে উঠলুম, বেলা তখন প্রায় আটটা। এখান থেকে তিনটি পথ গেছে তিনদিকে। প্রথমটি জম্মু হয়ে সোজা শ্রীনগর, দ্বিতীয়টি ধরমশালা, কাংড়া ও মণ্ডিরাজ্যের দিকে, তৃতীয়টি 'চাম্বা' উপত্যকার পথে। কাশ্মীর হোলো উত্তর-পশ্চিমে, চাম্বা উত্তর-পূর্বে এবং কাংড়া হোলো পূর্ব দক্ষিণে। 'চাক্কি' থেকে আমাদের পথ ঘুরলো উত্তরে। আমরা ধবলাধার গিরিশ্রেণীর উপত্যকার ভিতর দিয়ে অতিক্রম ক'রে পীরপাঞ্জাল পর্বতমালার দক্ষিণপ্রান্তীয় উপত্যকায় প্রবেশ করবো। পঞ্চনদীর মধ্যে আমরা দক্ষিণবর্তী শতদ্রু ও বিপাশা দেখেছি বহুদূর পর্যন্ত, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার উৎস অঞ্চল প্রায় ঘুরে এসেছি—এবার আমরা চললুম ইরাবতীর পথ ধরে। গিরিশ্রেণীর ভিতরে ভিতরে ইরাবতী নদী কোন্ পথ দিয়ে এসেছে, আমাদের কিছু জানা নেই। কিন্তু এইটুকু জানি, কুলু উপত্যকায় জন্ম নিয়েছে বিপাশা, লাহুল উপত্যকায় জন্মলাভ করেছে চন্দ্রভাগা তথা ভাগা ও চন্দ্রা, এবং 'চাম্বা' উপত্যকার কোনও একস্থল থেকে বেরিয়েছে ইরাবতী।

'চাক্কীর' ঘাঁটি পাহারা ছেড়ে মোটর বাস চলেছে 'ভাটোয়া' হয়ে 'দুনেরা' গেট এর দিকে। এটি নাতিউচ্চ উপত্যকাপথ। পার্বত্য, কিন্তু প্রায় সমতল। সমুদ্রসমতা থেকে এ অঞ্চল কমবেশী দু হাজার ফুট উঁচু, কিন্তু বোঝবার জো নেই। এখানে পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশ উভয়ে মিশ্রিত। একজন আরেকজনের ঘাড়ের উপর কোথায় ঝুঁকে পড়েছে, ঠিক হদিশ মেলা ভার। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষ্য করছি। হিমালয়ের স্বভাবটি প্রকাশ পাচ্ছে ধীরে ধীরে, কিন্তু উচ্চতা এসে পৌছয়নি। পাহাড়ের কোল এসেছে, এসেছে তার গায়ে গায়ে অজস্র ফলন। গ্রামের সরোবরে কোথাও শ্বেত, কোথাও রক্তকমল ভেসে উঠেছে। দেখতে দেখতে গাড়ী এসে পৌছলো 'দুনেরা' বস্তিতে। এবার থেকে পথ একতরফা। ঘাঁটি-পাহারা এখানে গেট খোলে,—ওপক্ষের গাড়ী এসে পৌছলে এপক্ষের গাড়ীকে যাবার অনুমতি দেয়। এটি হিমাচল প্রদেশের সঠিক সীমানা কিনা বলতে পারিনে।

কথা ছিল শ্রীমতী মায়া এ যাত্রায় ভ্রমণটি পরিচালনা করবেন। সুতরাং আমি অক্রিয়, তিনি সক্রিয়। তিনি চায়ের হুকুম করলেন, এবং তিনিই জল-যোগাদি আনলেন। পুরুষের প্রাধান্যের যুগ বোধ করি এবার শেষ হয়ে এলো, এবার নারী সমাজ। মেয়ে-পুলিশ, মেয়ে-উকিল, মেয়ে হাকিম। ঝাঁসীর রানী-বিগ্রেড দেখেছি নেতাজীর কৃপায়, নেহেরুর কৃপায় দেখেছি মেয়ে-রাজদূত, গান্ধিজীর

কৃপায় দেখেছি মেয়ে-রাজ্যপাল, বিধান রায়ের কৃপায় মেয়ে-মন্ত্রী। সর্বশেষে প্রধান মন্ত্রী—তিনিও মেয়ে। এটি মহিলা যুগ। শ্রীমতী মায়া তদ্বির-তদারক করছিলেন। বলা-বাহুল্য, ভ্রমণে অভিজ্ঞতা তাঁর প্রচুর লাভ হয়েছে।

ক্রমে ক্রমে এসে পৌঁছলুম প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল পেরিয়ে 'বানীক্ষেতে।' বানীক্ষেত,—'রানীক্ষেত' নয়। এর মধ্যে থেমেছে অনেকবার, পেরিয়েছে অনেক চড়াই উৎরাই। হিমালয় অনেকবার তার রাজমহিমা প্রকাশ করেছে, কোথাও কোথাও খরস্রোতা গিরিনদী ত্বরিৎ গতিতে সামনে দিয়ে ঘুরে অভিসারিকার মতো ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে আত্মগোপন করেছে। আমরা এতক্ষণে ইরাবতীর সীমানা পেলুম।

'বানীক্ষেতে' নামলুম। এখান থেকে ভিন্ন গাড়ী যাবে 'চাম্বায়'। আমাদের গাড়ীটি চ'লে গেল নিকটবর্তী 'ডালহাউসী' পাহাড়ের চূড়ার দিকে। হাতে সময় অনেকক্ষণ। সুতরাং হাতের কাছেই এক ফার্লং এগিয়ে বাজারের ধারে 'জয়হিন্দ' হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করা গেল।

বানীক্ষেত থেকে বাঁ-হাতি 'চাম্বার' পথ। ইংরেজ আমলে সাহেব সুবোদের আনাগোনা কম ছিল বলেই 'চাম্বা' উপত্যকার পথটি ভাল হতে পারেনি। 'ডালহাউসী'র পথটি কিন্তু কলকাতার চৌরঙ্গী অপেক্ষা কম সুন্দর নয়, তবে অপ্রশস্ত। গাড়ী ছাড়লো,—তখন প্রায় বেলা পৌনে দুটো। এবার আমরা ইরাবতীর পথ ধরলুম। 'চাম্বার' পাহাড়ের কোলে তখন মেঘ নেমে আসছে। এখান থেকে আন্দাজ তিরিশ বত্রিশ মাইল পথ। শ্রীমতী মায়া এবার গুছিয়ে বসলেন।

প্রায় মাইলখানেক পর্যন্ত এগিয়ে সহসা অনুভব করলুম, সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন আমাদের সামনে থেকে মুছে গেছে, উন্মত্তা ইরাবতীর পাশে পাশে হিমালয় যেন এবার তার প্রকৃত অন্তঃপুরের দ্বার উদ্ঘাটন করেছে। শব্দজগৎ স্তব্ধ। একমাত্র শব্দ হোলো ইরাবতীর প্রমত্ত গর্জন, এবং অন্য আওয়াজ মোটরের। সকালের জগৎ অপরাহ্নে যেন নিশ্চিহ্ন। এই পথ দিয়ে আমরা কোনও কালে কোথাও জনপদ আবিষ্কার করতে পারবো এমন মনে হচ্ছে না। বর্ষার আক্রমণে পথ ভেঙে গেছে পদে পদে, পাহাড় থেকে বড় বড় 'ঝোরা' নেমেছে, ধস নেমে পথ ভেঙে নীচের দিকে অতিকায় পাথর গড়িয়ে গেছে। অতি সঙ্কীর্ণ পথ। কোথাও ছায়া ছমছম করছে, কোথাও আতঙ্কজনক বাঁক। গাড়ীর পিছনের চাকা এক-এক সময় সঙ্কট পেরিয়ে যাচ্ছে। একটি মুহূর্তের জন্যও নিরাপদ বোধ করছিনে। জন দশ-বারো যাত্রী আমরা, কিন্তু সকলের মুখ শুকনো, এবং উদ্বিগ্ন। শীতকালে এ পথ এমন দুঃসাধ্য নয়। শুনলুম

দু-তিনটে লোক সম্প্রতি পাহাড়ের ধস প'ড়ে এখানে মারা গেছে। গত তিনদিন আগেও গাড়ী চলাচল এদিকে বন্ধ ছিল। মনে পড়ছে তিস্তা-বাজার থেকে সিকিম-সীমান্ত রংগীত নদীর পথ। বনময়, বন্ধ, জনহীন, প্রস্তরপরিকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথের সেই ভাঙন। যাত্রী সম্পূর্ণ নিরুপায়, সামনে ও পিছনে পার্বত্যপথের রেখাটি যোগচ্ছিন্ন। তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদো। কান্না শুনে জন্তু যদি বা আসে, একটি মানুষেরও দেখা পাবে না। দু-চারদিন পরে হয়তো আসবে পি-ডব্লু-ডির লোক তদন্তে—দেখবে তোমার নাজেহাল। তারপর খবর যাবে যথাস্থানে। পাহাড়ের পথ যদি খদ থেকে অনেক উঁচু হয়, এবং সামনে-পিছনে ধস নামে,—তবে শিবের অসাধ্য! ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দার্জিলিং ও সিকিমে এই ঘটনা ঘটে গেছে! দু-বছর লেগেছিল নিরাপদ করতে।

আজ এখানে সেই চেহারা দেখে যাচ্ছি। ফাটল দেখা দিয়েছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে, জল ঢুকেছে ভিতরে-ভিতরে। পাথরের ওজন কতক্ষণ টেনে রাখতে পারবে কে জানে, কতখানি ধস নামতে পারে তাও জানা নেই। ড্রাইভার মাঝে মাঝে গাড়ী থামাচ্ছে, ডানপাশের পাহাড় এক-একবার পর্যবেক্ষণ করছে, তারপর স্টার্ট দিচ্ছে গাড়ীতে। কে জানে সতর্ক থাকা ভালো। একটি ধস নেমে আসার অর্থ,—মোটরবাস ও যাত্রীর দল ইরাবতীর মধ্যে সমাধিস্থ! তার চেয়ে বড় কথা,—ছেঁচে-কুটে অপমৃত্যু। সুতরাং মৃত্যু এড়িয়ে আমাদের গাড়ী পালাচ্ছে পদে-পদে। ফিরে দেখি, মুখে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে মায়াদেবী হেঁট হয়ে পড়েছেন। পাহাড়ের ঘূর্ণী লেগেছে তাঁর। তিনি দেখতে পাচ্ছেন না গাড়ী কেমন ক'রে পড়ছে গর্তের মধ্যে, কেমন কাৎ হচ্ছে, কেমনভাবে আবার উঠছে। অপঘাত যদি ঘটে, তবে আনন্দের কথা এই—শ্রীমান কেশবের শোক তাপ দেখার জন্য আমাকেও বেঁচে থাকতে হবে না। ভয়ে ভয়ে কেবল এই কথাই ভাবছিলুম, এ যাত্রায় মায়াদেবীর আসা উচিত হয়নি। পথঘাটের চেহারা আগে জানলে ভালো হোতো।

পাথরে-পাথরে মাথা ঠুকছে ইরাবতী, রণোন্মত্তা ভৈরবী যেন অসহ্য যন্ত্রণায় অবরোধ ভেঙে ছুটেছে। ধবলাধার ছেড়ে পীরপাঞ্জালের প্রান্তগিরিলোকে প্রবেশ করছি। চম্পাবতীর সংবাদ আনছে ওপারের পাহাড়ী পাখীরা। দেওদারের অরণ্যে মাঝে মাঝে দলছাড়া পাইন উঠেছে আপন সৌন্দর্যমহিমা নিয়ে।

ঘণ্টা তিনেক পরে এক স্থলে এসে সহসা গাড়ী থমকে দাঁড়ালো,—এর

পর গাড়ী আর যাবে না। তখনও মাইল চার-পাঁচ বাকি। এ অঞ্চল পাহাড়তলী, সুতরাং এরই মধ্যে দিনান্ত এসেছে ছমছমিয়ে। সামনেই ইরাবতীর ধারে বসেছে পুলিশ চৌকি। অদূরে একটি বড় পাহাড়ের বিরাট এক ধস নেমে এসেছে,—পথ বন্ধ। আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে নেমে এলুম মালপত্র নিয়ে। দেখা গেল, আমরা ছাড়া অনেকেরই নিকট এ সংবাদটি বিদিত, অতএব তারা একে একে যে যার পথে পা বাড়ালো। আমরা পড়লুম একা। শূন্য মোটরবাস প'ড়ে রইলো একপাশে, ড্রাইভার গা ঢাকা দিল।

এটি নাকি বস্তি, নাম 'প্রেল্'। কিন্তু ওই পুলিশ চৌকিদার একটি সশস্ত্র লোক এবং একটি ঘোড়া,—এ ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখছিনে কোথাও। হঠাৎ এসে দাঁড়ালো দুটি কিশোর পাহাড়ী বালক পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে। তারা মাল বইতে পারবে জানালো। কিন্তু তাদের শীর্ণ চেহারা দেখে একেবারেই উৎসাহ পেলুম না। এদিকে সন্ধ্যা আসন্ন। ছেলে দুটি বকশিসের লোভে আমার জন্য একটি ঘোড়ার সন্ধানে ছুটল।

কেমন যেন একটু বিব্রতই বোধ ক'রে এবার ফিরে তাকালুম মায়াদেবীর দিকে। আর কিছু নয়, একজন ভদ্রমহিলার নিরাপত্তার প্রশ্ন। তাঁর স্বামী পাঠিয়েছেন গৌরবের সঙ্গে,—আত্মীয়-স্বজন-কুটুম্ব—কোন পর্যায়েই ইনি পড়েন না। কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ সম্মানে রাখার স্বাভাবিক দায়িত্ব আছে বৈকি। সুতরাং আসন্ন অন্ধকারের চেহারা দেখে একটু যেন ভয়ই পেলুম। বিরক্তিপূর্ণ অনুশোচনাও বোধ করলুম।

আমি আসছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।—এই ব'লে তিনি একদিকে একা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই আমি বাধা দিলুম,—না, একা যাওয়া হবে না আপনার। আপনি বরং দাঁড়ান, আমি দেখি।

তিনিও মুখ তুলে তাকালেন। সে মুখে হাসি। শান্তকণ্ঠে বললেন, আপনি আমাকে একা ছাড়তে চান না, কিন্তু গুপ্ত সাহেব আমাকে একা ছেড়ে দিয়েছেন। কেন জানেন? তিনি চেনেন আমাকে।

পুলিশ চৌকির ওই সশস্ত্র লোকটিকে ডেকে নিয়ে মায়াদেবী এগিয়ে গেলেন, এবং দূর পাহাড়ী পথের বাঁকে অদৃশ্য হলেন।

পাঁচ মিনিট গেল। দশ মিনিট কাটলো। পনেরো মিনিট হ'তে চললো! ঝিঁঝিঁ পোকারা ডেকে উঠলো সন্ধ্যায়। চৌকির ঘোড়াটা একবার সাড়া দিল। পঁচিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। বন্য পাখী পাহাড়ের ফাটলে কোথায় যেন ডানা

ঝাপটিয়ে উঠলো! তিরিশ মি··হাঁ, দূর থেকে এবার আসছে যেন একটি ঘোড়া এদিকে। একটির উপরে নারীর আয়তন! আর একটির উপরে সশস্ত্র সেই পুলিশ। দম আটকে ছিল এতক্ষণ, এবার ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিলুম।

কাছে এসে লোকটি নামলো। পিছনে পিছনে এসে দাঁড়ালো একটি ঘোড়াওয়ালা। পাশের ঘোড়াটির উপরে একদিকে দুই পা ঝুলিয়ে সহাস্যে বসে রয়েছেন মায়াদেবী। পুলিশের ওই লোকটির সাহায্যে বস্তি থেকে তিনি ওই ঘোড়া দুটি ও তাদের রক্ষীকে ধ'রে এনেছেন।

বিছানার পুঁটলি খুলে দুখানা কম্বল বার ক'রে ঘোড়ার পিঠে পাতা হোলো। আরেকখানি গরম চাদর মায়াদেবী চেয়ে নিলেন। এবার ভাগাভাগি ক'রে সেই দুটি বালক ও অশ্বরক্ষী মিলে মালপত্রগুলি পিঠে তুলে নিল। পুলিশের লোকটিকে কিছু বকশিশ দেওয়া হোলো। মায়াদেবী এবার হঠাৎ জিমনাস্টিক দেখিয়ে নিজেই টপা' ক'রে উঠলেন ঘোড়ার পিঠে, তারপর চাদরখানা দিয়ে সামনের দিকে ঢেকে বসলেন। অশ্বরক্ষী এবার আমার দিকে তাকালো, তারপর তার 'চাম্বিয়ালী' ভাষায় বলল, মেমসাহেব ঘোড়ায় চড়াটা জানেন ভালো।

ঘোড়াটি না পাওয়া গেলে হয়তো হোঁচট খেয়ে খেয়ে রাত্রে একসময় 'চাম্বায়' পৌঁছতুম, কিন্তু খোয়ারের শেষ থাকতো না। মাঝপথে একটি গিরিনদীর জলে খালি পায়ে নামতে হোতো, অন্ধকার পথে সরীসৃপের ভয় থাকতো,—এবং পরিশেষে মালপত্রের কোন ব্যবস্থাই করা যেতো না। পথ এখন খুবই অন্ধকার। নদীর গর্জন শুনছি, কিন্তু দেখতে কিছু পাচ্ছিনে। ঝোপজঙ্গল এবং একটি পাহাড়ী বস্তির গা ঘেঁষে আমাদের ঘোড়া দুটি এগোচ্ছিল। কোথাও কিছু স্পষ্ট ক'রে দেখা যাচ্ছে না। আলোর চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।

পাঁচ মাইল অত নয়, তার চেয়ে কম। সামনের দিকে একটি মস্ত পাহাড়ের অবরোধ ছিল, তাই অমন অন্ধকার জনশূন্যতা ছিল। আমরা পশ্চিম পথে মাইল দুই ঘুরে বনভূমির একটা অংশ পার হয়ে আসতেই দেখা গেল, দূরের পাহাড়ে রাত্রির আলো ঝিকমিক করছে। আর মাইল দুই। অশ্বরক্ষীরা সতর্কভাবে আমাদের পথ দেখিয়ে নি'' চলেছে। ছেলে দুটিও যাচ্ছে সাধ্যমতো মালপত্র পিঠে নিয়ে। মায়াদেবীর ঘোড়া সামনে এগিয়ে চলেছে। ঘোড়ার সঙ্গে তিনিও দুলছেন।

ক্রমে আমরা এসে পৌঁছলুম ইরাবতীর পুলের কাছে। এটি লছমন-ঝুলারই মতো কাছিটানা সাঁকো। কিন্তু আশেপাশে সব অন্ধকারে একাকার।

লোকজন এবার দেখা যাচ্ছে। দোকানপত্র দেখছি। পুলের নীচে দিয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে নদী ব'য়ে চলেছে। পুল পার হয়ে ডানহাতি শহরের চড়াইপথ। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধহয় অতি মৃদু ইলেকট্রিকের আলো জ্বালা হয়েছে। কিন্তু সেই আলো শ্রীনগরের রাত্রির আলোর মতই মৃদু। ইলেকট্রিকের আলোর কথা আমার স্মরণ নেই,—আমাদের তেলের আলো জ্বালাতে হয়েছিল।

চড়াইপথে ধীরে ধীরে পাকদণ্ডী পেরিয়ে আমরা উঠে এলুম শহরে। শহর-প্রবেশের ঠিক মুখে একটি বিশাল প্রাচীন তোরণদ্বার, কিন্তু তোরণটির বর্তমান নামকরণ করা হয়েছে 'গান্ধী তোরণ'। তোরণ পার হলেই ডানদিকে প্রশস্ত এক ময়দান, এটি নাকি পোলোখেলার মাঠ। শহরের বাজার আরম্ভ হয়েছে ঠিক তোরণের পর থেকে।

কিন্তু হঠাৎ রাত্রিকালে শহরের মধ্যে একজন অশ্বারোহীর সঙ্গে আরেকজন সুন্দরী অশ্বারোহিনী এসে প্রবেশ করবেন, এবং তিনি নিতান্ত অবলা লজ্জা-জড়িতা নন—এটি বোধ করি চম্পাবতীর অধিবাসীমহলে কিছু কৌতূহল সঞ্চার করেছিল। সেজন্য মিনিট দুয়েকের মধ্যে শ দুই লোক একটি মস্ত জনতার আকারে ঘিরে দাঁড়ালো, এবং তারা যখন জানালো—আমরা পরিভ্রমণ করতে এসেছি তাদের এই সুন্দর ও মনোরম পার্বত্য উপত্যকায়, তখন তাদের মধ্যে অনেকে আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বাসস্থানটি দেখিয়ে দেবার উৎসাহে এগিয়ে এলো।

বাসস্থানটি হোলো রেস্টহাউস, এবং সেটি ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোলে একটি নিরিবিলি মস্ত বাগানের মধ্যে। বাগানের ঠিক নীচে ইরাবতীর খদ, গভীরতলে নদী বয়ে চলেছে। এই বাগানে অজস্র পুষ্পলতা, সূর্যমুখী, গোলাপ এবং ডালিয়া থরে থরে প্রস্ফুটিত। মাঝে মাঝে রয়েছে ওক আর পাইন, মাঝে মাঝে এক-আধটা চীড়। নানাবিধবর্ণ অসংখ্য ফুল ও পুষ্পলতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দুই পাশে, কিন্তু এদের নাম মনে রাখতে পারলুম না কোনও কালে। যাই হোক, উদ্যানের এই শোভা আজও থেকে গেছে বোধ করি একটি কারণে। মাস দেড়েক আগে পণ্ডিত নেহেরু এসেছিলেন চম্পাবতীতে,—ফলে, সর্বালঙ্কারভূষিতা হয়েছে চম্পাবতী! বন্য কৌমার্যের গায়ে জড়ানো হয়েছে মণিরত্নখচিত আভরণসজ্জা।

বাগানে এসে যখন আমরা ঢুকেছি, দেখি রাত্রি সাড়ে সাতটা। দুইধারে বিশাল পর্বত বেষ্টন ক'রে রয়েছে,—সেই কারণে এই উপত্যকায় রাত্রি ঘনিয়েছে একটু অকালে। বারান্দার উপরে টিপটিপ করছে একটি আলো, তার বাইরে সমস্তই আবছা। সামনের পাহাড়ের গা বেয়ে একটি প্রকাণ্ড তির্যক ছায়া

বাগানে নেমে এসেছে দেখে কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। দেখি দ্বিতীয়ার অতি শীর্ণ বঙ্কিম-চন্দ্র—রমণীর নখাগ্রের মতো—দূর পাহাড়ের পিছনে অদৃশ্য হবার আগে তার শেষ সঙ্কেতটুকু রেখে যাচ্ছে। আকাশ ঝলমল করছে জ্যোতিষ্কে আর তারকায়।

অশ্বরক্ষীরা জিনিসপত্র নামালো। খানসামা এসে দাঁড়ালো সামনে। একটি অতি সুশ্রী ও সুপুরুষ যুবা,—ভদ্র এবং লাজুক। আমরা যা কিছু প্রস্তাব করি, তাইতেই সে নতমুখে সম্মত হয় এবং সেটি প্রতিপালন করে। করে বটে, কিন্তু দেরী করে—এই যা অসুবিধা। দুজন অশ্বরক্ষী এবং দুটি বালককে তাদের পারিশ্রমিক ও বকশিশ দিয়ে বিদায় করা হোলো। মায়াদেবী ছেলে-দুটিকে কিছু খাদ্যও দিলেন।

ঠিক মনে নেই, খানসামার নামটি বোধ করি মহেন্দর। সে এসে দরজা খুলে আলো জেলে দিল। পাশের ঘরটিতে এসেছেন একজন সৌম্যদর্শন 'এগ্রিকালচারাল ইনস্‌পেক্টর'। তাঁকে ডেকে আমরা আলাপ করলুম। আমাদের এ ঘরটি বেশ বড় এবং সুসজ্জিত। এধারে-ওধারে প্রচুর আসবাবপত্র সাজানো। ঘরের দেওয়ালে একটি প্রকাণ্ড বাঘের ছবি,—স্বল্প আলোয় তার জলজলে চেহারাটা দেখলে ভয় করে। দূরের থেকে একজন শিকারী তার দিকে বন্দুক তুলেছে।

মহেন্দর পাঁচ মিনিটের চা পনেরো মিনিটে আনলো, তারপর স্নানের ঘরে গরম জলের ব্যবস্থা করতে লাগালো ঘণ্টাখানেক। সব কাজেই তার দেরি। একটি ঘটি আনতে লেগে গেল দশ মিনিট! মায়াদেবী তাকে নৈশভোজনের ব্যবস্থা করতে বললেন বটে, তবে রাত বারোটার আগে সেই খাদ্য আমাদের মুখে উঠবে কিনা গভীর সন্দেহ।

দিনের আলোয় নতুন দেশে পৌঁছলে সমস্তটা আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া যায়। আলোয় হাওয়ায় তার প্রকাশের সঙ্গে একটি আত্মীয়তা ঘটে। আমরা রাত্রের দিকে এসেছি ব'লেই সমস্তটা সন্দেহে ভরা। কিছু দেখতে পাচ্ছিনে, সেজন্য অবিশ্বাস্যকেও বিশ্বাস করতে হচ্ছে। ঘরের অথবা বারান্দার আলোটুকুতে যেটুকু প্রকাশিত, তার বাইরে এ জগৎটি হোলো ভৌতিক। সেই কারণে একজন কয়েক পা এগিয়ে গেলেই আরেকজন তার সাড়া নিচ্ছি। ইচ্ছা ক'রেই অনাবশ্যক কথা বলছি, কেননা ওইটুকু সোরগোলের মধ্যেই সাহস। রাত আন্দাজ সাড়ে নটার সময় ইন্‌স্‌পেক্টর ভদ্রলোক তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করার আগে অনুগ্রহ ক'রে বললেন, যদি কোনও দরকার হয় আমাকে

ডাকবেন। আপনারা অবশ্য এ অঞ্চলে নতুন লোক, তবে এখানে ভয়ের কিছু নেই। আমি পাশেই রইলুম।

মায়াদেবী ভ্রূকুঞ্চন ক'রে সহাস্যে বললেন, ভয় নেই ব'লে লোকটা যেন আরও ভয় পাইয়ে দিল। কই, আপনার মহেন্দরকে একবার হাঁক দিন দেখি।

বাইরে এসে হাঁক দিলুম, কিন্তু চমকে উঠলুম নিজের হাঁকে। সামনে কখন যেন সেই শীর্ণ চন্দ্রের ছায়া কৃষ্ণকায় ময়দানবের বক্ষপট থেকে মিলিয়ে গেছে। শুধু চরাচরব্যাপী রয়েছে নিঃঝুম অন্ধকার। বারান্দার আলোটা আর জ্বলছে না। চেতনার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।

সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে উঠে এলো আরেকটি লোক,—মহেন্দর নয়। লোকটি বয়স্ক, রেস্ট হাউসের পাচক। তাকে বললুম, আমরা স্নান সেরে ব'সে আছি, বুঝেছ? খাবার দাবার কই? মহেন্দর কোথা?

বাজার গিয়া।

বাজারে গেছে এতক্ষণে? মানে? জিনিসপত্র কিনতে?

জি হাঁ।

এর পর আর কিছু বলবার রইলো না। সঙ্গে আমাদের আর কোনও খাদ্য নেই। মায়াদেবী ক্লান্ত ছিলেন। তিনি ঘরে গেলেন। আমি বারান্দার ধারে ব'সে অপেক্ষা ক'রে রইলুম।

কিছুক্ষণ পরেই এলো অবশ্য মহেন্দর। ঠাহর ক'রে দেখলুম, কি-কি যেন তার সঙ্গে। রাগে গসগস করছিলুম। ছোকরা নিজের মনেই লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ভিতর দিকে কোথায় যেন গিয়ে ঢুকলো।

ঘণ্টাখানেক বাদে অনেক হাঁকাহাঁকির পর এবার সে খাবার আনলো আমাদের ঘরে। আলোটা বাড়িয়ে দিলুম। মুখখানা তার সত্যই সুশ্রী। বয়স বছর পঁচিশ। স্বাস্থ্যে ঝলমল করছে। কিন্তু আমরা উভয়েই তার ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলুম। দুজনের একজন—কে তা আর মনে নেই—ফস ক'রে প্রশ্ন করলুম, ঠোঁট দুখানায় অমন ক'রে রং মেখেছ কেন? তুমি কি মেয়ে?

মুখ তুললো মহেন্দর,—ক্যা?

মায়াদেবী হেসেই অস্থির। হাসিমুখে তিনি প্রশ্ন করলেন, এতক্ষণ কি করছিলে? আমরা যে খিদের জ্বালায় ছটফট করছিলুম।

মহেন্দর সবিনয়ে জানালো, সে 'নিমক' আর মাখন আনতে গিয়েছিল বাজারে, তবে পথে একটুখানি তাস খেলতে ব'সে গিয়েছিল।

তার এবম্বিধ সরল স্বীকারোক্তি শুনে আমরা অভিভূত হলুম। কিন্তু একথা সত্য, তার ওষ্ঠাধরের এ প্রকার লালবর্ণ পুরুষমানুষের মুখে আর কোথাও

দেখেছি কিনা মনে পড়ে না। আহারাদির পর যথারীতি সে এসে তেমনি বিনীত ভাবটি বজায় রেখে থালাবাসনগুলি নিয়ে চ'লে গেল।

রাত্রে শীত পড়েছিল। কিন্তু দিল্লী থেকে বেরিয়ে এই প্রথম আবিষ্কার করলুম, বিছানার কোনও পুঁটলি মায়াদেবীর সঙ্গে নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়বার সময় ওটার কথা তাঁর মনেই পড়েনি। তাঁর এই শিল্পীজনোচিত জীবনবৈরাগ্য নিয়ে পরিহাস করতেই তিনি বললেন, বিশ্বাস করুন, আমার ঠাণ্ডাও লাগে না, অসুখও করে না। শীতের রাত্রেও এক একদিন নাচের আসর থেকে ফিরে গলগল ক'রে ঘাম পড়েছে, গায়ে ঢাকা না দিয়েই ঘুমিয়েছি।

'চাম্বা' উপত্যকার প্রকৃত নাম 'চম্পাবতী'। দক্ষযজ্ঞের পৌরাণিক কাহিনীটির সত্য-মিথ্যা কখনও নিরূপণ করার চেষ্টা পাইনি, কিন্তু তারই অনুরূপ একটি কাহিনী এককালে এই উপত্যকায় ঘটেছিল। চম্পাবতী ছিলেন রাজদুহিতা, সুন্দরী সুশিক্ষিতা। কোনও এক ভিনদেশী সৌম্যদর্শন তরুণের সঙ্গে তিনি প্রণয়াসক্ত হন এবং সম্ভবত গোপনেই তাকে বিবাহ করেন। রাজকন্যার এবম্প্রকার বিবাহ এবং জীবনযাত্রা পিতার পক্ষে আনন্দদায়ক হয়নি এবং যখন সেই তরুণের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে,—চম্পাবতীও সেই চিতার আগুনে ঝাঁপ দেন। এখানকার প্রধান একটি মন্দিরের নাম 'চম্পাবতী'—ভিতরে যাঁর মূর্তি রয়েছে তিনি হলেন মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা।

পরদিন আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। দূর হিমালয়ের অন্তঃস্থলে,—জনতার সর্বপ্রকার কলরব কোলাহলের বাইরে চম্পাবতী যেন তপস্বিনী। চারিদিকে বিরাট হিমালয়ের অন্তহীন একটির পর একটি উত্তুঙ্গ স্তর,—পৃথিবী এখানে অচল অবরোধে সম্পূর্ণ বন্দিনী। 'লস্ট হোরাইজন্' গল্পটি মনে পড়ে, হিমালয়ের আকাশপথে একটি উড্ডীন বিমান যখন 'লাসা'-নগরী আবিষ্কার করে। চম্পানগরীও তেমনি হিমালয়ের গহনলোকে যেন একটি নিরুদ্দেশ হারানো শহর।

চম্পাবতীর এই পার্বত্য পরিবেষ্টনের একদিকে জম্মু ও কাশ্মীর, অন্যদিকে লাহুল, জাস্কার ও লাদাখ,—এই দুইয়ের মধ্যলোকে দুর্গম ও গগনস্পর্শী পীরপাঞ্জালের নীচে দিয়ে চ'লে গেছে চন্দ্রভাগার প্রবাহ। এপারে চম্পাবতী, ওপারে লাহুল। সমগ্র পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা এই অঞ্চলে কুড়ি থেকে বাইশ হাজার ফুট। চম্পাবতী, লাহুল ও কুলু উপত্যকাই হোলো পাঞ্জাবের তিনটি

প্রধান নদীর উৎপত্তিস্থল—ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিপাশা। লাহুলের দক্ষিণে কুলু। চম্পাবতীর দক্ষিণে ধবলাধার অতিক্রম করলেই কাংড়া উপত্যকায় পৌছনো যায়। গত বছর এমন দিনে আমরা কাংড়া ও কুলু ভ্রমণ করছিলুম।

চম্পাবতীর পার্বত্য উপত্যকার আয়তন হোলো ৩,২১৬ বর্গমাইল, এবং জনসংখ্যা সওয়া লক্ষর কিছু বেশী। চম্পা শহরে মাত্র ৬,০০০ নরনারীর বসবাস এবং চাষবাস পশুপালনাদি তাদের উপজীবিকা। এই উপত্যকা হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত, এবং রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতে এর উল্লেখ রয়েছে। সমগ্র উপত্যকাকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে বিরাট এক-একটি গিরিশৃঙ্গ,—হাতীধর, ধবলাধর, পাঙ্গীশ্রেণী, মণিমহেশ, দাগানিধর, ছত্রধর এবং জাস্কার। চম্পার অধিবাসীগণের মূল পরিচয় হোলো, তারা রাজপুত এবং রাঠোরবংশীয়। চম্পাবতীতে এরা 'রাঠ' নামে পরিচিত। স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, তাতার, পাঠান এবং মোগলযুগে রাজস্থানের একটা বড় অংশ যখন টুকরো-টুকরো হয়ে হিমালয়ের নানা পাহাড়ী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং আঞ্চলিক আদিবাসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপন আপন শিক্ষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লালন করতে থাকে,—এই 'রাঠ' সম্প্রদায় তখন হয়ে ওঠে তাদেরই একটি ভগ্নাংশ। নেপালে, কাংড়ায়, মণ্ডিতে, বিলাসপুরে, কুলুতে এবং আরও অনেক অঞ্চলে রাজস্থানী রাজপুতরা উপনিবেশ গ'ড়ে তুলেছিল। পাঞ্জাবী হিন্দু যাদের অনেকটা অংশ রাজপুত, এবং রাজস্থানী রাজপুত,—এই দুইয়ের মধ্যে অনেকটা প্রার্থক্য থেকে গেছে বৈকি। হিমাচল প্রদেশে ভ্রমণকালে যে কেউ অনুভব করবে, পাঞ্জাব অপেক্ষা বাঙলার সামাজিক পরিবেশ ওখানে সুপ্রত্যক্ষ। বাঙলায় যেমন মনসা ও শীতলাদেবীর পূজা চলে, চম্পাবতীতেও প্রায় তাই। শীতলা ওখানে হিংস্র ও কঠোর মূর্তিতে প্রকট; বহু অঞ্চলে বাঙলার 'নাগ-পঞ্চমীর' মতো মূর্তির সঙ্গে সাপ জড়িয়ে সাপের পূজো দেওয়া হয়। 'নাগ' এবং 'মহানাগ' মন্দির অথবা 'দেউল' যেখানে সেখানে। জাতিতে বা সম্প্রদায়গতভাবে এরা 'নাগ' অথবা 'নাগা'—এমন কোনও খবর পাইনি। এরা আমাদের মতোই সর্পপূজারী মাত্র। সাপের উৎপাতও চম্পাবতীতে প্রচুর। গোখরো, বোড়া, শঙ্খচূড় এবং 'রাত্তির' নামক সাপ খুব দেখা যায়। চম্পাবতীর নিজস্ব যেটি ভাষা, সেটির নাম 'চাম্বিয়ালী'। সেটি পার্বত্য, কিন্তু হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী মেশানো। একই ভাষা ঘুরেছে অনেক দিকে এবং অনেক দেশে, মাঝে মাঝে কেবল তার আঞ্চলিক আওয়াজটি বদলেছে।

চম্পাবতীর 'বর্মা' রাজবংশ এককালে ছিল অভিজাত। তারা ছিল প্রবল শক্তির পূজারী। কোনও কোনে এরা কেন্দ্রীয় প্রভুত্বের নিকট বশ্যতা স্বীকার

করেনি। এরা স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। কিন্তু ধর্মীয় সংস্কৃতির দিক থেকে ভারতের থেকে এরা নিজেদের কখনও পৃথক মনে করেনি। ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে এরা বৃহতের সঙ্গে আত্মিক যোগ কখনো হারায়নি। ইউরোপের খ্রীষ্টান রাজনীতিতে আমরা যে অসভ্যতা দেখে আসছি একশো বছর কাল থেকে, এদেশে সেই প্রকার রাজনীতি অনেক কম। হিমালয়ে তার চেয়েও কম। পররাজ্যের প্রতি লোভ ও জুলুম, পরের ঘরে অশান্তি বাধাবার ফন্দি, পরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন ও হুমকি, পরের উপর প্রভুত্বের চেষ্টা,—এই রাজনীতি ভারতীয় ঐতিহ্যের ধাতে সয়নি। বৃহত্তর কল্যাণের দিকে চেয়ে পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় একমাত্র দেশ ভারতবর্ষ যেখানে দুই প্রকার মহাসম্মেলন আহ্বান ক'রে মানুষের সঙ্গে মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মিলনের চিরকালীন চেষ্টা করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হোলো ধর্ম মহাসম্মেলন এবং অন্যটি হলো 'মহাকুম্ভের মেলা'। ভারতের প্রায় সর্বত্র আজও সম্মেলন এবং শত-সহস্র বাৎসরিক 'মেলা' তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এইসব সম্মেলন এবং 'মেলা'র না আছে বিজ্ঞাপন, এবং না বা প্রচারকার্য—হয়তো পঞ্জিকার এক কোণে ছোট একটি উল্লেখ আছে, এবং সেইটিই যথেষ্ট। শতে, সহস্রে, লক্ষে—ছুটে আসবে নরনারী দেশ-দেশান্তর থেকে। তখন দেখি একটি মাত্র তীর্থপথে ভারতের সকল জাত এবং শ্রেণী একাকার হয়ে থাকে।

চম্পাবতীর প্রাচীন রাজধানী হোলো ভারমর। কেউ বলে, ব্রহ্মহর। চম্পানগরী থেকে ইরাবতীর তীরে তীরে পূর্বপথে অগ্রসর হ'য়ে আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল দূরে 'ভ্রামর'। এই নগরীর বন্য পার্বত্য শোভা অতি মনোরম। এখানে 'বর্মা' বংশ ছিল বহুকাল। আদিত্য বর্মা, লক্ষী বর্মা, শহিলা, সোম, উদয়, গণেশ, প্রতাপ সিং, বলভদ্র, পৃথী সিং, ছত্র সিং, শ্রীসিং, গোপাল সিং, শান সিং, ভুরি সিং ইত্যাদি বহু নরপতির শাসনকাল ছিল। চম্পানগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছে, তাও বহুকাল। এই উপত্যকার দুইদিকে, অর্থাৎ ধবলাধার ও পীরপাঞ্জালের মধ্যস্থলে বহু দেবদেবীর মন্দির ও তীর্থস্থান আজও এখানকার শিবশক্তি উপাসনার গৌরব বহন ক'রে চলেছে। তাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর, শিখর, লছমন, শক্তি, চামুণ্ডা, ভগবতী, বংশীগোপাল ইত্যাদি প্রধান। চম্পাবতীর সর্বপ্রধান যে কটি উৎসব, তাদের মধ্যে পহেলা বৈশাখের নববর্ষ উৎসব একটি। এ ছাড়া পহেলা ভাদ্রে একটি উৎসব হয়, সেটির নাম 'পত্রক' সংক্রান্তি,—সেটির সঙ্গে বোধ করি বর্ষার সাফল্য ও সার্থকতার যোগ আছে। তারপর হোলো 'মণিমহেশের' বিরাট উৎসব ও মহাসম্মেলন। এটির নাম 'মাশক'। এই মেলাটি শিব-পার্বতীর নামে অনুষ্ঠিত হয়। অনেকটা 'কুলুর'

দশহরা উৎসবের মতো। 'মণিমহেশের' এই মেলায় সমগ্র চম্পাবতীর নর্তকীরা এসে জড়ো হয় এবং তাদের আলুথালু ও জীবনমরণ-মাতানো নাচ দেখার জন্য বহু দূর দেশ থেকেও পর্যটকরা আসে। সেই নাচের নাড়া খেয়ে কমলকোরক রক্তপদ্মে পরিণত হয়। জ্যোৎস্নারজনীতে পাহাড়ে পাহাড়ে নৃত্যসভা বসে যায়।

'খাজিয়ার' তথা 'খাজ্জার' এখান থেকে প্রায় আট মাইল চড়াই পথ। সেখানকার পাইনবন এবং সরোবরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে কাশ্মীরের গুলমার্গ মনে পড়ে। অতি নিরিবিলি এবং নিভৃত নিকুঞ্জলোক। নিকটেই একটি প্রাচীন দেবস্থান,—নাম 'খাজিনাগ'। সেখানকার জনবিরল ডাকবাংলোর বারান্দায় ব'সে অনেক পথের অনেক পথহারানো পাখী তাদের প্রাণের প্রলাপ গুঞ্জন ক'রে চ'লে যায়।

দিন দুই ঘুরে-ঘুরে আমরা বেশ পরিশ্রান্ত। গত বছর মায়াদেবী ছিলেন গম্ভীর, এবার হুজুগে মেতেছেন। কলরব তুলছেন পথে-ঘাটে। নাচ দেখছেন, গান শুনছেন, ফটো জোগাড় করছেন। টিলাপাহাড়ের ওপর চম্পাবতী রাজপ্রাসাদ,—তার মধ্যে রয়েছে চিড়িয়াখানা,—সেখানে নানা পশুপক্ষীর মেলা। মায়াদেবী ঘুরছেন প্রাসাদপ্রাঙ্গণে আর অন্তঃপুরের আশে পাশে। সঙ্কীর্ণ পথ পেরিয়ে মস্ত দেউড়ীর ভিতর দিয়ে ঢুকছেন লছমীনারায়ণের মন্দিরে, এদিকে গণেশের মন্দির, ওধারে চামুণ্ডা, তারপর ভগবতী। কোথাও পূজো দিচ্ছেন, কোথাও বা মেয়েদের জড়ো করছেন। ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি হাটতলার পাশ দিয়ে দোকানপাতি ছাড়িয়ে ছোট ময়দানের সামনে 'ভূরি সিং' জাদুঘরে,—যেখানে বিভিন্ন প্রকারের প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র এবং তৎসংলগ্ন ঐতিহাসিক সামগ্রী সুরক্ষিত।

আমরা বড় শহরে মানুষ,—এখানকার কোনটাই আমাদের কাছে নতুন নয়। এখানে সব রকমের প্রতিষ্ঠান প্রায় পাশাপাশি,—আধঘণ্টার মধ্যে দেখা শেষ হয়ে যায়। প্রাসাদে আর কোনও বিস্ময় নেই,—বিস্ময় আছে মানুষের বৈশিষ্ট্যে এবং সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য পরিচয়ে। ঠিক তথ্য সংগ্রহ নয়। কিন্তু দেখতে চাচ্ছি সেই বস্তু, যা দেখিনি কোনওদিন। জীবনের নিবিড় পরিচয়টুকু জানতে চাচ্ছি, যেটি রয়েছে পাহাড় পর্বতে জড়িয়ে, যেটি রয়েছে আদি অধিবাসীদের ঘরকন্নার মধ্যে ছড়িয়ে। জাদুঘর, হাসপাতাল, পৌরভবন, প্রসূতিসদন,—এসব দেখার জন্য আসিনি, এসেছি চম্পাবতীর প্রাণের ইতিহাস পাঠ ক'রে যেতে,—যেটি তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

চম্পাবতীর সামন্ত নরপতি ছিলেন এই সেদিন অবধি, এখন ভারত গভর্নমেণ্টের নিয়োজিত ডেপুটি কমিশনার ব'সে রয়েছেন শাসনকার্য নিয়ে। তাঁরই সৌজন্য ও সহাযতায় আমরা জানবার ও বুঝবার স্ুবিধা পেলুম অনেক। চম্পাবতীর পায়ে ছিল শৃঙ্খল,—আজ শৃঙ্খলের পরিবর্তে নূপুর। ইরাবতীর তীরে-তীরে সেই নূপুর 'ঝুমুর ঝুমুর মধুর' হয়ে বেজে চলেছে। চম্পাবতী আজ চোখ মেলেছে। কাজ তুলে নিয়েছে অনেক। কুটীর শিল্পের নানাবিধ ফরমাস নিয়ে সে নতুন জীবন আরম্ভ করেছে। ডেপুটি কমিশনার মহাশয় চম্পাবতীর সমস্ত পরিচয় আমাদের কাছে ব্যক্ত করলেন। অনেক ক্ষেত্রে দলিলপত্রও তিনি বার ক'রে দেখতে দিলেন।

'হরিরায়ের' মন্দিরের পাশ কাটিয়ে ময়দান পেরিয়ে আমরা রেস্ট হাউসের সেই নন্দন কাননে এসে ঢুকলুম রাত্রের দিকে। সেই এগ্রিকালচারাল ইন্‌সপেক্টর ভদ্রলোক চ'লে গিয়েছেন। অন্ধকারে থমথম করছে দুখানা শূন্য হলঘর। মহেন্দর তাদের মহলে আছে কিনা কোনও সাড়াশব্দ নেই। বাগানের গায়ে বিশাল পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে একটি আবছা পথ উঠে কোনদিকে যেন হারিয়ে গেছে। থমকে দাঁড়িয়ে একবার হাঁক দিলুম মহেন্দরকে, কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। আজকে আর আলোও জ্বলেনি বারান্দায়।

আন্দাজে আন্দাজে এগিয়ে ঘরের চাবি খুললুম, কিন্তু হ্যারিকেন লণ্ঠনটি খুঁজে বের করার জন্য চার পাঁচটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতে হোলো। হঠাৎ এতক্ষণ পরে মনে প'ড়ে গেল, কেরোসিনের অভাবে গত রাত্রে আলোটা কখন এক সময় নিভে গিয়েছিল। লণ্ঠনটা তেমনি শূন্য অবস্থায়ই রয়ে গেছে। মোমবাতি কেনার কথা মনেই পড়েনি।

পরদিন প্রভাতেই আমাদের যাত্রা। কাল রাত্রের তিরস্কার মহেন্দর ভোলেনি, আজ প্রত্যূষে চা ও কিঞ্চিৎ প্রাতরাশের ব্যবস্থা ক'রে দিল। নির্দিষ্ট সময়ে ঘোড়াওয়ালারা দুটি ভদ্রগোছের ঘোড়া এনে বারান্দার নীচে হাজির করলো। সকাল তখন সাতটা। রাঙা রৌদ্র স্পর্শ করেছে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। নীচের উপত্যকায় তখনও প্রভাত এসে পৌঁছয়নি। মধুর ঠাণ্ডায় চম্পাবতীর চোখে তখন সুখের তন্দ্রা জড়ানো। মহেন্দরের পাওনা এবং বকশিশ মিটিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

ঘোড়াওয়ালারাই আমাদের মালপত্র সঙ্গে নিল। আমরা উৎরাই পথে ইরাবতীর তীরে নেমে সাঁকো পার হয়ে ঘোড়ায় উঠলুম।

পাখীর কণ্ঠে প্রভাত বন্দনা চলছিল। বনময় বস্তি ও পাহাড়তলীর ধারে ধারে আমাদের ঘোড়া দুটি চললো। আবার আমাদের যেতে হবে সেই 'প্রেল্' নামক পুলিশ চৌকি পর্যন্ত সেখানে মোটরবাস পাবার কথা। গিরি-নদীটি পার হয়ে দূর পথে অগ্রসর হলুম। স্বর্ণকিরণ নেমেছে তখন ইরাবতীতে।

॥ ১২ ॥

ধবলাধারের প্রান্তভাগেই নামছি। নীচে-নেমে আবার ঘুরে যাবো পশ্চিমে। সেই একই ইরাবতীর ধারাপথে ফিরে যাচ্ছি,—প্রেল্ থেকে 'বানীক্ষেত',—রানীক্ষেত নয়। সেই পাহাড়ের তলায় তলায় ভাঙন, আর ধস নামা। সেই সঙ্কট আর অপমৃত্যুর ভয়,—সেই পাশে পাশে বন্য আর পার্বত্য ছায়াচ্ছন্নতার ভিতর দিয়ে লীলায়িত ইরাবতী পাথরে পাথরে আছাড় খেয়ে ছুটেছে। কালো-কালো অতিকায় পাথর পড়ে রয়েছে নদীতে এক-একটি মহিষাসুরের মতো,—মহিষমর্দিনী ইরাবতী রণোন্মত্তা হয়ে তাদের দলন ক'রে চলেছে।

ভয় আর পাচ্ছিনে। ভয়েতেও অভ্যস্ত। ড্রাইভারের হাতে যদি স্টীয়ারিং ঠিক থাকে, তবে আমাদের মৃত্যু ঘটানো শিবেরও অসাধ্য। সুতরাং আর ভয় পেতে চাইনে, ওটা হোলো মনের একটি বিশেষ পঙ্গুতা। মৃত্যুকে কাছে দাঁড়িয়ে দেখলে মৃত্যুভয় কমে যায়। হাসপাতালের ডাক্তার মৃত্যু দেখে অভ্যস্ত। মানুষ মরছে, সহকারীদের সঙ্গে তিনি চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনাটা করছেন। শ্মশানের মুর্দাফরাস চিতার আগুনে বিড়ি ধরায়। যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চে মড়া সাজিয়ে নীচের দিকে সিঁড়ি বানিয়ে সৈন্যরা মাথা তুলে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে। সবই এক সময় অভ্যাস হয়ে যায়। সাধুসন্ন্যাসী যখন নদী-পাহাড়ের ধারে কোথাও ম'রে প'ড়ে থাকে, তখন আরেক সাধু সেই পথ দিয়ে যাবার সময়ে অবশ্য মৃতের ঠ্যাং ধরে নদীতে ফেলে দিয়ে যায়,—কিন্তু মৃতের শেষ সম্পত্তির সেই হয় উত্তরাধিকারী। হয়তো সে খুঁজে পায় একটি ছোট কল্‌কে, এক খাবল কাঁচা তামাক, কিংবা এক টুকরো গাঁজার জট, আর নয়তো বা এক বড়ি অহিফেন সদৃশ চরস,—ব্যস। ওইখানে বসেই কলকেটি সেজে আগুন দিয়ে দম্‌ভোর টানে দুই টান। চোখ রাঙা ক'রে ওই পরলোকগত উলঙ্গ অদ্বৈতবাদীর দিকে একবার তাকিয়ে বলে

যায়,—ঈশা, সোম শিউয়াশঙ্কর। মৃত্যুভয় ও শোকের সংস্কার তাকে স্পর্শ করে না।

সবই অভ্যাস। মন আমাদের নিত্যই জীর্ণ হ'তে থাকে কয়েকটি সংস্কারে। ভয় তার মধ্যে প্রধান,—কেননা পিতামাতার অশিক্ষাদানের ফলে শৈশব থেকে ভয় চেপে বসে সন্তানের মনে। ভূতপ্রেতের ভয়, চোর-ডাকাতের ভয়, সেপাই-সান্ত্রীর ভয়, অপঘাত সম্ভাবনার ভয়—আরও নানাপ্রকারের ভয়। তারও সঙ্গে জোটে ব্যাধি ও বেদনাবোধ, সুখ-দুঃখবোধ, শোক-তাপবোধ, জরা বিকার-হিংসা-ঘৃণা লোভ-কামবোধ ইত্যাদি এরাও পেয়ে বসে ওই সঙ্গে। ফলে মানুষ হয়ে ওঠে বিভিন্ন বৃত্তির একটা সংমিশ্রণ। এদের থেকে মুক্তিই হোলো প্রকৃত মুক্তি। এইটিই মানুষের চিরকালীন ক্ষুধা। সংসার পিছন থেকে টানছে এদেরই চক্রান্তে টেনে ফেলবার, ওদিকে বেদান্তবাদ টানছে অসীম আদি অন্তহারা মুক্তি চৈতন্যের দিকে। দুই দিকের দুই টান,—মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষ। এই দোটানার মধ্যে প'ড়ে মানুষ গুরু খোঁজে, সাধুসন্তর কাছে ধরনা দেয়, তীর্থপথে ছোটে, মন্দির বানায়, কীর্তনের আসরে গিয়ে বসে, কিংবা পিঁপড়ের গর্তে চিনি দেয়। সব পেয়েও আনন্দ নেই, এই হোলো সুখী মানুষের দুঃখ সব ছেড়েও আনন্দ পাওয়া যায়, এই হোলো জ্ঞানী মানুষের ভাষা। সেই কারণে সুখী মানুষরা যখন আনন্দলাভের অসীম ক্ষুধায় দুঃখ বরণ করে, সংসারী লোকেরা তখন চমকে ওঠে। শাক্যসিংহের পলায়ন দেখে ভারতবর্ষ একদা মেতে উঠেছিল। নিরাসক্ত, স্বচ্ছ এবং নির্বিকার আনন্দই একমাত্র বস্তু—যেটি আপন অন্তর্যামীকে ঘিরে মধুর স্বর্গ রচনা করে।

ছাব্বিশ মাইল পথ। এই পথটিতে পড়েছিল অমর্ত্যলোকের ছায়া। যা কিছু দেখি,—বস্তুমাত্রই অভিজ্ঞতা। জীবনের পরম আস্বাদ হোলো অভিজ্ঞতার। অনেক বই পড়েছে অনেকে, অনেক পণ্ডিত অনেক শাস্ত্র পাঠ করেছে। কিন্তু পৃথিবীকে সে পাঠ করেনি, জীবনের পৃষ্ঠা ওলটায়নি। শাস্ত্র দেয় ভাষা আর ব্যাখ্যা, কিন্তু অভিজ্ঞতা দান করে না। অভিজ্ঞতাই জীবন। তার বৈচিত্র্যে অপরিসীম কৌতুক, তারই সংঘাতে আশ্চর্য নাটকীয়তা। গতি আছে ব'লেই গ্রহণ করতে পারছি, দেখছি ব'লেই অভিজ্ঞতালাভ করছি। বুদ্ধিতে পাই, চেতনায় পাই, জ্ঞানে পাই, দুঃখ ও আনন্দে পাই, দুর্যোগে-বেদনায়-ভালোবাসায় সর্বপ্রকারে পাই। পাণ্ডিত্যের মধ্যে এই পাওয়া নেই,—সেইজন্য পাণ্ডিত্য হোলো শূন্য, জ্ঞান হোলো সমৃদ্ধ। জ্ঞানের জন্ম অভিজ্ঞতায়, জ্ঞানের প্রকাশ জীবনসাধনায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রিলাভের কালে স্নাতকরা যখন আশীর্বাদ লাভ করে, তখন প্রথম কথাটাই হোলো—বাইরে

এসে দাঁড়াও জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে, ওইখানেই তোমাদের স্নাতকোত্তর শিক্ষার প্রথম আরম্ভ। তোমরা গতিলাভ করো অভিজ্ঞতা অর্জন করো,—সেই হবে তোমাদের জ্ঞানের প্রথম সোপান।—স্নাতকরা সেই মন্ত্র কানে নিয়ে নবজীবন রচনার কাজে এগোয়।

সভ্য জগতের চেতনার মধ্যে যখন এসে পৌঁছলুম, তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শেষের ছাব্বিশ মাইল পথ একপ্রকার প্রাণীশূন্য ছিল। পাহাড়ী উপত্যকার বহুদূর নীচের দিকে এক-আধটি স্লেট পাথরের ছাদওয়ালা ঘর দেখতে পেয়েছিলুম, কোথাও কোথাও এক আধটুকরো আকস্মিক ফসলের ক্ষেত—নৈলে সবটাই আদি প্রকৃতির বন্যতায় আর পাথরের জটলায় একাকার। নীচে দিকে উঠে গেছে পাহাড়, দিগন্তকে অবরোধ ক'রে রেখেছে চারিদিক থেকে। বিস্ময়ের সীমা নেই।

মায়াদেবী এবার বললেন, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। বেপোট্ জায়গায় না গেলে বুঝি আপনার হিমালয় দেখা হয় না?

হাসলুম। বললুম, মেজাজটি আপনার ভালো নেই। কারণটাও বুঝেছি। আসুন, সেই আমাদের 'জয়হিন্দ্' হোটেল।

তিনিও তাড়না করতে ছাড়লেন না।—বটে? ক্ষিধের জ্বালায় আপনিও চুপ ক'রে গিয়েছিলেন ঘণ্টা চারেক। মনে নেই?

বানীক্ষেত বাজারের সেই হোটেলওয়ালা আমাদের চিনে রেখেছে। ফর্সা পাতলা চেহারা, সামনে উনুন জালিয়ে সে খাবার বানাচ্ছিল। ভিতরে কয়েকখানি ময়লা বেঞ্চি ও হাতল ভাঙা চেয়ার। ঘরের দুই ধারে খান দুই চারপাই, তার থেকে ছেঁড়া দড়ি ঝুলছে। এক কোণে একটি জলের 'টাঙ্কি'। তারই উপরে কয়েকটি পিতল দস্তায় বানানো গেলাস। ভাত রুটি-তরকারি এখানে মিলবে। দোকানের সামনে সুন্দর ও মসৃণ রাজপথ,—পাঠানকোটের দিক থেকে এসে ডালহাউসীর দিকে গেছে। হিমাচলের কোলে আবার মেঘ নেমেছে।

হোটেলের ভিতরে ঢুকলুম। খাদ্যাদির সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অনেককাল পরে একটি নতুন ধরনের গন্ধ পাচ্ছি, সেটি হোলো খাঁটি ঘিয়ের। আজ বোঝা গেল শাস্ত্রবাক্য কত সত্য,—অর্থাৎ ঘ্রাণের দ্বারা আমরা অর্ধভোজন ক'রে থাকি। দোকানে হিন্দু এবং মুসলমান দুরকমেরই আহার্য থরে থরে সাজানো, —ঘৃত এবং মসলা সহযোগে তারা বর্ণাঢ্য। প্রশ্ন করলুম, কোনটা খাবেন বলুন? হিন্দু না মুসলমান?

মায়াদেবী আজ ফোয়ারার মতো অনর্গল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ওদিকে চেয়ে বললেন, উভয়ের মিলনেই তো আনন্দ।

হোটেলওয়ালার আনুকূল্য ছিল প্রচুর। চিবিয়ে, চুষে, চেটে এবং গিলে অবশেষে যে প্রকার কায়িক অবস্থা দাঁড়ালো, তাতে আর যাই হোক—ভ্রমণ করা চলে না। কেউ যদি তখন বলতো, থাক তোমার ডালহাউসী, চলো প্লেনে চড়িয়ে তোমাকে সেই কলকাতায় বাড়ীর ছাদে নামিয়ে দিয়ে আসি, বোধ হয় রাজি হয়ে যেতুম।

আহারাদির পর উদ্গার উঠলো। মায়াদেবী বললেন, জয়হিন্দ্।

কথাটা শুনে হোটেলওয়ালাটি হাসলো বটে, কিন্তু আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটি দিনের গল্প। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট। কলিকাতার পথে পথে লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা। চারিদিকে যানবাহন আর কলরব। সেদিন মদের দোকান বন্ধ ছিল কিনা জানিনে। কিন্তু পথের ধারে সেই বিপুল জনতার একান্তে বসেছিল একটি লোক এক বোতল মদ হাতে নিয়ে। কানে তার জবাফুল গোঁজা। সেই জনতার দিকে তাকিয়ে লোকটা নিজের মনেই আনন্দ ক'রে বলছিল, অনেক দুঃখে স্বাধীনতা পেলুম, বাবা!—জয়হিন্দ্!—এই বলে সে মদের বোতলটি ধ'রে ঢালতে লাগলো গলার মধ্যে।

হোটেলওয়ালার কাছে শুনলুম, এখানে কোথায় যেন পান পাওয়া যায়। ভাবলুম, পান কিনে এনে মায়াদেবীকে চমক লাগাবো। পান আনবার জন্য বেরিয়ে পড়লুম। খুঁজে খুঁজে এক সময় দোকানও পাওয়া গেল। কিন্তু সেই পান নিয়ে ফিরে এসে দেখি, দড়ি ছেঁড়া সেই খাটিয়াখানায় শুয়ে মায়াদেবী অগাধে নিদ্রা যাচ্ছেন। অত্যন্ত ময়লা একটি তুলোবারকরা লেপ তলায় পাতা, এবং তিনি গায়ে তুলে নিয়েছেন সবচেয়ে নোংরা একখানা ছিন্নভিন্ন কম্বল। এটি হোটেলওয়ালারই সংসারযাত্রার এইটুকুরই মধ্যে,—কিন্তু হোটেলওয়ালাও মায়াদেবীর নিশ্চিন্ত নিদ্রা দেখে একটু অবাক।

স্বামী স্ত্রী মিলে ভেবেচিন্তেই এই দুরবস্থা ঘটিয়েছেন, সুতরাং আমার ভাববার আর কিছু রইলো না। ওঁকে একবার দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি ছত্র স্মরণ ক'রে সান্ত্বনা পেতে হোলো,—'সবার পিছে সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।'

একটু পরেই ডালহাউসীর গাড়ী এসে পড়লো। কিন্তু মায়াদেবীকে ডেকে তোলবার কোনও উৎসাহই পেলুম না। ডাকলে বোধ হয় একটু অবিচারই হোতো। সুতরাং মিনিট পাঁচেক নিয়মমতো দাঁড়িয়ে গাড়ী চলে গেল উত্তর-

পশ্চিম পথে। আমি সেই জিনিসপত্র আগলে পথের ধারেই একখানা পাথর আশ্রয় ক'রে ব'সে রইলুম।

আন্দাজ মিনিট পনেরো পরেই আচমকা মায়াদেবী ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। গাড়ীর সময়টি তাঁর জানা ছিল। গাড়ী যে চ'লে গেছে এটি তাঁকে জানাতে হোলো। তিনি মহা লজ্জিত, কিন্তু মনোভাবটি চেপে রেখে তারস্বরে বললেন, আপনি এমন মুখচোরা তা তো জানতুম না? ডাকলেন না কেন?

বললুম, আপনার এই 'নেপোলীয়নী' ঘুম জানা থাকলে ঠিকই ডাকতুম। তবে আরেকখানা গাডী আছে চারটের সময়। দুশ্চিন্তার কারণ নেই। বেশ করেছেন ঘুমিয়ে। ওটা হলো 'ভাত-ঘুম'।

মায়াদেবী উঠে এলেন। সময় হাতে ছিল দুঘণ্টারও বেশী। তিনি বললেন, মালপত্র এখানে থাক, চলুন ঘুরে আসি।

ছোট্ট পাহাডী গ্রাম হোলো 'বানীক্ষেত'। মোটর চলাচলের পথটিই হোলো তার নাভিকেন্দ্র। তিন ফার্লংয়ের মধ্যেই তার ব্যবসায় বেসাতি। এর বাইরে হোলো দুদিকের পাহাডতলী এবং চাষীবস্তি,—বেডাবার মতো জায়গা তার কোথাও নেই। কেউ কম্বল বুনছে, কোথাও দর্জির ঘর, ফল বিক্রি করছে কেউ, কোনও মেয়ে কাঠের বোঝা নিয়ে চলছে, কোথাও বা বৃদ্ধা রৌদ্রে ব'সে তার নাতনীকে দিয়ে মাথার উকুন বাছিয়ে নিচ্ছে। পথের ধারে গান গাইতে বসেছে এক অন্ধ বোরেগী, আরেক জায়গায় পাথরের টুকরো আর জন্তুর হাড় দিয়ে ম্যাজিক দেখাচ্ছে একটি লোক। ঘুরে বেডালুম খানিকক্ষণ ওদেরই পাড়ায়। চাষী মেয়ে আগাছার বাণ্ডিল তুলে আনছে গিরিনদীর পাথর-জটলার ফাঁকে ফাঁকে—এগুলি গোরু-মহিষের খাদ্য। এটি তরাই অঞ্চল, সুতরাং ফসল অনেক বেশী। পাহাড়তলীর পাশে পাশে চ'লে গিয়েছে বনজঙ্গলের পথ ইরাবতীর পারে পারে। পল্টনের লোকেরা মাঝে মাঝে এদিকে আসে শিকারের সঙ্গী খুঁজতে। সাপ উঠে আসে এদিকে বড় বড়। ওই যতটুকু ঘুরে এলুম ততটুকুই পরিচয়, ততটুকুই সত্য। তার বাইরে সবই রয়ে গেল, সবটুকুই অজানা। আমরা যাত্রী, আমাদের কৌতূহল ক্ষণকালের,—সে কথা ওরাও জানে, আমরাও বুঝি। অভব্য কৌতূহল প্রকাশ করতে গিয়ে আমরাই ছোট হই, ওরা অবাক হয়ে থাকে। ওরা চিরকাল দাঁড়িয়ে রয়েছে শক্ত ভিত্তির ওপর, আমাদের মতো নোঙর-ছেঁড়া অগণিত যাত্রী ওদের চোখের ওপর দিয়ে অবিশ্রান্ত ভেসে চলেছে। কেউ ওদের প্রাণের পরিচয় নেয় না, ওরাও সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু এই পরিচয়ের

অভাব এবং অনুৎসাহ থেকে ভুল বোঝাবুঝির জন্ম ঘটে। একপক্ষের অনিচ্ছা এবং অন্যপক্ষের ঔদাসীন্য— এর থেকেই অবশেষে দেখা দেয় রাজনীতিক কচকচি। সামাজিক জীবনে না মিললে রাজনীতিক সম্পর্ক মধুর হয় না, এটি ছেলেমানুষেও বোঝে। উড়িষ্যার সঙ্গে বাঙলার সামাজিক জীবন চিরকাল অচ্ছেদ্য ব'লেই রাজনীতিক জীবনে উভয়ের মধ্যে কখনও বিবাদ বাধেনি। উভয়ের মন জানাজানি বহুকালের।

যথাকালে গাড়ী এলো, এবং যখন ছাড়লো তখন বেলা সাড়ে চারটে। চার পাঁচ মাইল মাত্র পথ। কিন্তু তখন পাহাড়ে, মেঘে, রৌদ্রে, আকাশে, অরণ্যে,—শরৎকালের লুকোচুরি আরম্ভ হয়ে গেছে। একদিকে বিষণ্ণ মুখ, অন্যদিকে হাস্যোজ্জ্বল। একটু পশ্চিমে, একটু উত্তরে আরম্ভ হোলো চড়াইপথ। পথ মসৃণ এবং সুন্দর,- রাজপুর থেকে মুসৌরীর পথের মতো। কোথাও ক্ষমা নেই, বিশ্বাস নেবার অবকাশ নেই,—কেবল চড়াই। গাড়ীর গতি মন্থর, কিন্তু শব্দ কানফাটা। চার মাইলে প্রায় চার হাজার ফুট চড়াই, সোজা কথা নয়। ওই যে সেবার উঠলুম বিহারের পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দিরে—জৈন ধর্মশালাটার পাশ দিয়ে চড়াই আরম্ভ হয়েছিল। সেও চার হাজার ফুট উঁচু, কিন্তু ছ মাইলে পথটা ছড়ানো,—এবং মাঝখানে পাওয়া গিয়েছিল কতকটা উপত্যকা। এখানে কিছু নেই, শুধু চড়াই। এ পথে ফিরবার সময় পেট্রল খরচ নেই। ষ্টীয়ারিং ধরে রইলো, ব্রেক টিপে রইলো, গাড়ী নেমে এলো গড়গড়িয়ে। সব পাহাড়ের ড্রাইভারেরাই এই সুযোগ নেয়।

দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। অনেক দূর দেখতে পাচ্ছি। উঠছি উঁচুতে। দক্ষিণে পাঞ্জাবের বিরাট সমতল অনেকটা যেন কুহেলি ঢাকা। ধবলাধার শ্রেণীর উপরে উঠে পীরপাঞ্জাল দেখতে পাচ্ছি। জম্মু থেকে কাশ্মীরের পাহাড় উঠে গেছে পশ্চিম থেকে উত্তরে,—একটির পর একটি হরিৎবর্ণ দানব পাশাপাশি শুয়ে যেন বিশ্রাম নিচ্ছে, ওরা যেন দেবতাত্মা হিমালয়ের মন্ত্রে বশীভূত। এটি হিমাচল প্রদেশ,—সমতল অঞ্চলের ধার ধারে না। এদিকে এমন বহু সহস্র নরনারী আছে যারা রেলপথ দূরের কথা, চাকার গাড়ী কখনও দেখেনি। তারা হিমালয়ের সন্তান, পৃথিবী তাদের থেকে বাইরে প'ড়ে থাকে। সংবাদপত্র কেমন তারা জানে না, সাহেবসুবো দেখেনি এ জীবনে,—এবং সারা বছরে একবার যদি কখনও পাহাড়ের শীর্ষলোকের ধার দিয়ে একটি এরোপ্লেনকে চকিতে পার হয়ে যেতে দেখে, তবে তারা পাহাড় পেরিয়ে ঘরের দিকে পালায় আতঙ্কে। চলতি যুগের ইতিহাসই ওরা পৌরাণিক কাহিনীর মতো শোনে।

সহসা সচেতন হলুম। আমাদের গাড়ীতে যাত্রীর সংখ্যা মোট দশ বারোজন। কিন্তু অধিকাংশেরই লেগেছে ঘূর্ণী,—পাহাড়ের পথে যেমন হয়। মায়াদেবীর মাথা এরই মধ্যে হেঁট হয়েছে, তাঁর আর সাড়াশব্দ নেই। অন্যান্য আরোহীদের মধ্যে স্ত্রীলোক আছে জনতিনেক। একজন দশাসই ভদ্রলোক শিবনেত্রে একেবার অসাড। কেউ কেউ জানলা দিয়ে যথাসম্ভব মুখ বাড়িয়ে গলা চিরে,—ও যা-ক—না, থাক দেখবো না। ওর ছোঁয়াচটা যেন নিজের মধ্যেও কিলবিলিয়ে ওঠে। দেখতে পাচ্ছি গাড়ী না থামলে মায়াদেবীর আর সুস্থ হবার আশা নেই।

গাড়ী ঘুরে ঘুরে ক্রমেই উঠেছে উপর দিকে। ভুজঙ্গভূষণের দেহ জড়িয়ে সাপ যেমন ক্রমশ তাঁর জটার শীর্ষে ওঠে। ঠাণ্ডায় এবার সবাই জড়সড়ো হচ্ছে। মেঘ নেমে যাচ্ছে ইরাবতীর দিকে. পাইনের বনে মেঘ ঢুকছে। মেঘ ঢুকছে আমাদের গাড়ীতে। ড্রাইভার ঝাপসা মেঘে গাড়ী চালাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া ঝলক দিয়ে যাচ্ছে। নীচেকার রৌদ্রক্লান্ত জীবন ভুলে গেলুম। জামার বোতাম বন্ধ করতে হোলো এতক্ষণে। পাহাড়ে পাহাড়ে শরতের কুসুম সমারোহ পথের দুধারে এসে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। একটি আধটি বস্তির দেখা পাচ্ছি।

পর্টনের পাড়ার ধারে এসে একবারটি গাড়ী দাড়ালো। আমরা শহরের প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। অসংখ্য মিলিটারী ব্যারাক এবং তাদের আনুষঙ্গিক উপকরণ চোখে পড়ছে। অফিসারদের আনাগোনা দেখছি। এটি বোধ করি পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের কেন্দ্র। পাঠানকোট থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে।

গাড়ী সেখান থেকে আবার ছাড়লো এবং আঁকাবাঁকা সুন্দর পথ ধ'রে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলুম। মোটর স্ট্যাণ্ডের পাড়ায় কিছু কিছু লোকজন দেখছি বটে, কিন্তু চারদিকেই জনবিরল। এমন কোলাহলবিহীন স্তব্ধতা কোনও পাহাড়ী বড় শহরে দেখিনি। একটু যেন বিস্ময়বোধ করলুম

নানা হোটেলের দালাল এসে দাড়ালো, কিন্তু ওদের মধ্যে আমরা 'গ্রাণ্ডভিউ হোটেলটি' পছন্দ করলুম। নির্বাচনে তখনকার মতো ভুল ঘটলো, সেটি পরে টের পেলুম। কিন্তু মায়াদেবী ক্লান্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে বিশ্রাম নেবার বিশেষ দরকার ছিল। প্রায় বারো থেকে তেরো ঘণ্টা হোলো, আমরা পথে-পথে ঘুরছিলুম।

ডাকঘরের গা দিয়ে একটা পায়ে হাঁটা ঢালুপথ উঠে এলো মস্ত এক হোটেল-প্রাসাদের প্রাঙ্গণে। কিন্তু এটি এত নিভৃত অঞ্চল যে একটু যেন আড়ষ্ট হলুম। একটি গুজরাটী পরিবার নীচের তলায় এসে ভালো দুটি ঘর

আগেই নিয়েছেন। সুতরাং উপবতলায় গিয়ে একটা বড ঘর নিতে হলো। মস্ত বর্ড বারান্দা,—কিন্তু এপাশে ওপাশে কোথাও মানুষ নেই। চতুর্দিকে এত বিলাসসজ্জা এবং অপ্রয়োজনীব ঝাকঝকে আসবাবপত্র যে, চোখ ঠিকবে যায়। এই হোটেল থেকে হিমালয়েব দৃশ্য সর্বাপেক্ষা সুন্দব,—ওবা বললে। কিন্তু মাথাপিছু দৈনিক পনেরো টাকা লাগবে,—এ যেন একটু বেশী। হোটেলে যাত্রীসংখ্যা যত, তাব চেয়ে খানসামাব সংখ্যা অধিক। ভিতবে লাউঞ্জেব আসবাবপত্র দেখে আমরা হতচকিত। এ হোটেলে আজকাল সাধারণ উচ্চ মধ্যবিত্ত ভাবতীযবা আসে, এবং তাব জন্য বেট কমিযে পনেরো টাব। করতে হযেছে, এজন্য কর্তৃপক্ষেব মনে চাপা দুঃখ রযেছে। সাহেবসুবোবা টাকা দিতে জানতো, তাবা এদেশ ছেড়ে চ'লে গিযেছে,- সেজন্য অনেকেই বিমর্ষ।

ঘরখানা মস্ত। ভালো ভালো গদি আটা কৌচ, দেওযালেব নীচে ফাযাব প্লেস, পবিপাটি শয্যা ব্যবস্থা, ঘবেব সংলগ্ন স্নানেব ঘব, মেঝেব উপরে কার্পেট, মখমলেব বড পর্দা, চৌদিকে ইলেকট্রিক আলো,- অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ্য এবং আবামেব উপকবণ প্রচুব এদিক ওদিক ঘুবে দেখে এলুম, আমাদেব ঘরটি শ্রেষ্ঠ মনে হ'ল কিন্তু এই বিবাট এবং সুদীর্ঘ দোতলাটিতে লাউঞ্জের দবজা সন্ধ্যাব পর বন্ধ হয়ে গেলে আমাদেব মহল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং নিঃসঙ্গ হযে পড়বে। অজানা এবং অপবিচিত পাহাডেব প্রান্তে যদি কোনও অভাবনীয় বিপত্তি ঘটে, বহু ডাকাডাকি সত্ত্বেও কেউ ছুটে এসে দাঁড়াবে, এমন মনে হচ্ছে না। হোটেল নির্বাচনে ভুল ঘটেছে, এই ধাবণা আমাকে পেযে বসেছিল। উৎসাহেব অভাব বোধ কবছিলুম।

ঠাণ্ডাকে রোধ কবাব জন্য চাবিদিক ঘেবে বন্ধ। সমস্ত বাবান্দায় কাঠেব, দেওযাল এবং কাঁচেব জানলা সমস্ত মেঝে কাঠেব, সিঁড়িও কাঠেব। পাহাড়ী শহবে কাঠ ছাড়া উপায় নেই। কাঠেব বাড়ী চালো সর্বত্র। কাঁচ না থাকলে জানলা হয় না কাঠেব মেঝে থাকাব জন্য বহুদুব থেকে পাযেব শব্দ এবং কাঁপন অনুভব কবা যায়। পাহাড়ে পাহাড়ে ভালো বাড়ী মানেই ভালো এবং মোটা কাঠেব বাড়ী। আরাম এবং মধুব উত্তাপ সৃষ্টির জন্যই এই কাঠেব কাজ।

সন্ধ্যাব চা এবং জলযোগাদিব পব ঘণ্টাখানেকেব মধ্যে মাযাদেবী চাঙ্গা হলেন। আমাব ধারণা ছিল বিপরীত। ভাবছিলুম রাত্রিব মতো তিনি অবসর গ্রহণ করবেন। কিন্তু হোটেলেব ভিতবে গিযে নৈশভোজনেব ফবমাস দিয়ে এসে দেখি, তিনি বাহিব হবার জন্য প্রস্তুত। বললেন, চলুন, বেরিযে

পড়ি। আমি সত্যিই বুলি, চাম্বার চেয়ে ডালহাউসী আমার বেশি ভালো লাগছে।

বললুম, বড্ড বেশি সাহেবী নয় কি? একটু যেন উগ্র আধুনিক?

তিনি রাগ করলেন,—এ যুগের অন্নজল খেয়ে বাঁচবো, অথচ একশো বছরের পেছনে চেয়ে থাকবো,—এ কেমন কথা? এবার বুঝতে পারছি আপনার গাম্ভীর্যের আসল কারণ। চলুন, পথে বেরিয়ে কথা হবে। আমার সন্দেহই ঠিক, আপনি একটু সেকেলে।

ঈষৎ দিনের আলো তখনও রাঙা হয়ে রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। কিন্তু সেই সূর্যাস্তকাল যে কত সুন্দর, পথে বেরিয়ে বুঝতে পারা গেল। সীডার ও পাইনের বিশাল অরণ্য পাহাড়ের সীমানা ধ'রে দূরদূরান্তে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে দিনান্তের রক্তবরণ দিগন্ত সর্বত্র বক্তিম আভা প্রসারিত করেছে। বাঁ হাতি সুন্দর পথ উঠে গেছে অন্ধকার পাহাড়ের জঙ্গল জটলার ভিতর দিয়ে। এত নিবিবিলি যে, এখন পর্যন্ত একটি মানুষেরও দেখা পাচ্ছিনে। আমরা আস্তে আস্তে চড়াই পথে উঠে যাচ্ছি। সীডার বৃক্ষের পাতায় বায়ু সঞ্চালনে মর্মর শব্দ হচ্ছে, মুখ তুলে দেখি পশ্চিম দিগন্ত সম্পূর্ণ অন্ধকার হবার আগেই প্রথম শুক্লপক্ষের শীর্ণ চাঁদ আকাশপথে এসে হাজির হয়েছে। প্রত্যেকটি বৃক্ষ প্রায়ই লতাগুল্মজড়িত এবং শৈবালাচ্ছন্ন। পথের বাঁকে বাঁকে আলো জ্বলছে। বড় বড় পাখীর ডানা ঝাপটের আওয়াজ পাচ্ছিলুম। কিন্তু তাদের সেই পক্ষ সঞ্চালনের ফলে গাছের থেকে যে গন্ধের ঝলক এসে নাকে লাগবে, এটা ভাবিনি। ফুল নয়, গাছের গন্ধ। ফুলের মতো গন্ধ নয়, কিন্তু এমন একটি নিবিড় তন্দ্রাজড়ানো অপরিচিত গন্ধ, যেটি সমতলবাসীরা কখনও পায় না। হ'তে পারে 'সীডারের' গন্ধ, কিন্তু এইটা ছড়ানো রয়েছে হিমালয়ের প্রায় সর্বত্র। মৃগনাভির উগ্র গন্ধের ঝলক দু-চারবার পেয়েছি, রাজস্থানে গিয়ে জেনেছি আসল চুয়ার গন্ধ কেমন। প্রাচীন বট যেখানে জরাজীর্ণ মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে বাইরে এসেছে—সেই মন্দিরের ভিতরকার বন্য সোঁদা গন্ধও জানি,—কিন্তু এ গন্ধের সঙ্গে তাদের কারো মিল নেই। এ পাওয়া যায় কেবলমাত্র হিমালয়ে এলে। কুমায়ুনের উত্তর পাহাড় পথে, নেপালের পাহাড়ে পাহাড়ে, উত্তর সিকিমের লাচেন অঞ্চলে, কাশ্মীরে,—এবং ওই যেটি আজ পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, —মারী, নাথিয়া গলি অথবা হাভেলিয়ানের পরম রমণীয় পার্বত্য অঞ্চলে। আমার ধারণা, বিনিদ্র রোগীকে ঘুম পাড়াবার মতো এমন গন্ধ আর নেই। আমার ক্লান্তির মধ্যে তন্দ্রার বিহ্বলতা ছিল।

অন্ধকার হয়েছে, কিন্তু ঠিক যাচ্ছি কোন্‌দিকে ঠাহর হচ্ছে না। এখানে ওখানে আড়ালে আবডালে বাগানবাড়ী এক-একটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আলো জ্বালা দেখে মানুষের অস্তিত্বের প্রমাণও পাচ্ছি,—কিন্তু সমস্তটাই নিস্তব্ধ। পথ কোথায় গিয়ে কতদূরে উঠে শেষ হয়েছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মায়াদেবীর ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই, তাঁর চলনের উৎসাহে সমস্ত দিনমানের ক্লান্তির কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি এখানে পা দিয়েই যেন তাঁর কাশ্মীরকে খুঁজে পেয়েছেন। স্পষ্টই বলেছেন, চাম্বা অর্থাৎ চম্পা নগরী তাঁর ভালো লাগেনি। বন্ধ ও দুঃসাধ্য পর্বতপ্রাকারের মধ্যে বন্দিনী 'চম্পাবতী' তাঁর প্রিয় হ'তে পারেনি। ডালহাউসীর এই আধুনিক সুসভ্য সাজসজ্জা তাঁর ভালো লেগেছে। আমার মনে সান্ত্বনা ছিল এই, ডালহাউসী চম্পাবতীরই অন্তর্গত।

আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মায়াদেবী। এবার থমকে দাঁড়িয়ে ধমক দিলেন, সংস্কার কথাটা কিন্তু ভুলিনি।

আমিও দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, আমার সন্দেহ, আপনার মধ্যে সেই পুরনো পৈতেধারী ব্রাহ্মণটি ঠিকই বেঁচে আছে।

থাকলে ক্ষতি কি?

আপনার গাম্ভীর্যের কারণও ওইখানে।

এবার খুব হেসে উঠলুম সকৌতুকে। ধনুর্বাণ তুলে তিনি সোজা আক্রমণ করেছেন। পুনরায় বললেন, গুপ্তসাহেবের মুখে যেদিন থেকে আপনি শুনেছেন, আমি নাচ বাজনা অভিনয় জানি—সেদিন থেকেই আপনার মুখ ভার। বুঝতে পারি, আপনি এসব পছন্দ করেন না।

প্রাদেশিক ভাষায় একে বলে, 'বেধড়ক' আক্রমণ। হাসিমুখে শুধু বললুম, সাংঘাতিক অভিযোগ বটে। আপনার স্বামী এখানে উপস্থিত থাকলে তাঁর সঙ্গে ঠিক আপনার ঝগড়া হোতো।

কেন?

আমার ওপর আক্রমণ তিনি সইতেন না।

মায়াদেবী আবার কিছুদূর এগিয়ে চললেন। দুদিকের ঘন বৃক্ষচ্ছায়ার অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। বহু দূরের আলোর একটু আভা পড়েছে গাছের শীর্ষে। উপর দিকে তাকিয়ে তিনি এবার নিজেই থামলেন,—না, আর নয়—চলুন ফিরি। আচ্ছা বলুন তো আপনি কি সত্যিই মেয়েদের নাচ গান পছন্দ করেন না?

উৎরাই পথ ধরলাম এবার। পরিশ্রম হয়েছে প্রচুর। তাঁর কথা শুনে কিন্তু হাসতেই হোলো,—পছন্দ করি—একথা শুনলে কি আপনি ধেই ধেই ক'রে নাচতে আরম্ভ করবেন?

উচ্চ হাস্যে পথ মুখরিত হোলো। অতঃপর নীচের পথ ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে যখন 'ডালহাউসী ক্লাবে'র পাশ কাটিয়ে হোটেলে এসে উঠলুম, তখন বেশ রাত হয়েছে। গুজরাটিরা দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

সন্ধ্যার পর থেকে শীত পড়েছে প্রচুর।

উত্তরে বহুদূরে চম্পাবতী উপত্যকার ললাটলোকে দেখা যাচ্ছে তুষারশুভ্র 'পাঙ্গী পর্বতমালা'। সমুদ্রসমতা থেকে 'পাঙ্গীর' উচ্চতা প্রায় ২৩,০০০ হাজার ফুট,—চিরকাল বরফে আচ্ছন্ন। তার নীচে থেকে দক্ষিণ পার্বত্য-লোকের নাম 'চম্পাবতী' উপত্যকা। আগে চম্পাবতী ছিল একটি সামন্ত রাজ্য, এখন ডেপুটি কমিশনারের অধীন। এটি এখন হিমাচল প্রদেশের একটি জেলামাত্র। যেমন মণ্ডি, বিলাসপুর, শিরমুর ইত্যাদি।

বারান্দায় এক ফালি মধুর রৌদ্র এসে পড়েছে। সন্দেহ ছিল, দিনমানে হয়তো মানুষের কলরব-কোলাহল শুনতে পাওয়া যাবে। সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়নি। শূন্য ডালহাউসী চারিদিকে যেন খাঁ খাঁ করছে। সমস্ত দিন ধ'রে চেয়ে থাকা 'পাঙ্গীর' দিকে, সমস্ত দিন পাখীর ডাক শোনা,—সমস্ত দিনরাত্রি নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গতার মধ্যে সময় অতিবাহিত করা। যদি কিছু বৈচিত্র্য থাকে তবে সে বাইরের পথে পথে। প্রাতরাশ সেরে আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

ওক আর পাইনের বন আলোছায়ার ঝিলিমিলিতে ঝলমল করছে। পথ তেমনি নিরিবিলি, তেমনি বনময়। তিনদিকে পাহাড়, একদিকে খদ। আমাদের বসবাসের অঞ্চল হোলো 'বাকরোটা' পাহাড়। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চার-পাঁচটি পাহাড় পরস্পর সংলগ্ন, এবং তাদেরই কেন্দ্র ক'রে ডালহাউসী গ'ড়ে উঠেছে। 'চম্পা' উপত্যকার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু হোলো নিকটবর্তী এই ডালহাউসী, এবং এখান থেকে নেমে অরণ্যপথ ধ'রে আন্দাজ কুড়ি মাইল গেলে 'চম্পানগর'। কিন্তু এর চারিপাশের অরণ্য অত্যন্ত গহন গভীর,—হিংস্র জানোয়ারদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। ওদিকে অসুরনাশিনী চামুণ্ডা দশপ্রহরণ ধারণ ক'রে আছেন, এদিকে পাশব রাজ্যের পশুপতিনাথ তাঁর বিরাট পশুশালা সৃষ্টি ক'রে রেখে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে ব'সে রয়েছেন। সমগ্র চম্পাবতী অরণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

আমরা 'নিম্ন বাকরোটা' থেকে উঠতে উঠতে 'শীর্ষ-বাকরোটার' দিকে চললুম। অন্য পাহাড়গুলির নাম হোলো 'ভান্‌জার, পট্‌রাইন, তেহ্‌রা কাঠলাগ' ইত্যাদি। রানীক্ষেত, মুসৌরী, নৈনীতাল সম্বন্ধে সাধারণত যে ধারণা হয়, এখানেও তাই। হিমালয়ের প্রায় প্রত্যেকটি সুন্দর শহর ইংরেজের গ্রীষ্মাবাসের কল্পনায় তৈরী। কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব—এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে ইংরাজ দেখতে পেয়েছিল 'চাম্বা' উপত্যকা। এই উপত্যকার সামন্তরাজ্যের হাত থেকে একশো বছর আগে পূর্বোক্ত পাহাড়গুলি আদায় করেন কর্নেল চার্লস নেপিয়ার। তখন ছিলেন বড়লাট লর্ড ডালহাউসী,—সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক আগে। তখনও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল চলছে। তারপর নগর নির্মাণ করতে তিন বছর লাগে। আমরা এখানে দৈবাৎ এসে পড়েছি ঠিক একশো বছর পূরণের কালে। সম্প্রতি কিছুদিন আগে 'ডালহাউসী' প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উৎসবকালে পণ্ডিত নেহরু এখানে এসেছিলেন। তাঁর আগমন সমারোহের ধাক্কা এখনও এখানকার অধিবাসীরা কাটিয়ে ওঠেনি। বাজারে এখনও উত্তাপ রয়েছে।

চড়াই ভাঙতে ভাঙতে উঠছি উপর দিকে। গাছপালার ফাঁকে, পাহাড়ের কোলে, ঝোপজঙ্গলের আড়ালে,—এক একটি বাংলো রয়েছে লুকিয়ে। কিন্তু প্রত্যেকটিতে মানুষের সংখ্যা কম। কোনও বাংলো একেবারে শূন্য, কোনটি মালী অথবা রক্ষীর তত্ত্বাবধানে, কোনটিতে বা বাইরের দু একটি লোক। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হিসাব হচ্ছে, পাঁচশোখানা বাংলোর মধ্যে চারশোখানারও বেশী শূন্য প'ড়ে রয়েছে। এই ডালহাউসী মানুষের সোরগোলে গমগম করেছে দশ বছর আগে ভারত যখন স্বাধীন হয়নি। স্থানীয় 'বালুন' গোরা ছাউনিতে ছিল ইংরেজ সামরিক অফিসারদের প্রবল কর্মতৎপরতা, পাহাড়ে পাহাড়ে সাহেবসুবোদের বাংলো,—তাদেরই ছেলেমেয়েদের ইস্কুল পাঠশালা, মিশনারীদের কন্‌ভেন্ট্‌ আর গির্জার প্রার্থনা সমারোহ। এই একমাত্র পাহাড়ী শহর যেখানে নোংরা বস্তি চোখে পড়ে না। দারিদ্র্য যেখানে সর্বাপেক্ষা কম, সেখানে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিচ্ছন্নতা। প্রত্যেকটি বাংলোয় সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত পরিবারের বসবাস ছিল, এটি দৃষ্টিমাত্রই ধারণা হয়। স্কটল্যাণ্ড দেখিনি, দক্ষিণ কানাডাও দেখিনি,—কিন্তু তাদের ছবির সঙ্গে ডালহাউসী হুবহু মিলে যায়। বনে, কাননে, উদ্যানে, গিরিনির্ঝরে, ওক-পাইনের বীথিকায়, ছায়ানিবিড় নিভৃত নিকুঞ্জলোক—ডালহাউসী শহর মুসৌরীকে পদে পদে হার মানায়।

'বাক্‌রোটা' পাহাড়ের শীর্ষে উঠে এলুম। দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ঘন

রৌদ্র, কিন্তু স্নিগ্ধ হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এখান থেকে পথ নানাশাখায় গেছে নানা দিকে। এ অঞ্চলটি দার্জিলিংয়ের 'অবজারভেটরির' পাড়ার মতো চারিদিকে প্রসারিত,—অনেকটা যেন মালভূমি। খাদ্যসামগ্রীর বাজার একটু নীচের দিকে। উপরদিকের ম্যাল্ এব বাজার কলকাতার চৌরঙ্গীর অপভ্রংশ। কাজকারবার বড ছিল, কিন্তু এখন লোকজন অতি কম। মায়াদেবীর ভালো লেগেছে এই জনবিরলতা। তিনি ডালহাউসীর গুণগানে মুখর হয়ে উঠেছেন। চারিদিকের পাখীসমাজে বোধ করি এই ধারণাটি বদ্ধমূল হয়েছে যে, ডালহাউসী বোধ করি এমনি জনবিরল থেকে যাবে চিরদিন। তারা গাছে-গাছে আদিবাসীর মতো দল পাকিযে সম্ভবত তারস্বরে এই কথাটাই ঘোষণা করছে,—তোমরা সভ্যতা আর সংস্কৃতির ধ্বজধারী হ'তে পারো, কিন্তু তোমরা পরদেশী,—তোমরা এসেছ বাইরের থেকে। বস্তুত, কোনও পাহাডে বিচিত্রবর্ণের পাখীসমাবেশ দেখিনি।

'পাঙ্গীর' বিশাল শুভ্র পর্বতশ্রেণী দেখছি উত্তরে। চোখ ঠিকরে যায়—এত শাদা। প্রত্যেকটি চূডা পাশাপাশি সাজানো,—প্রত্যেকটি ঝলমল করছে রৌদ্রে। উত্তব পর্বতের নীচে দিযে প্রবাহিত হয়েছে চন্দ্রভাগা, ডালহাউসীর ঠিক নীচে দিযে গেছে ইরাবতী, এবং দূব দক্ষিণ পাহাডের ভিতর দিযে সমতল ভূভাগে বেরিযে এসেছে বন্য বিপাশা। বিপাশা থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে গেলেই মানস সরোবরের সন্তান মহানদ শতদ্রু। চূডায দাঁডিযে কাছেই দেখা যাচ্ছে জম্বুর গিরিশ্রেণী,—পীর পাঞ্জালের দক্ষিণ প্রান্ত। 'উধমপুর' ও 'চিনেনি' অঞ্চলে চন্দ্রভাগার একপারে ধবলাধার, অন্যপারে পীর পাঞ্জাল,—এবং এটি কেবলমাত্র ডালহাউসী থেকে সুপ্রত্যক্ষ। দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যে সেতু রচনা করেছে চম্পাবতী।

নানাকথা নিয়ে আমরা ঘুরতে ঘুরতে এসেছি অনেকদূর। কয়েকটি ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে ডালহাউসীর সঙ্গে—সেগুলি স্মরণ ক'রে আমাদের মনে ছিল রোমাঞ্চ কৌতুক। বহুকাল পূর্বে—সেও প্রায় চুরাশি বছর পেরিয়ে গেল—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এসেছিলেন তাঁর কিশোরপুত্র রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে। এখানে তাঁর একটি সাধনার স্থল ছিল। সকালের দিকের শীতে রবীন্দ্রনাথ এখানে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন,—সেটি অতিমানবিক ধৈর্য ব'লে আজও মনে করি। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এসেছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু,—সেটি লর্ড রেডিংয়ের স্বেচ্ছাচারের কাল,—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিরোধানের বছর,—সেই সময় মতিলালের সঙ্গে ছিলেন পুত্র জওয়াহরলাল—ভাবী ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধার। এখানে তাঁরা অনেকদিন কাটিয়েছিলেন।

থমকে এসে দাঁড়ালুম দুইটি পথের একটি সংযোগস্থলে। একজন বৃদ্ধ ঘোড়াওয়ালা সেখান থেকে নির্দেশ ক'রে দেখিয়ে দিল, অদূরে ডাঃ ধরমবীরের বাড়ী। এই বাগানবাড়ীতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের ভাবী নেতাজী সদ্য কারামুক্ত সুভাষচন্দ্র অসুস্থ দেহে ধরমবীর এবং তাঁর বিদেশিনী স্ত্রীর আতিথ্য নিয়ে বাস করেছিলেন অনেকদিন। ওই বাড়াটির সঙ্গে আমার নিজের মনের সামান্য যোগ ছিল, কেননা ওখান থেকেই সুভাষচন্দ্র সেদিন খানদুই স্মরণীয় পত্র আমাকে লিখেছিলেন। কিন্তু এখানে আমার সহসা থমকে দাঁড়াবার হেতু বারম্বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও মায়াদেবীকে সন্তোষজনক জবাব দিতে পারা গেল না।

সেই ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পর ডালহাউসীর জীবনের উপর দিয়ে গেল আরও কয়েক বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হোলো, ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন হয়ে এলো। পূর্ব পাঞ্জাব রয়ে গেছে ভারতের মধ্যে। অতঃপর কাশ্মীর ঘোষণা করলো ভারতের অন্তর্ভুক্তি। ক্রমে সাম্প্রদায়িকতার সর্বনাশের আগুন জ্ব'লে উঠলো পাঞ্জাবে। ইংরেজ চ'লে গেল দেশ ছেড়ে। কিন্তু এই ডালহাউসীর অধিকাংশ ভূসম্পত্তি ছিল সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত মুসলমান পরিবারবর্গের দখলে। পাহাড়ের এই চূড়ায় চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ অবস্থায় তাঁরা বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এর উপর আবার উপজাতীয়দের দ্বারা কাশ্মীর আক্রান্ত হোলো ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। ফলে স্থানীয় মুসলমান এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে 'চাম্বা'র এই অঞ্চল ছেড়ে দিগ্বিদিকে চ'লে যেতে লাগলো। মুসলমানরা গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে শিয়ালকোট অভিমুখে। সমস্ত চলাচল ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য, বাজার হাট এবং গভর্নমেণ্ট পরিচালিত নানা জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ও শাসনযন্ত্র—সমস্তই ভেঙে পড়লো। ডালহাউসীর সেই থেকে দুরবস্থা আরম্ভ। অসংখ্য ভূসম্পত্তি অনাদরে প'ড়ে রয়েছে, কিন্তু ভোগ করবার মানুষও নেই, এবং ভোগের অধিকারও বিশেষ কেউ পায়নি।

বিশ্রাম নিয়ে এক সময় মায়াদেবী গাত্রোত্থান করলেন। বললেন, চলুন।

মন টিঁকছে না কোথাও, এত জনবিরল। হোটেলের ওই প্রকাণ্ড অট্টালিকার সর্বত্র যেন সকরুণ শূন্যতা জড়ানো। অরণ্য, প্রান্তর, মরুভূমি, দুস্তর পর্বতের কোথাও,—কেউ মানুষের কলরব আশা করে না। কিন্তু একটি জনকোলাহলমুখরিত নগর এবং তার শত শত অট্টালিকা যদি সহসা জন

প্রাণীশূন্য হয়ে যায়, তবে তার আনাচে কানাচে ঘুরতেও ভয় করে। পরিত্যক্ত ডালহাউসী, কিন্তু অনাদৃত নয়। সাজানো পুষ্পোদ্যান সর্বত্র রয়েছে পরিচ্ছন্ন, প্রায় প্রতি বাংলোর ভিতরে প্রচুর আসবাবপত্র, বিলাসের পর্যাপ্ত উপকরণ, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের নিখুঁত আয়োজন,—শুধু মানুষ নেই। যে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তিনভাগের একভাগ মূল্যে এক একটি সম্পত্তি কিনতে পারে, তার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানও কাজ করছে,—কিন্তু কেনবার লোক কম। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি পার্বত্য শহরের এই দুর্গত ও অভিশপ্ত জীবন দেখে আমাদের দিন কাটছে।

যিনি সঙ্গে রয়েছেন তাঁর মনোভাবটি কিন্তু বিপরীত। তিনি একপ্রকার আনন্দ পাচ্ছেন এই জনশূন্যতায়। পাখীর কলরব তার শুনতে শুনতে লেগে যায় ঘণ্টাখানেক। শূন্য বাংলোর আশেপাশে গিয়ে তার ইতিহাসটি ঠাওরাতে লেগে যায় বহুক্ষণ। বনজঙ্গলের ছমছমে পথ তাকে টেনে নিয়ে যায় অনেকদূর। তাঁর আনন্দ ভিন্ন রকমের।

'কালাপাহাড়' এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইলের বনপথ। অনেকে বলে, 'কালাটপ'। এখন শরৎকাল, ছায়ালোকের বাঁকে বাঁকে এখনও গিরিনির্ঝরের নির্মল সুশীতল জল ঝরঝরিয়ে নামছে নীচেকার খাদে। ছোট ছোট বাস্তর গায়ে গায়ে সামান্য ফসলের খামার পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে দেখা যায়। এই অঞ্চল থেকে পাইনবনের আরম্ভ। এই পথ চ'লে গেছে আরও অনেক দূর 'দইনকুণ্ড' ছাড়িয়ে। এখানকার অধিবাসীরা অতি সুখী রাজপুত এবং ধর্মভীরু। এরা সকলেই 'চাম্বা' উপত্যকার লোক বলেই নিজেদের জানে, ডালহাউসী অথবা পাঞ্জাবকে তারা স্বীকার করে না। 'দইনকুণ্ডে' কতকটা সমতল পাওয়া যায়, কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে, হিমালয়ের দুর্লভ দৃশ্য অনাবৃত ভাবে চোখে পড়ে। ঠাণ্ডা প্রচুর। কিন্তু 'পাঙ্গী' পর্বতশ্রেণীর আশ্চর্য শোভা সমস্ত পরিশ্রমকে সার্থক ক'রে তোলে। মায়াদেবী অত্যন্ত ভক্ত হয়ে উঠেছেন ডালহাউসীর, সুতরাং তিনি সবিস্তারে জানালেন, ঘোড়ায় চ'ড়ে সমস্ত দিন ঘুরলেও তাঁর ক্লান্তি আসবে না।

'খাজিয়ারে'র সুন্দর শোভা এখান থেকে দেখা যায়। সীডার আর পাইনের ঘন অরণ্যবেষ্টিত 'খাজিয়ার' এর দূর্বাদলশ্যাম মালভূমি অনেকটা নীচে। মাঝখানে একটি মস্ত সরোবর, এবং সেই সরোবরে একটি ভাসমান ক্ষুদ্র দ্বীপ। চারিদিকের ঢালু মালভূমির জল ধীরে ধীরে 'খাজিয়ার'কে পূর্ণ ক'রে তোলে। পাইনসমাকীর্ণ পাহাড়ের ঠিক নীচে একটি ডাকবাংলো। খাজিয়ারে এসে দাঁড়ালে চম্পানগরীর দূরত্ব আর থাকে মাত্র নয় মাইল।

'দইনকুণ্ডের' উচ্চ ভূখণ্ডে দাঁড়ালে দূর পর্বতের তলায় তলায় পাঞ্জাবের পূর্বোক্ত চারিটি নদীর ধারা চোখের উপরে ঝলমল করে রৌদ্রকিরণে। ভূস্বর্গ দেখেছি অনেকবার, অনেকবার মর্ত্যের সঙ্গে নন্দলোকের সেতু রচনা করেছি। কিন্তু সেদিনকার কুসুমিত কাননের বন্য প্রকৃতি হতবিস্ময় এনেছিল চোখে।

সেদিন রাত্রে হোটেলের সেই সুবিস্তৃত ডিনার হল এর টেবিলে ব'সে শ্রীমতী মাথা একটি হাসির কথা তুলতেও ছাড়লেন না। কথা উঠেছিল হিমালয় ভ্রমণ নিয়ে। বিগত ত্রিশ-বত্রিশ বছরের হিমালয় ভ্রমণের প্রায় প্রত্যেকটি পর্ব লিখতে বসেছি 'দেশ' পত্রিকায়, এবং ভ্রমণের শেষ পর্বে এসে পৌঁছেছি এতদিনে এই 'চাম্বা' উপত্যকায়,—এই সব আলোচনার কালে তিনি একসময়ে বললেন, আমার অহংকার কিন্তু আর বোধ হয় রইলো না। কাশ্মীর থেকে আপনার সঙ্গে বেরিয়ে ভেবেছিলুম, লেখক মানুষটি কেমন তাই দেখবো, -আমরা স্বামী স্ত্রী কখনও লেখক দেখিনি। কিন্তু আপনাকে দেখবার সময়ই পেলুম না। হিমালয়ের আড়ালে আপনি প'ড়ে রইলেন। এক বছর এমনি ক'রেই আপনি আমাকে ঠকালেন।

প্রকাণ্ড হলের মধ্যে উচ্চ হাসির আওয়াজ কিছুক্ষণ ধ'রে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু আহারাদির পরেও ওই বিতর্কটা সেদিন দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত চললো, এবং তার সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে আমি জর্জরিত হ'তে লাগলুম।

'বাকরোটার' উপরে দাঁড়িয়ে সূর্যের আলোয় দেখেছিলুম, উত্তর পীরপাঞ্জালের পর্বতশ্রেণী এবং আকাশ ঘনবর্ষার মেঘে মলিন। কিন্তু তার পরে ভোগ করতে হবে সেকথা ভাবিনি।

সেদিন মধ্যাহ্নের পর আমরা ডালহাউসী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। পাখীডাকা পাহাড়ের বনলোক প'ড়ে রইলো পিছনে, আমরা গোরাছাউনি পেরিয়ে মধুর স্নিগ্ধতার দেশ ছাড়িয়ে নেমে চললুম সেই পুরনো পথ দিয়ে। বিদায় সম্ভাষণ জানালো চম্পাবতীর কুসুমবল্লরীর দল। সেই জয়হিন্দ্ হোটেল, সেই ডান দিকে চম্পানগরীর সঙ্কটসঙ্কুল গিরিসঙ্কট হাতছানি দিল। অপরাহ্নের দিকে 'ডুনেরা'য় এসে পাওয়া গেল প্রচুর জনসমারোহ,—যেন ভিন্ন গ্রহলোকের অপরিচিত প্রাণী সমাজে এসে পৌঁছলুম। কিছু চিনতে পারছিনে। জীবনের একটা ছোট টুকরো নিরুদ্দেশ পাহাড়ের মধ্যে মিলিয়ে রইলো।

ঘাঁটি পাহারার অবরোধ ছাড়িয়ে আরও প্রায় কুড়ি মাইল পেরিয়ে 'চাক্কি' ঘাটিতে এসে একবার গাড়ী থামলো। এখান থেকে অন্য একটি পথ গেছে কাংড়ার দিকে—যেটি আমাদের দুজনেরই অতি পরিচিত। কাংড়া, জ্বালামুখী, বৈজনাথ, মণ্ডি, কুলু,—সমস্তই জানা পথ। ওপথে গত বছরের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে আমাদের দুইজনেরই মনে।

পাঠানকোটে এসে গাড়ী যখন থামলো, বেলা তখন পাঁচটা বাজেনি। দিল্লীর গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। কাশ্মীর দিল্লী মেল। ঠাণ্ডা থেকে নেমে এসে গরমে কষ্ট পাচ্ছিলুম।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে জানা গেল, প্রবল বৃষ্টি নেমেছে কাশ্মীরে এবং গত তিনদিন অবধি কাশ্মীর-পাঠানকোটের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। আজ প্রথম সেই পথ দিয়ে যাত্রী নেমে এসেছে। স্টেশন এবং তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল লোকে-লোকারণ্য,- রেল কর্তৃপক্ষ দিশাহারা। আমরা বিপন্নভাবে ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলুম। হিমালয় ভ্রমণের আনন্দ মাথায় উঠে গেল। এ গাড়ী না ধরতে পারলে কোনমতেই চলবে না।

ট্রেনে ইতিমধ্যেই তিলধারণের ঠাঁই নেই। সবাই যাচ্ছে দিল্লী, আর নয়তো লুধিয়ানা, জলন্ধর, অথবা ওই কাছাকাছি। ফার্স্ট ক্লাস অথবা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কোনোমতেই পাওয়া গেল না। প্রত্যেকটি 'বোগী' পরিপূর্ণ,—এবং তালাচাবি লাগানো। আগে থেকে আমরা ব্যবস্থা করিনি সেই আমাদের মস্ত ত্রুটি। কাশ্মীর থেকে নেমেছে জলের বদলে মানুষের বন্যাস্রোত। আমাদের অবস্থাটা একেবারে নিরুপায়। গাড়ীর পাদানে পর্যন্ত মানুষ ঝুলছে।

আমার এক বন্ধু বলেন, যৌবনকাল হোলো জীবনের বাড়বেশ। কথাটার প্রমাণ আজ প্রথম পাওয়া গেল। মেয়েদের গাড়ী থেকে দুটি পাঞ্জাবী মহিলা মায়াদেবীকে ইশারায় ডাকলেন,—তাঁদের গাড়ীতে একজন মাত্র মহিলার মাথা গোঁজবার মতো জায়গা মিলতে পারে। এতেই আমরা কৃতার্থ, কেননা আগে থেকে মিঃ গুপ্তকে জানানো আছে, আগামীকাল প্রভাতে তিনি দিল্লী স্টেশনে এসে দাঁড়াবেন স্ত্রীর প্রতীক্ষায়। সুতরাং সর্বাগে দেবীকে গাড়ীতে তুলতে হোলো বহু সংগ্রামের পর। আমার কপালে ওই পাদানি। ঝুলতে ঝুলতেই যেতে হবে সারারাত।

ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম সমস্ত প্ল্যাটফরমে মরিয়ার মতো। কোন পাদানিতেও পা রাখার জায়গা নেই। একজন শিখ ভদ্রলোকের পায়ের ভিতর দিয়ে পা

গলানাব চেষ্টা কবলুম,—তিনি ল্যাং দিয়েই আমাব পা সবিয়ে দিলেন। ঠ্যাং ভাঙেনি এই বক্ষে।

আশ্চয, বিপদেব সমস্ত আযোজন ঘনিযে আসা সত্ত্বেও আমাব বিপদ সচবাচব ঘটে না। কয়েকমাস আগে কলকাতাব প্রসিদ্ধ ডাক্তাব নলিনী বঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয বলেছিলেন, আপনাব হার্টেব ব্যামো। পাহাডে আব কখনও যাবেন না, গেলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। কিন্তু পাহাডে না গেলে যে হার্টেব ব্যামো বাডে,-এটি তাঁকে বলা হযনি। যাই হোক, হঠাৎ চোখে পডলো প্ল্যাটফবমে আমাদেব এক পুবাণো বন্ধু দাডিযে। তিনি শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমাব গুপ্ত, একজন বিশিষ্ট কৃতী সাংবাদিক। সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে তিনি গিযেছিলেন শ্রীনগবে সপবিবাবে। তিনি দিল্লীব 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডেব' স্পেশাল অফিসাব। ফিবে যাচ্ছেন দিল্লীতে। দেখেই তিনি প্রসন্ন হাসি হাসলেন।

-কোন গাডীতে উঠেছেন?

হেসে বললুম ইচ্ছা আছে ওঠবাব, তবে এখনও উঠতে পাবিনি।

বেশ তো, আসুন না আমাব গাডীতে, - আমাব জন্য সম্পূর্ণ কামবা বিজার্ভ কবা আছে। অশ্বিনীবাবু তাঁব সহৃদয প্রস্তাব জানালেন।

তাব স্ত্রীব সঙ্গে পবিচয কবিযে দিলেন। সঙ্গে তিন চাবটি তাদেব পুত্রকন্যা। তাদেব সেদিনকাব উদাব ও স্নেহশীল আচবণ সত্যই স্মবণীয।

অপ্রত্যাশিতভাবে আমি সেই সন্ধ্যা। যেন হাতে স্বর্গ,—না থাক, নির্বিঘ্নে আগে টিকেট চেকাবেব চোখে ধুলো দিযে ট্রেন ছাডুক, তাবপব ধীবে সুস্থে একটা সিগাবেট ধবিযে ঈশ্ববকে সুবিধামতো ধন্যবাদ দেওয়া যাবে।

মাযাদেবী ও তাব স্বামীব সম্বন্ধে অশ্বিনীবাবুব সঙ্গে কথা উঠলো। জানা গেল, ওবা অশ্বিনীবাবুব যেন কি প্রকাব কুটুম্ব হন।

গাডী ছেডে দিল যথাসমযে। মাযাদেবী জানতেও পাবলেন না, আমি পবম স্বাচ্ছন্দ্যে গদিব উপবে পা ছডিযে শুযে বাচলুম। বাখে কেষ্ট মাবে কে।

পবদিন সকাল সাডে সাতটায গাডী এসে পৌছলো দিল্লীতে। একটু মুখ ফেবাতেই দেখা গেল, হাস্যমুখে শ্রীমান কেশবচন্দ্র স্ত্রীব অপেক্ষায দাঁডিযে। সকল জনতাব ভিতব থেকে দুজনে নামলুম দুই কামবা থেকে। এব পব অধিক বলা বাহুল্য। শ্রীমান আমাকে সহাস্যে জডিযে ধবলেন।

এই কাহিনী রচনার কয়েক বছর পরে বন্ধুবর অশ্বিনীকুমার গুপ্ত মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে বড়ই মর্মাহত হয়েছিলুম। একদা পশ্চিম রাজস্থানে 'থর' মরুভূমি অঞ্চলে আমার ভ্রমণকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি ভারতীয় সামরিক বিভাগকে আমার সহায়তার জন্য তৎপর ক'রে তুলেছিলেন।

*

* *

কিন্তু ধওলাধার আর পীরপাঞ্জালের আকর্ষণ ওখানেই শেষ হয়নি। আমাকে বারম্বার ছুটিয়ে নিয়ে গেছে ওদের কোলে কোলে—এখানে আর ওখানে। যাচ্ছিলুম নারকাণ্ডা থেকে শিমলা, সেখান থেকে বিলাসপুরের নিচে বাখরা নাঙ্গালের উপান্তে শতদ্রুর দৃশ্য, সেখান থেকে সুন্দরনগরের মনোরম উপত্যকা পথ ধরে মণ্ডি।

বৃষ্টিপাত আর রাত্রির অন্ধকার পাহাড়কে দুর্গম ও ভয়াবহ করে সবাই জানে। তারপর আশ্রয় যদি নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত না হয়, তাহলে সমস্যাটা ভৌতিক চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাড়ায়।

১৯৬৮-র অক্টোবরের শেষ প্রান্তে এক অতিশয় দুর্যোগের রাত্রে কুলু উপত্যকা পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। উদ্দেশ্য ছিল পরদিন 'রোটা' গিরিসঙ্কট পেরিয়ে কেলং অভিমুখে যাব। অসুবিধা ছিলনা, প্রতিরক্ষা বিভাগের গাড়ি ছিল সঙ্গে। কিন্তু কাটরাই পৌঁছতে গিয়েই রাত দশটা বাজতে চলল। মুষলধারে বৃষ্টি চলছে, এবং ঠাণ্ডা প্রবল। বাইরে কিছু দেখা যাচ্ছে না, দু'দিকের দানবাকার পর্বতশ্রেণী কেমন যেন পৈশাচিক মনে হচ্ছিল। হিমালয়ের তখনকার সেই বীভৎস ভূভাগ যেন জীবশূন্য, প্রাণীশূন্য।

মানালিতে যখন পৌঁছলুম, রাত প্রায় সাড়ে দশটা। চারিদিক ঠাণ্ডায় ও বৃষ্টিতে অসাড়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এই ছোট্ট জনপদটি আমার খুবই পরিচিত। কোথায় কোন্ দোকানটি, দোতলায় কোথায় ডাকঘর, বিশেষ বিশেষ হোটেল ও ডাকবাংলো—সবই জানি। কিন্তু অন্ধকার বৃষ্টির মধ্যে চারিদিক ইন্দিছিন্দি বন্ধ। মিলিটারি ক্যাম্পও তাই, কোথাও সাড়াশব্দ নেই। প্রবল বৃষ্টিধারার মধ্যে সমস্তটাই নিঃসাড়।

অবশেষে একপ্রকার গায়ের জোরে অনেকটা বে আইনীভাবে দূরবর্তী টুরিষ্ট লজে গিয়ে ঢুকলুম। সেই অবিরাম বৃষ্টিতে আর কোনও উপায় ছিলনা। দেবরাজ গিরিশ্রেণীর একেবারে চরণোপ্রান্তে এই অট্টালিকা সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে। বছর দশেক আগেও এসব পাহাড়তলী পাণ্ডববর্জিত অঞ্চল ছিল।

পরদিন প্রভাতকাল স্মরণীয়। সমগ্র মানালি তুষারপাতের ফলে একেবারে

ঘন শ্বেতবর্ণ। সমস্ত পাহাড় পাইনের অরণ্যলোক, টুরিষ্ট লজ, দূরের মোটর পথ--আগাগোড়া শাদা।

আমার সমস্ত পরিকল্পনা ভেঙ্গে গেল। খবর পেলুম রোটাংযের পথ বন্ধ, এবং এ বছরে আর পথ খুলবে কিনা সন্দেহ। ওয়েষ্টার্ণ হিমালয়ান্ মাউণ্টেনিয়ারিং ইন্‌ষ্টিট্যুটের প্রিন্সিপাল বলদেব সিং বললেন, অসম্ভব, আপনাকে বিপদের মুখে ছাড়তে পারব না। বরং যাবার আগে দেখে যান বশিষ্ঠ আশ্রমের ধাতব ঝর্ণার সঙ্গে কেমন সুন্দর স্নানাগার তৈরি হয়েছে। এবার আপনি দেরি ক'রে এসেছেন।

সত্যি, বিগত চার বছরে মানালির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সকালের দিকেও তুষারপাত থামেনি। ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি না থাকলে শুধু তুষারপাত অসুবিধাজনক নয়। তারই ভিতর দিয়ে আবার আমি ফিরে চললুম। মেঘ নেমেছিল নিচে, কুয়াশায় বিশ্বচরাচর অন্ধকার, তারই ভিতর দিয়ে অবিশ্রান্ত তুষারপাত,—পৃথিবী যেন তার পরমায়ুর শেষপ্রান্তে এসে তুষার সমাধিস্থ হচ্ছে। শুধু দুই চোখ ভ'রে দেখার বড় আনন্দ ছিল আমার মনে। ইন্দ্রদেবতাকে অভিনন্দন জানিয়ে এলুম।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে এসে পৌছলুম মণ্ডিতে। সামনেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোটেল। হোটেলের যিনি মালিক তিনি আমার পুরনো বন্ধু। এই পথ দিয়েই গতকাল গিয়েছি, কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। আজ আমাকে দেখে উনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন, এবং রুচিকর আহারের দ্বারা আপ্যায়িত করলেন। কিন্তু মূল্য না নিয়ে এবার শুধু হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাইলেন।

সন্ধ্যার পরে সেদিন মোটরের হেডলাইট জেলে যোগেন্দ্রনগরের দিকে অভিযান ভুলিনি। পথ মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল, কিন্তু অধিকাংশ অল্প অল্প উৎরাই। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে সঙ্কীর্ণ পার্বত্যপথ ও তার 'বেণ্ড'গুলি মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। অনেক সময় অন্ধকারে গিরিখাদের দিকে তাকালে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

যোগেন্দ্রনগরের নতুন ডাকবাংলো আগে দেখিনি। দুই দিকের গিরিশ্রেণীর ঠিক মাঝখানে একটি নিচু পাহাড়ের মালভূমির উপরে এই আধুনিক কালের সর্বসুবিধাযুক্ত অট্টালিকা নির্মিত। আমার সঙ্গে সামরিক পোষাকপরা জনৈক জোয়ান ও সামরিক বিভাগের 'জোঙ্গা' গাড়িটি দেখে শ্রেষ্ঠ বিলাস-কক্ষটাই আমাকে দেওয়া হ'ত। এখানে আমার আয়ুষ্কাল মাত্র ষোল ঘণ্টা। কিন্তু চন্দ্রহসিত সেই রাত্রে ডাকবাংলোর তত্ত্বাবধায়ক ও তাঁর সালঙ্কারা পাহাড়ি বধূটির সঙ্গে গল্পগুজবে দুই প্রহর রাত্রি অতিক্রান্ত হয়েছিল।

পরদিন যোগেন্দ্রনগর থেকে ধরমশালার পার্বত্যনগর অভিযান করলুম। সাতান্ন মাইল সুন্দর ও মনোরম পথ। এটি কাংড়া উপত্যকার হৃৎকেন্দ্র। চারিদিকের হিমালয়ের শোভা ও সৌন্দর্য দেখে ভাবছিলুম এই উপত্যকায় একদা কেন বড় বড় চিত্রশিল্পীর জন্ম হয়েছিল। এসব অঞ্চল অতিক্রম করার কালে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে থাকি।

ইযোল্ এবং ম্যাকলেয়ডগঞ্জ হয়ে যখন ধরমশালা সামরিক ছাউনি শহরে এসে ঢুকলুম, সন্ধ্যার তখনও বিলম্ব রয়েছে। ছাউনি শহর প্রায় যেখানে গিয়ে শেষ হ'ল, তখন পাওয়া গেল ধরমশালার ছোট্ট শহর— আমার গাড়ি উঠে এল চড়াইপথে। এবার ঠিক আমার নাকের উপরে ধওলাধার পর্বত শ্রেণীর বিশাল ও গগনস্পর্শী দেওয়াল। সেই দেওয়াল ও তা'র তুষারশীর্ষ ভরা জ্যোৎস্নায় যেন দপদপ ক'রে জ্বলছে।

কাংড়া উপত্যকার পার্বত্য অংশের সর্বশেষ শৈলশহর হ'ল ধরমশালা। সমস্ত উত্তর ভূভাগ যেমন ধওলাধারের প্রাকার বেষ্টিত, তেমনি পশ্চিমভূভাগ শুধু অনন্ত সমতল। এই দূরদূরান্তরব্যাপী সমতলের উপর দিয়ে সুপ্রশস্ত একটি পথ চলে গেছে পাঠানকোটের দিকে। এই রাজপথ আগাগোড়া সামরিক প্রহরার লৌহবেষ্টনে যেন বজ্রকঠিন। ভারতের ওয়েস্টার্ণ কমাণ্ড যে কি বিপুল সামরিক সজ্জায় নিত্য উৎকর্ণ থাকে এবং তারা কি প্রকার বলশালী, সেটি কাশ্মীর, হিমাচল ও পাঞ্জাব সীমান্তে ভ্রমণ না করলে বোঝা যায় না। এই কমাণ্ডকে সম্প্রতি দ্বিধাবিভক্ত ক'রে একটির নাম রাখা হচ্ছে সেই আগেকার নর্দার্ণ কমাণ্ড—যার কেন্দ্রীয় দপ্তর বসবে উধমপুরে—যেটি পাঠানকোট থেকে জম্মু হয়ে একশ' দশ মাইল পড়ে। ওয়েস্টার্ণ কমাণ্ড শিমলায় যেমন আছে তেমনিই থাকবে। অনুমান করি, এই দুই অপরিমেয় শক্তিশালী কমাণ্ড আপন আপন বৃত্তে জম্মু, কাশ্মীর, লাদাখ, লাহুল ও স্পিতি, পাক পাঞ্জাব ও তিব্বত ভারত সীমান্তগুলির সর্বপ্রকার প্রহরার দায়িত্ব নিয়ে থাকবে। ধরমশালার টুরিষ্টলজের যে চমৎকার ঘরটি পেয়েছিলুম তার সামনে ছিল ধওলাধারের বিশাল দৃশ্য এবং ঘরের একটি জানলা খুললেই পশ্চিম কাংড়ার অনন্ত সমতল— যেমনটি দেখা যায় দার্জিলিংয়ের টাইগার হিল্ থেকে তিস্তা উপত্যকা, মুসৌরী থেকে গঙ্গা উপত্যকা, চেরাপুঞ্জীর থেকে সুরমা উপত্যকা ইত্যাদি।

ধরমশালা শহরের একটি বড় আকর্ষণ হ'ল পশমের ও কার্পেটের মস্ত বাজার। দ্বিতীয় আকর্ষণ, কয়েক মাইল দূরে দালাই লামার ক্ষুদ্র পার্বত্য উপনিবেশ। অনেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান নানা চেষ্টা চরিত্রের পর পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে। কিন্তু আমার পক্ষে সেটির দরকার ছিল না। ১৯৫৬

খ্রীষ্টাব্দে দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামার সঙ্গে আমি দেখা করি কলকাতার গ্রাণ্ড হোটেলে—তখন দালাইয়ের বয়স তেইশ ও পাঞ্চেনের বয়স বছর উনিশ। তার ঠিক আগে ভারতীয় বন্দীশিবির থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালের পলাতক জার্মান লেখক হেনরিখ হারের এর সুপ্রসিদ্ধ "Seven Years in Tibet" নামক গ্রন্থটি আমার পড়া ছিল।

পরদিন সকালে কিছু উৎরাই পথে নেমে চামুণ্ডার দিকে রওনা হলুম। পাহাড়তলীর নিচের দিকে পথ চলে গেছে পশ্চিম থেকে উত্তরের দিকে। একটির পর একটি গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছি উপত্যকার ভিতর দিয়ে,—এক একটি ঝর্ণা দেখে দেখে যাচ্ছি। তারপরে গিরিখাদ, মাঝে মাঝে উপত্যকার বিস্তার, একটু আধটু চড়াই, দূরদূরান্তর ব্যাপী জনবিরলতা। এগুলি পেরিয়ে চামুণ্ডার পথ ধরলুম বাঁদিকে ডানদিকের পূর্বপথ চলে গেল কাংড়ার বনভূমির দিকে।

পথ থেকে নেমে ছোট একটি পাথুরে পথ ধ'রে কিছুদূর গেলে চামুণ্ডাদেবীর সুপ্রাচীন মন্দির। কাংড়া চিরদিন শক্তির উপাসক, এবং একটি উপলখণ্ডময় গিরিনদীর তীরে এই মন্দির কাংড়ার অন্যতম প্রাচীন তীর্থ। ভিতরে গিয়ে চামুণ্ডার সমান একটি শিবলিঙ্গ মন্দির নাম নন্দীকেশ্বর।

না, আমার সময় ছিলনা। চামুণ্ডা থেকে কাংড়ার প্রধানতর তীর্থ বজ্রেশ্বরী। এর কথা আগে বলেছি। এখন পনেরো বছর পরে দেখছি সব নতুন। কোথায় যেন ভেসে গেছে সেই পুরানো সঙ্কীর্ণ অসাধ্য পথ,—এ একেবারে আধুনিক রাজপথ। চামুণ্ডা থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল পথ দুই ধারে যেন শোভা বিস্তার ক'রে রয়েছে।

এর পর সেই ধালীধর গিরিশ্রেণীর কোলে জ্বালামুখী তীর্থ একান্ন পীঠের অন্যতম। এখানে দেবীর জিহ্বা থেকে অগ্নি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। একালে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের নিচে পথ দিয়ে দাহ্য ধাতব নির্গত হচ্ছে,—ওখানে বসেছে ধাতব বিজ্ঞানের শিক্ষা কেন্দ্র। কাংড়া থেকে জ্বালামুখী ত্রিশমাইল। মাঝপথে পড়ে সেই প্রাচীন কাংড়া দুর্গ এবং বানিতাল। কিন্তু এ অঞ্চল এখন সব বদলিয়ে গেছে। আধুনিক কালের তার সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা চারিদিকে বিস্তার করেছে।

কাংড়া থেকে বিদায় নিয়ে গোগ গল আর নূরপুর ছাড়িয়ে ষাট মাইল পথ পেরিয়ে পাঠানকোটে এসে পৌঁছলুম অপরাহ্ণ কালে। না, সে পাঠানকোটও আজ নেই। এ প্রশস্ত রাজপথ আগে ছিলনা। বিগত চার বছরের মধ্যে যেন এক ময়দানব একে আবার নতুন ক'রে নির্মাণ করেছে। আমি

গিয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্তী মিলিটারী ক্যাম্পের ভিতরে অফিসার্স কোয়ার্টারে একটি বড় ঘর দখল করলুম। কিন্তু এটি যেহেতু ২১ কমাণ্ড হেডকোয়ার্টার্স, এবং এখানে থাকা আমাদের উভয় পক্ষের অসুবিধা, সেজন্য এখান থেকে মাইল চারেক দূরে একটি পরম রমণীয় ও নিরিবিলি মিলিটারী বাংলোয় গিয়ে উঠলুম। চারদিকে বনবাগান এবং পুষ্পোদ্যান। আমার কক্ষটি সর্বাধুনিক আসবাব সজ্জায় পরিপূর্ণ।

পরদিন পাঠানকোট ছেড়ে জম্মু। পঁয়ষট্টি মাইল চ'লে এলুম উপত্যকাপথে। সঙ্গে এলেন মিলিটারী এক ক্যাপটেন মিঃ শর্মা,- ইনি অতি সজ্জন ব্যক্তি এবং সাংবাদিকও বটে। জম্মু আমার বিশেষ পরিচিত এক বৃহৎ শহর। এখানকার কোর্ট কাছারি, রাজবাড়ি, বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠান, এবং সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথজি ও অন্যান্য মন্দির আমার জানা। জম্মুতে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, সেই উপলক্ষ্যে ওখানকারই টুরিষ্ট রিসেপসন কেন্দ্রের অট্টালিকায় একরাত্রি বসে গেলুম।

পরদিন ক্যাপ্টেন শর্মা আমাকে নিয়ে চললেন পাক ভারত যুদ্ধবিরতি সীমারেখার ধারে ধারে। প্রথমে জম্মু থেকে আখনুর উনিশ মাইল পথ। আমার চোখ ছিল, ধওলাধারের সীমানা ছেড়ে পীরপাঞ্জালের দোড়গিরি শিবলিঙ্গ পর্বতমালার গা ঘেঁষে চলেছি। আমাদের এ পথ কাশ্মীর রোড, বরং বলা চলে 'সিজ ফায়ার' রোড—কেননা এই পথ থেকে সামান্য পশ্চিম বা দক্ষিণে স'রে গেলেই পশ্চিম পাঞ্জাব বা পাকিস্থান। এ পথ অপ্রশস্ত ও ধূলিধূসর। আখনুর এখন ছোট জনপদ, দুতিনটি দোকান,—এ ছাড়া যা আছে তা হ'ল মিলিটারি চেক পোষ্ট আর পিকেট্। আখনুর দুর্গ ঠিক সামনেই, এখানে ১৯৬৫ সালে পাক ভারত সংগ্রাম জ্ব'লে উঠেছিল। এ পথটিতে পদে পদে ছাড়পত্র লাগে।

এর পরে দেখতে পাচ্ছিলুম গিরিশ্রেণীর গহনলোকের দিকে এগোচ্ছি। সঙ্গে আছেন ক্যাপটেন্ কিন্তু দুর্ভাবনা আছে মনে। অতঃপর আখনুর থেকে 'সুন্দরবনি' —সবটাই পার্বত্য। কোথাও এখনও মানুষ, বা বস্তি বা জীবনের চিহ্ন দেখছিনে। দেখতে দেখতে সুন্দরবনির ক্যাম্প ছেড়ে উপত্যকা ও গিরিখাদ পেরিয়ে এলুম 'লামবেরিতে।' এগুলি শুধু নাম। হয়ত কচিৎ কোথাও বনমধ্যে একটি বস্তি, কোথাও বা দুই একটি পথচারী। এ যেন চারিদিকে সন্দেহের চক্ষু, নাটকীয় ছমছমানি, প্রতি পাহাড় যেন সংশয় আর উৎকণ্ঠার প্রতীক। ক্রমশ আমরা এলুম 'চিঙ্গাস' নামক এক অঞ্চলে।

'চিঙ্গাস' হ'ল যা হোক একটা নাম, তা'র বেশি কিছু নয়। দুদিকে পাহাড় আর বন, একটু আধটু চাষবাস, কিন্তু মানুষজন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সীজ ফায়ার' লাইনের অনুচ্চ পাহাড়গুলির এপার দিয়ে আমরা পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। এ অঞ্চল অনেকটা 'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড', শর্মাজি আমাকে একে একে সব দেখাচ্ছিলেন। এর আগে কিন্নরদেশের গন্ধনলোকে সামরিক ঘাঁটি গুলি পরিভ্রমণের কালে আমার সঙ্গে ছিলেন ক্যাপটেন কোচার এবং ক্যাপটেন সিদ্দিকি। তারপর নামগিয়া থেকে সিপকি লা সীমান্তের দুঃসাধ্য গিরিসঙ্কটে জনৈক সশস্ত্র মেজর ছিলেন সঙ্গে। তিনিই নিয়ে গিয়েছিলেন সিপকি উপত্যকার কৌরিকি সীমান্তে - যেখানে তিব্বত ও ভারতের 'প্রকৃত সীমারেখা।'

এবার আমরা এসে পৌঁছলুম রজৌরির সামরিক ঘাটিতে। এটি জম্মু থেকে একশ' এক মাইল দূরে। এখানে সামরিক অফিসারদের কোয়ার্টারে একটি পৃথক কক্ষে আমার দিন তিনেক বসবাসের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল। এই নতুন ঘাঁটি শহর নির্মাণ করেছেন প্রতিরক্ষা বিভাগ। প্রবল শীত এখানে। নিকটবর্তী পীরপাঞ্জাল পর্বতমালা প্রতিদিন তুষারপাত ও ঝঞ্ঝায় ভয়াবহ হয়ে উঠছে। আমরা পৌঁছলুম প্রায় সন্ধ্যাকালে, এবং দেখতে দেখতে এই বন বাগান ঘেরা শান্ত ও সুদৃশ্য সামরিক উপনিবেশটিতে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। আমাদের অতি নিকটে পীরপাঞ্জালের গিরিশ্রেণী থাকার জন্য আমরা তার শুভ্র তুষারের উপর প্রতিফলিত জ্যোৎস্নাকে এক নতুন রূপে দেখতে পাচ্ছিলুম। তুষারভূমি অতিক্রম করার কালে রৌদ্র থাকলে যেমন চোখ ঝলসিয়ে যায়, চন্দ্রালোকিত তুষারক্ষেত্র তার ঠিক বিপরীত। শ্বেতবর্ণ স্নিগ্ধ আগুন জ্বলছে চোখের সামনে, যার প্রতিফলিত দুগ্ধবর্ণাভায় কেমন একটা অনৈসর্গিক দিব্য বিভা দেখা যাচ্ছে চতুর্দিকে।

অপর একটি কক্ষে সেদিন অফিসার মহলে এক পার্টি দেওয়া হয়েছিল। আমি ছিলুম তার প্রধান অতিথি। জনৈক মেজর পদোন্নতি লাভ ক'রে লেফটেনান্ট কর্ণেল হয়েছেন,—সেইটি ছিল উপলক্ষ্য। আমাকে দু'চারটি কথাও বলতে হয়েছিল। এই রাত্রির আনন্দের আয়োজন সকলের পক্ষেই স্মরণীয় হয়ে রইল।

রজৌরিকে কেন্দ্র ক'রে আমার ভ্রমণ ও পরিদর্শনের নতুন তালিকা প্রস্তুত হয়েছিল। শর্মাজি আমাকে নিয়ে চললেন অন্যপথে নওশেরার দিকে। এ অঞ্চলে যেমন বনভূমি, জনহীনতা তেমনি, বন্য পার্বত্যালোক—যেদিকে অন্য কোনও প্রকার যানবাহন নেই। ক্বচিৎ কখনও জম্মুপ্রদেশবাসী এক আধজন

এদিকে ছিটকিয়ে আসে, তাকে কারণ দেখাতে হয়। আমাদের পথের পাশের পাহাড়গুলি যুদ্ধবিরতি সীমারেখায় অবস্থিত, সুতরাং প্রতি পাহাড়ের উপর কড়া দৃষ্টি থাকে। এগুলির নাম জম্মুপাহাড়। এখানে প্রবল সংগ্রাম ঘটেছিল ১৯৬৫ সালে।

আমরা এক একটি প্রকাশ্য ঘাটি ও গোপন পিকেট দেখে যাচ্ছিলুম। নওশেরা থেকে ভিমবারগলি, এবং মেনধার। এখানে পাহাড়তলীর উপত্যকা প্রশস্ত হয়েছে। এই ঘাটি অতিশয় শক্তিশালী। এখানকার এক অতি বলিষ্ঠ ডোগরা সেনানায়ক আমাকে দেখাচ্ছিলেন, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এখানে প্রথম পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীরা কি ভাবে হামলা করে। তিনি যখন তার সামরিক দায়িত্ব, ঘাটিরক্ষার নীতি ও কৌশল, এবং সর্বপ্রকার সংঘর্ষের বর্ণনা করছিলেন, -আমি চেয়ে দেখছিলুম আমার দক্ষিণে পুঞ্চ শহর বাঁদিকে মেনধার এবং সম্মুখে সেই কুখ্যাত হাজিপীর। শুধু হাজিপীর নয়, হাজিপীরের যেটি বাল্‌জ্‌ অর্থাৎ স্ফীত অংশ বা ভুঁড়ি- যেটি বেরিয়ে এসেছে ভারতীয় অংশে সেটি সকৌতুকে লক্ষ্য করছিলুম দূর থেকে। এখান থেকে মেনধারের পথ ধ'রে কিছুদূর গেলেই হাজিপীরের পাশেই উরি অঞ্চল পেয়ে যাবো। উঁচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে পথের চেহারাটি দেখে আমার খুবই ভালো লাগছিল।

এখানে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন ছিল। কিন্তু তার আগে শর্মাজি তার গাড়িতে আমাকে নিয়ে অন্য একটি পাহাড়ের মাথায় গিয়ে বললেন, আসুন একটু পায়ে হেঁটে যাই।

পার্বত্য নালা, উঁচু নিচু পাহাড়ি পথ পেরিয়ে আমরা একটি পিকেট দেখতে গেলুম। এখানে ষোলজন জোয়ান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সিগ্‌নালার, হাবিলদার, লান্সনায়েক এবং একজন যুবা কমাণ্ডার। তারা আমাকে একটি কাঠের তীরওলা যন্ত্রে চোখ রেখে দূরের পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য করতে বললেন। ওই সঙ্কেতটি ধরে আমি সকৌতুকে দেখলুম, কয়েকজন পাকিস্তানী জওয়ান আমাদেরই মতো একটি পাহাড়ে প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে এবং নড়াচড়া করছে। এ দৃশ্যটি একটু রোমাঞ্চ আনে।

ফিরে এসে জলযোগে বসলুম। প্রশ্ন করলুম, মেন্‌ধার হয়ে উরি পৌঁছতে ঘণ্টা দুই লাগবে কি?

আমার কথায় অফিসার মহল হেসে উঠলেন। হাসির অর্থ বুঝতে না পেরে যখন ওঁদের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলুম, তখন একজন বললেন, দু ঘণ্টার কমই লাগে। কিন্তু যাওয়া সম্ভব নয়।

কেন?

ওঁরা আবার হেসে উঠলেন। কিন্তু যিনি হাসলেন না তিনি বললেন, লালবাহাদুর শাস্ত্রী বেঁচে থাকলে হয়ত আপনি এর জবাব পেতেন।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করতুম। তাঁর মৃত্যুর পরের দিন আমি বিমানযোগে দিল্লী গিয়ে তাঁর শবদেহের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছি, এবং দিল্লীর কালীবাড়িতে তাঁর শোকসভায় দাঁড়িয়ে আবেগ প্রবণ বক্তৃতাও করেছি, এঁরা যেন তার প্রতি একটু বক্রোক্তিই করছেন।

এক ব্যক্তি বললেন, শুনুন তবে, শাস্ত্রীজি হিতাহিত বিবেচনা না ক'রে তাসকন্দ চুক্তিতে সই করার ফলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আপনাকে উরি পৌঁছতে গেলে এখান থেকে আবার জম্মু শহর যেতে হবে এবং সেখান থেকে শ্রীনগর, সেখান থেকে বরামুলা, এবং তারপর রামপুর পেরিয়ে উরি। অর্থাৎ চারশ' মাইল ঘুরে, ঘুরে আবার যাওয়া। এর জন্য অকারণে প্রতি বছরে প্রতিরক্ষার খাতে কত কোটি টাকা অপব্যয় হয় শুনবেন? লালবাহাদুর আগাগোড়া আয়ুবখাঁর কাছে পরাভূত হয়েছিলেন। আর যাই হোক আয়ুবখাঁ হলেন একজন মিলিটারি ডিক্টেটর। নক্সাগুলো ছিল তার নখদর্পণে।

সেদিন আমি [illegible] হয়ে গিয়েছিলুম। অতঃপর অন্য প্রসঙ্গ তুলে কয়েকজন অধিবাসীর সঙ্গে [illegible] বসে গেলুম। এমন অনেক কথা ও কাহিনী শুনলুম, যেগুলো বেতারে বা সংবাদ পত্রে কোনও দিন প্রকাশিত হতে পারেনা। কিন্তু একটি বিশ্বাস নিয়ে সেদিন সন্ধ্যাকালে রজৌরিতে ফিরে এলুম, ভারতীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাটি দিন দিন সুশৃঙ্খল, সুপরিচালিত ও নব নব শক্তি লাভে দৃঢ়তর হচ্ছে।

রজৌরির সামরিক শহর যেমন ছবির মতো সুদৃশ্য, আধমাইলের মধ্যে এর পুরনো পার্বত্য শহরটি কিন্তু তেমন নয়। দূরের থেকে রজৌরির সুবৃহৎ ও প্রাচীন দুর্গসংলগ্ন অট্টালিকাগুলি পর্যটকের মনে একটি সম্ভ্রম চেতনা জাগে। এককালে এই হিন্দুপ্রধান শহরের একটি আভিজাত্য ও সম্পদ প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ১৯৪৭।৪৮ খ্রীষ্টাব্দে উপজাতীয় পাঠান ও ছদ্মবেশী পাকিস্তানের সৈন্যরা এই নগর আক্রমণ করে এবং সেই বেড়াজালের মধ্যে হিন্দুরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়। এখন এখানে শান্তিবাদী মুসলমান, হিন্দু, শিখ ও ডোগরারা সকলে সম্মিলিত আর্থনীতিক স্বার্থে পাশাপাশি বসবাস করে।

পুরনো শহরের অলিগলি পথঘাট, দোকানবাজার ইত্যাদি দেখে

বেড়াচ্ছিলুম। শহর নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন। মিলিটারী পুলিশ এই শহরে প্রহরার কাজ করে।

এক বাড়ির দোতলায় উঠে একটি রাম ও সীতার মন্দির দেখলুম। প্রায় প্রত্যেক ঘরেই একটি দুটি দেববিগ্রহের পূজা চলে। দুদিন আগে পূর্ণিমায় এখানে খুব ধুমধাম হয়েছিল। এখানকার যিনি বৃদ্ধ পূজারী তাঁর বয়স নব্বই পেরিয়ে গেছে। একুশ বছর আগে তিনি কি ভাবে পাঠান ও পাকিস্তানীদের হাত থেকে রক্ষা পান তার রোমাঞ্চকর কাহিনী ও ইতিবৃত্ত তিনি বলছিলেন। বাঙ্গলা দেশের নাম তিনি শুনেছেন, কিন্তু একজন বাঙ্গালীকে তিনি তার সুদীর্ঘ জীবনে এই প্রথম দেখলেন। তিনি করুণকণ্ঠে বলেছিলেন, শুধু হিন্দু নয়, শত শত মুসলমান নাগরিককে পাঠান ও পাকিস্তানীরা আগুনে পুড়িয়ে শেষ করেছিল। ওরা এসেছিল সমস্ত ধ্বংস করতে, জাতিবিচার করতে আসেনি। এখনও আমাদের মনে শান্তি নেই, আমরা, সন্ধ্যের পর বাইরে বেরোইনে, রাত্তিরে ঘুমোইনে, নিজের নিজের এলাকা ছেড়ে এক পা বাইরে যাইনে। ওই যে দেখছেন পশ্চিমের পাহাড় ওই পাহাড় সব সময়ে সন্দেহে ভরা। এখানে কেউ কারোকে তেমন বিশ্বাস করেনা। দিন রাত আমরা ফৌজদের পাহারায় থাকি। দিন রাত আমাদের, উৎকণ্ঠা।

দিন তিনেক পরে রজৌরি ছেড়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল আখনুর জম্মু, ও নাগরোটা ছাড়িয়ে নবনির্মিত ও প্রশস্ত সুন্দর শ্রীনগর রোড ধ'রে সোজা উধমপুর--রজৌরি থেকে প্রায় দেড়শ' মাইল। এ যাত্রায় গত দুই সপ্তাহেরও বেশি আর্মি হয়ে আছি একজন ভি. আই. পি. অর্থাৎ অতি বিশিষ্ট এক ব্যক্তি। প্রতিরক্ষা বিভাগের আতিথ্য-লাভ ঘটলে যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে অনেকগুলি সুযোগ সুবিধা সহজে মেলে। বসবাসের সুব্যবস্থা, সুখাদ্য, যানবাহন, সশস্ত্র পাহারা এবং সর্বোপরি যে কোনও নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশের জন্য ছাড়পত্র।

সন্ধ্যায় এসে উধমপুরে পৌঁছলুম। যাঁরা দশ বছর আগেও কাশ্মীরের দিকে পা বাড়িয়েছেন, তাঁরা আজকের উধমপুর চিনতে পারবেন কিনা সন্দেহ। শুধু উধমপুর নয়, পাঠানকোট থেকে সামরিক কর্তৃপক্ষ ও প্রতিরক্ষা বিভাগ একযোগে যে নতুন সড়ক নির্মাণ করেছেন শ্রীনগর পর্যন্ত, সেই পথ অতি প্রশস্ত, সুন্দর, ঝকঝকে ও সর্বার্থ সাধক। সেন্ট্রাল পি,—ডব্লু, -ডির নানা বদনাম আছে, এখানে আর্মি ইঞ্জিনিয়ার্স ও সামরিক কর্তৃপক্ষ সেই বদনাম ঘুচিয়েছেন।

উধমপুরেও আমার জন্য সেই নবনির্মিত এম, ই, এস, এর বিলাস ভবন—যেটিকে বাগান বাড়ি বললেও ভুল হবে। এক রাত্রি উধমপুরে। পরের দিন বেরিয়ে বাটোট, রামবান, বানিহালের সুড়ঙ্গ পেরিয়ে একেবারে কাজি বা গাজিকুণ্ড। সেখান থেকে শ্রীনগর—মোট আবার দেড়শ' মাইল। শ্রীনগরে আবার সেই ঝিলমের বাঁধের পাশে নিরিবিলি পল্লীতে এম, ই, এস বাংলো। নবেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ। টুরিষ্টদের মরশুম শেষ হয়ে গেছে। শ্রীনগর এখন থেকেই কাঁপতে আরম্ভ করেছে। ঘরে ঘরে 'বোখারি' অর্থাৎ দেশী উপায়ে চিমনিসহ কেরোসিনের 'হীটার' জ্বলছে। হিমাচলের প্রত্যেক সামরিক ঘাঁটিতে এই 'বোখারির' উত্তাপ উপভোগ ক'রে এসেছি। গঙ্গোত্রির পথেও কিছুকাল আগে সামরিক ঘাটিগুলোতেও এগুলি আমার দেখা ছিল। এম, ই, এস বাংলো শ্রীনগর থেকে মাইল চারেক দূরে।

একটি রাত্রি বাংলোয় কাটিয়ে শ্রীনগর থেকে বরামূলা, রামপুর, উরি, শিলিকোট, তিলাওয়ারি এবং অবশেষে সেই সীজ ফায়ার লাইন,—যার ঠিক সামনে হাজিপীর। হাজির সেই মহাবিপজ্জনক 'বৃকোদর', অর্থাৎ বাল্জ অর্থাৎ বিরাট ভুঁড়ি পাহাড়। উরির ক্যাম্প উৎরাই পথে, এখানে ঝিলমের একটি অপ্রশস্ত শাখানদী রয়েছে যার নাম উরি নালা। এই নালার উপর দিয়ে উঠেছে হাজিপীর। ভিমবারগলির ডোগরা অফিসার যথার্থ বলেছিলেন। আমরা অনাবশ্যক ও অহেতুক এই চারশ' মাইল ঘুরে থাবার এলুম 'যুদ্ধবিরতি সীমারেখার' ঠিক নিচে।

চারিদিক জনবিরল। কিন্তু উঁচু পাহাড়ের ছায়া, অনুন্নত পাথুরে পথ, একটা ভূস্বর পরিবেশ,—সব মিলিয়ে একটা উৎকণ্ঠ অনিশ্চয়তা। উরির ক্যাম্পে গিয়ে কতক্ষণ কাটালুম,—এখান থেকে পশ্চিমের খানিকটা নদীপথ 'No-man's land', তারপরেই পাক অধিকৃত কাশ্মীর এলাকা। এখান দিয়েই গেছে 'সীজ ফায়ার লাইন।' লাইনের ওপারে দোমেল, যেখানে ঝিলম ও কৃষ্ণগঙ্গা মিলেছে। দোমেলের তটপ্রান্তে কাশ্মীরের শেষ বৃহৎ ঘাঁটিশহর মুজাফ্ফরাবাদ—যেখানে দাঁড়িয়ে, যতদূর আমরা জেনে এসেছি, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর তারিখে নবলব্ধ পাকিস্তানের নবনিযোজিত গভর্ণর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ অতর্কিত ভাবে উপজাতীয় পাঠান দস্যুদল পাকিস্তানী সৈন্যদলকে কাশ্মীর আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিলেন।

আমার সঙ্গে একজন সশস্ত্র পাঞ্জাবী মেজর ছিলেন। তিনি ১৯৬৫ সালে পাক ভারত সংঘর্ষে আহত হয়েছিলেন। সুদর্শন হাসিখুশী ভদ্রলোকটি

এমনই বলিষ্ঠ যে, দেখলে মন উদ্দীপ্ত হয়। তিনি আমাকে এ অঞ্চলের বিশদ বিবরণ খুঁটিয়ে বোঝাচ্ছিলেন। এক সময় শুধু বললেন, আপনি যে আমার সঙ্গে পিকেট্ দেখতে যাচ্ছেন, এটি ওরা ঠিক লক্ষ করেছে। দূরবীন দিয়ে আপনাকে দেখে নিচ্ছে।

থমকিয়ে গেলুম, -তাহলে আর এগিয়ে কাজ নেই।—আমি হাজিপীরের উপরদিকের পাহাড় লক্ষ্য করছিলুম। যদি ওরা হঠাৎ গুলী করে?

ভয় পাবেননা—মেজর বললেন, গুলী আপনার গায়ে লাগবে না। ঈশ্বরের নিয়ম ও দূরত্ব অনুসারে ওদের লক্ষভ্রষ্ট হয়ে যাবে। গুলী ছুটবে অন্যদিকে। আর গুলী যদি আপনার গায়ে লাগে, তার প্রতিকারও আছে।

তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। মেজর বললেন, বিশ্বাস করুন, আমাদের এ ঘাঁটি অত্যন্ত শক্তিশালী। ওরা যদি গোঁয়ার আর নির্বোধের মতো এমন কুকাজ করে বসে, তাহলে একঘণ্টার মধ্যে ওদের ওই হাজিপীর আমরা উড়িয়ে দেবো।

মেজর আমাকে নিয়ে গেলেন উচ্চ এক মালভূমিতে। সেখানে প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধরে তিনি আমাকে তাদের সব রকমের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার খুঁটিনাটি একের পর এক দেখাতে লাগলেন। এ অঞ্চল হল বরামুলা ও শ্রীনগর প্রবেশের প্রধান তোরণ।

সন্ধ্যার আগে আমরা রামপুরের সুবৃহৎ ক্যাম্পে ফিরে এলুম। এটি আমার পূর্ব পরিচিত 'ঝিলম ভ্যালি রোড।' বিগত ১৯২৮ সালে তরুণ বয়সে যখন আমি ছিলুম সামরিক বিভাগে, সেই সময় রাওয়ালপিণ্ডি থেকে সানি ব্যাঙ্ক ও কোহালায় ঝিলম পেরিয়ে দোমেল, মুজাফ্ফরাবাদ, উরি এবং এই রামপুর দিয়ে বরামূলা, শ্রীনগর, মাটাণ্ড হয়ে পহলগাঁওয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

রামপুর ক্যাম্পের কোলে একটি রমণীয় উদ্যান নির্মাণ করেছেন সামরিক কর্তৃপক্ষ। এই উদ্যানের উত্তর প্রান্তের ঠিক নিচে গহ্বরে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা, যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার—"

একদা রবীন্দ্রনাথ এই রামপুরের উপর দিয়েই শ্রীনগরে গিয়েছিলেন।

কাশ্মীরের পরম রমণীয় বন্যশ্রী ও সৌন্দর্য এখানে যেন তার প্রাচুর্যকে অবারিত ভাবে মেলে ধরেছে। কত দেশে, কত দেশান্তরে পাইনবনের শোভা আর দেওদারের দিগন্তবিস্তার—একে একে দেখে বেড়িয়েছি। দক্ষিণ জার্মানির বাভারিয়ার ব্ল্যাক ফরেষ্টের ছায়ালোকে, আল্পস্ পর্বতের তলায় তলায়, ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে, উত্তর ইতালী ও অষ্ট্রিয়ায়, সুইজারল্যাণ্ডে,

সাইবেরিয়ার দক্ষিণ তুন্দ্রায়, মস্কোর থেকে দূরে সেই পেরেডেলকিনোয়,—উক্রায়েন, লেনিনগ্রাড আর-ট্রান্স-ককেসাসের এখানে ওখানে,—দেখেছি। কিন্তু ফিরে আসি ভারতে। উপলাহত গিরিনদীর প্রখর প্রবাহের সঙ্গে, উত্তুঙ্গ হিমালয়ের অপার সৌন্দর্যের সঙ্গে, সারাদিনমান বন্য রঙ্গীন পাখিদের কলতানের সঙ্গে, সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশের অনন্ত নীলিমা ও দুগ্ধ শুভ্র মেঘদলের সঙ্গে -মিলিয়ে রয়েছে দেওদার পাইনের অন্তহীন অরণ্যলোক,—এমনটি আর কোথাও দেখতে পাইনি।

পুষ্পোদ্যানের ঠিক মাঝখানে একটি বিশ্রামাগারের ঘর- -যেটির দেওয়ালগুলি কাঁচ দিয়ে ঘেরা। হিমজর্জর হাওয়া ঢুকবেনা ঘরে, চারিদিক দেখা যাবে সুস্পষ্ট, আকাশের তারা, জ্যোৎস্না পর্বতের শোভা, ঝিলমের খরধারা—সব দেখা যাবে। এই ঘরটিতে আমাদের রাত্রির বৈঠক বসেছিল। ছিলেন এক এক জন অফিসার। ব্রিগেডিয়ার, লেফটেনান্ট জেনারেল, কর্ণেল, মেজর, ক্যাপটেন্ -কে নয়? এমন ভদ্র, অমায়িক ও সজ্জন এঁরা,—এঁরা যেন সামরিক বিভাগের গৌরব। এরা সকল রাজ্যের থেকে এসেছেন—কেরালা থেকে কাশ্মীর, আসাম থেকে গুজরাট। ভাষা এদের ইংরেজি,—ইংরেজি ছাড়া গত্যন্তর নেই। হিন্দির জন্য কথায় কথায় যারা চেঁচায়, তাদের এনে দেখাতে ইচ্ছা করে। সামরিক বিভাগের কোনও সংজ্ঞা আজও হিন্দিতে জন্মায়নি।

এখানকার অফিসার মহলের বিবিধপ্রকার হয়রানির আলোচনা শুনছিলুম। দিল্লীর রাজনীতিবিদ্‌রা যদি সামরিক পদ্ধতি ও ঘাটি রচনার ব্যাপার নিয়ে বা সামরিক কৌশলের কথা নিয়ে সেনানায়কদের উপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা পান তবে সেটি দুঃখদায়ক ও আপত্তিজনক। এতে সেনাপতিদের মন ভাঙ্গে। স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আর যাই থাক, সামরিক ঘাঁটি ও সমরকৌশল জানা ছিলনা। তাসকন্দ চুক্তিতে সই করার অব্যবহিত পরে সম্ভবত কেউ একজন একটি বিশেষ অনুচ্ছেদের প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে তাঁর সাংঘাতিক প্রমাদটি ধরিয়ে দিয়ে থাকবে, হয়ত তাঁর হার্টফেল করার এটি অন্যতম কারণ। বেচারি কোসিগিনের তিলমাত্রও ত্রুটি নেই। তিনি এদেশের মানুষও নন্ এবং কাশ্মীরের সামরিক ঘাটিগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও নেই। তিনি শুধু চেয়েছিলেন পাক ভারতের মধ্যে মিটমাট এবং দুই দেশের মধ্যে শান্তি। অনেকে একবাক্যে বললেন, তাসকন্দ চুক্তির ফলে আমাদের হয়রানি ও অহেতুক দুর্দশা বেড়ে গেছে। ক্ষয়, ক্ষতি ও অপব্যয় বেড়ে গেছে তার চেয়েও বেশি। তবে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস ক'রে যান, আমরা কোথাও দুর্বল নই,

আমরা সর্বত্র যথেষ্ট শক্তিশালী। চীন আর পাকিস্তান—এদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এরা আমাদের সব দুর্বলতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। যদি রাজনীতিক নেতারা আমাদের ওপর কথায় কথায় ফোড়ন দিতে না আসেন তবে দেখে নেবেন এর পরের পরীক্ষায় কী করি আমরা। আমরা জানিয়ে দেবো দেশরক্ষা কাকে বলে।

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে পাক ভারত সংঘর্ষে তাঁরা এটি ভালভাবেই জানিয়েছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাদের অবারিত সুযোগ দিয়েছিলেন।

রামপুর থেকে বরামুলা ও সোপোর হয়ে আটচল্লিশ মাইল পেরিয়ে ফিরে এলুম শ্রীনগরে। আকাশে ঘন বাদল, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝাপটা, পথঘাটের উপরে আলো ছায়া, প্রবল শীতার্ত বাতাস,—এবার কাশ্মীর ঠাণ্ডা হয়েছে। শীত এসেছে এবার, তুহিন ঝঞ্ঝা বইবে, বরফ পড়বে এবপর। চেনারের পাতা রক্তিম বর্ণ হয়ে ঝরে পড়ছে, বনে-বাগানে কাননে অঙ্গনে যেন আগুন লেগেছে—এত লাল। ওই পাতা কুড়োচ্ছে নরনারীরা। ওগুলো পুড়িয়ে তামাকের ছোট ছোট ডেলার মতো হবে। তারপর ওগুলোয় আগুন দিয়ে কাংড়িতে ভরে তাপ পোয়াবে। সেই কাংড়ি গলায় ঝুলিয়ে জোব্বার তলায় নিয়ে ঘুরবে নিজেদের কাছে। যদি কোনও অভ্যাগত ওদের ঘরে আসে তবে মেঝের উপর তাঁকে মোটা বিছানায় বসিয়ে কম্বল চড়িয়ে দেবে তার গায়ে এবং আগুনভরা কাংড়ি—যেটা মাটির খুরিচির মতো—সেটি এনে কম্বলের তলায় দিয়ে দেবে। আমার বন্ধু পণ্ডিত দীননাথ কাউলের বাড়িতে অমন বিশ পচিশটে কাংড়ি রয়েছে। বাড়ির প্রতি ব্যক্তি শীতকালে কাংড় ব্যবহার করতে বাধ্য।

শ্রীনগর এখন জনাবরল, লাল চৌকের বাজার মন্দা। কম্বল মুড়ি দিয়ে টাঙ্গায় যাত্রী যাচ্ছে। সাতটি 'কদল' মানে সাতটি পুল যথা, মীরা কদল, হাওয়া কদল, ফতে কদল, জয়না কদল, আলি কদল, নাভা কদল, সাফা কদল,—এদের মধ্যে একমাত্র মীরা অর্থাৎ প্রথম পুলটি দিয়েই লোক চলাচল বেশি। কেননা শ্রীনগর দুইভাগে বিভক্ত।

গান্ধারবল, কংগন ও গুন্দ হয়ে পৌঁছলুম সোনামার্গে। সোনামার্গ এরই মধ্যে বরফ চাপা পড়েছে। ছোট ছোট কটেজ, দোকান, ক্যাম্প,—সবগুলিই প্রায় অদৃশ্য। নালা ও নদী নানাস্থলে জমে গেছে। তবু ওই বরফের রাশি ঠেলে ঠেলে অনেক জওয়ান ক্যাম্পে ভিতর ঢুকে ফুটন্ত চা বানিয়ে নিবে

এল। একপাশে 'খাজওয়াজেম' সেই উপত্যকা সব বরফ চাপা। পাশ দিয়ে নিচের দিকে বলতালে যাবার আমার সেই পরিচিত পথ, তার চিহ্নও নেই। যোজিলা গিরিসঙ্কটের পথ হয়ে উঠেছে শুধু তুষার পর্বত,—কারগিল, খালাৎসে, লে শহর প্রভৃতি পৌঁছবার ওই আমার একমাত্র পথ ছিল। আজ প্রায় দেড়মাস হল ও পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ওই পথের নিশানা ধরে ওপারে পৌঁছে গেলে লাদাখ এবং মধ্য এশিয়ার সিন্ধুনদের সীমানায় সেই হেমিস গুম্ফা,—আমার সেই ভ্রমণের বিশদ বর্ণনা করেছি উত্তর হিমালয় চরিত গ্রন্থে। সোনামার্গের প্রবল ঠাণ্ডা আর বরফের মধ্যে চলাফেরা করে আনন্দ পাচ্ছিলুম।

শ্রীনগরে ফিরে পরদিন গেলুম বান্দিপুরা শহরে চক্রাকারে উলার হ্রদের প্রদক্ষিণ পথ ধরে। সে যাত্রা বড়ই মনোরম। বান্দিপুরা ছোট শহর, কিন্তু আমার দরকার ছিল উলার বা গোলার প্রদক্ষিণ। বান্দিপুরা থেকে সোপর উলারের গা ঘেঁষে। এ যাত্রায় সুবিধা ছিল সোপরকে খুঁটিয়ে দেখা। দেখে নিলুম নতুন করে মাঝামাঝি উলারের উপরের বাতাসে বর্ণের খেলা কেমন। এর পর আরেকবার সেই চারটি মোগল গার্ডেনস, আরেকবার হজরতবাল, হরবন ও মানসবল। মানসবলের ডাকবাংলোটি আমার বড়ই প্রিয়। ডালহ্রদ তেমনি প্রসারিত তেমনি শৈবাল ও আগাছাদল তার ভিতরে ভিতরে, তেমনি হাউস বোটগুলি সার হয়ে পড়ে রয়েছে জলের উপর।

তবু মন পড়েছিল কাশ্মীরের আনাচে কানাচে। জানতুম এটা অসময়, তবু অবুঝ মনকে টানতে টানতে নিয়ে গেলুম খানাবল থেকে বিজবিহার, লগনবল থেকে পহলগাঁও। না, টুরিস্টদের পাট উঠে গেছে, নিঃঝুম পহলগাঁও। সবগুলি হোটেল, সবগুলি দোকানপাট, সমস্ত বিকিকিনি—আগাগোড়া বন্ধ। দু'একটি লোক এখানে এখনও রয়েছে, তাদেরও পালাই পালাই করছে। সেই নবনির্মিত বৃহৎ পহলগাঁও হোটেলও এখন জনবিরল।

এখান থেকে আগেকার সেই বনপথ ধ'রে পাইনের অরণ্য পাহাড়ের তলা দিয়ে লিডার উপত্যকা ধ'রে ফিরে চললুম। চারিদিকে উন্নতি ঘটেছে, নির্মাণ চলেছে প্রচুর। সেই প্রাকৃত আরণ্যক রূপটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ফিরে এলুম শ্রীনগরে মার্তণ্ড, ললিতাদিত্য আর অনন্তনাগ হয়ে। তারপর ভেরিনাগ বা নীলনাগ হয়ে রামবান বাটোট এবং সেই সুন্দর উধমপুর।

না, আর নয়। আমার এবারের যাত্রা শেষ হোক। 'উত্তর হিমালয় চরিত' গ্রন্থের পর কাশ্মীরের প্রসঙ্গ আর নয়। এবার আমি শ্রীনগর ছেড়ে চললুম।

দিন তিনেকের মধ্যে পাঠানকোট থেকে ট্রেন ধ'রে সোজা হরিদ্বার। হরিদ্বার ডাকছিল যেন।

॥ ১৩ ॥

গাড়োয়ালের ভিতর দিয়ে আবার অগ্রসর হচ্ছিলুম। হেমন্তের হাওয়া নেমেছে তরাইয়ের বনে বনে। কোটদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করছি। সেই আত্ম-তাড়না আবার ছুটিয়ে এনেছে এদিকে। সেই নতুনের টান, বিচিত্রের সেই ঘরছাড়ানো আকর্ষণ। আমি আসিনি, আমাকে এনেছে কেউ। আমি যাচ্ছিনে, যাচ্ছে অন্য কেউ আমার পায়ে পায়ে। সেই দেখছে, সেই দেখাচ্ছে, জানাচ্ছে সেই,—আমার অস্তিত্ব তারই চেতনায়। আমি আছি চর্মচক্ষু মেলে,—দেখছে সে।

কোটদ্বারের পাহাড় পেরিয়ে যাচ্ছিলুম।—

হিমালয় পরিক্রমা শেষ হয়ে এলো বৈকি। ডায়েরীও প্রায় শূন্য হ'তে চলেছে। এই ঝুলি সম্পূর্ণ শূন্য ক'রে যেতে চাই এই যাত্রায়। কিন্তু দক্ষিণ গাড়োয়ালের হৃষিকেশে না পৌছতে পারলে সর্বস্বান্ত হবার পরম আনন্দ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এই পরিক্রমা শেষ হোক হৃষিকেশে। অর্ধ শতাব্দীর হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে শূন্য ঝুলিটি ফেলে দিয়ে যাবো নীলধারায়। ওইটি আমার শেষকৃত্য।

*

* *

'কালদণ্ড' পর্বতের চূড়ায় উঠেছি। আধুনিক মানচিত্রে 'কালদণ্ডর' উল্লেখ নেই কোথাও, তার স্থলে বসানো হয়েছে 'লান্সডাউন'। কোটদ্বার থেকে লান্সডাউন পচিশমাইল পার্বত্য ও উপত্যকাপথ। গাড়ী যায়।

সুদূর সমতল ভারত দক্ষিণে, এবং উত্তরে তুষার গিরিশ্রেণীর কয়েকটি পরিচিত শিখর,—এই দুই দৃশ্যের সন্ধিস্থল হোলো 'কালদণ্ড' পর্বত। এদিকে চোখ ফেরাও, ওদিকে মুখ ঘোরাও—দেখে নাও বিরাটের আনন্দস্বরূপ। মহাকালের অতন্দ্র প্রহরী।

তবু স্বীকার করবো, কোনও আমন্ত্রণ নেই লান্সডাউনে। কেউ ডাকে না, —এসে পড়লে কেউ জায়গা দিতেও নারাজ। সেইজন্য লান্সডাউন থাকে অনেকটা যেন লোকলোচনের বাইরে। সন্দেহ নেই, এককালে কর্তৃপক্ষও এটি চেয়েছিল। এটি 'গাড়োয়াল রেজিমেণ্টের' প্রধান কেন্দ্র। এই রেজিমেণ্টের

সঙ্গে বাইরের অন্যান্য পার্বত্য অধিবাসী অথবা সমতলবাসীর যোগাযোগ না থাকে—এই ছিল উদ্দেশ্য। ভারতীয় সেনাবাহিনী ইংরেজ আমলে ভারতীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ছোট্ট এই শহরটি দাড়িয়ে রয়েছে পাহাড়ের চূড়ায়, বুঝতে পারা যায় এই অসমতল মালভূমি প্রস্তুত করতে এককালে সময় লেগেছিল। সরু সরু পথ এখানে ওখানে পাহাড়ী বস্তির গা ঘেঁষে নীচের দিকে নেমে গেছে। ক্ষুদ্র এক পাহাড়ী শহরের দোকান বাজার যতটুকু হওয়া সম্ভব—এখানেও তাই। অভাব এবং দারিদ্র্য চারিদিকেই প্রকট। ওদেরই আনাচে কানাচে আবশ্যিক এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভার নিয়ে ব'সে গেছে মাড়োয়ারীর দোকান,—দরিদ্র এবং স্বল্পবিত্ত পল্লীবাসার মাঝখানেই নাকি খুচরা ব্যবসায়ের উন্নতি ঘটে কিছু দ্রুতগতিতে।

মালভূমিটি প্রশস্ত, কিন্তু এর বাইরে সমতল বলতে আর বিশেষ কিছু নেই। এর পাশেই গাড়োয়াল রেজিমেণ্ট এর সুবিস্তৃত গোরাছাউনি। লান্সডাউনের ওটাই সকলের বড় পরিচয়। কাটাতারের বেড়া দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে, ভিতরে ভিতরে গা, বাংলো অসংখ্য, ওদেরই মধ্যে কুচকাওয়াজের ময়দান, অস্ত্রশালা আর দপ্তর। বোধ হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে একমাত্র গাড়োয়াল রেজিমেণ্ট, যার সৈন্যদল পাহাড় পর্ব্বতের বাইরে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বসবাস করতে চায় না। নেপালী গুর্খারাও বরং উত্তাপ সইতে শিখেছে, কিন্তু গরমের দেশের কথা উঠলে গাড়োয়ালীরা আতঙ্কিত হয়। এই রেজিমেণ্ট-এর চিরস্থায়ী বসবাস এবং হিসাব নিকাশের দপ্তর হোলো এই লান্সডাউন,—এবং হিমালয়ের ভিতরে ভিতরে বহু অঞ্চল এরা পাহারা দেয়। কঠিন পরিশ্রম, কঠোর জীবন যাত্রা, অনন্যসাধারণ নির্ভরযোগ্যতা ও নিয়মানুবর্তিতা—ইত্যাদি গুণাবলী এদের একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে। মনে প'ড়ে গেল একটি ঘটনার কথা। বোধ হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ। সেটি আইন অমান্যের যুগ, এবং গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত পাঠান খোদা-ই খিদমৎগারগণের সীমান্তব্যাপী আন্দোলন। বোধ করি পেশাওয়ার রেল স্টেশনের নিকট দাঁড়িয়ে ইংরেজ সেনাপতি গাড়োয়ালী সেনাদলের উপর হুকুম দিলেন, শোভাযাত্রাকারী নিরস্ত্র এবং অহিংস পাঠানদের উপর গুলি চালাও, সম্ভবত সেই প্রথম গাড়োয়াল রেজিমেণ্ট বেঁকে বসলো, কারণ অহিংস ও নিরস্ত্র পাঠানদের তারা হত্যা করতে প্রস্তুত হলনা।

সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষের উৎপীড়িত হৃদয় চাপাকণ্ঠে এই গাড়োয়ালী রেজিমেণ্টকে আশীর্বাদ করেছিল। কিন্তু অবাধ্যতার জন্য সেই বিশেষ গাড়োয়ালী সেনাদলটি পরবর্তী সতেরো বৎসরকাল অবধি নিঃশব্দে ইংরাজের

হাতের শাস্তি বহন করেছে, তার কঠোরতা আমাদের অনেকেরই অগোচরে ছিল।

আগেই বলেছি লান্সডাউনের প্রাচীন নাম 'কালদণ্ড' পর্বত, এবং এই 'কালদণ্ডের' ঠিক নীচেই ছিল দুটি প্রাচীন তীর্থমন্দির—কুমারী শাকম্ভরী ও কালেশ্বর মহাদেব,—যার উল্লেখ পাওয়া যায় কেদারখণ্ডে। এককালে অরণ্যে আকীর্ণ ছিল পাহাড়ের নীচের দিক, জন্তুজানোয়ার বছরের অধিকাংশকাল এখানে অবাধে বাড়াপাটি চালাতো। তখন বছরের বিশেষ বিশেষ পর্বে গাড়োয়ালীরা এসে পাহাড়ের তলায় এই দুটি মন্দিরে কেবল পূজা দিয়ে যেতো। এমনি ক'রে গেছে বহুকাল। কেউ বলে পাঁচশো বছর, কেউ বা বলে আরও বেশী। আধুনিক কালে এসে দেখি, ঠাণ্ডা পাহাড়ের নিরিবিলি অঞ্চল খুঁজতে বেরিয়েছে ইংরেজ। ডালহাউসী, মুসৌরী, নৈনিতাল, শিমলা রানীক্ষেতে—এরা একে একে গ'ড়ে উঠেছে দুটি শ্রেণীর জন্য। একটি হোলো শাসক ইংরেজ, অন্যটি রক্ষক ইংরেজ। শাসক হোলো বড়লাট, রক্ষক হোলো জঙ্গীলাট। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কালদণ্ড' নামটি অপসারিত ক'রে তার স্থলে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লান্সডাউনের নামে এই পর্বতচূড়াটির উপরে গাড়োয়াল রেজিমেণ্টকে বসিয়ে ক্ষুদ্র একটি জনপদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। লান্সডাউন থেকে পঁচিশ মাইল পথ নীচে নেমে গেলে কোটদ্বারের ক্ষুদ্র রেলস্টেশন। ইদানিং এই কোটদ্বার থেকে বদরিনাথ যাবার জন্য মোটরবাস চলাচল করছে। এ গাড়ী কর্ণপ্রয়াগ ও চামোলী হয়ে পিপলকুঠি পর্যন্ত যাচ্ছে, সেখান থেকে বদরিনাথ আর মাত্র বাকি থাকে সাঁইত্রিশ মাইল। হিমালয়ের বহু দুঃসাধ্য পথ প্রতিনিয়তই সুগম ও সহজসাধ্য হচ্ছে।

কালেশ্বর মহাদেবের নিভৃত বনময় মন্দিরটির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। বনে বনে পাখীর কূজনগুঞ্জন ছাড়া আর কোনও প্রকার কলরব নেই। সামনে রয়েছে বলীবর্দ মূর্তি, একটি ঘণ্টা ঝুলছে—ওটার মৃদু গম্ভীর রবে গাড়োয়ালীরা মাঝে মাঝে এসে কালেশ্বরের যোগতন্দ্রা ভাঙাবার চেষ্টা পায়। এখানে ওখানে ছায়ানিবিড় নিরিবিলি দু তিনটি ঘর, একটি অঙ্গন,—এর বাইরে পাহাড়ের তলায় তলায় চ'লে গেল বনপথ। এদের নিয়েই থাকেন পূজারী,—তিনি অতি ভদ্র একটি আত্মভোলা মানুষ। মন্দিরটির কোনও চাকচিক্য নেই বলেই সহজে শ্রদ্ধা আসে। হয়তো এর বয়স বছর ষাট সত্তরের বেশী নয়। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, কেদারখণ্ডে উল্লিখিত ঠিক এই স্থলেই পঞ্চাশ বছর আগে ওই কালেশ্বরের লিঙ্গমূর্তি খুঁজে পাওয়া যায় বনের মধ্যে সেই লিঙ্গই পরে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সত্যমিথ্যার সমস্ত দায়িত্ব রয়ে গেল স্থানীয়

অধিবাসীদের কাছে—যাদের শ্রদ্ধায়, সেবায়, পূজায়, ভালোবাসায়, কালেশ্বর জাগ্রত। দেবতার অস্তিত্ব হোলো বিশ্বাসে, বাইরে কিছু নেই।

বিদায় নিচ্ছিলুম শাকম্ভরী মন্দিরের কাছে—লান্সডাউন বাজারের নীচের দিকে মন্দির। পাশ দিয়ে চ'লে গেছে পাহাড়ী বস্তির পথ। কোথাও কোথাও সপরিবারে থাকে কয়েকজন গাড়োয়ালী সৈনিক,—যারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি পায়। রেজিমেন্ট আছে, প্রাণধারণের সংস্থান আছে। সৈন্যদলের মধ্যে গাড়োয়ালী গুর্খার সংখ্যাও কম নয়। কালক্রমে গাড়োয়ালীর মধ্যে নানা শ্রেণী মিশে গেছে।

অদৃষ্ট লান্সডাউনের শিখরলোক - চারিদিকে এর অন্তহীন অবকাশ। হঠাৎ চূড়াটি যেন দাঁড়িয়ে উঠেছে হাজার ফুট থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতার উপরে, —যেন দলছাড়া। ফলে, দক্ষিণে দেখা যায়, অনন্ত লবণাসমাকীর্ণ ভাবাই, এবং উত্তরে তুষারমৌলী হিমালয়। যে-দৃশ্যটি বদরীক্ষেত্র এবং কেদারনাথ থেকেও পরোপরি দেখা যায় না,—এখানে তারা অধিকতর স্পষ্ট দুটি চূড়া কেদারনাথ এবং বদরিনাথ পাশাপাশি দুটি শৃঙ্গচূড়া ওরা গাড়োয়ালের আদি দেবতা ওরা নিত্যপূজ্য।

দেবতাদের কাছে বিদায় নিয়ে পাকদণ্ডী পথে ঘুরে ঘুরে নামছিলুম। সুন্দর ও মহান প্রকাণ্ড পথ চারিদিকের দিগন্তকে যেন চোখের সামনে ঘোরাচ্ছে। যেমন নির্জন বনময় পথও যেন সহসা চোখে পড়ে না, তেমনি এই অল্পসংখ্যক মাইলের মধ্যে যেমন চূড়াটিও সহজে দেখা যায় না। এর বাইরে দেখা যাচ্ছে লান্সডাউনে দ্রষ্টব্য আর কিছু নেই,—কিছুই রাখাও হয়নি। কেউ যেন লান্সডাউনের আকর্ষণ খুঁজে না পায়, এই ছিল লক্ষ্য। সেই কারণে যদিও একটি সামান্য ও শৃঙ্খলাহীন ছোট হোটেল আবিষ্কার করা যায়, ভদ্র বাসস্থান কোনও মতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। বাইরের লোকের অভ্যর্থনা এখানে কোথাও নেই।

অবকাশ সঙ্কীর্ণ হয়ে এলো, ঘুরে ঘুরে জঙ্গলে নেমে যাচ্ছি, চীড়বনের ভিতর দিয়ে নেমে যাচ্ছি 'দুগাড্ডার' দিকে। একদিকে পার্বত্য অরণ্য, অন্যদিকে বিস্তৃত অতিকায় পাহাড় তার অতিপ্রাকৃত মহিমা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। ছায়াচ্ছন্নভমে পথ ঝিল্লিমুখরিত। পথের পাশে গভীর খদ, নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে 'খো' নদী। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় যেন ঘুম জড়িয়ে রয়েছে গুহার গহ্বরে পাথরে,—সেই ঘুম হাজার হাজার বছরের। চারিদিকের আকণ্ঠ স্তব্ধতার মধ্যে কোথাও যেন লুকিয়ে রয়েছে অমৃতের পরম আস্বাদ,—সেটি খুঁজে পাবার

জন্ম উৎসুক অধীর যেন ছোঁক ছোঁক করে   এবারের মতো বিদায় নিয়ে যাচ্ছি হিমালয়ের কাছে।

'উমারাওখান' নামক একটি ঘাটি পাহারা পার হলুম, এ পথ দিয়ে যাবার সময় একবার সেলাম ঠুকে 'ষোল আনা' প্রবেশমূল্য দিযে যেতে হয়েছিল। এটি পাহাড়ী ছোট বস্তি, চতুর্দিকে অরণ্য। গাড়ী কিছুক্ষণ থামে বলেই এখানে একটি চায়ের দোকান পাওয়া যায়। পাশে পাশে 'খো' নদী ব'যে চলেছে। তার ধারা কখনও বাঁ দিকে, কখনও বা দক্ষিণে। এখান থেকে 'দুগাড্ডা' পৌঁছবার মাইল দুই আগে একটি শাখাপথ চ'লে গেছে বদরিনাথের দিকে, এটি বহুদূর অবধি পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কর্ণপ্রয়াগে গিয়ে সংযুক্ত হয়েছে।

'দুগাড্ডায়' এসে পৌঁছলুম। 'খো' নদীর উপরেই একটি জনবহুল ছোট প্রাচীন শহর। এই শহরের দুদিকে গদ্দ বলেই হয়তো এর নাম দুগাড্ডা। যেটি বাজার অঞ্চল সেটির নাম 'গান্ধী চৌক'। বস্তি, নালা, ঘিঞ্জি এবং দারিদ্র্য, সমস্ত মিলিয়ে যেন হতশ্রী। এটি উপত্যকা, এবং চাষবাস আছে। অদূরের পাহাড়ে দেখা যাচ্ছে একটি শ্বেতবর্ণ শিবমন্দির, এবং 'খো' নদীর ধারে একটি মসজিদ। 'দুগাড্ডা' থেকে একটি পথ বেঁকে চলে গেছে গাড়োয়ালের প্রধান কেন্দ্র 'পৌড়ী'র দিকে। 'পৌড়ী' এখান থেকে চল্লিশ মাইল, এবং কোটদ্বার দক্ষিণে দশ মাইল মাত্র। 'খো' নদীর ধার দিয়ে দিয়েই আমাদের মোটরবাস কোটদ্বার শহরের দু মাইল দূরে এসে পৌঁছলো। এই পথটির নাম দেওয়া হয়েছে 'অশোক মার্গ', এবং আমরা যে প্রশস্ত রাজপথ ধরে 'গান্ধীভবন' নামক হোটেলে এসে পৌঁছলুম, সেটির নাম 'রবীন্দ্র মার্গ।' বস্তুত, গত পনেরো বছরের মধ্যে চারজন ব্যক্তির নামে ভারতের সংখ্যাতীত শহর এবং হিমালয়ের নানা অঞ্চলে অনেকগুলি রাজপথ উৎসর্গ করা হয়েছে. তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ. গান্ধীজি. সুভাষচন্দ্র এবং পণ্ডিত নেহরু।

অরণ্যের সীমানায় হোলো কোটদ্বার। ছোট রেলস্টেশন- তাও যেন অনেকটা বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে। শহরটি যেন মোটরবাসেরই একটি প্রধান আড্ডা। বদরিনাথের যাত্রীর কলরবে ইদানীং এই শহর গ্রীষ্মকালে মুখরিত থাকে। অধিকাংশ যাত্রী পায়ে হাঁটা তীর্থ পরিক্রমা এখন ত্যাগ করেছে, তারা গাড়ীতে যায় 'চামোলী' ছাড়িয়ে। ফলে, মধ্যপথে যে সকল যাত্রীশালা ও 'চটি' ছিল, যাত্রীদের মুখ চেয়ে সুন্দর পাহাড়ী অঞ্চলে যারা অন্নসংস্থান করতো তারা কপালে হাত দিয়ে বসেছে। মাঝপথের গ্রাম, বস্তি, মন্দির, চটি— এদের দুর্গতি বেড়ে উঠছে যেমন দিন-দিন, তেমনি যাত্রীদের পক্ষে এখন

পথের দুঃখকষ্ট ও পরিশ্রমও কমছে। তীর্থপথ অপেক্ষা তীর্থক্ষেত্রই এখন তীর্থযাত্রীদের প্রধান লক্ষ্য।

অরণ্যের সীমানা দিয়ে কোটদ্বার থেকে একটি পাকা রাস্তা চ'লে গেছে হরিদ্বারের দিকে। পঁয়ত্রিশ মাইল পথ, এবং এ পথে মোটর বাস চলে। কিন্তু অসুবিধা এই, বর্ষার ভাঙনে এ পথটি অগম্য হয়ে ওঠে, সেই কারণে নভেম্বরের মাঝামাঝির আগে এটি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এটি অরণ্যপথ এবং পাহাড়ের তলায় তলায় এঁকে বেঁকে গঙ্গার মূলধারার দিকে চ'লে গেছে। পথে ছোট বড় অনেকগুলি গিরিনদী পার হয়ে যেতে হয়।

॥ ১৪ ॥

হিমালয় শত পাকে বেঁধে রেখেছিল বহুকাল। সেই বাঁধন কাটতেও লেগে গেল অনেকদিন। বাস্ত দুই পা এবার বিশ্রাম চাইছে সেইখানে, যেখানে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে একদা যাত্রা শুরু হয়েছিল। অতএব আবার সেদিন হরিদ্বার ছাড়িয়ে এসে পৌঁছলুম হৃষিকেশে। এই হৃষিকেশেরই উত্তর প্রান্তের বিশুষ্ক চন্দ্রভাগার নুড়ি তুলে একদা কপালে ঘষে মনে মনে স্থির করেছিলুম, হিমালয় পরিক্রমা এখান থেকেই শুরু হোক। কিন্তু ঠিক এইখানে এসে সেই পরিক্রমার পরিসমাপ্তি ঘটবে, তরুণ বয়সে এ কথাটা সেদিন মনে হয়নি। জীবনের অপরাহ্ণকাল ঘনিয়ে এসেছে, বেলা আর বাকি নেই, চূড়ায় চূড়ায় রাঙারোদ্র দেখা যাচ্ছে। সুদূর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বিহঙ্গের ডানায় এসেছে ক্লান্তি। সৌরবিশ্বব্যোমের অনন্ত নিদ্রা তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। এবার বিদায় নেবো।

ঝোলাঝুলি নিয়ে দাঁড়ালুম পথে। কর্কশ পাথর কাঁকরের রুক্ষরৌদ্রপথ, কিন্তু এর টান হোলো জীবনজোড়া। কতবার এসেছি এখানে, সংখ্যা গণনা করিনি। যতবার গান গেয়েছি, সব শেষে সমে এসে ঠেকেছি এই হৃষিকেশে। দুঃখে অপমানে আঘাতে নরকযন্ত্রণায় কতবার অভিশপ্ত পৃথিবীকে ফেলে পালিয়ে এসেছি এখানে,—সহসা পরম বিস্ময় যেন তার রহস্য তোরণদ্বার খুলে ভিতরে ডেকে নিয়েছে। ঝোলাঝুলিকেও মনে হয়েছে বাধা, ফেলে চ'লে গেছি বার বার,- কিন্তু একবারও হারায়নি, এই দুঃখ। এখানে আজ দেখতে দেখতে পাকাবাড়ী উঠে গেল অনেকগুলি, আধুনিকের অনেক ছাঁচ এসে পৌঁছে গেল, সেতু বাঁধা হোলো চন্দ্রভাগায়, রাস্তা পাকা হোলো নানাস্থলে, দোকানপাট আর বাজার ব'সে গেল যেখানে সেখানে, রেলপথ এসে পৌঁছলো 'রাড়েওয়ালা' থেকে,

মোটরবাস হাঁসফাঁস ক'রে ছুটে এলো নানাদিক থেকে। এখানেও কালের চাকার সঙ্গে কলের চাকা ঘুরলো। সেই হৃষিকেশকে আজকে যেন আর চিনতে পারা যায় না।

'কালীকম্লীবাবার' বিরাট ইমারতের পূর্বপাশ দিয়ে অতি পরিচিত পথটি গেছে ঘাটের দিকে, এরই উপর একটি ছবির দোকানের পিছনে থাকতেন সেই আত্মানন্দ, কে যেন তাকে এনে দিত 'সত্রত' থেকে খান চারেক রুটি আর একটু ডাল,— ওই খেয়ে তিনি রইলেন [illegible] বছর। তার দেশ ছিল মধ্যভারতে এবং দু'খানা ছেঁড়া কম্বল ছিল ভরসা। সন্ধ্যার পরে একটি মোমবাতি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসতুম। সেই মোমবাতির আলোয় জ্বলজ্বলে দুটো চোখ মেলে আত্মানন্দ উঠে বসতেন। তখন রাত্রির নীলধারার ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ আসতো ঘরের পাথরে দেওয়ালের ফাটলে ফাটলে, আর ছবির দোকান থেকে লছমনের বুড়ি পিসি দোলাই গায়ে জড়িয়ে গুটি গুটি আসতো গরম কলকেটি হাতে নিয়ে, আত্মানন্দ তখন আরম্ভ করতেন শোনাতে তাঁর যোগসাধনার কথা। একে একে আসতো চৈতন্য আর অধ্যাত্মবাদ, বুদ্ধের চক্ষু থেকে [illegible] নামতো আমিও মুগ্ধমনে বসে থাকতুম। মোমবাতি গলে গলে যেতো, গঙ্গার বাতাসে মাঝে মাঝে কোথাও বেজে উঠতো ঘণ্টা, কোথাও বা উদার গম্ভীর কণ্ঠে শোনা যেতো ব্যোম শঙ্কর, ব্যোম শম্ভু।

কিছুকাল পরে একবার গিয়ে শুনি, বাড়ো বাবা আত্মানন্দ [illegible] মারা গেছে, এবং ছবির দোকান তুলে দিয়ে লছমন গিয়ে বাসা নিয়েছে [illegible] ষ্টেশনে। ওখানে বসে এখন [illegible] তেলের খেলনার দোকান।

১৩৩৬ সালে যখন একবার আসি হৃষিকেশে, দেখি [illegible] তখন কালীকম্লীর [illegible] চলতে [illegible] ধুমধাম করে [illegible] নিঃসঙ্গ, ভাঙা ভাঙা পুরনো [illegible] ছিল [illegible] — বাড়ীর কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ, [illegible] যায় না। সেই কালের ওই এক অন্ধকার খুপরি থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিল এক অতি সুশ্রী ধনবান যুবক। আমারই সমবয়সী, কিছু বড় হ'তে পারে। নাম কিশোর জৈন, বাড়ী তার আওরঙ্গাবাদে। প্রণাম ক'রে দিল সে আমাকে যখন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো। নাবালক বয়সে বাড়ীর লোকের সঙ্গে আমি যবে গিয়েছিলুম একবার তারকনাথে, কিশোর জৈন নাকি আমাকে দেখেছিল তারকনাথে,— সেখানে সে বাপের অসুখে হত্যা ধরনা দিতে গিয়েছিল। আমার মনে নেই, কিন্তু কিশোর ভোলেনি। সে যাত্রায় তিনদিন ধরনা দিয়ে 'ওষুধ' সে পেয়েছিল, সেই ওষুধের জন্য নাকি তার বাবা বেঁচেছিল

পরবর্তী পাঁচ বছর। কিশোর আমাকে কিছু ভাবতে দিলে না, এখানে তার আসার উদ্দেশ্য কি জানতে দিল না। কেবল দিন আষ্টেক ধরে ঘূর্ণীবাত্যায় আমাকে টান মেরে উড়িয়ে নিয়ে ঘুরলো এ-পাহাড়ে আর ও-পাহাড়ে, ঘুরলো নীলধারার তীরে তীরে সাধুদের আশ্রমের আনাচে কানাচে। নিয়ে গেল সেই কনখলের আশ্রমে আর গুরুকুলে; নিয়ে গেল দক্ষঘাটে, আর ওই তার দক্ষিণ দিকে 'সতীসমাধি ক্ষেত্রে',—সেটির নাম 'সতীকুণ্ড', যেখানে অগণিত সতীমেয়ের অস্থি ও চিতা ভস্মের উপরে স্মৃতিফলক বানানো। নিয়ে গেল তেলের আলো-জ্বালা হরিদ্বারের অন্ধকার পথে পথে। রাত্রিবাস করতে লাগলো যে কোনও ধর্মশালায়। পান আর জর্দা খাচ্ছে সে প্রচুর, পানের রস গড়াচ্ছে তার গরদের জামায়, ধুলোয় আর মালিন্যে ওই পরম সুন্দর রূপ জ্'লে পুড়ে যাচ্ছে। টাকা পয়সা খরচ করছে অজস্র, প্রয়োজনের বহু অতিরিক্ত। তার হাসিতে আর প্রাণের প্রাচুর্যে পথঘাট মুখরিত। আমি নাকি পৃথিবীতে তার একমাত্র বন্ধু। মোতি বাজারের কোণে এক পানের দোকানে তার নাম হয়ে গেল, 'পানওয়া শেঠ'। সত্যি বলতে কি অত পান খাওয়া সে বয়স অবধি আমি দেখিনি। তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলুম তিন সপ্তাহ পর। কিশোর তার উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য আমার মনে গভীর রেখা টেনেছিল।

পর-পর দু'বার আবার গেলুম হৃষিকেশে,—কিশোর জৈনকে পাওয়া গেল না। ওর মনের মধ্যে আত্মনাশের বীজ ছিল জানতুম। একথাও মনে হোতো, ওর একটা পরম মূল্যবান কথা আমার কাছে যেন চেপে রাখলো। আমার অনেকদিনের অনেক প্রশ্ন কিশোর এড়িয়ে গেছে। আমার ধারণা, ওর কোনও একটা পারিবারিক কলঙ্ক ছিল। কিন্তু শিক্ষিত যুবক ব'লেই সেটা আমার কাছে প্রকাশ করেনি।

কিন্তু সেই-ই শেষ নয়। ডায়েরীতে দেখছি, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বরে ওর সঙ্গে শেষবার দেখা। ওই পথে 'সত্যনারায়ণের' মন্দিরে গাছপালার ছায়ায় ব'সে যে ব্যক্তি ভাঙা গলায় ভজন গান করছিল, সহসা সবিস্ময়ে লক্ষ্য ক'রে দেখি, সে ব্যক্তি কিশোর জৈনের প্রেতমূর্তি। বয়স ত্রিশ হ'তে তখনও অনেক বাকি, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ষাট হ'তে দেরি নেই। এক মুখ দাড়িগোঁফ, ময়লা তামার পয়সার মতো গায়ের রং, শীর্ণকায় চেহারা, রাশিকৃত ময়লাচুল ঝুলে পড়েছে মাথার চারিদিক থেকে। সেই পদ্মপলাশ চক্ষু আজ দেখলে ভয় করে,—যেন গিলতে আসছে। যাত্রীদের কাছে বোধ হয় কিছু ভিক্ষার আশায় ছিল। আমার ধারণা, আমাকে সে লক্ষ্য করেনি। আমি আত্মগোপন ক'রে ছিলুম।

দু-চারজন ভিক্ষা অবশ্য দিল। কিন্তু যাত্রীদের মধ্যে একজন হঠাৎ ওর দিকে একটুখানি মনোনিবেশ ক'রে তাকাতেই ও যেন আগুন হয়ে উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ বিশ্রী গালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। কিন্তু হট্টগোল বাধবার আগেই মন্দিরের চত্বর থেকে ছুটে এলো একজন সেবক। উভয়ের মাঝখানে পড়ে থামিয়ে দিয়ে সে কিশোরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পথে বার ক'রে দিয়ে এলো। তারপর সেই ভদ্রলোকটিকে বললে, উনকো দেমাক ঠিক নহি হ্যায়, শেঠজি। বেহুঁশ আদ্‌মি হু'।

পা দুখানা পাথর হয়ে গিয়েছিল। কিশোর জৈন বার দুই ফিরে-ফিরে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো। তার সেই খুনে চেহারা লক্ষ্য ক'রে কেউ কেউ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেবকটির কাছে খবর নিয়ে জানলুম, ও হোলো এক বৈরেগী, এই অঞ্চলেই থাকে। তবে ওর মাথার কিছু দোষ আছে। লোকটা ক্ষয়রোগে ভুগছে, এবং রাস্তাঘাটে প'ড়ে থাকে।—এইটুকুর মধ্যেই কিশোর জৈনের সমস্ত জীবনের পরিচয় ধরা রয়েছে।

কিশোর জৈনের জন্য কাঁদবার কেউ থাকলে সেদিন আমিও কাঁদতাম বৈকি।

*

* *

মীনবাহিনী গঙ্গার নীলধারা হিমালয়ের জটিল জটাবন্ধন খুলে ছুটে নেমে এসেছেন হৃষিকেশে,—প্রথম মর্ত্যলোকে নেমেছেন জাহ্নবী। যত গঙ্গা আছে উত্তরে,—সকলকে ধারণ করেছেন তিনি আপন নীলধারায়। যদি কেউ বলে এটি স্বর্গ আর মর্ত্যের সন্ধিস্থল,—বিশ্বাস ক'রে নেবো। এই নীলধারার ঘাটে ব'সে অনেকদিনের বেলা গিয়েছে কেটে,—অনেক সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে রাত্রে। এই হৃষিকেশের ঘাটে নেমে অবগাহন করেছে ভারতের সকল সম্প্রদায়—মারাঠী, মাদ্রাজী, গুজরাটী, বিহারী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, উত্তর প্রদেশী—সবাই। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা বলে, হৃষিকেশের সর্বাপেক্ষা ভক্ত হোলো বাঙালী। বাঙালীর আশ্রম, বাঙালীর প্রতিষ্ঠান, বাঙালীর সেবা ও শিক্ষাদান, এ অঞ্চলে সুবিদিত। হৃষিকেশ এবং লছমনঝুলা অঞ্চলে বাঙালীর একাধিক ভূসম্পত্তি আজও রয়েছে, এবং লছমনঝুলার নিকটবর্তী সর্বাপেক্ষা মনোরম অঞ্চলে পাহাড়ের কিনারায় দুখানি বাঙালীর বাড়ী আজও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রামকৃষ্ণ মিশনের ঔষধ বিতরণের কেন্দ্রটির কথা কে না জানে? স্বর্গাশ্রমের পথে বহু বাঙালী সাধু এবং শিক্ষিত ব্যক্তি আত্মপরিচয় গোপন ক'রে অধ্যাত্ম তপস্যায় রত আছেন,—একথা কারো অবিদিত নেই। তাঁরা ভিন্ন ভাষা

এবং অবাঙ্গালী পরিচ্ছদের অন্তরালে নির্জন পাহাড়ের আশেপাশে কুটীর বানিয়ে থেকে গেছেন অনেককাল। ১৯৪১ সালের এক সময়ের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। এক প্রৌঢ়া বাঙালী গৃহিণী এই অঞ্চলে খুঁজতে খুঁজতে এসে তাঁর গৃহত্যাগী স্বামীকে সাধুর বেশে সহসা এক কুটীরে নাকি দেখতে পান। স্বামী তখন যোগসাধনায় নিমীলিতনেত্র ছিলেন। কিন্তু চোখ খুলে তিনি তাঁর গৃহিণীকে সহসা সামনে দেখেই আঁতকিয়ে ওঠেন, এবং উঠে দাঁড়িয়ে ভগ্নকণ্ঠে চেঁচান, তুমি এখানেও ধাওয়া করেছ?—ওই ব'লে তিনি পাগলের মতো একদিকে ছুটতে থাকেন। স্ত্রী এবং কর্তার শ্যালক অনেক ছুটোছুটি ক'রে বুঝি পুলিশের সাহায্যে তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুদিন পরে সেই ব্যক্তির মৃতদেহ গঙ্গার জলে পাওয়া যায়। দু তিনখানা বড় বড় পাথরের খাঁজে লাসটি আটকে ছিল।

কালীকম্বলীর নীচের তলাকার সেই পশ্চিমের এঁদো ঘরখানায় একদা এসে উঠেছিলেন কাশীর পাঁড়ে হাউলীর পুষ্পদিদিরা। বিধবা পুষ্পদিদির সঙ্গে ছিল তাঁদের আত্মীয়া বিষ্ণুপুরের স্নেহলতা। স্নেহলতার চোখ ছিল কটা, পরনে থাকতো খদ্দরের থান, মানুষটা ছিল ক্ষণমর্জী এবং একগুঁয়ে। শাসন মানতো না স্নেহলতা, এবং সবলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও এই নীলধারার তুহিন ঠাণ্ডা জলে সে সাঁতার দেবার চেষ্টা পেতো। নিজের বয়স এবং বৈধব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অচেতন ছিল। কায়স্থের মেয়ে ছিল সে, সুতরাং পুষ্পদিদির শাশুড়ী একদিন তাকে ইঙ্গিতে মানা করেন, ব্রাহ্মণের রান্না জিনিস ছুঁতে নেই। সেই অপমানে স্নেহলতা পাশের ঘরে গিয়ে উপুড় হয়ে কাঁদতে থাকে সারাদিন। সন্ধ্যার সময়ও দেখি, সে একা ঘরে প'ড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। সান্ত্বনা দিতে গেলুম, সে ধমক দিয়ে উঠলো। কিন্তু এক সময় নিজেই সে উঠে বসলো। সারাদিন কেঁদে-কেঁদে মুখখানা ফুলেছে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললো, তীর্থে সে আসেনি, তীর্থের বয়স তার হয়নি—সে জানে। সে এসেছে তার স্বামীর সন্ধান পাবার জন্য। স্বামীর অকাল মৃত্যুর কালে স্নেহলতা নাকি তাকে দেখতে পায়নি।

আরেকবার তাকে দেখেছিলুম কলকাতায় হাজার হাজার নরনারীর ভিড়ের মধ্যে। পরনে ময়লা খদ্দরের থান, ধুলোয় ভরা দুই পা, কালিবর্ণ গায়ের রং, খড়ের আঁটির মতো মাথার চুল, কোমরে একটি ছোট্ট পুঁটলী, শীর্ণকায় চেহারা,—স্নেহলতা—একা যেন কোন্‌দিকে চলেছে হনহনিয়ে। ভিড়ের মধ্যে সে হারিয়ে গেল।

স্নেহলতার স্বামী-অন্বেষণের এই কাহিনীটি নিয়ে কবে যেন কোন্ কাগজে একটি ছোট লেখা লিখেছিলুম, —সেই লেখাটা আর খুঁজেও পাইনি।

এই 'কালীকম্বলীর' সদাব্রতের রান্নামহলটি দেখলে আজও অবাক হই। বিশাল এক চুল্লি, তদবিধ তার চালের কড়াই আর বিস্তৃত তার আটা ছানবার পাত্র, বিপুল পরিমাণ খাদ্যবিতরণের ব্যবস্থা। আয়োজনের ব্যাপারটা আগাগোড়া সমস্তই বৃহৎ। বৈরাগী, সন্ন্যাসী, সাধক,—এরা বিনামূল্যে খেতে পাবে। কেউ ব'সে খাবে, কেউ নিয়ে যাবে, কেউ বা রসদ নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে প্রস্তুত ক'রে খাবে। যতদূর যাও গাড়োয়ালের, কালীকম্বলীর 'সদাব্রত' যেখানে সেখানে। এখানে মেডিকুকুরের দল ছোক ছোক ক'রে ভিতরে আসে, আসে বেপরোয়া পাহাড়ী বানরের পাল, আসে পরিচয়হীন সর্বহারা অজানা দেশের দুর্বোধ্য ভাষাভাষী মানুষ,— অনেকেই এসে তাদের অস্থায়ী বাসা বাঁধে এই বিশালায়তন প্রাচীন ইমারতের গুহায় গুহায়। কখনও কখনও ঘরে খুঁজে পাওয়া যায় একখানা ছেঁড়া কম্বল বা চাটাই, কোথাও একখানা গেরুয়া লেংটি কিংবা টিনের কৌটা, হয়তো কোনও নিরুদ্দেশ বৈরাগীর পরিত্যক্ত পুঁটলী, কোনও তীর্থযাত্রীর উনুনের পোড়া কাঠ কিংবা ভাঙা মাটির ঘট। এরই একটা ঘরে ম'রে পড়েছিল পণ্ডিত শীতলাপ্রসাদ, তারই ছেঁড়া কম্বল, গামছা আর রবারের জুতোজোড়াটি নিয়ে গা ঢাকা দিল এক বৈরাগী। আবার এখানকারই ওই দোতলার চাতালে এক আমাশয়গ্রস্ত বৃদ্ধ গৌরনন্দনকে ফেলে পালিয়েছিল তার সহযাত্রীরা। ওরই পাশের ঘরখানায় এসে উঠেছিলেন কলকাতার এক 'রায়বাহাদুর' তার জন পাঁচেক চাকরদাসী নিয়ে। সেদিন তাঁর প্রতাপে এই প্রাচীন ইমারত কেঁপে উঠেছিল। এসেছিল উদাসী আখড়ার সন্ত রামাদাস- একখানা ছবি টাঙিয়ে তার দিকে চেয়ে সে হাসতো আর কাঁদতো। আর এসেছিলেন নাগপুর থেকে আপ্পল বাঈ তার সঙ্গে ছিলেন চারজন জামাই, নয়টি সাবালক পুত্রকন্যা, এবং গুনে দেখেছিলুম, চৌদ্দটি নাতিনাতনী। তাঁদের দেখে স্থানীয় একটি লোক গঙ্গার ধারে তাড়াতাড়ি একটি পুরি আর তরকারির দোকান বানালো। ওরা সবাই দাঁড়ুড়ে খেয়েছে যত, তার চেয়ে বেশি বানর তাড়িয়েছে। তারপর সবাই যেদিন চ'লে গেল, দেখা গেল সমস্ত ঝুপসি ঘরখানার দেওয়ালগুলিতে কাঠকয়লার অসংখ্য আঁচড়ে ওদের বৃহৎ গোষ্ঠী ও বংশাবলীর নাম লেখা। অঙ্গারের সেই পাণ্ডুলিপি হয়তো আজও মোছেনি।

সন্ন্যাসীর কোনও জাত নেই,—ওরা সমস্ত মুছে দিয়ে হৃষিকেশে চ'লে এসেছে। ওরা আছে চারিদিকে ছড়িয়ে—পাহাড়ের পাশে, নদীর বাঁকে,

পাহাড়তলীর গুহায়, মুনি কি রেতির তপোবনে, বাধা নিয়মের আশ্রমে, মন্দিরের চাতালে,—এবং লোকলোচন ও জনকোলাহলের বাইরে। মাঝে মাঝে কোনও পর্ব উপলক্ষ্যে ওদের দেখতে পাওয়া যায়। দশহরায়, অক্ষয় তৃতীয়ায়, মাঘী অমাবস্যায়, রামনবমীতে, জন্মাষ্টমীতে, শিবরাত্রিতে ইত্যাদি তিথিতে ওরা শতে শতে বেরিয়ে আসে। ওদের ওই গেরুয়ার বর্ণে আর চেহারার সমগ্র ছবিতে পাহাড়তলী আর নীলধারার মনোবিমোহন সৌন্দর্য— সব মিলে দূরের থেকে মনে হয়, চার পাঁচ হাজার বছর আগের ইতিহাসে যেন পিছিয়ে গেছি, যখন আর্যরা নেমে আসছে নদীপথের সূত্র ধরে ভারত সভ্যতার প্রথম উদ্বোধন করতে। সমগ্র পাহাড়ের কোণগুলি, নদীতীর, মন্দির ও আশ্রম অঙ্গন,—সব যেন রক্তবর্ণে ভরে ওঠে। পরপর আবার আসে কুম্ভমেলার সময়। বিশাল ভারতের সকল অঞ্চল থেকে সহস্র সহস্র সাধু এসে পৌঁছয় এই 'গঙ্গাবতরণ' অঞ্চলে, তখন হৃষিকেশ, কনখল আর হরিদ্বার সব একাকার। ওঙ্কারধ্বনি ওঠে তখন হাজার হাজার কণ্ঠে।

[illegible] শপথে এদিন এসে পৌঁছেছিলেন গান্ধীজীর অনুগতা শিষ্যা ইংরেজ নারী শ্রীমতী মীরাবেন। তিনি বনযোগিনী, তাই গুরুর নির্দেশ পালন করতে এসেছিলেন এখানে। তিনি এখানে একটি গোশালা গ'ড়ে তোলেন গঙ্গার কোল প্রান্তপ্রাঙ্গে, সেটি গো ও [illegible]। তিনি নাকি সম্প্রতি ঐ গোশালার উদ্বোধন করেছেন হিমালয়ের আর একটি গহন অঞ্চলে গিয়ে, শুনতে পাই। এটি তার সাধনারই একটি অঙ্গ, —সমস্ত পরিচয় মুছে দিয়ে সংসারের খ্যাতির বাইরে গিয়ে একটি বনজীবনের পরম সার্থকতার পথ বেছে নেওয়া, বৈদেশিনীর পক্ষে বিচিত্র বৈকি! তবু তিনি একা নন,— ইংরেজ, জর্মান, ফরাসী, মার্কিন, ইতালীয়, হাঙ্গেরীয়, অনেক দেশ থেকে এসেছে জ্ঞানপিপাসু, [illegible], দার্শনিক, সাধু। তারা ছড়িয়ে আছে হিমালয়ের নানা অঞ্চলে। তাদের অনেকেই রয়েছে হৃষিকেশের এখানে ওখানে। মোটরবাসের ধুলো, পাঠকের কৌতূহলী চক্ষু, বাস্তব জীবনের লাভক্ষতি টানাটানির কোলাহল, এরা তাদের আশ্রম পর্যন্ত পৌঁছয় না। আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ অবধি বহু সাধু সন্ন্যাসীর কুটিরদ্বার রুদ্ধ থাকে। অনেকে স'রে যায় দূর পাহাড়ের দিকে,—কারণ এই সময়টায় থাকে বায়ুবিলাসী ও স্বাস্থ্যান্বেষীর জনতা,—তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নরনারী নোংরা কৌতূহল আর প্রমোদপ্রবৃত্তি নিয়ে ওদের আনাচে কানাচে ঘুরে ওদের অস্থির ক'রে তোলে। তথাকথিত সভ্য আর শিক্ষিতকে দেখলে ওরা ত্রস্ত হয়। ওরা থাকে জীবনজোড়া জিজ্ঞাসা নিয়ে, অধ্যাত্মের তত্ত্বানুসন্ধানে ওদের দিন কাটে,

ওদের প্রাণচৈতন্য আকাশের তারায় তারায় নিবিড় অস্থির পিপাসা-বিন্দুর মতো নিত্য ঘুরে বেড়ায়,—তোমার-আমার ক্ষুদ্র কৌতূহল পিপীলিকার দংশনের মতো ওদের নিকট বিরক্তিকর।

নীলকণ্ঠ পর্বতের নীচে দুই বিশাল পাহাড়ের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে দিগ্বিজয়িনী নীলবর্ণা গঙ্গা ছুটে এসেছেন মর্ত্যে তাঁর নাচের ঝঙ্কার তুলে,—সেই ঝঙ্কার-ঝনকে হৃষিকেশ নিত্যকাল ধরে মুখরিত। হিমালয়ের প্রস্তর-চক্রান্ত হার মেনেছে তাঁর কাছে। অতিকায় পাথরের অন্তরায়, উত্তুঙ্গ উচ্চতার বাধা,—এরা তাঁর দুরন্ত রণরঙ্গের কাছে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, একে একে তিনি ব্রহ্মলোক দেবলোক তপোলোক পেরিয়ে ছুটে এসেছেন মর্ত্যে মানবসংসারের দিকে। কিন্তু শূন্য হস্তে তিনি নেমে আসেননি। ওই অমৃত-রসধারার সঙ্গে এনেছেন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলমন্ত্র। হৃষিকেশ হোলো সেই প্রথম মর্ত্যভূমি যেখানে গঙ্গার ঝঙ্কারে শোনা যায় ভাগীরথীর প্রথম প্রতিজ্ঞার ভাষা,— তিনি প্রাণের দ্বারা প্লাবিত করবেন আর্যসভ্যতাকে, কোটি কোটি নরনারীর প্রত্যহের জীবনকে তিনি সঞ্জীবিত করবেন, তিনি আনবেন শুচিতা, স্বাস্থ্য, আয়ু, আনন্দ ও কল্যাণ। জাহ্নবীধারার দুই প্রান্তে জন্ম নিয়েছে নগর সভ্যতা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, বিবিধ শিল্পকলা, সাহিত্য ও মহাকাব্য। গঙ্গার মূলধারা ও তার শাখা নদী উপনদীর কূলে কূলে চিরকাল জন্ম নিয়েছে অতিমানব, সাধক, শিল্পী, মহাকবি, দার্শনিক ও তত্ত্ববিদ। সেই গঙ্গার প্রথম অবতরণক্ষেত্র হোলো এই ব্রহ্মপুরী গাড়োয়ালের ভূস্বর্গপ্রান্ত হৃষিকেশ।

ওই হৃষিকেশের ঘাটে আমার চন্দ্রপক্ষ কেটে গেছে কতবার। ওই নীলধারার আকুলিবিকুলির মধ্যে বিগলিত চন্দ্র কেঁদে-কেঁদে বয়ে গেছে যুগযুগান্তর। পাথরের আসনে ব'সে দেহতত্ত্বের গান গেয়ে উঠে গেছে জীবনবৈরাগী, রাতজাগা কোন্ অস্থির পাখী হিমালয়ের অনন্ত আনন্দ মহিমার সংবাদ বিতরণ করেছে আমার কানে কানে। বটের ঝুরির নীচে সন্ন্যাসী তার ধুনি জ্বালিয়ে বসে তন্দ্রাজড়ানো কণ্ঠে শিবশম্ভোর উদ্দেশ্যে ডাক দিচ্ছে, দূর কোনও দেবালয়ে বেজে যাচ্ছে মৃদু উদাত্ত ঘণ্টারব। তখন ওই জ্যোৎস্নার নীচে প্রতি ছায়াচারীকে মনে হয়েছে দেবতার প্রতীক, প্রতি সন্ন্যাসীকে মনে হয়েছে অজর অমর মহর্ষি বেদব্যাস, প্রতি পাথর হয়েছে শিবলিঙ্গ, প্রতিটি ধুনিকে মনে হয়েছে তপোবনের হোমাগ্নি আভা।

স্বর্ণলঙ্কার রাজা রাবণ ছিলেন ত্রিভুবনবিজয়ী, তাঁকে সম্রাট বলতে বাধে না। তিনি ছিলেন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, এবং আনুষ্ঠানিক। দশদিকে তাঁর সজাগ

দৃষ্টি ছিল, তাই তিনি দশমুণ্ড। তিনি সাধক, পণ্ডিত, প্রেমিক ও বুদ্ধিমান ছিলেন। শক্তি ও সাধ্যে তিনি ছিলেন অজেয়, তাঁর বীর্যবত্তা কৈলাস পর্বতের প্রান্ত থেকে শ্রীলঙ্কা অবধি সুবিদিত ছিল। ব্যক্তিত্বে, বিক্রমে, প্রবল প্রতিষ্ঠায়, অনন্যসাধারণ রণকৌশলে তৎকালে তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ছিল কঠিন। আত্মশক্তির প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট। কিন্তু শক্তি তাঁর আসুরিক, দৈব নয়,—ওইখানেই ছিল বিতর্ক। তাঁর রাজনীতির মূল আদর্শটা দাঁড়িয়েছিল স্বৈরাচার হিংসার উপরে, সেটা উদারনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল না। সম্ভবত আর্যজাতির সঙ্গে তাঁর বিরোধের মূল কারণ ছিল এইখানে। আর্যরা চেয়েছিল সর্বভারতীয় ঐক্য, তিনি চেয়েছিলেন অসুর-শক্তির প্রভুত্ব। সুতরাং রাম-রাবণের যে সংগ্রাম সেটি নর এবং বানরের গদাযুদ্ধে কৌতুকের মধ্যে শেষ হয়নি, সেটি ছিল সকল দেশের চিরকালীন রাষ্ট্র ও সমাজের ন্যায়নীতি ও আদর্শের বিশাল পরীক্ষার ক্ষেত্র। ভারত সংস্কৃতির এই মূল ভাষ্যটি বিবর্তিত হয়ে এসেছে কল্পে ও কল্পান্তে। পুরাণে, ইতিহাসে, আধুনিকে এরই পুনরাবৃত্তি। প্রাক্‌বৈদিক যুগে সমুদ্রমন্থনে মহাদেবকে যে হলাহল পান করতে হয়েছিল, একালে এসে গান্ধীজীকেও প্রায় সেই প্রকার বিষ গলাধঃকরণ করতে দেখি।

রক্ষকুলপতিকে সংহার করে আর্যজাতির নেতা সদলবলে এসেছিলেন হৃষিকেশে। এই হৃষিকেশে পৌঁছে রাজা রামচন্দ্র শিবের তপস্যা করেছিলেন,—দেবাসুরের সংগ্রাম কালে যিনি হলাহল পান করে হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। সম্ভবত নীলকণ্ঠই রামচন্দ্রকে এই নির্দেশ দেন, ব্রাহ্মণকে তুমি হত্যা করেছ, সেজন্য তোমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। রামচন্দ্র হৃষিকেশ থেকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে 'তপোলোকের' প্রান্তে গিয়ে দেবপ্রয়াগে উপস্থিত হন এবং গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদানকালে বোধ করি ব্রহ্মহত্যারও প্রায়শ্চিত্ত করেন। ব্রহ্মপুরার পথে এই হৃষিকেশ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় ভরতজীর মন্দির, লছমনঝুলার সাঁকোর পাশেই লক্ষণের মন্দির, মুনি তথা 'মৌনি-কি-রেতির' তপোবনে শত্রুঘ্নজীর মন্দির এবং দেবপ্রয়াগে রয়েছে রামচন্দ্রের মন্দির।

পরবর্তী যুগে মহর্ষি বেদব্যাস এসে হৃষিকেশে আসন নিয়েছিলেন। তিনি এখানে দুটি প্রধান কর্ম সম্পাদন করেন। প্রথমটি হোলো বেদবিভক্তি। বেদকে তিনি এখানে বসে চারভাগে ভাগ করেন। তাঁর দ্বিতীয় কর্ম হ'লো 'কেদারখণ্ড' রচনা। সম্ভবত কেদারখণ্ডের দ্বিতীয় নাম শিবপুরাণ। কিন্তু এই রচনায় শিবস্তোত্রই প্রধান নয়, এটি হোলো সমগ্র ব্রহ্মপুরা তথা গাড়োয়ালের

একটি প্রামাণ্য এবং পরোক্ষ মানচিত্র। পৌরাণিক কালের কাহিনী এবং ভূগোলের এমন সার্থক পরিচয় বোধ হয় অপর, কোনও গ্রন্থে নেই। সেই কারণে মহাভারতের পাশে দাঁড়িয়ে এই 'কেদারখণ্ড' আপন স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য এত কাল ধ'রে বজায় রেখে এসেছে। জনৈক পণ্ডিত এই গ্রন্থখানির আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এখানি গাড়োয়ালের সর্বশ্রেষ্ঠ 'গেজেটিয়র'। গাড়োয়ালের প্রায় প্রত্যেকটি প্রাচীন তীর্থপথ এবং দেবস্থান 'কেদারখণ্ডে' উল্লিখিত রয়েছে।

হৃষিকেশ ছাড়িয়ে উত্তর দিকে পা বাড়ালেই চন্দ্রভাগার ধারা। এই গিরিনদীটির অপর কোনও পৃথক নাম আছে কিনা আমি শুনিনি। বৎসরের অধিকাংশকাল এই ধারাটি প্রায় শুষ্ক এবং পাথরের প্রচুর জটলায় আকীর্ণ থাকে, কিন্তু বর্ষায় এই নদীতে ঢল নামে। সম্প্রতি কয়েক বছর হোলো এর উপরে সাঁকো নির্মাণ করা হয়েছে, এবং এখান দিয়ে মোটররাস্তা শিবানন্দপুরী হয়ে দেবপ্রয়াগের দিকে যায়। এই মোটরপথে বিগত কয়েক বছরে কয়েকটি অপঘাতও হয়ে গেছে। যাই হোক, এই সাঁকো পেরিয়ে আন্দাজ মাইল দেড়েক পাহাড়ের ভিতরে এগিয়ে গেলে এক সময় ডান দিকে লছমনঝুলার পথ। এই পথের বাঁ দিকে সম্প্রতি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ওঠার জন্য একটি সোপানশ্রেণী নির্মিত হয়েছে এবং মন্দিরের উপরে গিয়ে দাড়ালে গঙ্গার ওপারে স্বর্গাশ্রমের মন্দিরটিকে বড় সুন্দর মনে হয়। মানুষের মহৎ ভাবনাকে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিরকাল ধ'রে কত সহায়তা ক'রে এসেছে, এই অঞ্চলটিতে আনাগোনা করলে তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। হৃষিকেশের প্রায় প্রত্যেক যাত্রী এই অঞ্চলে লছমনঝুলার সাঁকো পেরিয়ে ডানপথে সাধকদের আশ্রম দেখতে দেখতে স্বর্গাশ্রমের প্রশস্ত মন্দির প্রাঙ্গণে নানা প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হন, এবং আধুনিককালের ছোঁয়াচ দেখে থমকিয়ে যান। অতঃপর বিনামূল্যে নৌকাযোগে নদী পার হয়ে তাঁরা আবার হৃষিকেশে ফেরেন। এই পরিক্রমাটি খুবই আনন্দদায়ক। সম্প্রতি এই অঞ্চলের পূর্ব পাহাড়তলীতে মহেশ যোগী নামক এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি এক ব্যয়বহুল আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে তিনি তাঁর মার্কিন ও অন্যান্য বিদেশী শিষ্যদের 'জ্ঞানাতীত যোগ' (**transcendental meditation**) শিক্ষা দেন। তাঁর নিজস্ব একখানা বিমানও নাকি আছে। সেই বিমান যোগে তার প্রায়শঃ ইউরোপ আমেরিকা আনাগোনা করাটা ভারত গভর্ণমেণ্ট কিছু সংশয়ের চক্ষে দেখেন কিনা, আমার জানা নেই।

সে যাই হোক, পথটি কেবল যে মনোরম তাই নয়। হৃষিকেশ থেকেই

যেন আধুনিক ভারত রহস্য-রূপান্তরিত হয় প্রাচীন ভারতে। একটি আদি-অন্তহীন কালের হাওয়া লাগে গায়ে। নির্জন পাহাড়ের মধ্যে পাখীর ডাকে, উদাস হাওয়ায় এবং নদীর কলধ্বনিতে—এমন একটি মধুর অবসাদের ক্লান্ত সুর মনের মধ্যে কাঁদতে থাকে, যেটি অনির্বচনীয়। হিমালয়ের হাজার হাজার বর্গমাইলের মধ্যে এইপ্রকার পর্বতরহস্যনির্গত নদীপ্রকৃতির শোভা আছে শত শত,—কিন্তু তারা এখানকার মতো এমন অধ্যাত্ম আনন্দের মহিমা ধারণ করে না। হিমালয়ে শত সহস্র পার্বত্যভূভাগ আছে যেগুলি পরম বিস্ময়ের ক্ষেত্র, যেখানকার অপার্থিব রূপ দেখলে রুদ্ধশ্বাস হতে হয়। এমন অগণ্য উপত্যকাপথ আছে,—যেখানে গিয়ে দাঁড়ালে চক্ষু অপলক হয়, এবং পর্যটক হয় হতবাক,—কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। এটি যেন অধ্যাত্ম ভারতের প্রথম প্রবেশপথ। এখানে পদার্পণ করামাত্র অনুভব করা যায় অতি পরিচিত বাস্তব জীবনের সর্বপ্রকার অভ্যস্ত সংস্কারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছি। এসে দাঁড়িয়েছি নরলোক এবং তপোলোকের সন্ধিস্থলে। যে কেউ একটি বারের জন্য এ অঞ্চলে এলেই হোলো। সমস্ত বাকি জীবনের মধ্যে এর স্মৃতি ক্ষুধার মতো ঘুরে বেড়ায়। অনেককাল আগে এই অঞ্চলে এক অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁর নাম শিউদৎ ত্রিপাঠী। তিনি এক সময় কিছুকালের জন্য লাহোরের কলেজে পড়াতেন। পণ্ডিত সুরসিক, কিন্তু ভয়ানক নাস্তিক। কোনও বিষয়ে তর্ক করতেন না, কিন্তু দু'চার কথায় তাঁর কঠোর নাস্তিকতা প্রকাশ পেতো। একদা স্বর্গাশ্রমের একটি গাছের ছায়ার নীচে বসে তিনি বললেন, আমাদের মন হোলো আধুনিক। বিজ্ঞানের বাইরে কিছু ভাবিনে, কারণ ভাবতে জানিনে। এখানে মনোবিকলন কেন ঘটে, এর স্পষ্ট কৈফিয়ৎ শরীরবিজ্ঞানে পাই, মনের যোগও তারই সঙ্গে। তবু এখানে এলে বস্তুতন্ত্রবাদকে অরুচিকর লাগে কেন—আমি বলতে পারবো না। বিজ্ঞানের বাইরে এসে নিরুপায় মন যেন অহেতুক কান্না কাঁদতে চায়,—আশ্চর্য, এর কিন্তু কোনও কৈফিয়ৎ নেই। সমস্ত পাবার পরেও মানুষের তৃপ্তি নেই, এখানে একথা বিশ্বাস করি। জীবনের বাইরে কোন পরমার্থ নেই, এখানে এসে সেটি ভাবতে ভয় পাই। নিয়ন্ত্রণ করছি, কিংবা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি, এ প্রশ্ন এখানে ওঠে। এতকাল ধ'রে যে-বিশ্বাসটি পোষণ ক'রে এসেছি,—এখানে এলে সেই বিশ্বাসের ভিত কাঁপে।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় পণ্ডিত শিউদৎ ত্রিপাঠী হৃষিকেশ অঞ্চলে একটি আশ্রম নির্মাণ ক'রে সেখান থেকে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করতে থাকেন। এই নেশা তাঁকে পেয়ে বসে, এবং তিনি নাকি ওরই জন্য সর্বস্ব

খোয়ান। তাঁকে ঘিরে ওদিকে একটি মস্ত দল গ'ড়ে ওঠে। অতঃপর তিনি দলীয় লোককেই এক সময় গালাগালি দিতে আরম্ভ করেন এবং সেই গালির চোটে কৌতুকজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমি গিয়ে তাঁকে পুনরায় আবিষ্কার করেছিলুম,—কিন্তু ছিন্নভিন্ন ও সর্বহারা চেহারা দেখে তাঁকে চেনবার উপায় ছিল না। তিনিও আমাকে চিনতে পারেননি। এর পর হঠাৎ তিনি একদিন আশ্রম ছেড়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। কেউ বলে এক ভৈরবী গেছেন তাঁর সঙ্গে।

আবার ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশের দিকে যাবার সময় শুনলুম, একটি বাঙালী মেয়ে একাকিনী রহস্যজনকভাবে লছমনঝুলার ওদিকে সম্প্রতি ঘুরে বেড়াচ্ছেন নিরুদ্দিষ্টভাবে। মেয়েটি বি এ পাস করা, এবং চমৎকার ইংরেজিতে আলাপ করেন। অতিশয় বুদ্ধিমতী, এবং মিষ্টভাষিণী। তিনি সন্ন্যাস নিতে চান কিনা বলা কঠিন, তবে মনে হয় নিজের জীবনে কোনও একটি বিষয়ে বিশেষভাবে আঘাত পেয়ে দেশ ছেড়ে চ'লে এসেছেন। বয়স কম, বোধ করি অবিবাহিতা। আমরা কৌতূহলী হয়ে উঠলুম।

লছমনঝুলার ওখানে এসে জানা গেল অনেকেই মেয়েটির সংবাদ রাখে এবং এ নিয়ে একটা চাপা আলোচনাও হয়েছে। সেই মহিলাকে আমরা আবিষ্কার করলুম লছমনঝুলার সাঁকো পেরিয়ে ডানহাতি বাঁকের মুখে একটি চালা ঘরে। জনদুই 'বাবাজি' তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। একজন বাঙালী শ্যামানন্দ,—পান খাচ্ছেন তিনি প্রচুর, অন্যজন সিলেটী বোরেগী, ব'সে ব'সে গঞ্জিকাসেবন করছিলেন। মহিলা ঈষৎ গৌরবর্ণা ও স্বাস্থ্যবতী। বয়স পঁচিশের বেশী। কিন্তু তাঁর পরনে একখানি শতছিন্ন ধুতি ও সেমিজ, মাথার চুল 'বব'-করার মতো ছাঁটা,—চোখ দুটি শান্ত। আমাদের দেখে নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। কোনও ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত নারী এমন ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদে বাইরে এসে দাঁড়ায়, এটি বিস্ময়কর। ফলে, মুখ তুলে কথা বলা কঠিন ছিল। তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য এবং অবস্থিতির কারণ জানতে চাইলুম, তিনি সন্তোষজনক কারণ দিতে পারলেন না। বললেন, পথঘাট সবই খোলা, কোথাও যাবার বাধা নেই। প্রায় সপ্তাহ তিনেক এখানে আছি, এখান থেকে ফিরবো না।—তাঁর পরিচয় ইত্যাদি জানতে চাইলুম, কিন্তু তিনি একটি কথাও বলতে প্রস্তুত নন। বাবাজী দুজন বললেন, মা আমাদের এখানে কোথাও একটি আশ্রম করতে চান, আমরা সেখানে ওঁকে রেখে ওঁর

চরণসেবা করবো। মা আমাদের জগদম্বা, জগদ্ধাত্রী জননী। আহা, মুখ তুলে চাও, মা। সাক্ষাৎ ভগবতীর আবির্ভাব।

একটু সংক্ষেপেই কাহিনীটুকু বলি। এখানে এভাবে তাঁর থাকাটা বিসদৃশ, এটি জানালুম। এবার তিনি বিশুদ্ধ এবং শ্রুতিমধুর ইংরেজি ভাষায় আলাপ করতে আরম্ভ করলেন। তিনি আমার নিকট কোনও প্রকার সাহায্য নিতে চান না,—তথাপি আমি কিছু টাকা ও বিশেষ ক'রে কাপড় চোপড় এনে দিতে চাইলুম। কোনও দান তিনি গ্রহণ করবেন না। তার আত্মসম্মানবোধ এবং আত্মরক্ষার নৈতিক দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি আছে কিনা, অথবা এখানে অন্ন ও আশ্রয়ের জন্য তাঁকে হীনতা স্বীকার করতে হচ্ছে কিনা—এ সকল প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, এবং অন্ন না জুটলে তিনি উপবাস করবেন ও আশ্রয় না পেলে তিনি পথে প'ড়ে থাকবেন। বর্তমানে তিনি লছমনজীর মন্দিরে পাণ্ডার বৃদ্ধা জননীর নিকট বাস করছেন। পরিচয়াদি দিতে তিনি সম্পূর্ণ নারাজ এবং নিজ নামটিও তিনি বলতে প্রস্তুত নন। এভাবে জীবনযাপন করা অপেক্ষা আত্মহত্যা করা অধিকতর শ্রেয়,—আমার এই প্রস্তাব শুনে তিনি এক সময় সহসা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন, এবং আমার কণ্ঠস্বরে তিনি তাঁর সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতার কথা স্মরণ ক'রে আমাকে ডেকে নিয়ে ওই চালাটার উত্তর পাশে একটি পাথরের আসনে এসে বসলেন।

খর মধ্যাহ্নকাল। ঈষৎ কঠোর ভাষায় তাকে তিরস্কার করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। মহিলা অতি ভদ্র, এবং কঠোরপ্রতিজ্ঞ। তিনি বিবাহিত, এবং নয় বছরের একটি কন্যার জননী। তাঁর এই অজ্ঞাতবাসের সংবাদ স্বামী অথবা পিতামাতা যদি কেউ পান, তবে তাঁরা এই মুহূর্তে ছুটে আসবেন, একথা তিনি বললেন। তাঁর এই পলায়নের পিছনে কোনও প্রকার সামাজিক অথবা নৈতিক অপযশ নেই - স্পষ্টই জানালেন। এক সময়ে তিনি বললেন, তাঁর পক্ষে জীবন ধারণ করা আর কোনমতেই সম্ভবপর হচ্ছে না, কারণ ভিতরটা তাঁর প্রতি মুহূর্তেই প'চে যাচ্ছে,—'am constantly rotting within myself.' বুঝতে পাচ্ছি আমাকে সেজন্য সবাই সরিয়ে দিতে চাইছে'—এই কথা বলতে বলতে তিনি তাঁর rotting অবস্থাটা জানাবার জন্য শরীরের একটি বিশেষ অংশের কাপড় সরিয়ে দেখালেন—যেটি কোনও যুবতী নারীর পক্ষে সহসা সম্ভব নয়। তাঁর সর্বাঙ্গে অসুস্থতার কোনও চিহ্ন নেই, কেবল পায়ের নীচের দিকে একটি কালো দাগ দেখা যাচ্ছিল মাত্র। কিন্তু আত্মহত্যা করার প্রস্তাবটি তিনি সোৎসাহে গ্রহণ ক'রেছিলেন, এবং আমার একটি হাত ধ'রে

তিনি এবিষয়ে সাহায্য চাইলেন। আমার প্রস্তাব ছিল, পাহাড়ের ওপর থেকে গিরিখাদের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া, অথবা একখানা পাথর কোমরে বেঁধে নীলধারার মধ্যে তলিয়ে যাওয়া। কিন্তু এ দুটিই যন্ত্রনাদায়ক ব'লে তৃতীয় একটি উপায় তিনি জানতে চাইলেন। মুশকিল এই, মহিলা কাঁদছিলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। অবশেষে তাঁকে যখন জানালুম, চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়ার মত 'ড্রাগ' দু'একটা আমার জানা আছে, এবং তাতে কিছুমাত্র যন্ত্রণাবোধ নেই, তখন তিনি অত্যন্ত উৎসাহে আমার পায়ে ধরার জন্য চেষ্টা পেলেন। আমি বাধা দিলুম।

দর্শনশাস্ত্রে মহিলার অনাস ছিল,—সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শিনী। তাঁর অপমৃত্যু আমার কাম্য ছিল না। তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আত্মীয়স্বজন ও সন্তানের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমার ইচ্ছা ছিল। বিকাল প্রায় চারটে পর্যন্ত তাঁর পরিচয় নেবার চেষ্টা পেলুম, একসময় যখন তিনি সন্দেহ করলেন, বিষ দেবার নাম ক'রে ভিন্ন উদ্দেশ্যে তাঁকে হরিদ্বারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই, তখন তিনি বেঁকে বসলেন। বললেন, মিথ্যে চেষ্টা। 'All your efforts will be fruitless.

বিদায় নেবার আগে তিনি কেবল আমার অনুরোধে নিকটবর্তী একটি ছোট্ট দোকানে এক পেয়ালা চা খেলেন, এবং যাবার সময় অশ্রুসজল চক্ষে মৃদু গলায় ব'লে গেলেন, স্থানীয় অদ্বৈতবাদী এবং নারীবিদ্বেষী সন্ন্যাসীর দল তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। যদি তারা আমাকে অতর্কিতে হত্যা করে সেই আমার আনন্দ।

চোখের জল মুছে তিনি লছমনঝুলার সাঁকো অতিক্রম ক'রে চললেন। আমি রুদ্ধশ্বাস। ঘণ্টা চারেকের চেষ্টায় কেবলমাত্র দুটি কথা তাঁর মুখ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমটি হোলো, তিনি একসময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু মহাশয়ের ছাত্রী ছিলেন এবং দ্বিতীয়টি, তাঁর পদবী হোলো 'ভট্টাচার্য।'

সেবার কলকাতায় ফিরে একদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আপিসে বন্ধুবর ভবেশ নাগ মহাশয়ের নিকট গল্পচ্ছলে এই কাহিনীটি ফেঁদেছিলুম। তিনি একটু অন্যমনস্কভাবেই বললেন, তাঁর এক বন্ধুকন্যা কিছুদিন আগে নিরুদ্দেশ হন, এবং তাঁর বৃদ্ধ পিতাও অবশ্য 'ভট্টাচার্য'। ভবেশবাবুর নিকট থেকে তৎক্ষণাৎ ঠিকানা নিয়ে আমি আশুতোষ মুখার্জী রোডের এক বাসায় যাই সেই সন্ধ্যায়ই। আমার বর্ণনার সঙ্গে সেই বাড়ীর বৃদ্ধ পিতামাতার কন্যার চেহারার সঙ্গে মিলে যায়, এবং তাঁরা একখানি অতি সুশ্রী ফটো আমাকে দেখান। কলিকাতা পুলিশের জনৈক অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার সেই রাত্রে

হরিদ্বারে বেতারবার্তা পাঠান, এবং পরের দিন শ্রীমতী ভট্টাচার্যের বাবা ও ছোটভাই রওনা হন। কিন্তু কাহিনীটি ততদিনে জটিল হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে হোলো এই, শ্রীমতী ভট্টাচার্যকে নিয়ে ইতিমধ্যে জনৈক নাগা সন্ন্যাসী দূর পর্বতের দিকে কোথায় যেন পলায়ন করে, এবং নির্জন নদীগর্ভের দিকে এক গুহায় তাঁকে লুকিয়ে রাখে। অতঃপর কোটদ্বার পুলিশ এ বিষয়ে দায়িত্ব নেন এবং স্থানীয় প্রায় একশত লোকের 'প্রবল বিরোধিতার' ভিতর থেকে একদিন সেই মহিলাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এই সব ঘটনাচক্রে প'ড়ে ঠাণ্ডা লেগে কয়েকদিনের মধ্যে ছোট ভাইটি অসুখে পড়ে, এবং সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু সংক্ষিপ্ত হলেও গল্পটি এখানে শেষ নয়। তার বৃদ্ধ পিতার অনুরোধে একবার কাশী গিয়ে কেদারনাথের গলির এক বাড়ীতে দেখি, গেরুয়া পরিহিতা শ্রীমতী ভট্টাচার্য, -চেহারাটি তখন তার আরও সুশ্রী,—ব'সে আছেন একটি অন্ধকার ঘরে একরাশি মৃন্ময় দেবমূর্তির মাঝখানে। তিনি কলিকাতায় ফিরতে চাননি, কাশীতেই বসবাস করছেন। আশ্চর্য, জীবন বৈচিত্র্যের অনন্ত আধার হোলো কাশীধাম! আমাকে দেখে বৃদ্ধ পিতা অভ্যর্থনা করলেন, এবং শ্রীমতী ভট্টাচার্য তার হাতের জ্বলন্ত কাঁচি সিগারেট লুকিয়ে এক মস্ত গাঁদাফলের মালা তুলে আমার গলায় ঝুলিয়ে প্রণাম করে বললেন,—**Ah, you, my saviour! Never you are fruitless! Thy will is done!**

এই প্রথম জানলুম, তাঁর মস্তিষ্কের বিকার। মাঝে অনেকদিন তিনি ছিলেন পূর্ব কলকাতার 'লুম্বিনী পার্কে'।

* *

*

ভারতের মহাজনতার আকার হোলো বিপুল। তারা ছড়িয়ে রয়েছে ভারতের বিশাল সমতলে। কিন্তু হিমালয়ের গিরিসঙ্কটে, সঙ্কীর্ণ পথের বাঁকে, বিরাট পটভূমির তলায় তলায় ওই মহাজনতার ভগ্নাংশের দেখা মেলে। তারা আপন আপন ইতিহাস নিয়ে যায় সঙ্গে। তখন তাদের একান্ত ক'রে দেখা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি তখন হয়ে ওঠে সৃষ্টি বৈচিত্র্যের আশ্চর্য অভিব্যক্তি। জনতার মধ্যে যারা হারিয়ে থাকে, বহুর মধ্যে যারা মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে থাকে, ওখানে গিয়ে তারা পেয়ে যায় অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোনও দিন যার কোনও পরিচয় নেই সে পেয়ে যায় একটি অনির্বচনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

কিন্তু এই অন্তহীন জীবনবৈচিত্র্যের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিমালয় আপন

বিপুল প্রাণসম্ভার নিয়ে। আনন্দ, সৌন্দর্য, পরমার্থ, অনুরাগ, উল্লাস, উদ্দীপনা—এরা রয়েছে একদিকে, এদেরই সঙ্গে রয়েছে দুঃখ, দুর্যোগ, সঙ্কট, আতঙ্ক ও যন্ত্রণা। এই দুই পরিচয়ের ভিতর দিয়েই ডাক এসে পৌঁছয় হিমালয়ের প্রাণলোক থেকে। ডাক দেয় উত্তুঙ্গ চূড়া, গিরিনির্ঝর, তুষার ঝঞ্ঝার ঝাপ্টা, হিমবাহের আকর্ষণ, রোমাঞ্চকর ধবলশৃঙ্গ, গিরিসঙ্কটগামী ঝব্বু দলের মন্থরগতি, তীর্থযাত্রীদলের দীর্ঘবিলম্বিত সমারোহ,—এদেরই দুর্বার টান অস্থির করে তোলে। এরা চাঞ্চল্য আনে মানুষের মনে চিরকাল। এরা ঘর ছাড়ায়, পথ ভোলায়, দুর্গমে ভাসায়, যন্ত্রণায় কাঁদায়! আনন্দের অপরিসীম আকর্ষণ মানুষকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় হিমালয়ের পথে পথে।

আবার ফিরে আসি আমার পরিব্রাজক জীবনের অশান্ত ঝঞ্ঝায়। না, হিমালয় কোনওদিন আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না, বোধ হয় দেবেওনা কোনওদিন। সমতলে, জনতার ভিড়ে, কলকাতার নিত্য অরাজক বেহায়াপনায়—আমার অস্থির মন কথায় কথায় বাঁধন কাটতে থাকে। আমাকে যেন ডেকে নিয়ে যায় আমার সেই পুরনো পথ। ধওলাধারের পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে বন্য শতদ্রু বাঁধা পড়েছে ভাকড়া নাঙ্গালের আশ্চর্য পূর্তবিদ্যার কৌশলে--সে আমার জানা চাই। আমার দেখা চাই সাতাশ ফুট উঁচুতে হিমালয়ের কোলে সেই বিশালায়তন গোবিন্দসাগর। সেজন্য আম্বালা থেকে বেরিয়ে রূপারের বাসষ্ট্যাণ্ডে রাত কাটাতে আমার ভাল লেগেছিল। একদিকে.. ফেব্রুয়ারি মাসের শ্বেতচূড়াকার ধওলাধার, অন্য দিকে হিমালয়ের সমান্তরাল যে সুন্দর পথ—যে পথ চলে গেছে হোসিয়ারপুর আর জলন্ধর হয়ে অমৃতসরের দিকে, সেই পথে হিমালয়ের কোলে ইউক্যালিপটাসের অনন্ত বনভূমি—বাতাস সুগন্ধ ভরোভরো। সেই আমার ভ্রমণের পথে সুশ্বেতবর্ণ আনন্দপুর সাহেবের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম।

পথ এলোমেলো, কিন্তু আমার সব পথ মিলেছে হিমালয়ে। কেন বার বার যাচ্ছি কৌসানি আর বাগেশ্বরে, কেন যাচ্ছি টিহরি আর গাড়োয়ালে, নারকাণ্ডায় আর ওলদি-হাওয়ানের সেই পার্বত্য পাইন অরণ্যের ভিতর দিয়ে, যাচ্ছি বার বার ব্রহ্মপুরায়—তার কৈফিয়ৎ আমার ভিতরে আর্তকণ্ঠ আমাকেই যেন শুনিয়ে দিচ্ছে!

আবার একদা নরেন্দ্রনগর থেকে টিহরি--ভাগীরথী পার হলুম। সেটি সুন্দর উপত্যকায় এক পার্বত্য শহর। সেখান থেকে আবার নদী পেরিয়ে আমার সেই এককালের পুরনো পথে ভাগীরথীর তীরে তীরে সোজা উত্তর-কাশী। সেই অসি আর বরুণা! তারপর ভাটোয়ারী আর ধরাসু—সেই

যমুনোত্রীর পথ উঠে গেল। সেখান থেকে একে একে হরশিল, ধরালি, নীলম, কোপাং, কাংলা,—ঝালার পুল ছাড়িয়ে। তারপর দুস্তর চড়াই পেরিয়ে ভৈরঘাটির সেই ঠাণ্ডা বনবাগান। ভৈরঘাটি থেকে গঙ্গোত্রি—সে যেন চারিদিকে মৃৎপ্রস্তরময় হিমালয়ের বন্য মহিমা। সেই আনন্দের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'গঙ্গাপথে গঙ্গোত্রি' গ্রন্থে। গঙ্গোত্রি থেকে গোমুখ—সেই দেওগড, চীরবাস, পুষ্পবাস, ভূগুবন, তপোবন,—তারপর গোমুখ আর সেই হিমবাহ। গঙ্গোত্রির প্রবেশ পথে সেই গঙ্গাদেবীর মন্দির। ওপারে সাধক মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমের সেই আশ্রম। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন।

কিন্তু আজকের এই দৈহিক জরা আর ক্ষীণতার মধ্যেও ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে আরেকবার টান দিয়েছিল লাহুল স্পিতির দুঃসাধ্য পথ। ১৯৬৮র অক্টোবরের শেষপ্রান্তে মানালি থেকে ফিরতে হয়েছিল তুষারঝঞ্ঝার প্রবল তাড়নায়। এবার অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই মানালির উপরে মেঘ, বৃষ্টি, বায়ুর ঝাপ্টা ও অকাল তুষারপাত। সরকারি বুলেটিন সতর্ক হবার নিশানা প্রচার করছিলেন বার বার. দিল্লীর প্রতিরক্ষা দপ্তর এক তারযোগে আমাকে নিষেধবাণী পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

কিন্তু এই আমার শেষ কিস্তি। হিমালয় আমাকে অবিচল রেখেছে চিরদিন। ওঁরা বোঝেননি অকাল তুষারপাত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ কখনও হিমালয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়না। সুতরাং ওই তুষারকায় ডাস্কার ও ধওলাধারের গিরিশৃঙ্গমালা পাঁচ ছয় দিন পরে আবার নীলকান্ত আকাশের রৌদ্রোজ্জ্বলতায় হেসে উঠল। আবার দর্শন করলুম দেবতাত্মার প্রসন্ন সুন্দর রূপ।

মানালি থেকে লাদাখের রাজধানী লেহ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশ' মাইল পার্বত্য পথ নির্মাণ করা চলছে। এটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ ভূভাগ অতিক্রম করে যাবে। মধ্যপথে দুটি গিরিসঙ্কট পার হবে। একটি রোহটাং. অন্যটি বড়া লাচা। এই দুই গিরিসঙ্কটের মধ্যে লাহুল ও স্পিতি উপত্যকা।

বিপাশা নদীর ধারাপথ ধ'রে অতি সন্তর্পণে প্রস্তর সঙ্কট পেরিয়ে আমাদের গাড়ি চড়াই পথে উঠেছিল। 'মোহি' বস্তির পর থেকে তুষারাকীর্ণ চড়াই পথ এক সময় রোহটাং চূড়া (১৩,০৫০ ফুট) অতিক্রম করে 'কোকসার' বস্তিতে নামল। এখান থেকে লাহুল উপত্যকা (১০,৫০০ ফুট) আরম্ভ হয়। রোহটাং-এর দক্ষিণ তুষারলোকে দেখতে পাচ্ছিলুম 'বিয়াসকুণ্ড',—যে স্থলটি বিপাশার উৎসমুখ। ওটা অনেকটা যেন গোমুখের মতো। হিমাচলীরা ওখানে পূজাপাট ক'রে যায়।

আনুপূর্বিক বর্ণনা এখন থাক। একে একে পেরিয়ে গেলুম কোকসার, ওন্দলা, সিস্যু, ডালিং ময়দান, টাণ্ডি এবং অবশেষে কেলং জনপদ। লাহুলের একদিকে উত্তরবাহিনী ভাগা ও পশ্চিমবাহিনী চন্দ্রা। এই দুই নদী মিলছে টাণ্ডিতে,—নাম হয়েছে চন্দ্রভাগা।

ভাগাতীরবর্তী ছোট্ট জনপদ কেলং কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র প্রশাসন কেন্দ্র, এ ছাড়া তা'র অন্য পরিচয় নেই। নদীর অপর পারে উচ্চ পর্বতগাত্রে পর পর তিনটি গুম্ফা,—সেগুলি স্বয়ংশাসিত ও ভারতীয় জীবন থেকে কতকটা বিচ্ছিন্ন। পর্বত প্রাকারের বেষ্টনীর নিচে পড়ে রয়েছে ছোট কেলং—যার মধ্যে একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ গলিপথ জনপদটিকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। জনবসতি সামান্য, কাজ কারবার নেই, খোলা অবকাশ খুঁজে পাওয়া যায় না। ওই সঙ্কীর্ণ গলিপথটির নাম 'রাসবিহারী বসু মার্গ।' এই শতাব্দীর প্রারম্ভে বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু তাঁর পলাতক অবস্থায় এই কেলং এ এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কেলং এর প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এই এই গলিপথের ধারেই পরলোকগত রাসবিহারী বসুর একটি আবক্ষ প্রস্তরমূর্তি স্থাপনা করা হয়েছে,—সেটি প্রথমেই চোখে পড়ে।

মানালি থেকে কেলং ৭০ মাইল পার্বত্যপথ। আরও মাইল পনেরো এগিয়ে গেল 'যাসপা।' এর পর বড়া-লাচা গিরিসঙ্কট মাইল তিরিশেক। কিন্তু সেই সব অঞ্চলের প্রসঙ্গ 'উত্তর হিমালয় চরিত' গ্রন্থে আগেই আলোচনা ক'রে এসেছি। কেলং থেকে ১৮ মাইল ভিন্নপথে 'থেরোট', সেখান থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট চড়াই পথ পেরিয়ে গেলে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ ত্রিলোক নাথের মন্দির।

লাহুল ও স্পিতি উপত্যকায় পরিভ্রমণের শ্রেষ্ঠ কাল মে, জুন, জুলাই ও আগষ্ট। তখন বন্য গোলাপের অজস্র রক্তিম আভায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে পাহাড়ের পর পাহাড়। তার সঙ্গে বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে পপলার আর জুনিপার।—উইলোর বনে বনে দেখা দেয় পুষ্পসমারোহ। বৃষ্টি বাদল অতি সামান্য, কিন্তু ওতেই আলুর চাষে ভরে যায় পাহাড়ের এখানে ওখানে। চাষবাস করে গোর্খা আর তিব্বতী মিলিয়ে একটা সঙ্কর সম্প্রদায়।

মাত্র দুদিন লাহুলে বাস করেছিলুম।

মনে পড়ছে, ১৯৬৭ সালে আবার ধরেছিলুম পৌড়ি শ্রীনগর থেকে রুদ্রপ্রয়াগ,

কর্ণপ্রয়াগ, চামোলি,—সেখান থেকে যোশীমঠ। না, এ পথ সেকালের সে পথ নয়। সে পথ হারিয়ে গেছে কবে কোথায় অজানা কোন্ একটা জীবনে। কোথায় গেল সেখানের সেই বিষ্ণুগঙ্গা আর শিবোলির সেই বন্যালোক। নদীর ধারের পথ লুপ্ত হয়ে গেছে। উপরের পাহাড় কেটে পথ চলে এসেছে বদরিনাথের কোলে অলকানন্দার ওপারে। হনুমান চটির চেহারা গিয়েছে বদলিয়ে। চল্লিশ বছর আগেকার 'মহাপ্রস্থানের পথের' নিশানা কোথায় মিলিয়ে হারিয়ে গেছে।

তবু সমস্ত আধুনিকের ধাক্কার মধ্যেও এপার ওপারে সেই আদিকালের নর নারায়ণ পর্বত দাঁড়িয়ে। ওদের গগনচুম্বি চূড়াদলের উপর যেন কল্প-কল্পান্তের একটি মূক মন্ত্র স্থির হয়ে রয়েছে। আমি দেখছিলুম নতুন চোখে তা'র চারিদিকে চেয়ে। পঁয়ত্রিশ বছর পরে যে আমি আবার এসে দাঁড়িয়েছি, এ আমি সে আমি নয়। সে হারিয়ে গেছে যেন কোন গহন হিমালয়ে, সে তলিয়ে গেছে অলকানন্দায় আর মন্দাকিনীতে, গঙ্গায় আর যমুনায়, নর্মদায় আর কৃষ্ণায়, ভীমায় আর মঞ্জিরায়, বেত্রবতী আর দৃষদ্বতীতে। তার অনু পরমাণু ছড়িয়ে গিয়েছে সর্বভারতে।

কিন্তু তবু অজর, অক্ষয় ও অব্যয় হয়ে রয়েছে বদরিনাথ আর কেদারনাথ, আর ওই কৈলাসের শ্বেতকৃষ্ণ লিঙ্গশিখর, ত্রিশূল, গৌরীশঙ্কর আর উত্তরে সেই হরমহেশ আর শিবানীশিখর। ওরা টানছে মানুষকে সেই একই মন্ত্রে একই উদাত্ত বন্দনায়।

'হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে স্থাণো গিরিশ গিরিজেশ
মহেশ শম্ভো—। ভূতেশ ভীতভয়সূদন মামনাথম
সংসার দুঃখদহনাজ্জগদীশ রক্ষ। হে পার্বতি হৃদয়বল্লভ চন্দ্র মৌলে
ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরিশজাপ। হে বামদেব ভবরুদ্রপিনাকপাণে
সংসার দুঃখ দহনাজ্জগদীশ রক্ষ।

* *
*

পঞ্চাশ বছরের অল্পস্বল্প ডায়েরী এখানেই শেষ হচ্ছে, কিন্তু হিমালয়ের বিশাল পরিক্রমা এখনও সাঙ্গ হয়নি। ঘুরছি ফিরছি আজও ওর আনাচে কানাচে। অনেক কাহিনী অসমাপ্ত রয়ে গেছে, বহু জীবনের ছোট ছোট পরিচয় প্রকাশ করা গেল না। অনাস্বাদিত রহস্যপথ, অনাবিষ্কৃত পর্বত, অপরিচিত নদীপথ,—এদের টান অচ্ছেদ্য। নিরভিমান কণ্ঠেই বলি, জেনেছি অতি সামান্য, উপলব্ধি হয়তো তার চেয়েও কম। শুধু দেখবার চেষ্টা পেয়েছি

হিমালয়কে। সেইটিই ছিল প্রধান লক্ষ্য। হিন্দুকুশের সীমানা থেকে আসামের সীমানা—আমার আলিঙ্গনের মধ্যে এই বিশালতাকে ধারণ করবো, এই দুরাশা বাসা বেঁধেছিল এককালে এক তরুণ মনে।

হৃষিকেশের দিকেই আবার যাচ্ছি, আবার টিহরি গাড়োয়ালের দিকে। কেননা সেই পরিক্রমা যদি আবার আরম্ভ হয় হোক,—জানার পথটা অবারিত থাক, আবার রক্তক্ষরণ হয়ে চলুক। এটি আনন্দের পথ। কান্না পেলেও আনন্দ, কারণ আমি তীর্থগামী। অতৃপ্তি আর অসন্তোষ থাক জীবনজোড়া, থাক নিবিড় নৈরাশ্য আর অসীম কালের বিরহবেদনা, থাক অনন্তলাভের প্রবল ব্যাকুলতা—এরা তীর্থযাত্রীর পাথেয়। কোথায় পৌঁছবো, সঠিক জানা নেই। কিন্তু আপন চিত্তের অশ্রান্ত গতি কামনা করি। যে-গতি গঙ্গার, যে-গতি সৃষ্টিলোকের সেই গতিই জীবনের। একথাটি জেনেছি, গতিহীনতাই অপমৃত্যু।

হৃষিকেশের পথেই যাচ্ছি, ওটাই দেবতাত্মার সিংহদ্বার।

॥ সমাপ্ত ॥

পিয়ামুখচন্দা

(উপন্যাস)

উৎসর্গ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

শোনো, আমি জয়ন্ত। পোষ্ট অফিসের বুথ থেকে তোমায় ফোন করছি। শোনো, তোমার সঙ্গে দু'চারদিন এখন আমার দেখা হবে না। আমি কোথায় থাকব, ঠিক কি অবস্থা দাঁড়াবে বুঝতে পারছিনে।

কেন, কি হয়েছে তোমার ?

কাল কোর্ট থেকে রায় বেরিয়েছে। জ্যাঠামশাই মামলায় জিতেছেন। পৈতৃক বাড়ির নিচের দুখানা ঘরে থাকতুম, কিন্তু আসছে কাল সন্ধ্যের মধ্যে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। মা কান্নাকাটি করছেন। আচ্ছা…ছেড়ে দিচ্ছি—

শোনো, শোনো, আঃ ছেড়ো না জয়ন্ত। বিপদে পড়ে ছটফট করতে নেই। তুমি আমার স্বামী নও যে, টেলিফোনে হুকুম করব। তবু বলছি আমার সঙ্গে এখুনি তোমার দেখা হওয়া দরকার—

উত্তেজিত হয়ে জয়ন্ত বলল, না, না, আমাকে টাকার জন্য ছুটোছুটি করতে হচ্ছে, সময় নেই, রেবা। মা আজই চলে যেতে চাইছেন বার্ণপুরে হেমন্তর ওখানে—

রেবা বলল, কোন্ পোষ্টাপিস থেকে ফোন করছ ?

শ্যামবাজার থেকে। কেন ?

ওখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকো পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

তার মানে ?

মানে,—রেবা বলল, দেখা হ'লে বলব। আবার বলছি, ওখান থেকে এক পা নড়বে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ট্রাম গাড়ি গুণতে থাকো। আর নয়ত,—তুমি কবি, মনে মনে লিখে চলো আক্রোশ আর ঘৃণার কবিতা। ছেড়ে দিলুম।—

রিসিভারটি রেখে দিয়ে রেবা চেঁচালো,—আয়া, চুনারি, - এই যে। ওরে, আমার কাপড় দে তো। না, না ওগুলো থেকে নয়,—যেমন তেমন, আটপৌরে।

কেন, দিদি ?

হ্যাঁ, যা বলছি শোন্। কারোও চোখে না পড়ে,—মন দিয়ে যেন দেখে না কেউ।—রেবা ছুটে গিয়ে নিজেই বেছে নিল একখানা নিস্তেজ শাড়ি। এখানা শাদামাটা, পাড় গিয়েছে ঝলসিয়ে, ইস্ত্রি নেই,—এইখানা মানাবে। চুনারি, শিগগির ড্রাইভারকে বল্, গাড়ি বা'র করতে।

এত বড় বাড়িতে অন্য কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রেবার নিজের গলার

আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল ঘরের দেওয়ালে আর বাইরের করিডরে। পরনে ছিল তার সকাল বেলাকার গাউন। সেটি বদলিয়ে শাড়িখানা জড়িয়ে নিল লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে। ওদিকের দেওয়ালে দাঁড়িয়ে ছিল লাইফ সাইজ আয়না। রেবা ভ্রূক্ষেপ করল না সেদিকে। চুলের রাশি এলোগোঁপাথ বেধে নিল দুহাত ঘুরিয়ে। প্রসাধনের কথা মনেই এলো না।

আয়া সাড়া দিয়ে বলল, গাড়ি তৈরি।

ভ্যানিটি ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো রেবা। হাতঘড়িতে আটটা দশ। বারান্দার শেষ দিকে পেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ ফিরে দেখল, বাবা প'ড়ে আছেন তাঁর বিছানায়, এক পায়ে তাঁর জুতো মোজা, অন্য পায়ে শুধু মোজা,—একপাটি জুতো পড়ে রয়েছে কার্পেটের ওপর। মাথার নিচে বালিশ দেননি। পোশাকটা খোলবার মতো শারীরিক সঙ্গতি ছিল না। একে ঠিক নিদ্রা বলে না,—অনেকটা বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকা।

হাসিমুখে রেবা আয়াকে প্রশ্ন করল, বাবা ফিরলেন কখন?

চুনারি জানালো, শেষ রাত্রে।

মা?

মা গেছেন কাল সন্ধ্যেবেলা তাঁর প্রিন্সেসের পার্টিতে।

ক্ষণকালের জন্য রেবা স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপরেই দ্রুতগতিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। বাগান পেরিয়ে এসে সে তা'র নিজের ছোট ফিয়াটে উঠল। এ গাড়িখানা বাবা তাকে কিনে দিয়েছেন এই সেদিন। ছোকরা ড্রাইভার জানতে চাইল, আপনি কি স্টিয়ারিং ধরবেন?

না।

গাড়ি বেরিয়ে গেল ফটক পার হয়ে টালিগঞ্জের ভিতর দিয়ে। পথ অনেকদূর। মুর এভেন্যু থেকে শ্যামবাজার,—নয় দশ মাইল। রসা রোডে এসে পৌঁছাতে সময় লাগল। চৌরঙ্গী পৌঁছতে খরচ হয়ে গেল আধ ঘণ্টা। কে জানে, জয়ন্ত মেজাজী লোক, হঠাৎ বদলিয়ে যায় তার মর্জি। এক মিনিট এদিক ওদিক হলে সে অনিশ্চিতের মধ্যে হারিয়ে যায়। সে কবি। ক্ষণকালের আনন্দে সে বাঁচে, ক্ষণেকের নৈরাশ্যে সে বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

ধর্মতলার ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে রেবা বলল, এইখানে আমি নেমে যাচ্ছি তেওয়ারি, তুমি গাড়ি নিয়ে ফিরে যাও।

এ নতুন নয়, তেওয়ারি এতে অভ্যস্ত। রেবা নেমে গিয়ে একখানা ট্যাক্সি ধরে উঠে বসল।

আশ্চর্য শ্যামবাজার পোস্ট অফিসে যখন রেবা এসে পৌঁছল হাতে তখনও

পাঁচ মিনিট। কিন্তু জয়ন্ত নেই সামনে। রেবা ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ভিতরে গেল। জয়ন্ত সেখানেও নেই। বাইরে এসে দেখল চারিদিক,—কোথাও নেই। কিন্তু জয়ন্তর মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে রেবার হিসাবে ভুল ঘটে না। কয়েক পা এগিয়ে ট্রামরাস্তা পেরিয়ে প্রথম চায়ের দোকানেই তাকে পাওয়া গেল। রেবাকে দেখে সে সহাস্যে বলল, এই যে এসে পড়েছ। আমিও উঠছিলুম তোমার জন্যে। হ্যাঁ ইনি আমার বন্ধু ফটিক ঘোষ। ইনি আগে এই সামনের সিনেমা হলের গার্ড ছিলেন, এখন আফিংয়ের দোকান খুলেছেন! এইসব কাজকারবারের কথা চলছিল আর কি।

আপনাদের আলাপ শেষ হোক, আমি অপেক্ষা করি।—এই ব'লে রেবা এক পেয়ালা চা অর্ডার ক'রে অন্য টেবিলটির সামনে গিয়ে বসল।

ফটিক ঘোষ বললেন, আজ্ঞে, এসব আলাপ কি আর দু' কথায় শেষ হয়? আমি তাই জয়ন্তকে বলছিলুম, এসব কারবারে সাধু সেজেছ কি মরেছ! ছোট্ট দোকান খুলে বসতে হয় আগে। তারপর ধরো মাসেক ছ'মাস! জনচারেক লোক রাখতে হয় দ্বারভাঙার ওদিকে,—এই ধরো নারকটিয়াগঞ্জ থেকে রক্সৌল পর্যন্ত। তারপর ব'সে ব'সে দেখো ভানুমতীর খেল্। ওই ছোট্ট দোকান রবারের মতন টানতে টানতে বড় হয়ে উঠবে। নইলে এই আপনিই দেখুন না, হাজার টাকা নিয়ে কারবারে নামতে গেলে দশ হাজার টাকা খরচ হয় লাইসেন্স বা'র করতে। তাই তো আমি বলছিলুম জয়ন্তকে। ওর চেয়ে আমি বছর দশেকের বড়ই হবো, কিন্তু আমরা একই গোয়ালের গরু।

এক ঘণ্টা আগে যে-ব্যক্তি ভয়ানক পারিবারিক দুর্যোগের সংবাদ দিয়ে টেলিফোন করেছিল, তার মুখে চোখে তিলমাত্র উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা দেখা যাচ্ছে না। সে ভুলে গেছে তার জননীর চোখের জলের কাহিনী, এবং জ্যাঠামশাইয়ের তরফ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার নোটিশ। জয়ন্তর চোখে মুখে যে বিচিত্র ঔদাসীন্যটি দেখা যাচ্ছে, সেটি এমন শান্ত এবং প্রসন্ন যে, রেবার পক্ষে রাগ করার কথাই ওঠে না।

জয়ন্ত বলল, তুমি যা বলছ ফটিকদা, এ অতি উত্তম প্রস্তাব। আমাকে তোমার অংশীদার ক'রে নাও। টাকার কথা বলছ? আমার টুইশনির সব টাকা তোমাকে মাসে মাসে দিয়ে যাব। একথা জানি বৈকি, উন্নতির পথ সাধুতার পথ নয়।

ফটিক ঘোষ হাসলেন। বললেন, হুঁ, বুঝলুম। কিন্তু তুমি আজও ছেলেমানুসটি রয়ে গেছ, জয়ন্ত। টুইশনি আজ তুমি নতুন করছ না। টুইশনি

ক'রে নিজে এম-এ পাস করেছ, ছোট ভাই হেমন্তকে এম. এস-সি পাশ করিয়েছ—

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বলল, ইনিও এম এস সি, শ্রীমতী রেবা রায়, ইনি ছিলেন হেমন্তর সহপাঠী। এঁর অন্য পরিচয়, ইনি প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়র এম-বি-রায়ের একমাত্র মেয়ে। এঁর বাবার ফার্মে প্রায় আটশ লোক কাজ করে। রায়সাহেব তার মেজর পার্টনার। কোটিপতি এঁরা।

ফটিক ঘোষ পুলকিত উল্লাসে একবার তাকালেন রেবার দিকে। পরে বললেন, হ্যাঁ, যা বলছিলুম। তুমি টাকা পাবে কোথায় জয়ন্ত? তোমার টুইশনির টাকা মাস গেলে না হয় দেড়শ' দু'শ। তুমি আর তোমার বিধবা মা তার মধ্যে। আজকাল আলোচালের দাম তিন টাকা কিলো। সুতরাং টুইশনির কথা রাখো—

এবার রেবা কথা বলল,—ফটিকবাবু, উনি কিন্তু এম-এতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন। ওঁর ইংরেজি ছিল। যে কোনও কলেজে উনি প্রফেসরি নিতে পাবেন। ফেলে-ছড়িয়ে পাচশ টাকা।

ওঃ তাও হয় না, রেবা দেবী। ব্যবসায়ে মাসিক কিস্তিবন্দি নেই।—ফটিক ঘোষ বললেন, কত টাকা পাচার করতে হয় তলায় তলায়, তার হিসেব নেই কিছু। ব্যাপারটা কি জানেন, দশ বিশ হাজার মাথার শিয়রে রাখতে হয় সব সময়। এসব যে মাঝরাত্রের ব্যবসা। এর পেছনে থাকা দরকার কই কাংলা।

জয়ন্ত বলল, আচ্ছা ফটিকদা তোমার সঙ্গে বাকি কথা হবে সন্ধ্যের পর। আমাদের ওখানে আসছ তো?

হ্যাঁ, আসছি বৈকি। ফটিক ঘোষ বললেন, তবে কি জানো, এই তোমার রেবা দেবীর মতন মানুষকে দু'কথা বুঝিয়ে বলতে পারলে কাজ হ'ত। টাকায় টাকা টানে, বুঝলে জয়ন্ত?

রেবা বলল, যদি অনুমতি করেন তবে জয়ন্তর সঙ্গে আমিও যেতে পারি—। মন্দ কি। হোক না পার্টনারশিপ—

উৎফুল্ল হয়ে ফটিক ঘোষ বললেন, অনুমতি। বলছেন কি? এই ত' চাই। আপনার মতন এন্টারপ্রাইজিং মেয়ে এ কারবারে নামলে ত' বাজিমাৎ।

তা হ'লে এই কথাই থাক। রেবা বলল, শুধু এইটুক ব'লে রাখি, টাকার জন্য ভাববেন না।

চায়ের দাম চুকিয়ে ওরা তিনজনে এক সময় বেরিয়ে এলো। শুধু চায়ের

দোকানের কর্তা চাপা গলায় বলল, এরা বুঝি তোমার নতুন মক্কেল, ফটিকদা?

চুপ করো, এখন তামাসার সময় নয়।—এই ব'লে প্লেট থেকে কয়েকটা মৌরি তুলে নিয়ে ফটিক ঘোষ বেরিয়ে গেলেন।

রেবা ও জয়ন্ত এক সময় তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে বিপরীত দিকে অগ্রসর হল। বেলা তখন দশটা। রেবা বলল, আফিংয়ের কারবার যদি তোমার জমে ওঠে, তাহলে তোমার মায়ের দুঃখ নিশ্চয়ই ঘুচবে!

আমিও তাই ভাবছি। জয়ন্ত জবাব দিল।

কিন্তু ভাল ক'রে ভাববার মতন একটা জায়গা পাওয়া দরকার, জয়ন্ত। তোমার তাড়ায় আমি কিছু খেয়ে আসিনি।—ওই যে, খালি ট্যাক্সি একখানা—ডাকো, ডাকো শিগগির।

জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে ট্যাক্সিখানা থামালো। রেবা গিয়ে উঠে বসল। জয়ন্ত বসল পাশে। গাড়ি চলল দক্ষিণে।

রেবা প্রশ্ন করল, জ্যাঠামশাই মামলায় জিতলেন, খবরটা কখন পেলে?

জয়ন্ত বলল, সন্ধ্যের পর,—আমি তখন সবে ফিরেছি। জ্যাঠামশাইদের মহলে তখন হাসাহাসি, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ চলছে। মস্ত খাওয়া-দাওয়ার ঘটা আরম্ভ হয়েছে, মাংস রান্নার গন্ধ আসছে। আমাদের মহলে ঢুকে দেখি, মা ব'সে কাঁদছেন। ঘরে আলো জ্বলেনি।

মামলা কি মিথ্যা ছিল?

না, মিথ্যে নয়। বাবার ধার ছিল বহু টাকা। সব টাকা যুগিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই। বাবা ছিলেন দিলদরিয়া। যাক্ এখন ওসব কথা।

রেবা বলল, কাল রাত্রেই আমাকে ফোন ক'রে খবরটা দিলে না কেন?

কাল রাত্রে?—জয়ন্ত বলল, সময় ছিল কোথায়? শোবার আগে তিন তিনটে কবিতা লিখেছি! তবে তার একটিতেও মামলার গন্ধ নেই, মায়ের চোখের জলের দাগও নেই—

রোমান্টিক কবিতা বুঝি?

জয়ন্ত হেসে উঠল। বলল, কবিতামাত্রই রোমান্টিক, শুধু আইডিয়ার তফাৎ। ধুলো, কাদা, নোংরা, ঘৃণা, অপমান—সব মিলিয়ে রোমান্টিক। রোমান্স কিছুকে বাদ দেয় না।

নতুন রাস্তায় প'ড়ে গাড়ি চলল দ্রুতগতিতে। বাঁ হাতখানা জয়ন্তর কাঁধের পিছনে তুলে দিয়ে রেবা বলল, তোমার মা চ'লে যাচ্ছেন বার্ণপুরে, তুমি থাকছ কোথায়? খাচ্ছ কি?

আমাকে নাবালক মনে করছ কেন?—জয়ন্ত মুখ ফিরিয়ে রেবার দিকে তাকাল।

রেবা বলল, মাকে তোমার কাছে রাখতে পার না?

না, সেখানে হেমন্তর স্ত্রীর একটি বাচ্চা হয়েছে, মা'র সেখানে যাওয়া দরকার। তা ছাড়া হেমন্ত মা'র বেশি প্রিয়। মা'র ধারণা, আমি গেছি নষ্ট হয়ে, আমার আর কোনও আশা নেই।

আরেকটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ। রেবা বলল, তোমার সেই সাংঘাতিক টাইফয়েডের সময় যখন আমি রোজ খবর নিতুম, তখন তোমার মা একদিন বললেন—জয়ন্ত যদি এই রোগ থেকে বেচে ওঠে তবে জানব তোমার সেবাতেই সে বাঁচল। কিন্তু এর বেশি আর এগিয়ো না মা, তুমি শুদ্দুরের মেয়ে।—আমি তোমার মাকে খুব ভয় করি, জয়ন্ত।

ওরা এসে নামল চৌরঙ্গীর এক নামজাদা রেস্তরার সামনে। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ওরা ভিতরে গিয়ে একটি ক্যাবিনে ঢুকে পর্দা টেনে দিল। মেনু দেখে বয়কে খাবার অর্ডার করল। সে সব খাবারের দাম অনেক। রেবা বলল, ভয় পেয়ো না, আজ আমি পে করব। তোমাকে অসৎপথে নিয়ে যাবার জন্য অনেকগুলো টাকা সঙ্গে এনেছি।

জয়ন্ত খুব হেসে উঠল। বলল, তাহলে বল হেমন্তকেও তুমি গোল্লায় দিতে চেয়েছিলে?

মোটেই না, রেবা বলল, আধমরারা মায়ের প্রিয় হন, মেয়েদের দু' চোখের বিষ। তোমার ছোট ভাই খুব জ্যান্ত ছেলে ছিল না। সে ছিল সহপাঠী, একবয়সী, একই সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল করেছি। কিন্তু সমবয়সী সহপাঠীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি চলে, বড়জোর পিকনিকে গিয়ে চিমটি কাটা, অথবা আরেকটু এগোলে খোঁপা খুলে দেওয়া,—ব্যস, ওই পর্যন্তই। সেখান থেকে প্রণয় অনেক দূর, মনে রেখো, জয়ন্ত। একুশ বছরের মেয়ের কাছে একুশ বছরের ছেলে শুধু নাবালক নয়, একেবারে শিশু। সেই জন্যেই তোমার মা হেমন্তর বিয়ে দিলেন সতেরো বছরের মেয়ের সঙ্গে। ভালই হয়েছে।

জয়ন্ত বলল, মা একটু রাগ ক'রেই যাচ্ছেন। আমি প্রফেসারি নিইনি, উপার্জনে মন নেই, বিয়ের কথা উড়িয়ে দিই, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ভাবিনি,—আমার বিরুদ্ধে বহু নালিশ। হেমন্তকে টেলিগ্রাম করেছি, আজ রাত্তিরে সে আসছে। কাল মা'কে নিয়ে চলে যাবে।

তোমাদের মালপত্তর? রেবা প্রশ্ন করল।

দর্জিপাড়ায় আমার এক মামাতো মাসি আছেন। তার ওখানে সব পাঠিয়ে দেবো।

তুমি থাকছ কোথায় ? ফটিক ঘোষের আফিংয়ের দোকানে ? বাঁকা চোখে রেবা তাকাল।

জয়ন্ত আবার হেসে উঠল।

রেবা বলল, আচ্ছা জয়ন্ত, এক কাজ করলে হয় না ? ধরো, তুমি আর আমি দু'জনেই যদি প্রফেসরি করি ?

তুমি প্রফেসরি করবে ? কেন ? বাপের একটি সন্তান, লক্ষ লক্ষ টাকার ওপর বসে আছ, বাপের কোষাগার তোমার হাতে। গাড়ি, বাগানবাড়ি। তুমি করবে তিন চারশ' টাকার প্রফেসরি ? কি জন্য ? জয়ন্ত তাকে যেন ধমক দিল।

বয় এসে একে একে খাবার রেখে গেল। ঈষৎ গম্ভীর হয়ে রেবা বলল, তুমি আমার পজিসন্ অনেকটা জানো, তবুও কি ভেঙ্গে বলতে হবে ? বাবা আমার ডাকসাইটে। আর মা ? আমাকে কি তুমি মুখ খুলতে বলো, জয়ন্ত ?

দু'জনে খেতে ব'সে গেল। জয়ন্ত এক সময় বলল, তোমার মধ্যে এখনও সেই মেয়েলি কুসংস্কার! হোক না মা বাপ, নির্লিপ্ত চোখে জীবনকে দেখবে না কেন ? পুরনো চিন্তাধারা ছাড়ো। আমার মা প্রাচীন রীতিতে মানুষ, তোমার মা অতিশয় আধুনিক,--এই তফাৎ।

এতই আধুনিক যে, মাঝে মাঝে রাত্রে বাড়ি ফেরেন না। রেবা হাসতে হাসতে পুনরায় বলল, শ্যামপেন মা'র খুব প্রিয়।

তোমার মা'র বয়স কত ?

চল্লিশ বিয়াল্লিশ ত' বটেই। তবে বাবার চেয়ে মা প্রায় কুড়ি বছরের ছোট। তুমি ত' দেখেছিলে একদিন আমার মাকে দূর থেকে। মা এখনও খুব ইয়ং।

জয়ন্ত প্রশ্ন করল, হাসছ কেন ?

রেবা বলল, তোমার কাছে বলতে পারছিনে সব, তাই হাসছি।

যেটুকু বলেছ ওতেই হবে। এখন তুমি নিজের কথা ভাবো।-- এই বলে জয়ন্ত কাটলেটে কামড় দিল।

তোমাকে বাদ দিয়ে নিজের কথা আমার কিছু নেই।

মানে ? এবার ভাল ক'রে মুখ খোল তো ?—জয়ন্ত মুখ তুলে তাকালো।

হাসিমুখে রেবা বলল, অমন ক'রে তাকিয়ো না, তোমার চাহনি সাংঘাতিক। ওর মধ্যে আমার সর্বনাশ যেন লুকিয়ে। তোমার চাহনিই আমার মৃত্যু।

বুঝলুম—জয়ন্ত বলল, তুমি আজও খেলো ধরণের সেই পুরনো

রোমান্টিক। সত্যি বলব, তোমার মতন অনেক মেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে গোটা চার পাঁচ ছেলেপুলে হবার পর। তুমি সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার অবান্তর রসকল্পনার ক্রীতদাসী। দেশ, কাল মন, জীবন,—সব ঘুরে দাঁড়িয়েছে একে একে, কিন্তু তোমার মতন মেয়ের বদল হয়নি। একালের অন্ন খাচ্ছ সেকালের ভাবনার ওপর দাঁড়িয়ে। তোমার সঙ্গে আমার কোথাও মেলে না, রেবা।

রেবা চেয়েছিল জয়ন্তর দিকে একাগ্রচক্ষে। এবার সে বলল, তোমার কথায় একটুও ভয় পাচ্ছিনে, জয়ন্ত। তোমার ভয়, পাছে আমার ছোঁয়ায় তোমার কবিধর্মের স্খলন ঘটে। কিন্তু কেন ভয় পাবে, ধর্ম যদি তোমার সত্য হয়? প্রজাপতি ব্রহ্মার একই কলজে থেকে জন্ম তোমার আমার। একই এনার্জি, দুই তার মুখ। তুমি আমার রসকল্পনায় ভাবাতুর হবে, কে বললে? মিলনে আমার দরকার নেই, কেননা মিলিয়ে আছি দুজনে। পজিটিভ আর নেগেটিভ—দুই তারে আলো জ্বলে। দু'টো জড়িয়ে থাকলেও দু'টো আলাদা। দুই বিপরীত শক্তি, দুই মিলিয়ে [illegible]। ভয় কি তোমার? তুমি কবি, তুমি নির্বংশ তুমি অনাদিনিধন ঝংকার নতুন একালের আমি তোমার সঙ্গী হব। ভয় পাব কেন?

জয়ন্ত বলল, যদি তোমার সঙ্গে আমার লোকদর্শনের কখনো অমিল ঘটে?

চলে যাব,—রেবা দীপ্ত কণ্ঠে বলল, নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাব তোমার জীবন থেকে। আবার আসুক তোমার সামনে নতুন তেজ, নতুন প্রাণ,—আসুক আরেকটা ঝঞ্ঝা তোমার কাব্যলোকের আকাশপথে। আমি তিলমাত্র অভিমান রেখে যাব না।

জয়ন্ত হঠাৎ হাসল। বলল, কথাটা খুলে বল, রেবা। যদি হঠাৎ একদিন তোমাকে ভূতে ধরে? যদি আমাকে বেঁধে ফেলতে চাও?

কী দিয়ে বাঁধব?

কেন, তোমাদের সেই পুরনো শেকল, সেই বিয়ের বাঁধন?

রেবা বলল, হারাবার ভয় থাকলে বেঁধে রাখে। বিয়ের সিঁদুর মানে পাঁচজনের সম্মতির চিহ্ন এই চিহ্ন ধ'রে জন্মের নির্ভুল হিসেব গুণে যাওয়া। এর সঙ্গে জড়ানো থাকে মেয়েছেলের সতীত্ব। অর্থাৎ সতী নারীর সন্তানদের অধিকার পরম্পরা। আমি তোমার ক্রীতদাসী নাই বা হলুম, জয়ন্ত?

জয়ন্ত বলল, যদি তুমি আমার স্বাধীনতা ঘোচাতে চাও?

কোন স্বার্থে ঘোচাবো?—রেবা মুখ তুললো।

মেয়েলি বিদ্বেষ যেটা প্রাকৃতিক। ঈর্ষার থেকে যার জন্ম, আদিম প্রকৃতি

যেটাকে খুঁচিয়ে তোলে। যেটাকে শৃঙ্খলিত ক'রে রাখার প্রধান উপায় বিয়ে! যুগ যুগান্তরে যার থেকে মেয়ে পুরুষ মুক্তি পায়নি।

শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে রেবা বলল, আমি তোমাকে সেই অবারিত মুক্তি দেবো। তোমার যাওয়া-আসার পথ খোলা থাকবে।

জয়ন্ত বলল, আরেকটা কথা। এই হোটেলে বসেই তার নিষ্পত্তি হোক, রেবা। দেশের চারিদিকে এই নোংরা জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তুমি কি কথায়-কথায় আমাকে চরিত্রবান হয়ে থাকার উপদেশ দেবে?

রেবা খিল খিল করে এবার হেসে উঠল। তারপর বলল, অবাক করলে, জয়ন্ত। চরিত্রবান হয়ে থাকবে তুমি? তা হ'লে যে কাব্য সাহিত্যের সর্বনাশ। জীবনকে নির্ভুল চোখে তুমি দেখে এসেছ, সেই তোমার চরিত্র। তোমার কবিতায় ঘাম রক্ত ঘৃণা ক্ষুধা—এরা প্রচণ্ড প্যাশন্ নিয়ে টগবগ করে,—সেই চরিত্র তোমার নিজেরই সৃষ্টি। সেইখানে তুমি আমার সকলের বড় গৌরব।

জয়ন্ত হাসল,—অনেক নিচে যদি নেমে যাই, কিংবা অনেক নোংরায় যদি ডুবে যাই, তাহলেও তোমার গৌরব?

আনন্দে হেসে উঠল রেবা। বলল, পিছন থেকে ঠেলে দেবো যদি তুমি নিচে নামো, নোংরায় ডুবলে আনন্দ পাব। জানি দেহ তোমার নামবে, মনের গায়ে একটু নোংরাও লাগবে না। অপমানে নোংরায় ডুবে যাওয়া তোমার নামা দরকার বৈকি—সে ত' তোমার আনন্দেরই খেলা। তোমার কবিতা বার বার কেঁদে উঠুক সেই যন্ত্রণায়,—সেও আমার গৌরব।

চল এবার উঠি।—জয়ন্ত তার খাওয়া শেষ করল।

দাঁড়াও,—টাকা এনেছি তোমার জন্যে। টাকা রাখো সঙ্গে।

কেন?—জয়ন্ত বলল, আমি তিনটে কবিতা ছাপতে দিয়ে শ'খানেক টাকা পেয়েছি যে?

বেশ করেছ,—রেবা বলল, আরও কিছু টাকা রেখে দাও। তোমাদের সব খরচই হেমন্ত এসে করবে, সেটা দেখতে ভাল নয়। তুমি তার বড় ভাই।

জয়ন্ত বলল, তোমার হাত থেকে টাকা নিতে আমার কুণ্ঠা আসে কেন?

রেবা বলল, ওটা সেই পুরনো কালের কুসংস্কার। আত্মাভিমানী পুরুষ এতকাল ধ'রে জেনে এসেছে, মেয়েমানুষ মাত্রই কৃপার পাত্র, তাদের কেবল দিতেই হয়,—তাদের হাত থেকে নিতে নেই কিছু। তাই নেওয়াটা তাদের সম্ভ্রমে বাধে। তোমার মধ্যেও সেই প্রাচীন আত্মাভিমানীর বদরক্ত জমে রয়েছে, তোমার দোষ নেই।

এ টাকা শোধ করব কেমন করে?

শোধ করা খুব সহজ!—রেবা বলল, যে কবিতাটাকে তুমি তোমার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করবে, সেইটি আমাকে উৎসর্গ করো।

জয়ন্ত বলল, সর্বশ্রেষ্ঠ কি লিখতে পাবব কোনদিন?

পারবে, আমি তা'র জন্য অপেক্ষা করব। চলো—

হোটেলের টাকা চুকিয়ে ওরা দুজনে বাইরে এলো চৌরঙ্গীর ফুটপাথে। বেলা তখন মধ্যাহ্ন।

রায়সাহেব খেতে বসে হাসছিলেন।—

এক সময় তিনি বললেন, না, তর্কের কিছু নেই, শোভনা। নতুন কালের পাখি ডাকছে, কান পেতে শোনোই না কেন তার বুলি। আমার বয়স বাষট্টি, তোমার বিয়াল্লিশ, আর তোমাব মেয়ের যেন কত?

জবাব দিল রেবা। বলল, তোমরা যদি ইস্কুলে আমার বয়স কমিয়ে না থাকো, তবে আমি পঁচিশে পা দিলুম, বাবা।

শোভনা বললেন, মা-বাপেব চোখে সন্তান কখনও সাবালক হয় না, রেবা।

বল কি তুমি?—রায়সাহেব বললেন, পঁচিশ বছবে সাংঘাতিক সাবালক! একুশ বছবে তোমার মেয়ে এম. এস সি পাস কবেছে। চার বছর হ'ল কারবার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। তাকে এখনও ভাবছ নাবালক?

বাবা, তুমি চুপ করো।

ওই ত্যাখো মেয়ের শাসন। আচ্ছা, এই চুপ করলুম।—রায়সাহেব ব- .লন, তোমাব মুখ থেকে শুনব বৈকি এ-যুগের ভাষণ। হ্যাঁ, তুমি সেই দু'টি ছেলের কথা কি যেন বলছিলে, শোভনা?

শোভনা বললেন, একটি ছেলের বিয়ে হযে গেছে, সে ই ওর সঙ্গে পড়ত। সে ফার্স্ট হয়ে গেল, রেবা হল সেকেণ্ড। এটি হচ্ছে তার বড ভাই। লেখাপড়ায় বা চেহারায় বেশ ভালই। কিন্তু সেইটিই সব নয। আমি একেবারেই পছন্দ করছিনে তার সঙ্গে মেলামেশা।

এগুলো মামুলি আলোচনা, মা।

ঝনাৎ ক'রে উঠলেন শোভনা—এ-বাড়ির প্রেসটিজের কথা আছে, রেবা।

শান্তকণ্ঠে রেবা বলল, প্রেসটিজের ব্যাখ্যা চিরকাল বদলায। এক কালের ভলান্টিয়ার, অন্য কালের মিনিস্টার—প্রেসটিজকে ভোট দিযে তৈরি করা যায় মা।

হেসে উঠলেন রায়সাহেব। বললেন, কথাটা খুব মিথ্যে নয়, শোভনা। নাড়াবুনেরা কীর্তনে হলে খাতির পায় বৈকি। এই ধরো না কেন, আমি কি ছিলুম? দেড়শ' টাকা মাইনের ওভারসিয়ার, ছিল না হয় একটা ডিপ্লোমা, রাজমজুর খাটানো ছিল পেশা। প্রেসটিজ তৈরি হল যখন দেড় কোটি টাকার ফার্ম দাঁড়িয়ে উঠল। রেবার কথাটা ভাববার মতন বৈকি।

শোভনা বললেন, সেটা ছিল বিষয়কর্মের জীবন। এটা হল সামাজিক প্রশ্ন। এ-বাড়ির চাকর, ড্রাইভার, বাবুর্চি—এদেরও সামাজিক পরিচয় আছে, কেননা এ-বাড়িতে তারা চাকরি করে। কিন্তু ওই ছেলেটি, যাকে লোফার বলতে একটুও বাধে না? সে নাকি আবার মস্ত একজন কবি শুনতে পাই। আমি অত বই-কাগজ পড়িনে। পড়লেও বুঝিনে।

রেবা মুখ তুলে হাসল। বলল, তোমার কথায় আমার একটুও রাগ হচ্ছে না, মা।

বটেই ত'—রায়সাহেব চামচ নামিয়ে বললেন, কেনই বা রাগ হবে। প্রকৃত সৎশিক্ষা মানুষকে শান্ত ক'রে রাখে। যারা সামান্য কথায় উত্তেজিত হয় তারা অল্প জলের মাছ। ভেতরটা শূন্য, তাই বাজে বেশি।—আচ্ছা, আমি উঠলুম। প্রায় দু'টো বাজে। তুমি এ-সপ্তাহে টাকা রিকুইজিশন্ করেছ, রেবা?

রেবা বলল, করেছি। কিন্তু আমি আর তোমার ঘরকন্না চালাতে পারব না, বাবা। বাড়িতে তিনজন মানুষ, কিন্তু তেরোজন তাদের মাইনে-করা লোক। এ-বাড়িতে থাকলে কেউ বিশ্বাস করবে, এটা গরীবের দেশ? এই সব অপব্যয় আমার আর ভাল লাগছে না।

রায়সাহেব উচ্চকণ্ঠে হেসে বললেন, মেয়ে তোমার তৈরি হচ্ছে, শোভনা। আর কিছুদিনের মধ্যেই দেখো, এ মেয়ে ঝাণ্ডা তুলে চেঁচাবে, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

রায়সাহেব তাঁর অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে গেলেন। আধ মিনিটের মধ্যেই তাঁর মোটর ছুটে চলল বাগান পেরিয়ে।

টেবিল ছেড়ে উঠে যাবার আগে শোভনা একটু অনুযোগ ক'রে বললেন, তোর মতিগতি আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে, রেবা। কে যে তোকে কী মন্তর দিল, দু'-দু'টো ভাল পাত্র তুই নাকচ করলি। বিয়ের বয়সে বিয়ে না করলে চলবে কেন?

বিয়ে সবাই করে না, মা। আমি পড়াশুনো নিয়ে থাকব। ইচ্ছে হলে প্রফেসরি করব।

শোভনা বললেন, মেয়ে-প্রফেসর বিয়ে করে না?

করে বৈকি! তবে অনেকে বিয়ের পর বসেও যায়।

সমস্ত জীবন বসে থাকবি তুই এই শূন্যপুরীতে?

রেবা মুখ তুলল। বলল, কে বললে মা? সেই দিন আসছে, সম্পত্তির অহঙ্কার যেদিন ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে। কে বললে থাকব এই শূন্যপুরীতে? থাকব মানুষের মাঝখানে।

শোভনা বললেন, কিন্তু এই সম্পত্তি আর ওই মস্ত কারবার যদি তোকেই একদিন দেখাশুনো করতে হয়?

রেবা বলল, সেইদিন আমার দুর্ভাগ্য। সে দুর্ভাগ্য যদি আসে, সেদিন এই তাসের ঘর উড়ে যাবে—তোমাকে বলে রাখলুম।

উষ্ণকণ্ঠে শোভনা বললেন, এত সব দুর্বুদ্ধি বুঝি তুই কলকাতার আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে আনিস? তোর এই সর্বনেশে চেহারা হবে বলেই কি তোকে আমরা মানুষ করে তুলনুম?

রেবা এবার উঠে দাঁড়াল। সে হাসল না, কিন্তু তার গলার আওয়াজে এল বিদ্রূপ। বলল, তোমার হাতে মানুষ হইনি, তাই বোধ হয় বেঁচে গেছি। এ বাড়িতে ছিলেন আর দু'জন মহিলা। তুমি যাকে তাড়িয়েছ— সেই ইন্দুমতী। অন্যজন কে ছিলেন তুমিই জানো। আমার মনে নেই। আমাকে মানুষ করেছে আয়া, খেতে দিয়েছে মেটন, বেড়াতে নিয়ে গেছে দারোয়ান, পড়িয়েছে নার্সারির আন্টিরা। তুমি মেয়েকে ভালবাসতে পারোনি বলেই আমাকে কখনও কাছে ডাকোনি। মানুষ করে তোলার বড়াই নাই বা করলে মা?

রেবা নিজের ঘরে চ'লে গেল।

শোভনা কতক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। সম্ভবত এ ধরনের স্পষ্ট কথা তিনি একবারও শোনেননি। কথাগুলি অপ্রিয়, কিন্তু বোধ করি প্রতিবাদের ক্ষেত্র নেই। মায়ের সঙ্গে তার সম্মানের যোগ ঘটেনি সেই সেকালের স্তন্যপান ছাড়া। কিন্তু সে কাজ জন্তু জানোয়ারও ক'রে থাকে তাতে বাহাদুরি কিছু নেই। তিনি মেয়ে মহলে শুনেছেন, সন্তান হওয়া নাকি সেক্স অ্যাকসিডেন্ট সেইজন্য 'মা' শব্দটা পাশ্চাত্ত্য দেশে কানে ঠেকে। মা হবার জন্য বছর চব্বিশ আগে তাঁর পেটে কয়েকটা দাগ পড়েছিল, সেসব দাগ অনেকটা মিলিয়েছে। কন্যার আশ্চর্য যৌবনশ্রী শোভনা প্রসন্ন চক্ষে দেখেন না বলেই তিনি রেবাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে ভয় পান। রেবা সম্ভবত এ সম্বন্ধে বেশ সচেতন।

গরমের ছুটি এবং পূজোর ছুটিতে রেবাকে তিনি দূরে সরিয়ে দিতেন, কাছে রাখতেন না। সঙ্গে যেত আয়া এবং বুড়ো চাকর। কখনও দার্জিলিংয়ে, কখনও সমুদ্রতীরে, কখনও বা পশ্চিমে। সে সব ব্যাপারে রায়সাহেবের দখল

বা অভিমত গ্রাহ্য হ'ত না। শোভনা তখন পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতেন। কন্যা কাছে নেই বলেই বাড়িতে তিনি একের পর এক পার্টি দিতেন। সেই পার্টিতে আসতেন সকল সম্প্রদায়ের সাহেব-সুবো। মহিলারা আসতেন তাঁদের সহচরী হয়ে। শোভনা থাকতেন প্রধান আকর্ষণের পাত্রী। কন্যা সেখানে ভাগ বসাবার জন্য উপস্থিত থাকত না, এবং তিনি আপন বয়সটিকে লুকিয়ে রাখার সুযোগ পেতেন। সেই সব পার্টিতে সন্ধ্যারাত্রে চলত হুইস্কি, মাঝরাতে নাচের আসরে চলত শাম্‌পেন।

উনিশ বছর বয়সে প্রথম প্রতিবাদ জানালো রেবা। বি. এস-সি অনার্সে ফার্স্ট হয়ে সে সেদিন সামনে এসে যখন দাঁড়ালো তখন তার দীর্ঘোন্নত তনুলতার দিকে চেয়ে শোভনা ঈষৎ দুর্ভাবনার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, কি বলছিস?

রেবা বলল, আমাকে না জানিয়ে আমাকে এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা কে করল? তুমি, না বাবা?

শোভনা জবাব দিলেন, আমি। আমি তোর বিশ্রামের কথা ভেবেছিলুম। একটু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে আসবি এই ভেবেছিলুম।

আসন্ন ঝঞ্ঝার ঠিক আগেকার মতো একটা স্তব্ধতা ছিল রেবার চেহারায়। মৃদুকঠিন কণ্ঠে সে বলল, তোমার ওপর রাগ করব না, মা। কিন্তু আমাকে আর অন্ধকারে রাখতে চেয়ো না।

রেবা মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সেবার থেকে এ বাড়িতে পার্টি বন্ধ হয়েছে। শোভনা জানতেন, এ মেয়ে অন্যরকম ধাতুতে গড়া। তিনি তাঁর রীতি বদল করেছিলেন।

আরেকদিন সামান্য একটি ঘটনা ঘটেছিল। রেবার একখানা পোশাকী শাড়ি পরে তিনি গাড়ি নিয়ে সকালের দিকে মার্কেটিং করতে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু মাংসের বাজারে ঢুকতে গিয়ে সেই শাড়িতে দাগ লেগে যায় বলে সেখানা সযত্নে কাচিয়ে তিনি নিজের ঘরে রেখেছিলেন। সেদিন সেখানার খোঁজ পড়তেই শোভনা বললেন, আমার আলমারিতে তোলা আছে, তুই বার ক'রেনে রেবা।

রেবা বলল, ও শাড়ি তুমিই নাও, মা। তোমার যখন পছন্দ হয়েছে—

না না, তা কেন? বাজারে শাড়ির কি অভাব? ঐই নে চাবি—

চাবির গোছাটা শোভনা রেবার সামনে এগিয়ে দিলেন। কফির ছোট্ট পেয়ালায় চুমুক দিয়ে রেবা বলল, তোমার ঘরে আমার ঢুকতে ইচ্ছে করে না, মা!

বারান্দার দেওয়ালে ঝোলানো বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শোভনা

লিপস্টিক দিয়ে ঠোঁট দু'খানা দুরস্ত করে নিচ্ছিলেন। এবার তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, কেন?

আমার লজ্জা করে।

কিসের লজ্জা?

কুণ্ঠার সঙ্গে রেবা বলল, তোমার দেওয়ালে যে সব নোংরা বিলেতী ছবি টাঙিয়ে রেখেছ, মাথা তুলে সেগুলোর দিকে তাকানো যায় না।

শোভনা অবাক বিস্ময়ে বললেন, নোংরা বলছিস কিরে? তুই না মডার্ন মেয়ে। বিলেতের শ্রেষ্ঠ ললিতকলা তোর কাছে নোংরা। ওগুলোর দাম কত জানিস। কত টাকা ঘুষ দিয়ে তবে ওগুলো জাহাজে করে আনতে হয়েছে, তা ভেবে দেখেছিস। অবিশ্যি ফটোগ্রাফগুলো নাইট ক্লাবের দালালদের কাছে কেনা- সে সব আমি অ্যালবামে রেখেছি। কিন্তু পোর্ট্রেটগুলোকে তুই যদি অশ্লীল বলিস, তোকে সবাই বলবে- আর্টের তুই কিছুই বুঝিসনে। অবাক করলি তুই, রেবা।

হাসিমুখে রেবা বলল, তোমার শাম্‌পেন খাওয়া চোখে ও ছবিগুলো বাজে কেমন লাগে, মা?

চমৎকার।—শোভনা বললেন, যত দেখি আশা মেটে না। তুই মেয়ে না হ'লে বলতুম, ওদের দিকে চেয়ে শরীরের সমস্ত রক্ত তোলপাড় করে। আমি যেন প্রত্যেক ছবির মধ্যে বেঁচে উঠি। না, তুই পড়াশুনো অনেক করেছিস, কিন্তু আর্টের লাইনে তুই বড্ড বেরসিক, রেবা।

একটি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে কন্যার মুখের উপর দিয়ে শোভনা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন পিছন থেকে তাঁর দিকে একবারটি তাকিয়ে রেবা বলল, মা, তুমি যে সেদিন বললে, দিনের বেলা পাইপ-প্যাণ্ট আর পরবে না। আজ পরলে কেন? জ্যাকেটটা এবার বড্ড ছোট বানিয়েছ তুমি। মানাচ্ছে না।

ফিরে দাঁড়িয়ে শোভনা বললেন, মানাচ্ছে কিনা বাইরে গিয়ে বুঝবো। বহু লোক যেখানে, সেখানে গিয়ে জানবো বেমানান কি না। এপারের ফুটপাথে হাঁটবার সময় ওপারের ফুটপাথে যদি কেউ থমকিয়ে যায়, তখন জানতে পারব বেমানান হয়নি।- বলতে বলতে শোভনা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আমার ফিগার কি তোর আজকাল একেবারেই ভাল লাগছে না, রেবা

রেবা আবার হাসল। বলল, ভাল লাগে বলেই ভয় করে।

উচ্চরোলে হাসির আওয়াজ তুলে শোভনা নেমে যাবার সময় বলে গেলেন, তুই বড্ড সেকেলে।

কফির পেয়ালাটা রেখে রেবা উঠে এলো নিজের ঘরে। এ ঘরে ছবি নেই,

মনোযোগ আকর্ষণ করে—এমন সামগ্রী সে রাখতে দেয়নি। চারটে বোবা দেওয়াল চারদিকে—যাদের নিজেদের ভাষা কিছু নেই। ওই নিরাভরণ দেওয়ালে যে ছবি ফোটে, সেই ছবি সে ছাড়া কেউ দেখে না। সে মাকে দেখে—যিনি তার জননী। দেখতে চেষ্টা পায় নির্ভুল চক্ষে—যেটা শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা নামক বিভিন্ন ভাবাবেশে মোহগ্রস্ত নয়। মায়ের সঙ্গে তার যেন অনেকটা প্রতিযোগিতার সম্পর্ক,—বাৎসল্যের নয়। এ জীবনে কখনও মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে সমাদর করেননি, শিশুকালে কোলে নেননি, কন্যার জন্য কখনও তিনি পছন্দসই কোনও সামগ্রী কেনেননি, একটি কোনও খাদ্যবস্তু মেয়ের মুখে তুলে দেননি। অসুখ হলে নার্স এসেছে, খেতে দিয়েছে বাবুর্চি, বিছানায় শুইয়েছে আয়া, পোশাক পছন্দ করে কিনেছে মেট্রন। রায়সাহেব কন্যার কাছে আসেননি কোনওদিন বটে, কিন্তু তাঁর স্নেহ পাওয়া গেছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। কন্যার বসবাসের স্বাচ্ছন্দ্য, বহু মূল্যবান পোশাকপত্র, বিভিন্ন অলঙ্কার - রায়সাহেবের বাৎসল্য সেখানে অপরিসীম। মা টাকা খরচ করেন, কিন্তু হিসাব নিকাশের জ্ঞান না থাকায় বহু ব্যক্তির নিকট তিনি প্রতারিত হন, টাকার থলি হারিয়ে ফেলেন, এবং অপব্যয় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। এ নিয়ে রায়সাহেব শোভনাকে বহুবার সতর্ক করেও সুফল পাননি। অবশেষে রেবা বি. এস সি পাস করার পর রায়সাহেব তারই হাতে সর্বপ্রকার খরচপত্রের দায়িত্ব দেন। শোভনা বহু জায়গায় ধার রেখে আসেন, রেবা সেই সব বিল শোধ করে। রায়সাহেব বলেন, রেবাই ত' সব। ভবিষ্যৎকালে যা কিছু সমস্তই তার। আমরা আছি বৈ ত' কিছু নয়। এ সংসার রেবাই চালাক।

একদিন রেবা প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা বাবা, ন্যায্য খরচ কাকে বলে?

রায়সাহেব বললেন, এটা বুঝলে না মা, যে খরচটি না করলে জীবনযাত্রা অচল হয়, সেইটির নামই ন্যায্য খরচ।

রেবা বলল, আচ্ছা ধরো, তুমি মা আর আমি এই তিনজনের পায়ের জুতো মোট চুয়াল্লিশ জোড়া, —এগুলো কি ন্যায্য খরচ? তোমার দৈনিক লাগে একটা বড় বোতল জনি ওয়াকার,- এও কি তাই? মা বলেন ওঁর প্রায় তিনশ' শাড়ি জমেছে, তোমার স্যুট প্রায় পঞ্চাশ বাহান্নটা এগুলো?

রায়সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন এতক্ষণ। এবার হো হো করে হাসলেন। বললেন, তবে শোনো, মা। যখের ধন আর কুবেরের ভাণ্ডার এক জিনিস নয়। প্রথমটা কৃপণ, দ্বিতীয়টা দাতাকর্ণ। একটায় জমা পড়ে না—যা আছে তাই সামলিয়ে চলা, শুধু পাহারা দেওয়া; অন্যটা হল অফুরন্ত, সেটা

ব্যয় অপব্যয়ের অতীত,—যত দিতে পারবে ততই তার পুঁজি বাড়বে! যখন ওভারসিয়ার ছিলুম, তখন একজোড়া জুতোয় পাঁচটা তালি আর পাঁচটা হাফসোল্ লাগাতুম। তখন ছিল যখের ধনের যুগ। সেই যুগ এখন বদলিয়ে গেছে। এখন অনায়াসে বিলিয়ে দিতে পারি বলেই আর অভাব ঘটে না। চুয়াল্লিশ জোড়া জুতো যদি ফেলে ছড়িয়ে দাও, তবে দেখবে আবার চুয়াল্লিশ জোড়াই একে একে জুটে গেছে।

রায়সাহেব হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পিছন থেকে রেবা বলল, আচ্ছা বাবা, এমন লোকও ত' আছে যাদের এক জোড়া জুতো কেনার ক্ষমতা নেই? ধরো যাদের একবেলা পেটে ভাতও জোটে না?

আছে বৈকি তেমন লোক। আমাকে তাদের জন্যে কি করতে বলো?

না, বলছিনে কিছু, বাবা।

রায়সাহেব কাছে এলেন। কন্যার মাথায় হাত রেখে বললেন, তোমার এই ভাবান্তরের নামই চিন্তাবিলাস' অল্প বয়সে অনেক উদার আইডিয়া ছেলে মেয়েকে পেয়ে বসে। কালক্রমে সে সব আইডিয়ার ধার ক্ষয়ে যায়। যারা তাদের জীবনে প্রতিজ্ঞা নিয়ে ওঠে তারা অন্য ধাতুতে গড়া, রেবা।

তোমার জীবনে কোনও প্রতিজ্ঞা ছিল না, বাবা?

ছিল।---রায়সাহেব বললেন, কিন্তু আমার লোভ আমার সব প্রতিজ্ঞাকে ভাসিয়ে দিয়েছে, মা। আমি কালের ধোপে টিঁকে থাকতে পারিনি।

রায়সাহেব বেরিয়ে গেলেন।

নিজের ঘরে এসে বই কাগজ ইত্যাদি নিয়ে রেবা বসে গেল। অনেক পরিশ্রম বাকি আছে তার। অনেক বই ঘাঁটা, অনেক তার গবেষণা থিসিস লেখা সে এখনও ধরেনি, শুধু নোট নিয়ে যাচ্ছে মাসের পর মাস। কবে সে লিখতে বসবে, কতদিন ধরে যে লেখা চলবে, সে নিজেও জানে না। কিন্তু সে কোন্ ধাতু, যা দিয়ে নতুন প্রতিজ্ঞা আনা যায় জীবনে, যা দিয়ে তৈরি করে তোলা যায় নতুন চরিত্র, কোন্ ধাতবের সঙ্গে কোন্ রসায়ন মিললে সেই চরিত্রের দিগন্তজোড়া বিদারণ ঘটবে? ঘটবে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ না, রেবা জানে না সেই পরম জৈববিজ্ঞান। সে কেবল জানে, প্রবৃত্তির নিগূঢ় অন্ধ সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে থাকে লোভ, জৈব আসক্তি, মূঢ় জীবনের অন্তঃসার শূন্য আত্মাভিমান আর লালাসিক্ত সম্ভোগ প্রয়াস। সেই ধিকৃত নিকৃত দিনযাপনের গ্লানির মধ্যে কারা যেন কিলবিল করছে তার চারদিকে।

বিছানায় গা এলিয়ে বোধ হয় তার তন্দ্রা আসছিল, এমন সময় মাথার

কাছে অতি মৃদুস্বরে টেলিফোন বাজলো। রিসিভার তুলতেই তার কানে ঝংকৃত হল, আমি জয়ন্ত।

জয়ন্ত!—রেবা অধীর কণ্ঠে বলল, এতদিন পরে মনে পড়ল তোমার? কী করছিলে এতকাল, এত যুগ? ঠিকানা দাওনি কেন? কোথা থেকে বলছ? কোথায় আছ? তোমাকে আমার এক্ষুনি দরকার।

কেন?

আঃ, আবার কেন। তোমার কবিতার সঙ্গে উধাও শূন্যে উড়ে যেতে চাই এক্ষুনি, আমি সেই নিত্যকালের বনহংসী, জয়ন্ত।—রেবা আকুল ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল, আমাকে তুলে ধরো জয়ন্ত, যদি পারো। তুলে নিয়ে যাও এই নরককুণ্ড থেকে—যেদিকে মহাকাশ, যেদিকে অরোরার বর্ণের আলপনা, কিংবা নিয়ে যাও সমুদ্রে, অরণ্যে,—যেখানে যেদিকে তোমার খুশি, জয়ন্ত।

আঃ, তোমার রোমান্টিক প্রলাপ একটু থামাও ত'? আমি একালের কবি, রিয়ালিস্ট! শোনো, আমি আজ টুইশনির দরুন মোটা টাকা পেয়েছি, তুমি এলে খরচ করব।

চেঁচিয়ে উঠে রেবা বলল, কোথায় দেখা হচ্ছে শিগগির বলো। আসবে আমার এখানে? এখন বেলা দেড়টা। বাবা নেই বাড়িতে—যিনি তোমাকে মানুষ বলে মনে করেন না। মা আছেন—যাঁর কাছে তোমার তিলমাত্র সমাদর নেই! তবু আসবে?

হ্যাঁ, আসব। এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।—এই বলে জয়ন্ত টেলিফোন ছেড়ে দিল।

জয়ন্ত আসছে এ বাড়িতে এই প্রথম। ছয় বছর আগে রেবার সেই অর্বাচীন সহপাঠী হেমন্ত যেদিন বলল, এই আমার দাদা কবি জয়ন্ত—সেদিন সেইক্ষণে রেবার অন্তর জুড়ে জ্বলে উঠেছিল অগ্নিশিখা। থাক্ সে কথা। কুমারী কালের প্রণয়ে চটুলতা থাকে, সেই কারণে সেই প্রণয় ছটছট করে গভীরতার অভাবে। সে আড়াল খোঁজে, কথায় কথায় বায়না ধরে, নিরিবিলিতে বসে হিজিবিজি লেখে, প্রণয়পাত্রকে না দেখলে জগৎসংসার অন্ধকার, এবং ভাতে অরুচি! প্রণয় প্রেমে পরিণত হলে তবে শান্তি। রেবার বেলা এর বিপরীত। প্রথম বছর তিনেকে সে ছিল শান্ত, সে যেন সর্বক্ষণ চেয়ে থাকত আপন সত্তার অতল গভীরে। সে ছিল সংযতবাক্, নিত্য প্রসন্ন। সে নিজের মধ্যেই নিজের বাসা বেঁধেছিল।

কবি জয়ন্ত আসছে এই প্রথম এ বাড়িতে। কেমন করে তার অভ্যর্থনা হবে? এ বাড়িতে জায়গা কোথায় তার? এ যে রাক্ষসরাজপুরী! সম্পদের

এই অতি প্রাচুর্য জয়ন্তের পায়ের তলায় প্রতিক্ষণে কাঁটার মতো ফুটবে। এখানে চারিদিকে অপমান, এখানে তার জন্য ঘৃণা পুঞ্জীভূত। এখানে আসক্তি আর লোভ যখন-তখন কিলবিলিয়ে উঠছে, মানুষের সর্বাপেক্ষা ইতর দুষ্প্রবৃত্তি এ বাড়ির প্রত্যেক আসবাবপত্রের সঙ্গে জড়ানো। এ বাড়িতে হৃদয় নেই, আছে স্থূল দেহ—মাংসপিণ্ড দিয়ে যার পরিমাপ। এখানে জয়ন্ত এসে বসবে কোথায়? ওই সুবৃহৎ লাউঞ্জে জয়ন্তর ভাবনার কোনও আশ্রয় নেই। কেউ বসে না ওখানে, ওটা সাজানো গোছানো পড়ে থাকে। এ যেন ভৌতিক একটা যক্ষপুরী,—চারিদিকে মৃত্যুর চক্রান্ত যেন চুপি চুপি ষড়যন্ত্র করছে। বাইরের বৃহৎ প্রাঙ্গণে বড় বড় গাছ, সামনে ও পিছনে বাগান, দক্ষিণে বিস্তৃত দীঘির জলে রক্তশতদল,—এসব পেরিয়ে নগরের জনকল্লোল কোনদিক থেকে শোনা যায় না। মাঝে মাঝে দূরগতি মোটরের শব্দ, যখন তখন পাখির ডাক, কখনো কখনো ঝড়ের হাওয়ার হাহাকার।

এক সময় রেবা এসে শোভনার ঘরের সামনে দাঁড়াল।

মা।

শোভনা তাঁর সন্ধ্যার পোশাক নির্বাচনে ব্যস্ত ছিলেন। আয়া মতিয়াবিবি তাকে সাহায্য করছিল। কাঁচলি আর পেটিকোট ছাড়া শোভনার পরনে আর কিছু ছিল না। তিনি ফিরে দাঁড়ালেন।

জননীর ফিগারের দিকে তাকিয়ে রেবা হাসল। বলল, তুমি জয়ন্তকে আজও দেখনি, মা। সে এখনই আসছে। তুমি এখন আছ তো? তোমার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেবো।

বেশ ত', আনন্দের কথা।—শোভনা বললেন, চারিদিকে যাদের দেখি, তাদের জানা হয়ে গেছে। তোর বন্ধুকে দেখব সবচেয়ে সাধারণ একজন। মন্দ কি।

রেবা মাকে নিরীক্ষণ করে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াল, তারপরে চলে গেল নিজের মহলে।

ওই যে জয়ন্ত আসছে,—বারান্দা থেকে দূরে তাকে দেখা গেল।

জয়ন্তর এক-পা ধুলো—যখন বাগান পেরিয়ে এসে ভিতরে উঠল। পুরনো চটি সবাই পরে, কিন্তু এক পাটির ফিতা ছিঁড়ে গেলে হাঁটা অসুবিধে। বাস থেকে নেমে প্রথমটা সে রিক্সা ধরেছিল। মাইল দেড়েক এসে রিক্সা বলল, আর সে এক পাও যাবে না, কেন না তার ফিরবার পথে এ অঞ্চলে সওয়ারি মিলবে না। সুতরাং ওকে বারো আনা পয়সা চুকিয়ে সোজা হণ্টন। দুঃখ দিল শুধু চটি জোড়াটা। এ অঞ্চলে মুচিরা আসে না।

রেবা আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাসছিল।

জয়ন্ত বলল, দাড়ি কামাবার তারিখ ছিল আজ। কিন্তু ভাবলুম, ছাত্রমহলের নতুন স্টাইল ইদানীং দাড়ি রাখার বাহার। দাড়ি রাখলে বুঝি ছাত্রীদের চোখ পড়ে, পুরুষ বলে চিনতে পারে। তুমি তো আজও ছাত্রী।

বাঙ্গালী আয়াটা হাসিমুখে পিছন থেকে চেয়ার টেনে দিল। জয়ন্ত বলল, তোমার এখানে তাড়াতাড়ি আসব, তাই ডাইং ক্লিনিং থেকে পিরানটা আনা হল না। এ পাঞ্জাবিটা একটু ময়লা বটে, কিন্তু ধুতির সঙ্গে মেলে। ধুতিখানা আসলে কিন্তু হেমন্তর।

চান্ করেছিলে?—রেবা জানতে চাইল।

জয়ন্ত বলল, সে আর বলো না! বটুদের চায়ের দোকান থেকে একটা মগ নিয়ে দাঁড়ালুম গিয়ে রাস্তার কলে। সে কলে ছিরছিরে জল। কিন্তু ওখানে বালতির কিউ পড়েছে পঞ্চাশ গজ দূর পর্যন্ত। সকলের পেছনে আমি। সুতরাং চান হবে কেমন করে?

রেবা তাকে সঙ্গে করে নিজের মহলে তুলে নিয়ে গেল। খালি পায়ে কেউ হাঁটে না এ বাড়ির ঝকঝকে মিহি মার্বেলের মেঝের উপর দিয়ে। ছয় ফুট চওড়া বর্মা টীকের সিঁড়িতে আটকানো মোলায়েম কার্পেটের উপরে বিনা জুতোয় কেউ ওঠানামা করে দেখেনি, পায়ের তলায় রোমাঞ্চ হয় কতটুকু। ছেঁড়া চটির পাশে রেবার জরি মখমলের চটি জোড়াটা পাশাপাশি পড়ে রইল - যেন জলজ্যান্ত অসঙ্গতি। শুধু পিছন থেকে চেয়ে রইল বাঙ্গালী আয়া জয়ন্তর ঘাড়ের নিচে পাঞ্জাবির ছেঁড়া অংশটার দিকে।

কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচায়ি করে রইল নিচের তলাকার সবাই। তাদের চোখের উপর দিয়েই রেবা তুলে নিয়ে গেল জয়ন্তকে দোতলায়। এ যেন এক নতুন কালের অলকাপুরী। ভবিষ্যৎকালে এই অট্টালিকাই বোধ করি যাদুঘরে পরিণত হবে, যেদিন আসবে সত্যাশ্রয়ী এবং আদর্শবাদী কর্মীর দল।

কোথা দিয়ে কোন্ দিকে রেবা তাকে নিয়ে গেল, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এ যেন মৃতলোক—তার একটির পর একটি রহস্য দ্বার উদ্ঘাটন করছে চোখের সামনে। এক সময় জয়ন্ত যেখানে এসে ঢুকল, সেটা নাকি রেবার মহল। মহল মানে একালের স্যুইট্। নিজস্ব কিচেন্ আর প্যান্ট্রি, এন্টিরুম, ড্রেসিং কর্ণার, ছোট লাউঞ্জ, বাথ ও টয়লেট। এধারে দক্ষিণমুখী বারান্দা, তার পাশ দিয়ে অন্য মহলে চলে গেছে প্রশস্ত করিডর। এ মহলে আসতে গেলে ঠুং-ঠুং করে বেল্ বাজিয়ে সাড়া দিয়ে ঢুকতে হয়। হাঁটতে গেলে মার্বেলের মেঝের উপর

দেহের অধমাঙ্গের ছায়া প্রতিবিম্বিত হতে থাকে। এ নিয়ে হাই-কাট্ ফ্রকপরা মেয়েমহলে হাসাহাসি আছে।

শোভনা এখনও টের পাননি। এই সুযোগে দু'চারটে কথা সেরে নেওয়া দরকার। রেবা প্রশ্ন করল, সেই কবে তোমার সঙ্গে দেখা। এতদিন ধরে চুপ করে ছিলে যে?

জয়ন্ত বলল, তোমাতে আমাতে এত উঁচু নিচু যে, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা অশোভন মনে হচ্ছে। আজ তোমাকে ফোন করলুম এই জন্যে যে, গোটা কয়েক কবিতা লিখেছি।

কোথায় বসে লিখলে?—রেবা জিজ্ঞাসা করল, তোমার জ্যাঠামশাই ত' তাড়িয়ে দিয়েছেন, ঘর ছেড়ে দিয়ে মা গেছেন বাণপুরে। তুমি উঠেছ কোথায়?

জয়ন্ত হাসিমুখে জবাব দিল, ঠিকানাটা এখনও ঠিক রপ্ত হয়নি, ডাক-পিওনরাও সব সময় নাকি হদিস পায় না। তবে ওই ন্যাড়া বটগাছটা হল নিশানা। ওইটে সামনে রেখে আধমাইল আন্দাজ এগোলে হাটতলাটার গায়ে একপাশে হল গন্নাখাঁদার পাইস-হোটেল, আর এই মোড়ে হল কর্পোরেশনের কলেবার টিকে নেবার আপিস। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। শুধু চামড়ার কারখানার একটু বদগন্ধ আসে দক্ষিণ হাওয়ার সঙ্গে—এই যা। সাহিত্যচর্চার আইডিয়াল কর্ণার।

উজ্জ্বল চক্ষে রেবা জিজ্ঞাসা করল, তোমার ঘরটি কেমন?

হেসে উঠল জয়ন্ত,—কর্ণার মানে ঘর নয়। আরে, ঘরের দরকার যদি কিছু চুরি যাবার ভয় থাকে। তুমি অবাক করলে রেবা। আমি থাকি, আর থাকে আরসোলারা, উভয়েই আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে ওরা তোমার মতন একটু যেন গায়েপড়া—এই যা।

রেবা স্বচ্ছ সুন্দর কণ্ঠে হেসে উঠল, পরে বলল, আমাকে তোমার সেই কর্ণারে একবারটি নিয়ে চল, জয়ন্ত।

কেন? আমার যেটা বাসস্থান, সেটা যদি তোমার পক্ষে কৌতুকের বিষয় হয়!

রেবা থেমে গিয়ে বলল, এমন ত' হতে পারে সেটি আমার কবিতীর্থ।

ওই নাও,—জয়ন্ত বলল, তোমার গলায় আবার কাঁপন লাগল। তুমি সায়েন্সের মেয়ে, অত ইমোশন্ কেন। নতুন কালের কবির কাছে ইমোশন্ দু চোখের বিষ। আমার চারিদিকের কঠোর রিয়েলিটিজ সস্তা সেন্টিমেণ্ট আর ইমোশনকে চাবকিয়ে তাড়িয়েছে। একালের কবিতায় অতীন্দ্রিয়ের ফাঁকি নেই।

আমি চলতিকালের নির্ভুল জীবনকে আঁকতে চাই। আমার খেলা প্রাণ আর প্যাশন্ নিয়ে।

প্যাশন কাকে বলতে চাইছ?

নিজের বুকের মাংস ছিঁড়ে যে রক্তে কবিতা লেখা হয়,—তাকে বলে প্যাশন্। ছিন্নমস্তা যখন নিজের রক্ত পান করে, প্যাশন তার নাম।—জয়ন্ত শান্তকণ্ঠে জবাব দিল,—ভূপ্রকৃতির গর্ভে সাংঘাতিক উত্তাপ জমতে থাকলে অগ্নি উদ্‌গিরণ অবশ্যম্ভাবী। আমার কবিতায় সেই জলন্ত তরল অগ্নিপ্রবাহে বিশ্বাস করি।

রেবা হেসে বলল, আগুন আর রক্তের ওপর তোমার একটা মোহ আছে, জয়ন্ত।

জয়ন্ত বলল, আমার শুধু নয়, প্রত্যেক মানুষের। জন্মের মূলে অগ্নিবিন্দু, সেই কারণে অগ্নিই হল প্রাণ। আর রক্ত। রক্তই ত' দেহনির্মাণের প্রধান মসলা। যেমন বাড়ি তৈরির পক্ষে জল। আমার মোহ রক্তে আর আগুনে, কেন না রক্ত ঝরলে তবেই আসে নতুন কাল, আগুন ছড়ালে তবেই পুড়ে যায় পুরনো জঞ্জাল।

তা হলে ফটিক ঘোষকে নিয়ে আফিংয়ের ব্যবসা করতে গিয়েছিলে কেন।

ওটা জীবন বৈচিত্র্য, ওটাও আমার জানা দরকার—জয়ন্ত জবাব দিল - হাটতলা, পাইস হোটেল, মুচিপাড়া, কুলিধাওড়া, জাহাজঘাটা, মাছের ভেড়ি, মুর্গিহাটা, মদের ভাটি কালীঘাট, -আমি সর্বত্রগামী। আমার সব দেখা চাই। আমি দেখতে দেখতে কবি, জানতে জানতেই দার্শনিক। আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই এই ভয়াবহ অধোগতির কালে কী খেয়ে বাঁচে ওরা, চারিদিকের দুর্গতির মধ্যে ওদের দিন কাটে কেমন করে - । তোমাদের এই যক্ষপুরী, এও আমার একটা অভিজ্ঞতা।

হাতের কাছে টেলিফোনের একটা বোতাম টিপে রেবা রিসিভারটি তুলে এবার ডাকল, এ ঘরে তুমি একবার আসবে, মা।

শোভনা বললেন, আমি ত' অপেক্ষাই করছি। তোমরা দুজনে এঘরে এসো না কেন।

না মা, ওঘরের ছবিগুলো বড্ড অসভ্য। ওখানে জয়ন্তর সামনে আমি অস্বস্তি বোধ করব। তুমি এসো এখানে।

শোভনা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, তুই দিন দিন এত পিউরিটান হবি, আমি ভাবিনি, রেবা। আচ্ছা যাচ্ছি—

জয়ন্ত বলল, ব্যাপার কি?

রেবা জবাব দিল, মা হলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের মেয়ে। উনি সকল

সংস্কারমুক্ত। উনি কোনও আদর্শবাদে বিশ্বাস করেন না। তিন বছর উনি কন্টিনেন্টে কাটিয়েছেন। বাবার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক বড অদ্ভুত।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। শোভনা ভিতরে এসে দাঁডালেন—পিছনে পিছনে তাঁর নিজস্ব আয়া মতিয়াবিবি। রেবা পরিচয় করিয়ে দিল।

হাসি মুখে শোভনা বললেন, তুমিই জয়ন্ত? ফাইন? তুমি এত ব্রাইট ভাবিনি।

রেবা বলল, গত বছরে জয়ন্ত ডক্টরেট্ পেয়েছে।

বটে।—শোভনা মুখোমুখি বসলেন, হাসি মুখে বললেন, কীভাবে ক্যারিয়ার গডবে, বল শুনি।

জয়ন্তও হাসল। বলল, ধনী হবার চেষ্টা পাব না, এটুকু বলতে পারি।

ধনী হওয়া কি অন্যায়?

আমাব পডাশুনোটা ধনী হতে উৎসাহ দেয় না, মিসেস রায়। আমি বিদ্যায় বিশ্বাস কবি, ধনে নয়।

শোভনা তাঁর সরু প্যাণ্ট পরে ছিলেন। তার সঙ্গে যথারীতি শর্ট জ্যাকেট। বব করা চুলের রাশ তাঁব মাথায়। সেই চুল ঈষৎ বেগুনি রং-করা। মুখে মোলায়েম রক্তিমাভা। ঠোঁট দুখানা টকটক করছে লাল। রেবা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল, আমি সামান্য, মা'র সঙ্গে গল্প কবলে তুমি আনন্দ পাবে, জয়ন্ত।

জয়ন্ত বলল, আপনাকে চমৎকার মানিয়েছে, মিসেস রায়। মনে হচ্ছে আপনারা দুই বোন। রেবাব মনে যেন অকাল বার্ধক্য আসছে। আপনি সত্যাই আধুনিক।

আমি সকল কালের আধুনিক।—শোভনা বললেন, আমার মেয়ে ছবি দেখে ভয় পায়, জ্যান্ত ছবি দেখলে বোধহয় আঁৎকিয়ে উঠবে। আমি ভয় পাইনে জয়ন্ত। জীবনটা হল সম্ভোগের বড একখানা পাতা আসন, এটা রেবা স্বীকার করে না। ও মেয়ের ভবিষ্যৎ কী, আমি জানিনে। সে যাই হোক, তুমি কী খাবে বল। ভার্মুৎ, না শেবী? এত রোদে তোমাকে স্ট্রংগার ড্রিঙ্ক দিতে চাচ্ছিনে।

জয়ন্ত বলল, কোনও খাদ্যে আমার অরুচি নেই। কিন্তু মদ খাবার জন্যে এখানে আসিনি, মিসেস রায়।

তাহলে কী দিয়ে তোমাকে রিসিভ করব। ঠাণ্ডা একটু বীয়র খাবে?

না, শুধু এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল।

জল।—শোভনা বললেন, গুডনেস। জল আছে রে মতিয়া।

এনে দিচ্ছি।—মতিয়া চলে গেল।

জয়ন্ত একবারটি তাকালো শোভনার পোশাকের দিকে। পরে হাসি মুখে বলল, আপনাকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না, অসভ্যের মতন জানতে ইচ্ছে করে আপনার বয়স কত।

রেবা হেসে উঠল,—তুমি ঠকে গেছ জয়ন্ত। কত বয়স দেখায়, সেইটেই হল আসল বয়স মেয়েদের।

শোভনা বললেন, বয়সটা হল মনের একটা গঠন, জয়ন্ত। পৃথিবীর প্রত্যেক সামগ্রী দেখে যে আনন্দ পায়, তার কখনও বয়স বাড়ে না। আমি স্মার্টনেসে বিশ্বাস করি।

আচ্ছা মা,—রেবা বলল, জয়ন্তর সম্বন্ধে তোমার ধারণা কেমন হচ্ছে, বল তো।

শোভনা বললেন, আমার বয়স আরও কুড়ি বছর কম হলে বলতে পারতুম। শুধু এইটুক বলি—

মতিয়াবিবি জলের গ্লাস এনে রাখল সামনে। জয়ন্ত এক ঢোকে জল খেয়ে ফেলল।

শোভনা পুনরপি বললেন, আমার আগেকার ধারণার জন্য আমি দুঃখিত। বুঝলে জয়ন্ত, আমার মেয়ে এ বাড়িতে পার্টি দেওয়া বন্ধ করেছে। নইলে আমার সঙ্গে বল্‌নাচে তোমাকে নেমন্তন্ন করতাম।

ওটা আমি জানিনে, মিসেস রায়।

আ, জানবার কি আছে, রীদমিক পা ফেলা। আমার হাতের মোচড়ে তুমি শিখে নিতে। আমি খুবই দুঃখিত যে, রেবার শাসনে আমাকে বাইরে যেতে হয়।

জয়ন্ত উৎসুক কণ্ঠে বলল, মানে। আমি ঠিক ধরতে পারছিনে। ক্ষমা করবেন।

নিজের পরনের পাইপ প্যাণ্ট সম্বন্ধে শোভনা বোধ করি একটু সচেতন ছিলেন। সেজন্য রেবার চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি ঈষৎ ঘুরে বসলেন। তাঁর অনেক যুবক বন্ধু আছে। কিন্তু জয়ন্ত তাঁর মেয়ের বন্ধু। এবার একটু মাথা নিচু করে তিনি বললেন, আর না, কিন্তু আমাদের সামাজিক বা পারিবারিক পরিচয় কতকটা চাপা আছে। সেটুকু প্রকাশ করে রেবাকে আমি এম্‌ব্যারাস করতে চাইনে। তবে এইটুকু বললেই হবে, রেবা এ বাড়ির সমস্ত ইকনমি কন্‌ট্রোল করে। ওর সব কর্তৃত্ব আমরা মেনে নিয়েছি।

জয়ন্ত তাঁর দিকে চেয়ে রইল। সঠিক বুঝতে পারা গেল না, তিনি কী বলতে চাইলেন। তবে নিজের হাতঘড়ির দিকে চেয়ে এক সময় তিনি বললেন, পাঁচটা দশ, এবার উঠি। উইশ ইউ গুড লাক্‌।

শোভনা নিজের মহলের দিকে ফিরে যাবার আগে আরেকবার ফিরে তাকালেন,--আমার গ্যালারিটা একবারটি চোখ বুলিয়ে দেখে যাবে নাকি, জয়ন্ত ?

জয়ন্ত বলল, মনে রইল আপনার অনুরোধ। নিশ্চয় দেখব একদিন, মিসেস রায়।

একবার ক্ষণকালের জন্য থমকিয়ে এই প্রত্যাখ্যানটি মনের সঙ্গে মিলিয়ে শোভনা চলে গেলেন নিজের মহলে। আজ তাঁর বিশেষ আমন্ত্রণ আছে সন্ধ্যা সাতটায়। তাঁর তাড়া ছিল প্রচুর। মতিয়া হনহনিয়ে চলল তাঁর পিছু পিছু। কিন্তু আপন কক্ষে গিয়ে কতকটা বিরক্তির সঙ্গে তিনি বললেন, এখন যা, ডাকলে আসিস।

মতিয়া বলল, 'রোশনি' জ্বালিয়ে দেবো, মেমসাব।

না না, তুই যা এখন।

মতিয়া চলে গেল বটে, কিন্তু কাছাকাছি রইল মিনিট কয়েক পরে গলা বাড়িয়ে সে দেখল, নিচের বাগানের পথ দিয়ে বেরা মেমসাব তা'র ছোট গাড়িখানা নিজেই চালিয়ে বেরিয়ে গেল। পাশে বসেছে জয়ন্ত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা গেল, তা'রা চলে গেল অনেক দূর।

মতিয়া সেইভাবে সেইখানে বসে রইল বহুক্ষণ, কিন্তু বড়মেমসাহেবের ওদিক থেকে কোনও প্রকার সাড়া এল না। একে একে এ অট্টালিকার প্রায় সর্বত্র আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু মতিয়ার পক্ষে প্রস্তুত থাকা দরকার। হয়ত আজও বড়মেমসাবের সঙ্গে তাকে বেরোতে হবে। মাঝ রাত্রে বা শেষ রাত্রে তাঁর যখন ছুটি মিলবে তখন তাঁকে অনেকটা যেন কুড়িয়ে আনতে হয়। তখন মতিয়া ছাড়া সাহায্য করার জন্য অন্য কেউ কাছাকাছি থাকে না।

এক সময় সে উঠল এবং শোভনার সঙ্গে যাবার জন্য নিজের মতো সাজসজ্জা করে প্রস্তুত হয়ে এল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত শোভনার কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না।

সাতটা প্রায় বাজে।

মতিয়া একবার নিঃশব্দে অগ্রসর হয়ে জানলার বাইরে থেকে একটি চোখ ফেলে শোভনার ঘরের মধ্যে তাকালো। শোভনা জামা ও প্যাণ্ট ছেড়ে ফেলেছেন। সেগুলো মেঝের উপর ছড়ানো। উপুড় হয়ে তিনি পড়ে রয়েছেন বিছানায়, এবং তাঁর একখানা পা ঝুলছে। কোমর থেকে উরু পর্যন্ত সেই সামান্য ইলাসটিক রেশমি আণ্ডারওয়্যার। ঘর অন্ধকার।

এমন 'গোসা' তিনি মাঝে মাঝে করে থাকেন। মতিয়া নিঃশব্দেই আবার ফিরে এল। খাঁ খাঁ করছে উপরতলাটা।

ড্রাইভ করছিল রেবা। গাড়ি চলছে মৃদুগতি। মিনিট কয়েক পরে জয়ন্ত বলল, যাচ্ছ কোন্ দিকে। এ পথ চিনিনে।

আমিও চিনিনে—রেবা বলল, নাই গেলুম চেনা পথে।

হাসি মুখে জয়ন্ত বলল, এসব শুনতে মন্দ নয়। মেয়ে পালাচ্ছে পুরুষকে নিয়ে অচেনা রাজ্যের দিকে, তার মধ্যে একজনের চালচুলো নেই—এসব কাহিনী ভাল করে গুছিয়ে লিখলে এককালে আসর জমতো। আজ এগুলো পুরনো। রাজনীতি আর অর্থনীতির চাবুক খেয়ে অবাস্তব রঙীন কল্পনা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। যাই হোক, প্রথমেই জানতে চাই, গাড়িতে তেল আছে তো।

রেবা শুধু বলল, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

খুশী হলুম—জয়ন্ত বলল, এবার নিশ্চয় তুমি কোনও বন বাদাড়ের ধারে গিয়ে বসবার কথা ভাবছ।

হেসে উঠল রেবা। অনেকটা ধরেছ বটে।

বেশ, তার আগে একটি কথা শোনো।—জয়ন্ত বলল, তোমার বাড়িতে এক গেলাস জল ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি, দ্বিতীয়ত, আমার পকেটে রয়েছে আমার এ মাসের রুজি-রোজগার,—আজ আমি এটা সব খরচ করে যাব। গন্নাখাঁদার পাইস-হোটেলে একটা সুবিধে পেয়েছি—দু বেলা ধারে খেতে পারব।

রেবা এবার সামনের ড্রয়ারটি খুলে একটি স্ন্যাকের প্যাকেট বার করে দিয়ে বলল, খাও ততক্ষণ। ভয় নেই, ওসব বাড়ির জিনিস নয়। বাইরে থেকে আনা।

তোমার বাড়িতে কিছু কি আমাকে খাওয়াতে চাও না?

না। ওতে তোমার ছোঁয়াচ লাগতে পারে।

কিসের ছোঁয়াচ?

রেবা জবাব দিল, ও বাড়ির হাওয়ার।

জয়ন্ত বলল, এটা তুমি মায়ের ওপর কটাক্ষ করছ, রেবা।

রেবা হঠাৎ এক স্থলে গাড়ি থামালো। পিছনের সীটের পায়ের কাছে ছিল একটি ঝুলি। হাত বাড়িয়ে সেটি তুলে নিয়ে কফির ফ্লাস্কটা বার করে নিল। পরে বলল, জানি তুমি কারো নিন্দে করতে চাও না। কিন্তু মাকে তুমি ঘৃণা করেছ মনে-প্রাণে—এটি বুঝতে আমার দেরি হয়নি। আর কিছু আমি বলতে চাইনে।

কেমন করে বুঝলে তুমি?

মা নিজেই তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন – ফ্লাস্ক থেকে দুটো প্লাস্টিকের পেয়ালায় রেবা কফি ঢালল।

স্ন্যাকের প্যাকেট থেকে দুখানা স্যাণ্ডুইচ ও একটি কাটলেট বার করে জয়ন্ত রেবার হাতে দিল। পরে বলল, একটা জায়গায় বোধ হয় তোমার ভুল হচ্ছে, রেবা। আমি জন্মেছি দেখার জন্য আর লেখার জন্য, সমালোচনার জন্য নয়। ছোঁয়াচ আমার লাগে, কিন্তু সেটা বড় ক্ষণস্থায়ী। বোধহয় এই কারণে আমায় বন্ধু জোটে না, কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না। কোনও বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য, মন্তব্য, ধারণা, বিশ্লেষণ—সবগুলো অলীক। এইজন্যেই শোভনা দেবীর সম্বন্ধে আমার মনোভাব এতক্ষণে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আমি কবি, এই আমার শেষ পরিচয়। আমার ঘৃণা আর ভালবাসা—দুইয়ের মধ্যে তফাত কম। কিন্তু ও দুটোই আমার সাময়িক কাজে লাগে। অনুভূতির ক্ষেত্রে ও দুটোর দর একই। ঘৃণাও সুন্দর, যদি তার অভিব্যক্তিতে নির্ভুল নিবিড়তা থাকে। শোভনা দেবীকে ভুলতে পারি বলেই দেখে আনন্দ পাই। এইটি লক্ষ্য করে এলুম, উনি তোমার জননী, কিন্তু আজও মা হয়ে ওঠেননি। এই সত্য উদঘাটনেই কবির আনন্দ।

বক্তৃতা দীর্ঘ, কিন্তু রেবা কান পেতে শুনল। এক সময় রেবা বলল, আমরা দুজনে দুজনকে ছ বছর ধরে দেখছি। আমরা নিজেরাই কি নিজেদের খুঁটিয়ে দেখেছি?

জয়ন্ত বলল, কোন দিক থেকে বলছ।

ধরো, বন্ধুত্বের দিক থেকে।

জয়ন্ত কফিতে চুমুক দিয়ে একটু হাসল। পরে বলল, হ্যাঁ, খুঁটিয়ে আমি দেখেছি বইকি। তুমি চেয়ে এসেছ সান্নিধ্য, আমি চেয়েছি আনন্দ।

কিসের আনন্দ।

বাঃ, এ অদ্ভুত কথা। আনন্দের ভিন্ন পরিচয় কী আছে।—জয়ন্ত অনুযোগ জানাল।

নিজের পেয়ালায় রেবা কফি ঢালল। পরে হাসিমুখে বলল, সান্নিধ্য মানে সঙ্গ। সঙ্গ কি পেলুম।

জয়ন্ত বলল, ছয় বছর ধরে পেলে।

উচ্চ কণ্ঠে রেবা হেসে উঠল এবার। পরে বলল, কিন্তু মাত্র ছয় দিনের জন্য ত পেলুম না।

উভয় পক্ষের কেউই নাবালক নয়। সুতরাং দুজনেই পুনরায় হেসে উঠল। এক সময় কফি শেষ করে রেবা গাড়িতে স্টার্ট দিল।

আবার অনেক দূর চলে গেল দুজনে। শহরতলি ছাড়িয়ে বনবাগান পেরিয়ে চলল। অন্ধকার হয়ে এসেছিল। রেবা হেডলাইট জ্বালল। মুখ ফিরিয়ে সে এবার বলল, কবির মন কি বলে। এটা সুখ, না আনন্দ।

জয়ন্ত বলল, দুই মিলিয়ে থ্রিল। গতিবেগের আনন্দ। কিন্তু মনে রেখো, রেবা—আমার পকেটে দু'শ টাকা থেকে-থেকে কামড়াচ্ছে।

আবার গাড়ি এসে থামল এক গাছতলার অন্ধকারে। হেডলাইট নিবল। সন্ধ্যার পাখিরা কলকণ্ঠ থামিযে চুপ করে গেছে। প্রধান রাজপথ এটা নয়, সেজন্য একটু নিরিবিলি। গাড়ির ভিতরে আলো ছিল, কিন্তু জ্বালার দরকার নেই।

রেবা বলল, কি ভাবে টাকা খরচ করবে, বল? কোন্ হোটেলে গিয়ে খেতে চাও।

জয়ন্ত বলল, তোমার স্ন্যাক খেযে আমাব পেট ভরে গেছে। খেতে কিছু পারব না।

তাহলে যেতে হয সবচেযে বড হোটেলে '—রেবা বলল, শামপেনের সঙ্গে নাচের আসর—তাহলে টাকাটা ফুরোতে পারে।

কী আছে সেখানে?

পুরুষের চোখ যা চায় তাই আছে।

তাহলে তোমার মা যান কেন সেখানে?

হেসে উঠল রেবা। বলল, সে সব আসবে শুধুমাত্র মেযেমানুষ থাকলে মা যেতেন না।

কিযৎক্ষণ চুপ করে রইল জয়ন্ত। রেবা বলল, বয়স নয জয়ন্ত, বাসনা। মা এখন সেই বয়সে দাঁড়িযে, যখন শেষবেলাকাব ফানেস দাউ দাউ করে জ্বলছে। তার তাপ বোধহয পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কেউ যদি কাছাকাছি যায, সেও যাবে ঝলসিয়ে। ওই গ্যাসচুল্লিতে অনেক লোহা গলে গেছে।

জয়ন্ত কতক্ষণের জন্য আবার চুপ করে গেল। পরে বলল, নাঃ, তোমার হোটেলের আইডিয়াটা ভাল লাগছে না, রেবা। চোখের তৃপ্তি চাইলে ত' এই গাড়ির মধ্যেই সেটা পাই।

তাহলে কি সিলিং লাইটটা জ্বালব।—রেবা বলল, কেউ নেই এখানে। ভয় পেয়ো না।

জয়ন্ত হেসে উঠল। রেবা হাসিমুখে আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল। হেডলাইট

জ্বলে উঠল। যতটুকু দেখা যায় পথ, ততটুকুই জানার সীমা। রেবা বলল, এবার তুমিই বল কোন্‌দিকে যাব।

পাশে মেয়েছেলে বসা। আমি এখন দিকভ্রান্ত।

আমাদের বাড়িতে ফিরে যাবে?

জয়ন্ত বলল, তোমাদের বাড়িতে। তুমি যে বলছ ওখানে গ্যাসচুল্লি।

রেবা বলল, ভয় পাও কেন, জয়ন্ত। ওই উত্তাপের ধারে দাঁড়িয়ে লিখবে তোমার কবিতা—যার ভেতরে ভেতরে জ্বলবে লক্ষ সূর্যের আগুন। তুমি তেজ আনো জয়ন্ত, হাইড্রোজেন বোমার তেজ—শত শত মেগাটনের সাংঘাতিক শক্তি নিয়ে। আমি থাকব তোমার পাশে।

জয়ন্ত বলল, তোমার এ ধরনের চিন্তাধারা কেন বল তো।

তোমার জন্যে।—রেবা বলল, তুমি খুঁচিয়ে তুলেছ আমার এই ভাবনা। তোমার চোখে, মুখে, চিন্তায়—আমি দেখছি সেই সাংঘাতিক সর্বনাশের সঙ্কেত। তোমার কবিতায় পাচ্ছি সেই ছারখারের ভাষা—যেটা আমাকে বানিয়ে তুলছে ইস্পাতের ফলার মতন।

গাড়ি থামিয়ে দিল রেবা। রাখল এক পাশে।

জয়ন্ত বলল, ছারখার হলে তুমি আমি থাকছি কোথায়।

রেবা বলল নাই বা থাকলুম তোমার গলায় সর্বনাশের ভাষা আধো আধো কেন। কণ্ঠা কেন। আমি মেয়েমানুষ তাই ভয় পাইনে ঘর ভাঙতে, সমাজ ভাঙতে, জাত ভাঙতে। সময় নেই জয়ন্ত এই বেলা সব ভাঙো। তুমি আগুন জ্বালো, আমি বাতাস দেবো। সেইজন্যে বলছি, আমার বাড়িতে চলো। ওখানে গিয়ে পড়ব তোমার কবিতা শুনব যাবে আমার গলার আওয়াজ তখন পর্যন্ত ভূমিকম্প।

জয়ন্ত শান্তকণ্ঠে বলল, হুঁ সব বুঝলুম। ছ' বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে। আমি নিজে ছিলুম অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ভয়ানক বেপরোয়া। হেমন্ত তোমাকে ভয়ের চোখে দেখত, মা আমার মৃত্যু কামনা করতেন।

রেবা বলল, কি ধরনের বেপরোয়া।

সেটা সব সময় শুনতে নেই। —জয়ন্ত বলল, পুরুষ কতকগুলো ইনস্টিঙ্ক্ট নিয়ে জন্মায়, মেয়েদের তা নেই। পুরুষ স্বভাব দুরন্ত, মেয়ে তার বিপরীত।

আমাকে তখন কেমন দেখেছিলে —রেবা জানতে চাইল।

ঠিক আজকের উল্‌টোটা। অর্থাৎ লাজনম্র, স্বল্পভাষিণী। তোমাকে প্রথম দেখে আমি কবিতায় মন দিলুম। অর্থাৎ কেমন একটা অবাঞ্ছিত সংযম এলো আমার চিন্তায় আর আচরণে।

রেবা হাসল—আর আমি।

তোমার এল চাঞ্চল্য।—জয়ন্ত বলল, তুমি অস্থির হতে থাকলে। মুখর হয়ে উঠলে দিন দিন! মরা গাঙে জোয়ার এল। তুমি সায়েন্সের মেয়ে, তোমার মধ্যে দেখা দিল সায়েন্টিফিক হিস্টিরিয়া। আজ তুমি যা বলছ, এগুলো শুধু আওয়াজ। এগুলোর মধ্যে নাটকীয়তা আছে বলেই শুনতে ভাল। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে দোষ নেই, আমি শুধু কবিতাই লিখতে জানি, ছারখার করতে জানিনে। তোমার এই বিদ্রোহিনীমূর্তিই আমাকে শান্ত রেখেছে।

রেবা বলল, আমার এই চেহারার জন্যে তুমিই দায়ী জয়ন্ত। তোমার কবিতার কোন কথাটি কোথায় গিয়ে কার মনে কী কাজ করছে, তুমি কি খবর রেখেছ। তুমি নিঃশব্দে রচনা করছ একটা সম্প্রদায়, এ কি তুমি জানো। কেউ কাঁদছে তোমার কথায়, কেউ আক্রোশে ফুলছে, কেউ নৈরাশ্যে ডুবছে, কেউ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, কেউ বা বিদ্বেষ আর ঘৃণায় আকণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে উঠছে—এর খবর কি তুমি পাও? তোমার হাজার হাজার পাঠকের মধ্যে আমি একজন। কিন্তু আমি তোমার কবিতার এক অনুপ্রাণিত পরিণাম—কেননা, তুমি ঢুকেছ আমার রক্তে আর মজ্জায়, আমার শিরা উপশিরায়। তোমার কবিতার প্রতিটি অক্ষর জ্বলছে আমার আকাশে। তোমার আগুনের সর্বনেশে ফুলকি আমাকে দগ্ধ করছে দিনরাত।

জয়ন্ত দেখতে পেলো না রেবার চোখ দুটো জ্বালা করছে অন্ধকারে। জয়ন্ত একটু আড়ষ্ট হয়ে রইল।

কেন বলছ হিস্টিরিয়া? —রেবা বলল, তোমার কবিতা আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না, সে দোষ কি আমার? তোমার লেখায় কোন শব্দের সঙ্গে কোন শব্দ মিললে পাঠকের মনে কেমন কেমিক্যাল এফেক্ট হয়, সে খবর কি পাও তুমি? জীবনটা ত' মস্ত ল্যাবরেটরি। এক রসের সঙ্গে বিশেষ অন্য দ্রাবক মিললে যে সাংঘাতিক বিস্ফোরণ ঘটে। উনিশ বছরের শান্ত মেয়ে একটু একটু করে আজ এই যে বেপরোয়া চেহারা নিয়েছে, একে রচনা করেছ তুমি। এ যদি হিস্টিরিয়া হয়, তবে এ তোমার, আমার নয়। একে যদি তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দাও, তবে তোমার কাব্য সাধনা মিথ্যে। কবিতা লেখা যদি তোমার চিত্তবিলাস হয়, তবে আমি সেই বিলাসের বলি।

জয়ন্ত হেসে বলল, তুমি ত' জানো, কবিমাত্রই পালিয়ে বেড়ায়। তাদের অধিকাংশই এস্‌কেপিষ্ট।

বেশ ত' জয়ন্ত,—রেবা বলল, তুমিও পালাও। যেখানে খুশি যাও, যেমন ইচ্ছে জীবন কাটাও। তুমি নীচে নামো, নোংরায় তলিয়ে থাক, ওপরে ওঠো,

বিলাসে ডুবে যাও, তপস্যার তপোবনে আত্মগোপন কর,—যা খুশি তোমার। আমি শুধু দেখতে চাইব, তুমি ফুটে উঠেছ, শতদল মেলেছ।

জয়ন্ত বলল, সেক্ষেত্রে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা থাকবে কি প্রকার?

রেবা বলল, তুমি ত' একদিন বলেছিলে, সে সম্পর্কটা অনির্ণীত থাক। তার লৌকিক পরিচয় নেই। আছে আত্মিক।

জয়ন্ত বলল, কিন্তু আবার বলি, তুমি যদি একদিন আমাকে নিয়ে ঘরে উঠতে চাও। ঘর মানে বিছানা, বিছানা মানে সন্তান, সন্তান মানে ঘরকন্না।

এ সব ন্যাসকেমি, জয়ন্ত — চেঁচিয়ে উঠল রেবা- ভবিষ্যতে পাছে তোমার স্ত্রী হয়ে উঠি, এই তোমার ভয় — সেজন্য আমাকেও ভয় দেখিয়ে দিব্যি করিয়ে নিচ্ছ। তুমি বিদ্বান, গত বছরে ডক্টরেট পেয়েছ, কিন্তু এ কথা বোঝনি, একালে স্ত্রী আর সহধর্মিণীর মধ্যে তফাৎ ঘটেছে অনেক। জন্তুরা ঘরে ওঠে না, ওঠে মানুষ। ঘরে ঢুকলে জন্তুরা তাড়া খায়, কিন্তু মানুষরা পায় অভ্যর্থনা। বিছানা পাতে মানুষ, জন্তু শোয় জঙ্গলে। আর, শেষের কথাটা মন খুলে বলব?

বাস্ হয়েছে — ... বলো না, থাক থাক, দোহাই তোমার।

কলকণ্ঠে হেসে রেবা আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

দু শ' টাকা থেকে দু টাকাও খরচ করা গেল না। কিন্তু আন্দাজ রাত এগারোটায় রেবার ছোট গাড়িখানা যে পল্লীতে এসে ঢুকল তার গলিঘুঁজিতে গাড়ি নিয়ে ঢোকা একটু যেন কষ্টকর। দু পাশে কাঁচা নর্দমা যে প্রকার গন্ধ ছড়াচ্ছে, সেটা দক্ষিণ শহরতলির বাগানবাড়িতে বসে ঠিক কল্পনায় আসে না। মাঝে মাঝে স্তূপাকার জঞ্জালে চাকা আটকে যায়। সেজন্য সাবধানে স্টিয়ারিং ধরা দরকার। এ পাশে কাঁচা ঘর, ওপাশে গরুর খাটাল, ওদেরই মধ্যে হঠাৎ উঠেছে কারো দোতলা, পাশেই তার নাকের ডোবা বজবজ করছে। গাড়ির হেডলাইট জ্বেলে সঙ্কীর্ণ গলিপথ রেবা সন্তর্পণে পেরিয়ে যাচ্ছিল। এক সময় জয়ন্ত বলল, ব্যস, এবার থাম।

গাড়ির চাবি বন্ধ করে কাচগুলো তুলে দিয়ে জয়ন্তর সঙ্গে রেবা পা বাড়িয়ে ঠিক যেখানে নামল, সেখানে প্রথম পদার্পণেই রেবার চটিজুতো কাদায় ডুবল। এটা বোধ করি কোনও নতুন কলোনীর প্রারম্ভকাল। ঘরদোর উঠছে, কিন্তু জলের ব্যবস্থা নেই। আশা করা যাচ্ছে এই শতাব্দীর মধ্যেই পথঘাট, আলো, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী—এগুলো হবে। যারা এগুলো করবে তারা হয়ত জয়ন্তর মতো ব্যক্তির ঔরসে এবং রেবার মতো নারীর গর্ভে একালে জন্ম নিতে পারে। তবে কিনা জয়ন্ত কবে যেন বলছিল, না, এ ধারণা ভুল। যারা এই জীবনের

প্রতিকার করবে, তারা ঠিক আমাদের মতন ভদ্রসমাজ নয়। তারা জাতি-গোত্রহীন। তারা তরোয়াল শান দিচ্ছে। কান পাতলে তাদের পায়ের আওয়াজ শোনা যায়।

ওরা দুজনে যেখানে এসে উঠল, সেটা ঠিক ঘর নয়—চালা। এটা কোনও ময়রার দোকানের একটা অংশ। তবে দোকান বললেও ভুল হবে, কেননা, এখানে হালুইকররা মাল তৈরি করে বাজারের দিকে পাঠায়। জয়ন্ত থাকে এদিকের অংশে। এর ভাড়াই মাসিক দশ টাকা। স্নানাদি বাইরের খোলা আকাশের নিচে,—শৌচাদির জন্য শেষ রাত্রটাই সুবিধাজনক।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে জয়ন্ত কারিগরদের একজনকে ডেকে বলল, মোদক-মশাই, দেশলাইটে একটু দিন, মোম বাতিটা জেলে নিই।

এই যে—মোদকমশাই বললেন, আজও দেশলাই একটা কেনেননি দেখছি। দাও ত' মোড়ল, দেশলাইটে বাবুকে। ঠাকরুণকেও এনেছেন দেখছি আজ। শোবার অসুবিধে হবে না?

জয়ন্ত বলল, না, অসুবিধে কিসের? যা হোক ব্যবস্থা একটা করে নেব।

মোদক বলল, আমাদেরও কাজ এই শেষ হয়ে এলো। এবার পানতুয়ার কড়াটা নামলেই আজকের মতন ছুটি। দাও ত' মোড়ল, বেড়ার দরজাটা ভেজিয়ে। হাজার হোক, ঠাকরুণ এসেছেন তো? হোক না কেন দর্মার বেড়া, আড়াল হলেই হল।

ভাজা পানতুয়ারা এবার রসে ডুবল।

দর্মা আর বাঁকারি দিয়ে একপাল্লা দরজা। সেটা ভেজিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও একটু ফাঁক হয়ে রইল। এদিকে জয়ন্ত সরে এসে জ্বালল তার আধখানা মোমবাতি। আসবাবপত্র ঘরে কিছু নেই। কাদামাটির মেঝে, তারই এক পাশে টিনের একটা রং-চটা বাক্স। একখানা পুরনো শতরঞ্চির উপর তোষক নামক যেটি পাতা, সেটাকে কাঁথা বললেই হয়। তারই উপর ছড়ানো রয়েছে রাশি রাশি বই কাগজ। দেয়ালে ঝুলছে একখানা ক্যালেণ্ডার। কোণের দিকে এক জোড়া পুরনো জুতো। গোটা দুই ময়লা জামা পাট করে খানতিনেক বইয়ের সাহায্যে যেমন তেমন ভাবে মাথার বালিশ বানানো। চেঁচাবাঁশের বেড়া দিয়ে চালা তৈরি, সুতরাং বায়ু চলাচলের জন্য জানলা বানাবার কথা ওঠে না। এখানে একমাত্র মূল্যবান সামগ্রী বই ক'খানা।

রেবা এতক্ষণ পরে কথা বলল—টিনের বাক্সে কি আছে?

জয়ন্ত বলল, খান দুই হিজিবিজি লেখা খাতা। আর বোধ হয় সাবানকাচা দু'একটা কাপড়চোপড়।

রেবা একবার এদিক ওদিক তাকাল। পরে বলল, আমার কিন্তু খিধে পেয়েছে।

এই যে—জয়ন্ত বলল, যা ভয় করেছিলুম। তোমাদের মতন লোককে নিয়ে মুশকিল। এই ত' সন্ধ্যেবেলা তখন স্ন্যাক গিললে। তোমার লিভার বড্ড সক্রিয়, রেবা। একটু না খেয়ে থাকার অভ্যাস কর। দাঁড়াও, দেখি একবার—

জয়ন্ত হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল। রাত এগারোটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। ছুটতে ছুটতে সে এসে পৌঁছুল গন্নাখাঁদার পাইস হোটেলে। সেখানে খদ্দের আর কেউ নেই। ঝিয়েরা তখন ধোয়া মাজা করছে। খাঁদা খেয়েদেয়ে ঘরে উঠে সারাদিনের হিসেব নিকেশ নিয়ে বসে গেছে।

জয়ন্ত গিয়ে দাঁড়াতেই খাঁদা বলল, ওই নাও! আর যে কিচ্ছু নেই। হাঁড়ি খালি যে?

জয়ন্ত বলল, নিজের জন্যে নয়, খাঁদা। ঘরে আমার অতিথি। এক থালা না দিলেই চলবে না।

কাঁচপোকা টিপ পরা নতুন ঝি সামনে এসে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বলল, এই যে আপনি এসেছেন? হোক না কেন রাত্তির। খদ্দের লক্ষ্মী। তা হোক, আমার ভাতই দিচ্ছি।

নতুন ঝি ত' মিনিটের মধ্যে একজনের মতন পেটভরা ভাত আর রুটি, কলাইয়ের ঠাণ্ডা ডাল আর কুমড়োর ঘ্যাঁট, খয়রা মাছের ঝাল আর আমড়ার টক—কাঁসিতে করে সব গুছিয়ে এনে দিল। জয়ন্ত বলল, এক ঘটি জল দাও, বুঝেছ? কাল সকালে আমি মাজা বাসন ফেরত দিয়ে যাব।

পোড়া কপাল আমার!—নতুন ঝি বিশেষ এক ভঙ্গিতে বলল, আমি আছি কি করতে? চলুন, আপনার ওখানে আমিই পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি। এই তো, এইটুকু পথ। আমিই খাইয়ে দাইয়ে এঁটো বাসন ফিরিয়ে আনব।

খাঁদা ওদিক থেকে বলল, আজকের খাঁতে পাঁচ সিকে খাতায় উঠল, বুঝলেন?

আচ্ছা—বলে জয়ন্ত আগে আগে চলল।

ছটাক খানেক পথ। ওই পথটুকু আসতে আসতেই নতুন ঝি তার আত্মকাহিনী ফেঁদে বসল। তার নিঃস্বার্থ সেবায় মুগ্ধ হয়নি, এমন লোক কম। এর আগে হাসপাতালে ছিল তার মস্ত চাকরি। সেখানে তরুবালা বলতে সবাই অজ্ঞান। আর ওই যে ধোবাপাড়ার শাউরা—ওদের মেজবাবুই ত' তাকে দিয়েছিল কানের এই ফুল জোড়াটা—।

বলতে বলতেই জয়ন্তর পথ ফুরিয়ে গেল। অন্ধকারে নর্দমা পেরিয়ে ছেঁচা

জল মাড়িয়ে সে এসে ঢুকল তার সেই চালায়, রেবা যেখানে বসে রয়েছে মোমবাতিটার সামনে।

ভাতের কাঁসি নামিয়ে তরুবালা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে রেবার দিকে তাকাল। পরে বলল, ভাগ্যি শালপাতাখানা চাপা দিয়ে এনেছিলুম। দুজন কি আর জানতুম। বাসন ক'টা মেজে-ঘষে কাল তোমরাই হোটেলে পৌছে দিও। পোড়া কপাল।

নতুন ঝি আর ফিরে তাকাল না। খর পায়ে বেরিয়ে গেল।

চালার ভিতরে তাকিয়ে জয়ন্ত এবার বলল, বাঃ ফিটফাট করে সব গুছিয়েছ দেখছি। তোমার গোছাবার হাত আছে ত' বেশ। নাও, বসে যাও—

রেবা বলল, বেশ লাগছে জায়গাটা। ভাগ্যি এলুম।

জয়ন্ত বলল, নতুন বলেই ভাল লাগছে। ধনী লোকরা যেমন মুড়ি বাতাসার সুখ্যাতি করে।

তা হতে পারে—রেবা বলল, আমি এ ধরণের জীবন থেকে বঞ্চিত। বৈচিত্র্য দেখছি বলেই আনন্দ পাচ্ছি।

দুজনে খুশী হয়ে খেতে বসল। কড়কড়ে কাঁকর মেশানো ভাত, ঠাণ্ডা কলাইয়ের ডাল, কুমড়োর ঘ্যাঁট আর ছোট মাছের ঝাল। ওগুলোই পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া চলল। এক সময় জয়ন্ত বলল, ওটা কি ঢাকা দেওয়া?

হাসি মুখে রেবা বলল, ওর মধ্যে রয়েছে গোটা আষ্টেক টাট্‌কা পানতুয়া—মোদকমশাই যাবার আগে উপহার দিয়ে গেলেন।

জয়ন্ত বলল, বটে। তোমার চেহারা তাহলে একটু কাজে লাগল বলো! কিন্তু আর নয়, এবার হাত চালাও। রাত বারোটা বাজে।

বাজুক।

তোমাকে ফিরতে হবে না?

রেবা ঈষৎ উষ্ণ কণ্ঠে বলল, ফিরব কে বললে? আমি যে থাকতে এলুম।

জয়ন্ত স্থির হয়ে তাকাল রেবার দিকে। মোমবাতিটা ফুরিয়ে আসছে। বাইরে সাঁ সাঁ করছিল রাত। একে একে পানতুয়া ক'টা ওদের খাওয়া হয়ে গেল। আহারাদির পর বাসন ক'টা তুলে নিয়ে রেবা অন্ধকারে বাইরে এলো। মোদকমশাইয়ের কাছে এক বালতি জল চেয়ে নেওয়া ছিল। রেবা সেই জলে বাসনগুলি মেজে-ধুয়ে নিয়ে এলো। বুঝতে পারা যাচ্ছে, মেয়ের কাজ মেয়েই বেছে নিতে জানে। কিন্তু ততক্ষণে হাত ধুয়ে জয়ন্ত এসে বসেছে বিছানায়। সে একেবারে চুপ।

নতুন একটা বড় মোমবাতি রেবাকে জ্বালাতে দেখে জয়ন্ত বলল, আরে, বাতি পেলে কোত্থেকে ?

রেবা হাসল। বলল, ঘুষ কবুল করলে একালে মন্ত্রিত্ব পর্যন্ত কেনা যায়। মোমবাতি আর দেশলায়ের জন্য মোড়লের হাতে দুটি টাকা গুঁজেছি।

টেনেটুনে বিছানাটা একপ্রকার ছড়িয়ে পাতা। এর বেশি আর বিস্তারিত করা সম্ভব হয়নি। আগাগোড়া এটাকে লক্ষ্য করে জয়ন্ত বলল, নিজের বিছানাটা ত' বেশ গুছিয়ে পেতেছ। আমারটা কই ?

আমার বিছানা ? পোড়া কপাল। তখন তবে বললে না কেন ?—রেবা বলল, মোদকের সঙ্গে ওর ঘরে চলে যেতুম। কবি হলে কি হবে ? আসলে ত' সেই পুরুষমানুষ। তোমার তামাসার পেছনে আত্ম-অভিমান কেবলই ভাবছ, আমি তোমার আশ্রিত, আমার নাকি কষ্ট হচ্ছে। এ সব চিন্তার অভ্যাস ছাড়। আমার নিজের জায়গা আমি জানি। আমি শুধু ভাবছি, তোমার নাক ডাকার অভ্যেস থাকলে পাড়ার লোক জড়ো হবে কিনা।

জয়ন্ত হেসে উঠল।

ঝিলিমিলি বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরে রেবার গাড়িখানা দেখা যাচ্ছিল। বোধ হয় এটা কৃষ্ণপক্ষ। তৃতীয় প্রহরের অস্পষ্ট চন্দ্রাভা পড়েছে গাড়িখানার ওপর। আশা করা যায় ওখানা নিরাপদেই থাকবে।

বাইরের দিককার দরজাটা বন্ধ করে রেবা এবার বসল বিছানায়। জয়ন্ত ফস করে বলে বসল, তুমি ত' কই তেমন সেজেগুজে আসনি, রেবা ? মুখে-হাতে-পায়ে রং মাখনি, ঝলমলে শাড়ি পরনি, তোমার হাওয়ায় ফুলেল গন্ধ পাইনে—কেন বল তো ?

রেবা মুখ টিপে একটু হাসল—শ্যাম্পেনের বোতল বোধ হয় শাদামাটাই হয়।

আহা, ওসব ত' নিজেরই আনন্দের জন্যে।

রেবা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, আমার আনন্দের খবর কি সাজসজ্জায় আর রং মাখায়। কবির মন আর মেয়ের মন এক নয়, জয়ন্ত। আমি বাস করি এক নরককুণ্ডে, সেখানকার দুর্গন্ধ যে কী অসহ্য, সে কি জেনেছ কোন দিন। আজ এই চালার তলায় ঢুকে প্রথম জানলুম, ভূস্বর্গ কাকে বলে। থাক ওসব কথা, জয়ন্ত। শোবার আগে পাঞ্জাবিটা ছাড়বে না। ভেতরে যে বড্ড গুমোট।

জয়ন্ত বলল, পাঞ্জাবির তলায় গেঞ্জিটা বিশ্রী রকম ছেঁড়া, তাই খুলতে চাইছিনে।

রেবা বলল, ওতে তোমার অগৌরব নেই, ও তোমার নিজের। আমার বড় মানবি বাপের টাকায়, এতে তিলমাত্র গৌরব নেই।

রেবা ওর গা থেকে পাঞ্জাবিটা ছাড়িয়ে নিয়ে হেসে উঠল। গেঞ্জিটা একেবারে উলিঝুলি ছেঁড়া। পরে বলল, এবার শুয়ে পড়। কাল তোমার টুইশনি কখন।

কাল রবিবার।—জয়ন্ত এবার আড় হয়ে শুল! আজ তার পেটে অনেক-কাল পরে কয়েকটা তাজা পানতুয়ার ওজন পড়েছে। সুতরাং ঘুম আসতে দেরি হবে না। মনটাও যেন আজ কতকটা নিশ্চিন্ত।

রেবা প্রশ্ন করল, কাল সারাদিন তাহলে কি করবে?

কাল!—জয়ন্ত বলল, বাঃ, আজ কামাই হল সন্ধ্যেবেলাটা, কাল যেতে হবে না আমাদের আড্ডায়।

কি হয় সেখানে?

তাস-টাস খেলা হয়। ব্রিজ খেলতে বসি পয়সা-কড়ি নিয়ে। কেউ কেউ তাড়ি ফাড়ি খায়। বেশি হট্টগোল হলে সরে পড়ি।

রেবা বলল, ভালই ত' জায়গাটা! আমি যাব তোমার সঙ্গে কাল। আমিও তাস খেলা শিখব।

জয়ন্ত বলল, ওটা জুয়া, তা জান।

হোক না, জীবনটাই ত' জুয়া। মেয়েছেলে ওখানে আসে না?

ওই তোমার নতুন ঝি এক-আধবায় যায়। মাঝে মাঝে উটকো আসে এক আধজন।—জয়ন্ত বলল, কিন্তু তুমি সেখানে যেও না, রেবা। সেখানে তুমি বেমানান।

রেবা বলল, মানানসই হতে ক'মিনিট লাগে? আমিও পরে নেবো কাঁচপোকার টিপ আর দুই কানে ফুল। একখানা সস্তা ডুরে শাড়ি কিনতে কতক্ষণ? হোটেলের ঝি হয়ে বাসন মাজা, ঘর ধোওয়া, এঁটো পাড়া,—এতে দুঃখ পাব কেন? নিজের গতর খাটিয়ে খাব, জয়ন্ত। এতে বাধা দিও না!

জয়ন্ত বলল, এতে রুচি আর কালচারের কথা আছে, রেবা।

নন্‌সেন্স।—এই বলে রেবা দাঁত দিয়ে শাড়ির আঁচল চেপে ধরে একে একে তার গা থেকে গোটা দুই জামা খুলে এক পাশে সরিয়ে রাখল। পরে বলল, রুচি আর কাল্‌চার? আমার বাবা ত' আপ্‌স্টার্ট। আর মা?—থাক সে কথা। ঘুঁটেকুড়ুনি রাজরানী হলে নিজের রুচি নিজেই বানিয়ে নেয়। তুমিই ত' একদিন বলেছিলে, সব মানুষের মধ্যে একই জন্তু, শুধু পোশাকের তফাৎ। পোশাক আর স্টাইল হল রুচি, অন্য কিছু নয়। আর ভাষা। সে ত' শিক্ষা-সাপেক্ষ। নতুন ঝিয়ের স্টাইল-অফ লিভিং একটু বদলিয়ে দিলেই ত' সে হয়ে ওঠে রেবা রায়। ভয় পাও কেন সবাইকে একাকার করে দিতে? কেন সবাইকে তুমি তুলে ধরতে চাও না?

জয়ন্ত এবার রাগ করল। বলল, তুমি নিশ্চয় জান নতুন ঝি বহু লোকের মন যোগায়, বহু পুরুষের সঙ্গে—

খিলখিল করে এবার হেসে উঠল রেবা। বলল, এইবার বেরিয়ে এলো সেই আদিম রক্ষণশীল পুরুষ। তোমার মধ্যেও সেই সম্পত্তিবাদী, গোঁড়া, সমাজরক্ষী ব্রাহ্মণ বর্তমান। ভয় পাও কেন নতুন ঝিকে দেখে। সব মেয়ের মধ্যেই ও' নতুন ঝি। তোমার সভ্যসমাজে অমন আছে হাজার হাজার, তারা লুকিয়ে থাকে পোশাকের আড়ালে, থাকে আড়ম্বরের আশেপাশে। না, জয়ন্ত, তোমার আশাভরসা কম। নাম বললেই ত' মানহানির মামলা। কিন্তু কত মহাপুরুষের কত যৌনজীবনের কাহিনী খবরের কাগজে ওঠেনি, তার হিসেব রেখেছ? আমাকে নিয়ে ভয় কি তোমার? চলো, নামি নিচের তলায় তোমাকে সঙ্গে নিয়ে। অনেক নিচে নামব, দেখব সেই জীবনকে। আমাকে সুখে রাখতে চেয়ো না তুমি।

রেবা রাগ করে শুয়ে পড়ল এক পাশে।

জয়ন্তর চোখে তন্দ্রা নামছিল। সে একটু জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, আমি কথা বলি কম, লেখাতেই আমার পরিচয়। তুমি লেখ না কিন্তু কথা বলার বাণ নিয়ে জন্মেছ। বলতে পার, আমি আর কোন কাজের যোগ্য?

একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। রেবা মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি সত্য হবে নিজের ধর্মে আর নিজের মর্মে। সেই তোমার একমাত্র কাজ। আমি তোমার সেই কাজের সহচরী হব।

তুমি? কেমন করে?

রেবা শান্ত কণ্ঠে বলল, তোমার ধুনি জ্বালিয়ে দেব। তুমি যাতে নিত্য অসন্তোষে থাক তার চেষ্টা করব। তোমার ভাবনা চিন্তাকে ছিন্নভিন্ন করব। অশান্তির আরামে তোমার মস্তিষ্ক যাতে ওলোটপালট হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখব।

জয়ন্ত আচ্ছন্ন কণ্ঠে বলল, অ্যাঁ, কি বললে?

রেবা জবাব দিল না কিছুক্ষণ। এক সময় শুধু বলল, তুমি থাকো দুঃখ আর দুর্গতির মধ্যে, থাকো যন্ত্রণার আর উপবাসে। বিদ্বেষ, ঘৃণা, আক্রোশ, তিক্তস্বাদ, বিদ্রূপ—এরা থাক তোমার মন জুড়ে। তোমার নিঃশ্বাসে যেন থাকে বিষের বাষ্প, হাজার হাজার গোখরো সাপ যেন বেরিয়ে আসে তোমার কবিতায়। ক্ষমা, দয়া, রোমান্স, প্রেম, মধুর নৈরাশ্য, অস্তের অজস্র রসকল্পনা, মেয়েমানুষের ওপর লোভাতুর প্রতিবাদ, মিথ্যা প্রণয়ের মাধুরী-বিলাপ—তোমার কবিতায় এই সব জঞ্জাল ঘেঁট না। তুমি আনবে বলবানের বীর দর্প, আনবে দুর্জয় প্রাণ, শত সূর্যের তেজ, ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক, অন্যায়ের

বিরুদ্ধে হিংসা। তোমার কবিতায় যেন পাই বৈশ্বানরের সর্বনাশা আগুন, ছিন্নমস্তার রক্তপিপাসা, পরশুরামের প্রচণ্ড ঘৃণা, পণ্ডিত দুর্বাসার আজন্মের আক্রোশ। তোমার ওই আগুনে আর আক্রোশে আমিও যেন ছারখার হই। আরেকটা কথা কান পেতে শোন জয়ন্ত—

অ্যাঁ, কি বলছ? —জয়ন্ত জবাব দিল।

রেবা বলল, ভোর হলেই তোমাকে আমি নিয়ে যাব। তোমার একাউন্টে মোদকমশাইকে তার পাওনা সব চুকিয়ে দিয়েছি। এখানে তোমার থাকা হবে না। আবার কি সেবারের মতন টাইফয়েড ধরাবে? বছর তিনেক আগে কী কষ্ট আমাকে দিয়েছিলে, মনে নেই? এখানে তোমাকে থাকতে দেব না। তোমার জ্যাঠামশাই তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন তো দিলেই বা। তোমার জায়গার অভাব কি?

জয়ন্ত বলল, যাব কোন চুলোয়?

কাল তুমি আমার ওখানে যাবে।

জয়ন্ত বলল, বটে? ঘরজামাই হতে আমি পারব না।

রেবা বলল, সোজা কথা থাক। তুমি আমি দুজনেই কাজ নেব। থাকব অন্যত্র। থাকব সাধারণের মধ্যে। তুমি শুধু কবিতা লিখবে, আমি তোমাকে কফি করে খাওয়াব। বুঝেছ? আপত্তি করো না। কাল সকালে যাবে আমার সঙ্গে।

মোমবাতিটা তেমনি জ্বলছিল। রাত বোধ হয় দুটো বাজে। বেড়ার বাইরে চন্দ্রাভা কখন যেন মিলিয়ে গেছে। গাড়িখানা আর ঠাহর হচ্ছে না।

আরেক কথা—রেবা বলল, এখানে কারো কাছে কিছু দেনা আছে তোমার? গন্নাখাঁদার পয়সা তুমি দিয়ে যেও। শুনছ? জয়ন্ত? আঃ, বড্ড ঘুম তোমার।

জয়ন্ত অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সাড়া দিল না।

রেবা চুপ করে গেল বটে, কিন্তু জয়ন্তর মুখের উপর থেকে সে চোখ ফেরাতে পারল না। অনেক দিন পরে সে যেন আরেকবার দেখল জয়ন্তকে। কবে যেন কোন উপন্যাসে সে পড়েছিল, দুটো কালো ভ্রমর বসে ঘুমিয়ে পড়েছে যেন আরক্তিম এক শতদলের ওপর। ললাট প্রশস্ত, যেন তারই উপর দিয়ে ঘন কালো ডানা মেলে উড়েছে দুই ভুরু। গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর শ্বেতমর্মর মূর্তি বসানো আছে রেবাদের বাগানে। তার সৌন্দর্য কি এর চেয়েও বেশি?

রেবা ডান হাতখানা বাড়িয়ে মোমবাতিটা তুলে কাছে আনল। পাছে গরম

মোমের কৌটো হাতে পড়ে, সেজন্য হোটেলের একটা বাটির মধ্যে বসালো মোমবাতিটা। ছয় বছর ধরে সে দেখছে জয়ন্তকে, কিন্তু এখনও যে অনেক জন্ম, অনেক জন্মান্তর ধরে এই দেখা শেষ হবে না। জয়ন্তর স্বাস্থ্য অতিশয় বলিষ্ঠ, কিন্তু বড় বড় আঙুলগুলো ক্রমশ সরু হয়ে নখের পেলবতায় মিলেছে। বক্ষোপট বিস্তৃত, সেখানে পৌরুষের তৃণদল বিছানো। বলেই জয়ন্ত তার ছেঁড়া গেঞ্জি দেখাতে চায়নি। এই জয়ন্তই একদা টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিল। বাঁচবার আশা ছিল কম। জয়ন্তর মা দেখলেন, হেমন্তর সহপাঠিনী এক মেয়ে আসছে রোজ। কখনো ডাব আনে কখনো ওষুধ, কখনো ছুটে ডেকে নিয়ে আসে ডাক্তার, কখনো বা হাত ধুয়ে ছানার জল তৈরি করতে বসে যায়। হ্যাঁ, হেমন্তর সহপাঠিনী। ওপার থেকে জ্যাঠামশায়ের গোপন বা বিদ্রূপের কণ্ঠে ঠাট্টা ভালোবাসা ইশারা ইঙ্গিত করে। কিন্তু রেবার ভ্রূক্ষেপ নেই কোনও দিকে। একমাস হতে চলল। ডাক্তার প্রায় এক প্রকার জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর ভাঁড়ারে গল্প ওষুধ আর নেই। এখন শুধু সেবা শুধু লক্ষ্য রাখা শুধুমাত্র পাহারা। জয়ন্তর মা দেখেশুনে আড়ালে গিয়ে চোখ মুছছিলেন। রোগীর বাঁচার আশা নেই বললেও হয়। সাতাশ দিনের দিন সঙ্কট দেখা দিল।

শান্ত উপবাসিনী তপস্বিনী রেবা সেদিন দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল একান্তে। জয়ন্তর মৃত্যু হলে সামনে দিয়েই ও শ্মশানে যাবে।

সেদিন মৃত্যুর দেবতা যম এসে রেবার সামনে দাঁড়ালেন,—পথ ছাড় সাবিত্রি, আমি নিতে এসেছি সত্যবানকে। দেহধারীর মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। জন্মতিথির সঙ্গে মৃত্যুতিথি একই সূত্রে বাঁধা। মৃত্যু শুধু উপলক্ষ খোঁজে মাত্র। সর্পাঘাতে তোমার সত্যবানের নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে গেছে। আমি ওকে তাই নিতে এসেছি। পথ ছাড় সাবিত্রি।

সেই দরজায় বজ্রাহতার মতো দাঁড়িয়ে সাবিত্রী কঠোর প্রতিরোধ করে বলল, হে দক্ষিণদিকপতি, একথা তোমার সত্য নয়। ভালবাসা মৃত্যুর চেয়ে অনেক বড়। সৌরবিশ্বলোকের অনন্ত কোটি গ্রহ তারকার দল যে ভালবাসার কঠিন আকর্ষণে বাঁধা, আমি সেই অমোঘ অমিততেজা পরমা প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ মাত্র। আমি তপশ্চারিণী, ভোগরহিত আমার প্রেম, এই প্রেম পুনর্জীবনলাভের মূলমন্ত্রস্বরূপ। সত্যবানের মৃত্যু ঘটতে পারে না,—ঘটতে দেবো না। ফিরিয়ে দিয়ে যাও আমার প্রিয়তমকে।

মেয়েটার দাপুটে চেহারাটা লক্ষ্য করে যম একটু যেন ভয় পেয়ে সেবার জয়ন্তকে ফেলে পালিয়েছিল।

মোমবাতিটা ধরে একাগ্রচক্ষে রেবা তাকিয়েছিল জয়ন্তর মুখের প্রতি,

কিন্তু কখন যে তার দুই চোখ বেয়ে আনন্দের অশ্রু নেমে এসেছিল, সে নিজেও বুঝতে পারেনি।

ঘণ্টা দুই পরে ছ্যাঁৎ করে জয়ন্তর ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাথা তুলে সে দেখল, অত বড় নতুন মোমবাতিটার অন্তিমকাল উপস্থিত। কিন্তু তখন উষাকাল আসন্ন। জয়ন্ত উঠে বসল। রেবা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তার নিরাবরণ বাম বাহুখানা উপর দিকে প্রসারিত এবং তারই কব্জিতে কালো ফিতায় বাঁধা একটি রিস্টওয়াচ। ভোর চারটে বেজে গেছে। কিন্তু এমন নিশ্চিন্ত নিদ্রা আধুনিক কালের স্ত্রীরাও ভুলে গেছে। রেবাকে এমন করে ঘুমোতে জয়ন্ত আগে দেখেনি। শোবার আগে সে ভ্রূক্ষেপ করেনি ঘরে আলো জ্বালা। ঘুমের ঘোরে যে অসতর্ক শৈথিল্য প্রকাশ পেতে পারে, ঘুমের আগে সেটা সে গ্রাহ্য করেনি।

জয়ন্ত আস্তে আস্তে উঠে নিঃশব্দে বাইরে গেল। দেখে এল গাড়িখানা নিরাপদেই আছে। মুখ হাত ধুয়ে আবার সে ভিতরে এসে দাঁড়াল। না, এই অকাতর নিদ্রা ভেঙ্গে দিলে অন্যায় হয়, আলোটা নিবিয়ে দেওয়াই উচিত। কেননা যে দৃশ্য চোখে পড়ছে, পুরুষের চিরকালীন অধীর ঔৎসুক্য সেইটির জন্যই ছোঁক ছোঁক করে এসেছে। রেবার নিরাবরণ তনুলতার আশ্চর্য যৌবন শ্রীর দিকে চেয়ে জয়ন্ত শুধু ভাবল, এর ওই সুদীর্ঘ বাহু যেন এক শাণিত তরবারি---আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে ওখানা যেন ঝকঝক করছে—দুই বক্ষঃস্থল যেন দুই কঠিন আগ্নেয়গিরি। ওরই ভিতরকার বিগলিত লাভা উদ্‌গীর্ণ হতে থাকে কথায় কথায়। ওই পঞ্জরকোটরে, নাভিতলে, উরুসন্ধিলোকে --কোথায় যেন লুকিয়ে রয়েছে মহারুদ্রাণীর গর্ভমন্দির, সেখানে অদূর ভবিষ্যৎকালে হয়ত জন্মলাভ করবে অপরাজেয় কোনও এক বিপ্লববাদী আপন অমোঘ ক্ষাত্রতেজে। জননী সেদিন সিদ্ধিলাভ করবে সন্তানের গরিমায় আর যৌবনের মহিমায়।

জয়ন্ত যেন মনে মনে তারই স্বাগত সম্ভাষণ পাঠ করতে লাগল।

অভিভূতের মতো কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল, সে জানে না। কী দেখছিল তাও যেন তার চেতনা নেই। কিন্তু এমন আশ্চর্য ছবি সে জন্মের ধারা বাহিকতার মধ্যেও দেখে এসেছে কিনা, এ তার অজ্ঞাত। পুরুষের দেহে কোনও বিস্ময় আছে কিনা, মেয়ের চোখ জানে। কিন্তু কুমারী নারীর দেহের যৌবন-বিস্ময় যেন আগাগোড়া। তার চুলের রাশির মধ্যে পারিজাত কাননের সুগন্ধ কেমন করে জড়িয়ে যায়, তার সংবাদ কেউ জানে না। ললাটে, চোখের কোণে, নাসাগ্রে, আরক্ত অধরে, বাহুমূলে, বক্ষযুগলে, কটিমেখলায়—যে-পেলবতা এবং সৌকুমার্য উচ্ছলিত, তারই স্তবকে স্তবকে বাসা বেঁধে থাকে বাসনার সহস্রফণা।

কুমারীর সর্বাঙ্গে বা প্রত্যঙ্গে প্রাকৃত একপ্রকার মধুর বন্যগন্ধ কেন যে নিগূঢ় আকর্ষণে পুরুষকে কাছে টানতে থাকে, মেয়ে একথা জানে বৈকি। ফুলের পাপড়ি যেমন ভিতরের কুঁড়ির গন্ধকে চাপা দেয়, ওরা তেমনি আঁচল দিয়ে ঢাকে আপন দেহসৌরভকে। কিন্তু বেবা হল ভিন্ন ধাতু। আপন দেহশ্রী তার কাছে ভয়ের বস্তু নয়। বাঁকা চোখের কটাক্ষে সে লোভের ইশারা জানায় না। রাজহংসীর মতো তার শ্রোণিযুগল, তার উপরে দুলতে থাকে সুদীর্ঘ লম্বিত বেণী কালসর্পের লোলফণায়। কিন্তু এই বেবাই একদিন বলেছিল, বুঝলে অনন্ত, এক আধজন পুরুষকে দেখেছি, পিছন দিক থেকে আমাকে দেখে একটু অন্যমনস্ক হয়েছে। অথচ পিছন দিকের চলনের বিগুনিতে তাদের প্রলোভন নেই।

ভোর হয়ে আসছে দেখে অনন্ত অগত্যা মাথার দিকে ঘুরে গিয়ে ক্লান্ত হাসিমুখে বসল। তারপর তার বালিশ থেকে একগোছা সুতো ছিঁড়ে নিয়ে সে বেবার গায়ে যেখানে সুড়সুড়ি দিল, সে অংশটা অতিশয় স্পর্শাতুর। কোনও মেয়ে সে জায়গায় স্থির থাকতে পারে না। বেবা চোখ খুলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। বলল, বড্ড আরশোলা তোমার এই চালাঘরে।

অনন্ত বলল, আরশোলারা আজকাল পাড়ি দিতেও জানে। তা হোক, যদি ইচ্ছে হয় আরেকটু ঘুমোও। আকাশে এখনও তারা জ্বলছে, অন্ধকার এখনও সরেনি। ঘুমোও আরেকটু।

না, আর ঘুমিয়ে কাজ নেই। তুমি এগুলো গোছাতে থাকো,—আমি আসছি মুখ ধুয়ে। বেবা উঠে বেড়া ঠেলে ঢুকল মোদকের ভিয়েন ঘরে। সেখানে জলের বালতি ছিল।

এইটুকুর মধ্যেই অনন্তর যাবতীয় বই ক'খানারই দাম বেশি, এগুলোর অধিকাংশ লাইব্রেরী থেকে আনা। অবশ্য ইংরেজি বইয়ের সংখ্যা বেশি। বাঙলায় অত্যাধুনিক কবিতার বই। ওদের মধ্যে তার নিজের লেখা দু'খানা। একখানা সম্প্রতি প্রকাশিত। সবগুলো বই এক এক করে তুলল টিনের বাক্সে। অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে একখানা ক্ষয়া সাবান ও দাঁতমাজন। পেন্সিলকাটা একখানা ছুরি এবং মেট্রোর সামনে থেকে কেনা একটি চোরাই ফাউনটেন পেন। এ ছাড়া চার পাঁচখানা খাতা, কিন্তু টুকিটাকি আঁকা দরকারি ছেঁড়া কাগজ, বাকি দু'তিনটে ধুতি পাঞ্জাবি। যে জামাটা সে ছেড়েছিল ঘুমের আগে, তারই পকেটে অক্ষত দু'শ টাকা। কিন্তু বাঁধা আর ছেঁড়া শতরঞ্চি নিয়ে তার দুর্ভাগ দেখা দিল। এ দুটোকে কিভাবে গুছিয়ে সে

মানিয়ে নেবে—এইটি বিপন্নভাবে ভাবতে গিয়ে সে যখন দিশাহারা, তখন ভিতরে এসে ঢুকল রেবা। এ যেন এক মুহূর্তে সমস্যার সমাধান!

টান মেরে রেবা সেগুলো সরিয়ে দিয়ে বলল, সব পড়ে থাক। আবর্জনা এখনও ফেলতে শেখনি? মানুষ থাকলেই তার চারিদিকে জঞ্জাল জমে। নড়ে বেড়ালে তবে সেই জঞ্জাল এড়ান যায়। আর কি আছে এখানে তোমার, সব দেখে নাও।

আঁচল ফেলে রেবা একে একে এবার তার জামা দুটো পরে নিল।

জয়ন্ত বলল, এগুলো আবার দরকার হলে তখন কোথায় পাব? তখন আবার ছুটতে হবে শ্মশানের ডোমেদের পাড়ায়।

সে কি।—রেবা আঁৎকে উঠে বলল, এগুলো কোত্থেকে এনেছিলে?

বাঃ, বেশ কথা! জয়ন্ত বলল, মা চলে গেলেন হেমন্তের সঙ্গে। মামাতো মাসির কাছে রইল সববসতি জিনিসপত্তর। কিন্তু আমার বিছানা পত্র কোথায়? এসব ডোমপাড়া থেকে এক টাকায় কেনা! অনেকেই কেনে আমার মতন।

সেইজন্যেই গন্ধ পাচ্ছিলুম তোমার কাঁথাখানায়।—রেবা বলল, আমি ভাবছিলুম বুঝি চামড়ার কারখানারই দুর্গন্ধ হবে। তোমার ঘেন্না করে না, জয়ন্ত?

কেন করে না, আমিও বুঝতে পারিনে।—এই নাও তোমার ভ্যানিটি ব্যাগ। ওর মধ্যে আমার টাকাও রেখে দিয়েছি।

এবার সকাল হয়েছে। ওরা যাবার জন্য প্রস্তুত হল। জয়ন্ত বাসনের গোছাটা এবং টিনের বাক্স বেঁধে এল গাড়ির মধ্যে পিছনের সীটে। ফিরে এসে দেখল মোদকের লোক এসে উনুন থেকে ছাই সরাচ্ছে। পোড়াকাঠে ফুঁ দিলে এখনও আগুন দেখা যায়। প্রথম তৈরি হবে জিলাপি, ওই সঙ্গে আলু চচ্চড়ি, —একজন বসে যাবে শিঙাড়ার ময়দা মাখতে। মোদকের প্রাপ্য রেবা গতরাত্রেই চুকিয়ে দিয়েছে।

ওরা বেরিয়ে এসে গাড়িতে যখন উঠল তখন রোদ উঠছে। রেবা গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। গলির ভিতর দিয়ে নদমা বাঁচিয়ে গাড়িখানা এগিয়ে চলল অনেকটা পথ। পুরনো বটগাছটা সামনে রেখে ডানহাতি ঘুরলেই কাটিতলার সামনে গন্নাখাঁদার পাইস হোটেল। গন্নাখাঁদা তখন ঘটি নিয়ে দোকানের দরজায় মুখ ধুতে বসেছে। রেবা গাড়ি থামাল। জয়ন্ত বলল, লোকটা আমার কাছে মোট আট টাকা পাবে।

রেবা তার ব্যাগ থেকে দশ টাকার একটি নোট বার করে নিল। তারপর বাসনের গোছাটা সঙ্গে নিয়ে নেমে গিয়ে দাঁড়াল গন্নাখাঁদার মুখোমুখি। আগে

বাসনেব গোছাটা মিলিয়ে বেখে টাকাটা বাব কবল। ভাল কবে চেয়ে দেখল, লোকটাব নাক নেই, সে স্থলে আছে একটা হাড়োল বক্তিম গহ্বব। গাড়ি থেকে গলা বাড়িয়ে জয়ন্ত বলল, আপনাব সব পাওনা চুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। টাকাটা নিন পালমশাই। বাসনগুলো দেখে নিন।

ও চুকিয়ে দেবেন। তা বেশ।—বুঝলেন না, যত শিগগিব ফেবৎ আসে। ভোঁব বেলা ঘবে পান লক্ষ্মী এলো পালমশাই ভক্তদণ্ড হয়ে দুহাত মুছে বেবাব হাত থেকে নোটখানা নিয়ে বললেন, গাঁতা আব কি দেখব? ও আমাব মুখস্থ। আগেব বকেয়া [illegible] টাকা [illegible] কাল বাত্তিবেব [illegible] পচিশ, [illegible] সাত টাকা [illegible] বাকি, কিন্তু আপনি [illegible]

[illegible]

[illegible] আপনি [illegible] দেবেন [illegible]

[illegible]

[illegible] বশিস। [illegible]

বেবা [illegible] জয়ন্ত [illegible] গন্নাপালেব বিছানাতেই হয়ত ঘুমোচ্ছে।

উচ্চবোলে হেসে উঠল বেবা [illegible] চলল ছুটে। জয়ন্ত বলল, দাঁড়াও, ওই যে বেনেমসলাব দোকানেব গা ঘেঁষে গমন্দাব [illegible] বসটা দেখছ, ওব পাশেব গলি দিয়ে ঢুকলেই [illegible] আমাদেব তাসেব আড্ডা ওটাও অবিশ্যি কাঁচাপাকা ঘব,— এই যে, এই কাদাগুলি

বেবা একবাব ফিবে তাকাল সেই গলিব ভিতব দিকে এ অঞ্চল তাব কাছে একেবাবেই নতুন নতুন, কিন্তু যেন একান্তই পবিচিত। এখানকাব পতি পদেব [illegible] তাব মন ছুয়ে বইল।

একটা কথা আমাকে দাও, জয়ন্ত। কাব্যজগৎ তোমাব, বিষয় ব্যবস্থাব জগৎ আমাব। সেখানে তুমি বাধা দিয়ো না।

জয়ন্ত বলল, বিষয় জগতের সঙ্গে আমাব যোগ কোথায়?

বেবাব চুল ভোবেব হাওয়ায় উড়ছিল। সে চুপ কবে গেল কতক্ষণ। তাবপব

এক সময় বলল, আমার ভয়, পাছে তুমি অকালে শুকিয়ে ঝরে যাও। তোমার জীবনযাত্রার চেহারা নিরাপদ নয়।

পুরুষের আত্মাভিমান হঠাৎ গর্জিয়ে উঠল। জয়ন্ত বলল, তোমার বক্তব্যটা আরেকটু স্পষ্ট করে বল, রেবা। আমি ছেলেমানুষ নই। তোমার গলায় সেন্টিমেন্টের কাঁপন লাগে কেন? একি তোমার গাঁটছড়া বাঁধার ভূমিকা? দাও, গাড়িতে আরও স্পীড দাও। কোন চুলোয় নিয়ে যাচ্ছ তা তুমিই জান। আমার পূর্ণ স্বাধীনতাকে তিলমাত্র খর্ব করতে চেয়ো না রেবা—

রেবা ডান পায়ে ব্রেক কসল। তারপর ডানহাতে স্টিয়ারিং ধরে হাসিমুখে বাঁ হাত বাড়িয়ে জয়ন্তর মুখ চেপে ধরে বলল, চুপ, আর একটি কথাও বলবে না।

॥ ৩ ॥

বাড়ির বাইরে দক্ষিণের বাগান অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। গেস্ট হাউসের একতলা বাড়িটা বসেছে প্রায় তারই মাঝামাঝি। মূল অট্টালিকা থেকে গেস্ট হাউস একশ' গজ দূরে। এই সেদিন পর্যন্ত রায়সাহেবের বন্ধু মি. ম্যাকলিন সস্ত্রীক ওখানে অতিথি ছিলেন। শীতকালে অনেকেই এসে থেকে যায়। ও বাড়িতে মোট চারটে স্যুইট। ওরই একটা জয়ন্ত ক'দিন থেকে বেশ ভালই আছে। টেলিফোনে ওখান থেকেই সে কথা বলে রেবার শোবার ঘরে।

হঠাৎ একদিন জয়ন্ত রাগ করল, তুমি কেন চন্দ্রিকে আমার ওখানে মোতায়েন করতে গেলে?

হাসিমুখে রেবা জবাব দিল, কেন, অসুবিধে হচ্ছে?

হচ্ছে বৈ কি। —জয়ন্ত বলল, ওর চেহারাটা অত্যন্ত সেক্সি, কথাবার্তা অত্যন্ত মোলায়েম, ওকে দেখামাত্রই আমার চিত্তবিভ্রম ঘটে। হেঁটে যায় যেন ফুল ফুটিয়ে। ওকে সরিয়ে নাও

রেবা বলল, আমি মনে করলুম তুমি নিরিবিলিতে আছ, তোমার ওখানে ফেমিনিন টাচ থাকা দরকার। তুমি যে কবি। কবি নিরঙ্কুশ। আচ্ছা, আমি ওকে সরিয়ে নিচ্ছি।

জয়ন্ত বলল, হ্যাঁ, সরিয়ে নাও। কিন্তু একেবারে সরিয়ো না। অথচ যখন তখন চোখের সামনে পড়া নিরাপদ নয়। আসুক কচিৎ এক আধবার, আপত্তি নেই। কিন্তু অহেতুক আসুক, অকারণে হেসে চলে যাক।

রেবা বলল, এ ত' রোমান্টিক।

জয়ন্ত বলল, না, নিছক তা নয়। বলতে পার রোমান্টিক রিয়ালিজম। চুনারি যেন না থাকে এখানে কিন্তু আসে যায় যেন। নইলে বিচ্ছেদের সুর থাকবে মনে, সেটা ভাল নয়। আমার চিন্তাকে নীতিভ্রষ্ট হতে দেবো না। হ্যাঁ, তুমি আসছ কখন?

আমি যাব না, আমার এখানে অনেক কাজ। রেবা জবাব দিল।

একা আছি যে আমি।

কবিমাত্রই একা। তার দোসর হয় না। রেবা টেলিফোন ছেড়ে দিল।

বাংলোয় অন্য কেউ নেই। প্রত্যেকটি ঘর সম্পূর্ণ মহল যেন খাঁ খাঁ করছে। জয়ন্তর নিজের ঘরের কয়েকখানা সুন্দর ছবি দেওয়ালে ঝুলছিল, রেবার নির্দেশে সেগুলো যেন কোথায় সরে গেছে। রাশি রাশি বই পাঠিয়েছে রেবা, সেগুলো এখানে ওখানে ছড়ান। কোনদিকে আর কিছু নেই, ভাবের কোনও আশ্রয় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

জয়ন্ত বাইরে এসে দাঁড়াল। সামনে বিশাল দীঘি, তার চারিদিকে বড় বড় গাছ। একটা গাছ পাখিতে ভরা। এ যেন বনময় বাগান, এ অন্য জগৎ। মনে হচ্ছে সে যেন এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছে। কিন্তু রেবা ধরে নিয়েছে সে বিরহী যক্ষ, সে যেন থাকে নির্বাসনে। ভুল করেছে রেবা। এ কাল বিরহ-বিলাপের কাল নয়। এ কালের আকাশ নীল নয়, পাংশু। রৌদ্রে সোনা ঝরে না, রৌদ্র থাকে হলুদ। মেয়েপুরুষের প্রেমের অর্থ—প্রকৃতের তাড়না মাত্র। বন বাগানের শোভা কাব্য নয়—ওগুলো নার্ভকে স্বস্তি দেয় শুধু। গাছপালা অক্সিজেন ছাড়ে, হাইড্রোজেন টানে—তাই তার মূল্য। গাছে ফল হয়, সেই তার ইউটিলিটি। ঐতিহাসিক প্রয়োজন শেষ হলে মানুষের দাম আর ফলের গাছের দাম একই কারণে ফুরোবে। দিগন্তজোড়া শস্যক্ষেত্রে যখন ধান পেকে ওঠে, তখন সেটা কাব্য নয়—রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তিমাত্র। কে না জানে, একজন চাষীর জীবনের দাম রেবার চেয়ে অনেক বেশি। রেবারা হল পরগাছা, পরশ্রমজীবী, পরান্নভোজী,—এবং ওদের সমস্ত বিলাসবৈভবের পিছনে রয়েছে লুণ্ঠনের চাতুরী রাষ্ট্রনীতির ব্যবস্থাপনা যেটাকে আশ্রয় দিচ্ছে পদে পদে।

জয়ন্তর ভাবনার ধারা তার দুই চোখের সামনেকার জগৎকে কেমন যেন বিস্বাদ করে দিল। সে আস্তে আস্তে চলে গেল ঘরে। ঘরে গিয়ে নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল কতক্ষণ। তারপর হঠাৎ এক সময় উঠে টেবিলের ধারে কাগজ কলম নিয়ে সে যখন বসল, ঠিক সেই সময়

ও বাড়ির একজন ভৃত্য ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে তার সামনে এক পেয়ালা উত্তপ্ত কফি ও কয়েকটা কাজু বাদাম রেখে চলে গেল।

জয়ন্তর মুখে হাসি দেখা দিল। এই হল রেবার কাজ, অন্য কারও নয়। একেই বোধ হয় বলে, প্রকৃত ফেমিনিন টাচ। কফির এই সুমধুর উত্তাপের মধ্যে এবং এই তাজা বাদামভাজার সুস্বাদেই রেবা উপস্থিত। রেবার চোখ রয়েছে তার কবিতার প্রতিটি অক্ষরে, প্রতিটি অন্বেষণার লক্ষ্যে তার প্রত্যেক ভাবনার মূল শিকড়ে।

আচ্ছা দাঁড়াও— সে কি রেবাকে ভালবাসে? কলমটা রেখে জয়ন্ত ভাবতে বসল। আচ্ছা ধরো, সে কি রেবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না? গত ছয় বছরের ইতিহাস কি বলছে? কই তার স্বাধীনতা [illegible] রেবার ইচ্ছায় তার [illegible] জানাশোনার [illegible] তার [illegible] ও' চলছে [illegible] কি [illegible] পাখি [illegible] যত্নের [illegible] রেবার দক্ষিণ্য। [illegible] ভালবাসা। ভালবাসা [illegible] কিন্তু [illegible] মধ্যেই [illegible] সেই আদিম [illegible] কিন্তু তাদের [illegible] ধরেছে। [illegible] মৃত্যু [illegible] [illegible] কতের চিহ্ন

[illegible] একটা [illegible] হও। রেবার [illegible], সে কারও [illegible] ইচ্ছা [illegible] নেই। [illegible] উঠে [illegible] সেই [illegible] সাদা [illegible] তো?

[illegible]

[illegible] দাও [illegible]

[illegible] রেবা [illegible]

গলা পরিষ্কার করে [illegible] ওধার [illegible], শোনো রেবা, মনে করেছিলুম বলব না [illegible] আজ বলতেই হচ্ছে। তোমার [illegible] একদম ভাল লাগছে না। কোনও [illegible] পারছি নে। [illegible] আসাটা মস্ত ভুল হয়েছে। আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি। মানে, আমি বলছিলুম

রেবার কণ্ঠস্বর হঠাৎ কাঁপল— তুমি ঠিক বলেছ, জয়ন্ত— এ [illegible] চারিদিকে অপমানের বাঁধন। তোমাকে বলতে পারছিনে কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমার মতন আমারও বুকের ভেতর রক্ত ঝরছে সর্বক্ষণ। লোহার একটা খাঁচার মধ্যে

বনের পাখীর রক্তাক্ত যন্ত্রণা আর ডানা ঝাটাপটি তুমি কি চোখে দেখেছ কোন দিন? তুমি কি ভেবেছিলে কোনদিন, তোমারই চোখের সামনে এক রাজকন্যা প্রাসাদ অলিন্দে দাঁড়িয়ে ককিয়ে ককিয়ে বুকফাটা কান্না কাঁদবে?

জয়ন্ত সহসা নিজের সব কথা ভুলে গেল। বলল, রেবা, রেবা তুমি কাঁদছ? কী হয়েছে? কেউ কিছু বলেছে? শোনো, তুমি চুপ করো, রেবা—

রেবা চুপ করল না। সে হাউ হাউ করে বলতে লাগল, জয়ন্ত, কান পেতে কখনো কি মাঝরাত্তিরের বর্ষায় নেড়িকুকুরের কান্না শুনেছ? কখনো কি শুনেছ, ভিখারী একতারা বাজাচ্ছে, আর তার সামনে জীবনের সমস্ত নৈরাশ্য নিয়ে বসে আছে উপবাসী মানুষের দল? চোখের সামনে দেখেছ কি, বলদর্পীর সাংঘাতিক অনাচারে জর্জর ভীরুরা মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে নর্দমার দুর্গন্ধে। কখনো কি তুমি

রেবা, তুমি চুপ করো জয়ন্ত একটু ব্যাকুলতার সঙ্গে বলল, কিছু মনে করো না, রেবা—আমি কী মন তোমাকে বলতে গিয়েছিলুম আমি অন্যায়ই করেছি

রেবা ততক্ষণে [illegible] ছেড়ে দিয়ে মধুর হাসি হাসছিল।

জয়ন্ত চুপ করে একবার দাঁড়াল, কিন্তু উদ্দীপনা উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল তার মুখে চোখে। টেলিফোনে অভিনয় করল রেবা, কিন্তু তার কানে যেন বাজল একটা কবিতার মূর্ছনার মতো। সে চাইছে এ যন্ত্রণা আরও নিবিড় হোক, যন্ত্রণা হোক আরও নিদারুণ, যন্ত্রণার ঢেউ উঠুক রেবার চারদিকে। সুখের ঘরে যেন আগুন লাগ, [illegible] হয় মানুষের বুক নিরবধি যদি [illegible] হয়ে যা [illegible], [illegible] আসন্ন হয়ে আসে [illegible] তখন শোনা যা [illegible] বাতাসে উন্মুক্ত, মহানগরীর কালবৈশাখী [illegible],—[illegible], পথের চৌমাথার কবি,—সে দশতোলা [illegible] ভিতর থেকে তরবারির ঝঙ্কনা শুনতে পায়।

জয়ন্ত ইনইনিয়ে [illegible] গিয়ে কলম নিয়ে বসতে যাচ্ছিল চেয়ার টেনে,—কিন্তু হঠাৎ বাধা পড়ল। হাসিমুখে [illegible] তরুণী চুনারি। চুনারি বলল, আপনার চায়ের গরম জল, সে সাবান গামছা তোয়ালে—সব রইল

জয়ন্ত প্রায় চেঁচিয়ে বলল, কে তোমাকে অসময়ে পাঠাল? আমি কি চেয়েছিলুম কিছু? নাঃ সব মাটি করলে। অসম্ভব, আমার এখানে থাকা অসম্ভব।

চুনারি তেমনি হাসিমুখে ঈষৎ ঘোমটা টেনে সামনে দিয়ে চলে গেল। মেয়েটার বয়স বছর কুড়ি, হাত দুখানায় উল্কি কাটা, আঙুলগুলো মেহেদির রসে রঙীন, কঠিন নিটোল স্বাস্থ্য,--এই মেয়েটাই বোধ হয় এর গুরুনিতম্বের তালে তালে উর্বশীর বেশ ধরে প্রবেশ করেছিল বিশ্বামিত্রের তপোবনে। মেয়েটা যেন আর একটু রং মাখিয়ে গেল আকাশে, পাখির ডাকে আরেকটু মধু দিয়ে গেল এবং যাবার সময় সমগ্র কক্ষের হাওয়াটাকে দুলিয়ে দিয়ে গেল বসন্ত বাহারের মূর্ছনায়।

ওই সঙ্গেই জয়ন্তর সর্বনাশ ঘটে গেল। দ্রুতপদে বাইরে এসে সে দূর থেকে ডাকল চুনারিকে। চুনারি ঘুরে দাঁড়াল দীপ্ত স্মিত মুখে। ছায়া রৌদ্র ঝিলমিল করে উঠল তার অঙ্গে অঙ্গে বিলোল বাসনায়। চারিদিকের বন বাগানের শোভা যেন তাদের পরমার্থ পেয়ে গেল। জয়ন্ত গলা তুলে চেঁচিয়ে বলল, আমি বলছিলুম আমি না ডাকলে তুমি যেন আর এসো না।

ঘাড় নেড়ে সহাস্যে দূর থেকে চুনারি বলল, আচ্ছা। -

ইন্দ্রসভার নর্তকীর ঘাগরা যেন আবার ঘুরে গেল। চলে গেল চুনারি। চুনারি বলিয়া জেলার মেয়ে। এখানে এসেছে আবাল্য।

ঠিক বুঝতে পারা গেল না ইতিকর্তব্য। কিন্তু ঘর আর নয়, এবার বাহির। সঙ্কোচন নয়, এবার প্রসারণ। কবিতা ছড়িয়ে যাক এবার সর্বত্র - আমগাছের তলা দিয়ে দীঘির ধারে ধারে রক্তকমলের আশেপাশে তাল তেঁতুল আর অশ্বত্থের ছায়ায় ছায়ায়—সেই কবিতা গতিলাভ করুক দূর দূরান্তরে মানবাত্মার অপরিসীম ব্যাকুলতার মতো।

জয়ন্ত বারান্দা থেকে নেমে খালি পায়ে ঘাসের জমি পার হয়ে গিয়ে দীঘির সিঁড়ি বেয়ে নেমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুশীতল স্বচ্ছ জল। মাথার চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে সে সাঁতরিয়ে চলল দক্ষিণ দিকে। অগাধ জলে ভাসতে ভাসতে সে ভাবছিল, মন্দ কি, সে যদি লেখে গোটা কয়েক রোমান্টিক কবিতা! সে একবার ডুব দিল অনেক নিচে, যেন গভীর কোনও ক্ষুধা অন্ধ নিবদ্ধ জলরাশির তলায়--যেখানে কেউ হয়ত ভবিষ্যৎকালের বীজমন্ত্র জপ করছে। জয়ন্ত চলে গেল একবার অগাধ নিচে অতল এক অন্ধকারে। ঘন নিগূঢ় জলের মধ্যে কিছুই সে দেখতে পেল না, কিন্তু কী যেন একটা ছিনিয়ে নিয়ে এল একবিন্দু চেতনার মতো।

ঘণ্টাখানেক ধরে জয়ন্ত সাঁতরিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল ওই দীর্ঘ দীঘির এই প্রান্ত থেকে সেই প্রান্ত অবধি। তারপর ক্লান্ত হয়ে এক সময় সে যখন সিঁড়ির

কাছে এসে জল থেকে উঠে এল ওপরে, চেয়ে দেখল আমগাছের তলায় মধুর হাসিভরা মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে রেবা।

জয়ন্ত বলল, আমার সাঁতার দেওয়া দেখছিলে?

রেবা বলল, কই না, আমি দেখছিলুম জলের ওপর তুমি কবিতা লিখে যাচ্ছিলে!

ঝরঝরিয়ে জল পড়ছিল জয়ন্তর সর্বাঙ্গ থেকে। রেবা বলল, রোদে দাঁড়িয়ে একবার দেখে নিই, কী সুন্দর তুমি। আঃ, একটু দাঁড়াও বলছি। কেউ নেই এখানে। আচ্ছা, এত রং তোমার? এমন বাঙ্গা ঠোঁট পুরুষের হয়? চোখের পাতায় কি কাজল মাখানো? তোমার বুকের গড়ন কেউ কি ছেনি দিয়ে কুঁদে বার করেছিল? আবার চলে যাচ্ছ বড্ড ব্যস্তবাগীশ তুমি

ফিরে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত বলল, লজ্জা শরম নেই তোমার?

লজ্জা শরম! —রেবা আনন্দে হেসে উঠল, —লজ্জা শরম থাকে মানুষের কাছে। তোমার কাছে কেন লজ্জা শরম। তুমি যে পুরুষ। তোমার সপসপে কাপড়ে যে গায়ের যে আভা ফুটেছে, এ যদি না দেখব দুই চোখ ভরে —তবে মেয়ে হয়ে জন্মেছিলুম কেন

ননসেন্স।—জয়ন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, আটার ননসেন্স। হিস্টিরিয়া।

রেবা হাসিমুখে চলল জয়ন্তর পিছনে পিছনে ঘাসের জমিটুকু পেরিয়ে বারান্দার উপর। পিছন থেকেই বলল, আজই আমি আনাচ্ছি আমার জন্যে ফিনফিনে নাইলনের সুইমিং কস্টিউম্, তোমার জন্যেও কী আনি দেখো। সাঁতার আমিও শিখেছিলুম ছোটবেলা, কিন্তু এখন প্র্যাকটিস নেই। বাকিটুকু তুমি শিখিয়ে দিয়ো ডুব সাঁতারে।

ভিতরে গিয়ে জয়ন্ত ভিজে ধুতি ছেড়ে নতুন ধুতি, গেঞ্জি আর পাঞ্জাবি পরে নিল। রেবা তাকে টেনে নিয়ে গেল এন্টিরুমে। সেখানে আয়নার সামনে জয়ন্তকে বসিয়ে পিছন থেকে তার ঘন কোঁকড়া চুলে ব্যাকব্রাশ করে দিল।

জয়ন্ত বলল, কুড়ি বাইশ দিন ডুব মেরে রইলে কেন?

রেবা বলল, ওটা তোমার দরকার ছিল। বিচ্ছেদের ভাবনাটা তোমাকে পেয়ে বসুক, ফিজিওলজিক্যাল সিক্রিশন হোক—এ না হলে চলবে কেন?

কিন্তু আমার লেখার প্রত্যেক লাইনে যদি তোমার সেই রাত্রের ঘুমন্ত উর্বশীর চেহারাটা নেচে বেড়ায়, তাহলে আমার উপায়?

রেবা হেসে উঠল,- জানিনে আমার ঘুমের ঘোরে তুমি কী দেখেছিলে। কিন্তু আমি চেয়েছিলুম চুনারিকে পাঠিয়ে ওটা কাউন্টার অ্যাক্ট করতে। বৈচিত্র্য দিয়ে তোমার অবসেসনকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা ছিল -ভুলে যেয়ো না, জয়ন্ত।

তবে চুনারি যদি তোমাকে লোভ দেখিয়ে থাকে, তাহলে সেটি আমার অপমান। ওদিকে আবার তোমার মন যদি চুনারিকে দেখে গুনগুনিয়ে থাকে, আমার চেষ্টা সেখানে সার্থক।

জয়ন্ত বেরিয়ে এল বারান্দায়। বেলা তখন দুপুর। সেখানে খান দুই বেতের চেয়ারের সামনে বড় টিপাইয়ের ওপর কে যেন এইমাত্র নানাবিধ খাবার ঢেকে রেখে গেল। ওরা এসে বসল তার মুখোমুখি। জয়ন্তই একটির পর একটির ঢাকা খুলল। বলল, এ যে অনেক রকম। কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা খাব?

তোমার যা খুশি।—রেবা হাসিমুখে বলল।

খেতে বসে জয়ন্ত এক সময় প্রশ্ন করল, ফোনে তুমি অমন ককিয়ে উঠছিলে কেন?

রেবা ওর মুখের দিকে একবার তাকাল। তারপর হেসে উঠল উচ্চকণ্ঠে। বলল, তুমি বোধ হয় বুঝতে পারোনি। ওটাতেও আমার দরকার ছিল।

জয়ন্ত একে একে খেয়ে যেতে লাগল। কড়াইশুঁটি, টমাটো স্যুপ, মাংস-ভাজা, মাছের ফ্রাই, বান্‌ এর একটা টুকরো, ঘিয়ে ভাজা ভাত,—একটির পর একটি। খেতে খেতে সে বলল, কে রান্না করেছে এসব?

মুখ তুলে রেবা বলল, আমি ছাড়া তোমার রুচি জানে কে?

কাল তবে শুক্তো, পুঁই চচ্চড়ি, রাঙা আলুর সঙ্গে কুমড়োর ঘ্যাঁট, আর ওই পান্তাভাত পাঠালে কেন?

রেবা বলল, সব রকমই তোমার দরকার, তাই পাঠিয়েছিলুম। ওগুলোও আমার রান্না। খাদ্য-বৈচিত্র্য না থাকলে তোমার চিন্তা যে অসাড় হবে।—থাক জয়ন্ত, আর খেয়ো না তুমি। পেট ভরা থাকলে পাখি ডাকে না।

এখনও যে ক্ষিধে রয়েছে'

থাক ক্ষিধে—রেবা বলল, ক্ষিধে থাকলে চোখ খোলা থাকে। ক্ষিধে মানে অসন্তোষ। দইটা শুধু খেয়ে নাও।—চুনারি?

চুনারি ছিল আড়ালে। সে বেরিয়ে এল প্রসন্ন হাস্যে। রেবা বলল, এসব তুলে নিয়ে যা। আর শোন্‌, মিস্তিরিদের কাজ হয়েছে?

চুনারি বলল, হ্যাঁ। ওরা বসে আছে আপনার জন্যে।

রেবা উঠল। বলল, এসো জয়ন্ত—দেখে আসি।

ওরা দুজনে নেমে গিয়ে চলল কতকটা পূর্বদিকে। এখানে একটি সরু লাল সুর্কির পথ এসে মিলেছে। গোটা চার-পাঁচ বিদেশী পাইন আর ইউক্যালিপটাস শখ করে এদিকে বসানো। তাদের ঠিক নিচে পান্তাবাহার আর ঘন

আইভিলতার উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি অঙ্গন তৃণদলে আচ্ছন্ন। ওরই মধ্যে আজ প্রায় আটদিন ধরে খেটেখুটে জন পনেরো মিস্তিরি একটি পর্ণকুটির বানিয়েছে—বাঁশের খুঁটি, বাঁশের বেড়া, শালের গুঁড়ি, কাদামাটি, নারকেল দড়ি আর গোলপাতার সাহায্যে। মেঝে বা বারান্দা এখনও যথেষ্ট শক্ত হয়নি—সেজন্য সবত্রই নারকেল দড়ির কার্পেট বিছানো। ভিতরটা মস্ত। দুখানা নেপালের স্থন্দর চারপাই, টেবিল চেয়ার, কাপড় জামা রাখার আলনা, মোমবাতির বড় সেজ, বাইরে স্নানাদির ব্যবস্থা—এবং আশ্চর্য, একটি রান্নাঘর, যার মধ্যে সবপ্রকার বাসন সামগ্রী। ইলেকট্রিক কারেন্টে রান্না। ঘরের ভিতরে জ্বলবে মোমবাতি। বাইরে ইলেকট্রিক।

দুখানা খাট কেন ধরে? তুমি শোবে?

রেবা বলল, এত নিরিবিলিতে যদি তুমি ভয় পাও, তাহলে শোব বৈকি।

জয়ন্ত বলল, কিন্তু তুমি এসব করলে কেন?

এটুকু না করলে তোমার যে একঘেয়ে লাগবে। তোমার চোখ মন যে কবির। রেবা বলল, স্থিতি কোথাও তোমার দীর্ঘ হলে চলবে না। নতুন অ্যাঙ্গল্ চাই তোমার প্রত্যেক দিন। আকাশ, আলো, গাছ, জ্যোৎস্না—এদের দ্যাখো অনেক জানলা দিয়ে। তোমার দৃষ্টিকোণ এদের দেখুক নতুন নতুন ভঙ্গীতে। সব আমি করছিনে জয়ন্ত, তুমি করিয়ে নিচ্ছ। এ বাগান যতদিন বা যতকাল তোমার ভাল লাগবে, ততকালই তোমার। তারপর ধরো, তুমি থাকবে না এখানে। তখন কি মনে করেছ সব মিলিয়ে যাবে? মোটেই না। থাকবে তোমার স্পিরিট। তোমার আওয়াজ থাকবে পাখির ডাকে, দীঘিতে ভাসবে তোমার চোখ, হাওয়ায় তোমার নিঃশ্বাস, রোদে তোমার রং। আর আকাশ। আকাশ ধরে থাকবে তোমার সব বাসনার স্বপ্ন।

বুঝলুম—জয়ন্ত বলল, পেটে খাবার পড়ার পর ঘুমোবার আগে রোমান্স-বিলাস। এর চেয়ে মোদকের আটচালায় পাওয়া যেত হার্ড সেন্স অফ রিয়েলিটিজ। সেখানে কাঁচা চামড়া, নর্দমা আর পানতুয়া ভাজার গন্ধ এক সঙ্গে মিলিয়ে খুঁচিয়ে দিত আমার বাস্তববাদী কল্পনা। এখানে ক্লেশ-ক্লিন্নতা কই, দুর্গতির কান্না শুনিনে, অসন্তুষ্টির আক্রোশ দেখতে পাইনে—কোথায় আনলে তুমি? এ যে পর্ণকুটীরের সিংহাসন। কোটিপতির দারিদ্র্য। আমি কি চাই তা অবশ্য আমি জানিনে। কিন্তু এ ঘর আমি চাইনে।

দীপ্তচক্ষে রেবা বলল, কোনও ঘর তুমি চাও না, সেই তোমার পরিচয়। এ ঘর আমার বিলাস, কিন্তু তোমার পক্ষে নতুন আস্বাদ। এই ঘরে একা বসে কাঁদবে তোমার কবিতা মানুষের দুর্গতিতে, তাই তোমাকে এনেছি। তুমি

থাকবে এখানে দুঃখে, ভয়ে, চিত্তের বিকারে, অস্বস্তিতে, —তাই এ-ঘর তোমার। কেন ভুল করছ, জয়ন্ত! নর্দমায় বসে নর্দমার গান লেখা যায় না। দারিদ্র্যের থেকে কিছু দূরে বাস না করলে কেমন করে দেখবে দারিদ্র্যের ছবি? শান্তির পর্ণকুটীরে না ঢুকলে কেমন করে শুনবে অশান্ত মানুষের রুদ্ধ বিক্ষোভ দিকে দিকে আগুন জ্বালাচ্ছে। ধরো, আমি যদি তোমাকে সাপের মত জড়িয়ে পড়ে থাকি, তাহলে কি সেই অবস্থায় প্রেমের কবিতা ভাবতে পার?

হাসিমুখে জয়ন্ত বলল, তখন যদি কামকাব্য ভাবি?

তাও হয় না, জয়ন্ত। সেক্ষেত্রেও কামিনীকে থাকতে হয় চোখের আড়ালে। চিন্তা আর ইচ্ছাই হল আসল, দেহ শুধু মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়।

জয়ন্ত হঠাৎ প্রশ্ন করল, তোমার এত অভিজ্ঞতা হল কোত্থেকে? এত শিখলে তুমি কেমন করে?

ওমা, আমি যে মেয়ে!—রেবা বলল, অবাক করলে তুমি। এ যে বিজ্ঞানের প্রথম কথা। আমার জ্ঞান আর শিক্ষা এনেছি প্রজাপতি ব্রহ্মার পাঁজর থেকে। এ যে কল্প কল্পান্তরের, জন্ম জন্মান্তরের। নিষিদ্ধ ফল তুমি জানতে না, আমিই তোমাকে সেই ফলের সন্ধান দিয়েছিলুম লক্ষ লক্ষ বছর আগে। আমি যে মেয়ে। সৃষ্টির আদিতত্ত্বে মেয়ের দায়িত্বই বেশি, ভুলে যেয়ো না। এসো, চল আমার সঙ্গে।

জয়ন্ত বলল, আবার কোথায়?

এই তো পাশেই। ওই যে কুলকাঁটার মস্ত ঝোপ ওরই আড়ালে।

রেবা জয়ন্তকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘাসের উঠোন পেরিয়ে চালাঘরের বেড়ার পাশ দিয়ে। বেশি দূর নয়, আন্দাজ পঞ্চাশ গজ সামনেই কুলকাঁটার মস্ত ঝোপ, তার আড়াল দিয়ে ঘুরতেই সামনে পাওয়া গেল এক চমৎকার তাঁবু। কোলের কাছে তার ছোট একটি বাগান কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার তলায়-তলায় নানাজাতের মৌসুমী ফুল। একজন মালী সেখানে কাজ করছিল।

জয়ন্ত বলল, বেশ সুন্দর তো?

এসো ভেতরে!—বলে রেবাই আগে আগে ঢুকলো।

ভিতরের মেঝেটা কাঠের প্লাটফরম। এ যেন মস্ত হলঘর। দুধারে দুখানা নেয়ারের খাট, অদূরে খাবার টেবল, এখানে মীটসেফ, ওখানে আলমারি আর ওয়ার্ডরোব। দুজনে থাকার পক্ষে চমৎকার। এক কোণের পর্দা তুললে একটি প্যানট্রি, দু'পা এগোলে হাত ধোয়ার বেসিন। হলের মধ্যে ফলস সিলিং, তার ভিতর দিয়ে নেমেছে বিদ্যুতের আলো আর পাখা।

রেবা বলল, কেউ থাকে না এখানে। ঘর কাঁদে মানুষের জন্তে। তবে মালী আর খানসামা বাইরের ঘরটায় থাকে।

জয়ন্ত খুশি হয়ে বলল, আমি থাকব এখানে। আমার ইচ্ছে,—না, থাক, তোমার শুনে কাজ নেই।

হেসে উঠল রেবা। কাছে এসে কৌতুক করে বলল, থাকবে কেন? মেজাজ যে ফিরেছে এতক্ষণে! আমাকে চাই, এই তো?—ওরে, কে আছিস? শচীন—

শার্ট-প্যান্ট পরা একটি সিপসিপে কালো লোক ভিতরে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। রেবা বলল, উনি এখানে থাকবেন। ওঁর বাক্স আর কাপড়-চোপড় গেস্ট হাউস থেকে সব এনে দাও। চুনারিকে গুছিয়ে দিতে বলো।

যে আজ্ঞে—বলে শচীন চলে গেল।

জয়ন্ত এদিক ওদিক চেয়ে বলল. ওই বড় কাঠের সিন্দুকে কি আছে? তালা বন্ধ কেন?

ওটা সেলার।—রেবা বলল. সব জাতের মদ আর বীয়র আছে ওখানে। চাবিটা তুমি রেখো।

কেন? আমি কি করব চাবি নিয়ে?

বাঃ, তোমার জন্যেই তো সেলার।—রেবা বলল, আমি রইলুম আর সেলার রইল! শচীনকে সরিয়ে দেবো। মালী গিয়ে থাকবে বাংলোয়। চুনারিকে নাচের ঘাঘরা পরিয়ে তোমার সামনে ছেড়ে দেবো। অন্তত সেলারের মান বাঁচবে।

জয়ন্ত হাসিমুখে প্রশ্ন করল, আর তুমি?

রেবা বলল, আমি? প্রথম রাত্রের দিকে আমি থাকব পাশ ফিরে। সব কোলাহল শেষ হলে তারপর আমি! তোমার ওই বড় বড় নধর কালো চোখ হবে রাঙা, তোমার চুলের ঝালর ঝুলবে এলোমেলো হয়ে, টলবে তোমার হ্-পা, তোমার অহঙ্কার আর আত্মাভিমান ধারাল হয়ে উঠবে। আর আমি! আমি দেখব আমার কবিকে মহাকালের চেহারায়। দেখব তুমি ছিন্নভিন্ন করছ তোমার সংস্কার, শিক্ষা, সংযম—আগাগোড়া সব। জয়ন্ত, তোমার সেই চেহারা আমার দেখা দরকার। তুমি বড্ড যেন চাপা পড়ে আছ। কাগজে-কাগজে যত তোমাকে হাততালি দিচ্ছে, তুমি ততই জালের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চাইছ! তুমি কবি, শাসন বাঁধন তোমার জন্যে নয়। তুমি লোকজনের মধ্যে ভয়ানক বেমানান। সামাজিক, নৈতিক—এসব ব্যাপার তোমার কাছে নিরর্থক। আমার মতন ত্রিশ পঞ্চাশেক মেয়েকে তুমি যদি থেঁৎলে নিংড়ে ফেলে দাও—সেই নিন্দে

তোমার দাঁড়াবে না। তুমি সব যশ-অপযশের বাইরে। তোমার সিংহাসন তৈরি হয় না, নিজের থেকে জন্মায়। জয়ন্ত, লক্ষ্মীটি, আজ তুমি মাতাল হও। তুমি থাকবে একা পুরুষ, আর থাকব আমরা। শুধু চুনারি কেন, মিস মন্ডলীনুকে ফোন করছি এখুনি। রোজ্, মার্গারেট, মিনি সেন, ডলি কওর—সবাই ছুটে আসবে। আমি আসব সেই ঘন কালো গাউনটা চড়িয়ে। তলায় তার কিছু থাকবে না। আগাগোড়া টিপ-বোতামে তৈরি সেই সর্বনেশে রোব। মাঝরাত্রে একে-একে তোমার চারিদিকের মৌমাছিরা অসাড় হয়ে যখন মেঝের উপর লুটোবে—তখন আমি যাব এগিয়ে। তুমি তখন একটি একটি করে টিপ বোতামে টান দেবে।

জয়ন্ত ব্যস্ত হয়ে বলল, এবার একটু চুপ করো। ছবিগুলো একে একে কল্পনা করে নিই। তুমি যা বললে এ সব তো বিদেশের নাইট ক্লাবের ছবি। এ-সব তো ইম্‌মরাল্—

রেবা গড়িয়েছিল নেয়ারের খাটে। এবার তার ভাঙা খোঁপা সমেত ঘাড় তুলল। বলল, ঠিক বলেছ। এ-সব ছবি মায়ের সেই গ্যালারিতে ঢুকলে দেখতে পেতে। কিন্তু আমাদের দেশের ছবিও খারাপ নয়। তুমিও তো পরতে পার মাথায় মোহনচূড়া, তুমিও তো তমালের ডালে বসে তোমার বাঁশিতে ধরতে পার আশাবরী, আর জলকেলি করছে যে গোপিনীরা, তাদের শাড়িগুলো কেড়ে রাখতে পার। না জয়ন্ত, ইম্‌মরাল নয়, মরালও নয়,—এ হল অ্যামরাল্। চলো, এবার তোমাকে নিয়ে বেরোব।

রেবা উঠে পড়ল। আর দেরি নয়।

তাঁবুর ধারের বাগানটুকু পেরিয়ে বাঁহাতি দু'পা গেলেই বড় বাগানের খিড়কির ফটক। তেওয়ারি সেখানে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ওরা দুজন গাড়িতে উঠে তেওয়ারিকে ছেড়ে দিল। সরু নিরিবিলি পথে রেবা গাড়ি ছুটিয়ে চলল।

জয়ন্ত বলল, এতদিন ধরে রয়েছি এখানে, কিন্তু তোমাদের ঘরকন্নার কোনও আভাসই পেলুম না।

রেবা বলল, তুমি কি মা-বাবার কথা শুনতে চাইছ?

অন্য কেউ তো তোমাদের বাড়িতে থাকে না।

রেবা হাসল। বলল, বাবা গিয়েছেন লণ্ডনে নিজের কাজে। আর মা? গেল তিন সপ্তাহের মধ্যে মার সঙ্গে দুতিনবারের বেশি আমার দেখাই হয়নি।

খাবার সময়ও না?

না, আমরা কেউ কারো খবর রাখিনে। যার যখন টাকার দরকার হয়, আমার কাছে স্লিপ পাঠিয়ে দেন।

জয়ন্ত প্রশ্ন করল, তোমার খরচপত্র কি রায়সাহেব দেন?

না, তাঁর খরচপত্র আমি দিই। আমার হাতেই সব।

কথাটা আরেকটু সহজ করে বলো, রেবা।

রেবা পথের বাঁক ফিরে বলল, বাবার কোম্পানীর যে ম্যানেজিং এজেন্সি, আমি তার বড় পার্টনার। তুমি তো জান, ধনীরা কখনো ঘরের টাকায় কারবার করে না। ওরা ফাঁদ পাতে, সেই ফাঁদে টাকা ধরা পড়ে। এই ফাঁদে যারা টাকা দেয়, তারা কিন্তু যে ঠকে তা নয়। ব্যবসা যত বাড়ে, তারাও লাভবান হতে থাকে। কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্সির হাতে থাকে আশ্চর্য যাদু, তার নিজস্ব কৌশলই তাকে ধনকুবের বানায়। একটা ব্যবসা থেকে দশটা ব্যবসা গজিয়ে ওঠে। একদিকে টাকার বিরাট অঙ্ক, অন্যদিকে সেই টাকা উপার্জনে পরিশ্রমও কম। এর নামই ধনবাদ।

জয়ন্ত চুপ করে গেল। এ যেন তার কাছে নতুন আবিষ্কার। এক সময় সে বলল, তুমি কি বলতে চাও তোমার ওপর শাসনও নেই?

টালিগঞ্জ পার হয়ে গাড়ি ছুটছিল। পথের সামনের দিকে চেয়ে রেবা বলল, শাসন থাকলে তো খুশী হতুম। কিন্তু কিছু নেই যে। পড়ে কুড়িয়ে পাওয়া একটা মামাও নেই।

তোমার মা কি ভাবছেন আমার সম্বন্ধে বলো তো?

অত্যন্ত খারাপ কথাটা আমার মুখ থেকে শুনতে চেয়ো না, জয়ন্ত। আমার সম্বন্ধে মা সম্পূর্ণ উদাসীন। তার কারণও আছে।

জয়ন্ত মুখ ফেরাল। রেবা হেসে উঠে বলল, আর কিছু নাই শুনলে!

কিন্তু তুমি যদি অধঃপাতে যাও, তাহলেও মার লাগবে না?

অধঃপাত কাকে বলে মা জানেন না।

একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ পরিহাসের সঙ্কেতে উভয়েই উচ্চকণ্ঠে হেসে গাড়ির ভিতরটিকে মুখর করে তুলল।

ভবানীপুরের কোনও এক গলির মধ্যে ঢুকে কিছু দূর অবধি এগিয়ে রেবা এক জায়গায় গাড়ি থেকে নামল। বলল, তুমিও আসতে পার জয়ন্ত, এখানে সঙ্কোচ কিছু নেই।

ভাঙা পাঁচিলের পাশে একটি দরজা দিয়ে ওরা দুজন যেখানে ঢুকল, সে-জায়গাটা একটা খোলা চত্বর। আশেপাশে কয়েকখানা পুরনো বাড়ির এটা পিছন দিক। নানাদিক থেকে ছোট ছোট নালা-নর্দমা একদিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

ওরা এদিক ওদিক ডিঙিয়ে একটি একতলা বাড়ির রোয়াকে উঠল। রেবা দরজায় ঢুকে ডাকল, ইন্দু-মা ?

জনৈক মহিলা বেরিয়ে এলেন। রেবাকে দেখে তিনি অবাক। বললেন, তুমি যে হঠাৎ! ও ছেলেটি কে ?

আমার বন্ধু, জয়ন্ত। রেবা বলল, তোমার সঙ্গে সেদিন ফোনে কথা বললুম তোমার ইস্কুলে। তুমি তো এক কথায় আমার অনুরোধ উড়িয়ে দিলে। কিন্তু তোমাকে সত্যিই বলছি ইন্দুমা, আমি কাজ করতে চাই।

ইন্দুমা বললেন, নাও, বসো তোমরা এই তক্তাখানার ওপর। তুমি এখন আর ছেলেমানুষটি নও, রেবা। তোমার জ্ঞানগম্যি কিছু হয়েছে। ইস্কুল-কলেজে তোমার যে একটা কাজ জোটে না তা নয়, কিন্তু হাজার হলেও সেটা চাকরি। রায়সাহেবের মেয়ে চাকরি করছে, এ খবরটা খুব সম্মানজনক নয়।

মহিলার বয়স বোধ হয় চল্লিশ এখনও হয়নি। চোখে চশমা। মাথার সামনে বাঁকা টেরি। গায়ের রং ফর্সাই। কিন্তু মাথায় সিঁদুর নেই। স্বাস্থ্য ইত্যাদি ভালই।

রেবা বলল, তুমি বড্ড বাজে কথা বলো, ইন্দুমা। কাজ করব, টাকা আনব, খেটে খাবো,—এর মধ্যে অসম্মান কোথায় ?

জয়ন্ত একপাশে সবিনয়ে বসেছিল। ইন্দুমা বললেন, শুনলে জয়ন্ত, মেয়ের কথা! এ মেয়ে আমার হাতেই মানুষ, আমি ওর দু বছর বয়স থেকে ওর মেট্রন ছিলুম। ওদের বাড়ি ছেড়ে এসেছি এই ধরো বছর পাঁচেক আগে। ওর বাবার মতন উদার প্রকৃতির ভদ্রলোক সচরাচর দেখা যায় না। এই সেবার আমার ছোট ভাইটির কথা বললুম। এক কথায় তার দুশ টাকা মাইনের চাকরি হয়ে গেল। কত গরীব গেরস্ত যে ওঁর কাছে সাহায্য পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আমাকে তুমি আজ বলতে এসেছ রেবা, কিন্তু তোমার বাবার এক কথায় একটা কলেজ তৈরি হতে পারে, আর সেই কলেজের তুমি প্রিন্সিপাল হতে পার।

শোন ইন্দুমা—রেবা বলল, আমাদের বাড়ির কথা তুমি সব জান। নতুন কিছু নেই। আমার টাকা আছে, কিন্তু কাজের মধ্যে থাকব। পছন্দসই কাজ একটা আমার পাওয়া চাই। তুমি যে খবরটা সেদিন দিয়েছিলে, আমি সেইটেইর জন্যেই তোমার কাছে এলুম। হোক আড়াইশ, আমি ওতেই রাজী।

ইন্দুমা বললেন, তাহলে ইস্কুলের কর্তাদের সঙ্গে একবারটি কথা বলি। ওরা যদি রাজী হয় তোমাকে ফোনেই জানাব।

আমি যদি নিজে এসে তোমার এখানে খবর নিই ?

কিছু দরকার নেই—ইন্দুমতী বললেন, সামান্য একটা খবর বৈ তো নয়। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তোমরা কিছু মনে করো না।

না না, সে কি কথা, বলুন না?—জয়ন্ত ব্যস্ত হয়ে বলল।

ইন্দুমতী বললেন, আমার যখন চোদ্দ বছর বয়স, তখন রেবাদের ওখানে কাজ নিই। রেবা আমার সামনেই বড় হল। ওর স্বভাব প্রকৃতি মন শিক্ষা—কোনটাই সাধারণ গেরস্ত ঘরের মেয়ের মতন নয়। এ মেয়ের আধখানা হল পুরুষ। বোধহয় এই জন্যেই ইস্কুল কলেজের ছেলেরা, এমন কি মেয়েরাও ওকে সমীহ করে চলত। রায়সাহেব ওর জন্যে রেখেছিলেন ফিজিক্যাল ট্রেনিং-এর ইনস্ট্রাকটর। রিং বার, ডাম্বেল, চেস্ট এক্সপ্যাণ্ডার—এই সব নিয়ে রেবা এক্সারসাইজ করত। আমি ওকে সাঁতার শেখাই। রায়সাহেব ওকে ঘোড়ায়-চড়া শেখাবার জন্য রেখেছিলেন একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট। ওকে দেখে আমার মনে হতো, এ মেয়ে বিয়ে করবে না কোনদিন। সেইজন্যে ভাবছি তোমাদের বন্ধুত্বের পরিণাম কি। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার আজ এত ভাল লাগছে। তুমি কি কর জয়ন্ত?

জয়ন্ত জবাব দিল, সম্প্রতি আমি বেকার।

রেবা বলল, ইন্দুমা, জয়ন্ত নিজের সম্বন্ধে বড্ড লাজুক। তুমি কি মনে করছ শুধুই শিমুল ফুল, একটুও গন্ধ নেই? তা সত্যি না। জয়ন্ত ফার্স্ট ক্লাস এম এ, তার পর পি এইচ. ডি। কয়েকটা কলেজ থেকে, ইউনিভার্সিটি থেকে ওকে ডেকেছে, কিন্তু ও যায়নি। ও একজন বিশিষ্ট কবি।

কবি।—ইন্দুমতী বললেন, বই লেখো বুঝি?

হ্যাঁ—রেবা জবাব দিল।

তা না-হয় বুঝলুম। কাজকর্ম কিছু কর না? অবস্থা ভাল বুঝি?

জয়ন্ত এবার হেসে উঠল। আমি খুবই গরীবের ছেলে। চাল-চুলো বলতে আপনারা যা বোঝেন, তা আমার একেবারেই নেই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত টিউশনি করতুম, আর এক ময়রার আড়তে পড়ে থাকতুম—সে দুটোই এখন নেই।

ইন্দুমতী বললেন, কিন্তু ভাত-কাপড় বা মাথা গোঁজার ঠাঁই—এসবের কথা আছে তো!

আপাতত ওগুলোর দায়িত্ব রেবার ঘাড়ে চড়েছে।

ও, তাই বল!—ইন্দুমতী বললেন, কিন্তু আজকের ঘর-জামাইরাও ইস্কুল-মাস্টারি করে, জয়ন্ত। এই ছাখো না আমার কথা। দেড়খানা ঘর নিয়ে একলা থাকি, এরই ভাড়া পঁয়ত্রিশ টাকা। রেবার মার সঙ্গে কথান্তর হল, ও-বাড়ির

কাজটা তাই রইল না। কি আর করব! একটা পাসও যদি করতুম, তাহলেও বা কথা ছিল। তবে যাই হোক, জুনিয়ার ট্রেনিংয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম, তাই প্রাইমারি ইস্কুলে কাজ পেয়ে গেলুম। দিনকাল যা মন্দা, দিন চলে না। ঠিকে ঝি একটা রেখেছিলুম, তাকেও ছাড়িয়ে দিতে হল।—তা বেশ, ভালই করেছ জয়ন্ত—বড় গাছের গোড়ায় নৌকো বাঁধা নিরাপদ।

এবার রেবা মুখ খুলল। বলল, তা যা বলেছ, ইন্দুমা। তবে শেকল শক্ত না হলে ছিঁড়ে যেতে পারে। তোমার ত' সবই মনে আছে। এখানে শেকল নেই, নৌকো অকূলেই ভাসছে। ঘূর্ণীঝড়ে ঘুরছে, বাঁধে কার সাধ্য। ভাসতেই এসেছে। হয় ভাসবে, না হয় তলা ফুটো হয়ে ডুববে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য না হলে আমার সঙ্গে কারও বন্ধুত্ব হয় না, ইন্দুমা।

জয়ন্ত কৌতুক বোধ করে হাসছিল। রেবা পুনরায় বলল, আমরা দুজনেই বোধ হয় বেনোজল, বুঝেছ ইন্দুমা? কোনদিকে আমরা সরে যাব, দু'জনেই জানিনে। তখন শুকিয়ে যাবে বটে সব, কিন্তু আমরা রেখে যাব পলিমাটি, ভবিষ্যতে ফলবে প্রচুর ফসল। এখন কেবল বন্যার তাড়নায় মেতে আছি।

ইন্দুমতী বললেন, কিন্তু তুমি তো টাকার বাণ্ডিলের ওপরে বসেছ, রেবা।

আমার সেইটিই বিপদ, ইন্দুমা। বেশি টাকা মানে আজ বারুদের স্তূপ, একি তুমি বুঝবে? আজ আমার নিজের মধ্যেই কথা উঠছে, কার টাকার ওপর বসে আছি? পরিশ্রম করে রোজগার করছি, না শুধু কাগজ-কলমের কৌশলে ডাকাতি করছি। এমন দিন বোধ হয় আসন্ন, যেদিন আমি ছাড়া আমার জন্যে আর কেউ কাঁদবার থাকবে না।—আচ্ছা, আজ আমরা উঠি, ইন্দুমা।

ইন্দুমতী বললেন, তোমাদের একটু মিষ্টিও খাওয়াতে পারলুম না, জয়ন্ত। আচ্ছা, আবার কখনও দেখা হবে। তবে হ্যাঁ, তোমরা আমার ছেলেমেয়ের মতন—একটি কথা তোমাদের বলে রাখি—

জয়ন্ত বলল, ক্ষমা করবেন, ইন্দুদেবী—এতক্ষণ মনে মনে আপনার বয়সটি হিসাব করেছি। আপনার বয়স সাঁইত্রিশ, রেবার প্রায় পঁচিশ, আমার আটাশ। আমার বিশ্বাস, আপনার এই বয়সে আমাদের দুজনকে ছেলেমেয়ে ভাবা উচিত নয়।

ইন্দুমতী ওর দিকে তাকিয়ে একেবারে হতবাক্। পরে বললেন, কিন্তু রেবা আমাকে ইন্দুমা বলে।

ওটা ছিল আপনার চাকরির খাতির। নার্সরা যেমন সিস্টার। মিসনারি ইস্কুলে যেমন ফাদার। তা ছাড়া মেট্রন মানে মা নয়, মাদারলি! এজন্য বিয়ে-করা মেয়েই মেট্রন হয়। আপনি হলেন কুমারী!

ইন্দুমতী বললেন, তোমার তর্ক না হয় মেনেই নিলুম, জয়ন্ত। কিন্তু উপদেশ দেবার বয়স আমার হয়েছে। আমি আশা করব তোমাদের সংযত জীবন। ব্রহ্মচর্যই জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। সংযম আর চরিত্রের শুচিতা—এই দুটি হল সব রকম সাফল্যের সোপান। আমি একজন শিক্ষয়িত্রী, আমার এই সামান্য কথাটি মনে রেখ তোমরা।

ওরা দুজনে এবার হাসিমুখে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো। পিছন থেকে ইন্দুমতী বললেন, খবর পেলেই ফোনে জানাব, রেবা। কষ্ট করে তোমার না এলেও চলবে। আমি আবার এবেলা ওবেলা টিউশনি করতে যাই তো! সব সময় ঘরেও থাকিনে।

আচ্ছা—রেবা জবাব দিয়ে বেরিয়ে গেল।

গাড়িতে উঠে জয়ন্ত বলল, ভদ্রমহিলা চান না ওঁর বাড়িতে তুমি এসো। এই নিয়ে বা'র তিনেক উনি মানা করলেন।

ওই ওর স্বভাব—রেবা বলল, আমি গেলেই উসখুস করে! ও চায় না ওর ঘরের চেহারা দেখি। ওর ভয় করে পাছে এক পেয়ালা চা চেয়ে বসি।

গলি থেকে গাড়ি বার করে রেবা আবার ফিরে চলল। এক সময় জয়ন্ত বলল, উনি বিয়ে করেননি কেন?

রেবা বলল, স্বামী থাকলে মেয়েদের সহজে চাকরি জোটে না। স্বামী মারা গেলে প্রায়ই তরুণী বিধবাদের চাকরির উন্নতি হয়!

ফস করে জয়ন্ত উট্‌কো এক প্রশ্ন করল,—অনেক মেয়ে নামের পাশে কুমারী লেখে কেন বল তো?

ওটা বিজ্ঞাপন। ওতে পুরুষ পাঠক পুলকিত হয়!

তুমি কি মনে কর, কুমারী ইন্দুমতী আজও কৌমার্যবতী? উনি যে সংযম আর ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে লেকচার দিলেন, সেটা কি ঈর্ষাপ্রণোদিত নয়?

স্টিয়ারিংয়ের ওপর দুই হাত রেখে রেবা হেসে লুটোপুটি। জয়ন্ত পুনরায় রাগ করে বলল, চল ত' এক ঘরে দু'জনে শুয়ে দেখি, কুমারী ইন্দুমতীর হিতোপদেশ পালন করা যায় কিনা?

রেবা বলল, তুমি ত' সে-পরীক্ষায় পাস করেছিলে মোদকের সেই পাঠশালায়! তোমার ভয় ভাবনা কিসের?

জয়ন্ত বলল, না, সে-পরীক্ষায় শুধু পাসমার্ক পেয়েছিলুম। সে-অঙ্কে ফুলমার্ক পাইনি।

মানে? কী বলছ?—রেবা মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

জয়ন্ত বলল, সেদিন মানসিক সংযম আর ব্রহ্মচর্য থাকেনি! তোমার স্থূল, অচেতন এবং স্বল্পাবরণ মাংসপিণ্ড সেদিন আমাকে অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দেয়নি। চল, আজ তোমাকে জাগিয়ে রেখে তার প্রায়শ্চিত্ত করব!

রেবা হাসল,—বটে, আমার দিককার বুঝি কোনও কথা নেই? আমি কি তোমার প্রায়শ্চিত্তের উপকরণ? আমি কি ল্যাবরেটরির টেস্ট-টিউব? জয়ন্ত, বাঘিনীর রক্তে যদি নতুন জারক রস মিশিয়ে দাও, তাহলে তার ঝুঁকি নিয়ো। তুমি জাত-কবি, কিন্তু শেলীর জীবন ভুলো না!

জয়ন্ত বলল, ওর নাম করো না, রেবা। ওকে চট্‌কিয়ে খেয়েছি। ওর কবিতা নিয়ে আমি ছাত্র পড়াই। ভাবে ভাসা, আন্‌প্র্যাকটিকাল্‌, উন্মার্গগামী এক আত্মভোলা কবি! রিয়ালিজমের ধার মাড়ায়নি। একালের মূল্যায়নে তোমার উনিশ শতক আর ধোপে টিঁকছে না!

একালের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

জয়ন্ত হাসল। বলল, তোমার শ্যেলারের সকলের বড় বোতলটার সমস্ত মদটুকু যদি আমাকে খাওয়াতে পারতে, তাহলে সবিনয়ে বলতুম, তোমার পাশে যে ব্যক্তি বসে রয়েছে সে! এই কবি দুঃখ-বেদনায় নাকিকান্না কাঁদে না, ভালবাসার কথা নিয়ে মেয়েমানুষের অহেতুক স্তাবকতা করে না, সামান্য পাখির ডাক শুনে অলস আর অবাস্তব কল্পনার বুড়বুড়ি কাটে না! এই কবি জানে, একালের কাব্য বা সাহিত্য বাস্তব জীবনেরই একটা প্রধান অংশ। কাব্যে-সাহিত্যে চল্‌তি জীবন-কালের সব ভাবনার দ্বন্দ্বদোলা যদি না পাই তবে তা অপাঠ্য। জীবনকে রিভিউ করে সাহিত্য। রামায়ণ থেকে রবিঠাকুর— একই কথা। কবিতা কি শুধু কাঁদবে মেয়ের মোহে? কাঁদবে শুধু নৈরাশ্যে আর আক্ষেপে? কেন? কাব্য কি কান্নার বাহন? লিরিক কি কামাসক্তির রাজবেশ? এসব কথা ছাড় রেবা।

বাগানের সেই গলির মধ্যে গাড়ি এসে ঢুকল এবং ঠিক যেখান থেকে ওরা গাড়ি ছেড়েছিল, গাড়ি সেইখানে এসে থামল। রেবা বলল, তুমি একটু বিশ্রাম করোগে, আমি ঠিক সময়ে আসব।

দাঁড়াও—জয়ন্ত বলল, আমার কথা ছিল, রেবা।

কি, বলো?

তুমি কি সত্যিই একটা কাজের জন্ম ইন্দুমতীর কাছে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ নিশ্চয়। আমি কাজ করি এই আমার পরিচয় হোক। আমি এক ধনীঘরের বিলাসিনী মেয়ে, এ পরিচয় ঘুচুক, জয়ন্ত। আরেক কথা, আমি তোমার কাজে আসতে চাইছি। তোমার লেখা যদি থামতে থাকে, আমি তাকে জ্বালিয়ে তুলব। তুমি অরণী কাঠ, সাংঘাতিক আগুন এনেছ সঙ্গে, কিন্তু সেই কাঠ ঘষবে আমার জীবনের ওপর—দাউ দাউ করে জ্বলবে তুমি !

জয়ন্ত বলল, তার জন্যে কাজ নেবে ? চাকরি করবে ?

হ্যাঁ—রেবা বলল, অসঙ্কোচে। আমি জানি তোমার মূল প্রকৃতি, কোথাও তুমি দাঁড়াবে না, তুমি যে কবি। তোমার জাতি গোত্র-ধর্ম মানুষের সমাজের সঙ্গে মিলবে না, কিন্তু মানুষ ছাড়াও তোমার চলবে না, জয়ন্ত।

কিন্তু তুমি যদি কাজ নাও, তোমাকে তো হারাব ?

রেবা বলল, ঠিক উল্টো। তোমার সমস্ত অনুপ্রেরণার আদিমূল হয়ে থাকব তোমার পাশে পাশে, তাই কাজ নিচ্ছি।

এই বাড়ি তুমি ছাড়বে ? ছাড়তে পারবে ?—জয়ন্ত মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

কতক্ষণ লাগে এই নরককুণ্ড থেকে পালাতে ?

কিন্তু ধনসম্পদ ? বিলাস-বাসন-বৈভব ?

কুলকুলিয়ে রেবা হেসে উঠল। বলল, রাজা অশ্বপতির মেয়ে বনে চ'লে গিয়েছিল সব ছেড়ে দিয়ে।

জয়ন্ত বলল, সে যে বিবাহিতা স্ত্রী ছিল।

বিবাহিত!—রেবা দপ করে উঠল, তুচ্ছ বিয়ে। তুমি যে সত্যবানের চেয়ে অনেক বড়। তুমি কবি। আমি যে তোমার অনুগামিনী! আমার অন্য পরিচয় সব মুছে যাক্।

জয়ন্ত নেমে গিয়ে ফটকের ভিতরে ঢুকল। শচীন ছিল সামনে। সে ছুটতে ছুটতে গিয়ে আগেভাগে তাঁবুর বাইরে ও ভিতরে একটার পর একটা আলো জেলে দিল।

রেবা ততক্ষণে গাড়ি নিয়ে চলে গেছে।

জয়ন্ত তাঁবুর ভিতরে এসে দাঁড়াল। চেয়ে দেখল যেন চারদিকে যাদু স্পর্শ করেছে। অত বড় কক্ষ, চলাফেরার জন্য প্রচুর ও প্রশস্ত অবকাশ,—কিন্তু আসবাবপত্রাদি নিখুঁতভাবে সাজান। দুদিকে দুখানা নেয়ারের খাট, উপর দিকে মিহি নেটের মশারি তোলা, লেখাপড়ার খুঁটিনাটি সরঞ্জাম, রেডিয়ো যন্ত্র এক কোণে, উঁচু বেঞ্চির ওপর কুড়ি বাইশটে বিভিন্ন রংয়ের বিচিত্র লেবেল্-সাঁটা

বোতল এবং তাদেরই প্রয়োজনমতো মিহি কতকগুলি কাঁচের গেলাস ও সোডার শিশি। কাঁচের হ্যাণ্ডেলওলা পাত্র বীয়রের জন্ত অন্ত টিপাইয়ের ওপর রাখা। অপর শিশিগুলির কাছে গিয়ে জয়ন্ত দাঁড়িযে লক্ষ্য করল, সেগুলি আপেল জুস, পাইন-অ্যাপল, অরেঞ্জ স্কোয়াস, আইসক্রীম সোডা, লিমনেড, লাইম ইত্যাদি।

জয়ন্ত বলল, শচীন, যাদের তেষ্টা পায় কথায় কথায়, তারা এ ঘরে এলে আনন্দ পাবে, কিন্তু ক্ষিধের জিনিস কি আছে বল তো?

সবিনয়ে শচীন বলল, আপনাব যা ইচ্ছে বলুন?

জয়ন্তর মনে সহসা যেন প্রতিহিংসাপরায়ণ এক বিদ্বেষ জমে উঠেছিল ধনাঢ্যদের এই প্রাচুর্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সে বলল, বাঃ এ কি বলছ হে? চারদিকে বনবাদাড, কলকাতার সীমানার বাইরে, দেড মাইলের মধ্যে বস্তিবাজাব নেই,—এখানে যা খেতে চাইব তাই দেবে?

নতমুখে শচীন বলল, আপনার কি ইচ্ছে, আমাকে হুকুম করুন?

জয়ন্ত বলল, আচ্ছা ধরো, আমি যদি এখনই গাওয়া ঘিয়ে রান্না মোচা আর নারকেলের ঘণ্ট খেতে চাই? পারবে দিতে?

এসব সামান্ত জিনিস শচীনের হাতের মুঠোব মধ্যে। সে সবিনয়ে বলল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই দিতে পারব। এ বাগানের ভেতরেই আছে চাঁপাকলাব মোচা,—আব নাবকেল কুবে নিতে যা দেরি। মালীকে আমি বলিগে—

শচীন চলে যাচ্ছিল, জয়ন্ত বলল, দাঁডাও, মনে রেখ আমি উৎকৃষ্ট গাওযা ঘিয়ের কথা বলেছি,—যা ভারতে এখন স্বপ্নবৎ।

শচীন বলল, গাওয়া ঘি আমবা এখানে তৈবি কবি। বডসাহেব হিস্টার থেকে একপাল গরু এনে পুষেছেন।

না, লোকটাকে ঠকানো গেল না। জয়ন্ত একটু থমকিয়ে চুপ করে দাডাল। পরে বলল, আচ্ছা, ওটা এখন থাক। তুমি এক কাজ করো, শচীন। আমি জাতিতে আজও ব্রাহ্মণ। মোচার ঘণ্ট হলেই শূদ্রের বাডিতে ভাত খাওয়ার কথা ওঠে। সুতরাং এখন ওসব থাক্। যদি তোমার অসুবিধে না থাকে তাহলে আপাতত আমাকে এক প্লেট মুর্গির কলেজি ভাজা, গোটা দুই মিষ্টি আর এক কাপ কফি দাও।

কি মিষ্টি খাবেন বলুন?

ধরো যদি বলি, আসল ছানার কাঁচাগোল্লা?

উৎফুল্ল হয়ে শচীন চলে যাচ্ছিল, দু'পা গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি কি মিষ্টি খাবার পরে কড়া মদ পছন্দ করবেন?

অ্যাঁ—জয়ন্ত থমকিয়ে গেল, তাই তো, ওটা ঠিক ভাবিনি! কোন্‌গুলো কড়া মদ এখানে?

ওই যে বড় বোতলগুলো, ও প্রায় সবই। তবে ওদের মধ্যে ছ'টা আছে রেড ওয়াইন। শামপেনগুলো ঠাণ্ডায় ডুবিয়ে রেখেছি।

জয়ন্ত একবার এদিক ওদিক তাকাল। পরে বলল, কারা আজ আসছেন বল তো? আজ দুপুরের রোদে আমার মাথাটা একটু ধরেছে।

শচীন বলল, আপনার শরীর ভাল থাকলে মহিলারা সবাই আসবেন। ছোট মেমসাহেব সবাইকে বলে রেখেছেন। তবে আপনি না বললে কেউ তাঁরা আসবেন না।

এলে কখন আসতে পারেন তাঁরা?

আজ্ঞে, ওঁরা তো সন্ধ্যেরাত্রে কেউ বিশেষ আসেন না!

উৎসুক জয়ন্ত প্রশ্ন করল, কেন? তাঁদের অসুবিধে কি?

শচীন বলল, কেউ কেউ স্বামীকে সুস্থ করে রেখে আসেন তো।

সহসা প্যান্‌ট্রির ভিতরে টেলিফোন বেজে উঠল। দ্রুতপদে শচীন সেখানে গিয়ে ফোন ধরল এবং মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে বলল, ছোট মেমসাহেব বলে দিলেন, আপনাকে এখনই এক রোল শিককাবাব, বাদাম আর কফি বানিয়ে দিতে। দেবো?

জয়ন্ত মৃদু হাসল। বলল, উনি ঠিকই বলেছেন। তাই দাও।—আচ্ছা শোন শচীন, তোমার এখানে রুজি রোজগার বেশ ভাল তো?

শচীন সোৎসাহে বলল, আমার এখানে খাই খরচ নেই। ঘর সংসার আমি করিনি। দেখতে দেখতে বিশ বছর আমার কেটে গেল এখানে। দুশ' তিরিশ টাকা এখানে পাই। ওতেই আমার বেশ চলে যায়।

জয়ন্ত মৃদুস্বরে নিজের মনেই বলল, হু। আমার চেয়ে পাঁচ টাকা বেশি! তাছাড়া বোর্ডিং লজিং ফ্রী! আচ্ছা, ঠিক আছে।

শচীন আবার গিয়ে প্যানট্রির মধ্যে ঢুকল, এবং পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে সে যখন শিককাবাব আর বাদামের প্লেট এনে রাখল, জয়ন্ত তখন কলম এবং লাইন-টানা প্যাড সামনে নিয়ে কি যেন লিখছে—শচীনের পক্ষে যেটা বোধগম্য নয়। অতঃপর দুই মিনিটের মধ্যেই শচীন সরাব কফির পেয়ালা রেখে চলে গেল।

বোধ হয় শুক্ল দশমী কি একাদশী হবে। সন্ধ্যারাত্রেই এখানকার অচেনা আকাশ থেকে জ্যোৎস্না নামল। তাঁবুর বাইরেকার বাগান এমনভাবে ঝোপ-ঝাড়, গাছপালা ও পুষ্পলতাদলের আচ্ছাদনে ঢাকা—যাতে এটাকে মনে হয়

সকলের থেকে পৃথক। এখান থেকে মূল অট্টালিকা বেশ অনেকটা দূর, সেদিক থেকে সাড়াশব্দ কিছু আসে না। এই বৃহৎ বাগানের বাইরে পূর্বে ও দক্ষিণে মস্ত প্রান্তর এবং শস্যের ক্ষেত। গ্রাম বা লোকবসতি অনেক দূরে। অদূরবর্তী দীঘির ধার দিয়ে কতকটা গেলে মালী আর শচীনের ঘর পাশাপাশি। এই বাগানকে চারিদিক থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করে সশস্ত্র প্রহরীর দল। ইংরেজ আমলে জেলাশাসকরা এই বাগানে এসে ছোট বাংলায় আতিথ্য নিতেন। সেই বাড়িটি এখন তালাবন্ধ,—একালের রাজনীতিক নেতাদের জন্য সংরক্ষিত।

আজ রাত্রে কেমন যেন একটা নাটকীয় উৎকণ্ঠা জমে রয়েছে তাঁবুর ভিতরে ও বাইরের বাগানে। বোধহয় জ্যোৎস্নাটা নিবিড় বলেই বাগানে অনেকগুলি বেতের চেয়ার ও টিপাই সাজিয়ে রাখা। শামপেনের পরে খোলা জায়গাই নাকি ভাল লাগে, কেননা ফুরফুরে হাওয়া পাওয়া যায়। আজ অনেকটা যেন মহিলা দিবস। কে কি প্রকার বিচিত্র সজ্জায় আসবেন বলা কঠিন। কড়া মদ কে কে খাবেন, অথবা ওয়াইন বা শামপেনেই চলবে—সেটা জানা নেই। তবে শচীন ওঁদের অনেকের খাদ্যরুচি জানে বলেই আপেল, আঙুর, কমলালেবু, ষাঁড়ের জিভ ভাজা, শূকরের সসেজ বা কাঁকড়ার শাঁস—এগুলোও রাখে। শচীনের কেনাকাটার জন্য ছোট একখানা স্টেশন ওয়াগন প্রায়ই এ বাগানে আনাগোনা করে।

চকমিলানো বারান্দাগুলোর অনেকগুলি পাত্রে সুগন্ধ ফুলের রাশি থরে থরে সাজানো। ফুলের চাষ আছে একান্তে মালী সেসব দেখাশোনা করে। যাই হোক, সুগন্ধ পুষ্পরাশির থেকে যে সৌরভ তাঁবুর সমগ্র ভিতরটাকে অভিভূত করে রেখেছে, তারই আমেজের মধ্যে বসে অনন্ত একাগ্রমনে কাগজ কলম নিয়ে দেশ ও জাতির সর্বাপেক্ষা দুর্গত জীবনের অপরিসীম রুদ্ধ বিদ্বেষ এবং হিংস্র আক্রোশ নিয়ে অগ্নিকাব্য রচনা করছে কিনা, শচীন তার খবর রাখে না।

তাঁবুর মধ্যে কোথাও ঘড়ি টিকটিক করছে না। সময়ের সঙ্কেত জানানোটা এখানে অভব্যতা, ওটা যেন অনেকটা শাসনের মতো। এখানে যাঁরা আসেন, তাঁদের সামনে পড়ে থাকে সমগ্র রাত্রির কাল। তাঁদের জাগরণক্লান্ত আরক্তিম নয়নকমলদল রক্তিম ঊষাকে বন্দনা করে, তবে ঘরে ফিরে যায়।

কতক্ষণ,—ঠিক কতক্ষণ বলা কঠিন। এই কক্ষের মধ্যে যেন মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে রয়েছে নিরবধি কাল, এবং বিপুলা পৃথ্বী। আসন পেতে বসেছে মহাকাল, চোখ বুজে সে যেন রুদ্রাক্ষের মালা জপ করছে। যেন এক নরকপালভূষিত করাল-চক্ষু তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর ছায়া সঞ্চারিত হয়েছে এই কক্ষে,—প্রেতিনী ডাকিনীর দল নিঃশব্দে যেন তারই সম্ভাষণ পাঠ করছে। মাঝে মাঝে শিবাদল

ডেকে যাচ্ছে তারই সংবর্ধনায়। ওদের মাঝখানে এসে বসেছে যুগান্তরের এক কবি আপন তন্ত্র সাধনায়—নরমুণ্ডের খেলায় যে সিদ্ধহস্ত, চারিদিকে যার বিগলিত শবসম্ভার, শ্মশান-পিশাচীদলের অট্টহাস্যের হাহাকার, রণরঙ্গিনী উলঙ্গিনী মহাকালীর খড়্গাঘাতে যেখানে উত্তপ্ত রক্তের বন্যাস্রোত! পূতিগন্ধে, রক্তে, রণহিংসায়, কুটিল ক্রূরতায়, প্রতিকারবিহীন অনাচারে, নারকীয় বিদ্বেষে, দুর্গতের অকথ্য যন্ত্রণায়—এই কবি খুঁজে পায় তার নগ্ন শাণিত তরবারির ঝনক-ঝঙ্কার।

ত্রিযামা যামিনীর সেই নিঃঝুম নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কক্ষের মেঝের উপর দিয়ে কার যেন অতি মৃদু পায়ের শব্দ শোনা গেল। না, শচীন নয়। এ এক কালো ছায়া,—এ যেন রাক্ষসী নিয়তি! গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঘন কালো আবরণ, নিচের দিকে জঙ্ঘার পাশে একটা অংশ কাটা, বাকি পা দুখানা অনাবৃত। দু'খানা দীর্ঘ কমনীয় নগ্ন বাহু দোলায়মান, রুক্ষ রাশিকৃত এলোচুল মদির গন্ধ সহ পিছন দিকে নেমেছে নিতম্বের শেষ প্রান্তে, দুই পদ্মপলাশ নয়নে আলস্যের মধুর আবেশ,—ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াল জয়ন্তর পিছনে। তারপর ডান বাহুখানা পিছন থেকে জয়ন্তর সামনে প্রসারিত করে আপন কব্জিতে বাঁধা হাতঘড়িটি দেখালো,—রাত পৌনে দুটো।

জয়ন্ত তেমনিভাবে বসেই বলল, হ্যাঁ, এই যে—আরেকটু—

জয়ন্তর কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে রেবা বলল, শচীন আর মালীকে সরিয়ে দিয়েছি। এখন তুমি আর আমি শুধু—

জয়ন্তর কলম তখনও থামেনি। সে শুধু বলল, ও, বেশ ত'!

তপ্ত নিঃশ্বাস পড়ছিল জয়ন্তর কর্ণমূলে। রেবা আবার তাকে ডাকল, উঠবে না এবার? টিপ বোতামগুলোয় টান দেবে না?

হাসিমুখে অন্যমনস্কভাবে জয়ন্ত বলল, হ্যাঁ, এই যে—উঠি এবার—

রেবা নিঃশব্দে আবার পিছিয়ে এসে কোথায় অন্ধকারে যেন দাঁড়াল। টেবল ল্যাম্প ছাড়া ঘরে অন্য আলো নেই। সেই ছায়ালোকে দেখা যাচ্ছিল রেবার মুখে প্রফুল্ল আনন্দের হাসি। কিন্তু এভাবে অনির্দিষ্টকাল কেমন করে সে দাঁড়িয়ে থাকবে? সমস্ত অঙ্গে-অঙ্গে একটা অসহ্য রোমাঞ্চহর্ষ তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। কালো মিহি রেশমী ওই আবরণটুকু ছাড়া যে কিছু নেই।

কতক্ষণ ঠিক বলা কঠিন। বোধ হয় যুগ-যুগান্তর। মনে হচ্ছে রুদ্রাক্ষের জপের মালায় এখনও চলছে সেই বীজমন্ত্র পাঠ!

জয়ন্ত কলমটি রেখে যখন উঠে দাঁড়াল, তখন প্রভাতী পাখিরা প্রাতঃসূর্যের

বন্দনা ধরেছে। আলোয় প্লাবিত হচ্ছে তাঁবুর কক্ষ। ওদিকের খাটের বিছানায় সুন্দর শাড়ি ও জামা গায়ে দিয়ে রেবা অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

॥ ৪ ॥

রায়সাহেব ফিরেছেন লণ্ডন থেকে কয়েকদিন আগে। তিনি তাঁর কারবারের মারফত প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেন, সেজন্য তিনি কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রিয়পাত্র।

ছুটির দিন নয়, অথচ বাড়িতে রয়েছেন তিনি বেলা সাড়ে দশটায়—এটি নতুন। তার চেয়েও বিচিত্র, শোভনা দেবী তাঁর গাড়ি নিয়ে এখনও হগ-মার্কেট ঘুরতে যাননি। লাউঞ্জে বসে বহুদিন পরে রায়সাহেব, শোভনা এবং অপর দুজন অবাঙ্গালী সাহেব খোসগল্পে মশগুল রয়েছেন, এটি অভিনব দৃশ্য। জনশূন্য লাউঞ্জ পরিত্যক্ত অবস্থাতেই পড়ে থাকে, এটি এবাড়ির ঝি-চাকর সবাই জানে।

অবাঙ্গালী সাহেব দুজনের একজন হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের যেন কোন্ বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি, অন্যজন হলেন জনৈক বিজনেস ম্যাগনেট। এঁরা এসেছেন আলীপুর পার্ক থেকে।

লণ্ডনের সর্বশেষ চেহারা নিয়েই কথা চলছিল। দিন দুপুরে যখন তখন রাহাজানি, বর্ণবিদ্বেষ, বীট্‌ল্‌সদের রাজ্যপাট, 'সোহোপল্লীর' বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ভদ্র নাগরিকদের প্রাত্যহিক জীবনের বিড়ম্বনা, কথায় কথায় ডেমোক্রাসির নামে অচল অবস্থার সৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে ছুটতে উঠে এল রেবা, এবং লাউঞ্জের সামনে দিয়ে পেরিয়ে যাবার সময় সহসা থমকিয়ে দাঁড়াল। হাসিমুখে ভিতরের দিকে চেয়ে বলল, ও, এইজন্যেই তুমি আজ বেরোওনি বুঝি, বাবা?

রায়সাহেব বললেন, ঠিক এই জন্যেই! আজকে জেনারেল স্ট্রাইক, তুমি জানতে না?

একদম না, খবরই পাইনি। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে স্রেফ বোকা বনে গেলুম।

শোভনা ঈষৎ বক্রকণ্ঠে বললেন, খবরের কাগজখানা রোজ ওলটাতিস, তাও আজকাল বন্ধ করেছিস! বাগান নিয়ে তুই বড়ই ব্যস্ত?

রেবা ভিতরে এসে বসে পড়ল কুশনের ওপর। পরে হাসিমুখে অবাঙ্গালীদের দিকে ফিরে বলল, মাফ কিজিয়ে, ম্যায় বাংলেমে বাত করতা হুঁ!

তাঁরা হাসিমুখে সম্মতি দিলেন। শোভনার বক্রোক্তির জবাবে রেবা বলল,

বাগান নিয়ে ব্যস্ত নয় মা, আমি ব্যস্ত তাঁবু আর জয়ন্তকে নিয়ে। ওরই জন্যে বাজারের দিকে যাচ্ছিলুম। ওর সব অদ্ভুত ফরমাস।

রেবা প্রথমটা খুব হাসল। শোভনা ফিরে তাকালেন সেই হাসির মাত্রাটা লক্ষ্য করার জন্য। রেবা বলল, পরশু দিন রাত্রে আমাকে বলে, 'সেরাজু' পায়রার মাংস খাব!—আমি ভাবলুম বুঝি তামাসা করছে। কাল দুপুরে আবার যখন বলল, আমি বললুম, সেরাজু কেন, গোলাপায়রায় হয় না? জয়ন্ত বলল, না না, গোলা নয়—সেরাজু। পায়রাদের মধ্যে ওরা সব চেয়ে সুখী। ওদের মাংস না খেলেই চলবে না।

রায়সাহেব বললেন, ছেলেটি খুব ইণ্টারেষ্টিং। সেদিন ওর সঙ্গে ঘণ্টা দুই আলাপ করে বড আনন্দ পেয়েছিলুম।

রেবা বলল, না বাবা, সুখ্যাতি করো না। জয়ন্ত আমাকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাচ্ছে!

শোভনা বললেন, তুই যে জ্বলতেই চাইছিস।

রেবা শোভনার দিকে তাকাল। বলল, বেশ ত, তুমি একটা উপায় বাৎলিয়ে দাও না মা, যাতে না জ্বলি।

শোভনা এবার হাসলেন। বললেন, রবিঠাকুরের লেখা আমি পড়তে শিখিনি। কিন্তু ছোটবেলায় তাঁর একটা লাইন মুখস্থ করেছিলুম—"তাহারেও বাদ দিয়ে দেখি বিশ্বভুবন মস্ত ডাগব।"

রায়সাহেব হো হো করে হেসে তাঁর অবাঙ্গালী বন্ধু দুটিকে এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন ইংরেজিতে।

রেবা বলল, তুমি ভালই বলেছ, মা। কিন্তু ওকে বাদ দিয়ে বিশ্বভুবনের কিছু থাকে কিনা, সেটাও বলে দাও।

রায়সাহেব আবার বলে উঠলেন, ফাইন্, ফাইন্

রেবা পুনরায় বলল, তারপর আবার শোন, বাবা। সেদিন ফুলবাগানে বসে হঠাৎ জয়ন্ত বলল, এই মুহূর্তে কেরোসিনের সঙ্গে ফিনাইল-গোলা গন্ধ পেলে সে খুশী হয়। অমনি সঙ্গে সঙ্গে শচীন ছুটল

তারপর?

তবেই হয়েছে! আরও বলব? গুণে শেষ করা যাবে না, বাবা। একদিন ওর কথায় আমি নিজে কোমর বেঁধে সব রাঁধলুম। ও বললে, শীত পড়েছে, রাত্তিরে ঠাণ্ডা লাল কুমড়োর ঘণ্ট আর পান্তাভাত ওর চাই। বেশ, আমি আর শচীন তৈরি করলুম, তারপর অনেক রাত্রে খেতে বসে জয়ন্ত বলে, উহুঁ, এ হল না রেবা, কুমড়োর সঙ্গে শামুকের ঝোল পেলে খুব ভাল হতো!

আবার হাসির ঝড় উঠল।—

রেবা বলল, আমি কি দমবার মেয়ে! শচীন তখনই বার করল পেট্রোমাক্সের লণ্ঠন। আমি আর শচীন দীঘির ধার খুঁজে খুঁজে শামুক আনলুম।

রায়সাহেব বললেন, কবি কাকে বলে জানতুম না। এ হল জাত-কবি। যাকে বলে, পাঁড় কবি।

শোভনা বললেন, আমিও তাই ভাবছি। এদের নিয়ে কিন্তু ঘরকন্না করা যায় না, রায়সাহেব। যে-মেয়ে এদের নিয়ে ঘর করতে যায় তারা দুঃখে মরে।

মাথা চুলকিয়ে রায়সাহেব বললেন, অবশ্য ঘরকন্নাটা এখনও ঠিক আরম্ভ হয়নি।

অবাঙ্গালী বন্ধু দুজন এবার উঠে সকলকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। রায়সাহেব গলা বাড়িয়ে হেসে বললেন, রাস্তায় গাড়ি ধরবে না তো?

আজ্ঞে না, গাড়িতে রেডক্রশ লাগানো আছে। গলায় স্টেথিস্কোপটা ঝুলিয়ে রাখব।

তাঁরা যাবার পর আগের কথার সূত্র টেনে শোভনা বললেন, কবে ঘরকন্না আরম্ভ হবে জানিনে। তবে টানাটানি করে ধরে-বেঁধে ঘরকন্না হয় না। এ শুধু বুনো হাঁসের পেছনে ছোটা।

রেবা এবার জবাব দিল। বলল, আমারও তাই বিশ্বাস।

তা হলে বেঁধে রেখেছিস কেন? তা হলে ছ' বছর কোর্টশিপ চলছেই বা কেন? বন্ধুত্বই বা কিসের ওপর দাঁড়িয়ে?

জননীর এই আক্রমণে রেবার রাঙ্গামুখ রক্তিম হয়ে উঠল। সামনে বসে রয়েছেন বাবা,—যাঁর কাছে বাক্‌সংযম রাখা দরকার। শান্তকণ্ঠে সে বলল, কোর্টশিপ! বন্ধুত্ব! কই না ত'!' ছ বছর ধরে এত, প্রাণ নিয়ে টানাটানি, জীবন-মৃত্যুর সাংঘাতিক খেলা! কই, আমি তো ঠিক ঘরকন্নার কথা ভাবিনি!

শোভনা বললেন, তা হলে তোদের এই সম্পর্কের মানে কি?

মানে? ভাবিনি তো। তলিয়ে দেখিনি এর মানে।

তোর বয়স পঁচিশ বছর! তুই অজ্ঞান মেয়ে নয়!—শোভনা প্রশ্ন করলেন ঈষৎ রূঢ়কণ্ঠে,—তা হলে জয়ন্ত এ বাড়ির কে?

রেবা জবাব দিল, কেউ নয়!

তবে ওকে ধরে রেখেছিস কেন?

জয়ন্তকে ধরে রাখা যায় না, মা।

রায়সাহেব মাঝখানে পড়ে বললেন, দাঁড়াও, আমি একটা কথা ভাবছিলুম।

আচ্ছা রেবা মা, সবাই মিলে ওকে ধরেই রাখা যাক না কেন! ধরো, আমাদের অত বড় অপিস, অমন বিদ্বান ছেলে তোমার জয়ন্ত,—ওকে একটা বড় কাজের দায়িত্ব দিলে হয় না?

রেবা বলল, কাজের দায়িত্ব বা চাকরি ওর জন্যে নয়, বাবা।

এ কি বলছ মা? পুরুষের ভবিষ্যৎ—!

ভবিষ্যৎ তৈরি করার জন্য জয়ন্ত যে জন্মায়নি!—রেবা বলল, জয়ন্তর কোনও নীডস্ নেই! ভ্রূক্ষেপ করে না টাকায়।

শোভনা বললেন, কিন্তু গরীবের ছেলের এত অহঙ্কার ভাল নয়, রেবা।

ভুল!—রেবা বলল, ওর চেয়ে ধনী তুমি-আমি-বাবা কেউই নয়! মহাভারতের কর্ণ শ্রেষ্ঠ চরিত্র,—কবচ-কুণ্ডল নিয়ে জন্মেছিল! জয়ন্ত জন্মেছে কলম নিয়ে।

সে কলমের কালি ফুরোয়, আবার সে-কালি পয়সা দিয়ে কিনতে হয়!—শোভনার কণ্ঠে এবার যেন অকারণ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ফুটল।

রেবা শোভনার দিকে ফিরে একটু হাসল। বলল, জয়ন্তর কলমের কালি কোনদিন ফুরোবে না। আর যদি ফুরোয়, তার জন্য এ-বাড়ির ঘরজামাই সে হতে চাইবে না!

শোভনা হাসলেন। বললেন, তাহলে বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ায় কেন? এর পরে যে কথাটি প্রথম মনে আসে, সেটা বোধ হয় তোমার সামনে বলা চলে না, কি বলো রায়সাহেব?

হেসে উঠলেন রায়সাহেব। বললেন, ভাবছি কোন্ কথাটা তুমি রেবাকে বলতে বাকি রাখলে!

বাকি আছে বৈ কি—শোভনার মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল,—কিছু মনে করো না রায়সায়েব, তুমি ভুল করেছ,—তোমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারটা অন্য রকম করাই উচিত ছিল! তোমার ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে।

রায়সাহেব বললেন, তোমার সঠিক বক্তব্য কি?

আমার বক্তব্য? বলব রেবার সামনে?—আজ জয়ন্ত, কাল বসন্ত, পরশু অনন্ত! তারপর?

রেবা হাসছিল। রায়সাহেব বললেন, তারপর! আমার বিশ্বাস, তুমি রেবার ভাবগতিক দেখে একটু ভয় পাচ্ছ! হয়ত ভাবছ মেয়েটা তোমার শনিগ্রহ। কিন্তু মনে রেখো, যে-ব্যক্তি বিষয়-সম্পত্তি সৃষ্টি করে, সে তার মালিক নয়। মালিক হল পরবর্তীকাল! হোক না নষ্ট মেয়ের হাতে আমার ব্যবসা-বাণিজ্য

বা বিষয়সম্পত্তি, ক্ষতি কি ? তার পরেও থাকবে তোমার বন্ধু সমাজ, পার্ক স্ট্রীট, চৌরঙ্গী আর হগ-মার্কেট। ভাবছ কেন অত ? তোমাকে ভেসে যেতে হবে, এই তো ? বেশ—ভেসেই যাবে। ভয় পাও কেন ভবিষ্যতের কথা ভেবে ? বরং—তুমি শামপেনের ভক্ত,—শামপেন খেয়ে চলো। দেখবে ওরই গেলাসের মধ্যে পড়েছে তোমার-আমার মুখের ছায়া। দেখবে ওরই মধ্যে আসন্ন ঝড়, দেখবে একালের অনিশ্চয়তা—

রেবা চেয়েছিল বাবার মুখের দিকে। খানসামা এসে দাঁড়াল একটি থালা নিয়ে। তার ওপর দুটি গেলাস, একটি ড্রাই জিন্ ও একটি লাইম জুসের শিশি। সেটি কফি টেবলের ওপর নামিয়ে রেখে খানসামা পুনরায় এক মিনিটের মধ্যে ফ্রিজিডেয়ার থেকে বরফ নিয়ে এল। শোভনা রায়সাহেবকে লাইম-জিন্ ঢেলে নিজের গেলাসেও কতকটা নিলেন। পরে বললেন, তুমি কি এই জন্যেই রেবার ওপর দায়ধাক্কা ছেড়ে দিচ্ছ ? তোমার মতিগতি দেখলে ভয় করে, রায়সাহেব।

রায়সাহেব গেলাসে চুমুক দিয়ে জবাব দিলেন, কথাটা কতদূর বাড়াতে চাও, আগে তার একটু আভাস দাও ত' দেখি ?

রেবা ব্যস্ত হয়ে বলল, বাবা, তোমরা যেন আমাকে নিয়ে তর্ক আরম্ভ করে দিলে মনে হচ্ছে। এসব কথা কেন তুলছ মা ?

শোভনা এক ঢোকে সমস্ত গেলাসটা শেষ করলেন। পরে বাঁ হাতের রুমালে রঙীন ওষ্ঠাধর সন্তর্পণে মুছে নিয়ে বললেন, আমার পজিশনটা ভাল করে জানতে চাই, রেবা।

রায়সাহেব বললেন, জানতে চাইলেই কি পারবে ? তুমি কি ভুলে যাচ্ছ আগের কথা ? কী ছিল সেদিনের চুক্তি ?

শোভনা নতমুখে হঠাৎ চুপ করে গেলেন। ডুব দিলেন একবার যেন অতীত জীবনে। কথা বাড়াতে তাঁর সত্যই সাহস ছিল না ? কিন্তু রেবা এবার কিছু অস্বস্তি বোধ করে উঠে দাঁড়াল। পরে বলল, তোমাদের কথাবার্তা শুনলে মন কেন ছোঁক ছোঁক করে বল তো ! কী যেন একটা খুঁজে বার করতে ইচ্ছে করে, বাবা।

রায়সাহেব এবার গেলাসটি শেষ করে ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে ডাকলেন, বয়। স্ট্রং ড্রিঙ্ক লাও।

রেবা হেসে বলল, বাবা, তোমায় না মানা করেছি কতবার, দিন দুপুরে অ্যাল্‌কোহল্ খেয়ো না।

ভয় কি, মা ?—রায়সাহেব বললেন, কেউ নষ্ট হচ্ছে দেখে ভয় পাও কেন ?

তোমার হাতে সৃষ্টি বা ধ্বংস কোনটাই নেই! জীবনের গতি সোজা পথে যায় না! আমাকে একদিকে বাঁচাতে চাইছ, অন্যদিকে মৃত্যু ঘটছে পদে পদে!

রেবা তাকাল রায়সাহেবের দিকে। পরে বলল, তোমার যেন কী একটা হয় মাঝে মাঝে, বাবা! যদি কোনও দিন তোমার কাছাকাছি বসি, অমনি তোমার মন সরে যায় অনেক দূরে। তখনই আমার মনে হয় আমি যেন কত দোষ করেছি! তুমি কেবলই ভাবো, আমি তেমনিই ছোট আছি। কেন তুমি বলছ, মৃত্যু ঘটছে পদে পদে?

রায়সাহেব এবার স্নেহের হাসি হাসলেন। সরস শুদ্ধ ভাষায় বললেন, মৃত্যুর একই মাত্র চেহারা, অন্য চেহারা নেই। অভিজ্ঞান বলে, এ সত্যি নয়। জীবনের মধ্যেই বহুবার মৃত্যু ঘটে। অপমানে, প্রতারণায়, মিথ্যাচারে,—এদের সবগুলোর মধ্যেই দেখবে মৃত্যু।

খানসামা এবার নতুন হরিৎবর্ণের গ্লাস রেখে গেল একটি নতুন ডিসে, পাশে রেখে গেল ঝাঁজওলা খোলা সোডা। রায়সাহেব গেলাস তুলে চুমুক দিয়ে বললেন, ডাকাত যদি খুন করে চলে যায়, সেই মৃত্যু দৃশ্যমান। কিন্তু ঘরের লোক ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে যদি পদে পদে ঠকাতে থাকে, সেই মৃত্যুর বর্ণনা নেই। যদি বলি, ওমা, শ্রীমতী রেবা, তোমার এই সুন্দর জীবন মস্ত একটি প্রতারণার ওপর দাঁড়িয়ে, সেটি কি মৃত্যুর মতন নয়?

শোভনা একবার মুখ তুলে তাকালেন ভয়ে-ভয়ে।

রেবা কি যেন ভেবে এবার হঠাৎ হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল, এবার বুঝতে পেরেছি। হরতালের দিনে তোমার আপিস বন্ধ, তাই তুমি বেকার, বাবা। তবে একটা কথা তোমাদের দু'জনকেই বলি, জয়ন্ত ক যা ভাবো তা নয়! ছ' বছর ধরে তাকে জেনে এলুম, তার না আছে লোভ, না স্বার্থবোধ, না দেখেছি তার কথার কারচুপি। কেন ভয় পাচ্ছ, বাবা। কেন ভাবছ, এ আমার মৃত্যু? আমার সব চেয়ে দুঃখ, জয়ন্ত কিচ্ছু চায় না! কোনও কিছু ওর কাম্য নেই। সত্যি বলতে কি, সাংসারিক জ্ঞান ওর এক তিলও নেই। এতটুকু হিসেব বুদ্ধির ধার ধারে না! এমন একটা অপাত্র, এমন অপদার্থ যে, তোমাদের লোকসমাজে ওকে বার করাই চলে না।

বলতে বলতে রেবা নিজেই হেসে অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াল। যাবার সময় আরেকবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাদের মনে জয়ন্ত বা আমার সম্বন্ধে একটুও দুর্ভাবনা না থাকে, বাবা!

অনেক দূর পর্যন্ত রেবার হাসির শব্দ শোনা গেল।

চুপ করে বসেছিলেন শোভনা। সম্ভবত এতক্ষণকার কোনও আলোচনায়

প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। তাঁর নিজস্ব জগৎ এবং অন্তপ্রকার একটা সমাজ আছে, এরা সেখানে কেউ না! নিতান্ত আজ সর্বাত্মক হরতাল তাই, নচেৎ এভাবে সময়ের অপব্যয় তিনি করেন না। আর কিছু না হোক, ড্রাইভারকে দিয়ে এতক্ষণে তিনি তাঁর ধোপদস্ত পোশাকগুলি ধর্মতলার ওদিক থেকে আনিয়ে নিতে পারতেন। খেলো ধরনের তত্ত্বকথা তাঁর অনেক শোনা আছে, বাকি ওসব তোলা থাক শেষ বয়সের জন্য। দাঁত যখন পড়বে, মাংস হজম হতে যখন দেরি হবে, তখনকার জন্য মুলতুবী থাক দর্শনতত্ত্ব। আখের ছিবড়ের মতো যারা নীরস, বার্ধক্যে যারা শুধু অম্ল ও অজীর্ণ রোগের আলোচনায় দিন কাটায় এবং অবসরমতো যারা গুরুবাড়ির আশ্রমে গিয়ে গুটি গুটি বসে, সেইসব নাম-খারিজ করা মানুষের কানে এসব দর্শনতত্ত্ব ভাল লাগতে পারে।

এবার শোভনা বললেন, আমার কথাটা এখনও শেষ হয়নি। কথায় কথায় হাত-খরচের জন্য হাত পাতবো রেবার কাছে, এমন চুক্তি হয়নি, এ চুক্তিও আমার সঙ্গে ছিল না যে, আমার অন্ধকার ভবিষ্যৎ অন্ধকারেই থাকবে।

গেলাসটি শান্তভাবে শেষ করে রায়সাহেব ঈষৎ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, আস্তে কথা বলো, এখানে কেউ না শোনে। শুনলে তোমার মান থাকবে না।

গলা নামিয়ে শোভনা বললেন, আস্তেই বলছি।

রায়সাহেব তাঁর গেলাসে চুমুক দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, চুক্তির কথা রাখো। আমি যা জিজ্ঞেস করি, আগে তার জবাব দাও।

শোভনা এবার সভয়ে তাকালেন রায়সাহেবের দিকে। রায়সাহেবের মুখের চেহারা অন্যরকম। সেই মুখে স্নেহ, সৌজন্য এবং কোমলতার বিন্দুমাত্র আভাস নেই। শুধু কর্কশ নয়, হিংস্র ও ঘৃণাকুঞ্চিত সেই মুখ। তিনি প্রথম প্রশ্ন করলেন তোমার আসল নাম কি?

নিরুপায় স্ত্রীলোক ভীতচক্ষে মুখ তুলে তাকাল। পরে বলল, সে নাম আপনিই বলেছিলেন ভুলে যেতে।

রায়সাহেব আরও নিচু গলায় চাপা তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, গত পঁচিশ বছরের মধ্যে একদিনও তুমি আমার বিছানায় শুয়েছিলে?

না। আপনি আমাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন।

রায়সাহেব ওকথায় কান দিলেন না, শুধু পরিষ্কার কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তুমি প্রতি সপ্তাহে দু' হাজার টাকারও বেশি খরচ করো, এ কি সত্যি?

শোভনা জবাব দিলেন, হিসেব আমি করিনি।

হিসেব আমি চেয়েছি কোনদিন? জবাব দাও?

না।

রায়সাহেব এবার একটু থামলেন। পরে বললেন, তোমার প্রত্যেকদিনের গতিবিধি আর অনাচার সম্বন্ধে কখনও কথা তুলেছি? চুপ করে থেকো না। কথার উত্তর দাও?

শোভনা এবার বললেন, আপনিই ত' বলেছিলেন, আমার চলাফেরার ওপর কখনও হস্তক্ষেপ করবেন না?

রায়সাহেবের দুই চোখের মধ্যে একটা দাহ ছিল। সেই দুই চোখে সোজা শোভনার দিকে তাকিয়ে বললেন, না, হস্তক্ষেপ আমি করিনি। কিন্তু কোন্ অবস্থায় তোমার সঙ্গে প্রথম আমার দেখা হয়েছিল? কেন মিথ্যে কান্নায় কেঁদে পড়েছিলে, মনে পড়ে? আর সেই নোংরা জায়গায় একটা শিশুকে নিয়ে তোমার কদর্য প্রতারণা। এসব কি ভুলেছ? মনে আছে কোথা থেকে তোমাকে তুলে আনি? তোমার বয়স যত বেড়েছে, নোংরামি বেড়েছে তার চেয়েও বেশি। হস্তক্ষেপ আমি করিনি সত্যি, কিন্তু দুনিয়ার আঁস্তাকুড় থেকে সব নোংরা তুমি আমার এখানে জড়ো করবে, এই কি চুক্তি ছিল? এই কি চুক্তি ছিল, তুমি আমার টাকায় অন্য পুরুষ পুষবে?

শোভনা বিবর্ণ মুখে বললেন, আমাকে আপনি সাবধান করলে পারতেন?

চাপা গলায় রায়সাহেব বললেন, তোমাকে সাবধান! তোমাকে সাবধান করতে গিয়ে তোমার হাতে আমার স্ত্রীর জীবন যায়নি?

আপনার এই সন্দেহ আজও আপনার মন থেকে সরাতে পারলুম না।— এবার শোভনার চোখে জল এসে পড়ল।

চুপ করো—রায়সাহেব দাঁত কিটিয়ে বললেন, প্রমাণ নেই তাই বেঁচে গেছ। আমি তখন বিলেতে। তাঁর কলঙ্ক রটাবার জন্য কী না তুমি করেছিলে? আজ জয়ন্তর বিরুদ্ধে রেবার মনকে বিষিয়ে দেবার চেষ্টা পাচ্ছ! উদ্দেশ্য কি তোমার? রেবার নামে নোংরা কথা লিখে কোন্ মতলবে সেদিন খানসামার হাত দিয়ে জয়ন্তর কাছে লুকিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলে? তুমি রেবার কে, বলতে পার?

শোভনা সম্ভবত আর স্থির থাকতে পারছিলেন না। তিনি উঠে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই বাইরে থেকে মসমসে জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে এসে ঢুকলেন দু'জন ভদ্রলোক। রায়সাহেব তৎক্ষণাৎ সোৎসাহে তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, আসুন মিঃ মেহতা, আসুন আসুন ডক্টর মিত্র। লাঞ্চ আমাদের রেডি। আপনাদের জন্যই বসে রয়েছি। শোভনা, প্লীজ্, তুমি বয়কে একটু বলে দাও—

শোভনা হাসিমুখে বললেন, হ্যাঁ, এই যে—আপনারা বসুন। কোন্ ড্রিঙ্ক আপনারা পছন্দ করবেন?

মিঃ মেহতা বললেন, ব্যস্ত হবেন না, মিসেস রায়। বীয়ারই দেবেন খাবার টেবিলে। দু'-চারটে সান্‌-ল্যাজার হলেই চলবে।

ডাঃ মিত্র বললেন, আমি ভাবছিলুম মেহতা সাহেব হরতালের দিন কেমন করে বেরোবেন। সেইজন্যে আমিই ওঁর ওখানে গাড়ি নিয়ে গেলুম।

শোভনা চলে যাচ্ছিলেন ডাইনিং হলে। মিঃ মেহতা বললেন, পনেরো তারিখটি কিন্তু ভুলবেন না, মিসেস রয়। সেদিন রাত্রে না হয় আমিই এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

রায়সাহেব বললেন, আপনাদের সেই নাচের পার্টি আসছে বুঝি ?

মিত্র বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওরা আসছে ল্যাপল্যাণ্ড থেকে। গ্র্যাণ্ড হোটেলেই উঠবে। আপনিও চলুন না, মিঃ রয়।

মন্দ কি ? গেলেই তো হয়।—রায়সাহেব হেসে বললেন, আসুন এবার সবাই টেবিলে বসি।—আরে, এই যে রেবা,—যাচ্ছ কোথায় মা ? খাবে এসো।

রেবা চলে যাচ্ছিল হাসিমুখে, কিন্তু রায়সাহেবের ডাকে ফিরে দাঁড়াল এবং অতিথিদের নমস্কার জানাল। পরে বলল, বাবা, তাঁবুতে অপেক্ষা করছে জয়ন্ত, ওর সঙ্গে এ বেলায় খাবো বলে রেখেছি। তোমরা কিছু মনে করো না, বাবা।

কিন্তু তুমি জয়ন্তকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে বসে গেলেই তো পারতে, মা ?

রেবা হেসে উঠে বলল, তবেই হয়েছে। এমনিতেই ও তোমাকে দেখে জড়োসড়ো, তার ওপর সে আবার ভীষণ নার্ভি। জয়ন্ত বড্ড অসামাজিক, বাবা—

রেবা দ্রুতপদে হেসে চলে গেল। মিঃ মেহতা এগিয়ে এসে বললেন, মিসেস রয়, আমি কিন্তু আজ আপনার পাশে বসতে চাই। আমার ক্লেম একটা আছে।

মিত্র হেসে বললেন, কিসের ক্লেম ?

বাঃ, আপনি জানেন না বুঝি ?—মেহতা বললেন, আমি যেমন গুজরাটি, শোভনা দেবীও তেমনি অরিজিনালি গুজরাটের মেয়ে, ওঁর জন্ম সেখানে। অবশ্য উনি অনেককাল বাঙ্গলায় ডমিসাইলড্‌।

ওঁরা সবাই মিলে খেতে বসে গেলেন।

ওদিকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বারান্দা ও করিডর পেরিয়ে রেবা হনহনিয়ে ছুটল বাগানের দিকে। পথ অনেকটা। ফলের বাগানটা ছাড়ালে তবে দীঘির

উত্তর সীমানা। সজ্জির খামারের পাশে শান বাঁধানো পঞ্চবটি, ওটা ছাড়ালে অশথতলা,—বেশ অনেকটা পথ। গাড়িখানা আনলেই হতো। কিন্তু কেনই বা! প্রায় তিন দিন হল জয়ন্তর সঙ্গে তার দেখা হয়নি। ও নিয়ে বসেছে ওর সাহিত্য ভাবনা, এদিকে রেবা ওলটাচ্ছিল নানা গ্রন্থ। এমনি গত তিনদিনে দু'বারের বেশি ওরা ফোনেও কথা বলেনি। জয়ন্ত বলেছিল, এই তাঁবুতে আমি রোজ কুড়ি ঘণ্টা ঘুমোব। রাত একটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথা বলতে পার। ভোরবেলাকার পাখিরা বিরক্ত না করে, শচীন যেন ঠিক সময় জানলা বন্ধ করে দেয়।

ছুটতে ছুটতে রেবা এসে পৌঁছল তাঁবুর সামনে। শচীন বোধ হয় অপেক্ষা করছিল ছোট জামগাছতলাটায় দাঁড়িয়ে। দূর থেকেই রেবা বলল, পুঁটিমাছ পেয়েছিলে, শচীন?

আজ্ঞে হ্যাঁ--

লাউডগা ভাতে দিয়েছিলে। বাঙ্গা আলু আর কাঁচকলার ঘণ্ট?

শচীন বলল, আজ্ঞে সবই করেছি। কিন্তু—

রুদ্ধশ্বাসে রেবা বলল, কিন্তু কি?

ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মানে? কী বলছ?—রেবা এগিয়ে এসে বারান্দায় উঠল।

শচীন জবাবদিহি করতে লাগল,—উনি কাল রাত প্রায় দেড়টায় ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন, শচীন, এক পেয়ালা চা, আর একখানা বিস্কুট, আর কিচ্ছু না। আমি তাই দিলুম। বোধ হয় উনি আলো জ্বেলে কাজ করছিলেন। সকাল থেকে উনি বেরোননি। আমার ওপর মানা আছে খোঁজখবর নিতে। তবু ঘণ্টা দুই আগে ওঁর খবর নিতে গিয়ে দেখি উনি ঘরেও নেই, বাইরেও নেই—

রেবা ঘরে গিয়ে ঢুকল। অগোছালো পড়ে রয়েছে সব। টেবিলের ওপর কাগজপত্র ছড়ানো। একটি অসমাপ্ত কবিতার টুকরো। কলমটি খোলা। আধময়লা পাঞ্জাবিটা নেই। জয়ন্ত চলে গেছে। পাছে তার আকস্মিক চাঞ্চল্যের পথে বাধা ঘটে, সে জন্য সে বলে যায়নি। কাল রাত প্রায় এগারোটার সময় সে আজকের মধ্যাহ্ন ভোজের ফর্দটা দিয়েছিল রেবাকে।

শচীন?

আজ্ঞে, এই যে—শচীন ঘরে এল।

রেবা হাসিমুখে বলল, আমারই মনে ছিল না, বুঝলে শচীন, আজ হরতালের দিন তাঁর একটা জরুরি কাজ ছিল। আমিই তোমাকে বলতে ভুলেছিলুম। আচ্ছা, তোমরা এবার খেয়েদেয়ে নাওগে।

নতমুখে সম্মতি জানিয়ে শচীন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রেবার মিছে কথাটাকেই সে শিরোধার্য করে নিল।

সদ্যস্নাত ছিল রেবা। এলোচুল সে বাঁধেনি। ভিজা চুলের সজলতার সঙ্গে মৃদু সুগন্ধ জড়ানো। মুখশ্রীর উপর সে কখনও প্রসাধন করে না,—সুর্মা বা কাজল, রুজ বা লিপষ্টিক, পাউডার বা পরাগ,—কোনটা না। পরনে একখানা পরিচ্ছন্ন সূতী শাড়ি, গায়ে একটি শাদা চিকন-লেসের জামা, পায়ে সাধারণ স্লিপার। চেহারাটা আধুনিকা তরুণীর মতো নয়, মদালসা প্রণয়িনীর ঢং নয়, সর্বাঙ্গ পণ্য-প্রদর্শনীর স্টল হয়ে ওঠেনি,—সে এসে ক্যাম্পে উঠেছে যেন কল্যাণশ্রীসম্পন্না প্রসন্নময়ী সুগৃহিণী। গৃহিণীর আঁচলে চাবির গোছা বাঁধা।

ফলবাগানের দিকে মুখ করে রেবা সরে এসে দাঁড়াল পূবদিকের দরজার সামনে। এ যেন ভিন্ন রেবা। না বাত্ময়তা, না উদ্দীপনা, না বা আপন স্বাতন্ত্র্যের প্রখরতা। তুফান নেই বলেই তরঙ্গ নেই, সংশয় নেই বলেই উত্তেজনা নেই, দ্বন্দ্বের জটিলতা নেই বলেই অভিমান নেই। ঘরে নেই জয়ন্ত, কিন্তু তার নীলাভ চোখ ছড়িয়ে রয়েছে আকাশে। পাখি নেই, রয়েছে তাব কণ্ঠস্বর সমগ্র হলের সমস্ত সামগ্রীর সঙ্গে জড়িয়ে। রেবা যেন নতুন করে চেয়ে দেখছে জয়ন্তকে। নেই বলেই দেখছে যেন প্রত্যক্ষ, দেখছে নিবিড়ভাবে, একান্ত চক্ষে। মেডিক্যাল ছাত্রী যেমন অনুবীক্ষণ করে এনাটমি,—যেমন মানবদেহারণ্যের অগণিত সংখ্যক শিরা-উপশিরার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সে তন্নতন্ন করে দেখে, রেবা সেই চক্ষু দিয়ে দেখছিল জয়ন্তকে। ফুসফুসেব কোন্ পাশে থাকে প্রাণ স্পন্দনের ঘড়ির কাঁটা, হৃদয় বাসা বাঁধে কোন্ গহন সেই অরণ্যালোকে, মনের কারখানা পঞ্জরাস্থির কোন্ জটিল গুহাগহ্বরে। তবে কি সব মিলিয়ে শুধু একটা চেতনামাত্র। দেহ কি শুধু সেই চেতনার একটা মোড়ক,—আর কিছু না।

কার পিছনে এমন অস্থির হযে ছুটছে রেবা? জয়ন্তর সেই মোড়ক, না জয়ন্তর সেই চেতনা? কোনটার জন্য তার এই সর্বনাশা, কর্মনাশা মোহ? চেতনা তাকে টানছে, না চেতনার আধারটা? সর্বাপেক্ষা বিস্ময়, সে চাইছে না কিছু। জয়ন্ত তাকে পদে পদে অপছন্দ করছে কিনা সে খোঁজ করেনি, সে ঘৃণ্য হচ্ছে কিনা খবর পাওয়া যায়নি। নারীর সকল অস্ত্র তার সহজাত। সে জন্মায় হননের শক্তি নিয়ে। তার দুই চোখে, দুই বক্ষে, দুই নিতম্বে, দুই জঙ্ঘায় এবং দুই চরণে—মৃত্যু বাসা বেঁধে থাকে! কিন্তু অন্তদিকে—চক্ষে তার কল্যাণশ্রীর নিমীলিত আভা, বক্ষে সঞ্জীবনী অমৃতধারা, নিতম্বে ও জঙ্ঘায়

প্রাণস্বজনের সর্বকালের রহস্য কথা এবং তার দুই চরণক্ষেপে কাননের কুসুমসম্ভার প্রস্ফুটিত।

সে কি হনন করতে চাইছে জয়ন্তকে? সে কি চাইছে তার অগ্নিবাসনার সঙ্গী হোক জয়ন্ত? কই না। কিন্তু কী চাইছে কবি জয়ন্ত, সেটি না জানলে রেবার চলবে কেন? তার কবিচেতনার কোন রহস্যরন্ধ্র থেকে উঠে আসছে সেই প্রবল প্রাণময়তা, রেবা যার সঙ্গে লিপ্ত হতে চাইছে? এটি লক্ষ্য করার বিষয়, বিগত ছয় বছরে জয়ন্ত চায়নি কিছু। বলেনি, ভালবাসি। বলেনি, কাছে এস। এও বলেনি, তুমি আমার কবিজীবনের সকল দায়িত্ব তুলে নাও। জয়ন্ত তার জ্যাঠামশাই কর্তৃক বিতাড়িত, জননীর দ্বারা পরিত্যক্ত, ভাই-বোনের দ্বারা উপেক্ষিত। দুঃখ দারিদ্র্যে জয়ন্ত বড় হয়েছে, ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছে, পথে পথে বাসা বেঁধে কবিতা লিখেছে। অল্প বয়সে সে খ্যাতিমান, তার বই বিক্রি প্রচুর, তার একটি সামান্য রচনার আর্থিক মূল্য অনেক,—তাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবার জন্য অনুরাগী পাঠক-পাঠিকারা ছুটোছুটি করতে থাকে। জয়ন্ত কোনও সভায় গিয়ে দাঁড়ালে শুধু তাকে চোখে দেখার জন্য জনতার ভীড় হয়। জয়ন্ত ভালবাসে সেই সমগ্র জনতাকে, ব্যক্তিবিশেষকে নয়। অগণিত সংখ্যক অনুরাগিণী ছুটে আসে তার কাছে পতঙ্গদলের মতো, জয়ন্ত ভালবাসে সেই নারীসমাজকে, কিন্তু একটি বিশেষ নারী অদ্যাবধি তার হৃদয়কে আকর্ষণ করেনি। কোন্ বস্তু তার প্রিয় কেউ জানে না, কিন্তু অপ্রার্থিত প্রিয়বস্তুসম্ভার তাকে চারিদিক থেকে ঘিরতে থাকে। যে কবি সামগ্রিক প্রাণ নিয়ে কাজ করে, ব্যক্তি তার কাছে অলীক! সেখানে বহু মানুষের চেতনা বড়, একটিমাত্র মানুষ বড় নয়। উপলব্ধি সেখানে প্রধান, আধারের মূল্য সামান্য। কবিতার একটি ছত্রে কোন্ শব্দের পর কোন্ শব্দটি সযত্নে বসালে পাঠক ডুকরিয়ে উঠবে, জয়ন্ত ভালবাসে সেই শব্দের সৃজনরহস্য। জয়ন্তর মূল প্রাণচৈতন্য বাস করে একটি আইডিয়ার জগতে, সেখানে সাধারণের চেতনা বা মন পৌঁছয় না। সেই জগৎ একটি গ্রহবিন্দুর মতো মহাকাশের পটে আঁকা এবং একমাত্র জয়ন্তই জানে সেখানে পৌঁছবার কৌশল। সম্ভবত সেইখান থেকে জয়ন্ত শোনে এক বীণাযন্ত্রের ধ্বনি, সেই ধ্বনি রূপায়িত হয় অক্ষরে-অক্ষরে। জয়ন্ত যে-মন্ত্রপাঠ করে তার প্রতি কবিতায় বা রচনায়—তারই জারক রসায়নে প্রস্তুত হয় হিংস্রতা ও বিদ্বেষ, বাসনা ও প্রেম, ঘৃণা ও বিপ্লব, আক্রোশ ও করুণা, নৈরাশ্য ও বেদনা, দয়া ও অসন্তোষ। সে ভালবাসছে এদের, এরা তার আত্মজ, এরাই তার লীলা-সহচর। এদের ভাবনাই তাকে নিত্য অন্তর্মুখী করে রেখেছে এবং এই

অন্তর্মুখীনতাই তাকে উদাসীন করে রেখেছে এতকাল। জননীর বাৎসল্য, ভাইবোনের স্নেহভালবাসা, আত্মীয়বন্ধুগণের অনুরাগ—এই ঔদাসীন্যের কাছে মাথা ঠুকে মরেছে। রেবা যত করেছে তার জন্য সম্ভোগের আয়োজন, যত আহরণ করেছে বিলাসের সকল খুঁটিনাটি,—জয়ন্তর প্রসন্ন হাস্যের কাছে সব মিথ্যা হয়ে গেছে।

রেবা সরে এল দরজা ছেড়ে। বাইরে রৌদ্রোজ্জ্বল অপরাহ্ণ বড় সুন্দর। জয়ন্ত সামনে দাঁড়ালে অন্য কিছু যেন চোখে পড়ে না। পাখি ডাকলে শুনতে পায় না সে—মেঘ ডাকলে তার কানে ওঠে না। জয়ন্ত থাকলে পৃথিবীকে সে হারায়।

রেবা টেবলটি গোছাতে লাগল সযত্নে। একটি কাগজের টুকরো না হারায়, একটি হিজিবিজি কাটা ছেঁড়া কাগজ না নষ্ট হয়। কোনও কাগজে একটি ছোট্ট অঙ্ক, একটি মেয়ের নাম, বাইবেলের একটি ছত্র, বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের উপর একটি মন্তব্য, কার যেন একটি ঠিকানা, এবং বিলাতবাসী এক সহপাঠীর কাছে লেখা একটি আরম্ভ-করা চিঠি। এগুলি সব দরকার,—এদের প্রত্যেকটি। এগুলিকে উপলক্ষ্য করে তার কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা। এগুলি সব একত্র হয়ে ইশারা জানাচ্ছে কোনও এক কল্পলোকের। এই হিজিবিজি অক্ষর-চক্রান্তের মধ্যেই হয়ত গুপ্ত রয়েছে প্রচণ্ড প্রকাশের যন্ত্রণা, মানহারা সম্বলহারা মানুষের রক্তিম অশ্রুবিন্দু, হয়ত বা ভবিষ্যৎকালের কোনও বিপ্লবের সঙ্কেত। রেবা সেই সমস্ত খুঁটিনাটি সামগ্রীর প্রত্যেকটি স্তরে স্তরে গুছিয়ে রাখল। বইগুলি সাজিয়ে রাখল পেজ মার্ক দিয়ে। কয়েকটা ধোপদস্ত ধুতি পাঞ্জাবি রয়েছে র‍্যাকে, টিনের বাক্সটি খোলা, ছেঁড়া চটি জোড়াটা নেই—কিন্তু নতুন এলবার্ট জোড়াটা পড়ে রয়েছে। পুরনো গামছাখানা ঝুলছে। বিছানাটা ঝেড়ে দিয়ে রেবা ধোপদস্ত চাদর পাতলো এবং বেড-কভার দিয়ে ঢেকে দিল। নিজের হাতে সে ঝাটা দিয়ে মস্ত ঘরখানা পরিষ্কার করল। কপাল বেয়ে তার ঘামের ফোঁটা কেশগুচ্ছ থেকে নামল।

বেশ লাগল কাজগুলি। এগুলি তার পক্ষে নতুন। কিন্তু এদের সঙ্গে প্রাণের যোগ থাকছে বলেই কাজগুলি আনন্দদায়ক। ভালবাসার প্রেরণা থাকলে গাছতলাও পরিচ্ছন্ন হয় মেয়েদের হাতে। পুরুষের মধ্যে কুরূপ আছে, চোর-ডাকাত আছে, বর্বর ও শয়তান আছে,—তা থাক্, মেয়েরা খুশী থাকে ভালবাসার সততায়। ভালবাসায় মেয়ে মরে, ভালবাসায় সে বাঁচে। কিন্তু এখানে জয়ন্তর ভালবাসার কথাই উঠছে না। এখানে মেয়ে মরেছে তার কবিতার বিষপান করে, এবং মেয়ে বেঁচে উঠেছে একই কবিতার অমৃত আস্বাদ পেয়ে! কবি যত

দগ্ধ হয়েছে আপন কবিতা রচনায়, রেবা যেন ততই সেই চিতাগ্নি-আভায় তেজস্বতী হয়ে উঠেছে।

মেয়ের জীবনে জয়ন্ত বিপজ্জনক, সবাই বলবে। সে খেলাঘর ভেঙে দেয় একটির পর একটি। বিশ্রামের ক্ষেত্র ছাড়া ঘরের দাম নেই পুরুষের কাছে। সে চাইছে বাহির,—আত্মার অবিশ্রান্ত মুক্তি চাইছে সে শূন্যে শূন্যে। এই অর্থহীন শূন্য ভাষা পায় তার কণ্ঠে, এই শূন্যের মধ্যে সে আপন সঙ্গীত পাঠিয়ে দেয়। সেই জন্য পুরুষ যখন ঘরপোষা হয়, মেয়ের মনে তখন দুর্ভাবনা দেখা দেয়। জয়ন্তর মধ্যে রেবা পেয়ে গেছে সেই আশ্চর্য পুরুষকে। শুধু খেলাঘর নয়—জয়ন্ত ভাঙতে চাইছে চলিত কালকে, প্রাচীন চিন্তাভ্যাসকে,—যেগুলি তার চিন্তাধারার পক্ষে বাধা। ভাঙনের রব উঠছে তার কবিতায় কথায় কথায়, বিদ্রোহের গুরুপদধ্বনি শোনা যাচ্ছে—গগনে গগনে যেমন বজ্র ডেকে যায়। সে যেন ডাক দিচ্ছে এক মহাসংগ্রামকে, বেজে উঠছে তার কবিতায় এক ঝঙ্কার-ঝঞ্ঝনা, যেন অসুর নাশনের সম্ভাষণ, যেন প্রলয়ঙ্কর ভৈরবের ডমরুধ্বনি। জয়ন্তর কাব্যপ্রলাপের ভিতর থেকে উঠে আসছে যেন শ্মশানের প্রেতচ্ছায়ারা,—যারা আছে চারিদিকে, অথচ রেবার চোখে পড়ে না! তারা যেন আতুর, খঞ্জ, কাঙাল, বুভুক্ষু, ঘর্মাক্ত, বিদ্বেষ ও ঘৃণাজর্জর—তাদের দেখলে সুখের নিদ্রার মধ্যেও অন্ধকারে ও আতঙ্কে গা ছমছম করে।

ঘণ্টা দুই পরে শচীন দেখে গেল, রেবা ঘুমিয়ে পড়েছে পাশ ফিরে।

॥ ৫ ॥

দিন কয়েক যাবধি রেবাকে বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল। থেসিসের আলোচনা মুলতবী রেখে সে ছুটোছুটি করছিল বই কাগজের জন্য। প্রফেসর ডক্টর সেন মশায়ের ওখানে প্রায়ই তাকে যেতে আসতে হয়। ডাঃ সেনের সে অতি প্রিয় ছাত্রী এবং তাঁরই পরিচালনায় রেবা তার থেসিসটি লিখবে। রিসার্চ করার কাজ এখনও তার বাকি, স্কলারশিপ পাবার কথাটা এখন চলছে। তার বিশেষ বিষয় ছিল কেমিস্ট্রি, সুতরাং সাধারণভাবে অর্গানিক কম্পাউণ্ডেরই একটি প্রশাখা নিয়ে সে কাজ করছিল ডি-ফিল এর জন্য। কিন্তু তার আগে কাজ অনেক। রিসার্চের নোটস্ লেখা, তারপর ভাগে ভাগে কাজ আরম্ভ। লিখবে তিন ভাগে। এখনও বছর তিনেক লাগবে বৈকি। ডাঃ সেন সেদিন বলছিলেন, কাজটা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে করা দরকার। খেই হারালে অসুবিধা। লাইব্রেরীতে

গিয়ে বসলে এখান-ওখান থেকে কতকগুলো চোখ বড্ড বেশি তাকে অনুসরণ করতে থাকে, সুতরাং রেবা সেদিন রাগ করে আবার কিনে এনেছে প্রায় পাঁচ ছ'শ টাকার বই-কাগজ। অনেকগুলি জার্নালেরও খবর দিয়েছেন ডাঃ সেন। স্কলারশিপের জন্ম তিনিই প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু আসল কথা, 'কালি-কলম-মন!' রেবা মনঃসংযোগ করে কাজে বসতে চাইছে। দেখতে দেখতে কেটে গেল তিন সপ্তাহেরও বেশি।

একদিন হঠাৎ বই-কাগজ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে অনুভব করল, সে সম্পূর্ণ বেকার! লেখাপড়াটা প্রিয়তর হয়, যদি অন্যদিকে কোথাও আনন্দের আকর্ষণ থাকে। নইলে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন দু' চোখের বিষ। ঘণ্টা আষ্টেক লেখাপড়া ভাল লাগে, ঘণ্টা ছয়েক ঘুম,--বাকি দশ ঘণ্টায় স্নানাহার বাদ দিলে সময় কাটবে কী নিয়ে? মেয়েবন্ধুদের সঙ্গে বসলে যত সব খেলো সাজসজ্জার আলোচনা, নয়ত অন্যের স্বামীর গল্প, নয়ত শোনো অমুক মেয়ে ধরা পড়েছে সেই-যে-সেই ছেলেটার সঙ্গে, আর নয়ত কোনও ফিলম্ স্টারের সর্বশেষ চারিত্রিক সংবাদ। ওই সব আলোচনায় যোগ দেয় আবার মা-মাসিরা, সরুপাড় ধুতি ও কাঁচুলি-পরা বিধবা পিসি, প্রবাসী ভাইদের বুভুক্ষু বৌরা,—রেশনের কাঁকরভরা চাউলের কথা নিয়ে আড্ডা যাদের আরম্ভ এবং সর্বশেষ হিন্দি ছবির নোংরা গান নিয়ে যাদের বৈঠক শেষ।

তার চেয়ে চলো ভরা জীবনের মধ্যে, চলো স্থূল বাস্তবে, চলো সংগ্রামের ক্ষেত্রে। সেখানে গিয়ে দেখো, একটি স্বল্পবিত্ত ঘরের মেয়ে শুধু শাক-চচ্চড়ি আর আধপেটা ভাত খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে চলেছে বহু দূর পথ কেবল হাতের কাজ শেখার জন্ম। সে অন্নসংস্থান করবে, অন্যকে খাওয়াবে, অভাবকে ঘোচাবে, সম্মান নিয়ে দাঁড়াবে। চেয়ে দেখো, একটি মেয়ে হয়ত কাজ করে ডাক-ঘরে কিংবা রেল আপিসে। তার উচ্চাভিলাষ,—স্বাচ্ছন্দ্যের সংসার সে রচনা করবে। সামান্য আনন্দলাভের জন্ম সারাদিনে দুবার দুঃখ ও দুর্গতির ভিতর দিয়ে তাকে কর্মস্থলে যেতে হচ্ছে। সেই দুর্ভোগ কে না জানে। লক্ষ লক্ষের ভিড়ের ভিতর থেকে উঠছে নিত্য ধিক্কার, প্রতিদিনের চিত্তগ্লানি থেকে উৎপন্ন হচ্ছে লক্ষ লক্ষের অসন্তোষ ও ঘৃণা। জয়ন্ত বলে, এই ঘৃণা জমুক, পর্বতপ্রমাণ হোক এই নিত্য চিত্তক্ষোভ,—একদিন এই আগ্নেয়গিরির থেকে, ছুটে আসবে গলিত অগ্নিস্রাব। এই দুর্বল বাঙ্গালী কেরানির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ দধীচির বজ্রদণ্ড।

রেবা স্থির করল, সেই সংঘাতসঙ্কুল জীবনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ানো তার পক্ষে দরকার। যেখানে ঝড়-তুফান, যেখানে রণদামামা, প্রাণ নিয়ে যেখানে

ছিনিমিনি, মানুষের দুর্গতি এবং দুর্দশা যেখানে প্রতিকারবিহীন হয়ে মূঢ়-মুহ্যমান,—সেইখানে তার যাওয়া প্রয়োজন। সকলের মাঝখানে, সকলের দুঃখে-সুখে, আঘাত ও অপমানে, ব্যাধি ও মৃত্যুতে। রেবার ভাল লেগেছিল সেই দিনগুলি—দুরারোগ্য রোগে জয়ন্ত যখন শয্যাগত। রেবা দাঁড়াতে পেরেছিল সেদিন একটা স্বল্পবিত্ত সমাজের সামনে,—যাদের জীবন-সমস্যা উঁচু গলায় কেউ বলে না। সেই দিনগুলি চমৎকার—যখন রেবা নিজের হাতে কিনত ডাব আর লেবু, ওষুধ আর ফল, ছানার জলের জন্য দুধ এবং হরলিকস। কপাল বেয়ে তার ঘাম ঝরত, উপবাসে কেটে যেত কোন কোনদিন। সেই সব দিনে সে দেখত পথে পথে কা'রা বাস করে, ক'ারা খায় আঁস্তাকুড়ে, কা'রা যায় হাটবাজারে, কারা ছোটে কর্মস্থলে। এখন সেসব দিনের কথা ভাবতে রেবার ভাল লাগে। রেবা যেন মিলিয়ে যেতে চাইত তাদেরই মধ্যে।

রেবা সেদিন ইন্দুমতীর ইস্কুলে ফোন করল বার বার, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। সেদিন নাকি ইস্কুলের ছুটি। ইন্দুমতীকে জানে নানা লোক, তাদের মধ্যে অনেকেই প্রভাবশালী নাগরিক। স্কলারশিপ যদি সে না পায় এবং প্রফেসারিও যদি না জোটে, তবে অন্তত লেকচারার। নয়ত বড় কোনও মেয়ে-ইস্কুলের মাস্টারি। এসব কাজের জন্য ছুটোছুটি করতে পারে ইন্দুমতী। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কেন করবে ইন্দুমতী তার এই উপকার? কোন স্বার্থ তার? সে তার মেট্রন ছিল এককালে। কিন্তু শোভনা একদা অসম্ভব করে তুলেছিলেন ইন্দুমতীর জীবন এ বাড়িতে। মাঝে মাঝে রেবাকে দেখতে হয়েছিল সেইকালের অনেক কদর্য দৃশ্য। ইন্দুমতী কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। আজ রেবার পক্ষে তার জন্য কিছু প্রায়শ্চিত্ত করার দরকার বৈকি। ইন্দুমতী গরীব, তার টাকার দরকার। জয়ন্ত বলে, নিঃস্বার্থ সেবা, সততা ও পরোপকারের যুগ শেষ হয়ে গেছে। পথেঘাটে আজ কোথাও মহৎ হৃদয়ের দেখা মেলে না। দেখলে চমকিয়ে উঠি। ওটা যেন নতুন, যেন পরদেশী, ওটা যেন বিস্মৃতপ্রায় একটা অতীত। তোমার জন্য কেউ কাঁদছে না, কারও মাথা-ব্যথা নেই, তুমি একক। ভিড় ঠেলে তুমি শুধু এগিয়ে যাও, অন্যকে জায়গা দিয়ো না, অপরকে ডিঙ্গিয়ে নিজের জায়গা করে নিয়ে, পিছনে কেউ মুখ থুবড়িয়ে পড়লে তাকে তুলতে যেয়ো না। এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাল। একালে আশা করা চলে না, ইন্দুমতী নিঃস্বার্থভাবে উপকার করবে!

ইতিমধ্যে আরেকটি কাজ করেছিল সে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে সে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেবার জন্য ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নিকট লিখিত আবেদন জানায়। অতঃপর গাড়ি নিয়ে ছুটোছুটি করে কয়েকবার এবং টেলিফোনে বারংবার

তাগাদা দিতে থাকে। সেখান থেকে সম্প্রতি জবাব এসেছে। ছোট একটি ফ্ল্যাট পাওয়া গেছে সিন্ধি বাগান পল্লীতে। রায়সাহেবের আপিসের উচ্চতম কর্মচারী মিঃ মৈত্র সেখানে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করেছেন। ফ্ল্যাটটির ভাড়া দেড়শ' টাকার মধ্যে। ওটা জয়ন্তর নামে নেওয়া।

কোথায় কবে যেন রেবা শুনেছিল, বর্বরস্য ধনক্ষয়ঃ। একথা বলেনি যে, চোর-ডাকাত-জালিয়াত বা অসাধু—এরাই বর্বর। বর্বর একটি আলাদা জাত। উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ঘরের ভদ্র সন্তান যারা অর্থব্যয়ের নীতি জানে না,—তারা বর্বর। যেমন রেবা নিজে, যেমন তার মা, যেমন বাবা। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি জার্মান—তাদের নাকি এককালে বলা হতো 'বারবেরিয়ান্স্।' তা হয়ত হবে। বর্বর শব্দটা শুনতে যত খারাপ, ওর তাৎপর্যটা হয়ত নেহাত খারাপ নয়। রায়সাহেব মাঝে মাঝে যান বড় বড় দেশপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সম্মেলনে, রেবাও সেখানে গেছে এক-আধবার,—সেখানে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে যেসব কোটিপতিরা মদের গেলাস হাতে নিয়ে দেশের দুর্গতি মোচনের কথা ভাবে, সম্ভবত তারা বর্বর। রেবাদেরই বাগানে 'সাহেব বাংলায়' মাঝে মাঝে যেসব রাজনীতিবিদ্‌রা জড়ো হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রকার দুর্গতির আলোচনায় যোগ দেন এবং তার ফলে অধিকতরো দুর্গতি দেখা দেয়,—তাঁরাও অতি ভদ্র বর্বর! রেবাদের নিজেদের পরিচয়—তারা আগাগোড়া বর্বর। তারা থাকে এমন একটা বিলাস-বৈভবভরা জীবনে, এমন একটা অপব্যয়ের চক্রান্তে—যেটা অতিশয় সভ্যতাজাত বলেই বর্বর। তাদের ধনসমৃদ্ধির মধ্যে কাগজপত্রের কৌশল আছে, কিন্তু কপালের ঘাম নেই। অনায়াসলব্ধ আয় বলেই যথেষ্ট অপব্যয়! আরও অনেক আছে মূর্খ মূঢ় ধনপতি, যারা যক্ষের মতো ধন আগলায়। তার মা শ্রীযুক্তা শোভনা দেবী বলেন, আমি বিশ বছর ধরে গিনি জমিয়েছি, রেখেছি এক ব্যাঙ্কের ভল্টে,—আমি কিছু পরোয়া করিনে। রেবা একদিন প্রশ্ন করেছিল, জমালে কেন, মা? কতগুলো গিনি? শোভনা বলেছিলেন, সে সব তোমার শুনে কাজ নেই। কতগুলো কি গুনেছি? গোছা গোছা শুধু রেখেই এসেছি!—রেবা বলল, অত রাখলেই বা কেন?—রাখলুম কেন?—শোভনা বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছিলেন, তোদের দেশের কর্তাদের আমি বিশ্বাসই করিনে। রেবা চুপ করে গিয়েছিল। অর্থনীতি শাস্ত্রে তার জ্ঞানগম্যি নেই বললেই হয়।

সামনের রবিবারের দিনে রেবা গাড়ি নিয়ে বিকালের দিকে বেড়িয়ে পড়ল। ছুটির দিন ছাড়া ইন্দুমতীকে পাওয়া যাবে না। সঙ্গে সে টাকা নিল অনেক। বর্বরস্য ধনক্ষয়ঃ। কিন্তু রেবা কাঁচা মেয়ে নয়। সে তার পিতার বিরাট

কারবারের অংশীদার। অর্থনীতি হয়ত সে বোঝে না, কিন্তু অঙ্ক বোঝে। কোথায় টাকা খাওয়ালে কাকে দিয়ে কোন কাজ হবে, সে জানে। সে জয়ন্তর মতো আকাশ পথিক নয়, শূন্যে সে হাঁটে না, তার চিন্তাধারা বিজ্ঞানভিত্তিক, সে বাস্তববাদিনী।

সঙ্গে জয়ন্ত নেই, ভালই হয়েছে। রেবার পাশে জয়ন্তর আশ্চর্য-সুন্দর চেহারা দেখে বর্ষীয়সী কুমারীদের বিস্মৃতপ্রায় যৌবননিকুঞ্জে যেন অনেককাল পরে পাখি ডেকে ওঠে। কিন্তু তারা সেই চেতনাটা লুকিয়ে রেখে নীতিকথা বলতে থাকে। ব্রহ্মচর্য, সংযম, চরিত্রশুচিতা, নারীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা,—একটির পর একটি কথা ওঠে। শ্রোতারা শুনছে না, কিন্তু বক্তাদের গ্রাহ্য নেই। দেশের মধ্যেও তাই। কতকগুলো লোক শ্রোতা হয়ে জন্মায়, শুধু শুনে যাচ্ছে অসীম ধৈর্যসহ চিরকাল,—আর বক্তারা চাপাচ্ছে তাদের ওপর বস্তা বস্তা কথা। কিন্তু শ্রোতারা যদি একবার কথা বলে ওঠে,—বক্তারা পালায়:

রেবা নিজেই চালাচ্ছিল গাড়ি। পিছনের সীটে রয়েছে তেওয়ারি। দক্ষিণ থেকে উত্তরে পাচ মাইল এলে তবে কালীঘাটের এলাকা। ওটা পেরিয়ে গেলে আসে পুরনো ভবানীপুর। তারপর মাইলখানেক আরও গিয়ে এগলি-ওগলি। একটি স্থলে এসে গাড়ি থামাতে হল। সরু পায়ে চলা গলিতে রিকসাই ঢোকে না, গাড়ি ত' দূরের কথা। যাই হোক, সেই পরিচিত গলির প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে জরাজীর্ণ সেই একতলার পুরনো দরজা। দরজা খুললেই নোংরা কাঁচা উঠোন,—এবং অন্য আর পাঁচটা বাড়ির পিছন দিক। এ যেন কলকাতার মধ্যেই কলকাতার একটা বর্জিত টুকরো। সন্ধ্যা প্রায় আসন্ন। এদিকটা ঝুপসি, আলো জাললেই হয়।

রোয়াকের উপর ঘরের দরজাটা শুধু ভেজানো ছিল মাত্র। রেবা খুটখুট করে কড়া নাড়তেই সেটা আপনা থেকেই যখন খুলে যাচ্ছিল, তখন সহসা ভিতর থেকে সেই দরজায় খিল তুলে দেবার একটা প্রয়াস দেখা গেল। কিন্তু তখন একটি পলকমাত্র বিলম্ব হয়ে গেছে। রেবা বলল, ইন্দুমা, খোলো,—আমি রেবা··

খুলতে হল না, খিলটা পড়ে যেতে দরজাটা খুলেই গেল। কিন্তু এক পা ভিতরে বাড়িয়েই রেবা থমকিয়ে দাঁড়াল। ইন্দুমতী তখনও তাঁর কাপড়-চোপড় সামলিয়ে নিতে পারেননি। ওইটুকু ঘরে তক্তার ওপর যিনি বেহুঁস হয়ে পড়ে রয়েছেন তিনি রায়সাহেব, রেবার বাবা। ঘরের ভিতরটা ছমছমে ছায়ায় আচ্ছন্ন।

ইন্দুমতী ভীতকণ্ঠে বললেন, উনি ত' আর খোঁজখবর রাখেন না,—আজ দেখছি হঠাৎ রিকসায় চড়ে এসে পড়লেন একেবারে অসময়ে· আমি ওঁকে দেখেই অবাক। এই যে, আলোটা জ্বালি। এ বস্তিতে ইলেকট্রিক কেউ নেয়নি, ওদিকে আবার কেরোসিনও আনতে পারিনি সময় মতন দাঁড়াও, দেখি আবার দেশলাইটে কোথায় গেল

আলো জ্বালতেই একপাশের তাকে রেবার চোখ পড়ল, বড় একটা লেবেলসাঁটা বোতলের পাশে কয়েকটা সোডার শিশি। গোটাতিনেক গেলাস একপাশে। রেবা হঠাৎ হেসে উঠল, ইন্দুমা, বাবাকে কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে দেখলুম অনেক দিন পরে আজ বাবা একদম নিছক বাঙ্গালী।

ঠিক আমিও তাই ভাবছিলুম, রেবা। তোর ছোটবেলায় উনি কিন্তু প্রায়ই ধুতি পরতেন,—ইন্দুমতী এবার অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, আজ উনি এসেই বললেন, এক বন্ধুর ওখানে দুপুরবেলা খেতে গিয়েছিলুম,—ফেরবার পথে শরীরটা যেন কেমন করছে, তাই ভাবলুম তোমার এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে যাই, ইন্দু।

আঃ—রায়সাহেব একটু নড়ে' পাশ ফিরবার চেষ্টা পেলেন। তারপর যে প্রকার জড়িত কণ্ঠে কথা উচ্চারণ করলেন, সেটি রেবার পরিচিত। তিনি বললেন, ইন্দুমতী বড্ড মিছে কথা বলছে।

রেবা মাথার কাছে গিয়ে হেসে বলল, ওটা যে ওর সেই পুরনো অভ্যাস, বাবা। তোমার মনে নেই, ছোটবেলায় আমার কান রগড়ে দিয়ে তোমার কাছে বলত, আমার কানে ব্যথা?—দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি। ইন্দুমা, জলের বালতি আর গামছা দাও ত'?

ইন্দুমতী জল আর গামছা আনতেই রায়সাহেব আবার জড়িত কণ্ঠে বললেন, তুমি এই নোংরায় কেন এলে, মা?

শান্ত হাস্যে রায়সাহেবের মাথায় ঠাণ্ডা জল বুলিয়ে রেবা বলল, নোংরা হবে কেন বাবা, তুমি যেখানে এসেছ? আমি অবশ্য জানতুম না। ইন্দুমার কাছে এসেছিলুম একটা কাজের জন্য উমেদারি করতে। আমাকে ক্ষমা করো, বাবা।

ইন্দুমতী ভয়ে-ভয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। রেবা জানত ঠাণ্ডা জলের প্রয়োগ। রায়সাহেবের মাথাটা সে বেশ করে ধুইয়ে দিল। পরে গামছাটা সরিয়ে নিজের আঁচল দিয়ে তাঁর মাথাটা মোছাল। তারপর বলল, একটু নেবুজল দেবো, বাবা?

মদমত্ত অর্ধচেতন রায়সাহেব সহসা তাঁর আদরিণী কন্যার প্রতি গর্জিয়ে উঠলেন, এবং যে-কথাটি কোনও কালে কোনও অবস্থায় বলতে চাননি, সেই

কথাটি তিনি ভগ্নস্বরে বলে উঠলেন, আঃ, শুধু বাবা আর বাবা! কে বললে আমি তোমার বাবা? আমি বাবা নই! তুমি বাবা বলে ডাকো, তাই আমি বাবা!

এ ধরনের কথা রায়সাহেব কোনওদিন বলেননি! রেবা একটু অসহায়ভাবে হাসবার চেষ্টা পেল। কাছাকাছি খুঁটি একটা নেই, তাহলে রেবা সেটা ধরে ফেলত!

রায়সাহেব অসংযত কণ্ঠে প্রলাপ বকলেন,—সাত রকমের বাবা আছে, তার মধ্যে একটা আমি! পুরনো মাতাল কখনও মিছে কথা বলে না! আমি তোমার জনক-পিতা নই!

বিবর্ণ ও নিরুপায় রেবা মৃদুস্বরে বলল, আমি তোমার মেয়ে নই, বাবা?

না। এই প্রথম আর শেষবার জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি আমার সন্তান নও! আমি তোমার প্রতিপালক, জনক নই।

রেবা কাঁপছিল ভূমিকম্পে!

জড়িতকণ্ঠে পুনরায় রায়সাহেব বললেন, ছেলেপুলে হবার আগেই আমার স্ত্রী সুইসাইড করেন। আমি কারও বাবা নই, রেবা!

তাহলে বাকিটুকু আজ আমাকেই বলতে হল—এই বলে ইন্দুমতী এগিয়ে এলেন,—তুই কিছু মনে করিসনে রেবা,—শোন্, যাকে তুই মা বলে জানিস, সে মাগিও তোর মা নয়!

যেন জাহাজ ডুবে যাচ্ছিল অতল সমুদ্রতলে, শুধু তার মাস্তুলের শেষ ডগা থেকে মৃদুস্বরে শোনা গেল, তাহলে? আমি কে? কোথাকার? মা-বাপ কোথায় আমার?

সব কথা পুরুষ মানুষের মুখ থেকে শুনতে নেই, রেবা—এই বলে ইন্দুমতী আরও কাছে সরে এলেন। একটু আগে তাঁর নিজের চরিত্রনৈতিক দৃশ্যটার ওপর যেন সৌভাগ্যক্রমে সহসা যবনিকাপাত ঘটে গেল। তিনি হঠাৎ যেন জোর পেয়ে গেলেন। বললেন, লজ্জার কথা, এক সার্কাস পার্টিতে উনি প্রথম দেখেন শোভনাকে। মেয়েটার বয়স তখন বছর আঠারো। কিন্তু তখনই একেবারে এঁচড়ে পাকা মেয়ে—বলতে বলতে এক কুমারী অন্য কুমারীর কানে-কানে কি যেন একটা কথা পুরে দিল! পরে ইন্দুমতী বললেন, তখন কে আর উদ্ধার করবে? ওই উনি!

রেবা ফিরে তাকাল যেন দুই মরা চোখে!—

উৎসাহিতা ইন্দুমতী বললেন, শোন্ মজা, তুই যা মনে করছিস তা নয়। প্রসূতিসদনে গিয়ে ওর একটা ছেলে হয়েছিল! কিন্তু রাতারাতি সেখানকার

মাসীকে মোটা ঘুষ কবুল করে ওই মাগি একটা চমৎকার ফুটফুটে মেয়ে আদায় করে নিল পাশের ঘর থেকে। টাকায় কী না হয় রে? মাগির মতলব ছিল, মেয়েকে বড় করে নাচ শিখিয়ে মোটা রোজগার করবে।

অচেতন রায়সাহেবের নাক ডাকছিল। প্রকৃতিস্থ থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অ্যাল্‌কোহলের মাত্রা আজ বেশি হয়ে গেছে।

এবার যেন জিদের সঙ্গে ইন্দুমতী বললেন, সেই টাকা দিয়েছিলেন রায়সাহেব, আর সেই ফুটফুটে মেয়ে হলি তুই। ও মাগি যে বলে বেড়ায়,— এই বলে ইন্দুমতী রেবার কানে কানে আবার কি যেন ফিসফিস করলেন, পরে বললেন, মাগির সব মিছে কথা। তুই সেই প্রথম দিন থেকে বেবিফুড খেয়ে মানুষ। হ্যাঁ, বাহাদুরি বটে এই রায়সাহেবের। মিছে কথা কেন বলব। এঁর ধৈর্য আর ক্ষমার সীমা নেই! ঘরে রয়েছেন সতীসাধ্বী স্ত্রী,—তাঁর কাছে গিয়ে শোভনা কান্নাকাটি করে পায়ে ধরে ওঁর বাড়িতে জায়গা করে নিল। কিন্তু বিষধর সাপকে যে জায়গা দিতে নেই, সে কথা ওঁরা কি তখন জানতেন? মনে আছে, তোর বয়স তখন বছর আড়াই। আমি তোর মেট্রন হয়েছি মাস চারেক আগে। তুই ছিলি রায়সাহেবের স্ত্রীর চোখের মণি। কিন্তু শোভনা এমনি অপকলঙ্ক রটাল সতীসাধ্বীর নামে যে, তিনি কারবলিক অ্যাসিড খেয়ে নিজেকে শেষ করলেন। পঁয়ত্রিশ বছরের ঘরণী গিন্নি। সন্তানাদি না হওয়ার জন্য তাঁর মনে বড় দুঃখ ছিল।

আমার মা বাবা তবে কে?

হেসে উঠলেন ইন্দুমতী। সেই হাসির আওয়াজে সজাগ হয়ে উঠলেন রায়সাহেব। বললেন, অ্যাঁ কি বলছ ?

ইন্দুমতী বললেন, শুনুন পাগলির কথা। যাঁকে বাবা বলে ডাকিস তিনিই কি জানেন? প্রসূতি সদনটা ছিল যে বেআইনী। সবাই আসত নাম ভাঁড়িয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে। তখন যে ইংরেজ আমল। জানাজানি হলে তখন বড় জোর বিশ পঞ্চাশ টাকা পুলিশের হাতে গুঁজে দেওয়া। রেবা, মনে রাখিস, কেউ জানে না কারো জন্মের মূল কাহিনী। বড় বড় সমাজপতি, বড় বড় নীতি জ্ঞানী,—তারাও কি হলপ করে বলতে পারে তাদের আদি পরিচয়?

ইন্দুমতী সহাস্যে যখন তাঁর সকল বোঝা নামিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন সহসা রেবা ডুকরিয়ে উঠল,—বাবা, এসব কি সত্যি? তবে কি...আমি তোমাদের মেয়ে নই ?

রায়সাহেব উঠে বসবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। বললেন, তুমি—তুমি আমার মেয়ে, এর চেয়ে বড় সত্যি নেই, মা।

চুপ করে গেল রেবা। পরে বলল, আমি অবাক হচ্ছি, কোনওদিন একথা বুঝিনি! আমি কেউ না, এই প্রথম জানলুম। এখন কি করব বল তো? বাবা, তুমি কেন তবে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করলে? কেন ব্যবসার ভাগ দিলে? কেন বলতে বলতেই রেবার কণ্ঠ যেন বুজে আসতে লাগল,—আমি কোন্ মুখে আজ তোমার বাড়িতে ঢুকব? কোন মুখে তোমার গাড়ি চড়ব? কোন মুখে তোমার টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলব?

রেবা কাঁদল না। কান্নার মেয়ে সে নয়। জয়ন্ত বলে, কান্না, চিৎকার, আবেগোচ্ছ্বাস, ভেঙ্গে পড়া, মূর্ছা যাওয়া—এগুলো খেলো ধরনের নাটকীয়তা, মূঢ়তার অভিব্যক্তি। কাঁদতে পার তখন, কেউ নেই যখন পাশে। হাসবে তখন—সবাই যেখানে উপস্থিত। মেয়েছেলে সব দেশে আগে কাঁদে,—ওদের ফিজিওলজির মূল কেন্দ্রটা জলভর্তি। সেই জন্য টিপলেই জল ওঠে। ওই জলটা নিয়ে পুরুষ জাতির কারবার। সিনেমা থিয়েটারে মেয়েকে কাঁদালেই ব্যবসা জমে। রেডিয়ো নাটকে মেয়ে যত কাঁদবে, তত বেশি লাইসেন্সের টাকা, উপন্যাসে মেয়ে কাঁদে বলেই পপুলার লেখক, বাড়ির বউ অনাচার সইতে না পেরে কাঁদে বলেই সে লক্ষ্মী বৌ, অতি তুচ্ছতা মেয়ে যদি কেঁদে উঠে বাপের কোলে বা স্বামীর কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তে শেখে, তবে তার সাতখুন মাপ। রেবা দয়া করে তুমি কেঁদো না।

রায়সাহেব আবার উঠবার চেষ্টা পেলেন। বললেন, ইন্দু, আর একটু ঢেলে দাও গেলাসে। হ্যাঁ, শোনো মা, আমার চরিত্রটা খুব গৌরবে ভরা নয়, তুমি জেনে এসেছ। কিন্তু বোধ হয় শুধু তুমিই জান, তুমি ছাড়া ভিন্ন সত্য নেই আমার এই নষ্ট জীবনে। ভালবাসার শ্রেষ্ঠ পরিণতি বাৎসল্যে। ভয় পেয়ো না মা,—আমার জীবনে তুমিই একমাত্র সন্তান, একমাত্র আমার মেয়ে, আমার সকল চেষ্টার শ্রেষ্ঠ সাফল্য, আর সকল কীর্তির তুমিই একমাত্র অধিকারী,—এর চেয়ে বড় গৌরব আর আমার নেই, রেবা।

ইন্দুমতী ফস করে বললেন, উনি ঠিক এইভাবেই তোর নামে সব লেখা-পড়া করে দিয়েছেন, রেবা!

আঃ—চটে উঠলেন রায়সাহেব,—তুমি চুপ করো একশ' টাকার মেট্রন। দেখেছ রেবা, যেন স্বর্গের দরজায় শ্মশানের পিশাচী পাহারা দিচ্ছে। কথায় কথায় ফোড়ন। দাও, গেলাস দাও—

ধমক খেয়ে ইন্দুমতী চুপ করে গেলেন।

রায়সাহেব জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, আমি বড় খুশী—যেদিন দেখলুম জয়ন্তকে তোমার সামনে—!

রেবা বলে উঠল, সে যে সর্বনেশে ছেলে, বাবা!

তা হোক, ওকে তোমার দরকার। পরীক্ষা করে দেখেছি,—রায়সাহেব বললেন, ওকেও আমার সন্তান ভাবতে বাধেনি! শোনো মা, মদের মুখেই বলি, জয়ন্ত তোমার সঙ্গী হোক, এইটি আমার ইচ্ছে। সর্বনেশে তুমি তাকেই বলছ যে-ছেলে সন্ন্যাসী। ও যে নতুন কালের কবি,—আগামীকালের প্রফেট! ও যদি ভাঙতে চায় সব, ওকে সাহায্য করো, মা। যদি নতুন জীবনের কথা বলে, লিখে রেখো!

রেবা শান্ত কণ্ঠে এবার বলল, বাবা, তুমি কি বলছ আমার সব রকমের উৎপাত বা স্বাধীনতা তুমি স্নেহের সঙ্গে মেনে নেবে?

উঠে বসলেন রায়সাহেব। নেশাটা একটু কমেছে। বললেন, স্নেহের সঙ্গে শুধু নয় মা, ঠাণ্ডা রক্তেই মেনে নেবো! তোমার মন উচ্চশিক্ষিত, তুমি বিদুষী। তোমার স্বাধীনতা বা উৎপাতের কথা আমি কেন ভাবব? তোমার সব নিয়েই ত' তুমি আমার মেয়ে! আমি তোমার সামনে পথ আগলে দাঁড়াবো না, আমি চলব তোমার পেছনে-পেছনে। আমার বাকি জীবনের সেইটিই আনন্দ।

রেবা এবার উঠল। সন্ধ্যা কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বোধ হয় লণ্ঠনে কেরোসিন নেই, আলো নিবে আসছে। পায়ে চটিজোড়াটা লাগিয়ে রেবা বলল, এই মানিব্যাগটা রেখে দাও ইন্দুমা, ওতে তোমার টাকা আছে। আবার আমি পরে আসব। বাবা, তেওয়ারির কাছে আমি গাড়ি রেখে যাচ্ছি তোমার জন্যে।

আচ্ছা মা—

রেবা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। গলি পার হয়ে চলে গেল বড় রাস্তায়। পথের হাওয়ায় অবরোধ নেই। এখানে দম আটকায় না। দক্ষিণ নগরী যেন তার বিশাল আলিঙ্গন প্রসারিত করেছে শত শত মানুষের দিকে।

ঠাণ্ডা রক্তে হাঁটা, এ হাঁটা একরকম। প্রত্যেক পদক্ষেপটি গুণে চলা। কাদার মধ্যে পা না পড়ে, উঁচু-নিচু টক্করে হোঁচট না লাগে, কারো সঙ্গে ধাক্কা না খায়,—দেখতে দেখতে রেবা পায়ে-পায়ে চলে গেল অনেক দূর। কেন গেল হেঁটে মাইলখানেক পথ, সেটা আলোচ্য নয়। বিনা কারণে কেউ হাঁটছে না কোথাও—অথচ আনাগোনা করছে শত শত লোক। একমাত্র সেই হেঁটে চলেছে অকারণে, জয়ন্ত বলে, পা নয়—মন, মন শুধু হাঁটে। মন তার নিজের ছক কাটে, পরিকল্পনা আঁকে, ভবিষ্যৎ রচনা করে ওই হাঁটা পথে!

ভবিষ্যৎ! থমকিয়ে গেল রেবা। ভবিষ্যৎ মানে অর্থহীন স্বপ্নিল একটা

ইন্দ্রজাল! অনেকটা যেন রামধনু,—ঈথারের বিভিন্ন বায়ুস্তরে সূর্যালোকের খেলা। ভবিষ্যৎ মানে কল্পনার সেই খেলা! রেবা বর্তমানের মেয়ে! যে-বর্তমান প্রতিদিনের, প্রতিক্ষণের। যে-সব মেয়ে সুখের আশা করবে, নতুনতর ঘরকন্নার কথা ভাববে, স্বামীসোহাগিনী হবার আশায় দিন গুনবে, জড়োয়ার সঙ্গে যাদের মন জড়িয়ে থাকবে,—তা'রা ভাববে ভবিষ্যৎ! রেবা আজকের, আগামীকালের নয়। রেবা ফিরে চলল।

এক ফুটপাথ থেকে অন্য ফুটপাথে ধীরে ধীরে সে পেরিয়ে এল। ঠাণ্ডা পদক্ষেপ, মন্থরগতি, ব্যস্ততাবিহীন চোখ,—সুতরাং গাড়ি চাপা যাবার ভয় নেই। সে নিজে গাড়ি চালায়, সে জানে কা'রা গাড়ি চাপা পড়ে। আজ যদি রেবা গাড়ির তলায় পড়ে, কী হয়। তার দেহখানা মাত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল,—এর বেশি কি কিছু? মৃত্যুতে কি শেষ হচ্ছে জীবন? কই না! আগম আর নিগমের দুই বৃহৎ ব্যাদান খোলাই ত' রইল। এল আবার কোনও অদৃশ্য ছায়ামূর্তির থেকে স্পারমাটোরিয়া অন্ধকার ওভাবির নিগূঢ় রহস্যলোকে। জন্ম নিল আরেক রেবা! সেই রেবা এসে দেখল এই রেবা তার অপরিসীম রূপলাবণ্যরাশি নিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে বর্তমানের মোটরের তলায়! সবাই কি দাঁড়িয়ে দেখবে সুন্দরী যুবতীর অপঘাত মৃত্যু। দেখে নেবে কি তা'রা শ্রীমতী রেবার রক্তাক্ত নগ্নতা? না, চোখ থাকলে তা'রা দেখতে পাবে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এক বিশাল প্রাসাদের ধূল্যবলুণ্ঠিত ভগ্নাবশেষ।

রেবা ভাবছিল, জয়ন্তকে এখনই তা'র দরকার। সে যেন আজ একটা শক্ত আশ্রয় চাইছে। ঝড়ে যার খুঁটি নড়বে না, প্লাবনে যেটা ভাসবে না, আগুনে যেটা গলবে না। কিন্তু জয়ন্ত যেন মিলিয়ে গেছে কোথায় কবে কোন্ অজানায়। যেন তার উপর দিয়ে চলে গেছে কত যুগ যুগান্তর। রেবা যেন এক জন্মের অতল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এসে পৌঁছল আরেক জন্মান্তরে। সে যেন দেখে এল আদিম সৃষ্টির কুহেলী সমাচ্ছন্ন এক রহস্যরূপ। জয়ন্ত সামনে থাকলে দেখত, রেবার চোখে অন্য আভা, মুখে অন্য ভাষা, বুকের মধ্যে অন্য স্পন্দন। কবি জয়ন্ত চমকিয়ে যেত।

হাঁটতে হাঁটতে রেবা এসে পৌঁছল একটি ঘড়ির দোকানে। ভিতরে জনসমাবেশ থাকা সত্ত্বেও কর্তাদের মধ্যে মিঃ ব্যানার্জি হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। হাত জোড় ক'রে বললেন, আসুন আসুন মিস রায়, কী সৌভাগ্য আমাদের। অনেকদিন পরে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল—

রেবা বলল, আপনাদের ফোনটা দয়া করে একবার দিন—

বিলক্ষণ।—ব্যানার্জি বললেন, আসুন—এই যে এখানে,—হরিদাস,

চেয়ারখানা দাও তো? আপনি নম্বরটা বলুন, আমি ডায়াল ক'রে দিই।

রেবা নম্বর বলল। ব্যানার্জি ডায়াল ক'রে ওর হাতে রিসিভারটি দিলেন। উগ্র আলোকের তলায় রেবার দীর্ঘোন্নতা তনুলতার দিকে তাকিয়ে মেয়ে পুরুষ অনেকেরই চোখ সরতে চাইল না। এ মেয়ে যেন সম্রাজ্ঞীর বেশ ধরেছে ভরা যৌবনে।

--হ্যালো, মিস্টার মৈত্র? শুনুন, আমি রেবা রায় বলছি। সিঙ্গী বাগানের ফ্ল্যাটটা গুছিয়ে রেখেছেন? -আচ্ছা, ওর চাবি কোথায়? ও, মাধো সিং রয়েছে ওখানে?—আচ্ছা, ঠিক আছে। গ্যারাজ নিয়ে ভাল করেছেন। -আচ্ছা, হ্যাঁ— আপনি আমাদের ওখান থেকে রামলোচনকে পাঠিয়ে দিন গাড়ি দিয়ে। ওর সঙ্গে কিছু টাকাও পাঠাবেন। আমি ব্যানার্জি কোম্পানীর এখানে অপেক্ষা করছি। হ্যাঁ, সেই ঘড়ির দোকান।

ফোন ছেড়ে দিয়ে রেবা বসল। ব্যানার্জি করজোড়ে বললেন, এই তো সেদিন রায়সাহেব নিজে এসেছিলেন এখানে। কী সৌভাগ্য আমাদের।

ঈষৎ ঔৎসুক্যের সঙ্গে রেবা বলল, নিজেই এসেছিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রেজেনটেশনের ঘড়ি কি না তাই কোনও কর্মচারীর ওপর উনি পছন্দের ভার দিতে চান না। –

হাসিমুখে রেবা বলল, হ্যাঁ, বাবা এসব বিষয়ে একটু খুঁতখুঁতে–

হবেই ত'– ব্যানার্জি বললেন, বিশেষ ক'রে আপনার জন্মদিনে উনি দিচ্ছেন প্রত্যেকটা দামী ঘড়ি! স্টাফদের হেড অফিসিয়ালেরও বেশি। রায়সাহেব প্রত্যেকের জন্য নিলেন 'টিসট'।

রেবা শুধু একটু হাসল। ভদ্রলোকের কল্পনার অতীত যে, বাবা রয়েছেন মাত্র আধ মাইলের মধ্যে একটি গলির ভিতরে পুরনো একতলার একটি ঘরে। সেখানকার পরিবেশটি একটু অন্যরকম। কিন্তু ভদ্রলোকের মুখে উপহার দেবার সংবাদটি শুনে রেবার কিছু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয়েছিল। যে কন্যা তাঁর পালিত, এবং যে-কন্যার জন্মবৃত্তান্ত তাঁরও স্পষ্ট জানা নেই,—না জাতি, না গোত্র, না পিতৃমাতৃ পরিচয়,—সেই কন্যার জন্মতারিখটি সযত্নে সংগ্রহ করতে তিনি ভোলেননি। কোথায় কোন অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে তার জনক আর জননী,—হয়ত ছিল তাদের পিছনে নৈতিক শাসন, লোকনিন্দার ভয়, হয়ত বা দুঃখ দারিদ্র্যই ছিল সন্তান পরিত্যাগের প্রকৃত কারণ! কিন্তু এসব প্রশ্ন নিয়ে তোলাপাড়া করার মতো রেবার রুচি কম। জন্ম অপেক্ষা জীবনের প্রাধান্য তার কাছে মূল্যবান। সেখানে তার পিতা রায়সাহেবই পরম সত্য,—অন্য সত্য নেই।

প্রায় আধঘণ্টার মধ্যেই মিঃ মৈত্র এসে গাড়ি থেকে নামলেন। অতঃপর

দোকানে ঢুকে তিনি রেবাকে নমস্কার জানিয়ে বললেন, আপনাদের ওখানে দু'জন ড্রাইভারের জ্বর। কাড্‌িলাকখানা নিয়ে মিসেস রায় বেরিয়েছেন ব্রাইট সাহেবের পার্টিতে, রামলোচন সঙ্গে গেছে। আপনার গাড়ি কি গ্যারাজে রয়েছে?

না, বাবার সঙ্গে পাঠিয়েছি। আচ্ছা, ভাবনার কিছু নেই, পরে যা হয় করব। আপনি টাকা এনেছেন?

মৈত্র বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ কত দেবো?

কত এনেছেন?

মৈত্র মহাশয় পাঁচশ টাকা বার ক'রে সবই রেবার হাতে দিয়ে বললেন, আপনি যদি আমার গাড়ি নিয়ে যান, আমার কিছু অসুবিধে হবে না। আমি ট্যাক্সি ধ'রে নেবো।

অনেক ধন্যবাদ।—রেবা বলল, আমিই ট্যাক্সি নেবো। কাল এই টাকা আপনি ডেবিট করিয়ে নেবেন।

প্রবীণ মৈত্র মহাশয় নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন।

এই ভদ্রলোক রেবাদের কলকাতা আফিসের প্রধান সেক্রেটারী। ইনি তাদের বাড়ির সব খবর রাখেন। মিসেস রায়ের কৃত সব দেনা ইনিই নানা স্থানে পরিশোধ করে থাকেন। পার্শীদের দোকান থেকে মদের বিলগুলি এঁরই কাছে আসে। ট্রাভেল এজেন্টরা এঁকেই চেনেন বেশি। পেট্রলের বিল এঁরই হাতে। বেতনাদি ইনিই মঞ্জুর করেন। নিয়োগ বদলির ইনিই নিয়ন্তা। পূজার আগে বাৎসরিক বোনাস ইনিই ঘোষণা ক'রে থাকেন। রায়সাহেবের সবপ্রকার দলিলপত্রের সংবাদ ইনিই জানেন। মিঃ মৈত্র তাদের আফিসের সর্বময় কর্তা।

সিঙ্গীবাগানের ঠিকানায় রেবা যখন এসে উঠল, রাত তখন প্রায় দশটা। মাধো সিং তাদের পুরনো নেপালী দারোয়ান। সে অপেক্ষা করছিল দোতলার ৫ নং ফ্ল্যাটের বারান্দায়। কিন্তু সে ব'সে ব'সে ঢুলছিল আলোটার ঠিক নিচে। রেবার পায়ের আওয়াজ সে শোনেনি। ওর কোমরে বাঁধা মস্ত খাপে ভরা কুকরিখানার ওপর রেবার অনেকদিনের লোভ। রেবা হাসিমুখে অতি সন্তর্পণে কাছে গিয়ে কুকরিখানা তুলে নেবার চেষ্টা করতেই পলকের মধ্যে খপ করে সে রেবার হাতখানা ধরে ফেলেছিল আর কি,—রেবা সেই মুহূর্তে হাত সরিয়ে হেসে উঠল। মাধো সিং তেজীয়ান হয়ে উঠে দাঁড়াল হাসিমুখে,—তুমি ডাকু বনে' গেছ দিদিসাব! আমার জান যাবে তবভি কুকরি ছোড়ব না। হামি জাতগুর্খা—

মাধো সিং চাবি খুলে দিয়ে বাইরে দাঁড়াল। ভিতরে ঢুকে রেবা খুশী হয়ে উঠল। বড় বড় খান তিনেক পরিচ্ছন্ন ঘর, রান্না ও ভাঁড়ারের সুব্যবস্থা, চাকরের

থাকার ঘর, চলাফেরার জন্ত যথেষ্ট অবকাশ, বাথরুমের মোটামুটি ভাল ব্যবস্থা। এখানে সে মাধো সিংকে রাখল পাহারা হিসাবে। লোকটা অনেক পুরনো।

আসবাবপত্রাদি ও বিছানাপত্রের ব্যবস্থা করেছেন মিঃ মৈত্র। টিউবওয়েল থেকে খাবার জল ছাড়া মিনারাল ওয়াটার রয়েছে। রেডিয়ো সেট এসেছে, রান্নার জন্য গ্যাস-সিলিণ্ডার, ব্রেক-ফাষ্টের জন্য নানা খাত্মসামগ্রী মীটসেফে রাখা। মিল্ক পাউডার, কোকো, কফি, চা, চিনি, বিস্কুট ও মাখনের টিন —থরে থরে সাজানো। ফ্রিজিডেয়ার খুলতেই দেখা যাচ্ছে নানা ফল, ডিম, তাজা মাছ-মাংস, কয়েকটা সব্জি। রেবা ওর মধ্যে চীজ ও মাখনের টিন রেখে দিল। বাইরের দিকের ঘরটি ছাড়া অন্য ছুটি শোবার ঘরে ছু'পাশে ছু'খানা খাট ও বিছানা-মশারি। মৈত্র মশায়ের অদূরদৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে রেবা একটু হাসল। তিনি মনে করেন ধনীসমাজের পক্ষে এগুলো দরকার।

মধ্য কলকাতার চেহারা কেমন, রেবা জানে। কিন্তু চারিদিকের জনসমারোহ এবং নাগরিক কোলাহলের মাঝখানে রাত্রিবাস, এ অভিজ্ঞতা বিচিত্র। রাত্রি কোনও সময় নিষুতি নয়, এ নতুন! আলো চারিদিকে দপ দপ করছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে রেবা এমনি খুশী হয়ে উঠল যে, যা সহসা নিজের জন্ত কখনও সে করেনি,—গ্যাস জেলে একদিকে সে চড়িয়ে দিল ডিম আর আলুসিদ্ধ, অন্তদিকে পাউরুটি কেটে টোস্ট তাতিয়ে নিতে লেগে গেল। ওই সঙ্গে ছু'একখানা মাছ ভেজে নিলে মন্দ কি?

আজ সে ঘুমোবে না। নতুন জায়গা ঘুরে ঘুরে সে দেখবে। তাদের নিজেদের বাড়ি যেন খেই-হারানো। সেখানে মহলের পর মহল, সেখানে যেন বাঁধন কোথাও নেই, কোনটা আয়ত্তের মধ্যে আসে না। এক মহল থেকে অন্ত মহলে একমাসের মধ্যেও কেউ যায় না। একের সঙ্গে অন্যের দেখাশোনা হতে সেখানে দেরি লাগে। এখানে সব যেন কোলের মধ্যে,—সব হাতের কাছে। প্রত্যেকটি সামগ্রীর সঙ্গে পদে পদে ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটে যাচ্ছে। এখানকার স্বাচ্ছন্দ্যের ভিন্ন নাম যেন ভালবাসা! এই ফ্ল্যাটটির ভিতরে ঢুকে প্রথম সে উপলব্ধি করল, এইটি যেন তার কাম্য ছিল বহুদিনের। অন্য কেউ নেই তার কাছে, তবু সে যেন রয়েছে সকলের মাঝখানে!

রেবা গুনগুনিয়ে গান ধ'রে দিল অনেক দিনের পর।

॥ ৬ ॥

বাগানবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন শোভনা দেবী। পায়ে তাঁর নধর মখমলের এক জোড়া বর্মী স্লিপার। ম্যানিকিয়োর করা পায়ের আঙ্গুলের নখগুলিতে টকটকে রং—যেন কয়েক ফোঁটা রক্ত। হাঁটু থেকে ইঞ্চি দুই নেমে পাজামা শেষ হয়েছে। বাকি নিচের অংশটা নগ্ন। সন্দেহ নেই, এ দু'খানা নাচেরই পা,—মাংসপেশীর গঠনভঙ্গী সেই রকমই। উপর দিকে একটি মিহি সুতী পাঞ্জাবি, তার ঝুলটা পুরুষের বুশ শার্টকে মনে করিয়ে দেয়। অর্থাৎ পিছন দিকে গুরুনিতম্বের সুচারুভঙ্গী যেন চলনের কালে সুস্পষ্ট হতে থাকে। কিন্তু এখন সকাল বেলা—সন্ধ্যার মায়ালোক নয়—সেই কারণে একটি কাঁধকাটা মখমলের বোতামখোলা জ্যাকেট পরার ফলে পাঞ্জাবির লজ্জা অনেকটা নিবারণ হয়েছে। বাঁ হাতে জ্বলন্ত একটা সিগারেট। সমস্ত ভঙ্গীটি পুরুষের।

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় নেমেই তিনি চমকিয়ে উঠে হাসলেন। যিনি দূর থেকে ফটক পেরিয়ে আউট-হাউস ছাড়িয়ে কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন, তাঁকে দেখে শোভনা বললেন, ও গড, ইন্দুমতী যে? এতকাল পরে হঠাৎ?

কৃত্রিম কণ্ঠে ইন্দুমতী বললেন, মনিবদের ভুলতে পারিনি কিনা, তাই পথ ভুলে এসে পড়েছি, দিদি।

না না, এ হতে পাবে না ইন্দু, সোজা করে বলো কেমন আছ? কোথায় আছ?

ইন্দুমতী বললেন, খারাপ ছিলুম কবে দিদি? তবে হ্যাঁ, গরীবের জায়গা সব ঠাঁই। পড়ে আছি এক পাশে।

শোভনা সহাস্যে ভুরু কুঁচকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কাজকর্ম করছ কিছু? রুজি রোজগার কিছু আছে তো?

ওমা, তা আর নেই? বেকার থাকলে ত' পরের পয়সায় বেগমী ক'রে বেড়াতুম! চেহারাটাও কাজে লাগত।

বটে, বেশ কথা বলছ আজকাল। দেখে ত' মনে হচ্ছে না বয়স বেড়েছে!—শোভনা চোখ বুলোলেন ইন্দুমতীর সর্বাঙ্গে।

ইন্দুমতী বক্রহাসি হাসলেন। বললেন, বাড়বে কেমন করে? টেনেটুনে বাড়াবার লোক ত' আর পাইনি, দিদি।

শোভনা হেসে উঠলেন। বললেন, তারপর? উদ্দেশ্য কি প্রকার?

উদ্দেশ্য তোমাদের রেবা। কোথায় সে?

ডানদিকে চোখটি মটকিয়ে শোভনা বললেন, রেবা বুঝি তোমার শেষ মক্কেল! আহা, বলই না ইন্দু?

ইন্দুমতী হেসে বললেন, তাহলে তুমিই আরেকটু খুলে বল না দিদি।

বলছি, রেবা তোমার লক্ষ্য, না উপলক্ষ্য?

তা জিজ্ঞেস করতে পার। তবে কি জান দিদি, আগে কানটা ধরেই টান দিই। জানি ওটা টানলেই মাথাটা আসবে। বলো এবার, রেবা আছে কিনা।

সিগারেটে টান দিযে শোভনা ভিতর দিকে যাবার আগে বলে গেলেন, দেখতে পার ঘুরে ফিরে। সেদিন আর নেই, ইন্দু।

এ বাড়ি ইন্দুমতীর অতিশয় পরিচিত। এখানে তিনি কাজ করে গেছেন কম বেশি আঠাব বছব। ইন্দুমতী এগিযে গেলেন আমাদের ঘরের দিকে। করিডর দিযে বাঁদিকে বেঁকলেই আফিস ঘর।

আফিস ঘরটি মস্ত এক হল। এটি রাযসাহেবেব নিজস্ব। তাঁব টেবিলটি বৃহৎ ও অর্ধচন্দ্রাকাব। তারই খোপে খোপে অগণিত সংখ্যক ফাইল। হাতের সামনে পাশাপাশি পাঁচ ছযটি টেলিফোন। সেগুলিব বর্ণ কোনটা কালো, কোনটা লাল বা শাদা। তিনি কলকাতায থাকলে তাঁব তিনজন পি এ এসে কাজ কবেন। তিনি বাইবে গেলে পালাক্রমে একজন সঙ্গে যান।

আজ অপরাহ্নে বাযসাহেব যাচ্ছেন বোম্বাই, সেখানে বণিসাযী সমিতির জরুরী বৈঠক বসবে কাল সকাল দশটায়। সেজন্য কাগজপত্র তৈবি হচ্ছে। সপ্তাহখানেক তিনি থাকবেন 'তাজমহলে'।

আফিস কক্ষে বসেছিলেন মাত্র তিনজন। রায়সাহেব ও মৈত্র মশায় কাছাকাছি, কিন্তু রেবা বসেছিল ঘরের কোণের দিকে। সেখানে চাপবাশি গিয়ে ইন্দুমতীর ছোট্ট কাগজের টুকবোটি দিল বেবার সামনেব টেবলে। রেবা সেটি প'ড়ে তাকাল চাপরাশির দিকে। পবে বলল, মতিমাকে বলো আমার মহলে নিযে যেতে। জলখাবার দিযো।

চাপরাশি চলে যাবার পর মিঃ মৈত্র কয়েকটি কাগজ রেবার টেবলের ওপর দিয়ে এলেন। আজ মাসের শেষ তারিখ। ওগুলোর মধ্যে একটি হল টাকা মঞ্জুরির কাগজ। দ্বিতীয় কাগজটির ওপর চোখ বুলিয়ে রেবা ডাকল, বাবা, এখানকার মিটিংয়ের তারিখ দেবো কবে? সামনের দশ তারিখ দেবো?

রায়সাহেব মুখ ফিরিয়ে কন্যার দিকে তাকালেন। পরে বললেন, তা দিতে পার। আমি অবিশ্যি বাঙ্গালোর হযে নয় তারিখের মধ্যে ফিরব। হ্যাঁ, তাই দাও।

মৈত্র মশায় একটি খোলা ফাইল নিয়ে আরেকবার উঠে গেলেন রেবার কাছে। রেবা সেটি দেখে হাসল। বলল, বাবা, তোমার জন্য প্লেন-বুকিং হয়ে গেছে। এবার ইনসিডেণ্টাল খরচ কি ধরব বল তো?

রায়সাহেব কাগজপত্র গোছাচ্ছিলেন। এবার কন্যার দিকে চেয়ে হেসে উঠলেন, বললেন, বটে, আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছ? তুমি যা মঞ্জুর করবে তার মধ্যেই থাকব।

এবার রেবাও খুব হেসে উঠল। কেননা বোম্বাইতে তাঁদের মস্ত শাখা-প্রতিষ্ঠান, উভয়পক্ষই সে সম্বন্ধে সচেতন। বলা বাহুল্য, রেবার এখান থেকেই সেখানে নির্দেশ নিমন্ত্রণ গিয়ে পৌঁছয়।

মিঃ মৈত্র একে একে সমস্ত কাগজপত্র বুঝে নিচ্ছিলেন। রেবার মনে কিছু তাড়া ছিল। ঘণ্টা খানেক পরে সে যখন উঠতে যাবে, সেই সময় মিঃ মৈত্র ক্লিপ-দিয়ে গাঁথা কয়ে কটি বিভিন্ন বিল রেবার সামনে পেশ ক'রে বললেন, এগুলোর জন্য বার বার বাইরে থেকে রিমাইণ্ডার আসছে আফিসে,--কিন্তু আপনি স্যাংসন না করলে কিছু করা যাচ্ছে না—

কাগজগুলির ওপর একে একে চোখ বুলিয়ে রেবার চোখ দুটো তীব্র এবং তার চোয়াল যেন কঠিন হয়ে উঠল। সে একবার তাকাল রায়সাহেবের দিকে। কিন্তু সেইক্ষণে এসে ঘরে ঢুকলেন মি. সেন,—রায়সাহেবের পি এ। তিনি সকলকে নমস্কার জানিয়ে যখন রায়সাহেবের মুখোমুখি কাজ করতে বসলেন, তখন রেবা উঠে এসে বাবার কাছে কাগজগুলি ধরে কি যেন মৃদুকণ্ঠে বলল। রায়সাহেব সেগুলি একবারটি পরীক্ষা করে বললেন, এসব তোমার বিবেচনা মা, এতে আমি মাথা গলাতে চাইনে এসব আগাগোড়া অপব্যয় আর তছরূপ।

খুব চাপা গলায় রায়সাহেব কথাগুলি বললেন বটে, কিন্তু মিঃ মৈত্র একবার অপাঙ্গে পিতাপুত্রীর দিকে দেখে নিলেন। অতঃপর কাগজগুলি হাতে নিয়ে রেবা নিজেই এগিয়ে এসে বলল, মিঃ মৈত্র, এগুলো আরেকবার আমাকে চেক করতে হবে। মনে হচ্ছে কোন কোনও বিল যেন ইনফ্লেট করা। এগুলো আমার কাছে এখন থাক, দুপুরে আপনাকে ফোনে জানাব।

মৈত্র বললেন, আমি কি আরও দিনতিনের সময় নেবো?

বেশ, তাই নিন। হ্যাঁ, আরেক কথা, সিঙ্গীবাগানের ফ্ল্যাটে ফোন কনেকশন কবে হচ্ছে? ওটা বিশেষ জরুরী।

আমি ব্যবস্থা করেছি। আজ-কালের মধ্যেই হয়ে যাবে।—মৈত্র বললেন, হ্যাঁ, ক্ষমা করবেন, আপনাকে বলতে ভুলেছি। গেল সোমবারে জয়ন্তবাবুর সঙ্গে

আমার দেখা হয়েছিল। ভিক্টোরিয়া হাউস থেকে বেরোচ্ছি, একেবারে ওঁর মুখোমুখি।

বললেন কিছু?—প্রশ্ন করল রেবা।

হ্যাঁ, উনি বললেন, সিণ্ডিকেট থেকে একখানা চিঠি গিয়েছিল ওঁর জ্যাঠামশায়ের ঠিকানায়, সেখানা ওঁর হাতে এসেছে অনেকদিন পরে। আপনার সঙ্গে আলোচনা না ক'রে উনি তার জবাব দেবেন না! উনি শীঘ্রই আসবেন এখানে।

কাগজগুলো হাতে নিয়ে রেবা বেরিয়ে এসে একবার থমকিয়ে গেল। জয়ন্ত কোন্ ঠিকানায় এখন আছে জানা গেল না তো? কিন্তু মৈত্র মশায়ের কাছে সে প্রশ্ন করা চলে না। রেবা সোজা ভিতর মহল পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

ইন্দুমতী তার জন্য অপেক্ষা করছেন জেনেও রেবা এসে বসতে যাচ্ছিল লাউঞ্জে, এমন সময় সামনে দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিলেন শোভনা। রেবাকে বসতে দেখে তিনি থমকিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনে হালকা মেরুন রংয়ের শাড়ি, তাতে মোটা সোনালি জরির পাড়,—গায়ে কাঁধকাটা ব্লাউস শাড়ির সঙ্গে বিপরীত রং মিলিয়ে। পায়ে সরু মখমলের নতুন ফ্যাশনের জুতো। বব করা মাথার চুল রাশীকৃত। সম্প্রতি তিনি বোধ হয় কোনও ভাল দোকান থেকে চুলগুলি কুঁকড়িয়ে নিয়েছেন।

শোভনা ওখান থেকেই বললেন, মিস্টার মৈত্রের কাজ কি হয়ে গেছে?

রেবা কাগজগুলো থেকে মুখ তুলে বলল, ঠিক বলতে পারছিনে তো?

ঈষৎ উষ্ণতার সঙ্গে শোভনা প্রশ্ন করলেন, উনি যে বিলগুলো সই করতে এসেছিলেন. সেগুলো সই হয়েছে? এ কিন্তু বিশেষ জরুরী।

রেবা বলল, সেগুলো এই।—কাগজগুলি সে নাড়ল।

সই হয়নি?

রেবা বলল, না। কিছু মনে করো না মা, আমার মনে নানা সন্দেহ এসেছে।

শোভনা থমকিয়ে বললেন, সন্দেহ। কিসের সন্দেহ?

রেবা একবার কাগজগুলোর দিকে লক্ষ্য করে ঈষৎ হাসল। বলল, তোমাকে সব কথা বলতে আমার এখনও বাধে। সেইজন্যে অপ্রিয় সত্য মুখে এলেও বলতে দুঃখ পাই, মা।

শোভনা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, এসব ছেঁদো কথা শোনবার সময় আমার একেবারেই নেই, রেবা। এ হল টাকা-পয়সার কথা। এসব কবির কাব্য নয়!

রেবা শান্তকণ্ঠে বলল, তোমাকে যদি কেউ ঠকিয়ে টাকা নেয়, সেটাও ত' কবির কাব্য নয় ?

একথার মানে কি ?

মানে ?—রেবা বলল, তা হলে শোনো! তোমার একমাসের পেট্রলের বিল কি হাজার টাকারও বেশি, মা ?

তা হওয়াই সম্ভব।—শোভনা জবাব দিলেন।

ও, তাহলে তোমার হোটেলের বিল সাড়ে ছ' হাজার টাকা হওয়াও সম্ভব বলো ?

না হলে ওরা বিল এ লিখতে যাবে কেন ?

রেবা বলল, এ ছাড়া এখানে রয়েছে আরও উনিশ কুড়িখানা বিল। আমার খুব সন্দেহ, এর মধ্যে ফাঁকি আছে!

শোভনার কণ্ঠে সহসা উত্তাপ এল। বললেন, তুই কি বাইরের লোকের কাছে আমাকে অপদস্থ করার ফিকির খুঁজছিস আজকাল ? আমি কি তোর দয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে আছি ভেবেছিস ?

হাসল রেবা। বলল, না, তা ভাবিনি, মা। আমি ভাবছি আর কতদিন তুমি চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে! আমার মনে হয় তুমি এবার একটা হিসেব নিকেশ নিয়ে বসে যাও। এ বাড়িতে তোমার অনেক দেনা! এবার বোধ হয় সুদে-আসলে সব মিটিয়ে দেবার সময় এসেছে।

শোভনা চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন, তারপর তাঁর রুদ্ধ আক্রোশ চেপে সেখান থেকে চলে গেলেন। কিন্তু তিনি সরে যাবার পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এলেন ইন্দুমতী। রেবার কাছাকাছি এসে বসে তিনি বললেন, সেদিন না তোকে বলেছিলুম আসল চেহারা প্রকাশ পেতে আর দেরি নেই ? এবার কেমন দেখছিস ?

রেবা শুধু বলল, চুপ করে বসো এইখানে।

না, বাছা। আমি বসতে আসিনি। ও যদি দুটো কড়া কথা বলে বসে, আমার মুখখানাও ক্ষান্ত থাকবে না।—ইন্দুমতী বললেন, আমি এখন বাইরের লোক। যাক গে। তোর সেই কাজের খবরটাই দিতে এসেছিলুম। বিন্দুবাসিনী ইস্কুলের কর্তারা তোকে দেখতে চান। ওখানে হেডমিস্ট্রেসের জায়গায় এখনও কারুকে নেওয়া হয়নি। মাইনে আপাতত সাড়ে চারশ'। এর পর ভাল কাজ দেখাতে পারলে—

ইন্দুমতীর কথাবার্তা শেষ হবার আগেই শোভনা পুনরায় এলেন উত্তেজিত মুখে। তাঁর পিছনে-পিছনে এলেন রায়সাহেব। ওঁদের এক সঙ্গে দেখে রেবার কিছুমাত্র ভাবান্তর ঘটল না।

ইন্দুমতীকে এখানে দেখে ফস করে চটে উঠলেন শোভনা। বললেন, তোমার যদি কাজ শেষ হয়ে থাকে, তাহলে আর বসে কেন, ইন্দু ?

রেবা শান্ত কঠিন কণ্ঠে বলল, ওকে আমার এখনও দরকার, মা।

তাহলে কি বাইরের লোকের কাছেও আমাকে মুখ খুলতে হবে ?—শোভনা বললেন, যার সঙ্গে একদিন চাকর মনিবের সম্পর্ক ছিল, সেই বা এসে কেন বসবে মনিবদের কোল জুড়ে ?

ইন্দুমতী বললেন, ও, এই কথা। তা চাকর মনিবের সম্পর্ক যদি হয় দিদি, তাহলে তুমি আর আমি তো একই দলে ? নিজের কথাগুলো ভুলে যেযো না দিদি।

শোভনা বললেন, রায়সাহেব, এসব বেয়াদবি কিন্তু আমি বরদাস্ত করব না। একদিকে ঝিয়ের আস্কারা, অন্যদিকে রেবার এই অনাচার। কিন্তু আমি পায়ের জুতো মাথায় উঠতে দেবো না।

রায়সাহেব এই ধরনের কয়েকটা কথা শোনার পরই হাসিমুখে বললেন, এবার তবে আমি যাই ? অনেক কাজ আমার।

শোভনা বললেন, তাহলে এর প্রতিকার কিছু হবে না, কেমন ?

রায়সাহেব যেমন এসেছিলেন তেমনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, প্রতিকার আমার হাতে আর নেই। নতুন কাল এসেছে এবার, প্রতিকার তার হাতেই হবে। রেবা রইল, আমাকে ছেড়ে দাও। জীবনে নোংরা ঘেঁটেছি অনেক, পাঁকের তলায় ডুবেছি অনেকবার। কিন্তু আমি এবার ছুটি চাইছি। শুধু বললেই চলবে, আমার মেয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই তোমার ভবিষ্যতের ছক কেটে নিযো, শোভনা।

আপনার মেয়ে ?—চিৎকার করে উঠলেন শোভনা,—কোথা থেকে পেয়েছিলেন আপনার মেয়ে ?

রায়সাহেব চলে গেলেন। শুধু তাঁর উচ্চকণ্ঠের হাসি কাছের থেকে দূরের দিকে মিলিয়ে যেতে লাগল।

অদূরে চেপে বসলেন শোভনা। উগ্র তিক্ত কণ্ঠে তিনি আবার ফুঁসিয়ে উঠলেন, আমি যাকে একদিন পথ থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করে তুলেছি, তারই সঙ্গে বোঝাপড়া ? কেন ? আমার মানসম্ভ্রম বোধ নেই ?

ইন্দুমতী তপ্তকণ্ঠে বললেন, আবার আমাকে কথা বলতে হল দিদি—

শোভনা সোজা হয়ে বসে বললেন, তুমি এ বাড়ি থেকে এখনই বেরিয়ে যাও, ইন্দু—

রেবা ধীর কণ্ঠে বলল, ইন্দুমতী এসেছেন আমার বিশেষ কাজে। তুমি তুমি ওঁকে যেতে বলো না, মা—

থামো রেবা, আমি তোমার মা নই, মা বলে ডেকো না আমাকে— !

কিন্তু তুমি যে ডাকিয়েছিলে ?—হ্যাঁ, ইন্দুমা, কি যেন বলছিলে তুমি ?

ইন্দুমতী বললেন, মানুষ করলে কখন তুমি, দিদি ? তুমি তো থাকতে তখন আউট হাউসে ! রায়সাহেবের স্ত্রীর কাছেই না রেবার তিন বছর কেটেছিল । আমি মেট্রন হয়ে এলুম ওর বয়স তখন দু'বছর ! বলো, এরপর কি বলবার আছে ?

শোভনা বললেন, হুঁ, বুঝলুম । সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে ।

রেবা হাসল । বলল, এমন তো হতে পারে, তোমার চক্রান্তই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে ?

কীসের চক্রান্ত আমার ?

জবাব দিলেন ইন্দুমতী । বললেন, তুমি না প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলে, রেবাকে নাচগান শিখিয়ে সিনেমা-সার্কাসে দিয়ে রোজগার করবে ? বল্ না রেবা, তোর পনেরো বছর বয়সে এই মেয়েমানুষ তোকে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের হাতে বিক্রি করতে যায়নি ? ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের সেই বাড়িটা কি ভুলে গেছ ? ভাগ্যি ছিলেন রায়সাহেব । কিছু মনে করো না দিদি, মেয়েটাকে তুমি অনেক প্রকারে নষ্ট করতে চেয়েছিলে । শুধু রেবা কেন, তোমার ঘরের ওই আর্ট গ্যালারির ছবি দেখে আমার স্বভাব চরিত্রও খারাপ হতে বসেছিল ।

রেবা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল । শোভনা ব্যঙ্গোক্তি করলেন, তাই বুঝি লুকিয়ে রায়সাহেবকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলে ?

তা যদি বলো,--ইন্দুমতী বললেন, আজও আঁকড়ে ধরে আছি । যাই হোক দিদি, কিছু মনে করো না—তুমি এ বাড়ির অতিথি । কিন্তু পঁচিশ বছর ধরে নবাবী করে থেকেও এ অতিথি বিদায় নেয় না—এ ঘটনা একটু নতুন ।

শোভনা বললেন, তাহলে আমরা তিনজনেই বা এ বাড়ির কে ?

রেবা জবাব দিল, কেউ না ।

এখানে আমাদের পজিশন কি ?

হাসিমুখে আবার রেবা বলল, নিল্ ।

কিন্তু পঁচিশ বছরে আমার পাওনাটা কি দাঁড়াল ?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে ইন্দুমতী বললেন, ভাত আর কাপড় । এ ছাড়া যা কিছু আদায় করে নিয়েছ, সব দেনা এবার শোধ করে যাও, দিদি ।

শোভনা বললেন, তাহলে রেবাই যা কোন সুবাদে এ বাড়ির সর্বময় কর্তা হয় ? তার চেয়ে আমার অধিকার কিসে কম ?

শান্তকণ্ঠে রেবা জবাব দিয়ে বলল, বাবার সঙ্গে তুমি বোম্বাই গিয়ে এ কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারতে ?

শোভনা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এ কথার জবাব আমার পাওয়াই চাই—আজই, এক্ষুনি চাই—।

টেলিফোন বেজে উঠল। শোভনা গিয়ে ধরলেন। বললেন, হ্যাঁ, আমিই বলছি।

বিলগুলো কি স্যাংশন করাতে পেরেছেন ?

শোভনা বললেন, দেখুন মিস্টার মৈত্র, বিলগুলো নিয়ে কিছু গণ্ডগোল বেধেছে আমাদের মধ্যে। ঠিক বুঝতে পারছিনে আমি—মানে, আমার ঠিক কি করা উচিত—আপনি একটু কথা বলুন মিস রায়ের সঙ্গে।

রেবা গিয়ে রিসিভার ধরে বলল, মিস্টার মৈত্র, আমি এই টাকা দিতে বাধ্য নই। যাঁর নামে বিল তিনিই টাকা দেবেন।

কিন্তু পার্টিরা এবার নালিশ করতে পারে।

যদি নালিশ করে, ডিফেনড্যাণ্ট বুঝবেন।

শোভনা চেঁচিয়ে উঠলেন,—এ কি সর্বনেশে কথা তুই বলছিস ? আমি টাকা কোথায় পাব ?

আচ্ছা নমস্কার—বলে রেবা রিসিভারটি রেখে দিল।

ইন্দুমতী বললেন, তোমার টাকা তুমি পেয়েই যাবে গোঁদিদি, ভয় পাও কেন ? পোশাকপত্তর নিলামে চড়াও ! আর তাতেও যদি না হয়, তোমার আর্ট গ্যালারির সব ছবি বেচে এসো মেথর পাড়ায় ! ভাবনা কি তোমার ?

শোভনা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন বোধ হয় আরেকবার রায়সাহেবকে ধরতে। কিন্তু তার আগে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, এর চরম প্রতিশোধ আমি নিতে জানি, রেবা। বলে রাখছি, আমার দাঁতের ধার তেমনিই আছে ! একদিন সাহেব-মহলে বাজি রেখে এই দাঁত দিয়েই কাঁচা শূয়োরের মাংস টেনে-ছিঁড়ে খেয়েছিলুম !

শোভনা তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। পিছন থেকে ইন্দুমতীর হাসির আওয়াজ বোধ হয় তিনি শুনতে পেলেন না।

হাসি থামলে ইন্দুমতী বললেন, একদিন এ-বাড়ি থেকে আমাকে অপমান করে তাড়াতে ওই মেয়েমানুষ একটুও দ্বিধা করেনি ! তোর কাছে ছিল আমার চাকরি, তোকে নিয়ে সারাদিন থাকতুম, একশ' টাকা মাইনে পেতুম। আমাকে যেদিন তাড়াল, রায়সাহেব সেদিন বিলেতে। আমি বলেছিলুম, রেবা কলেজে

গেছে—ফিরে আসুক, তার সঙ্গে দেখা করে যাব! আমাকে এক মিনিটও থাকতে দেয়নি।

রেবা প্রশ্ন করল, তুমি কী দোষ করেছিলে?

দোষ? দোষ কিছু নয় রে! আমি অনেকদিন ধরে বলছিলুম, দিদি, বাড়িতে তুমি পাঁচজনকে নিয়ে এই যে-সব নেলেল্লাপনা করছ, এতে মেয়েটা কি ভাল থাকবে? আমার মুখের ওপর চেঁচিয়ে উঠল, তুই আমার উদ্দেশ্য কি বুঝিস?—আমি বললুম, বেশ ত', ওকে এম. এস সি পর্যন্ত শেষ করতে দাও। মেয়েটার ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে যে?—আমাকে মারতে এল। বললে, হারামজাদি, আমি বুঝতে পেরেছি, তুইই কোথাকার একটা ছোঁড়াকে ধরে রেবার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিস! তুই বেরো আমার বাড়ি থেকে—এখনই দূর হ!

-ইন্দুমতী জয়ন্তর কথাই উল্লেখ করছিলেন।--

রেবা বলল, আচ্ছা শোনো, এবার তোমার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া হোক। তোমাকে বলব ভাবছিলুম—

বেশ তো—ইন্দুমতী বললেন।

কিছু মনে করো না—রেবা বলল, আমার কথার সোজা উত্তর দাও। মাস্টারির খবরটা এনে তুমি আমাকে খুশী করতে চাইছ,—এ আমি বুঝি, ইন্দুমা। কিন্তু একটা কথা আমার জানা দরকার। তুমি কি বাবার সব দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছ? সত্যি বলো!

ইন্দুমতী নতমুখে বললেন, সেদিনের ঘটনায় আমি খুব লজ্জা পেয়েছিলুম, রেবা—!

রেবা বলল, আমি কিন্তু খুব দুঃখ পাইনি, তোমাকে স্পষ্টই বলছি। আমি তোমার ওসব নীতিকথা বুঝিনে, ইন্দুমা। তা ছাড়া এসব ব্যাপারে যত গোপন করবে, ততই নোংরা ঘুলিয়ে উঠবে। বাবার মন একটু সেকালের, সেজন্য নৈতিক সঙ্কোচ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তুমি এটাকে সামাজিক দুর্নীতি বলে জেনেছ, অথচ এটার প্রতি আসক্তি তোমার যায়নি। কিন্তু এটা যে মানুষের স্বভাবধর্ম—মনে মনে তুমি জান! তা যদি হয়, ভয় কেন পাও, ইন্দুমা? ভয় হল নিজের ওপর অশ্রদ্ধা! আমার কথা এই, তুমি যদি বাবাকে ধরে থাকো তাহলে ছেড়ে দিওনা! বাবা বিরাট ধনী, মস্ত ব্যবসায়ী, দেশের আটশ' পরিবার বাবার কাজ করে সংসার প্রতিপালন করছে। কিন্তু চেয়ে দেখছি বাবা একা, বাবার শান্তি নেই,—বাবার মন কাঁদছে দিনরাত :তাঁর সেই স্ত্রীর জন্য। সেই বাবাকে যদি দেখি, একটু স্নেহ বা একটু সেবার জন্য গা ঢাকা দিয়ে আঁস্তাকুড় পেরিয়ে তোমার ঘরে ঢুকতে,—তখন আমারও মন কাঁদে।

ইন্দুমতী সসঙ্কোচ নতমুখে বললেন, আমি কি করতে পারি বল?

তুমি এ বাড়িতে আঠারো বছর ছিলে, ইন্দুমা। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি আমাকে মানুষ করেছ, বাবা তাই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তুমি আবার ফিরে এসো।

আবার গলাধাক্কা খাবো, সেইজন্যে?

রেবা হাসল এবার। বলল, কাঁচা লোহা পুড়ে পুড়ে ইস্পাত হয়, এ কি তুমি শেখোনি? ভুলে যাচ্ছ ইন্দুমা, আমি আজও ঠিক মানুষ হইনি। এখনও কিছু বাকি। তবে এইটুকু বলি, তোমার জায়গায় তুমি ফিরে এসো, বাবার সকল দায়িত্ব তুমি নাও,—আমি তোমার সব ভার নিচ্ছি। বাবার সামাজিক সম্মানকে তুমি ওভাবে বিপন্ন করো না। এখানে তুমি থাকো, মাসোহারা নাও, নিজের গৌরবের ওপর দাঁড়াও।

ইন্দুমতী বললেন, তোর কাছে সাহস পেলে তিনদিনের মধ্যেই আমি ভবানীপুরের ঘর ছেড়ে চলে আসতে পারি।

রেবা বলল, তোমার ভয়ের পেছনে রয়েছে মনের দুর্বলতা। দুর্নীতির মধ্যে পাপ থাকে না, যদি তার থেকে তুমি পাও নির্মল অনাবিল আনন্দ।

কোন্‌টা পাপ, কেমন করে জানব, রেবা?

অনেকেই জানে না—রেবা বলল, আমিও না। প্রবৃত্তি পাপ, কে বললে? দুষ্প্রবৃত্তি ঠিক কোন্‌টা? লোকে বলবে, বাবা মদ খান, বাবা মাতাল, বাবা চরিত্রহীন। সেদিন তোমাকে ওই অবস্থায় কেউ দেখলে বলত, তুমি অসচ্চরিত্রা। কিন্তু কেন? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষের অনেকেই মদ খেয়েছেন, হয়ত মাতালও হয়েছেন,—তাতে মহাপুরুষ ছোট হননি। মাঝরাত্রে রাজকুমার শাক্যসিংহ তাঁর স্ত্রীর বিছানায় উঠেছেন, পরের কালে তাঁর পক্ষে গৌতম বুদ্ধ হতে বাধেনি। গান্ধীজির স্বীকারোক্তিগুলো পড়ে দেখো, আজ কেউ তাঁকে বলে না চরিত্রহীন। তবে? মেয়ে-পুরুষের আদিম প্রবৃত্তির খেলা দেখে ভয় পাও কেন? কিন্তু অপমানটা কোথায় জান?

ইন্দুমতী মুখ তুললেন।—

রেবা বলল, যেটা অন্ধকার ঘরে খিল-আঁটার আড়ালে থাকে চুপি চুপি, সেটা যখন দিনের আলোয় সকলের মাঝখানে নিজের আবরণ ঘুচিয়ে দাঁড়ায়,—তখন সেটা কদর্য। সামাজিক মন তখনই তাকে ধিক্কার দেয়। তখনই ওঠে সংযম, শালীনতা আর সৎশিক্ষার কথা। আচ্ছা, আর নয়—এবার আমি উঠব, ইন্দুমা।

দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। ইন্দুমতী বললেন, আমি তাহলে এই সামনের বুধবার সকালেই আসব?

রেবা বলল, হ্যাঁ, তাই এস। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।

তুই উপস্থিত থাকবি ?

থাকব।

লাউঞ্জ থেকে বেরোতেই দেখা গেল, শোভনা চুপ করে করিডরে একটি চেয়ারে বসে আছেন। রেবা পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল ইন্দুমতীর সঙ্গে, পিছন থেকে শোভনা ককিয়ে উঠলেন, তোরা সবাই মিলে তাহলে আমাকে জেল খাটাতেই চাস ?

রেবা ফিরে দাঁড়াল। বলল, কেউ চায় না।

তুই যে রায়সাহেবকে কলের পুতুল করে রেখেছিস, এ কি আমি জানতুম। তাও বলি, বাপ তুই পেয়েছিলি কোথায় রে ?

হাসিমুখে রেবা বলল, কিছু জানিনে। শুধু জানি, পরম সৌভাগ্যে বাবাকে পেয়েছিলুম।

সেই সৌভাগ্যের হাতে কে তোকে তুলে দিয়েছিল ?

তাও জানিনে। শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছি, তুমি সৌভাগ্যের হাত থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে বার বার অগাধ জলে ফেলতে চেয়েছিলে। তোমাকে মা বলতে শিখিয়েছিলে আমাকে তোমার নিজের উপার্জনের স্বার্থে। কিন্তু তোমার নোংরা লালসা তোমাকে মা হয়ে উঠতে দেয়নি।—যাক, আর কিছু বলবে ?

শোভনা চুপ করে রইলেন নিরুপায় আত্মগ্লানিতে। রেবা বিলের তাড়াটা শোভনার কোলের উপর ফেলে দিয়ে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হল। ইন্দুমতী ওই ফাঁকে চট করে দু পা পিছিয়ে এলেন। বললেন, তুমি নিজের মান-খাতির রাখতে শেখনি, দিদি। আমি বলি, এক কাজ করো। ভালয়-ভালয় এবার নিজের মহল ছেড়ে ওই আউট-হাউসে গিয়ে ওঠো। গলার ওই আসল মুক্তোর মালা বেচে দিয়ে বাজার থেকে একগাছা দড়ি কিনে আনো।—বলতে বলতে প্রতিশোধপরায়ণা ইন্দুমতী সিঁড়ি দিবে নেমে গেলেন।

হাতী পাঁকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে। শোভনা কঠোর ঘৃণার সঙ্গে ইন্দুমতীর পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটা বাজে।—

রেবা পুনরায় এসে ঢুকল আফিস ঘরে। মৈত্র মহাশয় কাজ সেরে চলে গেছেন। মিঃ সেন রায়সাহেবের সঙ্গে যাবেন সেজন্ত বাড়ি গিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন। এখান থেকেই লাঞ্চ খেয়ে যাবেন।

রেবাকে দেখে রায়সাহেব মুখ তুললেন। রেবা বলল, বাবা, আমি যদি এ বাড়িতে কিছু কিছু নতুন ব্যবস্থা করি, তোমার কি আপত্তি হবে ?

আপত্তি!—রায়সাহেব খুব হেসে উঠলেন। বললেন, বিলক্ষণ! সে কি কথা, মা? নতুন যুগ সামনে এগিয়ে চলে, পুরনো যুগ তার পেছনে-পেছনে যায়।

রেবা একটু থেমে বলল, শোনো বাবা, আমি সিঙ্গী বাগানে একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি আমার চলাফেরার সুবিধের জন্য। ওটা কলকাতার প্রায় মাঝখানে। তুমি রাগ করলে ওটা আমি ছেড়ে দেবো!

হাসিমুখে রায়সাহেব বললেন, একদিন যদি আমাকে নেমন্তন্ন করে ওখানে না খাওয়াও তাহলে ভীষণ রাগ করব, মা।

রেবাও খুব হাসল। তারপর বলল, শোনো বাবা, তোমার সঙ্গে আরেকটা কথাও ছিল—

রায়সাহেব মুখ তুলে কন্যার দিকে তাকালেন।

সাহস করে রেবা আজ বলল, তুমি চিরকাল ব্যবসা-বাণিজ্য করেই বড় হয়েছ বাবা, সেইজন্যেই নিজের জীবনের দিকেও তোমার চোখ পড়েনি, ঘর-গেরস্থালীও গুছিয়ে ওঠেনি!

রায়সাহেব শান্তকণ্ঠে বললেন, তোমার মতন বিদুষী মেয়ে একদিন এই ধরনের নালিশ জানাতে পারে, আমি আন্দাজ করেছিলুম। কিন্তু কি করব বল মা, আজ প্রায় বাইশ বছর হতে চলল, আমার সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলছ? ওটা ত' নিজের চাকা নিজের নিয়মেই ঘোরাচ্ছে। আমি থামলেও ওর চাকা থামবে না। তবে কিনা আমার বাঁচার দরকার ছিল তোমার জন্যে। তুমি লেখাপড়া শিখে বড় হয়েছ, শক্তি অর্জন করেছ,—এই আমার প্রধান সাফল্য।

মানসিক কুণ্ঠা ত্যাগ করে রেবা বলল, বাবা, ইন্দুমা আমাকে আঠারো বছর ধরে এ বাড়িতে বড় করে তুলেছিল। আমি লক্ষ্য করেছি, তার ওপর মস্ত অবিচার ঘটে গেছে। আমি আবার তাকে ফিরিয়ে আনছি আমার নিজেরই জন্য। তুমি যেন কিছু বলো না বাবা।

রেবার বলার ভঙ্গীতে রায়সাহেব হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, তুমি ভয়ে-ভয়ে ভাবছ আমি রাজি হব কিনা, আর আমি ভয়ে-ভয়ে ভাবছি ইন্দুমতী তোমার অনুমতি পাবে কিনা—।

উচ্চ উল্লাসে পিতা ও পুত্রী উভয়েই হেসে উঠলেন।

ইন্দুমতী দাঁড়িয়েছিলেন দরজার ঠিক বাইরে। এবার তিনি ভিতরে এলেন। সামনে এসে বসতেই রায়সাহেব বললেন, ইন্দু, তোমার মনে অনেকদিন আগেকার অনেক আঘাত আছে জানি, কিন্তু রেবার অনুরোধ ঠেলে দিয়ো না। আবার এখানে তুমি ফিরে এসো।

ইন্দুমতী বললেন, আপনাব কথার অবাধ্য আমি হইনি কখনো।

রেবা বলল, আমার জন্যে আর তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, ইন্দুমা। তুমি এ বাড়ির ঘরকন্নাব সব দায়িত্ব নেবে। তুমি নিশ্চয় আসবে বুধবার সকালে। শোনো বাবা, ইন্দুমা আমার জন্যে একটা স্কুলে হেডমাস্টাবি যোগাড করেছে। কিন্তু ওটা আমি নেবো না, ওটা নিতান্তই চাকরি।

হাসিমুখে রায়সাহেব বললেন, তুমি ত' আমাবই হেডমাস্টার। এইটিই ত' তোমার মস্ত চাকবি।

হেসে উঠলেন তিনজনে। রেবা বলল, তার চেযে ভাল, আমার প্রফেসব ডক্টর সেনের সাহায্যে আমি একটা বিসার্চ স্কলারশিপ পাচ্ছি। ওটা নিয়েই আমি ইউনিভারসিটিতে থাকছি।

সকৌতুকে রায়সাহেব বললেন, কথাটা কান পেতে শুনলে, ইন্দু? আমাব মা হলে কি হবে,—তোমাকে একদিন না বলেছিলুম, এ মেয়ের আধখানা হল ছেলে। দেখছ, এব মধ্যে সব দিকের সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

বেবা নতহাস্যে চুপ করে বইল। ইন্দুমতী হাসলেন।

নয়ত কি? বাযসাহেব বললেন, এই মেযেকেই আমি চেযেছিলুম। আমি কখনও ভাবিনি মা, তুমি 'কোম্পানী আইনেব' ওই মস্ত বইখানা মুখস্থ কবেছ। আমি জানতুম না মা, কবে তুমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনেব মূল নীতি নখদর্পণে এনেছ। আজ আমার আর কোনও ভয় নেই।

ইন্দুমতী বললেন, আপনি ওকে আশীবাদ করুন।

আমি।—রায়সাহেব বললেন, তোমাব নিশ্চয মনে আছে ইন্দু, বাইশ বছব আগেকাব সেই মানুষকে—যিনি রেবাকে কোলে তুলে নিয়ে আশীর্বাদ কবে বলেছিলেন, এ মেয়েব চোখে আশ্চয এক ভবিষ্যতেব ছায়া আছে।

ইন্দুমতীর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হযে এল। বললেন, বডদিদিকে কোনও দিনই আমি ভুলতে পারব না।

আমিও ভুলিনি সে কথাটা। সেই বিশ্বাস নিযেই বেবার দিকে চেয়েছিলুম বাইশ বছর ধবে।—এই বলে রাযসাহেব নিজের কাজে আবার মন দিলেন। রেবাব সঙ্গে ইন্দুমতী বেরিযে চলে গেল।

॥ ৭ ॥

যাওয়া আসার পথ থাকবে অবাবিত, এবং বাঁধন থাকবে না কোনও দিক থেকে। সম্পর্কটা সেখানে সহজ। এর বিপরীতটাই হল স্নেহ মোহবন্ধন। জযন্ত এই বন্ধন এডিযে থাকতে চায়। নিজেব প্রাণেব তাডায সে যদি কিছু

আঁকড়িয়ে ধরে ত' ধরুক, কিন্তু অন্য কেউ তাকে না ধরে। তার চারিদিকে যদি সব-থাকে থাক, কিন্তু সে থাক নিষ্কাম। তার বিবাগী ভাবনার মুক্তিবোধ ক্ষুণ্ণ হলে চলবে না! জয়ন্ত বলে, কবির জীবনকে গতিশীল হতে-হবে, সে হবে প্রবহমান, উড্ডীন,—নইলে বদ্ধজলায় তার মৃত্যু।

রেবা একদিন বলেছিল, বদ্ধজলা কাকে বলছ?

বাঃ এই সামান্য কথা বুঝলে না? সুখের বিছানা, আরামের ঘর, সচ্ছল অর্থ, সুস্বাদ খাদ্য, নিবিড় ভালবাসা!—ব্যস, তুমি মরেছ, কবি! মৌমাছি মধু-র মধ্যে ডুবে মরেছে! সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলো কাম্য, কিন্তু জাত-কবির পক্ষে মারাত্মক। ভোরের পাখিরা ক্ষুধায় কাতর থাকে বলেই প্রভাত-পক্ষীর কাকলী এত মধুর! ক্ষুধায় ব্যথায় যন্ত্রণায় দুর্ভাবনায়—যে কবি মানুষ হয়নি, তার আর্তনাদ মিষ্ট হবে কেমন করে?

তোমার কি বিশ্বাস, সাচ্ছল্যের মধ্যে থাকলে উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি হয় না?

জয়ন্ত হেসে বলত, খোঁজ নিয়ে দেখোগে কী নির্লিপ্ত তারা! সকল সাচ্ছল্যের মধ্যে কেঁদেছে তারা আত্মার তাড়নায়, আরামের বিছানায় কাঁটা ফুটেছে তাদের গায়ে, সম্ভোগের প্রাচুর্যের মাঝখানে বসে বুকফাটা আর্তনাদ করেছে আপন কবিতায়! সেইজন্য কবিমাত্রই সন্ন্যাসধর্মী। সে এমন একটা উদার ঐশ্বর্যলোকে বাস করে যেটা স্ব-সম্পূর্ণ। উৎকৃষ্ট কবিতা জন্মায় অস্পৃষ্ট চিত্তের আনন্দ থেকে।

এ তো সেই পুরনো রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর আভাসই দিচ্ছ?

না—জয়ন্ত বলে, কবির আনন্দ অন্য বস্ত। আমি প্রকাশ করছি একটি বিশেষ রিয়েলাইজেশনকে—সেই আমার আনন্দ। আমার পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, মাথার ওপর আচ্ছাদন নেই,—নিন্দায় অপমানে আমার মাথা হেঁট হয়েছে, কলঙ্কে ভরে গেছে আমার সামাজিক জীবন—কিন্তু আমার পরম রিয়েলাইজেশনকে নির্ভুল সত্যে প্রকাশ করতে পেরেছি একটি কবিতায় ওতেই আমার সব ক্ষয়-ক্ষতির পূরণ হয়েছে। ওই আনন্দই আমার সত্য পরিচয়।

উর্ধ্বশ্বাসে রেবা গাড়িখানা ছুটিয়ে দিয়েছিল ফাঁকা রাস্তায়। এখন মধ্যাহ্নকাল, নতুন রাস্তায় ট্রাফিক কম। সে জানে, জয়ন্ত পলাতক নয়, অথবা নিরুদ্দেশে গিয়েও সে আত্মগোপন করেনি। সে কেবল চোখের সামনে থেকে সরে গিয়েছে মাত্র। হয়ত সে এখন কোনও কলেজে ঢুকে প্রফেসর মহলে গল্প জমিয়েছে, নয়ত গিয়ে বসেছে কোনও লাইব্রেরীতে, আর নয়ত রানীপুরে গিয়ে হেমন্তর ওখানে জমে গেছে। কিংবা হতে পারে, সে হয়ত ঘুরছে পথে, জনতার

ভিড়ে, নয়ত কোনও অচেনা সমাজে -যেখানে দাঁড়ালে শোনা যায় মানুষের দৈনন্দিন ভাষা—যার মধ্যে পাওয়া যায় ইতর সাধারণের নিত্যবিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী। জয়ন্ত সেইখান থেকে তুলে আনতে চায় হয়ত তার নিজস্ব কোনও মন্ত্র, হয়ত কোনও নিশার স্বপ্ন, হয়ত বা কোনও নিপপীড়িত মানবআত্মার আর্ত কণ্ঠস্বর।

ঠিক সেই জায়গাটিতে এসে রেবার গাড়ি থামল—যেখানে গন্নাখাঁদার পাইস হোটেল। গাড়ি থেকে নেমে এল রেবা দোকানের সামনে। কাছাকাছি গান্নাখাঁদা নেই, কিন্তু এদিক ওদিক খোঁজ করে পাওয়া গেল তার রান্নার বামুনকে। লোকটা চিনল রেবাকে।

আপনি খুঁজছেন সেই ফর্সাবাবুকে? ওই তো সেই ময়রাদের আটচালায় বাবু থাকত। সেই বাবুই তো?

হ্যাঁ, কোথায় তিনি?

তা তো বলতে পারিনে, দিদি। দিন তিনেক আগে বুঝি একবার সেই বাবুটা এখানে খেতে এসেছিল সন্ধ্যার পর। নতুন-ঝি থাকলে খবরটা আপনাকে দিতে পারত।

নতুন-ঝি কোথায়?

আহারাদির পর লোকটা পান চিবোচ্ছিল। এবার পানের কৌটার চুনসুদ্ধ ডগাটা কামড়িয়ে নিয়ে বলল, বলবেন না তার কথা। সকাল-সন্ধ্যে ফড়িংয়ের মতন গায়ে হাওয়া দিয়ে ঘুরছে। আজকাল বার দুই এসে কেবল ক'খানা বাসন মেজে দিয়ে যায়। দেখছেন না একালে ফাঁকি দিয়ে পয়সা নেবার ফিকির! একবার দেখুন দেখি ওই 'কেলাব-ঘরে' ছুঁড়িকে পান কিনা? ওই যে ভোটন মল্লিকের তাসের আড্ডায়। গমভাঙ্গার কলের পাশে ওই যে কাদাগলি—

ওখানে গেলে কি পাব?

সন্ধ্যের পর হলে ঠিক পেতেন—ছুঁড়ি ওদের মধ্যে ফুরফুরিয়ে বেড়ায়। তবে এখন দুপুরবেলা কিনা—

জয়ন্তর উদ্দেশ পাবার জন্য ছুটতে হবে এক হোটেলের ঠিকে-ঝির পিছনে, এটা অবশ্য আগে রেবা ঠিক অনুমান করেনি। রেবা একটু হাসল। এদিকটা দেখে তবে সে যাবে' জয়ন্তর জ্যাঠামশায়ের ওখানে, কিংবা দর্জিপাড়ায় জয়ন্তর সেই মামাতো মাসির বাড়ি—যদি তার সন্ধান পায়! ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কিছু তার কপালে হয়ত জুটবে কিন্তু তার জন্য রেবা সবসময়ে তৈরি হয়েই আসে। ওতে সে ভয় পায় না।

গাড়িখানা সন্তর্পণে ঘুরিয়ে নিয়ে রেবা কতকটা পথ এগিয়ে চলল। বেশি দূর নয়। গমভাঙ্গার দোকানটা রয়েছে, তবে দুপুরবেলায় মেশিন এখন বন্ধ। ওই দোকানের গায়েই কাদাগলি,—ওই কাদা কখনও শুকোয় না, কেননা আশ-পাশের বস্তির সব নোংরা জল রাতদিন ওখানেই জমা হয়! কিন্তু আনাগোনার জন্য ওখানে কয়েকখানা ইঁট-ফেলা,—তাদেরই ওপর পা ফেলে গলি পেরিয়ে যেতে হয়। যাই হোক, গাড়ি ঢুকবে না এই গলিতে। গাড়িখানা চাবি দিয়ে বন্ধ করে জানলার কাঁচ তুলে দিয়ে রেবা গলিতে ঢুকল। অতি সন্তর্পণে ইঁটের উপর পা ফেলতে গিয়েই একখানা ইঁট নড়ে গিযে পা পড়ল কাদায়! কিন্তু কি আর করা যাবে। রেবা সাবধানে বাকিটুকু পেরিযে গেল।

তারপর শুকনো। বাকিটুকু সহজ। এ অংশটা বস্তির পিছনদিক। ছোট পুরনো একতলা, সামনে চাতাল,—পাশে বোধ হয় ধোবার ঘর। ভাটিতে ময়লা কাপড় চড়াবার একখানা বড় মেটে গামলা অদূরে রয়েছে। রোযাকে উঠতেই সামনে খোলা দরজা। এটা নাকি 'ক্লাব রুম।'

ঘরখানা সরু, কিন্তু লম্বা। বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছিল খানতিনেক পুরনো মাদুর এবং ছোট ছোট দুখানা শতরঞ্চি মেঝের উপর পাতা! ভিতরে এসে ঢুকতেই রেবা একটু অবাক হয়ে গেল। জয়ন্ত পড়ে রযেছে একখানা মাদুরের ওপর। ঘরে অন্য কেউ নেই। অসাড়ে চোখ বুজে রয়েছে জযন্ত।

কিন্তু ওখানেই শেষ নয়, পাশের জানালাটা খোলা ওই কাদাগলিব দিকে। সেই আলোতেই এসেছে মাছির পাল এবং তারা বসেছে জয়ন্তর চোখে মুখে, এমন কি দুই ঠোঁটের মধ্যেও। সম্ভবত জযন্তর বমি মাদুরের একধারে। মাছির ভিড় জমেছে।

রেবা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িযে রইল জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে। প্রথম জানা দরকার, জযন্ত জীবিত আছে কিনা। হ্যাঁ, তা আছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ধুক-ধুকিয়ে। জযন্তর সেই টাইফযেডের কালে রেবা এক একবার চেয়ে দেখত, প্রায় এই প্রকারেরই শঙ্কাজনক একটা অভিব্যক্তি। এ যেন একটা সাধকের শয়ান,—দীর্ঘ ঋজু দেহ যেন পরিনির্বাণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চেয়ে দেখছিল রেবা, জয়ন্তর মুখে চোখে কোনও রুগ্নতা নেই, কিন্তু কেমন একটি কাহিল ভাব দেখা যাচ্ছে।

রেবা সবেমাত্র বসেছে জয়ন্তর পাশে, এবং সবেমাত্র যখন মাছি তাড়াতে আরম্ভ করেছে—সেই সময় সাড়া পেয়ে পিছন ফিরে দেখল, নতুন-ঝি এক বালতি জল ও একটি টিনের মগ নিয়ে ঘরে ঢুকল। এক গাল হেসে নতুন-ঝি বলল, ওমা, দিদি যে? কখন এলে ভাই?

রেবা নিঃসঙ্কোচে হেসে বলল, এইমাত্র এসেছি, বোন।

তা বেশ, আমিও তাই ভাবছিলুম। ওই চেয়ে ভ্যাখো, যত অসৈরন। ভয় নেই দিদি, জ্যান্তই রেখেছি তোমার মরদকে। যা দেখছ এখন, এ তো ভাল। তাড়ির সঙ্গে ইসপিরিট খেয়েছে মিশিয়ে—ওই যে, যে ইসপিরিটে আগুন জ্বালায় গো।

রেবা হাসিমুখেই তাকিয়েছিল।

নতুন ঝি আবার বলল, খাচ্ছে চারদিন ধরে—ওই অসুরকে সামলাকে কে বলো ভাই? বমি করছে আজ তিনদিন। পেটে আর কিচ্ছু নেই। কাল সন্ধ্যেবেলা ওর অবস্থা দেখে 'কেলাব' থেকে সবাই পালাল। যদি কিছু একটা হয়, লাস নেবে তো পুলিশে। সকলের হাতে যে দড়ি পড়বে।

রেবা বলল, তোমার ভয় নেই?

না দিদি, আমার ভয় কিসের? মাতাল ঘাটা তো অভ্যেস আমার।—তরুবালা বলল, আমি বলি, না, সে কি হয়? মানুষের অসময়ে ফেলে পালাব, এ যে মেয়েমানুষের ধম্মে সইবে না। আর তাও বলি দিদি, মানুষটা তো ঠিক মাতাল নয়। কি যেন একটা ভাবতে ভাবতে কি একটা করে বসল।

রেবা বলল, তোমার সন্ধানে তেঁতুল আছে, নতুন ঝি?

তেঁতুল? কেন, দিদি?

তেঁতুল, কিংবা পাতিনেবু?

নতুন ঝি বলল, হ্যাঁ, নেবু আছে বৈকি হোটেলে। বাবুরা সব পাতে খায় যে? আনব?

ওই সঙ্গে একটু নুন, আর খাবার জল।

তরুবালা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মগে করে জল নিয়ে রেবা সকলের আগে জয়ন্তর মাথাটা ধুইয়ে দিল। জলের ভিতরে হাত ডুবিয়ে সেই হাত গায়ে বুলিয়ে সপসপে করল। পা দুটোর ওপর আস্তে আস্তে জল দিল। শাড়ির আঁচলটা জলে ভিজিয়ে বেশ করে মুখখানা মোছাল। জয়ন্ত অসাড়, চেতনাশূন্য—কিন্তু এক সময় ঈষৎ চোখ খুলল নিমীলিতভাবে, সে যেন দেবাদিদেবের ধ্যাননিবিড় দৃষ্টি। জয়ন্ত যেন আপন আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের দিকে চেয়ে রয়েছে। এক সময় আঁচলটি নিংড়ে নাই দিয়েই রেবা হাওয়া দিতে লাগল জয়ন্তর মুখের উপর।

একটু পরেই এসে ঢুকল তরুবালা। ঢাকা একঘটি খাবার জল, একটি কাঁচের গেলাস, চারটি নেবু ও নুন এবং এক খামচা তেঁতুল। বলল, নেবু-তেঁতুল দুটোই পেয়েছি, দিদি—

রেবা ডাকল জয়ন্তকে। আবার ডাকল। আবার। জয়ন্ত একটু সাড়া দেবার চেষ্টা পেল, কিন্তু পারল না। ঘটির ধারালো কানায় পাতিনেবু কেটে সামান্য নুন দিয়ে রেবা ফোঁটা দুই জয়ন্তর জিভের ওপর টিপে দিল। অ্যাসিড পাবামাত্রই জয়ন্ত জিভ নাড়া দিয়ে ঢোক গিলল। রেবা আবার বেশি করে টিপে দিল।

কবি জয়ন্ত ঠিকই সুস্থ হবে। তবে আপাতত দেহটা তার সকল ইন্দ্রিয় সহ অকর্মণ্য। শ্রুতি, মন, চেতনা, শ্বাস—সমস্তই সচেতন আছে! শুধু দেহটা অবাধ্য, কেননা আন্ত্রিক কেন্দ্রটা বিপর্যস্ত। রক্তের সঙ্গে মিশেছে মেথিলেটেড স্পিরিট, তার সঙ্গে তাড়ির মাদক, এবং দুই মিলিয়ে পরিমাণ প্রচুর। কাঁচের গেলাসে এবার কড়া পাকা তেঁতুল গুলে রেবা একটু ঢেলে দিল জয়ন্তর মুখে। জয়ন্ত গিলে ফেলল।

এবার রেবা উঠল। কোমরে আঁচল বাঁধল। এলোচুল ফিরিয়ে বেঁধে নিল। তারপর মগে জল নিয়ে মাদুরের ধার থেকে বমি পরিষ্কার করতে লেগে গেল।

ও কি করছ, দিদি? না ভাই, ও কাজ তোমার নয়। তুমি সরো দিদি, ও তোমায় মানায় না! ওসব আমাদের কাজ, ভাই—

হাসিমুখে রেবা বলল, এ সামান্য কাজ, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, তরুবালা। কাজের কি কোনো ভাগ আছে? সব কাজই সকলের।

জয়ন্ত ধীরে ধীরে চোখ খুলল। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। তরুবালা এক সময় বেরিয়ে গিয়ে ধোবাদের ঘর থেকে একগাছা ঝাঁটা এনে ঘরের একটা দিক ধুয়ে জল বার করে দিল। রেবা সেই ফাঁকে দুখানা হাত ভাল করে ধুয়ে এসে আবার বসল জয়ন্তর এ পাশে। এবার ঘটির কানায় দুটো নেবু কেটে অল্প জলে সবটা টিপে দিয়ে জয়ন্তকে ধীরে ধীরে খাওয়ালো। ওখানেই শেষ হল না। রেবা আরেকবার জয়ন্তর মুখ ও মাথা ধুয়ে দিল।

তোমার হাতঘড়িতে ক'টা বেজেছে, দিদি?

তিনটে বাজে।

এবার আমি যাই, বাসনগুলো মেজে ঘষে দিইগে। চারটেয় তো আবার উনুন জ্বলবে।—বলতে বলতে তরুবালা উঠল।—আবার এসে আমি খবর নিয়ে যাব, দিদি।

ওখানে তুমি কত মাইনে পাও, তরুবালা?

তরুবালা বলল, আঠারো টাকা পেতাম দিদি, তা সামনের মাস থেকে দুটাকা বাড়িয়ে দেবে বলছে।

দাঁড়াও—রেবা মনিব্যাগটি খুলে তিনখানা দশ টাকার নোট বার করে

তরুবালার কাছে ধরল, বলল, তুমি অনেক করেছ তরুবালা, এই সামান্য আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন নিয়ে যাও, বোন।

এত কেন, দিদি? আমি রাখব কোথায়। এ টাকার খোঁজ পেলে খাঁদা বলবে, চুরি করেছিস তুই।

রেবা তার দিকে অবাক হয়ে তাকাল।

তরুবালা বলল, হ্যাঁ দিদি, ঠিকে-ঝিকে বিশ্বাস করে না কেউ। এদিকে আমার প্যাটরা-বাক্সও কিছু নেই। এ অনেক টাকা!

তা হোক, তুমি নিয়ে যাও, তরুবালা।

তরুবালা টাকা নিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রেবা। তারপর সে লক্ষ্য করল, জয়ন্ত ডান হাতখানা সরিয়ে কোমরের কাছে কি যেন অনুভব করতে চাইছে। রেবা তার পাঞ্জাবিটা আলগোছে একটু সরিয়ে দিল। দেখল, ধুতির কষিতে কি যেন একটা গোজা,—ওটাই কোমরে কষ্ট দিচ্ছে। সেটা শিশির মতো। রেবা তার কোমরের কষি উলটিয়ে সেটা বার করে নিল। কি যেন ওষুধ—গোটা দশেক আধ ইঞ্চি লম্বা ক্যাপসিউল রয়েছে একটি প্লাসটিকের কৌটোর মধ্যে। জয়ন্তর মুখের দিকে রেবা তাকাল। শুধু তাড়ির সঙ্গে মেথিলেটেড স্পিরিট নয়,—আরও কিছু। হাসল রেবা।

কবি প্রকৃতির মধ্যে শিশু বাস করে—তার খেয়ালের খেলা কথায় কথায় দরকার। জয়ন্তর কাছে সে শুনেছিল, কবির লেখা সর্বশেষের কবিতাটি তার কাছে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অলিখিত কবিতাটি—যেটি সে ভাবছে এইক্ষণে—সেটি শ্রেষ্ঠতর। যেটি সমাদরের সঙ্গে একদা রচনা করছে, অন্য একদিন অনাদরের সঙ্গে সেটি বর্জিতও হচ্ছে। এ হল সেই শিশুর খেলা। স্রষ্টা সরিয়ে দিচ্ছে পুরনোকে, কেবলই নতুনকে সে আনতে চাইছে। নতুন মানেই প্রগতি,—গতিহীনতাই মৃত্যু।

ঠাণ্ডা জলের হাতখানা রেবা জয়ন্তর কপালে বুলিয়ে দিল।

ঠিক এমনি সময় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল সিঁড়িতে। না, তরুবালা নয়, এ অন্য ব্যক্তি। এর জুতোর শব্দ মসমস করছে। কাছাকাছি এসে লোকটা বলল, ও, আপনি এসেছেন দেখছি। বেশ ভাল করেছেন। বড় অসময়ে এসেছেন আপনি। নমস্কার। আমাকে চিনতে পারলেন না। আমি সেই ফটিক ঘোষ,—সেই যে—

আসুন—রেবা অভ্যর্থনা জানাল।

ফটিকবাবু ঘুরে এসে বসলেন মুখোমুখি জয়ন্তর ওপাশে। বললেন, দেখুন দেখি একবার, আজ পনেরো দিন হতে চলল, সব বন্ধুবান্ধবকে দুঃখ দিচ্ছে! এই মানে—বন্ধু-টন্ধু ওর অবশ্য বিশেষ কেউ নেই। তবে কিনা অনেকেই তো চেনে। এই দেখুন না আমি, কদ্দিন ধরে ছুটছি ওর পেছন-পেছন! সেই আফিংয়ের কারবার করব দু'জনে—কথাটা আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিন্তু জয়ন্তকে বাগ মানানো কি সোজা? ও যেন পশুরাজ। আর আমরা ক'জন নেংটি ইঁদুর ঘুরছি ওর আশেপাশে।

রেবা হাসিমুখে ফটিকবাবুর গল্প শুনছিল।

ফটিকবাবু বললেন, সত্যি বলব, আজও ঠাহর করতে পারিনি, জয়ন্তর কে আছে, আর কে নেই। দেখছেন একবার চেহারাটা? জন্মেছে যেন সিনেমার স্টার! রাজার ছেলে, কি রাখাল রাজা—কিছু বোঝবার উপায় নেই। হঠাৎ সেদিন বসে বলল, ফটিকদা, মরবার সময় মানুষ কি রকম বোধ করে বলো তো? কী হয় তার চেতনায—এ আমার জানবার ইচ্ছে।—আমি ভয়ে ভয়ে বলি, এ আবার তোমার কোন্ দেশী তামাসা হচ্ছে, ভাই? ছি, এসব বলতে নেই। এত বড় বিদ্বান ছেলে তুমি, দশজনের একজন,—এ সব লাইনে তুমি ভাববে কেন? বড় হবে, কাজ-কারবার করবে, বাড়িঘর হাঁকডাবে, ভাল ঘরে বে-থা করবে,—তোমার এসব দুর্মতি কেন, জয়ন্ত?—কিন্তু কে কার কথা শোনে। বললে, ফটিকদা, ভাল লাগছে না। বাঁচাটা যেন একঘেয়ে। আমি তাই নেশায় বুঁদ হতে চাই। এমন নেশা—যা মৃত্যুর তলায নামিয়ে নিয়ে যায়।

হেসে উঠল রেবা। বলল, তারপর?

বলবেন না, বলবেন না রেবা দেবী,—ফটিক বললেন, সেদিনের কথা ভাবলে এখনও আমার গা শিউরে ওঠে। কাল রাত্তিরেও ওর অবস্থা দেখে ক্লাব থেকে সবাই পালিয়ে গেল। কি ভাগ্যি, থানা-পুলিশে কেউ খবর দেয়নি। আজ আমি আবার এসেছি কেন জানেন? ওর পায়ে নাকখৎ দিয়ে ঘাট মানতে! কাজ নেই আমার আফিংয়ের কারবারে। কোন্ দিন একতাল আফিং খেয়ে হয়ত দোকানেই প'ড়ে থাকবে। তখন কি করবে কর।—ও আমার দরকার নেই, রেবা দেবী। এ ছেলে সব মজাবে, আমাকে ঘুঘুর ফাঁদ দেখাবে। শেষ-কালে ছা-পোষা লোক কি জেল খাটব?

রেবা প্রশ্ন করল, কি ব্যাপারটা ঘটেছিল সেদিন?

ভাবতেও ভয় করে। ফটিক বললেন, কী বৃষ্টি সেদিন রাত্রে। তার ওপর

অমাবস্যে ছিল আবার। জয়ন্ত কি যেন খাচ্ছিল সেদিন দুপুরবেলা থেকে। না না, মদ ভাঙ তাড়ি-ফাড়ি নয়। অন্য কিছু। সন্ধ্যেবেলা ক্লাব ঘরে পড়েছিল একেবারে বেহুঁস। রাত্তিরের দিকে হঠাৎ জয়ন্তকে বেরোতে দেখে ওই ছুঁড়ি তরুবালা ওর পিছু নেয়। জয়ন্ত চলল সোজা ওই রেললাইনের দিকে। সেখানে গিয়ে সটান লাইনের ধারে শুয়ে পড়ল। শুধু তাই নয় রেবা দেবী, গলাটা রাখল লাইনের ওপর। ওধারে মুণ্ডু, এধারে ধড়। বৃষ্টিতে তখন সাপের মুখ ছিঁড়ে পড়ছিল। ভেবে দেখুন, তরুবালা সেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে না থাকলে কি ঘটত। কি ভাগ্যি জয়ন্ত বেহুঁস অজ্ঞান ছিল। ওর হাত দু'খানা হিঁচড়ে তরুবালা টেনে এনেছিল এদিকে। আধঘণ্টার মধ্যেই রেলগাড়ি পেরিয়ে গেল। অবিশ্যি বৃষ্টিটা সেদিন কাজে লেগেছিল। জয়ন্ত নিজেই পালিয়ে এল ক্লাব রুমে শেষ রাত্তিরে।

কে তরুবালা? কেউ না,—রেবা ঠিকই জানে। রেবা বা তরুবালা,—কতটুকু এদের মূল্য জয়ন্তর জীবনে? কেউ রেখে যাবে হয়ত কিছু হৃদয়াবেগ, নয়ত কিছু মানবতার দাগ। বিরাট নদ নেমে এসেছে তার উৎস থেকে, খরপ্রবাহ তার বয়ে যাবে একটা নিরুদ্দেশ নির্দিষ্ট পরিণামের দিকে। কখনও আছাড় খাবে পাথরে-পাথরে, কখনও ঘুরের ঘূর্ণীতে,—সে ত' সাময়িক! তীরভূমিতে দাঁড়ালে দেখা যাবে, সেই প্রবাহের ঘূর্ণী মাতনে ধূম্র শিকরকণা উত্তাল আর উচ্ছ্বসিত। সে ত' সৌন্দর্য। কবি তার আপন জীবনের ওপরেই দেখাতে চাইছে করালচক্ষু রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য,—সেই দৃশ্য দেখে ত্রাসগ্রস্ত মানবকের দল হৃৎকম্পমান। কবির জীবন প্রকাশিত হবে তার অভিব্যক্তিতে—সে অভিব্যক্তি সীমা ছাড়িয়ে যাবে দেশকাল পাত্রের,—রেবা-তরুবালা সেখানে সা" রণ সামান্য উপকরণ।

ওই দিন রেবাদেবী—ফটিক ঘোষ এবার সোৎসাহে জয়ন্তর দিকে চেয়ে বললেন, ওই দেখুন, শ্রীমান এবার চোখ খুলছেন। কী সৌভাগ্য আমাদের। দিন না আরো খানিকটা নুন তেঁতুল গুলে খাইয়ে। ওই ওর ওষুধ—বিষে বিষক্ষয়।

রেবা পুনরায় তার জলে ভিজানো হাতখানা জয়ন্তর কপালে বুলিয়ে একটু শুধু হাসল। জয়ন্ত এবার কথা বলার চেষ্টা পা"ছিল। তার সকৌতুক দুটো চক্ষু রেবার দিকে চেয়ে নড়ছিল।

ফটিকবাবু বললেন, আপনার কাছে আমার আবেদন, ওঁকে দয়া করে এখান থেকে নিয়ে যান—

রেবা বলল, কিন্তু আম'র বিশ্বাস, এখানে উনি ভালই আছেন!

অ্যাঁ—অবাক হয়ে তাকালেন ফটিক ঘোষ।

রেবা বলল, এখানকার আকর্ষণ বেশি, সেইজন্যেই ওঁর বেশি ভাল লাগে।

আজ্ঞে, আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না আপনি কি বলছেন!

রেবা একটু হাসল। বলল, উনি তো ঠিক সাধারণের মতন নন। একটু অন্যরকম। উনি একটা কাঁচা জীবন দেখতে চান, যেটা স্পষ্ট বাস্তব আর স্থূল—যার মধ্যে ভেজাল নেই!

ফটিক ঘোষ একবার মাথা চুলকিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, কাঁচা জীবন! মানে, আমি ঠিক—

ব্যস্ত হবেন না—রেবা বলল, এসব কথা অনেকেই একটু দেরিতে বোঝেন! কি জানেন, বাইরের পালিশটা ত' খোসা ছাড়া কিছু নয়, সেইজন্য উনি চান একেবারে ভেতরের শাঁসের মধ্যে পৌঁছতে। এই কারণেই ওঁর পক্ষে এইসব পাড়া-পল্লী দরকার!

এই পাঁদাড়-বস্তি,—এসব ওর দরকার বলছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ—রেবা সবিনয়ে বলল, ধরুন, এই যে কাদাগলি, পাঁকের গন্ধ, নোংরা নর্দমা, গন্নাখাঁদার পাইস-হোটেলের ভাত, হাটতলার ওই কুষ্ঠরোগীরা, পচা চামড়ার কারখানা, ভোটন মল্লিকের মাতলামি, তরুবালার ওই চাপা আসক্তিটুকু—এসব ওঁর দরকার। সব মিলিয়েই উনি।

ঈষৎ উত্তেজনা ও বিরক্তির সঙ্গে ফটিকবাবু বললেন, বার বার ওর সুইসাইডের চেষ্টাও কি দরকার?

শান্ত হাস্যে রেবা শুধু বলল, খুব সম্ভব এই চেষ্টার মধ্যে উনি আনন্দ পান।

আপনি কি তাহলে জয়ন্তকে এই ভাগাড়ের মধ্যেই ফেলে যেতে চান?

আমি তাই স্থির করেছি! রেবা জবাব দিল।

ফটিক ঘোষ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ক্ষমা করবেন, রেবা দেবী। এসব আমরা শুনিনি কখনো। লেখাপড়া জানা জগতের শেষ খবর আমি রাখিনে। আমি নিজে নন-ম্যাট্রিক। ছা-পোষা লোক আমি, নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করে পেট চালাই। এখন দেখছি আপনাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে আমারও হাতে দড়ি পড়বে। জয়ন্ত যদি থাকে এখানে আমি আর এ পাড়ায় ঢুকব না। আচ্ছা আমাকে এবার বিদায় দিন। নমস্কার।

রেবা হাসিমুখে চেয়ে ফটিকবাবুকে লক্ষ্য করছিল।

কয়েক পা গিয়ে ফটিকবাবু আবার ফিরলেন। বললেন, হ্যাঁ, আরেক কথা। আপনি নিশ্চয়ই জয়ন্তর মঙ্গল কামনাই করেন, আমার বিশ্বাস। কিন্তু মেয়েছেলের মুখে এ ধরনের কথা কখনও শুনিনি। বরং তরুবালাদের উদ্দেশ্য বুঝতে আমার

দেরি হয় না, কিন্তু—ক্ষমা করবেন, আপনি আজ বাদে কাল জয়ন্তর স্ত্রী হতে চলেছেন—

রেবা বলল, আজ বাদে কাল নয়,—চিরকাল।

কিন্তু এখানে এই কুৎসিত জীবনের মধ্যে যদি জয়ন্তর কোনও দুরারোগ্য নোংরা রোগ হয়? আমি এককালে সিনেমা-থিয়েটারে কাজ করে এসব জেনেছি রেবাদেবী। আপনি ওর স্ত্রী হয়ে কেমন ক'রে এসব— ?

হাসিমুখে রেবা বলল, আপনি ওঁর সত্যই মঙ্গলকামী, আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাই। তবে কি জানেন, ওরকম অসুখ-বিসুখ যদি ওঁর কখনও হয়, তাহলে বুঝব, নোংরা রোগ ওঁর পক্ষে দরকার ছিল।

অ্যাঁ,—ফটিক থমকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মুখগহ্বর আর বন্ধ হল না। কয়েক পলক মাত্র, তারপরই তিনি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে একপ্রকার ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

হোটেলের কাজ সেরে তরুবালা হনহনিয়ে ফিরছিল। ফটিকবাবু মাঝপথে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন, যাসনে, যাসনে মাগি তুই ওদের মধ্যে -বেঘোরে মরবি—।

তরুবালা বাঁকা কটাক্ষে বলল, কেন, মরব কেন?

ওদের একটা হ'ল কালি গোখরো অন্যটা কাল কেউটে।—দেখবি তখন, কোমরে দড়ি বেঁধে যখন নিয়ে যাবে হিঁচড়িয়ে।

ফটিকবাবু চলে যাচ্ছিলেন। পিছন থেকে তরুবালা বলল, মোটামুটি কিছু বাগিয়ে নিতে পারনি বুঝি? তাই এত রাগ—।

ততক্ষণে ফটিকবাবু অনেকটা এগিয়ে গেছেন।

তরুবালা এসে ঘরে ঢুকল। মুখে চোখে তার উদ্বেগ। ঘরে ঢুকে সে দেখল, জয়ন্ত ধীরে ধীরে কথা বলছে রেবার সঙ্গে।

উনি কেমন আছেন, দিদি?

রেবা বলল, ভাল, উনি যেতে চাইছেন এবার আমার সঙ্গে।

সে ত' একশবার। তোমার জন্যেই উনি অপেক্ষা করছিলেন।—তরুবালা বলল, পুরুষ ছেলে বড্ড অভিমানী, দিদি। ভাবতে ভাবতে আসছিলুম, তুমি হয়ত কিছু বলেছিলে, হয়ত সেটা ওর সহ্য হয়নি

তুমি ওঁকে বাঁচিয়েছ, তরুবালা।

আমি? রাম বলো। আমি কে, দিদি? ঠাকুরই ওঁকে রক্ষে করেছেন। আমি কেন বাহাদুরি নেবো? উনি বেঁচেছেন তোমার শাঁখা সিঁদুরের জোরে।

হাসিমুখে রেবা বলল, ও দুটোই আমার নেই, তরুবালা।

নেই।—তরুবালা বলল, কে বললে? ও ঠিকই আছে, তুমি দেখতে পাওনি দিদি। আমি যদি না দেখে থাকি, আমার জন্মই মিথ্যে। তুমি সতী-সাবিত্রী—।

রেবা এবার উঠে দাঁড়াল। গলায় ছিল তার একগাছা চেন হার। সেইটি খুলে নিয়ে সে বলল, এসো বোন—

ব্যস্ত হয়ে তরুবালা বলল, এ যে অনেক দিচ্ছ দিদি বার বার। আমি কিন্তু কিচ্ছু চাইনি—

মেয়েমানুষকে চাইতে হয় না ভাই, নিজের গুণে তারা পায়—এই বলে রেবা ছোট লকেটসুদ্ধ চেন-হারটি তরুবালার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলল, তোমার আরও পাওনা রইল, আমি মনে রাখব।

তরুবালা আভূমি নত হয়ে জয়ন্ত ও রেবাকে প্রণাম করল।

সজ্ঞানে জয়ন্ত এবার হাসছিল। আস্তে আস্তে জড়িয়ে সে বলল, নাটক কিন্তু জমল না। বেশ ঘুম এসেছিল।

হাসিমুখে রেবা বলল, এবার উঠতে পারবে?

নিশ্চয়। যে শক্তি ফেলেছে সেই শক্তিই তুলবে। এবার যাব তোমার সঙ্গে যেখানে বলবে।

হেঁটে যাবে তো?

নিশ্চয়।—জয়ন্ত জড়িত কণ্ঠে বলল, যে হাঁটে কেউ না-কেউ তার হাত ধরে।

রেবা খুব হেসে বলল, তোমার হাত কে ধরবে?

নিবিড় গভীর স্বরে জয়ন্ত বলল, আজও তাকে না, চিনিনে।

নিজের চেষ্টাতেই এক সময় জয়ন্ত উঠে বসল। তরুবালা বলল, একটু না ধরলে উনি কি হাঁটতে পারবেন, দিদি?

রেবা বলল, ঠিক পারবেন, দেখো না।

কিন্তু নেশায় যে টলছেন উনি।

নেশা নয়, ভাই, ও এক রকমের যোগ। ওটাই ওঁর অভিজ্ঞতা।

তরুবালা বলল, ধোবার উঠোনের ভেতর দিয়ে চলো দিদি, নইলে তোমার পায়ে আবার কাদা লাগবে।

রেবা ওর থুতনি নেড়ে দিয়ে বলল, বেশ, তাই যাব।—নাও, এবার ওঠো জয়ন্ত, আমার খিদে লেগেছে।

জয়ন্ত দেওয়াল ধরে-ধরে উঠল এবার হাসিমুখে। তারপর ওইভাবেই অন্য দরজাটার দিকে অগ্রসর হল। এ ঘরে জয়ন্তর পার্থিব সম্পত্তির মধ্যে কেবল

একপাশে প'ড়ে রয়েছে সেই বছর তিনেক আগেকার কেনা ছিন্নভিন্ন স্যাণ্ডাল জোড়াটা—যার ফিতেগুলোর বাঁধন আর নেই। রেবা এগিয়ে গিয়ে সেই ছেঁড়া চটি তুলতেই তরুবালা হাঁ হাঁ করে উঠল,—ফেলে দাও দিদি, ফেলে দাও—পাঁক মাখা পুরনো ছেঁড়া চামড়া,—কী আছে ওতে?

জয়ন্ত টলতে টলতে হাসল। রেবাও হাসিমুখে বলল, তুমি ত' জান না তরুবালা, এই চটি সামনে না থাকলে উনি কোনও কাজই করতে পারবেন না। এই চটির সঙ্গে মিলিয়ে থাকবে এখানকার জীবনের ইতিহাস,—এটা ওর চাই।

হতবাক তরুবালার সামনে দিয়ে ওরা দুজন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ধোবার উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় এসে নামল। সন্ধ্যা হতে তখন আর দেরি নেই।

গাড়ির দরজার চাবি খুলে দিল রেবা। জয়ন্ত উঠে বসল। তরুবালার কাছে বিদায় নিয়ে অতঃপর রেবা গাড়িতে উঠে চাবি খুলে স্টার্ট দিল। গাড়ি চলল গলি পথে। পিছনে পড়ে রইল শুধু দুটো চোখ। ঈর্ষা ছিল না সে-চোখে, ছিল শ্রদ্ধা। নৈরাশ্য ছিল না, ছিল দারিদ্র্যের করুণা। বেদনাবোধ ছিল না, ছিল এক উৎপীড়িতা হতমানার আত্মানুশোচনা।

একাকিনী দাঁড়িয়ে তরুবালার দুই চোখে অহেতুক কান্না এল।

টিনের বাক্সটি যথাসময়ে সিঙ্গীবাগানের ফ্ল্যাটে শচীনের সাহায্যে পৌঁছিয়ে গিয়েছিল। ওর মধ্যে গুছিয়ে রাখা ছিল ধোপদস্ত ধুতি, একটি গেঞ্জি আর পাঞ্জাবি। যে অবস্থায় এবং যে পরিচ্ছদে জয়ন্ত ফ্ল্যাটে এসে ঘণ্টা তিনেক আগে পৌঁছেছে, মাধো সিংয়ের কাছে সে-দৃশ্য অভিনব। পরিষ্কার দিনের আলো থাকলে হয়ত একটু অসুবিধাই হতো।

স্নানাদি সেরে জয়ন্ত সুস্থ হয়ে যখন ঘরে এসে দাঁড়াল, রাত তখন প্রায় দশটা। রেবাকেও স্নান করতে হয়েছিল পরে। জয়ন্ত বলল, তোমার লজ্জা-সঙ্কোচ বরাবরই কম। এমন কথা কোথাও শুনিনি যে, মেয়েছেলে হয়ে পুরুষ মানুষকে চান করিয়ে দেয়। তুমি অবাক করলে।

টেবলের ওপর নানা সুভোজ্য থরে থরে সাজানো। রেবা সেই দিকে একবার তাকিয়ে জয়ন্তর প্রতি মুখ ফেরালো। জয়ন্ত কাহিল হয়েছে, কিন্তু শ্রীহীন হয়নি। হাসিমুখে রেবা জবাব দিল, তুমি পুরুষ মানুষ—এ আমার মনে ছিল না। আমি কবিকে নাইয়ে ধুইয়ে তুলছিলুম।

জয়ন্তর কথায় তখনও কিছু জড়তা ছিল। সে নিজেই টেবলের সামনে খেতে বসে গেল। রেবা কাঁচের একখানা ডিস সামনে এগিয়ে দিল। বড় চামচ দিয়ে নিজেই জয়ন্ত গরম ভাত ডিসে তুলে নিল। মাছ ভাজা ছিল সামনেই।

পাশের পাত্রে মাংসের স্টু। কাটা টমাটো আর পেঁয়াজ। হাতের কাছে কাটা নেবু। ঘন মুগের ডালের সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কপি সিদ্ধ রয়েছে পাশে। আমের চাটনি, নেবুর আচার, আদার কুচি আর কাঁচালঙ্কা।

জয়ন্তর ক্ষুধা পেয়েছিল প্রচুর।

আরে!—জয়ন্ত চেঁচিয়ে উঠল,—আমি একাই খাচ্ছি? তুমি? ছি ছি, আমাকে ক্ষমা করো, রেবা।

জয়ন্ত নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে ডিস এগিয়ে দিল রেবার মুখের সামনে, এবং সেই ডিসের ওপর একে একে প্রত্যেকটি সামগ্রী পরিবেশন করল। হাসিমুখে রেবা চুপ করে আগাগোড়া লক্ষ্য করছিল। জয়ন্ত এতক্ষণে অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। রেবা নিঃশব্দে খেতে বসল।

এক সময়ে জয়ন্ত বলল, শচীন বুঝি এখানেও এসে রান্না করছে?

কেন, ভাল লাগছে না?

সলজ্জ কুণ্ঠার সঙ্গে হেসে জয়ন্ত বলল, না না, চমৎকার খাচ্ছি। মনে হচ্ছে জীবনে এই প্রথম ভাল খাবার মুখে তুললুম।

রেবা আর কথা বাড়ালো না। কেননা জয়ন্তর বিশ্রামের ফাঁকে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে রেবা এগুলো নিজেই করে নিয়েছে। এক সময় মুখ তুলে সে বলল, নতুন জায়গায় কেমন লাগছে, জয়ন্ত?

এই তো বেশ—জয়ন্ত বলল, এ যেন সবই নাগালের মধ্যে। তুমি যেন ছড়িয়ে ছিলে এতদিন, এবার গুটিয়ে এনেছ! এই ভাল।

জয়ন্তর এখনও ঘুম দরকার। রেবা চুপ করে গেল।

আহারাদির পর জয়ন্ত গিয়ে শান্তভাবে বিছানায় উঠল। রেবা সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরে আলোটা জ্বলছে। জয়ন্ত তন্দ্রাতুর চোখে হেসে বলল, আরেকটু কাছে এসো।

রেবা তার হাতের কাছে গিয়ে হাসিমুখে দাঁড়াল। জয়ন্ত মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল, তুমি কে আমার?

কেউ না। তোমার হাজার-হাজার অনুরাগীদের মধ্যে আমি একজন।

এত কাছে এসেছ, ভয় করে না তোমার?

রেবা মধুর হাসি হেসে বলল, কই এলুম কাছে? কেনই বা ভয় করবে?

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে গেল জয়ন্ত। এক সময় বলল, হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দাও।

রেবা সুইচ বন্ধ করে দিল। জয়ন্ত বলল, ছ'বছরের মধ্যে একদিনও কি তোমার ভয় করেনি?

রেবা শান্ত কণ্ঠে বলল, এক সেকেণ্ডের জন্যও ভয় করেনি।

কেন? তুমি কি মেয়ে নও?

হেসে ফেলল রেবা। বলল, বোধ হয় একটু বেশি রকম মেয়ে।

জয়ন্ত বলল, বলতে পার, কেন তুমি সেই ক্যাম্পের রাত্রে কালো গাউন পরে ঢুকেছিলে? তোমার আনগ্ন বাসনার অগ্নিশ্বাসে কেন আমাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলে?

ওঃ এই।—হেসে উঠল রেবা।—কী সামান্য কথা। মনে নেই, তোমার কবিতায় তন্ত্রসাধনার সঙ্কেত ছিল? আমার দেহ হয়ত তোমার কাজে লাগত, তাই গিয়েছিলুম তোমার ঘরে।

তন্দ্রা আসছিল জয়ন্তর চোখে। চোখ ছাড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে সে বলল, হয়ত থাকতে পারে হাজার হাজার অনুরাগী। কিন্তু অন্য কেউ তো এগিয়ে আসেনি।

রেবা বলল, বোধ হয় তোমার কবিতার থেকে একমাত্র আমারই জন্ম সম্ভব হয়েছে।

তুমি কি স্বামী চাও না?

স্বামী কেমন জানিনে। তুমি যা চাইবে আমি তাই। তোমাকে জানব, সেই আমার জীবন।

জয়ন্ত হঠাৎ অধীর কণ্ঠে বলে' উঠল, রেবা তুমি ছ'বছরেও জানতে দাওনি, আমি তোমার কে। কে আমি। কী আমি।

রেবার বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই। সে শান্ত মধুর কণ্ঠে বলল, বিশ্বাস করো জয়ন্ত, তুমি পুরুষ আর আমি মেয়ে—এই বোধের মধ্যে আজও তোমাকে ধরিনি। তুমি কোনওদিন আগুন হয়ে উঠলে আমি লোহার টুকরোর মতনই গলে যেতুম। তোমার কাছে এই আমি দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে, কিন্তু আজও বিশ্বাস করো, আমার শরীরের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নেই। কেন জান জয়ন্ত, আমার শিরা-উপশিরার অচ্ছেদ্য বাঁধনে তুমি ভাসছ দিনরাত,—আমার বায়লজির সঙ্গে তুমি বিলীন। আমার হৃৎপিণ্ডের আর্টারির মধ্যে তুমিই বসে' আছ মুগুর হাতে নিয়ে। ওই মুগুরের ঘায়ে ঠুকঠুক করে তুমি গুনছ মহাকালের প্রতি পল,—আমি তারই স্পন্দন শুনি দিনরাত। জয়ন্ত, তুমি সিংহাসন পেতেছ আমার সত্তায়।

প্রশ্নকর্তা চুপ করে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়েছিল জয়ন্ত। রেবা সরে এসে নেট-এর মশারিটি ফেলে গুঁজে দিল চারদিকে। বাইরে গিয়ে একবার

দেখে এল, মাধো সিং তার সব কাজকর্ম সেরে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে। রেবা ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে দিল, এবং ফিরে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পডল।

রাত বারোটা বেজে গেছে।—

॥ ৮ ॥

প্রভাতকালে জয়ন্ত হাসিমুখে সামনে এসে দাঁডাল। ততক্ষণে রেবা প্রাত-রাশের সামগ্রী প্রস্তুত করে ফেলেছে। টোস্ট, পোচ, কড়াইশুঁটি সিদ্ধ, কফির জন্ত দুধ ফুটনো, গোটা কয়েক আলুর চপ—মোটামুটি এই। সামনে মাখন, চীজের চাকলা, এবং বোতলে আপেলের জুস। মর্তমান কলা হাতের কাছে।

জয়ন্ত হেসে বলল, মাঝে মাঝে কেন যে উডনচুড়ে হই, বুঝিনে। ভাবছি এবার থেকে তোমার বাধ্য হয়ে চলব। খামোকা একমাস মিথ্যে কষ্ট পেলুম।

রেবা ফ্রীজ খুলে এটা রাখল, ওটা বার করল। তারপর বলল, না না, কোন কষ্টই মিথ্যে নয়। এ সবই হ'ল অভিজ্ঞতা, সবই তোমার কাজে লাগবে।

মাদকের আবিলতা জয়ন্তর কেটে গেছে। সে যেন নতুন করে জাগল, নতুন প্রভাত এল তার সামনে। আকাশ এত নীল হযনি আগে, প্রভাতের প্রথম আলো এমন করে রেবার রেশমি চুলের গোছায আগে পডেনি।

সে বলল, তুমি একা সব করছ কেন, রেবা? আমিও কিছু করি? দাও না কিছু হাতের কাজ।

ওতে কি তুমি আনন্দ পাবে?

বাঃ, যেখানে তুমি আর আমি—সেখানে সবই ত' আনন্দ। এবার দেখে বেড়াই একটু ফ্ল্যাটের ভেতরটা। বাঃ একেবারে আনকোরা। যেখানে যেটি দরকার সব। বারান্দা-বাথরুম এমন সুন্দর হয়। সব চেয়ে আনন্দ, আমরা একদম স্বাধীন। জানো রেবা, আমি এমনি একটা সুন্দর ফ্ল্যাট চিরকাল ভেবে এসেছি। সবাই চারিদিকে থাকবে গায়ে গায়ে। কিন্তু একটি দরজা বন্ধ করলেই পৃথিবী আমার নিজস্ব। আমি অবাক হচ্ছি, তুমি এমন করে আমার জন্তে ভেবেছ। কে বললে, বড়লোকের মেয়েরা অকেজো, তা'রা শুধু বিলাস নিয়ে থাকে, শুধু সাজানো পুতুল—? সব মিথ্যে কথা।

রেবা হেসে বলল, তুমি কি ঠাণ্ডা খাবার ভালবাসো?

না না, নিশ্চয়ই না—জয়ন্ত বলল, এসো, বসি দুজনে। ইস, কত করেছ বল তো। শেষ রাত্রে বুঝি সুরু করেছিলে। আচ্ছা দেখো, বছর খানেক থেকে মনে হচ্ছে আমি তোমাকে কষ্টই দিচ্ছি কেবল। তোমার মনে হচ্ছে কি, কষ্ট দিচ্ছি?

কই না ?—রেবা জবাব দিল।

ওই দেখো, তুমি কিচ্ছু বুঝতে পার না। তোমার চেতনা আগে বেশ ধারালো ছিল, এখন যেন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে ! তুমি ত' প্রেমে পড়নি যে, বোকা হবে ? আচ্ছা, তুমি যে সব ছেড়ে এখানে এসে রইলে,—কই, তোমার ত' কোনও ভাবান্তর নেই ?

দুজনে খেতে বসেছিল।

রেবা হাসল, বলল, ওসব সামান্য ব্যাপারে তুমি মন দিয়ো না, জয়ন্ত। শোন, দিন কয়েক আগে হেমন্ত একখানা চিঠি দিয়েছে আমাকে। তোমার খবর অনেকদিন ওরা পায়নি, তুমি কেমন আছ, কোথায় আছ, মা তোমার জন্য ভাবছেন—এই সব।

চিঠির জবাব দিয়েছ ?

তুমি বললে তবে দেবো।

জয়ন্ত বলল, লিখে দাও আমার চেয়ে সুখী আর স্বাস্থ্যবান কলকাতায় আপাতত কেউ নেই। ওই সঙ্গে লেখো, আমি আছি এক আশ্চর্য জগতে। আমার জন্যে এক অমরাবতী সৃষ্টি করেছে কোটিপতির এক মেয়ে—দেবতার এক দূতী—

রেবা বলল, না না, সত্যি তামাসা নয়, জয়ন্ত। ওরা খুব ভাবছে। আর তা ছাড়া এ ফ্ল্যাট তোমারই নামে। এর মালিক তুমি।

আমি ? কেমন করে ?

বাঃ তুমি যে গচ্ছিত রেখেছিলে আমার কাছে তোমার টুইশনির টাকা ?

জয়ন্ত বলল, সে-টাকায় এত হয় ?

এর চেয়েও বেশি হয়।—রেবা বলল, পাঁচ হাজার টাকার চাকা ঘুরিয়ে যদি পাঁচ লাখ করা যায়, তাহলে তোমার দুশ টাকা বিশ হাজারে উঠবে না কেন ? তুমি একটু ব্যবসা-বাণিজ্য শেখো, জয়ন্ত।

একালের বাজারে কথাটা যুক্তিহীন নয়। জয়ন্ত খুশী হয়ে খেতে লাগল। পরে বলল, মেয়েছেলে সমেত সাজানো একটি ফ্ল্যাট পেয়ে গেলুম কপাল গুণে! আচ্ছা, তুমিও কি ওই দুশ' টাকার মধ্যে এসেছ ?

শোনো কথা। আমার দাম আর কতটুকু।—রেবা হেসে ফেলল,—ল্যাবরেটরিতে নিয়ে আমাকে গলিয়ে ফেল,—দেখবে ক্যালসিয়াম ফসফোরাস—আর দু' একটা পদার্থ। ওজনে হয়ত সের দুই। দাম গোটা পাঁচেক টাকা।

সুন্দর ও মধুর সকালের সঙ্গে ওদের হাসি-পরিহাস মিলে গেছে। ওদের ঝরঝরে ঘরকন্নাটা আজ আনন্দে মুখর। কিন্তু সব মিলিয়ে যেন এক আশ্চর্য

অনিশ্চয়তা। কতটুকু কাল টিঁকে থাকবে এই ঘরকন্না, ওরা জানে না। এ যেন পরম সুন্দর এক রঙ্গীন তাসের ঘর—সামান্য একটু হাওয়ার অপেক্ষা, একটু ফুৎকার,—অমনি উড়ে যাবে সব তাস। সংসার মানে জন্মপরম্পরা, সমাজ মানে পারম্পরিক বিবাহপরম্পরা, জীবন মানে অজ্ঞান-রচিত কতগুলি জটিল সমস্যার একটা বাণ্ডিল। দেশের সর্বত্র বেড়ে গিয়েছে ভালবাসা, নচেৎ জন্মসংখ্যা এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় কেন? চারিদিকে যত দুর্গতি বেড়েছে, মেয়েরা ততই হয়ে উঠেছে কামাতুরা। নির্বোধ পুরুষের কাছ থেকে কোনও মতে একটি শিশু সন্তান আদায় করা—মূঢ় স্ত্রীলোকের পাল নিত্য এই কর্মে লিপ্ত। বিছানায় গিয়ে শু'লো রমণী,—বিছানা ছেড়ে উঠল জননী।

ওদের এই স্বচ্ছ আনন্দের মধ্যে কোনও দায় দায়িত্ব নেই, কেউ কারও বন্ধনের মধ্যে নেই,—উভয়ের যাওযা-আসার পথ খোলা।

জয়ন্ত প্রায় ঘুমিয়ে রইল দিন কয়েক। তার মুখে চোখে সুখ এবং স্বস্তির একটা নিবিড়তা লক্ষ্য করে রেবা নিশ্চিন্ত ছিল। নিচের তলায় গ্যারাজে রেখেছে তার গাড়ি, দরকার মতো সে ঘুরে আসছে তার কাজ সেরে। রিসার্চ স্কলারশিপটা সে পেয়ে যাবে শীঘ্রই, সুতরাং ইন্দুমতীর দরুন সেই মাস্টারিটা তার না নিলেও চলবে। মিঃ মৈত্র এখানে এসেছিলেন কয়েকবার, তাঁর কাজ সেরে চলে গেছেন। রায়সাহেব আজকাল আর বিশেষ সই সাবুদও করেন না। রেবার উপর প্রায় সব দায়িত্বই ছেড়েছেন।

একদিন জয়ন্ত ধরে বসল,—না রেবা আমার জন্য এত পরিশ্রম তোমাকে করতে দেবো না। তোমার সঙ্গে আমিও থাকব।

বেশ ত'—রেবা জবাব দিল।

জয়ন্ত বলল, আমাদের সমান দায়িত্ব থাকবে ঘরকন্নায়। তুমি খাবার তৈরি করবে, আমি বাসন ধোব। তুমি ঘর-দোর ঝাড়বে, আমি বিছানাপত্র দেখব।

রেবা বলল, এ তুমি যা বলছ, দুজনের পক্ষেই এসব সামান্য কাজ। এ-সব সারতে দুজনের পক্ষে দু'ঘণ্টা করে দৈনিক সময় লাগে।

জয়ন্ত বলল, আমি বাজার করব, রেশন আনব।

ওগুলো ত' শচীনের হাত।

তা বটে। জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু হাট-বাজারে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে না ঢুকলে আমার চলবে কেন? রেশনের দোকানে কিউ দিয়ে না দাঁড়ালে কেমন করে টের পাব কাকে বলে আক্রোশ আর অসন্তোষ। আমার মনে হয় শচীনের কাজগুলো আমারই করা উচিত। আরেক কথা—

রেবা তার দিকে তাকাল।

জয়ন্ত বলল, মাধো সিং রয়েছে কেন? ও ছোঁড়াটার কী কাজ? দারোয়ান, না চাকর?

হু-ই। ওর কাজ ফাই-ফরমাস খাটা!—রেবা বলল, অন্তত একজন না থাকলে কি তোমার চলবে? ধরো, দুজনেই আমরা বেড়াতে বেরলুম—

জয়ন্ত আর কিছু বলল না। বেতের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বারান্দায় বসল। তারপর হাসিমুখে বলল, আচ্ছা, রেবা, ধরো যদি আমাদের বিয়ে হয়? তখন তুমি কি করবে?

দাঁড়াও, একটু ভেবে নিই—এই বলে রেবা অন্য চেয়ারটি নিয়ে জয়ন্তর মুখোমুখি বসল। তারপর সহাস্যে বলল, তখন তোমাকে গলা টিপে বাজারে পাঠাব, মুদি-মসলার দোকানে ছোটাব, রাত থাকতে তুলে দুধের ক্যানটিনে কিউতে দাঁড় করাব, রেশন আনাব দুই হাতে থলি দিয়ে। তারপর ধরো যদি দু একটা কাচ্চা-বাচ্চা হয়, আর যদি তারা কাঁদুনে হয়—তখন তুমি তাদের নিয়ে ভুলিয়ে রাখবে, আর আমি কুটনো-বাটনা-রান্না বাসনমাজা-কয়লা ভাঙা সাবান কাচা-ঘরধোয়া নিয়ে থাকব! তারপর আরও আছে—

কি?

বাঃ বিয়ে-করা জীবন যে! রেবা বলল, সব কাজ সেরে রাত্তিরে ঘরে ঢোকা! একটা বাচ্চা ভুগছে, অন্যটা ঘ্যান-ঘ্যান করছে! পরনে রান্না-করা দাগলাগা কাপড়, হাত দুখানায় রান্নার গন্ধ! তখনও স্বামীর পরিচর্যা বাকি! দেখতে দেখতে কবে যেন তৃতীয় সন্তানটি আসন্ন হয়ে এল। আরেক বোতল দুধের খরচ বাড়ল।

এ-সব শুনলে ঘেন্না করে। তুমি এত জানলে কোত্থেকে?—জয়ন্ত প্রশ্ন করল।

মেয়েছেলের চোখ জয়ন্ত!

জয়ন্ত অনেকক্ষণ চুপ করে রইল! সন্দেহ নেই, বিয়ে মানে একালে বিশেষ অবস্থার দাসত্ব। সন্তান মানে দুঃখ ও সমস্যা।

রেবা এক সময় উঠে গিয়ে ফ্লাস্ক থেকে অল্প অল্প কফি ঢেলে নিয়ে এল দুই পেয়ালায়! সেই পেয়ালায় চুমুক দিয়ে জয়ন্ত বলল, রেবা, তোমাকে আমি আজও একটু ভালবাসতে পারছিনে, কেন বলো তো? তোমার কী মনে হয়?

রেবা হাসল। বলল, ওটা ফুল ফোটার মতন, জয়ন্ত! মাটির অনেক নিচের থেকে একটা নিশ্বাস ওঠে ওপর দিকে। অনেক পথ, অনেক অলিগলি

ডালপালা শেকড়-মাকড় তাকে পেরিয়ে আসতে হয়। তারপর সেই শক্তি ধরায় কুঁড়ি, একদিন সেই কুঁড়ির বুক ফেটে যায়। তার নামই বোধ হয় ভালবাসা! আমি তোমার ভালবাসা পাবো, ঠিক এই জন্য কি তোমার পেছনে ছুটেছি, জয়ন্ত?

জয়ন্ত বলল, তুমি মিথ্যে বলবে না, জানি। অথচ আমার মাথায় ওইটিই থেকে যাচ্ছে! ওটা একটা যন্ত্রণা। ওটার জন্যই তোমার ওই ক্যাম্প ছেড়ে চলে গিয়েছিলুম।

রেবা হাসল। বলল, ওর মীমাংসার জন্যেই কি এক উৎকট নেশা চড়িয়ে রেল-লাইনে গলা রাখতে গিযেছিলে?

কি জানি। কিছু মনে নেই আমার। তরুবালা আমাকে বোধ হয় মরতে দেয়নি।—জয়ন্ত বলল, কি জান, আমি ভয়ানক দারিদ্র্যে মানুষ, তার থেকে আমার সব আক্রোশ, সব ঘৃণা। এটাই ছড়াতে চেয়েছি আমার চারিদিকে। আমার মন জুড়ে যে কালো মেঘ দাঁড়িয়ে সেই মেঘ দিয়ে শ্রাবণের আকাশ তৈরি করতে বসেছি। মাঝে মাঝে অসহ্য নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। সেই কারণে শুধু একবার নয়, বার তিনেক মরবার চেষ্টা পেযেছি। জানি এ মৃত্যু হ'ত কাপুরুষের

রেবার মুখে হাসি মিলিযে গিযেছিল। সে ধীরে ধীরে বলল, যে আক্রোশ আর ঘৃণা তোমাকে কোথাও শান্তি দেয না—বার বার যেটা তোমাকে মরবার দিকে ঠেলে দেয, সেটা তো একটা শক্তি। সেই শক্তিই তো তোমাকে কবি বানিয়েছে, জয়ন্ত?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জয়ন্ত মুখ ফেরালো রেবার দিকে।

বুঝলে না?—রেবা বলল, ঘৃণা যদি খাঁটি হয, নৈরাশ্য যদি সত্য হয়,—সে কি বিপ্লবের বীজ নয়? তোমার কবিতার সমাদর তো সেইখানে। কিন্তু তোমার নিজের মৃত্যুই কি সব যন্ত্রণার মীমাংসা? তুমি নিজে কেন মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছ বার বার!

জয়ন্ত কথা বলল না। চুপ করে রইল। রেবা এক সময় বলল, আমার মাঝে মাঝে কি সন্দেহ হয় জানো? তুমি নিজের ভেতর থেকে বাইরে আসতে পারছ না,—তুমি যেন একটা জালে পড়েছ! বাইরেটা অনেকটা বড় জয়ন্ত, জীবন সেখানে অনেক বিচিত্র। এত দিক থেকে তার ডাক, এত দিকে তার আকর্ষণ—কোটি কোটি মানুষ মিলিয়ে সেখানে বাইরের পৃথিবী আশ্চর্য। তুমি তার কোনও সাড়া নিলে না।

জয়ন্ত প্রশ্ন করল, কোথায় সেই পৃথিবী?

তোমার জালের বাইরে।—রেবা হাসিমুখে জবাব দিল।

কফির পেয়ালা শেষ করে জয়ন্ত কতক্ষণ চুপ করে বসে রইল। জীবনটা তার এলোমেলো, সেটাকে গুছিয়ে তোলবার একটা পৃথক ধরনের কৌশল আছে। যারা হোটেল বোর্ডিয়ে থাকে, যারা থাকে ডর্মিটরিতে, যারা ক্যাম্পিং করে বেপোট অঞ্চলে গিয়ে—তাদের মধ্যে এমন বহু ব্যক্তিকে দেখা যায়, যারা নিজ নিজ সীমানাটুকুর মধ্যে একটু সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সেই-টুকুর ভিতরেই তার সংসারযাত্রা, সকল কীর্তি, সব রকমের আযোজন। সেইটুকুই তার সুখের ও স্বাচ্ছন্দ্যের কেন্দ্র। জয়ন্তর তা নেই। সে যেন একটা উৎক্ষিপ্ত উল্কা। জ্বলছে নিজের বারুদে, দর্শক দাঁড়িয়ে গেছে আশেপাশে। বারুদ যেদিন ফুরবে, সেদিন শুধু ছাই।

রেবা বলল, তোমাকে যত দেখি তত অবাক হই, কেন জান?

জয়ন্ত মুখ ফিরিয়ে তাকাল। রেবা হাসিমুখে পুনরায় বলল, তুমি একই সঙ্গে ধরে আছ চার রকমের জীবন। যেটাকে তুমি বলছ উডনচুডে—সেই একটা, দ্বিতীয়টায় তুমি কবি, তৃতীয়টায় তুমি আর আমি, চতুর্থটা তোমার আসন্ন, জয়ন্ত।

কী সেটা?

কিছু একটা।

জয়ন্ত একটু থামল। পরে বলল, তৃতীয়টার মীমাংসা কি প্রকার? আসন্ন চতুর্থটাই বা কি? মুখ খোল রেবা?

রেবা বলল, সেটা ছ' বছরের প্রশ্ন। কে কাকে ধ'রে আছে

হেসে উঠল জয়ন্ত। বলল, শক্ত করে তোমাকে না ধরলে তুমি বুঝি এবার পালিয়ে যেতে চাও?

রেবা হাসল না। শুধু বলল, না, ধরো না,—তুমি এমনই থাকো। তুমি ফুটে ওঠো, সেই আমার আনন্দ। আমি তোমাকে ধ'রে রাখব না,—এই স্বাচ্ছন্দ্যবোধের মধ্যে তুমি থাকো। বেড়া থাকবে না দুজনের মধ্যে, বাঁধন থাকবে না একটুও, হঠাৎ একদিন চলে গেলে খুঁজতে যাওয়া চলবে না, হারাবার ভয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে না,—সেই নির্মল স্বাচ্ছন্দ্য তোমার দরকার। তুমি যে কবি।

জয়ন্ত বলল, সে ক্ষেত্রে একটু একটু করে যদি শুকিয়ে যাই দুজনে?

তুমি কেন শুকোবে? তোমার প্রতিভাই তোমার প্রাণশক্তি।—রেবা বলল, ওটাই তোমাকে যোগাবে রক্তরস, ওটাই তোমার স্বাস্থ্যশ্রীকে সতেজ করে

রাখবে। আর আমি? একজন যথার্থ কবিকে পরিপূর্ণ প্রতিভায় যদি ফুটিয়ে তুলতে পারি, তার জন্য শুকিয়ে কাঠ হলে আনন্দই ত' বেশি। তোমার মাথা উঁচু হবে সকলকে ছাড়িয়ে—সেই বিরাট পুরুষকে দেখুক সবাই সকল দিক থেকে। সেই পুরুষের পায়ের নিচে কোন্ একটা সামান্য মেয়ের শুকনো কঙ্কাল কবে যেন পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেছে, ইতিহাস কেন তার খোঁজ করতে যাবে?

জয়ন্ত আবার হাসল। সে যেন স্বচ্ছ আনন্দের মধুর হাসি। হাসতে হাসতে বলল, আমার ওপর তুমি বড্ড বেশি প্রিমিয়ম চড়াচ্ছ। তোমার আইডিয়ার মতন কবি হয়ে উঠত না পারলে তোমার অশ্রদ্ধা কুড়োতে থাকব। সে মস্ত ট্রাজেডি। তার চেয়ে সোজাসুজি এসো।

সেটা কি রকম?—হেসে প্রশ্ন করল রেবা।

কঙ্কাল টঙ্কাল হয়ে তোমার কাজ নেই। ওসব কথা থাক। -জয়ন্ত বলল, তার চেয়ে এসো কাজ করি দুজনে। তুমি রিসার্চ করতে যাও, আমি গিয়ে কলেজে পড়াই। সে একটা নতুন জীবন হোক। আমার সকল দায়িত্ব তুমি যেমন নিচ্ছ, তেমনি তোমার সব কাজেও আমাকে ডেকে নাও।

আমার কাজ তোমার ভাল লাগবে কেন?—রেবা আবার প্রশ্ন করল।

জয়ন্ত বলল, বাঃ তোমার কাজ মানেই তো আমার কাজ।

রেবা চুপ করে যেন তলিয়ে গেল নিজের মধ্যে। অনেকক্ষণ পরে যেন উঠে এলো সমুদ্রের তল থেকে। তারপর সে উঠল চেয়ার ছেড়ে। জয়ন্তর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাকে বলতে ভয় করে জয়ন্ত। তুমি যদি আমার কাজ করতে চাও, তাহলে প্রথম আমার পিছনের ইতিহাসকে মুছে দিতে হবে। সেইটেই প্রথম কাজ।

কেন? কী সে ইতিহাস?- জয়ন্ত একটু অবাক হল।

রেবা চুপ করে রইল। জয়ন্ত উঠে দাড়াল কেমন যেন একটা দুর্ভাবনা নিয়ে। তারপর সে রেবার একখানা হাত ধরে ঘরের মধ্যে এনে এক জায়গায় বসালো। নিজে বসল তার গায়ে গায়ে। বলল, এমন কী ইতিহাস তোমার, যা আমার কাছে বলতে ভয় করে? পাস্ট অ্যাফেয়ার্স কিছু? বল রেবা। মন-দেয়া-নেয়ার কোনও ইতিহাস? আঃ বল রেবা, তোমার এসব ঘরদোর আমার কাছে এখন মিথ্যে মনে হচ্ছে যেন।

মৃদুকণ্ঠে রেবা বলল, শুনলে আমার ওপর তোমার ঘেন্না হয়ে যেতে পারে, জয়ন্ত।

উত্তেজিত হয়ে জয়ন্ত কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় দরজার বাইরে মাধো সিংয়ের সাড়া পাওয়া গেল। রেবা ও জয়ন্ত উভয়েই উঠে দাঁড়াল।

রেবা এলো এগিয়ে। দরজার বাইরে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাসি-মুখে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং রায়সাহেব। ওখান থেকেই রেবা চেঁচাল, জয়ন্ত, বাবা এসেছেন!

জয়ন্ত হাসিমুখে বেরিয়ে এসে রায়সাহেবের হাত ধরল। রায়সাহেব সেই আন্তরিক অভ্যর্থনার জবাবে বললেন, চুপচাপ আর থাকা গেল না জয়ন্ত। কেমন যেন খালি-খালি লাগল ঘরদোর! কারোকে কিছু না বলে আজ বেরিয়ে পড়েছি।

জয়ন্ত বলল, আমি ভাবতেই পারিনি, আপনি আসবেন!

রেবা উল্লসিত কণ্ঠে বলল, বাবা, আমি অবাক হচ্ছি তুমি কতদিন পরে আজ ধুতি পাঞ্জাবি পরেছ। আজ আপিস যাওনি?

আপিস তো তোমার মা? আমার আর আপিস-টাপিস ভাল লাগে না।

জয়ন্ত ওঁকে নিয়ে এসে ভিতরে বসালো। রায়সাহেব এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, চমৎকার গুছিয়েছ তোমরা। দেখে আমার একটু হিংসে হচ্ছে।

রেবা হেসেই খুন। রায়সাহেব বললেন, দেখলে তো জয়ন্ত, মেয়ে জন্মায় পরের জন্য! তোমাকে পাবার আনন্দে মা আমার সব ছাড়তে চাইছে! তোমাদের এই আনন্দে আমিও একটা ডুব দিয়ে যেতে এলুম!

রেবা বলল, বাবা, তোমার কাছ থেকে আমি দূরে যাইনি। জয়ন্ত আমাকে কথা দিয়েছে, আমাদের সব কাজেই সে থাকবে। আমি তোমাকে সব ঝঞ্ঝাট থেকে সরিয়ে দেবো, বাবা।

জয়ন্ত এবার কথা বলল,--দেখুন, আমি পড়াশুনো নিয়ে থাকি, আপনাকে সেবার বলেছিলুম। হয়ত আবার শিগগির কোথাও প্রফেসরিও নিতে পারি। রেবাও একটা স্কলারশিপ পাচ্ছে, ওটা নিয়ে ও রিসার্চ করবে, থেসিস লিখবে—এইসব আলোচনা নিয়েই আমরা আছি। আমার আবার একটা সাহিত্যকর্মের বাতিক আছে--

রায়সাহেব জয়ন্তর কাঁধের উপর হাত রেখে সমাদর জানিয়ে বললেন, তুমি শুধু মস্ত পণ্ডিত নও, তুমি একজন প্রতিষ্ঠাবান কবি, জয়ন্ত। আমি তোমার লেখা পড়ে সম্প্রতি মুগ্ধ হলুম। মিষ্টার মৈত্রকে দিয়ে তোমার তিন-খানা বইও কিনে আনিয়েছি। আজ এলুম তোমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে।

সবিনয়ে জয়ন্ত বলল, রেবা আমার সম্বন্ধে অনেক বেশি বলে। আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আপনার প্রত্যাশার যোগ্য হতে পারি!

রায়সাহেব হেসে বললেন, বর্তমান যুগ তোমাকে আশীর্বাদ করবে, জয়ন্ত।

আমি সামান্য। কিন্তু আমি এসেছি আমার অভিনন্দনের সঙ্গে একটি আবেদন জানাতে।

সে কি কথা, আপনি নির্দেশ দেবেন—আমরা দুজনে সেটা পালন করব।

রায়সাহেব একটু থামলেন, পরে হেসে বললেন, শোনো প্রফেসর, দুঃখের কথা বলি। ব্যবসা বাণিজ্যের মূল কথাটা হল লোভ, অবস্থার উন্নতির চেষ্টা! দেশের সমৃদ্ধি আনব, এসব ফাঁকা বুলি নিয়ে কেউ বিড়ির দোকান করতে বসে না। ওটা নিতান্ত ব্যক্তিগত উন্নতির ব্যাপার, বড় জোর উপার্জনের একটা পথ ধরা। ওটা যখন বাড়তে থাকে, মানুষের আদিম লোভ সেটাকে আরও উসাকিয়ে তোলে! আমি নিজেও সেই লোভে পড়েছিলুম। আমার বিদ্যে বুদ্ধি বরাবরই কম, কিন্তু একটা হিসেব বুদ্ধি ববাবরই থেকে গেছে। ডোবার ধারে বসে গামছা দিয়ে চুনো মাছ ধরতুম , তারপরের অবস্থা হল পুকুর পাড়ে বসে ছিপ দিয়ে বাটা মাছ ধরা , দেখতে দেখতে হুইল এল, ধরতে শিখলুম রুই কাৎলা।

জয়ন্ত ও রেবা দুজনেই হাসছিল।

রায়সাহেব বললেন, পুকুব থেকে দীঘি, তাবপর খাল বিল, তারপর নদী। অর্থাৎ লোভ বাড়তে লাগল। থামবার যো ছিল না। নদী ঘিবে জাল ফেলেছিলুম একদিন। দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলুম সমুদ্রে—জাহাজ নিযে চললুম অকূলে আর পাঁচটা জাতের সঙ্গে। উদ্দেশ্য, তিমি শিকার। দেখতে দেখতে ব্যবসা বিরাট হয়ে উঠল। এখন আর কূল কিনারা পাচ্ছিনে, প্রফেসর।

রেবা এবার বলল, বাবা, তোমাকে কিন্তু আমি হুইস্কি বা ব্র্যাণ্ডি -কিছু দিতে পারছিনে। ওসব এখানে রাখিনে।

রায়সাহেব হাসলেন শুধু। বললেন, না মা, ওসব থাক।

কিন্তু এখন যে সন্ধ্যে উৎরে গেছে? ড্রিঙ্ক ছাড়া তোমার চলবে কেন, বাবা ?

এতদিন চলেনি বটে, তবে এবার থেকে বোধহয় চলবে। মনে হচ্ছে অ্যাল্‌কোহল ছেড়েই দেবো। লিভারে আর সইছে না।

জয়ন্ত বলল, আজ আপনাকে এমন করে একান্তে পাওয়া যাবে আমি ভাবিনি। আপনাকে আজ আমি যেতে দেবো না।

হাসিমুখে রায়সাহেব বললেন, বেশ তো, তোমার আশ্রয়ে একদিন না হয় থেকেই যাই।

তাঁর মুখের ম্লান হাসির দিকে চেয়ে রেবার কিছু জানতে বাকি ছিল না। এবার ভেঙ্গেছে তাঁর পারিবারিক জীবন—সেটাকে যদি পারিবারিক বলতেই হয়! এ যেন বিরাট পাহাড়ের একটা অংশে ধ্বস নেমেছে, তার সঙ্গে ভূমিসাৎ

হয়েছে মস্ত একটা লোকাবাস—যেটা বহুকাল ধরে নির্মাণ করা হয়েছিল। বিরাট কারখার বিরাটতর হয়েছে, কিন্তু তার তলায় রুদ্ধশ্বাসে মরতে বসেছে তার স্রষ্টা। রায়সাহেব ধনকুবেরে পরিণত হয়েছেন, কিন্তু সেই ধনচক্রান্ত থেকে বেরিয়ে পড়ার পথ পাওয়া যাচ্ছে না।

জয়ন্ত বলল, আপনার জীবনের এত বড সাফল্য দেখতে পাচ্ছে সবাই, অথচ আপনি এত অসহায় বোধ করছেন কেন?

কারণ আছে, জয়ন্ত। —রায়সাহেব বললেন, সাফল্য আমার নয়,—যারা কাজ করেছে তাদের সকলের। আমি শুধু কল ঘুরিয়েছিলুম মাত্র। কিন্তু আজ কথা উঠছে নিজের ভেতর থেকে, তাব জবাব চাইছি। সাফল্যই কি সব? মন কি আমাব মিলছে সেই সাফল্যের সঙ্গে? পঁচিশ বছর ধরে মেয়েটা আমাকে যুগিয়ে এসেছে উদ্দীপনা আর শক্তি। সেই মেয়ে যখন মানুষ হয়ে উঠল, তখন আর কেন? আমাকে সম্পূর্ণ ছুটি দাও তোমরা।

জয়ন্ত বলল, আপনি রেবার কথাই বলছেন, কিন্তু আপনার স্ত্রী কেন আপনাকে ছুটি দেবেন? তাঁর তো অন্যরকম দাবি আছে।

আমার স্ত্রী! রায়সাহেব থমকিয়ে বললেন, মানে? তুমি কার কথা বলছ?

রেবা ব্যস্ত হয়ে বলল, বাবা

কেন মা?

জয়ন্ত আজও কিছু জানে না। আমি কিছু বলিনি।

সে কি, মা?—রায়সাহেব সবিস্ময়ে বললেন, যে ব্যক্তি তোমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু, তার কাছে কিছু লুকিয়ে রাখতে নেই, রেবা।

জয়ন্ত বলল, এ ত্রুটি রেবার নয়, মিঃ রায়—এ আমারই অযোগ্যতা। এই ফ্ল্যাটে আমরা এসে উঠেছি বটে, কিন্তু গত ছয় বছরে আমাদের মধ্যে কোনও অন্তরঙ্গ আলোচনা হয়নি। মাত্র আজই কথা উঠছিল। রেবা বলতে চাইছিল কি যেন—

রায়সাহেব শান্তকণ্ঠে বললেন, তোমার শোনা দরকার জয়ন্ত, শোভনা আমাদের কেউ নয়।

জয়ন্ত স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রথমটা একবার তাকাল। পরে বলল, মানে? উনি রেবার মা নন?

উৎকণ্ঠিত আর্তকণ্ঠে রেবা বলে উঠল, বাবা, জয়ন্তর পক্ষে আর কিছু কি শোনা ভাল হবে? ও যদি আমাদের সবাইকে ঘেন্না করে?

রায়সাহেব বললেন, তাহলে জানব তুমি ছ' বছর ধরে এত কাছে থেকেও জয়ন্তকে চেননি, মা। শোনো জয়ন্ত, শোভনা রেবার মা নন। কিন্তু রেবার মা কে, আমি আজও জানিনে।

মৃদুস্বরে জয়ন্ত শুধু বলতে পারল, অ্যাঁ— ?

পলকের মধ্যে রেবা ঝাঁপিয়ে পড়ল রায়সাহেবের কাঁধের ওপর। কোনও দিন সে যা করেনি, আজ প্রথম সে ডুকরিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, বাবা, বাবা, তুমি আর কিছু বলো না। তুমি আমার কেউ নও, এ আমি আর তোমাকে বলতে দেবো না।

রায়সাহেবের গলা জড়িয়ে রেবা—যার সংযম ইস্পাতের ফ্রেমে আঁটা, কান্না যার কাছে অম্লতন্ত্রের রসক্ষরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়,—সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল আকুল আবেগে। এর পর রায়সাহেবের দুই চোখ আর কোনও মতেই শুকনো থাকতে পারল না।

জয়ন্ত মূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। কিন্তু কবি জয়ন্ত পেয়ে গেল আবেগের একটি নূতন স্বাদ। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদলে রেবাকে কেমন দেখতে হয়, ছয় বছরে জয়ন্ত সে দৃশ্য দেখেনি। কঠিন মেয়ে রেবা, কান্নাও যেন তার পাথর-নেংড়ানো। নূতন স্বাদ শুধু নয়, নূতন উপাদানও বটে। যে ধনবন্ধক আজ পৃথিবীর সকল সমাজে ধিক্কৃত হচ্ছে, এ যেন তার ব্যক্তিগত জীবনের একটা ছবি! শোভনা স্ত্রী নয়, রেবা কন্যা নয়, কে পিতা, কে বা জননী, কার সঙ্গে কার কি প্রকার সম্পর্ক-বন্ধন— সমস্তটা রহস্যভরা, অথচ বাইরেটা আগাগোড়া সাজানো। জয়ন্ত নিজেই বা এখানে কে? সে স্বামী, না বন্ধু? কিসের জোরে সে দাঁড়িয়ে? কিসের জোরে রেবা এত টাকা আনছে? কিসের জোরে তার এই বিলাসবৈভব? অধিকারসূত্র সে পাচ্ছে কোথায়? কোন্ জন্মডোরে সে বাঁধা, কোন বৃন্তে সে ফোটা? কোন বাগানের সে ফুল?

জয়ন্ত যেন তার জীবনের এক নতুন কৌতুক পেয়ে গেল। সে দু'পা এগিয়ে গিয়ে রেবার হাত ধরে রায়সাহেবের কাছ থেকে সরিয়ে নিল। বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে রেবা, তুমি কেন কাঁদছ! যা মিথ্যে দিয়ে ঢাকা তা খসে যাক না কেন?

রায়সাহেব বললেন, ঠিক বলেছ, জয়ন্ত।

জয়ন্ত বলল, জন্ম দিয়ে পরিচয়ের যুগ চলে গেছে, রেবা। একাল সেকাল নয়। আজ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই জবাব দিতে হচ্ছে, সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ কিনা! জন্মের পরিচয়ের চেয়ে মানুষের গৌরব বড়। তোমার জন্মের পরিচয় তুমিও জানতে পারনি,—নাই বা পারলে? শিশুকালে জননী শিখিয়ে দেয়, ওই তোর বাবা। কিন্তু আসল বাবা সে-ব্যক্তি নাও হতে পারে। যিনি স্নেহশীল প্রতিপালক, যিনি সকল কল্যাণের আয়োজন করে থাকেন,—তিনিই প্রকৃত পিতা! এসো তুমি অন্য ঘরে, ওঁকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও।

রেবাকে সঙ্গে নিয়ে জয়ন্ত বারান্দা পেরিয়ে ওদিকের ঘরে এসে ঢুকল। আলোটা সে জ্বালল না। শুধু রেবাকে বসিয়ে নিল বিছানার ওপর। সে-রেবা এ নয়, এ মেয়ে শিশু। সে-জয়ন্ত এ নয়, এ যেন অভিভাবক।

জয়ন্ত পাশে বসল। রেবার গলাটা জড়িয়ে টেনে নিল কাছে। তারপর নিজের কোঁচার খুঁট দিয়ে রেবার মুখখানা মুছিয়ে বলল, ভুল করে কেঁদেছ রেবা, আমাকে তুমি বুঝতে পারনি মনে হচ্ছে। আচ্ছা, একথা পরে হবে। আমি ততক্ষণে ওঘরে বসিগে, তুমি একটু সামলিয়ে নিয়ে আমাদের খেতে দিয়ো।

জয়ন্ত বেরিয়ে এসে আবার রায়সাহেবের কাছে গিয়ে বসল। তারপর হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল, আপনি তখন যেটাকে আবেদন বলছিলেন, সেটা আমি আরেকটু শুনতে চাই।

রায়সাহেব গায়ের পাঞ্জাবিটা ছেড়ে শুধু গেঞ্জি পরে বসেছিলেন। পা দুখানা খালি। এই ফ্ল্যাটে তিনি যেন নিশ্চিন্ত, এ যেন একান্তই তাঁর অন্তঃপুর, তাঁর নিজস্ব পরিবেশ। এখানে তিনি দেশপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী নন, বিপুল সম্পত্তির মালিক নন—এখানে তিনি সামান্য নিরভিমান পিতা মাত্র—বার্ধক্যে যিনি অসহায় এবং পালিত এক কন্যা ছাড়া স্বজন বান্ধব বলতে যাঁর কেউ নেই।

হাসিমুখে তিনি বললেন, আবেদন জানাবার আগে নিজের পরিচয়টি দেওয়া ভাল, জয়ন্ত। আমি পল্লীগ্রামের এক বিধবার একটিমাত্র সন্তান ছিলুম। মা মারা যাবার পর ইছামতীর ভাঙনে আমাদের ঘরদোর সব চলে যায়। আমিও চলে আসি সেই বালক-বয়সে। তারপর সেই পুরনো গল্প—দুঃখ-দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে চলা। লেখাপড়া এগোয়নি তোমাদের মতন, আমি ম্যাট্রিক পর্যন্ত টেনেছিলুম। বেলগাছিয়া স্টেশনে সকাল-সন্ধ্যে ঘন্টা চারেক মোট বইতুম। দুপুরবেলায় এক ওভারসিয়ারের মাপজোপের দড়ি ধরতুম—তখন আর-জি-কর হাসপাতাল তৈরি হবার কথা চলছে। কলকাতায় আমার কেউ ছিল না বলেই আশ্রয়ের একটু অসুবিধা ছিল। দালালদের নুনের গোলায় পড়ে থাকতুম, সেজন্য ওদের ফাই ফরমাসও খেটে দিতুম। সেটা যেন আমার অজ্ঞাতবাসের পর্ব।

কবি-জয়ন্ত অবাক হয়ে শুনছিল এই শক্তিমান পুরুষের আত্মকথা। ইংরেজি আত্মজীবনী অনেক পড়া আছে তার,—এ আত্মকাহিনীও তার কাছে নতুন নয়। কিন্তু মুখোমুখি বসে শোনাটা নতুন। জীবন অনেক বড় এবং বৈচিত্র্যময় —মানুষের সকল কল্পনাকে সে কথায়-কথায় অতিক্রম করে যায়। এক ব্যক্তি-সত্তা, অধ্যবসায় এবং তীক্ষ্ণ হিসাব বুদ্ধির দ্বারা গড়ে তুলেছে এক বিশাল

ইমারত! কিন্তু এই কথাটিই কেবল রায়সাহেব বুঝতে পারেননি যে রাষ্ট্রের বিবিধ বিধান-চক্রান্ত ব্যক্তিগত সম্পদবৃদ্ধির কাজে সর্বপ্রকারে তাঁকে সহায়তা করে এসেছে। আজ তিনি অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখছেন, চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে গেছে তাঁর অনেক সম্পদ যা তাঁর পরিশ্রমলব্ধ নয়।

আবেদন আমার এইখানে—রায়সাহেব বললেন, আমার কাজ হয়ে গেছে, পাওনাও আমার পেয়ে গেছি। আমার সমস্ত স্বত্ব আর অধিকার ছেড়ে দিয়েছি রেবার নামে। কিন্তু আজও ছুটি পাইনি, বাবা। সেই ছুটি আমি চাইতে এলুম তোমাদের কাছে।

একটু থমকিয়ে জয়ন্ত বলল, আপনার এত বড প্রতিষ্ঠানের পবিচালনা রেবার দ্বারা কি সম্ভব হবে?

হেসে উঠলেন রায়সাহেব। বললেন, তোমাকে বোধ হয় বলেনি রেবা। আজ এক বছর ধবে তার হাতেই সব, জয়ন্ত।

বলেন কি? আমি তো কিছুই শুনিনি।

ও যে মেয়ে, জয়ন্ত—নিজেব কৃতিত্ব কখনও প্রচার কবে না। কিন্তু আমি ওকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইনে। ওব হাতে সব দিয়ে দিয়েছি।

এমন সময়ে রেবা স্মিতমুখে এসে দাঁড়াল। তার চোখ দুটো তখনও ফোলা। সে বলল, তোমাদের খেতে দিয়েছি, বাবা।

চলো মা—এসো জয়ন্ত।—রায়সাহেব এবার উঠলেন।

খাবারের টেবিলে বসে পুনরায় তিনি বললেন, বুঝলে জয়ন্ত, কাগজপত্র সমস্তই রেজেষ্টারি করে দিলুম। মিষ্টাব মৈত্র সবই বুঝে পড়ে' নিয়েছেন।

আপনি কি উইল্ করলেন?

না না, উইল্ কেন? আগাগোডা সমস্ত দানপত্র—সম্পূর্ণ নিঃস্বত্বে।

জয়ন্ত প্রশ্ন করল, কিন্তু শোভনা দেবীর অধিকার!—যাঁকে রেবা এতকাল ধরে মা বলে এসেছে?

রেবা সঙ্কোচ করল না। স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, জয়ন্ত, শোভনা দেবীর সঙ্গে বাবার লেশমাত্র সম্পর্ক নেই কোনকালে। বাবা বা আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একদম সাজানো। বাবার যিনি স্ত্রী ছিলেন, তিনি আমাকে প্রায় তিন বছর অবধি মানুষ করেন। ওরই মধ্যে আসেন ইন্দুমা। শোভনা দেবী এর মধ্যে কেউ না!—বাবা!

রায়সাহেব মুখ তুললেন। রেবা বলল, মাছভাজা আর মাংস তুমি সরিয়ে রাখলে? ওগুলোও বুঝি ছেড়ে দিয়েছ?

রায়সাহেব এবার হেসে উঠলেন। বললেন, দেখতে পাচ্ছ জয়ন্ত, মেয়ের চোখ দুটো কী ধারালো? তুমি একটু সাবধানে থেকো বাবা।

উচ্চকণ্ঠে তিনজনেই এবার হেসে উঠলেন। রেবা ছাড়ল না, আবার বলল, এখন দেখতে পাচ্ছি, তুমি অ্যাল্‌কোহল্‌ ছাড়লে, স্যুটপরা ছাড়লে, আমিষ খাওয়া ছাড়লে,—এবার বুঝি কণ্ঠী নেবে?

আদরিণী কন্যার এই প্রকার দংশনে যখন উচ্চরোলে হাসির আওয়াজ উঠল, তখন রেবা আরেকটু যুগিয়ে দিল, না, তা হবে না। আমার বাবা হয়ে উঠবেন বাবাজি, এ আমার কোনমতেই সইবে না।

আবার হাসির ঝড় উঠল।

এক সময় জয়ন্ত বলল, তবু কি একটা খোঁচার মতন রয়ে যাচ্ছে আমার মনে, রেবা। মা বলে যাকে জেনে এসেছিলে এতকাল, তাঁর নৈতিক পাওনা কোথায় যেন একটা কিছু আছে। তাঁর প্রকৃতি অন্যরকম জানি, হয়ত রুচিবিকারও তাঁর আছে, হয়ত তাঁর প্রবৃত্তির রাশ আলগাও হতে পারে। কিন্তু মানবতাবোধের আরেকটা দিকও আছে যেটার নাম করুণা, যার কাছে তুমি আমি শোভনা দেবী বা তোমার সেই নতুন শিক্ষকবালা, ফটিক ঘোষ বা গন্নাখাঁদা—কেউ ছোট নয়, রেবা।

মুগ্ধচক্ষে জয়ন্তর দিকে চেয়েছিলেন রায়সাহেব। এই জয়ন্তর কাছেই এক সঙ্গোপন পত্রে শোভনা রেবার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে কদর্য বিষোদ্‌গার করে অপকলঙ্ক প্রচারের চেষ্টা পান। জয়ন্ত সেই চিঠি শচীনের হাত দিয়ে রায়সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেয়। রেবা সে চিঠির খবর রাখে না। আজ জয়ন্তর উদার বিচারবোধের কথা শুনে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন।

আজ এই প্রথম ছয় বছর পরে রেবার মনে যে একটা নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেল, সেই সংবাদ অন্য কেউ পেলো না। পেলো শুধু সে নিজে। মনে হচ্ছে যে-জয়ন্ত ছিল তার এতকালের লীলারঙ্গের সহচর, যে-কবিপ্রতিভাকে পূর্ণবিকশিত করার জন্য আপন জীবনকে উপকরণস্বরূপ রেবা ব্যবহার করে এসেছে—সে কেবল এক সৌম্যদর্শন কবি নয়, সে আজ হঠাৎ মাথা উঁচু করে সামনে দাঁড়াল সামাজিক সুবিচারের ন্যায়নীতি নিয়ে। রেবা তার কাছে ছোট হয়ে গেল গেল বলেই রেবার গৌরব।

আহারাদির পর অনেক রাত্রে রায়সাহেব শুলেন এক খাটে, অন্য খাটে শুয়ে পড়ল জয়ন্ত। রেবা পাশের ঘরে গিয়ে শুলো নিজের বিছানায়। কিন্তু অন্ধকারে আবার গড়িয়ে নামল তার চোখের জল। এ অশ্রু আনন্দের এবং অপরিসীম শান্তির।—

॥ ৯ ॥

বাগানবাড়ির পিছন দিকে পূবমুখী যে খিড়কি গেট্, শচীন সেই গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, এমন সময় রেবার গাড়ি এসে থামল সেখানে। জয়ন্ত ও রেবা নামল শচীনের প্রায় মুখোমুখি।

প্রথমে জয়ন্ত বলল, শচীন, মাস দুই আগে তোমার সেই পুঁটিমাছ রান্না আমাকে একদিন ফেলে যেতে হয়েছিল, সেটা কি রেখে দিয়েছ?

জয়ন্তর কৌতুকের কথায় রেবা হেসে উঠল এবং শচীন নতহাস্যে সবিনয়ে বলল, আপনার হুকুম পেলে আজও তৈরি করে দেবো।

না থাক, শচীন—জয়ন্ত বলল, এবার তোমার হাতে নিজেকে সঁপে দিচ্ছি। যা খাওয়াবে তাই খাবো।

রেবা ও জয়ন্ত এসে ক্যাম্পে ঢুকল। আগেভাগে টেলিফোন পেয়ে শচীন সমস্ত ফিটফাট করে রেখেছিল। সে এসে দাঁড়াল দরজার পাশে। রেবা বলল, তুমি ধীরে-সুস্থে রান্না করো শচীন, তাড়া নেই।

জয়ন্ত বলল, চা নিয়ে এসো শচীন। মনে হচ্ছে সকাল থেকে খাইনি কিছু। বেলা দশটা বাজতে চলল।

ও কি?—রেবা বলল, বেশ লোক তুমি ত'? তুমি যে প্রায় পেট ভরে খেয়ে বেরোলে সিঙ্গিবাগান থেকে? এর মধ্যে ক্ষিদে?

জয়ন্ত বলল, আমার লিভার একটু বেশি সক্রিয়। তা ছাড়া ধরো কলকাতার রাস্তা দশ হাজার গর্ত, গাড়ির মধ্যে নাচতে নাচতে এসেছি দশ বারো মাইল। তারপর মনে করো, তোমার গায়ে গায়ে বসা, অর্থাৎ এক বাণ্ডিল প্যাশন্ পাশে রাখা,—সুতরাং সেক্স-ইম্পলস্ কাজ করেছে প্রচুর। হজমশক্তি বেড়ে গেছে।

তোমার মুণ্ড!—রেবা গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল।

ভোরের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, সেজন্য বাগানের চেহারাটা সতেজ দেখা যাচ্ছে। আকাশের নীলিমা আরও নিবিড় হয়েছে এবং গাছপালা ও সমতলের দূর্বাদলকে আরও সবুজ মনে হচ্ছে। পূজার হিড়িক চলে গেছে।

রান্নাঘর থেকে আফসে একটা ফোন করে রেবা ফিরে এলো ঘরে। তারপর হাসিমুখে বলল, বাবার আপিসের প্রায় এক হাজার লোক, আর আমার চারদিকে প্রায় একশ' মেয়েপুরুষ—চেয়ে রয়েছে তোমার দিকে!

জয়ন্ত বলল, আমার দিকে?

হ্যাঁ, আমার দিকেও।

তা হলে এখন উপায়? পালাবো কোন্ পথ দিয়ে বলো তো?

রেবা বলল, পালাবে? তুমি কি কেবল পালাতেই জানো? ফিরে দাঁড়াতে পারছ না কেন?

জয়ন্ত বলল, ফিরে দাঁড়িয়ে টোপর মাথায় তুলব বলছ?

কে বললে? তুমি বিয়ের জন্য জন্মাওনি, একথা বলতে তোমার বাধে কেন?

হাসল জয়ন্ত।—তার উত্তরে ওরা যদি বলে, তোমার বাপ, ঠাকুর্দা, তার ঠাকুর্দা,—কেউই কি বিয়ে করেনি? তার উত্তরে কি বলব?

রেবা বলল, তা'রা কেউ জন্ম-কবি ছিল কি?

তা অবশ্য জানিনে।—

মনে রেখো জয়ন্ত, প্রথম তুমি কবি, পরে অন্য পরিচয়।—রেবা বলল, কেন বিয়ে করবে তুমি? বিয়ে তোমার জন্যে নয়। বিয়ে মানে বাঁধন, বিয়ে মানে কবিতার মৃত্যু।

জয়ন্ত বলল, কিন্তু মেয়েছেলেকে ভালবাসার ব্যাপারটা—?

ভালবাসা।—থাক, ও-সব কথা রাখো। তুমি কবি, একই মেয়েছেলের আঁচল ধরে তোমার থাকার কথা নয়। ভালবাসা নয় জয়ন্ত, ভাল লাগা। ভালবাসা খোঁজে সান্নিধ্য, সাথীত্ব। খোঁজে নিবিড় সঙ্গ, নিভৃতের মন জানাজানি। বিয়ে মানে ভালবাসার অপমৃত্যু। বিয়ে মানে চক্ষুলজ্জা, আড়ষ্টতা, বাধ্যবাধকতা, —একটা বোঝাপড়া মাত্র। তোমার কবিমন ছড়িয়ে থাক সকলের মধ্যে।

শচীন খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। সদ্য গাওয়া ঘিয়ে ভাজা গরম গরম খানকয়েক নিম্‌কি, তার সঙ্গে কিসমিস আর খেজুর দিয়ে বানানো আলুবখরার চাটনি। এবম্প্রকার পরম উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীর দিকে তখনই হাত বাড়িয়ে জয়ন্ত বলল, তুমি কি আমার নৈতিক চরিত্র নষ্ট হবার দিকে ঠেলে দিতে চাইছ? নাও, ধরো -

রেবা একখানা নিম্‌কি তুলে নিয়ে হাসল। পরে মিষ্টকণ্ঠে বলল, তোমার মধ্যে বসে রয়েছেন দেবী সরস্বতী। তোমার প্রবৃত্তির রাশ তাঁর হাতে। আমি কে, জয়ন্ত? তুমি যখন সামাজিক জীবনের গণ্ডীর মধ্যে ঢুকবে, তখন উঠবে নৈতিক চরিত্রের কথা। তুমি কবি, তুমি সকল সমাজের বাইরে। কোনও নীতি তোমার জন্যে নয়, তুমি সকল শাসন-অনুশাসনের অতীত। তুমি বিশ্ব-জীবনের ভাষ্যকার। তোমার সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে লক্ষ লক্ষের স্রোত, তুমি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছ জীবন-বিধাতার প্রতিনিধির মত।

নিম্‌কির সুস্বাদের মধ্যে জয়ন্ত তলিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে উঠে এসে সে বলল, একটা নতুন বৌ নিয়ে বিছানায় উঠব, সেটা কি তোমার সইছে না?

ছি ছি ছি—রেবা নিম্‌কি চিবিয়ে বলল, কোন্ অভাগী সে, যাকে আখের ছিবড়ের মতন ছুঁড়ে ফেলে দেবে তুমি তিনদিন না যেতেই? নতুন একটা বৌ—সে ত' শস্তা রোমান্স। তার চেয়ে একথা চেঁচিয়ে বলো, তুমি কবি হলেও পুরুষ,—মেয়েকে তোমার দরকার।

জয়ন্ত বলল, শুধু মেয়ে ত' জন্তু, রঙীন খোসায় ঢাকা মাংসপিণ্ড!

শচীন এবার দু' পেয়ালা চা এনে রেখে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়াল। রেবা বলল, কি ধরনের খাবার পছন্দ করবে শচীনকে বলে দাও।

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে জয়ন্ত বলল, বেশ, এক কাজ করো! ডিমে ডুবিয়ে ভেট্‌কি মাছভাজা ফুলকপি আর মটরশুঁটি মাখো মাখো, গরম গরম চিকেন স্যুপ—

যে আজ্ঞে—শচীন চলে গেল।

রেবা বলল, আচ্ছা জয়ন্ত, বলো ত' সত্যি ক'রে—অনেকদিন পরে আজ তুমি বেরিয়েছ। সিঙ্গিবাগানের ফ্ল্যাট তোমার কেমন লাগছে?

জয়ন্ত হাসল। বলল, নতুন নেশার মতন। আমার ভাবনার একটা আশ্রয় জুটে গেছে।

রেবা চুপ করে গেল কিছুক্ষণ। মাঝখানে পেয়ালায় চুমুক দিল।

জয়ন্ত পুনরায় বলল, মনে হচ্ছে কন্‌ডিশন্‌ড হয়ে যাচ্ছি। কিছু একটা ভাঙছে, কিছু যেন গড়ছে। দেখতে পাচ্ছি কিছু, যেটা দেখা হয়ে ওঠেনি। এখনো ঠিক বুঝতে পারছিনে।

বাবাকে তুমি কেমন দেখলে?

হাসিমুখে জয়ন্ত বলল, প্রথম যেবার ওঁকে দেখেছিলুম, সেবার ঠিক এতটা চিনতে পারিনি, সত্যিই বলছি। ওঁর পারিবারিক জীবন যে আগাগোড়া মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়েছিল, সেদিন বুঝতে পারা যায়নি। আমায় ধারণা ছিল, টাকার কুমীর মাত্রই ক্রূর আর কুটিল। এখন দেখছি উনি তার ব্যতিক্রম।

দু'জনেই আবার পেয়ালায় চুমুক দিল।

রেবা এবার হাসল। বলল, বাবা যেমন ছিলেন, তেমনিই আছেন। দু' বছর আগেও যা এখনও তাই। নতুনের মধ্যে কেবল উনি মদ আর আমিষ ছেড়ে দিলেন। কিন্তু জয়ন্ত, এ কি হ'ল, তুমি যে এই নাটকীয় পরিস্থিতিতে কন্‌ডিশন্‌ড হয়ে গেলে? তোমার ভেতরে যে একটা পরিবর্তন ঢুকল?

তা হ'তে পারে!—জয়ন্ত বলল, এই যেমন তুমি ছিলে ছ' বছরের পরিচিত, সে-পরিচয় হঠাৎ যেন ধোঁয়া হয়ে গেল! ছিলে তুমি পুরনো,—যেমন আমার পুরনো চেনা ঘর, মা যেমন পুরনো, যেমন পুরনো আমার কবিতার বই, পুরনো গরম কোট, পুরনো যেমন স্ত্রী! সেই সব পুরনোর হঠাৎ মৃত্যু ঘটে গেল! ছিট্‌কে এসে পড়লুম একটা নতুন ভাবনায়! তুমি আবার দাঁড়ালে নতুন হয়ে!

ভাবনা কেন বলছ, জয়ন্ত ?

জানলার বাইরে জয়ন্তর চোখ যেন মিলিয়ে গেল সোনার রৌদ্রে,—কেশরী-সমান বিরাট শুভ্র মেঘপুঞ্জে এবং গাছপালার ঘন সবুজের নিবিড়তায়। সেই চোখ আবার ফিরে এলো রেবার মুখের ওপর। জয়ন্ত বলল, হ্যাঁ ভাবনাই তো! ভাবনা মানেই জীবন! নতুন ভাবনা মানে নতুন কাল, নতুন যুগ। শুধু মানুষ নয়,—মন। এই মন হাটে বলেই জীবনের গতি পায়। একটা রাষ্ট্র গড়ে ওঠে নতুন একটা ভাবনায়,—মানুষ সেখানে উপকরণ। নতুন ভাবনা মানে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি, অথবা নতুন কবির জন্ম। তুমি এলে আমার সেই নতুন ভাবনার পথ দিয়ে। তোমার জন্ম, জাত, বংশ, ইতিহাস—সব অন্ধকারে। কে তুমি, কোথাকার তুমি—সব অজ্ঞাত। কুমারী, বিধবা, অসতী, বেশ্যা, বিজাতীয়া—কা'র গর্ভের তুমি—জানিনে। আমি জানিনে শুধু নয়, যে তোমাকে বদলিয়ে নিয়েছে ঘুষ দিয়ে সেই প্রসূতিসদনে,—সেই শোভনাদেবীও জানে না। তুমি তাই নতুন ভাবনা এনেছ আমার মধ্যে। তুমি অবাক করেছ।

শান্ত স্মিতমুখে তাকিয়ে বসে ছিল রেবা। এবার বলল, তুমি কি ভাবছ কোনও এক শক্তি কাজ ক'রে যাচ্ছে তোমার জীবনে ?

জয়ন্ত ফিরে তাকাল।

রেবা বলল, সিঙ্গিবাগানে বসে তুমি যে কয়টা কবিতা লিখেছ, সে কবিতা সেই পুরনো জয়ন্তর লেখা নয়। ও কবিতার স্বভাব কেমন করে' বদলিয়ে গেল আমি তাই ভাবছিলুম, জয়ন্ত।

জয়ন্ত বলল, আমি লক্ষ্য করিনি রেবা—কী লিখেছি। লিখে খুশী হয়েছি, এই আসল কথা।

রেবা বলল, সাহিত্যের আসরে তুমি বিশেষ ধরনের এক ফরমাস এনেছিলে। ঘৃণা, বিদ্বেষ, আক্রোশ, বিপ্লববাদ—এদের তুমি প্রচার করবে। রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত কলঙ্ক, দুর্গত জীবনের যন্ত্রণা, উৎপীড়িতদের অবরুদ্ধ ক্রোধ, ক্ষুধিতের বঞ্চিতের নৈরাশ্য,—এরা তোমার কানে কানে মন্ত্রপাঠ করেছে। এই নিয়ে তুমি যত লিখবে, ততই তোমার সমাদর বাড়বে বিশেষ এক পাঠকশ্রেণীর কাছে। তারা চাইবে না তুমি অন্য কিছু লেখো। তারা কেউ সহ্য করবে না, যদি তোমার লেখার স্বভাব বদলায়, কিংবা যদি তোমার সাহিত্য দর্শন ভিন্ন পথ ধরে। তুমি ত' দেখতে পাচ্ছ জয়ন্ত, তুমি এনেছ নতুন মেজাজ, সেই তোমার বৈশিষ্ট্য। তুমি লোকভাবনার কবি, ক্রুদ্ধ কবি, তুমি অনির্দেশ্য অশান্তির ক্ষিপ্ত কবি,—তাই তোমার সমাদর। দেশের লোক তোমাকে হাততালি দিচ্ছে না, কিন্তু পথের লোক তোমাকে মাথায় তুলে নাচছে! তুমি তাদেরই লোক, তাদেরই মন কথা কয় তোমার কবিতায়।

জয়ন্ত মধুর হাসি হাসছিল।

রেবাও হাসল, কিন্তু থামল না। বলল, কিন্তু আজ? আজ কেন তোমার মধ্যে ভিন্ন সুর বাজে? তুমি ত' এতদিন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছিলে। দুরারোগ্য রোগে যারা মরতে বসেছে, তাদের তাড়ি খাইয়ে মাতিয়ে তুলতে চাইছিলে তুমি। সেখান থেকে কেন তুমি ফিরতে চাও? বলতে পার?

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, না পারিনে। আমি সচেতন কবি নই, রেবা। পিছন থেকে বোধ হয় কেউ আমাকে লেখায়, তাই লিখি। আমি শুধু যন্ত্র, বিদ্যুতের ডাইনামো কোথায়, খবর রাখিনে। উজ্জ্বল মুহূর্ত দেখা দেয় মনে, চাঞ্চল্যের সঞ্চার ঘটে প্রতি রোমকূপে, তরঙ্গের আঘাত আসে মস্তিষ্কে, ভূমিকম্প দেখা দেয় হৃৎপিণ্ডে,—তাই আমি লিখি। কী হয়ে ওঠে সেই লেখা, সে বিচার আমার তখন আসে না।

রেবা বলল, তুমি এবার শক্তির কথা তুলেছ, জয়ন্ত।

মানে?

কোনদিন যে শক্তির কথা তোমার লেখায় প্রকাশ পায়নি, তারই প্রার্থনা এসেছে তোমার কবিতায়।

জয়ন্ত বলল, প্রার্থনা? কী বলছ তুমি?

হাসিমুখে রেবা বলল, হ্যাঁ জয়ন্ত, প্রার্থনা। এবার তুমি যেন চাইছ সেই প্রবল প্রাণশক্তি, চাইছ সেই সাংঘাতিক তেজস্বিতা,—যেটা দৈব। তুমি যেন ডাক দিচ্ছ দেশজোড়া পৌরুষকে,—যারা সকল অপমানকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে উঠে দাঁড়াবে বিরাট এক তপস্যায়। তুমি চাইছ মানবাত্মার নতুন উদ্বোধন, যেটাকে বলতে পারা যায় রিভল্যুশনারি হিউম্যানিজম্। তুমি যেন এবার চারদিকে আগুন লাগাবার কাজ ছেড়ে দিয়ে শুকনো বেলকাঠের আগুন জেলে হোমযজ্ঞে বসতে চাইছ। তোমার ওই কবিতাগুলো যেন সেই হোমের আগুনে ঘৃতাহুতির মন্ত্রপাঠ করছে। জয়ন্ত, তুমি ত' দেখেছ, মানুষের প্রকৃতির ভেতরে এক আশ্চর্য বিজ্ঞানের খেলা চলছে। কে খেলছে সেই খেলা, কে নিয়ন্ত্রণ করছে সেই চিত্তবিজ্ঞান, তুমি কি জানো? মানুষের পাঁজরের মধ্যে কোথায় গুপ্ত রয়েছে সেই অদৃশ্য এটমের একটি সূক্ষ্ম বিন্দু—কেউ কি জেনেছে তার রীতি। বোধ হয় তারই জন্য শুধু মানুষেরই প্রকৃতি বদলায়,—জন্তুপ্রকৃতির বদল ঘটে না। বাঘ সন্দেশ খায় না, গরু মাছ খায় না, বিড়াল কলাপাতা চিবোয় না। কিন্তু মানুষ নবজন্মলাভ করে প্রতিদিন প্রভাতে। আসে তার নতুন ভাবনা আর উদ্দীপনা, নতুন রুচি আর বৈচিত্র্যবোধ, নতুন প্রাণের চেতনা, নতুন দৃষ্টি। তুমি এবার সেই নতুনকে খুঁজে পাচ্ছ, জয়ন্ত।—কে?

বারান্দার বাইরে যেন কা'দের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। তখনই শচীন ভিতরে এসে দাঁড়াল। বলল, আপিসের ওঁরা এসেছেন।

ওই নাও—রেবা উঠে দাঁড়াল, বলল, আসল কাজই তুমি ভুলেছ, জয়ন্ত। ওঁদের যে আসতে বলা হয়েছিল বেলা বারোটায়। শচীন, ওঁদের তুমি বাইরে বসাও।

সম্মতি জানিয়ে শচীন চলে গেল।

মিঃ মৈত্রর সঙ্গে এসেছেন আরও চারজন বিশিষ্ট কর্মচারী। তাঁরা এক একটি আপিসের কর্তা। একই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা, প্রতি শাখাই একেকটি সংস্থা। প্রত্যেকের কাজ আলাদা। আজকের কথাবার্তা এদেরই মূলনীতি নিয়ে। জয়ন্ত এবং রেবা ওদের মাঝখানে এসে বসে গেল।

মৈত্র বললেন, আমাদের কেন্দ্রগুলোর একটা লিষ্ট আপনি চেয়েছিলেন, সেটা সঙ্গে এনেছি। অসুবিধা এই, এক এক জায়গায় এক এক কাজ। প্রোডাকশন্ যত বাড়ছে, ষ্টাফও বেড়ে উঠছে সেই সঙ্গে।

রেবা বলল, প্রত্যেকের বাজেট তো আলাদা।

মৈত্র বললেন, বড়সাহেব এতদিন যা করে এসেছেন, সেইটিই আগের আমলের রীতি ছিল। অর্থাৎ সব ইউনিটের বাজেট কন্‌ট্রোল করছে হেড অফিস, এটাই সেন্ট্রাল পুল। কোনও ইউনিটেরই কোনও অটোনমি ছিল না।

রেবা বলল, বড়সাহেব এখন থেকে ছুটি নিচ্ছেন। ওঁর শরীরও খারাপ—।

মৈত্র সবই জানেন, তাই তিনি চুপ ক'রে রইলেন। ওঁরা সবাই জয়ন্তকে দেখলেন এই প্রথম। জয়ন্ত এখন রায়সাহেবের প্রতিষ্ঠানের চীফ অ্যাডভাইসর।

জয়ন্ত বলল, কাজকে যদি বড় করে তুলতে হয় তবে প্রত্যেক ইউনিটকে অটোনমাস হতেই হবে। কয়লা, চামড়া, লোহা, ম্যাঙ্গানীজ,—রবার তার সঙ্গে ষ্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং,—এটার সঙ্গে ওটার যোগসূত্র কম—

মুখার্জি বললেন, আমরা কাগজ তৈরির কাজও আরম্ভ করেছি। ভাল টীক্ আমরা পেয়েছি ছিন্দোয়াবার ওদিকে। বাঙ্গালোরে আমরা কনট্রাক্ট পেয়েছি। তা ছাড়া ধরুন পাঞ্জাবে আমাদের ডেয়ারি ফার্ম প্রায় আট বছরের। কোচিনে দড়ির কারখানা—

জয়ন্তর মনে ধাঁধা লেগে গেল।

রেবা বলল, মিষ্টার মৈত্র, আপনাদের ডে'কেছি সবচেয়ে বড় একটা কারণে। আপনি লিষ্ট এনেছেন, ওটা আমি মেলাবো। কিন্তু অটোনমি মানে স্বাচ্ছন্দ্য,— স্বাধীনতা নয়। আপনি ববং প্রত্যেক ইউনিটে একটা ট্রাষ্ট তৈরি করে দিন— মালিকানা থাক্ সকলের। ট্রাষ্টিরা আসবে ইলেকটেড হয়ে। তারাই অভিভাবক হবে।

ভৌমিক বললেন, তা হলে হেড অফিসের ফাংশন কি রকম দাঁড়াবে ?

জয়ন্ত বলল, হেড অফিস শুধু চেকিং নিয়ে থাকবে, আর একটা কমিশন পাবে।

মিঃ মেহতা রায়সাহেবের বিশেষ প্রিয় ব্যক্তি, এবং জয়ন্তর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব ভাল নয়। তিনি বললেন, এই কমিশনটি কে নির্ধারণ করছে, মিস রায় ?

রেবা বলল, মনে করুন, ইউনিটের ট্রাষ্টিরাই করছে।

মেহতা বললেন, আপনারা নিজেদের কর্তৃত্ব খুইয়ে অজানা একটা দলের দয়ার পাত্র হবেন ? এতে কি রায়সাহেবের সম্মতি আছে ?

মৈত্র বললেন, মিঃ মেহতা, এসব আমাদের আলোচ্য নয়।

রেবা হাসিমুখে বসেছিল। কিন্তু মেহতার দিকে বাঁকাচোখে জয়ন্ত একবার তাকাল। পরে সহাস্যে বলল, মালিক যদি তার স্বার্থ বা কর্তৃত্ব কিছু কমিয়ে দেয়, তবে ক্ষতি কি মিস্টার মেহতা ?

মেহতা এবার জয়ন্তর চোখের উপরে চোখ রাখলেন। এই গরীব ঘরের ছোকরাটা এ বাড়িতে সিঁধ কেটে ঢুকেছে রাজত্ব আর রাজকন্যার লোভে—মেহতা একথা শুনেছেন শোভনার কাছে। তিনি ঈষৎ বক্রকণ্ঠে বললেন, যিনি এই কারবার প্রতিষ্ঠা করেছেন, ক্ষতি তাঁর জয়ন্তবাবু। এ হল ব্যবসা বাণিজ্যের কথা। আমি এর দু' পয়সা অংশের মালিক বলেই বলছি।

জয়ন্ত হেসে বলল, তা হলে সাড়ে পনেরো আনা যাঁদের—তাঁদের কথাটা মান্য করা দরকার।

রেবা শান্তকণ্ঠে বলল, মিঃ মৈত্র, জয়ন্তবাবুর কথা অমান্য করা চলে না। আপনি এক কাজ করুন। যারা উৎপাদন করছে তারা যেন পঁচাত্তর ভাগ লভ্যাংশই পায়, এটা দেখবেন। নেট ইনকাম নয়, গ্রস ইনকাম থেকেই তাদের দেবেন। আপনি এইভাবেই কাগজপত্র তৈরি করুন।

যে আজ্ঞে—মৈত্র সম্মতি জানালেন।

এবার মেহতা তাঁর রুদ্ধ আক্রোশ চেপে সবিনয়ে বললেন, মিস রায়, বাঙ্গালীর একটা বদনাম আছে—তারা কারবার সৃষ্টি করে কিন্তু বজায় রাখতে পারে না। রায়সাহেব এই বদনাম ঘুচিয়েছিলেন।

বেশ তো, আপনার এখন বক্তব্য কি বলুন ?—রেবা প্রশ্ন করল।

আমার ভয় পাছে সমস্ত কাজ-কারবার লিকুইডেশনে যায়।

যাতে না যায়, মিস্টার মৈত্র তার চেষ্টা পাবেন।—রেবা বলল, তবে জয়ন্তবাবু চাইলেন, মালিকের স্বার্থ এবং অধিকার কমে যাক যতটা সম্ভব। দিনকাল

বদলেছে তো? এখন থেকে না দিলে এরপর কেড়েকুড়ে নিতে পারে। হ্যাঁ, আরেক কথা, মিঃ মৈত্র—

মৈত্র মুখ তুললেন।

রেবা বলল, বাবাকে কোনও কথায় আর কাজে পাওয়া যাবে না, আপনাকে সেদিন বলেছিলুম। জয়ন্তবাবুর ওপর উনি সমস্ত দখল ছেড়ে দিয়ে গেছেন। তবে আমাকে থাকতে হচ্ছে মাঝখানে, কেননা কর্মীদের স্বার্থ আমি নিজেই দেখব।

মেহতা বললেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া আমার বিশেষ দরকার ছিল, মিস রায়—

ভৌমিক বললেন, তাঁকে একটা বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়াও বোধ হয় আমাদের কর্তব্য।

রেবা হাতঘড়ির দিকে তাকাল। পরে বলল, মাস ছয়েকের আগে তাঁর সঙ্গে আপনাদের দেখাশোনা হওয়া সম্ভব হবে না, মিঃ মেহতা। আর—নতুন ব্যবস্থা স্বীকার করে নিতে যদি আপনার নিতান্তই অসুবিধে হয়, তাহলে আপনার শেয়ারটি কোম্পানী কিনেই নেবেন।

জয়ন্ত হাসিমুখে এবার বলল, সে ক্ষেত্রে আপনারও একটা বিদায় সংবর্ধনা পাওয়া হতে পারে, মিস্টার মেহতা।

মিঃ মেহতা হঠাৎ এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, জয়ন্তবাবু, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি বিদায় নেবো কিনা সেই বিচার ট্রাইব্যুনালে হতে পারে। তবে আমার শেষ কথাটা বোধ হয় বলা দরকার। রায়সাহেব ছিলেন ডিক্টেটর এবং রুথলেস—সেই কারণেই পঁয়ত্রিশ বছরে এই প্রতিষ্ঠান এত উন্নতি করেছে। এর কঠোর নিয়মনীতি, এর চুলচেরা হিসাবপত্র, নিজস্ব আইন আর শৃঙ্খলা এবং এর ঘড়ির কাঁটাধরা উৎপাদন ব্যবস্থা—দেশের পক্ষে গৌরবের বস্তু হয়েছিল। সেই ডিক্টেটরশিপ থেকে এলো ডেমোক্রাসি। এবার থেকে ধর্মঘট, পেন-ডাউন, ইউনিয়ন, মিছিল, পোস্টার, ডিমনস্ট্রেশন—সব এলো একে একে। পিলপিল করে বেরিয়ে এলো ষাঁড় বলদের ডেমোক্রাসী। অজ্ঞানের জয়যাত্রা। দেশের ভদ্রসমাজের হৃৎকম্প!—আচ্ছা, আপিসে আমার কিছু কাজ আছে। নমস্কার—

বারান্দা থেকে নেমে মেহতা হনহনিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। তাঁর দিকে একবার হাসিমুখে চেয়ে জয়ন্ত শুধু বলল, ডাইহার্ড।

মিঃ মৈত্র বসে রইলেন, বাকি তিনজন বিদায় নিলেন এক সময়ে। মৈত্র তাঁর নিজের পজিশন জানেন বলেই তাঁর চাঞ্চল্য নেই। হাসিমুখে তিনি বললেন,

মেহতার মনোভাবে আমাদের উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। ওঁর ভয়, ওঁর ওভার-ড্রাফ্‌ট্‌ নেওয়া হয়ত বন্ধ হবে। নিজের কেস উনি খারাপ করে রেখেছেন, সেটা সামলানো কঠিন!

রেবা বলল, ভারতের এগারোটা স্টেটে আমাদের প্রায় কুড়িটা ইউনিট, প্রত্যেক ইউনিটে কি আমাদের ইন্সপেকশন বাংলো নেই?

মৈত্র বললেন, আমাদের সতেরোটা ইউনিট, তার মধ্যে বারোটায় আছে ইন্সপেকশন বাংলো, পাঁচটায় আছে ফরেস্ট বাংলো! এগুলোয় শুধু মালীরা পাহারা দেয়।

একটু থামল রেবা। কি যেন ভাবল। পরে বলল, আচ্ছা মিষ্টার মৈত্র, আমাদের এ বাড়ির কাগজপত্রে এখানে কত জমি দেখানো আছে?

বাগান নিয়ে বলছেন? তা প্রায় নব্বই একর হবে!--মৈত্র বললেন, দীঘির দুই পারে ছিল দুখানা গ্রাম। এর চৌহদ্দিতে বেড়া দিতে তখনকার দিনেও লেগেছিল প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা। তবে নামমাত্র দামে কেনা তো? সমস্ত জমি দু লাখের মধ্যে রেজেষ্টারী হয়েছে।

রেবা বলল. মিঃ মৈত্র, আপনার সামনে দুটো পয়েন্ট তুলে ধরছি। হয় এ জমি ফিরিয়ে দিন মূল মালিকদের হাতে, আর নয়ত জয়ন্তবাবু যা বলছেন, এখানে কো অপারেটিভ গড়ে তুলে ডেয়ারি, পোলট্রি, ফল ফুলের চাষ আর কিছু কিছু হোম ইনডাষ্ট্রি আরম্ভ করে দিন। যারা জমি বেচেছিল, তাদের সেই অনুপাতে শেযার দেবেন। দীঘিতে মাছের চায করবেন।

মৈত্র বললেন, আপনার শেষের প্রস্তাবটিই ভাল মনে হয়। বাইরের জমি ছাডা আপনাদের বসতবাড়ি প্রায় তিরিশ বিঘে জায়গা নিয়ে আছে'

এ বাড়িটা নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করেছি, তবে এটার কথা ভাবতে আরও মাস ছয়েক সময় নিচ্ছি, মিঃ মৈত্র—রেবা বলল, জয়ন্তবাবুর ইচ্ছে এখানে মালটি-পারপাস স্কুল একটা হয়। আমরা যদি স্টাফ কোয়ার্টার বানিয়ে দিই, কাজটা তারাই চালায়। যাই হোক, পরে আপনার সঙ্গে এ নিয়ে একদিন বসব।

বেলা দেড়টা বাজে। মিঃ মৈত্র উঠে পড়লেন।

আহারাদির পর অপরাহ্ণের দিকে রেবা ও জয়ন্ত বড়বাড়ির সামনে এসে দেখল, মৈত্র মশায়ের গাড়িখানা তখনও দাঁড়িয়ে। ওরা দুজনে আপিস ঘরে এসে ঢুকতেই মৈত্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কাজ জমে গেছে অনেক কিনা—আজ আর হেড আপিসে যাবো না—

রেবা বলল, আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। মেহতার মনোভাব ভালো নয়। আপনি বাবার ঠিকানা কাবোকেই দেবেন না—

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ইন্দুমাকে পাঠিয়েছি বাবার সঙ্গে, —ওঁকে দেখাশোনা করার জন্যে। ইন্দুমা প্রত্যেক সপ্তাহে খরচের হিসেব পাঠাবেন। ওঁদের টাকা যেন নিয়মিত যায় দেখবেন।

শ্রীমতী রেবার এই প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করে মৈত্র মনে মনে তারিফ করলেন সন্দেহ নেই। বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওঁদের টাকা নিয়মিতই যাবে।

রেবা পুনরায় বলল, আপনি একটা প্ল্যান করুন পাঁচ বছরের। বাবা সুস্থ থাকতে তাঁকে দিয়েই এর উদ্বোধন করাবো। আপনি মাসখানেকের মধ্যে আমাকে খসড়াটা দিন মিস্টার মৈত্র।

মৈত্র বললেন, অত দিন লাগবে না তার আগেই দেবো। যদি দরকার হয়, জয়ন্তবাবুরও সাহায্য চাইব।

জয়ন্ত বলল, বেশ তো। এ একটা নতুন বিষয়। আমার ভালই লাগবে।

আরেক কথা মিস্টার মৈত্র, রেবা বলল, শোভনা দেবীর ব্যাপারটা জয়ন্ত বাবুই দেখছেন। উনি চাইছেন ব্যাপারটার একটা শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি হোক।

ঈষৎ উত্তেজনা এলো মৈত্রর মুখে চোখে। উনি বললেন, আমি খুবই অসুবিধেয় পড়েছি শোভনা দেবীর কেস নিয়ে। আজও পাওনাদার আসছে নতুন নতুন। এক জুয়েলারীর দোকান ওঁর কাছে আট হাজার টাকা পাবে। সেই জুয়েলারী উনি খুইয়েছেন বন্ধু মহলে।

হাসিমুখে জয়ন্ত বলল, আপনাদের অনেক টাকা—যাক না কিছু অপব্যয়ের মধ্যে দিয়ে।

মৈত্র এই হালকা চালের কথায় হেসে উঠলেন। পরে বললেন আমি মালিকের কথায় চলি। আপনারা যা বলবেন তাই হবে।

ওরা দুজন আপিস ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার খোলা অংশটা পার হয়ে যখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছিল, সেই সময় উপর থেকে নেমে আসছিল মোতিয়াবিবি। রেবা হাসিমুখে তাকে সম্ভাষণ করে বলল, টিফিন ক্যারিয়র নিয়ে কোথা যাচ্ছিস রে?

মোতিয়া বলল, বড় মেমসাহেবের খাবার। উনি এখন আউট হাউসে থাকেন।

রেবা তাকাল জয়ন্তর মুখের দিকে। জয়ন্ত বলল, চলো না ওঁর কাছে আগে হয়ে আসি? তুমিই তো ওঁকে আউট হাউসে সরিয়েছ।

বেশ, চলো—

আউট-হাউসের পুরনো ঘরগুলোয় চাকর ও ড্রাইভাররা থাকে। সেখানে এসে কখনও শোভনা দেবী জায়গা নিতে বাধ্য হবেন, এটা ভাবা যায়নি। মোতিয়া ওইটুকু সময়ের মধ্যেই জানিয়ে দিল, ছোঁয়াচে ঘা আছে বড় মেমসাহেবের গায়ে, সেজন্ত ডাক্তারকে বলে ইন্দুমতী ওঁকে বাড়ির থেকে বার করে দিয়ে গেছেন। রেবা ও জয়ন্ত এসে দেখল, আউট-হাউসের পিছন দিকের পুরনো ঘরখানায় শোভনা জায়গা পেয়েছেন।

মোতিয়ার পিছনে-পিছনে ওরা দুজন এসে সেই ঘরে ঢুকল।

কে ?—সাড়া দিলেন শোভনা।

আমি আর জয়ন্ত।

ও, তোমরা! এ ঘরে ঘেয়ো কুকুর জায়গা নিয়েছে, রেবা।

রেবা বলল, আমি তাকেই আরেকবার মা বলতে এলুম'

শোভনা চুপ করে গেলেন। জরা ধরেছে তাঁর। মুখে রং বা পালিশ নেই। পরনে আধ ময়লা একখানা সুতী শাড়ি। সর্বাঙ্গে তাঁর অসুস্থতার ছাপ সুস্পষ্ট। শোভনা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন।

জয়ন্ত বলল, আপনি কিছু ভাববেন না শোভনা দেবী। আমি আপনার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

কি ব্যবস্থা করবে, জয়ন্ত।

আপনার যেখানে যত দেনা আছে শোধ করা হবে। তাঁছাড়া আপনার ভরণপোষণের দায়িত্ব, আপনার—

শোভনা বললেন, আমি ফিরে যেতে চাই জয়ন্ত, আমার জন্মভূমি গুজরাটে। সেখানে আজও আমার বিধবা বোন আছে।

বেশ তো, তাই যাবেন ? একটু সেরে উঠুন'—আমি আপনার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ঘরের ভিতরটা ঝুপসি। এক কোণে মোটরগাড়ির এক রাশি লোহালক্কড় পড়ে রয়েছে। অন্তদিকে কাঁথাকুঁথি, ভাঙ্গা প্যাটরা, আমকাঠের খোলা পেটি—বাসা বেঁধেছে তার মধ্যে প্রচুর আরশোলা। ওদেরই পাশ কাটিয়ে এসে টিফিন ক্যারিয়রটি রেখে খাবার জলের ব্যবস্থা করে মোতিয়া একধার দিয়ে চলে গেল।

শোভনা বললেন, সেরে উঠতে চাইনে জয়ন্ত, আর এ বোধ হয় সারবেও না! ইন্দু টাকা দেয়নি! আমি আমার গ্যালারির সব ছবি ড্রাইভারকে দিয়ে বেচিয়ে এতদিন চিকিৎসা করালুম, কিছু হল না। যাই হোক, এবার আমি চলে যেতে চাই, জয়ন্ত।

রেবা স্তব্ধ রুদ্ধবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শোভনা বললেন, এ বাড়ি সাজানো ছিল বাইরের দিকে। কিন্তু কেউ কি জানত, রায়সাহেব আমার কেউ না, আমি রেবার কেউ না, রায়সাহেব রেবার কেউ না? এ আশ্চর্য বাড়ি, জয়ন্ত। আমরা দুজন পথেরই মেয়েছেলে, কিন্তু দুজনের দুই অবস্থা এখন আকাশ আর পাতাল! কেন জানো! হয়ত আমারই স্বভাবের ত্রুটি। রেবা মেয়ে হয়ে উঠেছিল বাপকে কুড়িয়ে পেয়ে, কিন্তু আমি মনের মতন মা হতে পারলুম না, জয়ন্ত।

রেবা থাকতে পারল না। বলল, আরও কথা আছে মা, জয়ন্ত সেই আত্মহত্যারি কাহিনীও জানে। যাক—আমার কথা এই, তুমি কোনও দিন মা হয়ে ওঠবার চেষ্টাও করনি। তুমি পঁচিশ বছর ধরে শুধু আমায় ঠকিয়েই এসেছ। সে প্রতারণার নোংরা ছবি আমিই শুধু দেখেছি। আমার পেটে তোমার বুকের দুধ এক ফোঁটাও নেই, ইন্দুমতী না থাকলে একথা কখনো জানতেও পারতুম না। এইসব কথা চাপা দেবার জন্যই তুমি একদিন বড়মার মৃত্যু ঘটিয়েছিলে।

জয়ন্ত ডাকল, রেবা—।

ক্ষমা করো, জয়ন্ত।—এই বলে রেবা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল।

জয়ন্ত বলল আমি আপনাকে কথা দিয়ে গেলুম, শোভনা দেবী, এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনার ব্যবস্থা করব। যাবার সময় একটি অনুরোধ শুধু জানাই, রেবার এই উত্তেজনাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

নমস্কার জানিয়ে জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

কিছুদূর পর্যন্ত একসঙ্গে চলল দুজন। তারপর বারান্দায় উঠে সিঁড়ি ধরল। ওরা দোতলায়। চুনারি ওদের দেখেই ছুটে গিয়ে রেবার মহলের চাবি খুলে আলোটা জেলে দিল। বিরাট দোতলাটা এখন শূন্য—খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। ভিতরে এসে জয়ন্ত নিজেই বসল একখানা চেয়ারে। রেবা বসল মুখোমুখি।

জয়ন্ত একটু হাসল। বলল, মৃত্যুর ওপর খাঁড়ার ঘা নাই দিলে, রেবা? তুমি তো অসংযত নও!

রেবা বলল, কিছু মনে করো না তুমি। আমি মা বলেই ডাকতে গিয়েছিলুম।

উনি মরে গেছেন অনেক দিন আগে। মা বলে কাকে ডাকবে?

রেবা চুপ করে গেল।

ওদিকে মিঃ মেহতা কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি তাঁর

দুই পয়সার অংশটাকে দু আনায় পরিণত করার জন্য চেষ্টা-চরিত্র করছিলেন বহুদিন থেকে, এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল, রায়সাহেবকে দিয়ে বোর্ডের কাছে প্রস্তাবটা তিনি তুলতেও পারবেন! ইদানীং রাজস্থানের নানা এলাকায় খনিজ সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে বহু প্রকার। সেই জন্য রাজস্থান ইউনিটের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মূল প্রতিষ্ঠানের দু আনা অংশের মালিক হতে না পারলে রাজস্থান ইউনিটের উপর দখল থাকে না। শ্রীমতী রেবা তাঁর এই উদ্দেশ্যের পথে মস্ত বাধা।

মিঃ মেহতা ছুটোছুটি করছিলেন। তাঁর হাতে বাজি একটা ছিল। সেটা রায়সাহেবের পারিবারিক জীবন। কয়েকটি গুজব ও কানাকানিতে সম্প্রতি মিঃ মেহতা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যেগুলি আগে তাঁর জানা ছিল না! তিনি জানতেন শোভনা রায়সাহেবের স্ত্রী এবং রেবা ওঁদের কন্যা। এখন তিনি জানলেন, রায়সাহেব শোভনার ন্যায় পতিপ্রাণা স্ত্রীকে ত্যাগ করে ইন্দুমতী নামক এক অজ্ঞাতকুলশীলাকে নিয়ে কোথায় যেন গা ঢাকা দিয়েছেন। শ্রীমতী রেবা রায়সাহেবের দ্বারা প্রতিপালিতা মাত্র, এবং রেবা তার নিজ জন্মকলঙ্কের একটি কাহিনী বহন করছে। এর মধ্যে এসে দাঁড়ায় এই বাউণ্ডুলে যুবক জয়ন্ত। এই ছোকরা নাকি কোন তান্ত্রিক দলের সঙ্গে যুক্ত, এবং বহু প্রকার বশীকরণের মন্ত্রাদি জানে। এই মন্ত্রের দ্বারা প্রথম সে বশ করে রেবা ও ইন্দুমতীকে, এবং তারপর রায়সাহেবকে ভুলিয়ে মধ্য কলিকাতার কোন এক ফ্ল্যাট বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দলিলাদিতে সই-সাবুদ করায়। কিন্তু এ ব্যাপারটি সহজে হয়নি! জনৈক নেপালী তার মস্ত একখানা কুকরি নিয়ে রায়সাহেবকে ভীতিগ্রস্ত করে রাখে প্রায় এক সপ্তাহ। এই এক সপ্তাহকালের মধ্যে তিনি কয়েকটি বিধিনিষেধ পালন করতে বাধ্য হন এবং তাঁকে মদ্য, মাংস, মাদক, মৎস্য ও মোহিনী—এগুলির থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। ইতিমধ্যে ওই তান্ত্রিক ছোকরাটি শ্মশানের থেকে একপ্রকার চর্বির সঙ্গে কি যেন বন্যলতার নির্যাস মিশিয়ে এনে রায়সাহেবকে খাওয়াতে থাকে। ফলে, সপ্তাহান্তে রায়সাহেবের স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, এবং সম্পূর্ণ বিভ্রান্তভাবে কয়েকটি দলিলে তিনি সই দেন!

রায়সাহেবের এই ব্যাপারটি নিয়ে মিঃ মেহতা তাঁর বিশেষ প্রিয়বান্ধবী শ্রীমতী শোভনা দেবীর সঙ্গে তিন চারদিন ধরে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন, কিন্তু তাঁর এবম্প্রকার আলোচনা ও গুজব রটনার সংবাদটি যখন সিঙ্গিবাগানের ফ্ল্যাটে রেবার কানে ওঠে, রেবা সেখান থেকেই মৈত্রকে জানায়, শোভনাকে ওবাড়ি থেকে সরিয়ে দিন এবং আমার অনুপস্থিতিতে মেহতা যেন অফিস

ঘর ছাড়া আমাদের বাগানবাড়ির অন্য কোথাও না যান। মিঃ মৈত্র তৎক্ষণাৎ এক চিঠি মেহতার উপর এই নিষেধ আরোপ করেন এবং বিষধর সর্প যেমন মাথার উপরে আঘাত পেয়ে গর্তে গিয়ে ঢোকে, শ্রীমতী শোভনাও তেমনি আউট-হাউসের পিছনের ঘরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। রায়সাহেবের পুরনো বৃদ্ধ চাকরটি এতদিন পরে শোভনার পরিচয়টি সকলের কাছে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিল।

কিন্তু এই প্রকার একটা হুজুগ তুলতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন মিঃ মেহতা নিজে। তিনি বিষয়ী লোক, কিন্তু তাঁর মাত্রাবোধ ছিল কম। তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, কিন্তু লোভ তাঁর সেই বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছিল। তিনি টাকা দিয়ে শেয়ার কেনেননি, কিন্তু বিশেষ বিশেষ সর্তাধীনে তীক্ষ্ণধী রায়সাহেব তাঁকে দু পয়সার শেয়ার দিয়েছিলেন মাত্র—সেটা কেবল সর্তাধীন প্রতিশ্রুতি।

সেদিন আপিসের টেবলে বসেই মেহতা পিওন বই মারফত একখানা সীল করা চিঠি পেলেন। চিঠি পাঠাচ্ছেন মৈত্র, চিঠিতে সই রেবা ও জয়ন্তর। মিঃ মেহতার দু' পয়সার প্রতিশ্রুত অংশ ফিরিয়ে নিচ্ছেন এই প্রতিষ্ঠান, এবং সেটি নাকচ করা হচ্ছে। এই পত্র পাবামাত্র মিঃ মেহতা যেন তাঁর ওভারড্রাফটের সম্পূর্ণ হিসাবটি দাখিল করেন। এ সম্পর্কে আদালতের আশ্রয় যদি নিতে হয়, তাহলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষের আইন বিশেষজ্ঞ বিশেষ দুঃখিত হবেন।

সেই রাত্রেই মেহতা ছুটে গিয়েছিলেন সিঙ্গিবাগানের ঠিকানায়। কিন্তু তালাবন্ধ ফ্ল্যাটের সামনে যে নেপালী কুকরি নিয়ে বসেছিল, সে মেহতাকে ভাগিয়ে দেয়।

॥ ১০ ॥

রায়সাহেব চেয়েছিলেন একটা নিরিবিলি বসবাস। তাঁর নির্দেশ ছিল এই, সেখানে সংবাদপত্র যাবে না, নাগরিক জীবনের ঢেউ পৌঁছবে না, এবং আপিস থেকে কেউ তাঁর উপদেশ অথবা পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখবে না। এটি তাঁর সন্ন্যাস নয়, কিন্তু আত্মগোপন। রেবা, জয়ন্ত এবং মৈত্রমহাশয় ভিন্ন অপর কেউ তাঁর খবর রাখে, এটি তিনি চান না। ই মনোভাবটি নিয়ে তিনি যখন আলোচনায় বসেছিলেন, জয়ন্ত তখন প্রস্তাব করল, বাঙ্গালী মাত্রেরই কাছে আপনার নামটি পরিচিত, সুতরাং বাঙ্গালীপ্রধান এলাকায় আপনার পক্ষে থাকা চলে না। অতএব শেষ পর্যন্ত স্থির হয়, বিহার ও বাঙ্গলায় ঠিক মাঝামাঝি একটি জায়গায় তিনি তাঁর ডেরা পাতবেন।

মৈত্রমহাশয় দিন তিনেকের জন্য মিহিজামের ওদিকে গিয়ে একটি বাড়ি ঠিক করে আসেন। বাড়িটি ভাড়া নেন মৈত্রমহাশয় নিজের নামে। বাড়িটি পাহাড়তলীর কাছাকাছি। সামনে ঢেউ-খেলানো মস্ত প্রান্তর এবং জনবিরল। বাড়ির ভিতর দিকে বড় ফুলবাগান। আশেপাশে কয়েকটা পেঁপে, ইউক্যালিপ-টাস ও কুলগাছ। এটি এক সৌখীন প্যাটার্নের বাংলো। বাইরের দিকে বড় একটা ইঁদারা। লতানে গোলাপের চারা এখানে ওখানে। আশেপাশে সন্ধ্যামণি। পিছন দিকটায় গ্যারাজ ও চাকর-বাকরের ঘর। রান্নামহলের বারান্দা ছেড়ে নিচে নামলেই সামনে লাউমাচা। সমস্ত বাগানটা তদ্বির-তদারক করে একটি বর্ষীয়সী সাঁওতালি স্ত্রীলোক। তার সঙ্গে থাকে তার এক জোয়ান মেয়ে। সে কামিনের কাজ করে পি-ডব্লু ডির নির্মাণের কেন্দ্রে। সকালের ট্রাকে বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যার দিকে ফেরে। ওদের ঘরের পাশের ঘরটায় উঠেছে রায়সাহেবের ভৃত্য বাহাদুর সিং—মাধো সিংয়ের কনিষ্ঠ সহোদর।

বাহাদুরকে নিয়ে রায়সাহেব এই সুন্দর বাংলোটিতে একা থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রেবা রাজি হয়নি। একদিন কি একটা কথার উত্তরে রেবা বলল, বাবা আমি তোমার প্রকৃত মেয়ে নই, আর তুমিও আমার সত্যিকার বাবা নও। তুমি প্রতিপালক পিতা, আমি তোমার পথে কুড়নো মেয়ে। তার ফলে কি হয়েছে জানো? সম্পর্ক সহজ হয়েছে, সঙ্কোচ ঘুচেছে।

আমি সেকথা স্বীকার করি, মা।

রেবা বলল, শোন বাবা, প্রবীণ বয়সে কেউ ভালবাসা খোঁজে না। খোঁজে স্নেহ, শান্তি আর সেবা। তুমি বিরক্ত হোয়ো না বাবা, ইন্দুমতীকে আমি সঙ্গে দিচ্ছি। দুনিয়ার সবাই জানে আমাদের বাড়িতে ইন্দুমতী চাকরি করেছেন আঠারো বছরেরও বেশি। আমাকে সত্যি সত্যি তিনিই মানুষ করেছেন। বড়মা মারা যাবার আগে ওঁর একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করবার কথা তোমাকে বলেছিলেন, শুনেছিলুম তুমিও তাঁকে কথা দিয়েছিলে। এগুলো কি সত্যি নয়, বাবা?

সব সত্যি মা।

জয়ন্ত মাঝখানে ব'সে বলল, আরেকটা কথা বোধহয় আমাদের ভেবে দেখা উচিত রায়সাহেব।

রায়সাহেব মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন। জয়ন্ত সেদিন বলল, মেয়েছেলের জীবনে শ্রেষ্ঠ কাল আরম্ভ চোদ্দ বছর বয়স থেকে। কিন্তু সেই কালের আঠারোটি বছর ইন্দুমতী আপনার ঘরকান্নায় উৎসর্গ করেছেন। তাঁর বিয়ে, সংসার, সন্তান, সংস্থান—কোনটাই আপনার জন্য বা রেবার জন্য হতে পারেনি।

শোভনা দেবী ওঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন অকারণে—কিন্তু আবার আপনার মেয়েই তাঁকে ফিরিয়ে আনল। ধরুন, আপনি হয়ত কিছু টাকা দিয়ে ইন্দুমতীকে আবার সরিয়ে দিতে পারেন, মুখ বুজে তিনি চলেও যাবেন,—কিন্তু বোধ হয় ওটাকে ঠিক সোশ্যাল জাষ্টিস বলা চলবে না, রায়সাহেব।

রায়সাহেব বললেন, আমরা পুরনো কালের লোক, জয়ন্ত। সুতরাং আমাদের ভাবনা-চিন্তায় কথায়-আচরণে পুরনো কালের বিবেচনাটাই এসে পড়ে।

রেবা হেসে উঠল,—বাবা, নতুন-পুরনো সব কালেই সোশ্যাল্ জাষ্টিসের কথা থাকে। তুমি নিজে হাতে পথে কুড়নো মেয়েকে সর্বস্ব দিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু আঠারো বছর ধরে যে মেয়ে তোমার ঘরে ব'সে তার সমস্ত বয়সটা উৎসর্গ করল, সে কি তোমার ওই বকশিসের আশায় বসেছিল?

রায়সাহেব বললেন, কিন্তু ইন্দুমতী আমার সঙ্গে গেলে তার আর আমার পরিচয়টা কি প্রকার হবে, মা?

খুব সহজ, বাবা। সে তোমার সেবিকা, ধাত্রী, অসময়ের বন্ধু। ইন্দুমতী নাবালিকা নয়, সে জানে সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। সে ওখানকার ছোট ইস্কুলটায় একটা কাজ নেবে। তার শরীর স্বাস্থ্য এখনও খুব মজবুত। তুমি অমত করো না, বাবা।

রেবা সেদিন যখন খাবার তৈরি করতে গেল, সেই ফাঁকে জয়ন্ত বলল, ক্ষমা করবেন, ইন্দুমতীকে আপনার সঙ্গে পাঠাবার প্রস্তাব আমিই করি। রেবার মনে কিছু সংশয় ছিল, পাছে আপনার এই বয়সে কোনও অখ্যাতি রটে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, ইন্দুমতী আপনার অপ্রিয় নন্। তাঁর মন ভদ্র, ব্যবহার সংযত! তার চেয়ে বড় কথা তাঁর মন স্নেহশীল। আপনার প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্বও আছে। আপনার কাছে থাকলে তিনি আনন্দও পান।

রায়সাহেব বললেন, তোমার ড্রাইভটা আমি বুঝি জয়ন্ত। আমার প্রকৃতিতে কিছু শৈথিল্য যে নেই তা নয়। তবু কথা একটা থাকে। আমার স্ত্রীকে হারিয়েছি আমি চল্লিশ বছর বয়সে, কিন্তু মূলত আমি পত্নীব্রতী! ইন্দুমতী সেখানে কোন্ মর্যাদা নিয়ে আমার কাছে দাঁড়াবে? সে ভদ্রঘরের মেয়ে, তার সম্ভ্রমবোধ আছে!

সেই সম্ভ্রমবোধের দায়িত্ব আপনিই নেবেন, রায়সাহেব।—জয়ন্ত বলল, কিন্তু একটি কথা আপনার কাছে নিবেদন করব। আপনি আমারও পিতৃতুল্য। আমি বলব, আপনার স্নেহ এবং সুবিচারের ইচ্ছা যদি সত্য হয়, আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। আপনার মেয়ে রেবাই বলে, ভয় মানেই দুর্বলতা, আর এই দুর্বল ভীরুতার থেকে অশ্রদ্ধার জন্ম! আপনি পত্নীব্রতী নন্, পত্নীচিন্তাব্রতী!

বাইশ-তেইশ বছর আগে সেই পত্নীর মৃত্যু ঘটে গেছে! কিন্তু আপনার সেই চিন্তাব্রত কি এমনিই যে, কোন নারীর কোনও আন্তরিকতা আপনাকে স্পর্শ করে না? বাইশ বছর আগে যে-জীবন শেষ হয়ে গেছে, বাইশ বছর পরেও সেই মৃত্যু শাসন করতে থাকবে চল্‌তি কালের জীবনের সুখ-দুঃখ? নতুন কালের ফুল-ফল-ফলন-ফসল—এরা কি কিছু নয়? যেটাকে বলছেন আপনার প্রকৃতির শৈথিল্য সেইটিই আপনার মূল প্রকৃতি। স্বভাবের সহজ অভিব্যক্তিকে শৈথিল্য বলছেন কেন? আমার মনে হয়, কোথায় যেন আপনার ভুল ঘটে যাচ্ছে! মৃতা পত্নীর পবিত্র স্মৃতি এক জিনিস, কিন্তু সেই স্মৃতি যদি আজকের এক সেবাপরায়ণা সর্বত্যাগিনী মেয়ের প্রতি আপনাকে বিমুখ করে তোলে, —তাহলে এ নিয়ে আপনার মনেই প্রশ্ন উঠবে।

রায়সাহেব চুপ করে গিয়েছিলেন।—

সেদিন জয়ন্ত ও রেবা হাওড়া স্টেশনে এসে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় রায়সাহেব ও ইন্দুমতীকে তুলে দিয়ে গেল। মি. মৈত্রর একজন বিশ্বস্ত সহকারী ও বাহাদুর সিং চলল পাশের গাড়িতে।

বাড়িটির নাম 'দেওগড'। ছোট বড শোবার ঘর চারখানা। কিছু কিছু আসবাবপত্র থাকার জন্য বসবাসের সুবিধা হয়েছে। যে দুটি ঘর পাশাপাশি এবং মাঝখানে একটি দরজা, সেই দুটি ঘরে ওঁরা দুজনে উঠেছেন। খরচপত্র এবং বিলিব্যবস্থা যা কিছু সমস্তই ইন্দুমতীর হাতে। রায়সাহেব বলেছেন, টাকাপয়সা তিনি কিছু ছোঁবেন না। তিনি বাকি জীবনের সব হিসাবপত্র ভুলতে চান।

আসবার সময় তিনি সঙ্গে এনেছেন রাশি রাশি বই। ইংরেজি, বাঙলা, এবং বহু রকমের অনুবাদ গ্রন্থ। জয়ন্ত কিনে দিয়েছে বহু ইতিহাস, জীবনী, অভিযানিক কাহিনী, রাজনীতি, সমাজদর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বই। এ ছাড়া বেদ, উপনিষদ্, বেদান্তের ভাষ্য, মহাভারত ও রামায়ণ, বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যান ইত্যাদি। রায়সাহেব অতঃপর সংবাদপত্রাদি পড়বেন না, পাছে চিন্তাবিভ্রম বা মানসিক উত্তেজনা ঘটে। কিন্তু রেবা সেকথা শোনেনি। ইন্দুমতীর নামে দু'খানা ইংরেজি-বাংলা কাগজ এবং খানচারেক মাসিক ও সাপ্তাহিক বরাদ্দ করে দিয়েছে।

দেওগড় বাংলোটি যিনি নির্মাণ করেছিলেন, তিনি মারা গেছেন বছর-খানেক আগে। রেখে গেছেন দুটি নিতান্ত নাবালক ছেলেমেয়ে এবং একটি বিধবা। তাঁরা থাকেন কলকাতায়। এ বাড়ি কবে তাঁরা ফেরৎ চাইবেন, তার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ইন্দুমতী এ বাড়িতে এসে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই

ঘরদোর গুছিয়ে তুললেন। তাঁর জীবনে এই প্রথম পুরুষের ঘর গোছানো! অন্যের ঘরকে নিজের মনে করার জন্য মেয়ের জন্ম। কিন্তু মেয়ের জীবনের সাঁইত্রিশটি বছর কেটে যাবার পর যে-ব্যক্তির সঙ্গে ইন্দুমতী এসে ঘরকন্না পাতলেন সেই ব্যক্তি তাঁর চেয়ে পঁচিশ বছরের বড়। এখানে পুরুষের জীবনে ছাপ রেখে গেছে অগণিত সংগ্রামের ইতিহাস, বিচিত্র ঘটনা পরম্পরা, সংখ্যাতীত অভিজ্ঞতার বিবিধ কাহিনী, এবং সকল কর্মের শেষ অধ্যায়ে পৌঁছিয়ে সর্বস্ব ত্যাগের নাটকীয় মনোবৃত্তি। শক্তি, সাধ্য, উদ্দীপনা, অধ্যবসায়, যৌবনধর্মের সর্বপ্রকার চেতনা, —এদের কোনটাই আর রায়সাহেবের বয়সে আশা করা চলে না। অন্যপক্ষে, ইন্দুমতীরও তাই। আঠারো বছর ধরে ভিতরে ভিতরে তিনি শুকিয়েছেন বাড়িতে এবং তারপরের পাঁচ বছর ভবানীপুরের সেই বস্তির ঘরে শুকোতে শুকোতে কেটেছে! এখন তিনি এসে পৌঁছেছেন যৌবনের প্রায় শেষ প্রান্তে।

একদিন রায়সাহেব তাঁকে ডাকলেন। বললেন, ইন্দু, আপাতত তোমার সেলাই-ফোঁড়াই রাখো। কাছে এসে মুখোমুখি বসো।

ইন্দুমতী হেসে বললেন, মুখোমুখি কেন? আপনার সঙ্গে আমার চাকর-মনিব সম্বাদ। দূরে দূরে বসাই ত' সঙ্গত!

কথাটা মিথ্যে নয়—রায়সাহেব বললেন, প্রথমে তোমার মাইনে ছিল পঁচিশ, আমার বেশ মনে পড়ে। আঠারো বছর পরে সেই মাইনে হয় দেড়শ। কিন্তু শোভনা তোমাকে তাড়িয়ে দেবার পর তোমার দিকে আমার মনোযোগ গেল। তোমার ওপর অবিচার ঘটে গেছে মনে করে তোমার ঘরে যাতায়াত আরম্ভ করে দিলাম।

ইন্দুমতী বললেন, আপনি মদ খাওয়া ছেড়েছেন, এই আমার সৌভাগ্য! বড়দির মারা যাওয়াটা আপনার কোনদিনই সহ্য হয়নি! সেই থেকেই আপনি মদ ধরেছেন। আমার বয়স তখন বছর পনেরো। আপনাকে এই চেহারায় দেখে ভয়েই পালাতুম।

রায়সাহেব বললেন, অথচ দেখো, মদের যুগই হল আমার ব্যবসার প্রধান উন্নতির যুগ। পারিবারিক জীবনে নানা দুর্যোগ, স্ত্রীর আত্মহত্যা, শোভনার কদর্য অনাচার, রেবার অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ, চারদিকে আমার নিন্দে আর কলঙ্ক রটনা,—কিন্তু অন্যদিকে? যেদিকে হাত বাড়াই, মুঠো-মুঠো সোনা! যে কাজটাই ধরি, অজস্র টাকা যেন হেঁটে আসে! কিন্তু আশ্চর্য, সেই টাকা খাচ্ছে যারা তারা সবাই বাইরের লোক, আর ঘরের মধ্যে বসে যে-ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি অপচয় করেছে, সে কে—আজও তাকে চিনিনে!

ইন্দুমতী বললেন, শোভনাকে আপনার আনাই উচিত হয়নি!

আমি ঠিক আনিনি ইন্দু, আমাকে ধ'রে সে আসে তোমার বড়দির কাছে। পায়ে ধরে কান্নাকাটি ক'রে বলে, আমার এই আঁতুড়ে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও আমার ঠাঁই হবে না দিদি। তোমার বড়দি ছিলেন নিঃসন্তান। ওই ফুটফুটে বাচ্চাটাকে দেখে তিনি আনন্দে আত্মহারা হলেন! ও-বাচ্চাটা যে শোভনার নয়, এটা তিনিও জানলেন অনেক দিনের পর। ওকথা তিনিও প্রথমটা বুঝতে পারেননি যে, শোভনা বাচ্চাটাকে মানুষ করিয়ে নিতে চায়, নিজে মানুষ করতে চায় না।

ইন্দুমতী বললেন, আপনি যা জানেন না, বড়দি তাও আমাকে বলে গেছেন। শোভনা একটি দিনের জন্যেও বেবাকে বুকে নেয়নি।

রায়সাহেব একটু থেমে বললেন, হুঁ, আমিও জানি। সে যাই হোক, তোমার কথায় আসি। তোমার বড়দির ইচ্ছে ছিল তোমাকে ভাল করে লেখাপড়া শিখিয়ে তোমার বিয়ে দেবেন। তোমার সেই দিদিমা মারা যাবার পর তোমার ওই বৈমাত্রেয় ভাইটি ছাড়া আর কেউ তোমার ছিল না!

ইন্দুমতী হাসিমুখে বললেন, সেদিন আমার বিয়ে হয়ে গেলে আজ আপনার এখানে কে থাকত?

সেইজন্যেই ভাবছি ইন্দু, মানুষের জন্মের থেকে কে যেন তার সমস্ত ভবিষ্যতের ঘটনাকে আগেভাগে সাজিয়ে রাখে।—রায়সাহেব বললেন, তবু আজ তোমাকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করছি, তোমার মনে কি কোথাও কোনও ব্যথা জমা আছে?

পশমের বোনা থেকে ইন্দুমতী মুখ তুললেন। বললেন, এতদিন পরে এসব কথা আপনার মনে আসছে কেন বলুন তো? আপনি পাঁচ-ছ' বছর ধরে আমার ওখানে আনাগোনা করছিলেন, কখনও কি দেখেছেন আমি কোনও দুঃখ আপনাকে জানিয়েছি?

রায়সাহেব চুপ করে গেলেন। আলোচনা ওখানেই শেষ হয়েছিল।

একে একে চারখানা ঘর ইন্দুমতী গুছিয়ে তুলেছিলেন। এই মেয়ের মধ্যে ছিল সংসারকে সুন্দর ক'রে তোলবার একটি অবরুদ্ধ বাসনা—সেটি প্রকাশ পাচ্ছে এই বাড়িতে। প্রত্যেকটি ঘর এখন যেমন পরিচ্ছন্ন তেমনি সুসজ্জিত। সাঁওতালি ঝি রোজ সকালে রাশিকৃত ফুল এনে দিয়ে যায়, ইন্দুমতী সেই ফুল রাখেন ফুলের ভাস-এ। ধূপ জ্বালিয়ে দেন ঘরে ঘরে। অতি মিহি আওয়াজে তাঁর নিজের ঘরে রেডিয়োটি খুলে দেন। তিনি নিজের হাতে ঘর-দোর পরিষ্কার করেন,—ঝিকে ঢুকতে দেন না, কেননা ওই প্রবীণা স্ত্রীলোকটির চেহারাটি সুশ্রী নয়। সকালে রায়সাহেবের আহারাদির পাট আছে, এবং

সে ব্যাপারে রেবার কড়া নির্দেশ ছিল। দুধ, ফল, মাখন, বাদাম, ক্রীম, ছানা, মালাই,—এসব ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার তাজা শাকসব্জি, নানাবিধ জেলি ও জুস, নানারকমের আচার—কোনটা বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। পুরুষ মানুষ খবর রাখার সময় পায় না, মেয়েরা কেমন ক'রে প্রতিবার আহার্য-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। শুধু ঘড়ির কাঁটা ধরে যখন-তখন-খুশি খাওয়ানো নয়। ওর মধ্যে কিছু বৈজ্ঞানিক বিবেচনাও থাকা দরকার। ইন্দুমতী এগুলি সব জানেন।

ইন্দুমতী এটি লক্ষ্য করেছেন, মদ্যপান পুরুষের মনে সৃষ্টি করে আত্মাভিমান ও অহমিকা। মদ্যপান ত্যাগের পর সেই সব অহমিকার অবশেষ হয়ত আজও কিছু আছে। ইন্দুমতী সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক। রায়সাহেব বয়সে প্রবীণ, কিন্তু তাঁর বার্ধক্য নেই। তাঁর স্বাস্থ্য প্রচুর এবং প্রবল। চেহারা তাঁর সুশ্রী, দুই কানের পাশে কিছু কিছু চুলে পাক ধরেছে মাত্র। সেদিন একটি ছড়ি হাতে নিয়ে রায়সাহেব সামনের ময়দানে নেমে আবাদি জমি পার হয়ে পাহাড়ের তলা দিয়ে যখন হেঁটে চললেন দূর থেকে দূরে, ইন্দুমতী সেই হাঁটার দিকে চেয়ে খুশি হলেন। ঘণ্টা চারেকের মধ্যে রায়সায়েব প্রায় মাইল দশেক হেঁটে এলেন। এছাড়া সম্প্রতি তিনি বাগানের দিকে মন দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। খোন্তা দিয়ে তিনি মাটি খোঁড়েন, আগাছা তুলে ফেলেন, গোলাপের চারার ডগা ছেঁটে দেন,—বাগান তৈরির সখ তাঁর চিরকালের।

সেদিন তরকারির খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ইন্দুমতী হাসছিলেন। বললেন, আপনার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই,—আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, আমার দুঃখ্ ব্যথা কিছু আছে কিনা। আমাদের বাড়িতে সাত জন্মে কেউ মেয়ে-মানুষের সুখ দুঃখের খোঁজ করেনি। আমি শুধু ভাবছি আমার ভাগ্য অনেক ভাল।

বই থেকে মুখ তুলে চশমাখানা সরিয়ে রায়সাহেব হেসে বললেন, হঠাৎ সকালবেলায় তোমার ভাগ্য ভালো হয়ে উঠল কেমন করে, ইন্দু?

নয়ত কি?—ইন্দুমতী বললেন, আপনি যে অম্বলের ব্যামো নিয়ে আসেননি এই রক্ষে। আমার এক মামা ছিলেন বুড়ো হাবড়া, দিনরাত তাঁর দাঁতের-যন্ত্রণা, পেটে অজীর্ণ, কথায় কথায় অম্বলের ব্যথা, মেজাজ তিরিক্ষে, ঘরে বসে' রাতদিন খিট-খিট করা। শুধু মাসে একদিন ঘর থেকে বেরোতেন বাহান্ন টাকা পেনসন আনতে।

ধরো, আমিও যদি সেই রকমটি হতুম।

হলে সহ্য করতুম,—আমার যে মেয়ে জন্ম। সবাই বলে, মেয়েমানুষ অবলা, বড্ড নরম ওরা।—ইন্দুমতী বললেন, এসব ছেলেমানুষি কথা। লোহার চেয়ে

যারা শক্ত, তাদের বলছে অবলা। চেয়ে দেখুন রেবার দিকে, কী বিরাট বোঝা আপনি চাপিয়েছেন তার ঘাড়ে? কী আশ্চর্য শক্তি ওই মেয়ে সঙ্গে এনেছে ভাবুন তো? একবার ভাল করে ভেবে দেখুন তো, আপনার মতন এক ক্রোরপতির সকল দায়িত্ব আমি মাথায় তুলে নিয়েছি নির্ভয়ে? আপনার ওজন কি আপনি জানেন না? এসব বাদ দিয়ে আমি ভাববো আমার নিজের ব্যথা? তার চেয়ে আপনার পায়ের কাছে মাথা রেখে মরব আমি, সে ভালো।

রায়সাহেব হাসিমুখে চশমাখানা চোখে দিয়ে আবার তাঁর বইখানার প্রতি মনঃসংযোগ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দ্রুতপদে বাহাদুর সিং সামনে এসে বলল, মাজি, দিদিসাব আর ছোটবাবু এসেছেন।

এসেছে? কই?- ইন্দুমতী সব ফেলে উঠে দৌড়ে গেলেন। বাগান পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে গেলেন ফটকের দিকে। রেবা ও জয়ন্ত তখন গাড়ি থেকে নেমেছে। এখানা সেই বড় নতুন গাড়ি—তেওয়ারি চালিয়ে এনেছে।

হেসে উঠল সকলে। ইন্দুমতী বললেন, একটু আগে, আধ ঘণ্টাও হয়নি—তোমাদের নাম করছিলুম।

রেবা বলল; ভোর পাঁচটায় বেরিয়েছি সিঙ্গিবাগান থেকে। অনেক আগেই পৌঁছতুম। কিন্তু তোমার জয়ন্তর কথায় কথায় খিদে। একবার বর্ধমানে, একবার আসানসোলে—খেতে খেতে আসছি। এইতেই বেলা সাড়ে এগারোটা হয়ে গেল।

এসো জয়ন্ত, ভেতরে চলো।- ইন্দুমতী বললেন, সব তৈরি আমার, যা চাইবে। এসো—

জয়ন্ত বলল, সকলের আগে কফি।

বেশ তো, দুমিনিটে দেবো।

বাঃ কী সুন্দর জায়গাটা!-জয়ন্ত বলল, দেখে নাও রেবা, পাহাড়ে মাঠে ময়দানে বনে—সব মিলিয়ে যেন কবিতা।

ওরা সবাই এসে উঠল বারান্দায়। রায়সাহেব সামনে এসে দাঁড়িয়ে জয়ন্তকে সমাদর জানালেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে রেবা বলল, বাবা, একমাস এখনও হয়নি, তোমাদের চেহারা কিন্তু বেশ ফিরেছে। বা., চমৎকার বাংলো তোমাদের। সময়টাও এখন খুব ভাল।

রায়সাহেব বললেন, তোমাদের দুজনের মাথায় জগদ্দল পাথর চাপিয়ে এসেছি—একটু আগে ইন্দুমতী তাই খোঁটা দিচ্ছিলেন। এসো জয়ন্ত, তোমাদের ঘরদোর দেখে নাও। এদিকে তুমি প্রথম এলে, তাই না?

জয়ন্ত বলল, লোকসমাজে বলতে লজ্জা পাই, কিন্তু আসানসোল পর্যন্তই

আমার দৌড়। তাও এসেছিলুম আমার ছোট ভাই হেমন্তর চাকরির ব্যাপারে—ওই বার্নপুরে।

গ্যারাজে গাড়িখানা তুলে তেওয়ারি দুটো ফল আর সব্জির ঝুড়ি এবং একটি তোরঙ্গ একে একে নামিয়ে আনল। তা ছাড়া ওদের সঙ্গে ছিল হোল্ড-অল্ আর গোটা দুই বড় সুটকেস। ওরা বেরোচ্ছে ভ্রমণে। জয়ন্ত হাসিমুখে বলল, এই প্রথম বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল।

এই ফাঁকেই ইন্দুমতী কফি আর বাদাম এনে দিলেন দুজনকে। পরে বললেন, অত রাশি রাশি ফল সব্জি আর ওইসব টিন প্যাকিং এনেছিস, অত কি হবে বল তো রেবা? তোরঙ্গয় কি?

রেবা বলল, ওসব জয়ন্তর ফরমাস, ইন্দুমা। বাবার জন্যে ধুতি, পাঞ্জাবি, পাজামা, সোয়েটার,—তোমার সব কাপড় চোপড়, স্লিপার, - তারপর বাদ বাকি খুলে দেখো। বাবা, এবার তোমাকে সু-খবর একটা দিই। আমি স্কলারশিপটা পেয়ে যাচ্ছি, আর জয়ন্তও ইউনিভারসিটির অফার অ্যাকসেপ্ট্ করেছে। সামনের বছরের মার্চ থেকে আমরা কাজ আরম্ভ করব।

ইন্দুমতী বললেন, বাগানবাড়িতে এখন কে রইল?

রইল কেবল ঝি চাকররা। বাইরের দিকে রইল দারোয়ান আর ড্রাইভাররা আর দীঘির ওদিকে শচীন, মালী—এরা সব।

যে-প্রশ্নটা তোলবার রুচি রায়সাহেবের একেবারেই ছিল না, সেটি ইন্দুমতীই তুললেন, শোভনাদির কি খবর?

রেবা ঈষৎ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, জয়ন্ত জানে।

জয়ন্ত কফির পেয়ালাটা শেষ ক'রে সরিয়ে রেখে বলল, ওঁর ব্যাপারটা বড় দুঃখদায়ক। উনি শেষের দিকে আউট হাউসে উঠেছিলেন। কিন্তু সেখানেও মিঃ মেহতা ওঁকে নিয়ে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলেন। এদিকে রেবা চটে লাল হয়ে মেহতার শেয়ার বাজেয়াপ্ত করে। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল শোভনা দেবীকে এবার সরানো দরকার। সেই জন্য আমিই প্রস্তাব করলুম, ওঁর সমস্ত দেনা চুকিয়ে ওঁর হাতে কিছু টাকা দিয়ে ওঁর সেই দেশে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। মৈত্রমশায় রাজি হলেন। শোভনা দেবীর দেনা ছিল প্রায় বিশ হাজার টাকা। ওঁর সর্বাঙ্গে যে রোগ ফুটেছে তার চিকিৎসা, ওঁর স্বাস্থ্যোদ্ধার আর সব রকমের খুচরো খরচ,—সব মিলিয়ে হাজার পাঁচেক। আর উনি যে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে ও-বাড়িতে রেবার মা বলে পরিচিত ছিলেন তার জন্য পঁচিশ হাজার টাকার গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটি ওঁর নামে,—এই সব ব্যবস্থা করে প্রায় হপ্তা দুই আগে মৈত্রমশায় ওঁকে আহমেদাবাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মোতিয়া বিবি ওঁর সঙ্গেই চলে গেছে।

বিবরণ শেষ করার আগে জয়ন্ত একটু হাসল। বলল, শোভনা দেবী খুব নির্বোধ ছিলেন না। গত বিশ বছরে তিনি প্রায় পাঁচশ' গিনি জমিয়ে ব্যাঙ্কের জন্টে রেখেছিলেন। যাবার সময় সেগুলোর কথা তিনি ভোলেননি।

রায়সাহেব গম্ভীর ঔদাসীন্যের সঙ্গে শোভনার শেষের কাহিনীটুকু যখন শুনে যাচ্ছিলেন, রেবা তখন নতমুখে নিঃশব্দে বসেছিল। ইন্দুমতী শুনে বললেন, পাঁচশ'খানা গিনি। বলো কি জয়ন্ত? মরুক, যাক্, পাপ এতদিনে বিদেয় হল।

রায়সাহেব ইন্দুমতীর মন্তব্যে হঠাৎ হেসে উঠলেন। বললেন, আগাগোড়া সবটাই পাপ নয়, ইন্দু। পঁচিশ বছর আগে একদিন আমার বন্ধু লুইস জোন্সের সঙ্গে গিয়ে যদি শোভনাব জিপসি নাচ দেখে হাততালি না দিতুম, তাহলে কি আমার এই কন্যারত্নটিকে পেতুম? হোক শোভনার প্রতারণা, থাক্ তার যত রকমের অসৎ আচরণ,—কিন্তু সে যে তার নিজের বাচ্চাকে ভাসিযে ওই আঁতুড়ে বিছানায় শুয়েই কোন কৌশলে কার যেন একটা মেয়ে-বাচ্চাকে কিনল, সেই মেয়েই ত' আজ আমার পরম সৌভাগ্যের চিহ্ন, জয়ন্ত।

ইন্দুমতীও ছাডবার মেযে নয়। তিনি বললেন, আপনাকে ধাপ্পা দিযে আপনারই টাকায সে মেযে কিনেছে। কিন্তু কিনেছিল সে কোন্ মতলবে? সব ভুলে গেছেন বুঝি? আপনার ঘর আলো করার জন্যে সে কি মেয়ে কিনেছিল? রেবা কে আপনার, কোথায় থাকত—যদি শোভনা ওকে টেনে নিয়ে যেত নিজের পথে? আপনাব কি মনে নেই, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের সেই সাহেব ব্যাটার কাছে শোভনা লুকিয়ে রেচে দিয়েছিল রেবাকে?

জয়ন্ত মৃদু হেসে বলল, এ আবার কি শুনি?

তুমি শুনে রাখো জয়ন্ত, ও মাগির মতন শয়তান মেযেমানুষ পৃথিবীর কোনও দেশে নেই,—ইন্দুমতী ঝাঁজিযে বললেন, মেয়েটাকে সেদিন আমি ইস্কুলে পাঠিয়ে বসে আছি সারাদিন। সন্ধ্যে হয়ে এল—হান্টান্ করছি,—মেযেব ইস্কুলের গাডির আর দেখা নেই। রেবার বয়স তখন প্রায় চোদ্দ। কী চেহারা, যেন কুঁদেকাটা সরস্বতী। ও মাগি করেছে কি, গাডি নিয়ে বেরিয়ে ইস্কুল থেকে মেয়েটাকে ভুলিয়ে নিয়ে সোজা গিযে ওঠে ফ্রি-ইস্কুলের এক বাড়ির তিনতলায়। কিন্তু ওইটুকু মেযে যে তরোযালের মতন ধারালো হতে পারে, ও মাগি বুঝতে পারেনি আগে। আপনি কি ভুলে গেছেন রায়সাহেব, সেদিনের কথা?

রায়সাহেব হাসিমুখে ইন্দুমতীকে লক্ষ্য করছিলেন।

ইন্দুমতী তেমনি উচ্চগ্রামেই বললেন, তুমি শুনে রাখো জয়ন্ত, এ মেয়ে রায়সাহেবের, এ মেয়ে সেই বড়দিদির,—কিন্তু এই মেয়ে আমার কোলের কাছে কুড়ি বছর বয়স অবধি শুয়ে মানুষ। এ মেয়ে আমারও বটে।

রায়সাহেব বললেন, এ কথা সত্যি, জয়ন্ত।

জয়ন্ত বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন, ইন্দুদেবী। আপনার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনে আপনাকে ঠিক বুঝতে পারিনি!

ইন্দুমতী বললেন, ও তুমি কিছু মনে রেগো না, জয়ন্ত।

সেবেলার মতো আসর ভাঙলো। হাসিমুখে এবার রেবা বলল, আমাকে নিয়ে এত কথা চলবে জানলে জন্মগ্রহণই করতুম না, বাবা।

জয়ন্তর সঙ্গে ওঁরাও হেসে উঠলেন। ইন্দুমতীর রান্নাবান্না তখনও সামান্য বাকি। তিনি উঠে চলে গেলেন বিজয়গর্বে।

রায়সাহেব সহাস্যে বললেন, ইন্দুমতীর মধ্যে ক্ষমা নেই কেন জানো, জয়ন্ত? ওর সততা আর সাধুতা ও বাড়িতে পদে পদে মার খেয়েছে।

জয়ন্ত বলল, আমারও সেইটি মনে হয়। উনি বাঙ্গালীঘরের সাধারণ টিপিকাল মেয়ে। আপনার ওই বাড়িতে এতকাল থেকেও ওঁর মন কোনও লোভে বা মোহে আচ্ছন্ন হয়নি।

এর কারণ ছিল, জয়ন্ত। বিলাস ব্যসন তখনই মানুষকে পেয়ে বসে যখন সে কোনও কাজ খুঁজে পায় না। ঝি-চাকর থাকা সত্ত্বেও আমাদের ঘরকন্নায় হাজার রকমের কাজ ইন্দুমতী খুঁজে নিতেন। আমাদের সবচেয়ে সমস্যা দেখা দিত শোভনাকে নিয়ে—যিনি বাড়ির কেউ নন। আজ তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছি এইজন্যে যে, তোমরা কঠোর হাতে ও বাড়ির সব ব্যবস্থার ভার নিয়েছ। আজ আমার মুক্তির আনন্দ সবচেয়ে বেশি।

রান্নাঘরের দরজায় মুখ বাড়িয়ে ওদিক থেকে ইন্দুমতী বললেন এবার তুমি স্নান সেরে নাও জয়ন্ত। আমার সব হয়ে গেছে।

জয়ন্ত উঠে পড়ল। বাহাদুর তাকে ডেকে নিয়ে এদিক ওদিক সব দেখিয়ে দিতে লাগল।

রেবা উঠে রায়সাহেবের পাশে এসে বসল। পরে বলল, আচ্ছা বাবা, আমার ছোটবেলায় তোমাকে একদিন বলেছিলুম, সবাই রাস্তায় সিগারেট খায়, তুমি খাও না কেন? মনে আছে তোমার?

রায়সাহেব হেসে বললেন, কিছুদিন পরে আবার তুমি যেন কি বলেছিলে? মনে পড়ে?

রেবা হেসেই অস্থির। বলল, হ্যাঁ, আমি বলেছিলুম, বাবা, সবাই সিগারেট খায় বলে' তুমিও খাচ্ছ? লোকের দেখে তুমি শিখবে কেন, বাবা? তুমি সেইদিনই সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিলে!

রায়সাহেব স্নেহের হাসি হাসছিলেন।

রেবা বলল, বাবা, অভ্যাস ছাড়া আর অভ্যাস ধরা—এ দুটোই ত সহজ হওয়া উচিত। অভ্যাসের কাছে দাসত্ব করা চলবে না, এই তো ? তা যদি হয়, তুমি তো অ্যাল্‌কোহলের কাছে দাসত্ব করোনি বাবা ? যেটা ছাড়তে পার সহজে সেটা ধরতেও পার অনায়াসে।

তোমার মনের কথা বুঝতে পারছি, মা।

আমার ইচ্ছে কোনটাই তুমি ছেড়ো না, বাবা। কোনও কিছুর টান বা মোহ তোমাকে আচ্ছন্ন করে না,—এই মহৎ শিক্ষা তোমার কাছেই পেয়ে এসেছি। তুমি ছাড়তে জানো, তাই ধরতে তুমি ভয় পাও না।

রায়সাহেব বললেন, আমি এখানে ভালই আছি, মা।

ভাল আছ তুমি জল হাওযার গুণে। কিন্তু তুমি ত' সন্ন্যাস নাওনি ?—রেবা বলল, অথচ তোমার মধ্যে এক আশ্চর্য নিরাসক্তি দেখে এলুম এতদিন ধরে ! কিন্তু যেখানে তুমি সবল, কঠিন সংযম যেখানে, যেখানে তুমি ত্যাগের দ্বারা অবাক করে দিয়েছ দেশকে, তার পাশে এই আত্মনিগ্রহকে কেন তুমি প্রশ্রয় দেবে, বাবা ?

রায়সাহেব বললেন, আত্মনিগ্রহ ? আমি ত' সহজেই সব ছেড়ে দিয়েছি, মা।

রেবা তাঁর গলায় বা হাতখানা জড়িয়ে বলল, নিশ্চয়। তুমি সহজে সব ছেড়ে দিয়েছ বলেই তোমাকে বলতে ভয় পাইনে, বাবা। কিন্তু বড়মার মৃত্যুর পরে তুমি আমারই জন্যে সব ধরে রেখেছিলে,—প্রত্যেকটি অভ্যাস পর্যন্ত। আমার চোখ আর মন, আমার লেখাপড়া বা জ্ঞানবুদ্ধি—এ সবই ত' তোমার কাছে পাওয়া, বাবা।

হাসিমুখে রায়সাহেব বললেন, তোমার নিজের প্রতিভা বুঝি কিছু নয় ?

তার চেয়ে অনেক বড় ছিলে তুমি। তুমি এমন বিরাট যে, তোমার নাগাল পাওয়া যেতো না।—রেবা হাসছিল,—সেই বিরাট পুরুষ সব বিষয়ে একটা সামান্য মেয়েকে বিশ্বাস করে চলেছে, একথা শুনেছে কেউ কোথাও ? এমন অবাধ স্বাধীনতা তুমি দিলে যা কোনও মেয়ে কখনও পায়নি। তোমার ব্যাঙ্ক একাউণ্ট গুলোর ওপর তুমি যে অধিকার আমাকে ছেড়ে দিলে, যে কোনও মেয়ের পক্ষে সেটা স্বপ্নের অগোচর। সবচেয়ে আশ্চর্য, নিজের জন্য তুমি কিছু রাখলে না। তুমি ভাবলে না তোমার শেষ জীবন কাটবে কেমন করে।

রায়সাহেব বললেন, ওসব আমি কেন ভাবতে যাব, রেবা ? একদিন তুমি আমার একটিমাত্র সন্তান ছিলে, তোমার প্রতিভার গুণে আর এক সন্তান জয়ন্তকে পেয়েছি। এবার আমাকে তোমাদের সন্তান বলে মানতে পারছ' না কেন ? তোমাকে মা বলে জেনেছি, তুমি আমাকে কেন সন্তান বলে চিনতে পারছ না ? আমার দায়িত্ব যে তোমাদেরই হাতে !

রেবার দুই চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। সে ঈষৎ উত্তেজনার সঙ্গে বলল, তাই বলে একটি উপদেশও তুমি দিয়ে এলে না? মুখ বুজে সব ছেড়ে দিয়ে এলে? মাসোহারার কথা পর্যন্ত বললে না, সঙ্গে কিছু আনলে না, নির্দেশ কিছু দিলে না,—শুধু চলে এলে আশীর্বাদ জানিয়ে? আচ্ছা বাবা, তোমার নিজের ওপর কি কোনও দয়ামায়া নেই? তুমি ওই একজনের ওপর সব ছেড়ে দিলে যে ব্যক্তি আজও তোমার কেউ নয়। সে যে এখনও অপরিচিত তোমার কাছে। তার না আছে চালচুলো, না বা ঠিক ঠিকানা। জয়ন্ত তোমার কে, বাবা?

উচ্চকণ্ঠে রায়সাহেব হেসে উঠলেন এবার। রেবার বাঁ হাতখানা সমাদরের সঙ্গে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে তিনি বললেন, তাহলে তুমিই বা আমার কে, মা?

রেবা বলল, আমাদের দু'জনের ওপর কি তোমার কোনও সন্দেহই নেই?

রায়সাহেব এবার একটু থামলেন। পরে বললেন, তোমরা নতুন কাল, নতুন যুগ তোমরা সৃষ্টি করবে নতুন জীবন। পুরানো কালের সন্দেহ রেখে গেলে আমিই ত' ছোট হয়ে যাব।

কিন্তু তুমি যে এই বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছ তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে—সে যদি আমরা ভেঙেচুরে তছনছ করে দিই?

রায়সাহেব মুখ ফেরালেন। বললেন, ভাঙতে ভয় পেয়ো না, মা। এক সভ্যতা ভাঙে বলেই নতুন নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে। ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতাই ত' দেখতে দেখতে এলুম পাঁচ হাজার বছর ধরে!

রেবার গৌরব গর্বিত মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল। তারপর সে হঠাৎ মেঝের উপরে বসে রায়সাহেবের পায়ের উপর হাত রেখে বলল, বাবা, তোমার এই আশীর্বাদই আমি নিতে এসেছিলুম। কিন্তু তবু আমার মন উঠছে না একটা কারণে।

কেন মা?

তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষে এখনও পাইনি, বাবা। সেই ভিক্ষে আমাকে নিঃসঙ্কোচে চাইতে দাও!

রায়সাহেবের গলাটা ভারি হয়ে এল। রেবার মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, আমার নিজের শেষ জীবনটুকু ছাড়া ত' কিছু নেই, মা।

রেবা সাশ্রুচক্ষে বলল, ওই জীবনটুকুই আমি ভিক্ষে চাইতে এসেছি, বাবা। তুমি সব দিয়েছ, ওইটে শুধু আমি পাইনি। ওইটের ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তুমি আমাকে দাও।

এ ত' সামান্য।—রায়সাহেব বললেন, দিলুম মা তোমাকে সেই কর্তৃত্ব। তুমি আমাকে ভাঙো, মোচড়াও, ছিন্নভিন্ন করো—আমাকে ধুলোয়-ধুলোয় মিলিয়ে দাও।

রায়সাহেবের পায়ের ধুলো নিয়ে রেবা উঠে দাঁড়াল।

এক সপ্তাহকাল এখানে রয়ে গেল রেবা ও জয়ন্ত। এর পর এসে পৌঁছলেন মিস্টার মৈত্র। তাঁর সঙ্গে এলেন দু'জন সহকারী। অনেকগুলি ফাইল, নানাবিধ দলিল-দস্তাবেজ, বহু পরিমাণ কাগজপত্র তাঁদের সঙ্গে এসে পৌঁছেছে। তাঁরা জায়গা নিয়েছেন স্থানীয় পি-ডব্লু-ডি র বাংলোয়। মরশুমের সময় নয় তাই রক্ষে। ছয়খানা ঘরের মধ্যে তিনখানাই মিঃ মৈত্র দখল করেছেন। সঙ্গে এসেছেন পাচক ও ভৃত্য, এবং পাছে কোনও প্রকার ক্ষয়ক্ষতি হয়, সেজন্য সশস্ত্র সুরযপ্রসাদও পাহারা দেবার জন্য এসেছে। রেবার নির্দেশ অনুসারে মৈত্র মহাশয় ছোট গাড়িখানাও এনেছেন।

জয়ন্ত ওঁদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইল। সকালে জলখাবার খেয়ে সে যায়, মধ্যাহ্নভোজনের কালে ফেরে। বিকালে আবার যায়, ফিরে আসে রাত্রে। এটা নতুন একটা বিষয়, এখানে তার বিদ্বান মনের একটা কল্পনা কাজ করতে থাকে, সেই কারণে কবি জয়ন্ত একটি নতুন রসের আস্বাদ পাচ্ছিল। রেবা ওকে লক্ষ্য করে বেশ কৌতুক বোধ করছিল।

কিন্তু রেবা চুপ করে বসে ছিল না। পিতা ও কন্যার মধ্যে যে বোঝাপড়াটা সেদিন হয়ে গেছে, সেটা কেবলমাত্র আবেগোচ্ছ্বাসের মধ্যেই শেষ হয়নি। রেবা রান্নাঘরে ঢুকে নিজের হাতেই আমিষ রান্না করে পিতাকে প্রথমদিন পরিতোষ-সহকারে খাইয়েছে। কলকাতা থেকে আসবার সময় বাবার জন্য সে সঙ্গে এনেছে দুই বোতল 'একৃন্য নম্বর ওয়ান্' ব্র্যাণ্ডি এবং মেজার-গ্লাস। সেই গ্লাসে পরিমাণ মতো ব্র্যাণ্ডি ঢেলে নিজের হাতে সে রায়সাহেবকে খাইয়ে বলেছে, বাবা, হুইস্কি বড় নোংরা জিনিস। ওটা তোমাকে কোনদিন আর খেতে দেবো না।

রায়সাহেব একটি প্রতিবাদও করেননি। রেবা বলল, ভাত বা ডিম তুমি কম খাবে, বাবা। রোস্টেড্ চিকেন্, শিককাবাবের রোল, বাদাম, দুধ, আপেল, কলা, কমলালেবু—এইসব তুমি খাবে নিয়মিত। আমি তার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। আমার ছোট গাড়িখানা রইল, যেখানে খুশী বেড়াতে যাবে। কিন্তু একা যেয়ো না, ইন্দুমা সঙ্গে থাকবে। মৈত্রমশায় কলকাতায় বসেই সব ব্যবস্থা করবেন। বেড়াতে যাবার সময় ট্রাউজার পরবে, মনে রেখো। রাত দশটায় শুয়ে পড়বে।

রায়সাহেব হাসিমুখে কন্যার দিকে চেয়ে বললেন, তথাস্তু।

রেবা বলল, যে-জীবন তোমার কাছে ভিক্ষে চেয়ে নিয়েছি, সেই জীবনের সব দায়িত্ব যার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি, সে হল ইন্দুমা। তুমি যেন তার অবাধ্য হয়ো না কোনদিন, বাবা।

গাড়ি নিয়ে রেবা বেরিয়ে গেল সরকারী বাংলোর দিকে। মৈত্রমশায়ের ওখানে জয়ন্ত তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

বাংলোর বাগানে বড় বড় গাছ, তারই তলায় তলায় ফুলের গাছ বসানো। রেবার গাড়িখানা তাদের মাঝখানে লাল সুরকির পথ দিয়ে এসে বারান্দার সামনেই দাঁড়াল। গাড়ি রেখে রেবা ভিতরে ঢুকল।

মৈত্রমহাশয় তাঁদের পরিকল্পনার একটি খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন। রেবা গিয়ে জয়ন্তর পাশে বসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, মোতিয়া চলে গেল আহমেদাবাদে, কিন্তু চুনারি কি একা রইল?

মৈত্র বললেন, না না, একা নেই। ওর মাকে আনিয়েছি সেই বালিয়া জেলা থেকে। দোতলায় ওরা থাকে, নিজেদের মতন রান্নাবান্না করে। শচীন ওদের সব খোঁজ রাখে। আপনি কি চুনারিকে ওখানে রাখবেন?

রেবা জয়ন্তর দিকে তাকাল। জয়ন্ত বলল, ওকে রাখা মানে ওর ভবিষ্যতের দায়িত্ব নেওয়া। কিন্তু ওর বয়স অত অল্প!

মৈত্র বললেন, ওর মাও সেই কথা বলছিল। সে ওকে দেশে নিয়ে গিয়ে বে-থা' দিতে চায়।

রেবা বলল, সেই ভাল জয়ন্ত, ওকে ওর মা নিয়েই যাক্। আপনি বরং এক কাজ করুন, মিস্টার মৈত্র। ওকে মাস-তিনেকের মতন মাইনে, আর ওর বিয়ের বাবদে হাজারখানেক টাকা ওর মায়ের হাতে দিয়ে দিন। কি বল, জয়ন্ত?

জয়ন্ত বলল, এইটিই ভাল প্রস্তাব। তবে মেয়েটা আমার কাছে অনেকবার ধমক খেয়ে মরেছে, তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ আর কিছু টাকা—

টেবিলের তলা দিয়ে রেবা জয়ন্তর হাঁটুর পাশে একটা চিমটি কাটল, অর্থাৎ চুনারির সম্বন্ধে তোমার রোমান্টিক দুর্বলতা আমি ভুলিনি! মৈত্রমহাশয় হাসিমুখে বললেন, শ'-পাঁচেক টাকা আরও দেবো বলছেন?

তাই দিন—রেবা বলে দিল।

মৈত্রমহাশয় একটি-একটি করে কাগজে টুকে নিলেন। এর পর কথা উঠল, বারো-চোদ্দজন চাকর ও ড্রাইভারের্। এ ছাড়া মালীর পরিবার, শচীন, সশস্ত্র পাহারা দু'জন—এদের রাখা হবে কিনা।

রেবা বলল, যারা চলে যেতে চাইবে না, তাদের সরাবেন কোন্ যুক্তিতে?

জয়ন্ত বলল, কাজ গেলে তাদের চলবেই বা কি করে ?

মৈত্র বললেন, চাকর-ড্রাইভার, মালী-শচীন চুনারি—এদের সবাইয়ের মাসিক মাইনে কম-বেশি ছ' হাজার টাকা পড়ে। তা ছাড়া ভাঙ্গচুর, নষ্ট হওয়া, কাটা-ছেঁড়া, অদল-বদল, মেরামতি—সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচশ' টাকা লাগে। মোটর চারখানা, ট্রাক একখানা, জীপ একখানা, স্টেশন ওয়াগন একখানা—সবগুলোকে ধরলে গড়পড়তা মাসে প্রায় সওয়া দুশ' গ্যালন্ পেট্রল লেগে যায়। এগুলো কিন্তু আপিসের খরচের বাইরে। এর পরেও আছে চাপরাশিদের পোশাকপত্র, বছরে দু' মাসের বোনাস, অতিথিদের খরচ, মোটর মেরামতি, লাইসেন্স, ম্যুনিসিপ্যাল ট্যাক্স, বাড়িতে অফিস রাখার খরচ—আরো নানা আইটেম্।

জয়ন্ত এগুলি মন দিয়ে শুনছিল। ধনী ব্যক্তিদের সে গালমন্দ করে এসেছে অনেককাল ধরে, কিন্তু ধনবানদের খরচপত্র কি প্রকার, এটি তার এতটা ঠিক জানা ছিল না। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, টাকা যত বেড়েছে, রায়সাহেব তাঁর বৈভবকেও বাড়িয়েছেন সে অনুপাতে। তিনি এককালের গরীব গৃহস্থের সন্তান, নিগৃহীত ছিল তাঁর অনেক ইচ্ছা, অনেক প্রকার উচ্চাভিলাষ। পরবর্তী-কালে সেই সকল ইচ্ছারই অভিব্যক্তিলাভ ঘটেছে বিপুল বৈভবের মধ্যে। তিনি তাঁর-এই দেশজোড়া সম্পদের পটভূমিতে নিজেকে দেখতে চেয়েছিলেন। সেই দেখা তাঁর শেষ হয়ে গেছে, তাঁর প্রতিভা ও কর্মশক্তি একটি পরিণতিলাভ করেছে, এখন ছুটি নিচ্ছেন তিনি। এখন শুঁয়াপোকা প্রজাপতি হয়ে উড়ে যাচ্ছে, গুটিপোকা তার মৃত্যু কামনা করছে—কেননা রেশম সৃষ্টির কাজ তার সমাপ্ত। তাঁর কর্মজীবনের ঐতিহাসিক প্রয়োজন এবার ফুরিয়ে গেছে। এ তাঁর সন্ন্যাস নয়, সর্বত্যাগের আত্মাভিমান নয়—এ হ'ল তাঁর লোভ, বাসনা, সংগ্রাম ও উচ্চাভিলাষের একটা পরিসমাপ্তি। তিনি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে অন্যের বিনা অনুরোধে স্বেচ্ছায় সকল বিষয় থেকে অবসর গ্রহণ করলেন।

জয়ন্ত একটু হেসে চুপ করে রইল।

মৈত্র বললেন, আমাদের কাজ এখনকার মতো আজ এইখানেই শেষ হচ্ছে। চিঠিপত্র আর ড্রাফ্‌টগুলো কাল আপনারা সই করবেন। আমি কলকাতায় ফিরেই আমাদের সব ইউনিটে এক একখানা সার্কুলার পাঠিয়ে দেবো যে, আপনারা যাচ্ছেন! তাঁরাই আমার সঙ্গে আপনাদের অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে যোগাযোগ রেখে চলবেন। যে কোনও ইউনিট থেকে আপনারা টাকাকড়ি নিতে পারবেন আপনাদের দরকার মতো।

মৈত্রমশায় ইউনিটগুলির একটি তালিকা, প্রত্যেকটি বাংলোর যথাযথ ঠিকানা

ও নকশা, স্থানীয় সুযোগ-সুবিধার সংবাদাদি, মালী বা চৌকিদারের নাম প্রভৃতি সমেত কাগজপত্রগুলি জয়ন্তর নিকট এগিয়ে দিলেন। পরে বললেন, বড় গাড়িখানা নতুন, ওখানাই আপনারা বরং নিয়ে যান।

রেবা বলল, চলবে কি রকম ?

মৈত্র বললেন, পঁচিশ-তিরিশ হাজার মাইল পর্যন্ত একটানা গেলেও কিছু হবে না। আজকাল ন্যাশন্যাল হাইওয়ে অনেকগুলো হয়েছে। রাস্তাঘাটের সুবিধে। আপনাদের সঙ্গে যাবে কে ? তেওয়ারি, না রামলোচন ?

রেবা বলল, বুড়োই চলুক।—

রাত অনেক হয়েছিল। ওরা মৈত্রমশায়ের কাছে এ যাত্রা বিদায় নিল। কাল সকালে বুড়ো রামলোচনের হাত দিয়ে মৈত্রমশায় কিছু টাকা ইন্দুমতীর কাছে পাঠিয়ে দেবেন এইটি স্থির রইল।

॥ ১১ ॥

অতি প্রত্যূষে সেদিন রায়সাহেব বিছানা ছেড়ে উঠলেন। মনে হয় রাত্রির অনেকটা অংশ তিনি বিনিদ্র ছিলেন, কেননা জয়ন্ত ও রেবা এবারের মতো আজ বিদায় নিচ্ছে।

শেষরাত্রি তখনও কিছু বাকি। আকাশে সব তারা দপদপ করছে। পাখির সঙ্গে তখনও ঘুমিয়ে আছে বিশ্বচরাচর। রায়সাহেব বারন্দায় বেরিয়ে দাঁড়ালেন কতক্ষণ। অতঃপর কলঘরে গিয়ে মুখ ধুয়ে আবার এসে ঘরে ঢুকলেন। মাঝখানের দরজা দিয়ে লক্ষ্য করলেন, ও ঘরের খাটে কম্বল জড়িয়ে তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছেন ইন্দুমতী!

রায়সাহেব দরজা পেরিয়ে কাছে এলেন, এবং ঈষৎ হেঁট হয়ে ইন্দুমতীর কপালের চুলের গোড়ায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে ডাকলেন, ইন্দু ?

ইন্দুমতী সাড়া দিলেন না, এতটুকু নড়লেন না, কিন্তু ওই অন্ধকারেই জেগে চোখ খুলে আবার চোখ বুজলেন। রায়সাহেবের হাতের স্পর্শে ছিল এক নিবিড় স্নেহ-রহস্য। এই রহস্যের স্বাদ অনেকটা যেন ইন্দুমতীর এই প্রথম অভিজ্ঞতা। তিনি নিজেই জানেন, রায়সাহেব কোনও দিনই এ সম্পর্কে কোনও দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। তিনি কেবল যে বয়সে প্রবীণ তাই নন, তিনি মদ্যপায়ী হয়ে অতিশয় স্বভাব-সংযত পুরুষ, এবং সেক্ষেত্রে তাঁর বিন্দুমাত্র ভণিতা ছিল না! বরং ইন্দুমতী নিজেই মনে মনে অনেকটা এই ব্যক্তির প্রতি যেন অনেকদিন থেকেই আসক্ত এবং অনুরক্ত। ভবানীপুরের বাড়িতে মাঝে মাঝে তাঁর মুখে চোখে, আচরণে, ব্যবহারে এবং বসন শৈথিল্যে এই

সংযত পুরুষের চোখের উপরে যে যৌবনচাঞ্চল্য প্রকাশ পেত, সেটি খুবই অর্থপূর্ণ। ইন্দুমতী আপন দুর্বলতা জানেন।

হাতখানা সরিয়ে নিয়ে রায়সাহেব সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। আর তিনি ডাকলেন না, কিন্তু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নিঃশব্দে। বোধ হয় তাঁর এই সময় ডাকা উচিত হয়নি, বোধ হয় ইন্দুমতীর কপালে হাত রাখা শোভনও হয়নি। কিন্তু সম্ভবত তাঁর হাতে ছিল পরম স্নেহের একটি আশীর্বাদস্পর্শ, যেটি কল্যাণেরই নামান্তর। এই নারী নিঃস্বার্থভাবে আপন সমগ্র জীবন তাঁর সেবায় সঁপে দিচ্ছে, রায়সাহেব একান্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এটি লক্ষ্য ক'রছেন অনেকদিন থেকে।

তিনি বাইরে গিয়ে বারান্দা দিয়ে নেমে ফুলবাগানের দিকে অগ্রসর হলেন। আকাশে তখন উষার রক্তিম বন্দনা চলছিল। কিন্তু মাত্র মিনিট পাঁচ-ছয়, তারপরেই পিছন দিকে ইন্দুমতীর গলার সাড়া পাওয়া গেল—আপনার আজকাল বড্ড ভুল হচ্ছে। গরম চাদর রেখেছি হাতের কাছে, তবুও ভুল। নিন, জড়িয়ে দিই আমি। দেখছেন না কত ঠাণ্ডা পড়ছে পাহাড়ি জায়গায়?

ইন্দুমতী তাঁর হাতের গরম চাদরটি খুলে রায়সাহেবের গায়ে সযত্নে জড়িয়ে দিলেন। পরে বললেন, চায়ের জল চড়িয়েছি। এবার আপনাকে চা দেবো।

ওদের ডাকবে কখন?

ওদের এখন ডাকতে গেলে মারতে উঠবে।—ইন্দুমতী বললেন, দু'জনে দুই ঘরে খিল এঁটে শুয়েছে রাত একটায়। সাতটার আগে কি উঠবে?

হঠাৎ রেবার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল বারান্দায়—বটে, কবে দেখেছ সাতটায় উঠতে, ইন্দুমা? কি মিথ্যুক তুমি?

ইন্দুমতীর সঙ্গে রায়সাহেবও হেসে উঠলেন উচ্চকণ্ঠে। রেবা খরপদে নেমে এল বাগানে। বলল, একটায় শুয়েছি? মিথ্যে কথা, বুঝলে বাবা? শুয়েছি প্রায় আড়াইটেয়। আমরা যে কথার তুবড়ি। যতক্ষণ বারুদ, ততক্ষণ জাগা। বিছানায় যখন উঠি, শূন্য খোল।

আবার ওদের হাসির শব্দ উঠল।

রেবা বলল, এর পর আবার দরজায় খিল আঁটার কথা বলছ? তা'হলে রক্ষে ছিল? এ কি বাবার কালের কথা? একালে দু' ঘরে থাকবে দু'জন, কিন্তু খিল আঁটবে না কোনও পক্ষ, অথচ ঘুমোবার স্বাধীনতা থাকবে অবাধ।

ইন্দুমতী বললেন, এর মানে কি?

মানে?—রেবা বলল, কিচ্ছু বোঝ না তুমি! ওই শূন্য খোলে যদি একটুও

বারুদ অবশিষ্ট থাকে, তা'হলে ঘুম আসবে কোন্ চোখে? কাল দু' দুবার ঢুকেছিল জয়ন্ত আমার ঘরে।

জয়ন্তর ঘরে খাটের পাশের জানলাটা দিয়ে এবার জয়ন্তর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল--কেন ঢুকেছিলুম সেটাও বলো, নইলে ওঁরা ভুল বুঝতে পারেন।

প্রভাতকালে যে হাসির রোল উঠল, তাতে ড্রাইভার দারোয়ান এবং ওই সাঁওতালি ঝিয়েদের ঘর অবধি খুলে ওরা বেরিয়ে পড়ল।

রেবা বলল, থামব কেন বাবা? জয়ন্তর বারুদের খোল তখনও একেবারে শূন্য হয়নি। ও যে কবি। অন্ধকারে মাথার ধারে এসে দাঁড়িয়ে বলে, রেবা, ঘুমিয়েছ বুঝি? —পনেরো মিনিট পরে আবার পা টিপে টিপে এসে বলে, রেবা, তুমি কি জেগে আছ?—আমি কিন্তু মটকা মেরে পড়েই আছি। ভাবছি, দেখি না কেন, গা ঠেলে ডাকে কিনা। এটা বোঝে না যে, আমার খোলে আর কিছু নেই। এটাও পুরুষমানুষ বোঝে না য, ঘরে বেড়াল ঢুকলেও মেয়েছেলে কান খাড়া করে ওঠে। আমাদের ঘুম আর কুকুরের ঘুম প্রায় একই।

ওধার থেকে জয়ন্ত ফোড়ন দিল, দেখেছেন রায়সাহেব, আপনার আদরিণী কন্যা কী সুন্দর আর সুমধুর করে মিছে কথা বলে? সবই বলল, কিন্তু মূল কথাটা সযত্নে এড়িয়ে গেল।

কন্যার কাঁধে হাত রেখে রায়সাহেব পুনরায় হেসে উঠলেন। স্বচ্ছ আনন্দের ভিতর দিয়ে এবার প্রভাতের বঙ্কিম সূর্য ময়দানের সুদূরপ্রান্তে দেখা দিল।

ইন্দুমতী ও রেবা বারান্দার ওধার দিয়ে উঠে চলে গেল। আজ সকালে আহারাদির পর জয়ন্ত ও রেবা এবারের মতো বিদায় নেবে, এই চিন্তাটি রায়সাহেবকে যেন বিষণ্ণ করে রেখেছিল।

আহারাদি এবং আয়োজন সারতে প্রায় দশটাই বাজল। কিন্তু যেহেতু রেলগাড়ির টাইম নয়, এবং ওরা যাচ্ছে মোটরযোগে, সেইজন্য তাড়াহুড়ো বা হই চই ছিল না। রামলোচন গাড়ি চালাবে। তেওয়ারি এখানে রইল ছোট গাড়িখানা নিয়ে। বাহাদুর রইল বাড়ির পাহারায়। সাঁওতালি ঝি বাড়ির কাজ করবে।

যাবার আগে রায়সাহেবের ঘরে ওরা যখন নানা কাজের কথায় ব্যস্ত সেই সময় জয়ন্ত যেন একটু বেঁকে বসল। সে বলল, দেখুন, এই মুহূর্তে যে কথাটা আমার মনে হচ্ছে, সেটা আমাকে খুব উৎসাহ দিচ্ছে না—।

রায়সাহেব তার দিকে তাকালেন। রেবা ও ইন্দুমতী চুপ করে রইলেন। জয়ন্ত বলল, আমি যেটি অর্জন করিনি, তার ওপর কি আমার অধিকার আছে কিছু? এই ধরুন, আপনাদের মোটরগাড়ি, টাকাকড়ি—এই সব যে আমার

যথেচ্ছ ব্যবহারে লাগছে, এ সব ত' আমার বিনা পরিশ্রমে পাওয়া! এদের ওপর নৈতিক অধিকার আছে কিছু আমার?

রায়সাহেব বললেন, রেবা আমার এখানে ওই ছোট গাড়িখানা রেখে যাচ্ছে, আর রেখে যাচ্ছে খানিকটা বিলাসের জীবন—এতে তোমার মতন আমারও ওই কথাটা মনে হচ্ছে, জয়ন্ত। মনে হচ্ছে আমিও যেন সব বিনামূল্যে পেয়ে যাচ্ছি। কোনটাই যেন আমার অর্জন করা নয়।

জয়ন্ত বলল, আপনি কেন একথা বলছেন?

হাসলেন রায়সাহেব। বললেন, এই যে তুমি কাজ কারবার, ব্যবসা বাণিজ্য, বিষয়-সম্পত্তি বা বিলাস-বৈভব—যা কিছু দেখছ, এর অধিকাংশ অনর্জিত—যাকে বলে শতকরা পঁচাত্তরভাগ। বড় ব্যবসা এদেশে হয় পরের টাকায়, কিন্তু মুনাফা অধিকাংশ নিজের দিকেই আসে।

জয়ন্ত বলল, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

পারলে না? আরেকবার বলি। এ দেশের সমাজব্যবস্থা এমনি যে, গরীবকে গরীব থাকতেই হবে, এবং ধনীকে আরও ধনী হতেই হবে।

এর বিপরীত কিছু করা যায় না?

রায়সাহেব এক মুহূর্ত চুপ করলেন। পরমুহূর্তে তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। রেবা তাঁর দিকে চেয়ে সহাস্যে বলল, জয়ন্ত, এর বিপরীতটাই হ'ল তোমার কবিতা। এখন বুঝতে পারছ, তোমার বইগুলো বাবা কেন কিনেছেন? সেই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধেই ত' তোমার বিপ্লবের ধ্বনি।

রায়সাহেব বললেন, অর্থনীতি সম্বন্ধে যদি বৈজ্ঞানিক বিবেচনা আজ প্রকাশ পায়, তা'হলে এদেশে ধনপতি হওয়া যায় না, জয়ন্ত।

কী হয় তাহলে?—জয়ন্ত প্রশ্ন করল।

তাহলে তোমার, রেবার, ইন্দুমতীর, বা আমার— কারও পক্ষেই কোনও অধিকার থাকে না। তাহলে দরিদ্ররা একটু উঁচুতে ওঠে, আর ধনীরা কতকটা নীচে নেমে যায়।

জয়ন্ত চুপ করে গেল।—

রেবা বলল, বাবা, জয়ন্তর মনে আড়ষ্টতা কেন জানো? ও ভাবছে, ওর কিছু নেই, সবই বুঝি আমাদের। এ কথাটা জয়ন্তর মাথাতেই ঢুকতে চায় না যে, আমাদেরও কোনও অধিকার নেই, আমরা কেবল গায়ের জোরে বিশেষ বিশেষ কাগজপত্রের কৌশলে জায়গা জুড়ে বসে আছি মাত্র। তুমি, আমি, জয়ন্ত—আমরা যে কেউ নই, এইটিই ওকে বোঝানো দরকার।

জয়ন্ত বলল, কিন্তু আমি এখন কা'র টাকায় নবাবী করছি?

শুধু তুমি নও—আমি, বাবা, ইন্দুমতী সবাই নবাবী করছি দেশের টাকায়। তুমি সম্পূর্ণ বাইরের লোক, এই বলতে চাও তো? বাবাও তো বাইরের লোক,—কিন্তু উনি এক বিশেষ ব্যবস্থাপনার কৌশলে এই ব্যবসায় ভেতরে ঢুকেছিলেন, এই মাত্র! আর নবাবীর কথা বলছ? আমাদের প্রত্যেকের নবাবীকে পাহারা দেবার জন্য বা নিরাপদ রাখার জন্য একটি অদ্ভুত ধরনের সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এটি ভুলো না জয়ন্ত। সেই অদ্ভুত ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই তো তুমি বিদ্রোহ করছ।

রায়সাহেব প্রশংসমান দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চেয়ে ছিলেন। জয়ন্ত গা ঝাড়া দিয়ে উঠে এবার বলল, বেশ, ঠিক আছে, চলো এবার।

ইন্দুমতী অতঃপর টিপ্পনী কাটতে ছাড়লেন না। ওরা দুজনে যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, তখন তিনি হেসে বললেন, জয়ন্তর মনে ভয় আছে, কেন জানিস, রেবা? ও পাছে ঘরজামাই হয়ে ওঠে, এই ভয়!

জয়ন্তর সঙ্গে রেবা ও রায়সাহেব উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। ওরা দু'জন গাড়িতে গিয়ে উঠল। বুড়ো রামলোচন স্টার্ট দিল।

অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে জয়ন্ত মুখ ফিরিয়ে বলল, আমরা আপাতত কোথায় যাচ্ছি বলো তো, রেবা?

হাসিমুখে রেবা বলল, আমি মেয়েমানুষ, কেমন করে জানব কোথায় যাচ্ছি। শুধু জানি দেশের এক কবির সঙ্গে অকূলে ভেসে চললুম।

জয়ন্ত চুপ করে রইল। রায়সাহেব ও রেবার কথাগুলো তাকে পেয়ে বসেছিল। এই কথাটাই তাকে এখন ভাবতে হবে, তারা নিজেরা কেউ কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা অর্জন করছে না, অথচ অনায়াসলব্ধ অর্থ যথেচ্ছ ব্যয় করে চলেছে। কেউ কোথাও বানিয়েছিল একটা নকশা বা পরিকল্পনা, সম্ভবত সেটি রায়সাহেবের দ্বারাই বানানো—সেটি যত নির্ভুল হয়েছে ততই ঘটেছে সাফল্য। এই সাফল্যের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে জয়ন্তর ভাগ্যও গেল জড়িয়ে। কবি-জয়ন্ত চেয়ে দেখল, নিয়তির এ যেন নতুন এক চক্রান্ত। সে চাইছে না কিছু, অথচ পেয়ে যাচ্ছে অজস্র। দারিদ্র্য ছিল তার অহঙ্কার, কিন্তু চারিদিকের স্তূপাকার সম্পদ তার সেই অহঙ্কারকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে পদে পদে। বাঙালী কবির ভাগ্যে সুন্দরী নারী নাকি জোটে না—বন্ধুসমাজে সে শুনে এসেছে। কিন্তু এইক্ষণে তার পাশে আত্মসমর্পিতা যে-নারী এলায়িত বিহ্বলতা নিয়ে বসে রয়েছে, সে অসমাসুন্দরী। আপন চিত্তের নৈরাশ্য এবং ব্যর্থতাবোধের থেকে যে-জয়ন্ত বার বার তিনবার আত্মনাশের চেষ্টা করেছিল, সে এখন উপলব্ধি করছে তার সেই পলায়নী মনোবৃত্তির নিছক বুদ্ধিহীনতা। কথায়

আছে, আশী লক্ষ বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এলে তবে একটি মনুষ্য-জীবন লাভ করা যায়। সেই জীবনকে যদি মিথ্যে বলতে হয় তবে সত্য কোনটা? সুতরাং এই জীবনের একটা মানে আছে, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন আছে, এবং নিশ্চয়ই বড় একটা লক্ষ্য আছে। কবি-জয়ন্ত ভাবছিল, যা কিছু সে দেখছে, জানছে বা ভোগ করছে—এ সবই তো তার এক একটা অভিজ্ঞতা। জীবন তো অগণিতসংখ্যক অভিজ্ঞতারই এক সমবেত বিরাট আধার। অন্য-দিকে—নিজেকে কত দিক থেকে সে গড়ে তুলেছে ধীরে ধীরে এতকাল অবধি। শরীরকে ধারণ করেছে, নিজেকে সুস্থ রেখেছে, স্বাস্থ্যকে সযত্নে নির্মাণ করেছে, মনকে শিক্ষিত ও সংস্কৃত করেছে—তার সঙ্গে ধরেছে শ্রেষ্ঠ ভাবনা ও কল্পনা—এ সবই কি মিথ্যে? সত্য তবে কোনটা? কেন তবে সে নির্বোধের মতো হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে রেললাইনের ওপর গলা রাখতে গিয়েছিল? তবে কী সেই নষ্টচরিত্রা তরুবালার সহজ বুদ্ধি ও স্বাভাবিক বিবেচনা তার চেয়ে অনেক সচেতন?

জয়ন্ত ভাবছিল, হ্যাঁ, জীবনটা জুয়া, তবে সবটাই জুয়া নয়। সে কবি, সে ব্রতচারী, ব্রাত্য—সে সঙ্গে এনেছে পরম পিপাসার এক ফরমাস, তাকে যেতে হবে সেই লক্ষ্যে। তাকে অগ্রসর হতে হবে বিশেষ বিশেষ অবস্থার ভিতর দিয়ে। তার চারদিকে যা কিছু জড়ো হচ্ছে—এগুলি সামগ্রীসম্ভার, এগুলির নাম বোধ হয় উপচার। এই সব উপকরণ লাগছে তার কাজে। এই উপকরণ-সহযোগে কে যেন তাকে নির্মাণ করে তুলছে মস্ত এক ইমারতের মতো। সে দেখে এসেছে বীভৎস দারিদ্র্য, কুরূপের মূঢ়তা ও দৈন্য তাকে তাড়া করেছে অনেকবার, দুঃখের নিবিড়তা তাকে বিনিদ্র রেখেছে অনেক রাত। এদেরই মাঝখানে বসে মৃদু প্রদীপের আলোয় সে বিপ্লবের কল্পনা করে এসেছে দিনের পর দিন। আপন কবিতার শঙ্খে ফুৎকার তুলেছে, বজ্রকণ্ঠে ডাক দিয়েছে, ডম্বরুধ্বনিতে হৃৎকম্প এনেছে, দুর্গত জীবনকে হিংস্র করে তোলার চেষ্টা পেয়েছে।

তারপর এল তার জীবনে আরেক বিবর্তন। ওই দুঃখের মধ্যেই সে দেখে নিল হোমানলের শিখা জ্বলছে দপদপিয়ে, দেখে নিল সেই বিঘোরা যামিনীর চতুর্দিকব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে কে যেন প্রদীপটি ধরে চলেছে আগে আগে, দেখে নিল জীবনজোড়া এক অচল বেদনার থেকে উঠে এল আনন্দের বার্তা—ধীরে ধীরে যেন জ্যোতির্লেখন দেখা দিল তার দিগন্তে।

এবার যেন এসে পৌছল আরেক নতুনের ডাক। কেউ যেন তাকে পরিয়ে দিচ্ছে রাজবেশ। কেউ এনেছে বরণমাল্য। মুখর হয়ে উঠছে যেন

মঙ্গলঘণ্টা। উৎসবের আনন্দে ভরে যাচ্ছে দিনের পর দিন। এ নতুন যেন বড় প্রখর, বড় রঙ্গীন, বড় উত্তাল। এর চারিদিকে রয়েছে ভরা জীবনের সুর, ঐশ্বর্যের অবিশ্রান্ত সমারোহ। জয়ন্ত যেন কথায় কথায় খেই হারিয়ে চলেছে।

দ্রুতগতি গাড়ির মধ্যে বসে রয়েছে দু'জন। দুই ধারে সুশ্যামল প্রান্তর যেন ছবির মতো সরে যাচ্ছে। পথ সমতল, মসৃণ—কোথাও বা মৃদু তরঙ্গায়িত। গাড়িখানা অতি মূল্যবান, বসবার গদি মোলায়েম,—জয়ন্ত যেন ভেসে চলেছে লাবণ্যের মধুর আবেশে। বাইরের আকাশ রৌদ্রোজ্জ্বল এবং সমাগত মধ্যাহ্ন সত্ত্বেও বাতাস সুস্নিগ্ধ। পার্শ্ববর্তিনী রেবা তন্দ্রাচ্ছন্ন, কিন্তু ফুরফুরে হাওয়ায় তার চুলের ঝলকে দোলা লাগছিল।

জামতাড়া ছাড়িয়ে কোথায় যেন বাঁক নিয়েছিল গাড়িখানা। ওরা চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। এক সময় জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, রামলোচন, আমরা যাচ্ছি ঠিক কোন দিকে বলো ত'?

রেবার তন্দ্রা ছুটে গেল। সে সোজা হয়ে বসল। বুড়ো রামলোচন হাসি মুখে বলল, আমরা পয়লা নম্বর ইউনিটে এখন যাচ্ছি। এটা গোমোর সড়ক।

গোমো কতদূর?

তা পঞ্চাশ মাইল হবে এখান থেকে। লেকিন আমরা ওৎনা দূর যাবো না।—রামলোচন তার নকশাটা বর্ণনা করে এক সময় বলল, আমরা যাবো আর বাইশ মাইল ভেতর দিকে। তারপর মাইলখানেক কাঁচা রাস্তা গেলে আমাদের তালডুবরির কারখানা পাহাড়ের ঠিক নিচে—

রেবা বলল, আমি কখনও আসিনি তালডুবরিতে। রাস্তাটা বেশ লাগছে কিন্তু। তোমার কাছে সব নতুন মনে হচ্ছে, না?

জয়ন্তর এতক্ষণে কৌতুক-বুদ্ধি ফিরে এল। মৃদুহাস্যে ইংরেজীতে সে জানাল, যে ব্যক্তি গাড়ি চালাচ্ছে তার উপস্থিতির জন্য মন খুলে কথা বলা অসুবিধা হচ্ছে।

এ কথাটা আগে রেবার মনে আসেনি। সে প্রশ্ন করল, তাহলে উপায়? তোমার মনে কাঁটা ফুটে থাকলে ত' চলবে না।

জয়ন্ত এক ঝলক হাসল। বলল, মনের নয়, পথের কাঁটা।

ওরা যখন তালডুবরির বাংলোয় এসে পৌঁছল, বেলা তখন দুটো বেজে গেছে। কারখানাটা একটু দূরে, কিন্তু এখান থেকেই তার ডিজেল্‌-ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে! পিছন দিকে মস্ত পাহাড়ের দেওয়াল বহুদূর অবধি বিস্তৃত। তারই ঠিক নিচে শীর্ণকায়া গিরিনদী—কিন্তু শীতের দিনে তার প্রবাহ সামান্যই।

এটি ফরেস্ট বাংলো। আশপাশে জঙ্গল খুব বেশি নেই। বারান্দার ঠিক নিচে ওই গিরিনদী। বোধ হয় এত নিরিবিলি বলেই এটার নাম দেওয়া হয়েছে ফরেস্ট বাংলো।

ওদের আগমন-সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। ওরা এখন মালিকপক্ষ, সুতরাং এ অঞ্চলে ছুটোছুটি পড়ে গিয়েছিল। এখানকার ডাইরেক্টর মিঃ ভৌমিক রেবা বা জয়ন্তর অপরিচিত নন। তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা এলেন একে একে। কুলিসর্দার, ইঞ্জিনের হেড-চালক, চৌকিদার, একাউণ্টাণ্ট, অফিস-স্টাফ—সবাই অভিবাদন জানাতে এলেন। খানসামা, মালী, ভৃত্য, জমাদার—কেউ বাদ নেই। বুঝতে পারা গেল, মিঃ মৈত্র কলকাতায় বসেই সকল ব্যবস্থা আগেভাগে করে রেখেছেন। বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ার ও ডেক-চেয়ারগুলি সাজিয়ে রাখা। ভিতরে পা বাড়ালেই সুসজ্জিত নিখুঁত ডাইনিং হল্। রান্না বান্নার ব্যাপারটা খানসামার মহলে। সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক, পিছনের বারান্দার দিকে পাহাড়ের দেওয়ালের ঠিক নিচে স্নানাদির সুব্যবস্থা।

মিঃ ভৌমিক তাঁর পক্ষের সকল কথাবার্তা শেষ করে যাবার সময় বলে গেলেন, আপনাদের বাথরুমে গরম জল সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করেছি। দিন রাত —যখনই খুশি কলে জল পাবেন। এখানে ঠাণ্ডা খুব বেশি। জল হাওয়াও বেশ ভাল।

জয়ন্ত বলল, আপনাদের অফিসটা ঠিক কোন্খানে?

ভৌমিক বললেন, সামনের এই জঙ্গলটা ছাড়িয়ে গেলে মিনিট পাঁচেকের হাঁটাপথ। কাল সকাল এগারোটায় আপনাদের ওখানে নিয়ে যাব। আমাদের এখানে এখন ম্যাঙ্গানিজ ও মাইকার কাজ চলছে। সাইট-এর কাছেই আমাদের স্টাফ-কোয়ার্টার।

মিঃ ভৌমিকের সঙ্গে একে একে প্রায় সবাই বিদায় নিলেন। অতঃপর খানসামা সুখন ও তার সহকারী প্রচুর পরিমাণ রুচিকর আহার্য সামগ্রী থরে থরে এনে যখন ডাইনিং টেবলের উপর একে একে সাজাতে লাগল, তখন তাজা গরম চিকেন-সুপের দিকে অলক্ষ্যে তাকিয়ে জয়ন্ত হেসে বলে উঠল, ভদ্রলোকের কথাটা মিথ্যে নয়। জল-হাওয়া বোধ হয় এদিকে ভালই!

খানসামারা যাবার সময় আলো জ্বেলে দিয়ে গেল।

মিহি ফ্লানেলের কোটটি ছেড়ে রেখে রেবা এসে খাবার টেবলে বসল। দু-তিন চামচ সুপ মুখে তুলে জয়ন্ত বলল, তোমার সেই ক্যাম্পের অভিজ্ঞতার পর এই আমার দ্বিতীয়বার। ঠিক এই ধরনের একটা দায়-দায়িত্বশূন্য জীবন আমার জানা ছিল না আগে।

কেমন লাগছে তোমার ?

ঠিক বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমার মধ্যে বোধ হয় রয়েছে একপ্রকার বন্যপ্রকৃতি। তার সঙ্গে মিলছে। সম্ভবত এইটি আমি চেয়েছিলুম।

রেবা চুপ করে স্থপ মুখে তুলতে লাগল।

জয়ন্ত বলল, বাংলার বাইরে এই আমার প্রথম। পাহাড়ি অঞ্চল কাকে বলে জানতুম না। গিরিনদী কেমন, দেখেছি কি কখনো? তুমি কতবার কত দেশ ঘুরেছ, কিন্তু আমার কাছে একবারও গল্প বলোনি। আজ মনে হচ্ছে এখানে আসারি দরকার ছিল আমার। মনে হচ্ছে বাকি জীবন এখানেই থেকে যাই না কেন ?

রেবা হাসল। এক চামচ ফ্রায়েড রাইস মুখে তুলে বলল, এত অল্পে তুমি কেন তুষ্ট হবে, জয়ন্ত ? পৃথিবী অনেক বড, আকাশ তার চেয়েও বড়। বাকি জীবন এখানে ? কেন, কি জন্য ? এমন জায়গা আছে হাজার হাজার ! সব রাজ্য থেকে তোমার ডাক আছে। তুমি ছড়িয়ে থাকবে সব দেশে, সকল খানে। এ দেশ তোমার। এমন অনেক অঞ্চল আজও আছে যেখানে এখনও মানুষের পায়ের দাগ পড়েনি—সে সব জায়গাও তোমার। তুমি যে এই দেশেরই কবি।

জয়ন্ত আবার চুপ করে গেল। অবেলার কোন্ অপরিচিত পাখি যেন ডাকছে কোন পাহাড়তলিতে। বাকি সব নিশ্চুপ। শীতের হাওয়ায় শাল ও শিসমের মর্মরদোলা, ঝাউবনের বিষণ্ণ নিঃশ্বাস, শীর্ণ গিরিজলের ছপছপে শব্দ—তার সঙ্গে মিলিয়ে থাকে কাঠবিড়ালি আর গিরগিটির ডাক, উড্ডীন টিয়াদলের চূর্ণকণ্ঠস্বর। প্রাকৃত বিজনতার এই উপলব্ধি জয়ন্তকে কি এক মন্ত্রে যেন শান্ত করে আনছে।

আহারাদি সেরে ওরা বাইরে এল। একদিকে সরু পথ চলে গেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। অন্য পথ গিয়ে নেমেছে নদীতে। অনেকদূর দিয়ে যাচ্ছে একটি আদিবাসী মেয়ে কাঠকুটো মাথায় নিয়ে। সামনের পাহাড়ের পিছন দিকে অবেলার সূর্য নেমে যাচ্ছিল। থমথম করছে চারধার। দূরের কারখানায় ডিজেল-ইঞ্জিনের বেয়াড়া আওয়াজটা ছাড়া আর কোথাও কিছু শোনা যাচ্ছে না।

একটা গাছের তলায় গিয়ে জয়ন্ত দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকেই সে বলল, ভৌমিকের মনস্তত্ত্বটা বিশ্লেষণ করলে কী পাওয়া যায় বলো ত' রেবা ?

একখানা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে রেবা বসে পড়েছিল নধর তৃণভূমির ওপর। সেখান থেকেই হাসিমুখে সে বলল, ভৌমিক ভাবছে, বড়সাহেবের

মেয়েটাকে এ-যাত্রায় খুশী রাখতে পারলে প্রো ডাকশন বোনাসটার সঙ্গে কমিশনও কিছু বাড়তে পারে!

না না, ও লাইন নয়—জয়ন্ত বলল, আমাদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে ভদ্রলোক কী ভাবছেন তাই বলো।

রেবা হেসে উঠল। তারপর বলল, বুঝেছি। তোমার ভেতরকার সেই রক্ষণশীল ভূত আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে। ভৌমিক কিছু ভাবছে না—ভাবছ তুমি। পাছে তোমার চরিত্র-নষ্টের খবর কেউ পায়, এই ভয় তোমার! বেশ, আমি যাবার সময় ভৌমিকের কান ধরে একটা কথা বলে যাব—

হাসিমুখে জয়ন্ত বলল, কী বলবে?

রেবা বলল, এই কথাটাই বুঝিয়ে বলব, ভৌমিকমশাই, কিছু মনে করবেন না। জয়ন্তকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু মনে রাখবেন, কবি-চরিত্র আর পুরুষ-চরিত্র এক নয়! এই ভীরুপ্রকৃতি কবির কাছে আমার কৌমার্য চিরদিনই নিরাপদ থাকবে, আপনার উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।

হেসে উঠল জয়ন্ত। বলল, বেশ, এবার শুনিয়ে দাও তোমার ওই ভৌমিক কি প্রকার জবাব দিতে পারে!

খুব সহজ।—হাসিমুখে রেবা বলল, ভৌমিক বলবে, দিদিমণি—আপনি যে-ব্যক্তির পায়ের তলায় আশ্রয় নিয়েছেন, তাকে কবি বলেই আমরা জানি। তিনি যে ম্যাসকুলিন জেন্ডার, এ কিন্তু প্রথম জানলুম!

বটে। এত হেনস্থা আমাকে! চলো ঘরে, তোমাদের এই চ্যালেঞ্জের জবাব আজ দেবো!—জয়ন্ত দ্রুতপদে এগিয়ে এসে রেবার হাত ধরে তুলল। বলল, চলো—

রেবা উঠল। হাতখানা সে ছাড়াবার চেষ্টা পেল না। ঘরে এসে শান্ত মধুর হাস্যে বলল, জয়ন্ত, তোমার স্বভাবের নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা। চেষ্টা করলেও এ সব তুমি পারবে না।

দেখো পারি কিনা—জয়ন্ত রেবাকে বিছানায় বসিয়ে দিল।

রেবা আবার হাসল। বলল, জয়ন্ত, প্রায় সাত বছর হতে চলল, তুমি আর আমি। তোমার চোখের ওপরে ভরে উঠেছে আমার দেহ—এই যা দেখছ কানায়-কানায়। আমার চোখের ওপরে তোমার দেহের সব লক্ষণ একে একে ফুটেছে—মেয়ের চোখ ঠিক যেগুলি চায়! আজ তুমি হাত ধরে টানছ কেন? তোমার ওই ব্যায়াম-করা মাংসপেশী, তোমার বলবান বুকের ছাতি, তোমার আশ্চর্য রূপ—এই সব নিয়ে তুমি যদি আমার চুলের ঝুঁটি ধরে আছাড় মারতে থাকো, সেও যে আমার সইবে। তুমি অসুর হয়ে উঠলেই দেখতে আমিও

রাক্ষসী হয়ে উঠেছি। কিন্তু তা তুমি হওনি, আমাকেও হতে দাওনি। সুতরাং তোমার মন যেখানে দুর্বল নয়, সেখানে সামান্য ভৌমিককে ভয় পাও কেন?

শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল বাইরে। রেবা উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। তারপর জয়ন্তর একখানা হাত টেনে বলল, নাও, শুয়ে পড়ো বিছানায়। অবেলায় খেয়ে উঠেছ।

জয়ন্ত বলল, তুমি ত' বেশ মজার লোক চান্সটা নষ্ট করলে?

কিচ্ছু নষ্ট হয়নি।—এই বলে রেবা জয়ন্তকে ডানলপ্ গদির উপর নধর বালিশ দিয়ে শুইয়ে দিল। পরে হাসিমুখে বলল, মেয়েমানুষের ইনট্যুইটিভ্ দৃষ্টির ওপর বিশ্বাস রেখো জয়ন্ত। তোমার গা ছুঁলেই বুঝতে পারি তোমার সর্বনেশে পোটেন্সি।

রেবা বসল জয়ন্তর পাশে। তারপর ঈষৎ হেঁট হয়ে সে বলল, রামলোচনকে বলে দিয়েছি। কাল ভোরে তোমার পথের কাঁটা সরাবো।

তুমি ড্রাইভ করবে?

হাসিমুখে রেবা বলল, দাসী তোমার হুকুমের জন্য সব সময়ে প্রস্তুত।

জয়ন্ত কী যেন ভাবল। পরে বলল, আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না, রেবা? ধরো, আমরা গাড়ি ছেড়েই দিলুম। রেলগাড়ি, ট্যাক্সি, টাঙ্গা, একা, নৌকো, সাইকেল রিকসা—সব আছে সব জায়গায়। জানি ওতে অনেক পরিশ্রম, ছুটোছুটি, কুলি হাঁকাহাঁকি, দর কষাকষি,—এবং শেষ পর্যন্ত জন্তুর মতন হাঁপানো। কিন্তু রেবা ওতে অন্তত ধনাঢ্যের বিলাস নেই

রেবা বলল, কোনও প্রশ্ন আমি তুলব না। তোমার ভাল লাগলেই আমি খুশী। পথঘাট জানা নেই,—নাই বা থাকল। রেলগাড়ির টিকিট কিনব না,—যেখানে খুশি নামব টিকিটের দাম দিয়ে। কুলি যা চাইবে তাই দেবো। প্লাটফরমে যা খুশি খাবো। ওয়েটিং রুমে রাত কাটাবো। ভাল জায়গা দেখলে ডাক বাংলো বা হোটেল খুঁজবো। স্নানের দরকার নেই। সাজসজ্জা ময়লা হলে ফেলে দিয়ে নতুন কিনব। একা কি টাঙ্গা পেলে বলব, চল যেদিকে খুশি।

জয়ন্ত বলল, হুঁ, বুঝেছি। তুমি মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু নও। একালের খবর এতটুকু রাখো না। ট্রেনের হ্যাণ্ডেল ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে যায় অর্ধেক প্যাসেঞ্জার, রেলগাড়ির মাথায় চড়ে শত শত লোক। সেবার আসানসোলে গাড়ি ধরতে গিয়ে আমার জামা কাপড়ের অবস্থা দাঁড়াল যেন ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্ট। যখন নামলুম,—তৈলঙ্গ স্বামী।

রেবা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

জয়ন্ত বলল, তারপর কুলি। কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে যখন তোমার যৌবনসম্ভারকে পাহারা দিতে দিতে এগোবো,—পিছনের কুলি ততক্ষণে হাওয়া। প্লাটফরমে মাছি-বসা নোংরাটে খাবার খাবো,—তারপর পঞ্চাশ মাইল পেরিয়ে গিয়ে কবিপ্রিয়ার ওলাউঠো আরম্ভ। আর—ওয়েটিং রুমে পাঁচজনের মাঝখানে পুঁটলী হয়ে শোবে? কিন্তু তখন যদি হঠাৎ দুজনের ভালোবাসার ইচ্ছে হয়? আড়াল পাবো কোথায়? তারপর ধরো, এক্কা কিংবা টাঙ্গা। যদি তারা দু'জনকে অজানা জায়গায় নিয়ে গিয়ে পাঁচজনে মিলে তোমার,—মানে, খারাপ কথাটাই বলছি।

রেবা বলল, আমি তখন বলতে পারব, কবি, তুমি পালিয়ে বাঁচো। আমার যে দশা হয় হোক।

জয়ন্ত হেসে ফেলল। রেবা তার সঙ্গে যোগ দিল।

তার চেয়ে আমি বলি ওসব থাক—জয়ন্ত বলল, গাড়ি নিয়েই চলো। যেখানে খুশি থামা যাবে, যাবে যেখানে ইচ্ছে। রেলগাড়ি হ'ল বশ্যতা, তার মুখ চেয়ে থাকা, তার টাইমের কাছে দাসত্ব। মোটর তা নয়। ওর মধ্যে থাকবে আমাদের নিজস্ব জগৎ, আমাদের মন দিয়ে গড়া ছোট্ট সংসার। তার সঙ্গে মধুর আলস্য জড়িয়ে থাকবে। সেই আনন্দ আমাদের গতিশীল। ওই ছোট্ট আমাদের সংসার দ্রুত ধাবমান। সমস্তটা অস্থির, চলমান, বেগবান। ঊর্ধ্বশ্বাসে আমরা ছুটছি, রাশ আমাদের আলগা, জীবন স্খলিত, উড়েছে আমাদের মন, উড়েছে যৌবনের বিজয়কেতন, শিথিল হয়েছে সব বাঁধন। তারপর সেই অচেনা অজানা পথের কোনও একখানে,—চরাচরব্যাপী অন্ধকারে আত্মহারা তুমি আর আমি,—কোনও এক গিরিখাদের পাশে গাড়িখানা হোঁচট খেয়ে ছিটকিয়ে পড়ল নিচের দিকে—

তারপর?

জয়ন্ত বলল, তারপর কেটে গেছে অনেকদিন। আমাদের সেই রসরক্তমাখা দেহ নিয়ে টানা হেঁচড়া ক'রে গেছে শেয়াল আর হায়না, খাবল খাবল পচা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেছে আহত অশক্ত নরখাদক বাঘ,—পড়ে আছে আমাদের কঙ্কাল থেকে খসা কয়েকটা হাড়ের টুকরো,—

রেবা কান পাতল জয়ন্তর বুকের উপর। বলল, না, ঘড়ির কাঁটা একভাবেই চলছে। একটু চাঞ্চল্যও তোমার নেই। এসব তোমার কবি কল্পনা। তুমি সব বললে, একটি শুধু বাকি রাখলে। আমার হাতে যে ষ্টিয়ারিং আর ডান পায়ে ব্রেক—এটা কই বললে না তো? একথা কই বললে, আমার পাশে রয়েছে আমার দেবোত্তম, যার দৈবশক্তি আমাকে অপরাজেয়া করে রেখেছে?

দৈবশক্তি? জয়ন্ত ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলল, এ আবার কি বলছ?

রেবা হাসল। বলল, যে-শক্তি চোখে দেখিনে অথচ রয়েছে, সেইটিই তো দৈব। ইলেকট্রিকের মূল উদ্ভব দৈবের থেকে, একি তুমি আজও জানো না? তুমি যে কবি, তোমার শক্তি দৈবের সেই অনুপ্রেরণা। বিজ্ঞানের অনেক কথা জেনেও এটি আমি স্বীকার করছি। তোমার সেই রহস্যশক্তি থেকেই আমি সম্ভূত, ভুলে যেয়ো না, জয়ন্ত। তোমার শক্তি নিয়ে তোমাকেই আমি পাহারা দিচ্ছি। তুমি ব্রেক কষছ, তুমিই ষ্টিয়ারিং ধরছ আমারই হাত-পা দিয়ে!

• জয়ন্ত বলল, তোমার চোখ যেন অনুরাগের রঙীন তন্দ্রায় বিলোল। কাকে ভালোবাসো তুমি বল তো? আমাকে, না কবিকে?

রেবা তার মুখখানা আরও কাছে নিয়ে এল। তারই চুলের ঝালর নামল জয়ন্তর ললাটে। সেই মোহমদির আবেশে যেন কিশোর মন্দারপুষ্পের গন্ধ ঢালা। পাছে পৃথিবীর আর কেউ শোনে, সেজন্য চাপা কণ্ঠে রেবা বলল, কবি কে। তুমি হলে খোসা, কবি শাঁস। তোমার সেই কবিসত্তায় আমি আত্মলীন জয়ন্ত।

কিন্তু আমি যে ভালবাসি তোমাকে?

ভুল, - ভুল জয়ন্ত!—রেবা সোজা হয়ে বসল এবার। বলল, এতক্ষণে ভুল বললে। ভালবাসছ তুমি নিজেকে। আমি তোমার সেই নিজ। তোমার সেই আদিম পঞ্জরাস্থির থেকে আমার উদ্ভব। তোমার মর্মচ্ছেদন করেছি দাঁত দিয়ে, শিরা উপশিরা ছিঁড়েছি নখ দিয়ে, সমস্ত রক্ত চুষেছি তোমার হৃৎপিণ্ডের, ঝড়ের আঘাত হেনেছি তোমার মস্তিষ্কে, বন্যাকে বিস্তার করেছি তোমার ভাবনায়,—আমি তোমার সেই নিজ। আমি যে তোমাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে বাইরে ছুটে এসেছি অবশ্যম্ভাবী এক পরিণামের মতন। আমাকে ভালবাসবে তুমি? আমি কি বাইরের অবজেক্ট? আমি মানেই যে তুমি!—বলতে বলতে হেসে উঠল রেবা।

জয়ন্ত গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। বলল, সব মাটি করলে! বেশ একটু গরম হয়ে উঠছিলুম, সব জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তুমি যেন একালের ভগ্নিপতিব্রতা। শুধু উসকিয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে চাও। সে যাই হোক, তোমার শাঁসটুকু ঠিক কেমন, আজও জানিনে, কিন্তু তোমার খোসাটি বড় মনোহর।

রেবা হেসে লুটিয়ে পড়ছিল। জয়ন্ত বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। বাইরেটা ততক্ষণে নিশুতি অন্ধকার হয়ে এসেছে। দরজার পাশেই ছিল কলিং বেল। সেটা টিপে জয়ন্ত খানসামাকে ডাকল।

এক মিনিটের মধ্যেই ছুটে এল সুখন। ওরা চায়ের অর্ডার দিল। চাকরটা এগিয়ে বাইরের বড আলোটা জ্বালল। মালিকপক্ষ বাংলোয় এসে বাস করছে,—ওই আলোটাই তার নিশানা।

পাহাড়ের ঠিক মাথায় পশ্চিম আকাশে চতুর্থীর চাঁদ দেখা দিয়েছে। গিরিনদীর ক্ষীণধারায় সেই চন্দ্রালোক ঝিকমিক করছিল। রেবা গিযে স্থির হযে দাঁডাল বারান্দায়। না, আর নয। সময় হয়েছে।

॥ ১২ ॥

মাসদুই পরে ওদের দুজনের আবার খোঁজ পাওয়া গেল। গতি ছিল ওদের দুর্বার। ওরা যেন অনেকটা শূন্যে উড়ছিল মহাকাশযান বিমানের মতো। থামবার মতো মন ওদের নেই। তা না থাক, কিন্তু রেডিয়ো সিগনালের মতো ওদের গতিপথ বহু দূর থেকে যিনি নিয়ন্ত্রিত করছিলেন, তিনি হলেন মিস্টার মৈত্র। দেখতে দেখতে দু মাস ওরা বারটা ইউনিট ঘুরে বেড়ালো। মিঃ মৈত্রর নিকট ওদের প্রত্যেকটি ইউনিট পরিদর্শনের সংবাদ গিয়ে পৌঁছচ্ছিল।

ওরা চেনাপথ দিয়ে যাচ্ছে না বলেই সময় নিচ্ছে বেশি। তাড়া কিছু নেই, কেননা দায়িত্ব নেই। ওরা হারিয়ে যেতে চাইছে, ওদের সখ হ'ল অপরিচয়ের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া। পিছনের কোনও টান নেই বলেই দুর্ভাবনা কিছু নেই।

পথ ভুলছে পদে পদে, সেটি ওদের চিত্তবিলাস। ভুল যত ঘটে আমোদ তত বেশি। তবুও একদিন ছত্রিশগডের ভিতর দিয়ে ওরা এসে পৌঁছল মহারাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে। এটি দণ্ডকারণ্যের উত্তর সীমানা। ওরা চললো দক্ষিণ পশ্চিমে। অতঃপর ওরা অম্গাগডচৌকি ছাড়িয়ে পার্বত্য পথের ভিতর দিয়ে এক সময় বাইনগঙ্গা অতিক্রম করে পৌঁছল ব্রহ্মপুরী। এখানে পেটল নেবার দরকার ছিল। এরপর চন্দা ষ্টেশন অনেক দূর। তা হোক। ওদের গাডির গতি ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল। সুতরাং মধ্যাহ্নকালের অনেক আগে ওরা চন্দা, রাজুরা ও নাদের হয়ে সাতমালা পর্বতশ্রেণীর তলায় তলায় এক সময় গিয়ে পৌঁছল আদিলবাদ দুর্গনগরীর কাছাকাছি। নগরের উপান্তে পাহাডতলীর এক বৃক্ষচ্ছায়ায় রেবা ওর গাডি থামাল। গাডির দুই দরজা খুলে দু'জনেই নামল সান-গ্লাস চোখে দিয়ে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, জয়ন্ত কালো ট্রপিকাল ট্রাউজার ও ফিতাবাঁধা স্যু পরেছে। গায়ে তার শ্রেষ্ঠ টেরেলিন। ছোট প্রজাপতি-ফুল আঁকা নেকটাই ঝুলছে চৌদ্দ ক্যারাট সোনার সেফটিপিনে আঁটা। দাক্ষিণাত্যের কিছু রৌদ্রাভাস ওদের স্পর্শ করেছে, সে জন্য ওদের সোনামুখ টকটকে রাঙা হয়ে উঠেছে। মৃদুর একপ্রকার ক্লান্তি ওদের আরও সুন্দর করেছে।

কাল রাত্তিরে যেন কোথায় ছিলুম, জয়ন্ত?

কাল রাত্তিরে? দাঁড়াও বলছি,—কী যেন বেশ জায়গাটা!

জয়ন্ত তাকাল বিদেশী গাছপালার ভিতর দিয়ে আকাশের কোন এক কোণে। না, মনে পড়ছে না। প্রতিদিন ওদের নব নব জন্ম ঘটছে এক জীবন থেকে অন্য জীবনে। চোখের উপর দিয়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে যেন জন্মজন্মান্তরের ছবি। ওরা যেন ভেসে চলেছে কালস্রোতে। না, কিছুতেই মনে পড়ছে না।

রেবা হাসল। বলল, কবিতা নিযে বসেছিলে কাল প্রায় সারারাত, সেটাও কি ভুলেছ? ডাকবাংলোর শূন্য বিছানাটা যে কাঁদছিল তোমার জন্যে।

হেসে উঠল জয়ন্ত। বলল, এবার মনে পড়েছে। মানপুর।

রেবা বলল, উঁহু, হল না। ওটা অভিমানপুর।

জয়ন্ত আবার হেসে উঠল!

রেবার পরনে ছিল স্ল্যাক, উপর দিকে হাফ হাতা ও হাফ ঝুলের একটা মেরুনবর্ণের কামিজ। ফলে, সে পাহাড়ি জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। রেবা তার কালো চশমার ভিতর দিয়ে সেটি লক্ষ্য ক'রে এক সময় বলল, এসো গাড়িতে উঠি।

কোন্ দেশের ভেতর দিয়ে কোথায় যে যাচ্ছি, ঠাহর করতে পারছিনে।

আমিই কি পারছি?—গাড়িতে উঠে রেবা বলল, এই জানি সামনে শুধু পথ। আর দেশ। এ দেশ তো তোমারই, জয়ন্ত।

সেই দেশেরই দিকে এদিক-ওদিক চেয়ে জয়ন্ত বলল, তোমার কি মনে হচ্ছে মিথ্যেই ঘুরছি আমরা? শুধু এক ইউনিট থেকে অন্য ইউনিটে যাওয়া,—তুমি কি ভাবছ একই গল্পের পুনরাবৃত্তি?

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে রেবা বলল, না, আমি ভাবছি তোমার মন। তুমি চেয়েছিলে তোমার আকাশ বড় হোক, তোমার ভাবনা বিশাল হোক। আর আমি চেয়েছিলুম, সমস্ত দেশের ছায়া পড়ুক তোমার কবিতায়।

জয়ন্ত চুপ ক'রে গেল। সাতমালার আঁকাবাঁকা পথের ভিতর দিয়ে ওদের গাড়ি চলল দূর দূরান্তরে। রৌদ্রপথ ছিল ফাঁকা। রেবা গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল। জয়ন্তর পকেটে ছিল বাদাম। তার থেকে গোটাদুই বার ক'রে একটি দিল রেবাকে, অন্যটি নিজে। এটি যে ক্ষুধার সঙ্কেত, রেবার সেটি চোখ এড়াল না। নান্দের নামক বড় একটা জনপদে পৌঁছে হাটতলার দিকে তাকিয়ে রেবা বিরক্ত হয়ে বলল, খাবার দোকান দু'চারটে রয়েছে দেখছি। কিন্তু এখানে তুমি নাই বা কিছু খেলে?

জয়ন্ত হাসিমুখে বলল, তোমার বুঝি স্ল্যাক পরে নামতে লজ্জা?

লজ্জা! কই না, তুমি আছ—লজ্জা কিসের? আমি বলছি তোমার ওই নর্দমার ধারে মাছি-বসা মিষ্টি, কিংবা তিলের তেলে রান্না ভাত-চচ্চড়ি খেয়ে কাজ নেই। চলো।—রেবা আবার গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

সকাল নটায় আজ তারা বেরিয়েছিল। কিন্তু আজ ওরা ন্যাশন্যাল হাইওয়ে খুঁজে পায়নি। সেজন্য পথের নির্দেশ নিতে গিয়ে বহুবার রেবাকে গাড়ি থামাতে হয়েছে, এবং প্রশ্ন করতে হয়েছে বহুলোককে। এইভাবেই ওরা এসেছে বরাবর। সুতরাং নান্দের থেকে কালমনুডি পযন্ত ওইভাবেই ওদের আসতে হ'ল। অতঃপর কালমনুডি থেকে হিঙ্গোলি হয়ে ওরা যখন শিউপুরীর মস্ত বাংলোয় এসে পৌছল, বেলা তখন দেড়টা বেজে গেছে। এটি উপত্যকা অঞ্চল। দূরে দূরে বনময় পাহাড়ের স্তর দেখা যাচ্ছে।

একটি গোলাকার টিলা-পাহাড়ের ওপর ঠিক কেন্দ্রস্থলটিতে এই বাংলোটি একটু পুরনো কালের। এটি ছিল ইংরেজ আমলের কমিশনার সাহেবদের বিশ্রাম-ভবন। এটিকে তাঁদের বিলাসপুরী বললে ভুল হয় না। এই বাংলোটির ভিন্ন নাম হ'ল শিকারকুটি। এখান থেকে বনজঙ্গলের দিকে তাঁরা নৈশ অভিযান করতেন, অর্থাৎ শিকার সন্ধানে যেতেন। এই পাহাড়েরই পশ্চিমে অদূরবর্তী পার্বত্য পূর্ণানদীর জনশূন্য বেলাভূমি। ওপারে বনময় শস্য প্রান্তর। কিন্তু হিঙ্গোলি থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরবর্তী এই বাংলোর অর্থনীতিক প্রযোজন না থাকায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এটির প্রতি আকৃষ্ট হননি। সেই কারণে বছর আঠারো আগে এখানকার পাহাড়ি অঞ্চলের এক স্থলে রায়সাহেব এক সাহেবের সহায়তায় যেদিন সোডিয়ম্ বক্সাইটের খোঁজ খবর পান, সেদিন তিনি আর কালবিলম্ব না ক'রে শিউপুরীর এই বাংলোটি খরিদ করেন। সুদূর বাঙলা দেশের জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হঠাৎ শিউপুরীর বাংলোটি কিনে বসলেন কেন, এই কৌতূহলী প্রশ্নের যথার্থ জবাব পাওয়া গেল বছর দুয়েকের মধ্যেই—যখন পূর্ণা ও পীনগঙ্গার মাঝামাঝি অনধ্যুষিত বনময় পাহাড়ি এলাকার মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল এলুমিনিয়মের খনিজ ধাতব সার। স্থানীয় জনসমাজ একটু সচেতন হয়ে উঠেছিল সেদিন।

লাল কাঁকর পাথরের সুন্দর ঢালু পথটি দিয়ে রেবার গাড়ি টিলা পাহাড়ে উঠে এসে বাংলোর সামনে থামল। ওরা এখানে সম্পূর্ণ নতুন, কিন্তু যেন অতি পরিচিতের চেহারা নিয়ে এসে দাঁড়াল কয়েকজন মেয়ে পুরুষ। তারা হাসিমুখে ইংরেজি ও মারাঠি ভাষায় সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল, সেই সময় ভিড়ের ভিতর একজনকে লক্ষ্য ক'রে রেবা বলল, আরে, মিস্টার সামন্ত যে?

সামন্ত করজোড়ে নতবিনয় সংকারে এগিয়ে এলেন। রেবা বলল, বোম্বাই থেকে বদলি হলেন কবে?

সামন্ত বললেন, এই মাস তিনেক হল। আমি এখানকার চার্জেই আছি। এঁরা অনেকে আমার সহকারী। ওই মহিলা দু'জন অফিসের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী, একজন হলেন টাইপিস্ট। উনি তো নিশ্চয়ই জয়ন্তবাবু— ?

নমস্কার ও সম্ভাষণ বিনিময়ের পর জয়ন্ত ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, দেখুন, সামন্ত মশাই, আজ আমাদের একাদশী, কিন্তু দ্বাদশীর দিনে হোটেলে খেতে গেলে কি হিঙ্গোলির দিকে যেতে হবে ?

রেবা অতি কষ্টে সকলের সামনে হাসি চাপল। সামন্ত শশব্যস্তে বললেন, আজ্ঞে, তা হবে কেন, স্যর। এই বাংলোতেই আপনাদের সব আহারাদি প্রস্তুত আছে। আপনাদের যা দরকার তাই পাবেন। এখানকার দেশী ঘি, মাখন, গরুর দুধ—এসব খুবই খাঁটি। তা ছাড়া তাজা সব্জি, ফলপাকড়—

কিন্তু আমিষের দিকটা ?

সামন্ত বললেন, এই যে ইনি সুশীলাবাঈ রয়েছেন, ইনি আছেন রান্নাবান্নার চার্জে। ইনি ইংরেজি জানেন। এখানে পূর্ণানদীর মাছ খুব ভাল। তা ছাড়া আদিলাবাদের হাট থেকে হাঁস মুরগি সবই আসে। আপনারা যদি লোনার এর ওদিকে যান, তা হ'লে হরিণ শিকারও হতে পারে।—যাই হোক, আজ আপনাদের একাদশী এটা আগে জানা ছিল না। সুশীলাবাঈ সব প্রস্তুত রেখেছিলেন, মানে, আমার কাছে পরশু দিনে কলকাতা থেকে ইন্‌সট্রাকশন এসে গেছে—

রেবা তাড়াতাড়ি ভিতর দিকে পালিয়ে গেল। জয়ন্ত এবার বিপাকে পড়ে একটু থতমত খেয়ে বলল, আচ্ছা, আপনাকে এখনকার মতো ছুটি দিচ্ছি—সুশীলাবাঈ কাছাকাছি থাকুন,—দেখি, এদিকে আবার মেয়েছেলে কিনা,—বুঝতেই পারছেন। মানে, অবশ্য ঠিক হিন্দু বিধবার একাদশী নয়, এই যা—

সামন্ত তখনকার মতো বিদায় নিলেন। এই পাহাড়ের উপরেই অদূরে ওঁদের অফিস। কোয়ার্টারগুলি তার কাছাকাছি। যাবার আগে তিনি হুকুম দিয়ে গেলেন, মোটর থেকে সমস্ত মালপত্র নামিয়ে নিয়ে যেন মালিকের গাড়ি ধোওয়া-মোছা হয়।

জয়ন্তও একপ্রকার ছুটে পালিয়ে এল ভিতরে। বড় হলঘরটা মুখর হয়ে উঠল দুজনের হাসিতে। একাদশী কবে আসে এবং কোথা দিয়ে যায়—ওরা তার খবরই রাখে না। কিন্তু জয়ন্তর এই অপলাপ কাটিয়ে উঠতে রেবাকে বেগ পেতে হল। ব্যাপারটা সুশীলাবাঈকে বুঝিয়ে বলতে সময় লাগল। সে মারাঠি মেয়ে, সে জানে একাদশী মানে নির্জলা উপবাস। রেবা তখন তুলল পাঁজিপুঁথির কথা। তা ছাড়া ধরো, লঙ্গিটিউড-ল্যাটিটিউড। বোম্বাইতে

যখন রাত তিনটে কলকাতায় ভোর সাড়ে পাঁচটা। তা হলে ছাখো, তুমি নির্জলা উপোস করে যখন ছটফট করছ, বাঙ্গালী তখন ডিমসিদ্ধ আর মাংস ভাজা নিয়ে ব্রেকফাস্টে বসে গেছে। এসব অ্যাডভান্সড টাইম আর বিহাইণ্ড টাইমের মামলা। বাঙ্গলা সবচেয়ে অ্যাডভান্সড টাইমে চলে, বুঝেছ সুশীলাবাঈ?

আই সী।—সুশীলাবাঈ হাসল।

তারপর এই যে তোমাকে বললুম, প্রহর, দণ্ড, পল, অনুপলের কথা,— এসবই সায়েন্সের ক্যালকুলেশন। কিন্তু ওই যে,—এক রাজ্যে যা মেলে না, অন্য রাজ্যে তাই নিয়ে গণ্ডগোল। একাদশী আজ ছেড়ে গেছে বেলা এগারোটায়,—তুমি কি জানতে পেরেছিলে? তা হলেই বুঝতে পারছ দ্বাদশী পড়ে গেছে আমাদের আসার কিছু আগে। ওরা পুরুষ মানুষ অত শত খবরও রাখে না। তুমি শিগগির আমাদের জন্মে খাবার পাঠিয়ে দাও মানে, নন-ভেজিটেরিয়ান, বুঝেছ?

আজ্ঞে হাঁ, ম্যাদাম আগাগোড়া পরিষ্কার বুঝেছি। এই বলে সুশীলাবাঈ হাসিমুখে চলে গেল। এই বাংলোর সে মেট্রন।

বলা বাহুল্য, অপরাহ্ন আসন্ন। তবু আহারাদির আয়োজন ছিল প্রচুর-এবং উপাদেয়। ওর মধ্যে মোগল পাঠান ও হিন্দু সংস্কৃতি একটি সংহতি লাভ করেছিল। যে ছোকরাটি ওদের ভৃত্য হিসাবে রইল তার নাম প্রভাকর খোটে। তা ছাড়া রইল চাপরাশি এবং সশস্ত্র প্রহরা। জয়ন্তর ভ্রূক্ষেপ ছিল না কোনদিকে। ক্ষুধার্ত কবি-জয়ন্ত দ্বাদশীর পারণে অতিশয় ব্যস্ত ছিল।

রেবা ওর খাওয়া দেখে হেসে লুটোপুটি।

পরদিন অফিস ও কারখানা পরিদর্শনকালে কথায় কথায় রেবা বলল, আচ্ছা, সামন্ত মশাই, আমাদের ওই পেছনের পাহাড়ে ওঠা যায় না? খুব কি জঙ্গল ওদিকে?

আজ্ঞে, ও সবই তো জংলা জায়গা। ওদিকে যায় না কেউ বড় একটা।

জন্তু-জানোয়ার আছে নাকি?

এখন নেই বটে, তবে মাস কয়েক আগে পর্যন্ত ম্যান-ঈটার একটা ছিটকিয়ে এসেছিল। সেটা মাস দুই আগে মারা পড়েছে। এই পাহাড়টারই ওপারে পরভানি মহকুমা।

রেবা বলল, আমাদের খুব ইচ্ছে পাহাড়ের ওপরে দু'একদিন কাটাই। আপনি ব্যবস্থা করতে পারবেন?

সামন্ত বললেন, বিলক্ষণ, এ তো সামান্য কথা। আমাদের বড় তাঁবুটা খাটিয়ে দিতে কতক্ষণ?

জয়ন্ত বলল, কিন্তু মালপত্র তুলতে অসুবিধে হবে না?

সামন্ত বললেন, আপনারা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, এইটুকুই আমাদের আনন্দ। বাকি সব ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি। আজকেই যাবেন কি?

আপনি কি বলেন?—রেবা বলল।

আমার যে-কোনদিনই সুবিধা। তবে চাঁদের আলো বাড়লে মাঝে-মধ্যে এক আধটা ভালুক বেরোয়। তাতে কিছু এসে যায় না। দপ্তেকারের রাইফেল আছে, ওর সঙ্গে দু'জন থাকবে ওখানে আপনাদের পাহারায়। অবিশ্যি ভয় ওঁর এখন কিছু নেই।

রেবা বলল, মিস্টার সামন্ত, পাহারার ব্যবস্থা আমার ভালো লাগছে না—। আমরা একাই থাকব।

সামন্ত কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। পরে বললেন, কিন্তু দু'চারটে ময়াল আছে ওপরে, যদি এক আধটা তাঁবুতে ঢুকে পড়ে, তাই ভাবছি। হরিণ-সম্বরে তো আর ভয় নেই, তবে বন কুকুর আছে কয়েকটা শুনেছি। এদিকটা ঘন জঙ্গল কিনা—। আমি ঠিক ভরসা পাইনে আপনাদের একা রাখতে।

হাসিমুখে শান্তকণ্ঠে রেবা বলল, আপনি লোডেড রাইফেলটা দিয়ে রাখবেন তা হলেই হবে। স্পট-লাইটটাও পাঠাবেন।

স্ত্রীলোকের মুখে এ ধরনের কথা শোনা সামন্তর অভ্যাস নেই! তিনি শুধু বললেন, বেশ, তাই হবে।

জয়ন্ত এবার ওঁর ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে বলল, আপনার বোধ হয় জানা নেই, রেবাদেবীর হাতে রাইফেল খুব ভালো চলে। টারগেট-সুটিংয়ে এন-সি সিতে ওঁর জুড়ি ছিল না!

রেবা বলল, কিছু মনে করবেন না সামন্ত মশাই, উনি একটু বেশি সুখ্যাতি ক'রে ফেলেন। আপনি বন্দোবস্ত করুন, কালকে লাঞ্চের পর আমরা পাহাড়ে উঠব। প্রভাকর শুধু আমাদের সঙ্গে থাকবে।

যে আজ্ঞে।—বলে সামন্ত ওদের সঙ্গে ফিরবার পথ ধরলেন।

বাংলোয় ফিরে এসে চারিদিকের সুন্দর ব্যবস্থাদি লক্ষ্য ক'রে আনন্দোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল জয়ন্ত। বলল, হ্যাঁ, ঠিক এই আমি চেয়েছিলুম। তুমি আমার মন জানো, রেবা। মা বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয় পরিজন,—মনের খবর কেউ জানে না। একান্তে নিভৃতে যার সঙ্গে মন-দেয়া-নেয়া, যার সঙ্গে প্রাণ নিয়ে নিত্য নতুন খেলা, সেই শুধু জানে—কী চাই আমি।

হাসিমুখে রেবা বলল, বলো তো ঠিক কী চাই তোমার?

তুমিই জানো আমার সেই চাওয়া।—জয়ন্ত বলল, তুমি আমাকে নিয়ে

চলো এক বন্য, উচ্ছৃঙ্খল জীবনে,—সে আমি চাইব। যদি পারো নিয়ে চলো হিংস্র বর্বরতায়, নিয়ে চলো নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক সমাজে, নিয়ে চলো সেখানে —যেখানে যত পেগান আছে।

কেন?—রেবা বলল, সভ্যসমাজ তোমার কি ভাল লাগছে না? তুমি তো ভদ্রসমাজের কবি। তুমি তো তাদেরই গোষ্ঠীর লোক, যাদের নাম প্রলেটেরিয়েট ইন্‌টেলিজেন্সিয়া। আজ হঠাৎ তাদের ওপর তোমার অরুচি আসছে কেন?

আমি জানিনে, রেবা—জয়ন্ত তার পোশাক সমেত বিছানায় শুয়ে প'ড়ে বলল, আমাকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে প্রশ্ন করো, কিন্তু সদুত্তর দিতে পারব না! তুমি যদি দেশলক্ষ্মীর মতন আমার সামনে দাঁড়াও, তাহলে বলতে পারতুম, আমাকে নিয়ে চলো তুমি সেই জীবনে, যেখানে ভয়হীন সত্য আর কঠোর প্রতিজ্ঞা উজ্জ্বলন্ত শিখায় দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। নিয়ে চলো সংঘাতে, অভিঘাতে, দৈব হিংসায়, দেবাসুরের সংগ্রামে! আমাকে পুষে রেখো না রেবা, আমাকে পাহারা দিয়ো না। আমার মন এই ভিক্ষে চাইছে, আমাকে স্নেহের দ্বারা লালন ক'রো না, কোলের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ো না।

রেবা হাসল। বলল, যারা তোমাকে মেনি বেড়ালের মতন পুষে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, তারা দেশলক্ষ্মী, না দেশের লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মী?

বাঙ্গালী কবি জয়ন্ত খড়ের আগুনের মতো জ্বলে উঠল। বলল, আমি জানিনে কে তা'রা, কোথায় তারা। তারা যদি মূঢ় হয়, তবে দুঃখ পাবে, যদি অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে,—কাঁদবে, পুরনো কালকে যদি আঁকড়ে ধরে থাকে, তাহলে মরবে। আমি জানি শুধু তোমাকে। তোমার হাতে যদি কোনও যাদু থাকে আমাকে তুলে ধরো, যদি পারো আমাকে সন্ধান দাও সেই দুর্বার বন্য-জীবনের, কঠিনের দিকে ঠেলে দাও, মৃত্যুকে অস্বীকার ক'রে যেন এগোতে পারি।

রেবা তেমনি হাসিমুখে এগিয়ে এল জয়ন্তের কাছে। তারপর জয়ন্তর পিঠের তলায় একখানা হাত দিয়ে সে জয়ন্তকে টেনে তুলল।

কী হচ্ছে? আরে।

রেবা জয়ন্তের গাল দুটো দু'হাতে ধরে বললে, শুনতে খুব ভালো লাগছে। কিন্তু কবি, এখনই চঞ্চল হবে কেন? জীবনের মহাকাব্য সবে মাত্র খুলছে, সবে উপক্রমণিকা,—দাঁড়াও অনেক বাকি এখন। চলো, এবার তোমাকে চান করিয়ে খাইয়ে দিই? মেনি বেড়াল নও তুমি,—আমি যে শিশু সিংহকে কোলে নিয়ে ঘুরছি।

জয়ন্ত বলল, আঃ সরো···তোমার গায়ের গন্ধে চাঞ্চল্য আসে। আমার শরীর খারাপ হয়।

হেসে উঠল রেবা। বলল, বটে, তুমি মাখনের মতন গলবে, আর আমি বুঝি পাথর হয়ে থাকব? এসো তবে দেখি—।

জয়ন্তকে তুলে দাঁড় করালো রেবা। তারপব নিজের বলিষ্ঠ দুই বাহু দিয়ে জয়ন্তকে জড়িয়ে ধ'রে সে তুলল উপর দিকে। চৈ চৈ ক'রে উঠল জয়ন্ত,— আরে, কী করছ রেবা, নামাও, নামিয়ে দাও লাগবে তোমার। আমার ওজন দেড় মণেরও বেশি, তা জানো।

•রেবা তাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল হাসিমুখে। বলল, বড নরম আমাকে মনে হচ্ছে তাই না? কিন্তু ভুলে যেয়ো না, আমি সেই পৌরাণিক যুগের শ্রীমতী রাধা। তুমি দেড মণ? তা হতে পারে। আমি কিন্তু পুরাণ ইতিহাস জন্ম-জন্মান্তর পেরিয়ে এসে আজও বলছি, হে কল্লান্তের কবি, আমি এক-মন। তোমার জন্যে ছিঁড়েছি বুকের শিরা, তোমার জন্যে ছিঁড়তে বসেছি বত্রিশ নাড়ির পাক। জয়ন্ত, তোমাকে মৃত্যুর থেকে তুলে এনেছি বার বার। এবার তোমাকে মাথায় নিয়ে ঘুরবো দেশের ভবা জীবনের সবখানে।

রেবা আনন্দে আহ্লাদে হাসিতে উল্লসিত হয়ে সেই বৃহৎ কক্ষের মধ্যে জয়ন্তকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল!

কাঁধের উপর থেকে জয়ন্ত চেঁচাচ্ছিল,--শোনো রেবা, লজ্জাই নারীর ভূষণ। মানে,—তুমি বুঝতে পারছ না রেবা—

লজ্জা, লজ্জা!--খিল খিল করে হাসল রেবা ভাঙা এলোখোঁপার চুলের রাশি ছডিয়ে প্রেতিনীর মতো, -কেন লজ্জা? কিসের লজ্জা? লজ্জা না ঘুচলে তোমাকে পাবো কেমন করে, কবি? চিরকাল ধ'রে ব'সে আছ তুমি শীর্ষলোকে।

জয়ন্ত তখনও বিব্রত কণ্ঠে মিনতি জানাচ্ছিল,—তুমি একদম ছেলেমানুষ রেবা বুঝতে পারছ না তুমি কী বিপজ্জনক। ধুতি পরা আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে তোমাকে আর বিশ্বাস করব না আমি—।

ব্যায়াম করা কঠিন স্বাস্থ্য নিয়ে রেবা তার দুই পেশীবহুল বাহুর দ্বারা জয়ন্তকে এতক্ষণ টিপে ধরেছিল। এবারে তার প্রকৃত দুরবস্থা অনুভব করে মেঝের উপর দুম্ করে নামিয়ে দিল এবং পলকের জন্যও পিছন ফিরে না তাকিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে চলে গেল স্নানের ঘরে।

পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজের পর সামন্ত মশায় নিজে প্রভাকর এবং ওদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে গিরিখাদ পেরিয়ে বনজঙ্গলের পথঘাট ডিঙিয়ে ওদের দূর দক্ষিণ পাহাড়ের উপর দিকে তুলে দিলেন। ডাবলবেডের তাঁবু পড়েছে একটুখানি ফাঁকা জায়গায়। চারিদিকে ঘন জঙ্গল, ঝোপঝাড়, কাঁটাকুলের বন,

ছোট বড় গাছের জটলা,—কোনও জনমনুষ্যের সমাগম এদিকে নেই। প্রভাকরের ছোট তাঁবু পড়েছে একটু দূরে, আহারাদির সকল ব্যবস্থা তারই তাঁবুতে। উভয়ের মাঝামাঝি খোলা জায়গাটুকুর ঝোপজঙ্গল কেটে সাফ করা হয়েছে। সামন্ত মশায়ের শ্রমিকরা সেখানে টেবিল চেয়ার ছাড়াও দুখানা বেতের আরাম কেদারা সাজিয়ে রেখে গেছে। রেবা এগিয়ে গিয়ে গুলিভরা রাইফেলটা পরীক্ষা করে নিয়ে রেখে দিল তার বিছানার পাশে। মোট জনকুড়ি লোক কাজ করেছে দুদিন। জয়ন্ত নির্দেশ দিল, শ' দুই টাকা ওদের পারিশ্রমিক দেবেন।

সামন্ত নত বিনয়ে বললেন, যে আজ্ঞে।

হাসিমুখে জয়ন্ত বলল, আপনাকেও আমরা ফাঁকি দেবো না মিস্টার সামন্ত।

সামন্ত মশায় রেবার সঙ্গেই হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, হারিকেন, মোমবাতি, টর্চ, দেশলাই—আপনাদের হাতের কাছেই রইল। তাঁবুর সামনেই ঝোলানো রইল পেট্রমাক্স,—সমস্ত রাতই জ্বলবে। ব্যাটারির সঙ্গে রাইফেলের স্পট-লাইটটা রইল।

খাবার জল?

ওই যে—সামন্ত বললেন, তাঁবুর মধ্যেই আছে চাবি দেওয়া চিনা মাটির ট্যাঙ্ক, ওতে টিউব-ওয়েলের ভাল জলভরা। সঙ্গে কল ফিট করা আছে। তাঁবুর ঠিক পেছনে স্নানের ব্যবস্থা রইল, আপনাদের কোনও অসুবিধা হবে না। পেট্রমাক্স জ্বললেই দেখবেন, স্নানের জায়গায় জোর আলো পড়েছে। এত আলো দেখলে শেয়ালও আসবে না।

আয়োজন যত বড়, উদ্দেশ্য তার তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ। এমন কি, কিছুই না। সবাই লক্ষ্য করছে, এটি মালিকপক্ষের সামান্য একটু সখ মাত্র। একটুখানি বন্য জীবনযাপনের স্বাদ, তার সঙ্গে ঈষৎ ভয় বিলাস। কিছু রসকল্পনার আমেজ, কিছু সভ্য জগতের সঙ্গে বিচ্ছেদ, কিছু বা আত্মবিলুপ্তিবোধ। সমস্ত আয়োজনের আড়ালে রয়েছে চিত্তের একটি সূক্ষ্মতন্ত্রীর মৃদু কম্পন। এ কেবল যেন নিজকে দেখা বিশেষ পটভূমির মুকুরে, আপন ক্ষুধিত আত্মার চেহারাকে জানা,—এ যেন আত্মদর্শন! জয়ন্ত এক, কিন্তু কবি জয়ন্ত বহুর মধ্যে ছড়ানো। এই কবি বিবর্তিত হয়ে চলেছে বহু অবস্থায় বহু ঘটনায়। একই কবিচিত্ত, কিন্তু বিভিন্ন বৈচিত্র্যে তার অভিব্যক্তি।

সামন্ত হাসিমুখে যখন বিদায় নিলেন, শীতের সূর্য তখন অস্তাচলে।

পাহাড় অনেক উঁচু। চারিদিকে ঘন বন। সুতরাং প্রচুর ঠাণ্ডা পড়ল সন্ধ্যার

পর। গাছপালায় ঝোপজঙ্গলে এবং প্রাণীশূন্য সেই পাহাড়ের জটিল বনাঞ্চলে ঠাণ্ডা হি হি করছিল। ওরা চা পান সেরে নিয়ে গোটা দুই কফির ফ্লাস্ক এবং কিছু ভোজ্যসামগ্রী নিজেদের কাছে রেখে দিল। উদ্দেশ্য, প্রভাকরকে আজকের মতো ছুটি দেওয়া। ওদের তাঁবুর ডিজাইনটি সর্বাধুনিক। সমস্ত মেঝের উপর পুরু কার্পেট পাতা, তার নিচে মোটা দড়ির শতরঞ্চি। বেশ পুরু গরম চাদরের দ্বারা একটি চাঁদোয়া তৈরি, তেরপলের দেওয়াল মোটা কাপড়ে ঢাকা। ছোট টেবলটি বনাত দিয়ে মোড়া। দুই খাটে দুই বিছানা। কিন্তু সে বিছানা মামুলি নয়। রাশি রাশি জন্তুর লোম কম্বলের সঙ্গে বোনা, যে বস্তু উত্তাপকে ধরে রাখে সর্বক্ষণ। গায়ে ঢাকা দেবার জন্য নরম ও নধর পালকের লেপ। তাঁবুর দরজা পাট করা তেরপল দিয়ে প্রস্তুত, এবং সেখানে মোটা দড়ির বাঁধন দেওয়া। ভিতরে চলাফেরার অবকাশ যথেষ্ট।

প্রভাকর তার নিজের তাঁবুতে ফিরে যাবার সময় পেট্রোমাক্স আলোটা জ্বালিয়ে উদ্‌ভাসিত করে গেল পাহাড়ের সেই শীর্ষদেশ। সেই প্রবল আলোর কিরণচ্ছটায় ওদের তাঁবুর ভিতরটাও আলোকাভ হয়ে উঠল।

বিছানার মধ্যে ঢুকে জয়ন্ত বলল, ইচ্ছাটা আমাদের আদিম, কিন্তু সঙ্গে এসেছে আধুনিক বিলাসের সমস্ত উপকরণ। মনের সঙ্গে যেন মিলছে না।

রেবা বলল, পাঁচ হাজার বছর আগে কেমন করে ফিরে যাবে?

জয়ন্ত বলল, জানি যাওয়া যায় না। আর তা ছাড়া ধরো, সভ্যতা সৃষ্টি মানেই ত' আরাম আর আনন্দের সাজসজ্জা সৃষ্টি।—এই বলে জয়ন্ত চুপ করে গেল।

রেবা বলল, বাঁদর থেকে মানুষ হওয়া সহজ,—ওটা নিয়মের পথ ধরে আসে। কিন্তু মানুষ থেকে বাঁদর হচ্ছে, এ শোনা যায় না। তুমি সব রকম বিলাসের সাজসজ্জা নিয়ে এই বনজঙ্গলে উঠে এসেছ তোমার নতুন অভিজ্ঞতার আস্বাদ পাবার জন্য। এ তোমার দরকার, জয়ন্ত।

কেন দরকার?

তুমি যে কবি। সকল অবস্থায় তোমার রস পাওয়া চাই।—রেবা বলল, দুঃখে দুর্যোগেও তোমার রস, ভয়ের মধ্যে তোমার আনন্দ। তোমার জীবন-পাত্র ভরে উঠছে প্রতিক্ষণে নানা রসে,—তুমি নিজেও তার খবর পাচ্ছ না।

জয়ন্ত মুখের উপর থেকে লেপ সরিয়ে বলল, তোমার মধ্যে এত রস পাচ্ছি কেন? কোথায় পেলে তুমি এই অফুরন্ত রস?

রেবা বলল, কী রস পাচ্ছ জানিনে। তবে শুধু যৌন রস নয়, এটা জেনে নিয়েছি। তোমার দেহ অনেক সুন্দর আমার চেয়ে—মেয়ে হয়ে না জন্মালে এটা

জানা যায় না। ও কথা থাক। তুমি আমার মধ্যে রস পাচ্ছ, কেননা আমি তোমারই সৃষ্টি। তোমার চোখ, মন, ইচ্ছা, তোমার আগ্নেয় বাসনা, তোমার আনন্দ-কল্পনা, কাব্যের অনুপ্রেরণা,—সব দিয়ে আমি তোমারই সৃষ্টি! তুমি যেমন আমাকে দেখবে, তেমনি আমি। অফুরন্ত রস তোমার, আমার নয়। আমার একই রস জয়ন্ত, আমি শুধু মেয়ে। জীববিজ্ঞানের বই খুলে ছাখো, লক্ষ লক্ষ জীবন্ত ব্যাকটিরিয়া তোমার,—সেখানে একটিও আমাব নেই। সৃষ্টির সমস্ত দায়িত্ব তোমার, আমি ধারণ করি মাত্র। তোমার একটি কবিতায় তুমি ঈশ্বরকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলে আমারই বুকের ওপর মাথা ঠুকে।

জয়ন্ত চুপ করে গেল আবার। অনেকক্ষণ পরে নিজেই সে উঠে বসল বিছানায়। বলল, আরেক কারণে তোমার রস। প্রথম দেখলুম তোমাকে, তখন আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়েছ। শান্ত, নিরীহ, সলজ্জ, অর্বাচীন কলেজেপড়া মেয়ে।

রেবা হেসে উঠল। বলল, তারপর আকাশে চাঁদ উঠল, নদীতে দেখা দিল জোয়ার-ভাঁটা।

জয়ন্ত বলল, ছিলে শান্ত, কিন্তু তোমার জোয়ার-ভাঁটা ছাড়িয়ে এল বন্যাব ডাক।

রেবা বলল, রক্তের প্রবাহে বিষ মিশে গেল। ঝড় উঠল জীবনে। সর্বনাশ নিয়ে এল তোমার কবিতা।

জয়ন্ত বলল, তোমার অনন্ততার সঙ্গে মিলছে তোমার জন্মের কাহিনী—এ এক নতুন রস। কেউ জানে না তুমি কে। তুমি স্বয়ম্ভূতা। তুমি সকল ধর্ম ও সমাজেব বাইরে। জাতি বর্ণ গণ-গোত্র গোষ্ঠি--কিছু নেই তোমাব। এ আরেক রস। তুমি আছ, তাই অরণ্যে এত রহস্য, অন্ধকাবে এত আনন্দ। তুমি যদি এখনই চলে যাও, দেখব এই বনেরই বিভীষিকা, দেখব প্রেতচ্ছায়াদেব কানাকানি, দেখব বিশ্বভুবনের বীভৎসতা। ঠিক মনে হবে করালীর আকাশজোড়া আতঙ্ক অন্ধকারে গ্রাস করতে আসছে আমাকে। অথচ তুমি স্থূল নারী মাংসপিণ্ড হলে আমি ভারাক্রান্ত হতুম, তোমাকে সতর্ক প্রহরা দিযে আমাব দিন কাটত। এ ছাড়া আরও আছে। অন্যের বিরংসার থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্য প্রেমে গদ্‌গদ হতুম, এবং তোমাকে নিরাপদ রাখবার জন্য ঘর বাঁধতুম।

রেবা মুখের উপর লেপ চাপা দিযে হাসছিল কিনা জয়ন্ত ঠিক বুঝতে পারছিল না। বাইরে পঞ্চমীর চাঁদ কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা রুক্ষ হাওয়া এক একবার ঝাপট দিয়ে চলেছে গাছগালায। তারই সড়সড়ে শব্দ ছাড়া বাইরের পৃথিবী নিশ্চুপ। এ যেন প্রাণস্পন্দহীন একটা সেই আদিম পৃথিবী,—আদমের প্রথম পাযের চিহ্ন পড়েছে সেই পৃথিবীতে যেন প্রথম জীবচৈতন্যের মতো।

রেবা বিছানা ছেড়ে উঠল। বলল, জয়ন্ত, এ তুমি চাওনি। সুখের বিছানা তোমার জন্যে নয়। তুমি কবি, তোমার দরকার নতুন নতুন ঢেউ। তোমার মস্তিষ্কে ওরা আছাড়ি পিছাড়ি করুক নতুন নতুন রঙ্গে। ওঠো তুমি।

জয়ন্ত সত্যই উঠল। গা ঝাড়া দিয়ে বলল, মিথ্যে বলোনি।—পরে এদিক ওদিক লক্ষ্য করে বলল, তোমার সামন্ত চায় আমরা সুখে থাকি। কিন্তু সুখের অন্য নাম অনড়তা, ও কেমন করে জানবে? সুখের জন্য কেন পাহাড়ে উঠলুম? বনের মধ্যে ঢুকলুম কেন?

তোমার যে বন্য জীবনের সখ?

তাহলে সেই বন্যকেই তৈরি কর। এ যদি একরাত্রির বিলাস হয়, হোক না কেন?—জয়ন্ত সন্ধ্যার আবহাওয়ার দিকে চেয়ে পুনরায় বলল, দেখছ বিশাল ওই এক একটা বৃক্ষ? ওদের ওই বড় বড় পাতা দাক্ষিণাত্যে এসে পর্যন্ত দেখছি। প্রভাকরকে ডাকি, ওই পাতা পেড়ে দিক। ওই পাতা দিয়ে তুমি ঢাকো তোমার শরীর।

রেবা বলল, আর তুমি?

জয়ন্ত বলল, দেখছ, গাছ থেকে কত ছাল ঝুলছে? ধরো, ওই ছিঁড়ে নিয়ে যদি পরিচ্ছদ বানাই?

রেবা বলল, তুমি বড্ড ভীরু, জয়ন্ত। তুমি আদিম যুগে যেতে চাইছ। কিন্তু ওটা বন্যজীবনের দ্বিতীয় স্তর। প্রথম স্তরে পিছিয়ে যেতে সাহস পাও না কেন—যখন বসন ভূষণের কথা ওঠেনি? যখন কণ্ঠস্বর শুধু ছিল, ভাষা ছিল না? শোনো জয়ন্ত, তুমি কবি, একটা রোমাঞ্চ রাত তুমি নিজের হাতে তৈরি করো। কল্পনায় কেন থাকবে সব সময়ে যা কল্পনাতীত? কে বাধা দিচ্ছে তোমাকে যদি তুমি প্রিমিটিভ পেগানিজমে এক রাত্রের জন্য চলে যাও? তখন মানুষ আর জন্তু থাকে গায়ে-গায়ে। এ ওকে কামড়ায়, ও এ[illegible] চিরোয় চোখের সামনে। উভয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর বোঝে। এসো সেই প্রথম স্তরে। মানুষ যখন ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেনি, দৈবের ঘুম যখন ভাঙেনি। মন্দ কি, দেখে নাও না কেন সেই জীবন কবির চোখ দিয়ে?

জয়ন্ত হাসিমুখে কি যেন কতক্ষণ ভাবল। পরে বলল, ওটা আপাতত থাক রেবা। একেই ত' বনের মধ্যে অন্ধকার,—এর সঙ্গে নিজেদের প্রাকৃত চেহারা দেখলে ভয় পাব। ওতে কাজ নেই। তার চে: বরং এইসথেটিক যুগে এসো। লজ্জাকে সুন্দর করে তোল গাছের বাকল আর বড় বড় পাতা দিয়ে ঢেকে। জীবনরঙ্গ চাইছি, যৌবনতরঙ্গ নয়। ভাবনার মধ্যেই রেখে দাও যা অভাবনীয়। সবাদিম যুগে ভাষা ছিল না বলেই কাব্য ছিল না। এল কাব্য, যখন বল্কলে ঢাকা পড়ল লজ্জা।

রেবা হাসল। বলল, তবু রইল উর্বশীর কল্পনা সকল যুগে আর সকল কালে। বেশ, সেই ভাল,—তুমি যাতে আনন্দ পাও। পর্দা তোল, ডাক প্রভাকরকে।

জয়ন্ত পর্দার দড়ি খুলে দিয়ে বাইরে প্রথম পেট্রোমাক্সের আলোর সামনে এসে প্রভাকরকে তিন চারবার উচ্চকণ্ঠে ডাকল, কিন্তু সে-ছোকরা জঙ্গলে ঠাণ্ডা পেয়ে কম্বল-কাঁথা মুড়ি দিয়ে এমনই অকাতরে নাক ডাকাচ্ছিল যে, কোন মতে তার সাড়া পাওয়া গেল না। ফিরে এল জয়ন্ত। প্রভাতের আগে মারাঠী ছোকরার ঘুম ভাঙবে মনে হচ্ছে না।

আলোটা নিবিয়ে দিই রেবা, কেমন?

সেই ভাল। আমিও তাই ভাবছিলাম।

জয়ন্ত পেট্রমাক্স নিবিয়ে দিল। এতক্ষণ পরে দেখা গেল, দূর পশ্চিম দিগন্তে পঞ্চমীর চাঁদটুকু যেন মৃত্যু শয্যায় শয়ান,—তার শেষ আভাটুকু যেন রেখে যাচ্ছে বনস্পতির ডালপালায়। এর পরে রইল চারিদিকের রাত্রি তার ভৌতিক অন্ধকার নিয়ে। সাঁ সাঁ করছিল সেই রাত। দৈত্য দানব দলের মতো যেন ঘেরাও করে রেখেছে বিশাল শাল্মলীর শ্রেণী। এখান থেকে পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে না। হারিয়ে গেছে কোথায় যেন মানুষের সমাজ। সভ্যজগৎ শৃঙ্খল ছিঁড়ে যেন কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

রেবা দাঁড়িয়েছিল পাশে। অন্ধকারে জয়ন্ত ওর গলায় হাত রেখে বলল, আজ শেষবারের মতন জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, তুমি আমার কে? কী সম্পর্ক তোমার সঙ্গে?

হাসল রেবা। বলল, শেষবারের মতন আমিও বলি জয়ন্ত, এ সম্পর্ক অনির্ণেয়। তুমি রক্ষণশীল সংস্কারের ক্রীতদাস, তাই আবার সেই পুরনো প্রশ্ন তুলেছ। আমি তোমার কেউ নয়। প্রিয়া, বন্ধু, সখী, সচিব, প্রণয়িনী, স্ত্রী, রক্ষিতা,—কেউ না।

তবে কে তুমি আমার?

আমি? আমি তোমার মন, তুমি আমার দেহ।

ঈষৎ কঠোরতার সঙ্গে জয়ন্ত বলল, অন্ধকারে যদি তোমার গলা টিপে মারি?

রেবা হাসল। বলল, যদি মারতে তোমার ইচ্ছে হয়, বাধা দেবো না। জানব, তোমার সুন্দর একটি কবিতার জন্য আমার অপমৃত্যু দরকার ছিল। কিন্তু কা'কে মারবে তুমি? আমি যে তোমার অচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য, অবিচ্ছিন্ন। তুমি আমার কবি, আমি তোমার কবিতা, জয়ন্ত।

জয়ন্ত হাসিমুখে সরে এল।

বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে রেবা বলল, বিশ্বাস করো জয়ন্ত, এ আমার যৌন বিহ্বলতার আবেগ-উচ্ছ্বাস নয়। তোমার সত্তা আমার মধ্যে নিবিড়ভাবে সঞ্চালিত। তুমি জ্যোতির্ময় আমার সত্তায়। আমার গলা টিপে তুমি যদি মারো,—বেশ তো, আমার শবাসনে বসবে তুমি! তোমার সকল বাসনার মৃত্যু হবে, মন্দ কী? তুমি যোগতন্দ্রায় বসবে যেন তপঃসিদ্ধ কাপালিক। আমার মৃত্যুর দরকার,--তুমি যদি আনতে পার তোমার কবিতায় প্রবল প্রাণ, প্রচণ্ড উদ্দীপনা, আর পরমাণু বিস্ফোরণের সাংঘাতিক উত্তাপ। হত্যায় ভয় পাবে কেন? সে ত' ক্লৈবহিংসা! আমার শবাসনে বসে অসুরনাশনের স্বরঝঙ্কার তুলবে তোমার অগ্নিবীণায়,—সেই ত' আমার প্রাণের পরম মূল্য। ধ্বংসে, সংহারে, বিনাশে, রক্তক্ষরণে,--কেন তোমার দ্বিধাগ্রস্ত মন? আমি তোমার সেই রথ, মহাকাল সেই রথের সারথি,--তুমি সব্যসাচী কবি, ভয় সংশয় কেন তোমার রণাঙ্গনে? কুরুক্ষেত্র যে তোমার পথে পথে। অসত্য, দুষ্কৃতি, কদাচার, মানুষের অপমান, জীবনের এই সাংঘাতিক বিকৃতি, অন্যায়ের এই রাজ্যপাট,—এরা গুঁড়িয়ে যাক তোমার রথচক্রের তলায়। তবেই না সার্থক হবে আমার মৃত্যু?

জয়ন্ত আবার এগিয়ে এল। রেবার হাত দুখানা ধ'রে বলল, বলো না মৃত্যুর কথা। শুনলে ভয় করে। তুমি নেই মানে, আমিও নেই। তোমার লোপ মানে আমার অবলুপ্তি। কিন্তু ওসব আমি ভাবতে চাইনে, রেবা। আমি চাই এমন কিছু, যা এই রহস্যময়ী রাতকে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে। আমার জানা দরকার, কেন উঠে এসেছি এই অন্ধকার পাহাড়ে, কী জন্যে এলুম এই নিঃসঙ্গ বনে। এলুম কি শুধু প্রহর গুণতে? শুধু রাত কাটিয়ে চলে যেতে? বল না রেবা, কোন্ খেলায় মেতেছি আমরা, কোন্ আনন্দে আ'রা লক্ষ্যহীন?

এ তোমার প্রাণশক্তির খেলা, জয়ন্ত। এই খেলাই উদ্বৃত্ত এনার্জির।

জয়ন্ত বলল, আজ রাত্রে সেই অফুরন্ত এনার্জি কি কেবল তত্ত্ব নিয়ে থাকবে? সে তত্ত্বের কি আকার নেই, রূপ কি নেই তার?

রেবা এদিক ওদিক তাকাল বনের অন্ধকারে। পরে কম্পিত কণ্ঠে বলল, তা হলে এসো তাঁবুর মধ্যে। আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতার স্বাদ নেবো যা দুজনের পক্ষে চিরস্মরণীয়। দুজনে ডুবে যাই একই উন্মত্ত বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমথিত সমুদ্রে,—সেও যেন অন্তহীন অতল অন্ধকার' তোমার একটি কবিতায় যার বর্ণনা ছিল,--স্তব্ধকাল, রুদ্ধশ্বাস, বায়ুশূন্য, বিগলিত বিষাক্ত দেহজ গুপ্ত গূঢ় ফণার নিরন্ধ্র মিনতি। তারপর ক্লান্তিতে অপরিসীম, নিঃসাড়, শিথিল,—জীবনজন্মরসাতলে তলিয়ে অতঃপর দুর্নীত আত্মার তত্ত্বক্ষুধা! এই ছিল সেই কবিতায়।

মোমবাতির মত্ত প্রদীপ জ্বলছিল শিয়রে। রেবা জয়ন্তের হাত ধরে নিয়ে এলো। বলল, তুমি অশান্ত অতৃপ্ত থাকলে চলবে না, জয়ন্ত।

জয়ন্ত বলল, কী বলতে চাইছ?

রেবা বলল, ওঠো ওই চিতাশয্যায়। হোক না মৃত্যু আজ কবি আর কবিতার? এই মধুর নিমীলিত মৃত্যু যেন এক পরমাশ্চর্য অমৃতের আস্বাদ। এ যেন অস্তিত্বের অনন্ত রহস্যতলে মিলিয়ে যাওয়া। বিলীন নিলীন দুই একাকার দেহে যেন দেহাতীতের নিগূঢ় উপলব্ধি। সমস্ত সত্তায় বিপ্লবের শিঙ্গাধ্বনি দেহের ভিতরকার অরণ্যে অরণ্যে দাবানল, রক্তে রক্তে কালঝঞ্ঝার দোলা, প্রাণের প্রবল প্লাবনে আনন্দের নিবিড় মাধুরীতে ডুবে যাওয়া। এসো জয়ন্ত,। লগ্ন বয়ে যায়—

রেবার কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে জড়িয়ে আসছিল। তাকে কাছে টেনে নিয়ে জয়ন্ত বলল, ওই কবিতাটার মধ্যেই কি পড়োনি, আসঙ্গের আয়ু হ'ল স্বল্পকালের? আমরা কি এসেছিলুম ওই চিতাশয্যায় বাসনার আগুনে পুড়ে ছাই হবো দু'জনে,—এই লক্ষ্য নিয়ে? কিন্তু তারপরে যে আসবে নিলজ্জ পরিতৃপ্তির অবসাদ, পড়োনি সেই কবিতায়? আসবে মধুর নিদ্রা আত্মবিলুপ্তির,- শিথিল, দুর্বল, তেজশক্তিহীন সেই নিদ্রা এক আতুর ক্লান্তির। সেই ক্লান্তি বা অবসাদ আমি চাইনে, রেবা।

দুই আতপ্ত দেহ আবার বিচ্ছিন্ন হল। রেবা সরে গেল হাসিমুখে। অতঃপর মধুর কণ্ঠে সে বলল, জয়ন্ত, দুই রমণীয় দেহ কি এক বিপুল সম্ভোগের ক্ষেত্র নয়?

জয়ন্ত বলল, সমস্ত রাত্রির নয়। আমাদের ক্ষণায়ু সম্ভোগের জন্য কি এই বিশাল অন্ধকারের দরকার ছিল, রেবা? পাহাড়ে এই অনন্ত বনরাজি, চরাচরের এই নিশ্চুপ স্তব্ধতা, সীমাহীন আকাশের ওই প্রতি নক্ষত্রের বীজমন্ত্রজপ,—ওরা কি গণনা করছে তোমার বায়লজি বিজ্ঞানের এক বিশেষ লগ্নের হিসাব? কেন আমরা স্বীকার করব সেই গুপ্ত গূঢ় জৈবনীতির মূল প্রয়োজন? আমি বিপ্লববাদী,—বাসনায় পুড়ে আমি ছাই হতে চাইনে রেবা, বাসনাকেই আমি পুড়িয়ে মারতে চাই।

তাহলে ভেতরে নয়, বাইরে এসো, জয়ন্ত।—রেবা জয়ন্তর হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল।

॥ ১৩ ॥

চারিদিকে বিশাল বৃক্ষশ্রেণীর প্রাকার। আকাশ থেকে নেমেছে তারকাদলের ক্ষীণ আলোর আভাস। রাত্রি ঘন গভীর।

জয়ন্ত বলল, বলো, কেমন ক'রে সুন্দর একটি রাত কাটানো যায়? বিছানায় রয়েছে বাসনার বিছার কামড়, সুতরাং বিছানা থাক। ও বিছানা আছে তোমার সতেরোটা ইউনিটে, মিহিজামের দেওগড়ে, সিঙ্গিবাগানের ফ্ল্যাটে, তোমাদের বাগান-বাড়ির ক্যাম্পে।

হাসিমুখে রেবা বলল, কেমন লাগে যদি আগুন নিয়ে খেলা করো? অন্ধকারে খেলাও জমবে, সময়ও কাটবে।

প্রস্তাবটি মন্দ নয়। আগুনের খেলা খেলেই তো প্রত্যেক যুগের অবসান ঘটেছে। আগুন মানেই ত' মহৎ বিনষ্টির উপাদান। নূতন সভ্যতার প্রথম পত্তন ঘটে আগুনে। আগুন আনে শুচিতা! জয়ন্ত অনেকক্ষণ ভেবে বলল, তোমার কথাটা ভালই লাগছে।

রেবা বলল, ওই যে স্তূপাকার ঝোপ জঙ্গল কেটে রেখেছে, ওটায় আগুন ধরাতে পার?

হেসে উঠে জয়ন্ত বলল, ওইটেই ত' সব চেয়ে ভাল পারি।

তবে তাই করো। রেবা বলল, আগুন তোমার হাতেই জ্বলুক। আগুন হোক আসন, খেলা হোক লীলা। যেখানে যত শুকনো নীরস কাঠ, জ্বলুক তোমার হাতে। আমি দেবো হাততালি,— দাউ দাউ ক'রে জ্বলুক। সেই আগুনের আভায় আরেকবার দেখব কবিমূর্তি।

রেবা নিজেই গিয়ে তাঁবুর ভিতর থেকে হারিকেন ও দেশলাই এনে জয়ন্তর হাতে দিল। জয়ন্ত কেরোসিন ছিটিয়ে দিল সেই স্তূপাকার ঝোপের উপর, অতঃপর দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিল। দাবানলের দৃশ্য ঠিক এটা নয়। কিন্তু অন্ধকার পাহাড়ে দাবানলের আস্বাদ পাওয়া ওদের পক্ষে দরকার।

আগুন ধীরে ধীরে জ্বলে উঠল। কতক্ষণের মধ্যে সেই অজানা আরণ্যলোকে যে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটল, সে যেন অনেকটা আদিম এক বন্য প্রকৃতির ভয়ার্ত চেহারা। ক্রমবর্ধমান সেই বিপুল পরিমাণ জ্বলন্ত আগুন লকলকিয়ে উঠল উপর দিকে, এবং তারই উত্তাপ-আতঙ্কের থেকে আত্মরক্ষার জন্য

কয়েকটা বৃহদাকার পক্ষী অন্ধকারে পাখা ঝাপটিয়ে উঠে চলে গেল। আগুনের ভিতর থেকে কাঠফাটার ফুটফাট শব্দ সত্ত্বেও প্রভাকরের ঘুমভাঙ্গার কোনও লক্ষণ ছিল না।

অন্ধকার যেন সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দানবাকার বৃহৎ বনস্পতিদলের আশেপাশে। অগ্নিশিখার দীর্ঘচ্ছায়ারা যেন তাদেরই সম্মুখ উপান্তে শ্মশান পিশাচীর মতো নৃত্য করে ফিরছে। জয়ন্ত তাকালো সেই দিকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বে এই আগুন যেন উঠে এসেছিল বৈশ্বানরের আগ্নেয়মুখগহ্বর থেকে। সেই আগুন এই যোগতন্দ্রাসমাচ্ছন্ন রাত্রে আবার জ্বলল সাধনা তন্ত্র কবি কাপালিক জয়ন্তর হাতে,—যা কাব্যসাধনারই নামান্তর। সে যেন এসে দাঁড়িয়েছে যুগান্তের দ্বারে একটি পরম প্রত্যাশা নিয়ে। এই দাবদহনের ভিতর থেকে উঠে আসবে একটি অগ্নিপুত্তলী তার প্রবল প্রাণসত্তা নিয়ে, কাপালিক কবি জয়ন্ত তার কানে কানে মন্ত্রপাঠ করবে। বিপুল তেজে, ভীষণ বিক্রমে, দৈবশক্তিতে, ক্ষাত্রবীর্যে—এক হাতে সে ছারখার করবে মূঢ় পুরাতনকে, অন্য হাতে নবজীবনের শঙ্খে তুলবে ফুৎকার ধ্বনি।

আগুনের উত্তাপ অনেকটা পরিধি নিয়ে ছড়াচ্ছিল। জয়ন্ত একটু পিছিয়ে এল। ওই ঝোপেরই জ্বলন্ত স্তূপ থেকে লম্বা একটা ডাল টেনে নিয়ে সে আগুনটাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। সব জঞ্জাল পুড়ে যাক এই তার চেষ্টা। ওই সঙ্গে পুড়ে যাক মিথ্যা যেখানে যত। মানুষের দুঃখ দৈন্য, চারিপাশের হতাশা নৈরাশ্য, দেশের যত ভিক্ষাবৃত্তি কাঙ্গালপনা, জীবনের যত অবমাননা আর অধোগতি,—একে একে ওই আগুনে সব ছারখার হোক।

নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল রেবা। এবার সে বলল, আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছ কি? গরম লাগছে?

না।

রেবা হেসে উঠল পিছন থেকে। বলল, তাহলে বল ভালো লাগছে। বলো, তোমার কবি-মন রস পাচ্ছে লকলকে আগুনের রসনায়?

জয়ন্ত বলল, সম্ভবত তাই, রেবা। আগুন আমার প্রিয়। আমি শুচিতা বোধ করি আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে। আমার এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, আমি যেন একে একে সব এই হোমানলে আহুতি দিচ্ছি। আমার যেন বিশুদ্ধি লাভ ঘটছে।

রেবা বলল, তুমি নয় জয়ন্ত, তোমার কবিতা। তোমার জীবন-দর্শনে মূল প্রকৃতির বিশুদ্ধি লাভ কি তুমি চাও?

জয়ন্ত বলল, কথাটা বুঝতে পারলুম না, রেবা।

রেবা বলল, সহজ কথা। তুমি কি চাও তোমার কবি-চেতনায় নতুন করে শুচিতা আসুক? শুচিতার কি অভাব ছিল তোমার?

হেসে উঠল জয়ন্ত। আগুনের দিকে চেয়েই সে বলল, তুমি বোধ হয় কথাটা বুঝতে পারোনি, রেবা। আমি চাইছি আমার পুরনো আমি র মৃত্যু হোক! আমার মধ্যে আরেক আমি র নব-জন্মলাভ ঘটুক।

রেবা হাসল এবার। বলল, জয়ন্ত, তার জন্য তুমি অগ্নিশুদ্ধি চাও, না নতুন তপস্যায় বসতে চাও? তুমি নিজে কেন জ্বলবে, কেনই বা পুড়বে? তুমি ত' তোমারই অতীতের ধারাবাহিকতা। কবে ছিল তোমার অশুচিতা? কবে ছিলে তুমি অশুদ্ধ, জয়ন্ত? আমি যে দেখেছি তোমার মনের গহ্বরে অমৃতের উৎস,—সেইখান থেকে উঠে আসছে তোমার কবিচেতনা। আমি ভুল করিনি, জয়ন্ত।

জয়ন্ত আগুনের মধ্যে আবার ডালপালা ও গাছ-গাছড়া ঠেলে দিতে লাগল। একসময় বলল আমার কবিতা এতদিন ধ'রে দাঁড়িয়েছিল ঘৃণা বিদ্বেষ আর আক্রোশের ওপর। মানুষের কুটিলতা আর স্বভাবের বিকৃতির ওপর ব্যঙ্গোক্তি ক'রে এসেছি। শুধু দেখেছি পুঞ্জীভূত অসন্তোষ আর নৈরাশ্য জীবনকে ধিক্কৃত করবে সবদিকে। দুষ্ট শক্তি আশা ও আশ্বাসকে গ্রাস করছে। সমস্ত আলো নিভে আসছে, সভ্যতার নাভিশ্বাস উঠছে, তাই আমি চেয়েছি দারুণ ঝঞ্ঝা, চেয়েছি সর্বনাশা সংহার, চেয়েছি দুষ্কৃতের বিনষ্টি। আমার কবিতায় এতদিন ধরে তাই বিপ্লবের ধ্বজা তুলেছি। বলে এসেছি, রক্তে, আগুনে, চোখের জলে প্রতিহিংসার সেই বিপ্লব এনে দিক মহাপ্রলয়। কিন্তু মানুষের কল্যাণের কথা ভাবিনি কোনদিন। আজ তাই আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে কামনা করছি আমার পরম আত্মশুদ্ধি।

রেবা সেই মধ্যরাত্রির ছায়ান্ধকারে দাঁড়িয়ে বলল, আমার সব বিদ্যে তোমারই কাছে পাওয়া,—সূর্যের আলোই চাঁদের পরিচয়। কিন্তু কল্যাণ কি কামনায় আসে, জয়ন্ত? আমি জানিনে। আসে কি আত্মবিসর্জনে?—তাও জানিনে। কিন্তু তুমিই ত' একদিন বলেছিলে, রেবা, বাসনার মৃত্যু হয় কেমন করে বলতে পারো? বলতে পারো, লোভের অবসান ঘটে কেমন ক'রে? মানুষের স্বভাব-শুচিতার অপমৃত্যু ঘটছে কেমন করে, এ কি জানো তুমি? কোথায় হারিয়ে গেল আজ সেই পরমাশ্চর্য সংবেদনশীল চরিত্র? সততা মরছে উপবাস করে, সাধুতা মুখ থুবড়ে পড়েছে,—কিন্তু অন্যায় বর্বরতা কেমন ক'রে তার রাজ্যপাট বসালো? কোথায় অদৃশ্য হ'ল আজ তারা, যারা দধীচির কঙ্কাল থেকে বজ্রদণ্ড তুলে এনেছিল? কোথায় মিলিয়ে গেল তারা, যারা মৃত্যু থেকে খুঁজে পেয়েছিল

অমৃত ? সত্যের সেই জ্যোতির্ময়তা কই ? বীর্যের সেই নিঃশব্দ সাধনা দেখছিনে কেন ? আত্মোৎসর্গের সেই একাগ্র প্রতিযোগিতা কোথায় লুকোনো রেবা, বলতে পারো ? বলতে পারো জীবনের এই বিপুল অপচয়কে রোধ করার জন্ত কবে কোথা দিয়ে আসবে সেই কল্যাণব্রতীর দল ?—এ সব তোমারই কথা জয়ন্ত, এ সব তুমিই লিখে রেখেছ আমার বুকের পটে হৃদপিণ্ডের রক্তের অক্ষরে !

আগুন উঠেছে অনেক উঁচুতে গাছপালার শীর্ষ ছাড়িয়ে। সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে যাচ্ছিল প্রখর বায়ুতাড়নায়। বিশাল অগ্নিকুণ্ডের সেই প্রবল উত্তাপ লাগছিল দুজনের অঙ্গে অঙ্গে। সেই আগ্নেয়বায়ুর একটা ঝলকের থেকে আত্মরক্ষার জন্ত জয়ন্ত একটু পিছিয়ে আসতেই এতক্ষণ পরে সহসা রেবার দিকে তাকিয়ে সে ডরিয়ে উঠল,--এ কি। তুমি তুমি বিবস্ত্রা। এ কি খেলা তোমার ? রেবা কেন তুমি এ অবস্থায়··· ?

চুপ !—রেবা বলল, মুখ ফিবিযে থাকো আগুনের দিকে। হ্যাঁ, এবার বলো, তুমি আমার কে ? অগ্নিসাক্ষী ক'রে বলো।

জয়ন্ত অধীর একপ্রকার উত্তেজনায় কাঁপছিল। বলল, আমি আমি তোমার কবি।

আমি তোমার কে ?

তুমি নিবতি আমাব। রেবা, রেবা, রেবা এ কি করছ তুমি ?

রেবা পেছন থেকে তার দুই বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দিল জয়ন্তর সব সাজসজ্জা।· পরে বলল, এ খেলা মন্দ নয, জয়ন্ত। আমরা সেই দুই আদিম নরনারী দাঁডিযে আছি অন্ধকারে জনচক্ষুর থেকে অনেক দূরে। আমাদের জন্মের মূল উৎস সেইখানে, যেখানে এক অগ্নিবিন্দু অন্য অগ্নিগহ্বরে বিলীন হয়েছিল। আমরা দুজনে অগ্নিকে ধারণ করেছি সর্বাঙ্গে। কিন্তু আমাদের পাঁজরের সেই আনবিক বিদারণ ঘটেনি শুধু একটি কারণে। দুজনের দেহের উদ্বৃত্ত অগ্নির উদগীরণের পথ আছে খোলা—যেমন আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর। জয়ন্ত, কেন লজ্জা পাবে তুমি নিজের সুন্দর দেহের দিকে তাকিয়ে। নাও, চেয়ে থাকো আগুনের দিকে।

কবি-জয়ন্তর প্রাকৃত দেহ স্তব্ধ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেন সম্মুখের ওই বিশাল শাল্মলী তরু। তারই সম্মুখে উলঙ্গিনী অন্ধকার নিশীথিনী যেন আপন অগ্নিচ্ছায়াদলকে সঙ্গে নিয়ে থরথরিয়ে কাঁপছিল।

জয়ন্ত ?

উঁ ?

রেবা বলল, এ যদি খেলা হয়, তবে এ খেলা জীবন মৃত্যুর। কী দেখছ তুমি ?

কবি-জয়ন্ত জবাব দিল, আমি দেখছি উজ্জ্বলন্ত বৈশ্বানরের কোলে মহাকালীর লোল রসনা!

তা হলে ওরই সামনে দাঁড়িয়ে তোমার কবি-জীবনের নতুন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করো। মনে রেখো জয়ন্ত, তোমার—আমার চোখ কাল মন—সব খোলা। তোমার আছে সমাজ-দর্শন, তুমি দেখতে পাও সব। আমার আছে বিজ্ঞান, পদার্থ আর রসায়ন গবেষণায় অনুমান করে নিই অনেক। তুমি আমি দুজনেই সুস্থ ও সচেতন। সুতরাং সচেতন মন নিয়েই আজ ওই হোমানলেব থেকে প্রতিজ্ঞা তুলে নাও।—রেবা পিছন থেকে তাকালো।

জয়ন্ত বলল, তুমি তবে পাশে এসে দাঁড়াও?

রেবা এতক্ষণ পরে গিয়ে ডান পাশে দাঁড়াল। জয়ন্ত আগুনের দিকে তাকিয়েই বলল, বলো কি বলতে হবে।

রেবা সানন্দে ও হাসিমুখে বলল, এ তোমারই কথা, শুধু আমার মুখ দিয়ে বলব, জয়ন্ত। প্রতিজ্ঞা কবো বাসনার মৃত্যু হোক,—সুখের সম্পদের ক্ষমতার প্রভুত্বের, -এক একে মৃত্যু হোক। লোভ অজ্ঞান মূঢ়তা অপৌরুষ আলস্য হীনবৃত্তি,– এদের বিপক্ষে তুমি খড়্গ ধাবণ করবে।

জয়ন্ত বলল, এ প্রতিজ্ঞা নতুন নয়, রেবা।

তা হলে বলো আগুনের দিকে চেয়ে, এক হাতে সংহাব অন্য হাতে সৃষ্টি। বলো, বিচাব বুদ্ধিহীন মূঢ়তাকে উচ্ছেদ করবে। অন্যায় কুটিলের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে। অপবাজেয় অসমসাহসিকতা তোমাব কাব্যে প্রতিষ্ঠা পাবে। সত্যের ভয়হীন জয়যাত্রার সঙ্গী হবে--।

জয়ন্ত বলল, এ প্রতিজ্ঞা বহুবার নিয়েছি এই শতাব্দীতে!

অগ্নিবিতপ্তা বেবা সাবলীল আনন্দে হেসে উঠল। বলল, জয়ন্ত, দেখে নাও এই নির্জন রাত্রের কৌতুক। দেখে নাও তোমার শক্তির আশ্চয পরিণতি! তুমি আসছ ইভল্যুশনের ভিতর দিয়ে, তোমার একই এনার্জি। পর্বে পর্বে তার নতুন পরিচয়! এই রাত্রির বিচিত্র অভিজ্ঞতা তোমার কবিতার মূলতত্ত্ব হোক, জয়ন্ত। আবার তুমি ওঠো, মাথা তোলো সকলের মাথা ছাড়িয়ে। চেঁচিয়ে বলো চারিদিকের এই অনিশ্চযতার মধ্যে সংশয়াচ্ছন্ন মানুষ যেন ভয় না পায়। এই দুযোগে আসন্ন হয়ে এসেছে প্রসব বেদনার কাল, নতুন এক সভ্যতার ভূমিষ্ঠ হবার লগ্ন উপস্থিত। তাই আকণ্ঠ উৎকণ্ঠায় তুমি কাঁপছ।

না—জয়ন্ত বলল, রণরঙ্গিণী উলঙ্গিনীব শাসন পাশে দাঁড়িয়ে, তাই নিরুপায় অস্থিরতায় কাঁপছি থরথরিয়ে। এবার হুকুম দাও দেখে নিই একবার এই কাল সমুদ্রে ভাসা রক্তকমলের শোভাকে

আবার হেসে উঠল রেবা। বলল, দাঁড়াও, এই হ্লাদিনী শক্তির সঞ্চার হোক আগে তোমার সকল প্রতিজ্ঞায়, তোমার শিরা-উপশিরার রক্তে। তোমার স্নায়ুতন্ত্রে, প্রতি রোমকূপে, তোমার নিম্ন-নাভিমণ্ডলীতে। তোমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে আমি। তোমার কাব্যে, দর্শনে, মস্তিষ্কে, কল্পনায়, অভিব্যক্তিতে —সর্বত্র আমি। হ্লাদিনীর অগ্নিসঞ্চালন তোমার মধ্যে প্রতিক্ষণে বিদ্যুৎ শক্তি উদ্ভাবন করছে। তুমি তাই আমারই কবি, জয়ন্ত। আমি লীন হয়ে আছি তোমার প্রাণসত্তায় সর্বকালে সর্বযুগে। এ হল বিজ্ঞানেরও সর্বশেষ গবেষণা,— দর্শনতত্ত্বে যার প্রস্তাবনা পাও।

জয়ন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কিন্তু তুমি ত' দেহ। হ্লাদিনীর বাহ্যপ্রকাশ তোমার দেহসম্ভারে।

আমি দেহ, কিন্তু বিদেহিনী।—রেবা বলল, চোখ বুজে দেখো, দেহাতীত আমি। তুমি যদি বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী হতে, যদি হ্লাদিনী-বর্জিত হত তোমার সত্তা—তোমাকে দেখে ভয় পেতুম। তুমি তা নও, তুমি কবি। তুমি কবি দুঃখ আর নৈরাশ্যের, বেদনা ও যন্ত্রণার, অসন্তোষ আর আক্রোশের। কিন্তু ভয় করে, জয়ন্ত, পাছে তুমি হারিয়ে যাও চলতিকালের দেনা চুকিয়ে। তোমার মধ্যে তোমারই চৈতন্যের অন্যদিক, যে দৈব। সেই দৈবের উজ্জীবন ঘটুক তোমার জীবনে। তোমার কবিতায় এবার ডাক দাও কল্যাণকে,—এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ুক তোমার সেই উদাত্ত আহ্বান।

শুনবে কেউ?—জয়ন্ত জানতে চাইল।

ডাক সত্য হলেই শুনবে, জয়ন্ত। মহৎকে ডাক দাও, যার অপমৃত্যু ঘটছে পদে পদে। সত্যভাষীকে ডাকো, যার টুঁটি টিপে ধরেছে দুষ্টশক্তি। ন্যায় বিচারকে ডাকো, আড়ালে দাঁড়িয়ে যার চোখের জল পড়ছে। বীর চরিত্রকে ডাকো, লোভ আর মিথ্যার ষড়যন্ত্রে যে পঙ্গু। স্বার্থত্যাগীকে ডাকো, প্রতারণার দেশজোড়া চক্রান্তে আপন মনুষ্যত্বকে যে খুইয়েছে। তুমি ডাকবে বজ্রকণ্ঠে, ডাকবে তোমার ডমরুধ্বনিতে, ডাকবে শঙ্খনাদে, ডাকবে তোমার রথচক্রঘর্ষণের বিঘোষণে। হোমানল থেকে এই প্রতিজ্ঞা আজ তুলে নাও জয়ন্ত।

রেবা থামল। অগ্নির উত্তাপে ও আভায় এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জয়ন্তর কপাল থেকে সর্বাঙ্গে ঘামের ধারা নামছিল। সে যেন আগুনে ঝলসিয়ে সিদ্ধ হয়েছে। রেবা বলল, এবার শেষ পরীক্ষা, তোমার জয়ন্ত।

আবার কি?

রেবা বলল, আমার দিকে অপাঙ্গেও তাকিয়োনা। ক্যাম্পের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়াও। শেষকৃত্য করব এবার।

জয়ন্ত অতিবাধ্যের মতো ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। রেবা বলল, চোখ বোজো। মনে রেখো, চোখ খুললেই তোমার এই ইস্পাতের ফলা ওই আগুনে ঝাঁপ দেবে।

চোখ বুজে জয়ন্ত বলল, তোমার কি একটুও ভাবান্তর ঘটছে না, রেবা? লজ্জা, দ্বিধা, ভয়, প্যাশন—কোনটা কি তোমার আসছে না?

তিলমাত্র না।—রেবা বলল, মনের সংযোগ ঘটলে তবেই দেহের অবস্থান্তর ঘটে। এই বলে সে দুপা এগিয়ে হেঁট হয়ে বসে কি যেন করল কতক্ষণ, তারপর দুই অঞ্জলি ভরে নিয়ে এল নরম ছাই সেইআগুনের প্রান্ত থেকে। বার বার অমনি ক'রে এনে একরাশি ভস্ম জমা করল। তার পর মুঠি-মুঠি সেই ছাই তুলে মাখাতে লাগল জয়ন্তর সর্বাঙ্গে আপাদমস্তক,—কোথাও বাদ রইল না। তারপর বলল, এ আমার বহুদিনের সাধ, জয়ন্ত।

হাসিমুখে জয়ন্ত এবার বলল, তোমার আর কি-কি সাধ আছে, বাকি যতটুকু তা সব মিটিয়ে নাও, রেবা।

শ্মশানচারিণী পিশাচী উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বলল, এসো, ভিতরে চলো —

এই বলে সে জয়ন্তর হাত ধরে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল।

বাইরে রইল এই বিশাল অগ্নিকুণ্ড তার পাশে চিতাগ্নির মতো স্তিমিত হয়ে রইল।

মন্দিরের ভিতরটা ঘন অন্ধকার। সেখানে এসে দুজনে দাঁড়াল চোখ বুজে। জয়ন্ত এবার বলল, আমরা আলো জ্বালব, রেবা?

কেন?

দেখব দুজনে দুজনকে, দেখব যেন নব রাজবেশ।

রেবা বলল, দেখবে বৈকি, দেখবে চিরজীবন, দেখবে জন্ম-জন্মান্তর কিন্তু আরেকবার স্থির হয়ে দাঁড়াও, জয়ন্ত।

রেবার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল সে একটু হেঁট হলো।

হঠাৎ তিরস্কার করে উঠল জয়ন্ত,—কী হচ্ছে, রেবা?

—আঃ চেঁচিয়ো না জয়ন্ত, শান্ত থাকো। তুমি কেন চঞ্চল হবে? সংযমের কঠিন বাঁধনে তৈরি তোমার প্রকৃতি। তুমি চিরজীবনের নিরাসক্ত যোগী...তুমি আমার সকল মাধুরীর প্রতীক। অমৃতের পাত্র তুমি...

রেবা বোধ হয় কাঁদছিল গলিত স্ফুরিত কণ্ঠে, এবং ওই অবস্থায় এক সময় ভেঙে পড়ল জয়ন্তর পায়ের তলায়। অন্ধকার মেঝের উপর তার সেই এলায়িত উদ্দাম কেশরাশি ছড়িয়ে পড়ল। গ্রীক এপলোর প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে জয়ন্ত দাঁড়িয়েছিল। এবার সে রেবার দুই হাত ধ'রে তুলল। পরে

ঈষৎ কঠোর কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, বলো, এবার তোমার পরীক্ষা-সমীক্ষা শেষ হয়েছে?

যক্ষিণী কিরাত-নন্দিনীর মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রেবা জবাব দিল, না, হয়নি।

কাঁদছিলে কেন মাথা লুটিয়ে?

কম্পিত কণ্ঠে রেবা বলল, বাঘিনী কাঁদে না...শিকার মুখে নিয়ে গোঙায়।

জয়ন্ত প্রশ্ন করল, হঠাৎ নরম হয়ে গেলে কেন? কেন এমন কোমল হয়ে এলে ঠিক করে বলো তো?

কোমল নয়, শিথিল।—ঘন গভীর ধরা গলায় রেবা বলল, এই বনের মধ্যে অন্ধকারে এবার যেন ভেঙে পড়ছে সব। ইহকাল, জীবন, বিশ্বাস, বিদ্যা, আজন্মের সংযম, চিরদিনের কৌমার্য, তুমি-আমি, পৃথিবী, ঈশ্বর, বজ্র,—সব ভেঙে পড়ছে শিথিল গ্রন্থি হয়ে। আর...আর আমি পারিনে। জয়ন্ত, কবি—তুমি আরেকবার উজ্জীবনের মন্ত্র পাঠ করো..আমি...আমি..আমার মৃত্যু ঘটল বোধ

রেবা আবার বসে পড়ল পায়ের কাছে। দুই হাতে নিজের মুখখানা চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগলো।

শান্ত, নগ্ন, অবিচল জয়ন্ত। স্নেহে, মোহে, আবেদনে বা আসক্তির আহ্বানে তার সাড়া নেই। সে কবি, সৃষ্টির প্রথম পুরুষ সে। খেলাচ্ছলে যে-রাত্রি আরম্ভ হয়েছিল, যোগাসিদ্ধির পরম লগ্নে তার শেষ হচ্ছে। জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। রইল অটল, আত্মস্থ, স্থিতধী পুরুষের মতো। অন্ধকারে অচপল চক্ষু সে যেন দাঁড়াল বদরিবৃত পরম পুরুষ-প্রধান। পায়ের তলায় আলুলায়িত পড়ে রইল দেশলক্ষ্মী।

তাঁবুর পর্দা তোলা পূর্ব গগনের দিকে। ঊষার প্রথম কিরণ তখনও ফোটেনি। মাথার চুল ফিরিয়ে এক সময় উঠে দাঁড়াল রেবা। মুখ তুলে সে বলল, না, ভয় নেই আমার। হার মানছি তোমার কাছে, জয়ন্ত। নিরাসক্ত কবি তুমি আমার। বিষয়-বৈভব, ধন-দৌলত বিলাস-ব্যসন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য,—কোনটাই তোমাকে স্পর্শ করবে না। সম্ভোগের বিছানা চিরকাল পেতে রাখব তোমার জন্যে, যখন যেদিন খুশি তুমি আমাকে তুলে নিয়ো।

শান্ত কণ্ঠে জয়ন্ত বলল, তোমার এই পরমাশ্চর্য দেহের মধ্যে আমি মিলিয়ে যেতে চাই, রেবা।

মিলিয়েই আছ তুমি, কবি। আমি তোমাকে মাথায় নিয়ে ঘুরব সকল রাজ্যে, সমস্ত ভারতে।—রেবা বলল, তোমার সাধনা হোক চারিদিকের মৃত্যুর

মাঝখানে ব'সে নবজীবনের কাব্য রচনা, আমার সাধনা হোক, তোমার কবি-মানসকে শতদলে প্রস্ফুটিত ক'রে তোলা!

জয়ন্তর পায়ে প্রণাম ক'রে রেবা উঠে দাঁড়াল বটে, কিন্তু সহসা গাছপালার ফাঁক দিয়ে ওদের উপরে প্রভাত সূর্যের আলো পড়তেই ওরা শিউরে উঠল দুজনে ওদের আপাদমস্তক কৃষ্ণধূসর ভস্মরাশিমাখা। যেন দুজনের একজন হ'ল প্রেত, অন্যজন পিশাচী। একজন চিনতে পারল না অন্যজনকে। উভয়ের সেই রূপগৌরব, সেই লাবণ্য, সেই প্রস্ফুটিত কৌমার্য, সেই অতিপ্রাকৃত আদিম আরণ্য নগ্নকান্তি সমস্ত ঢাকা পড়ে গেছে ঘন ভস্মরাশির প্রলেপে। ওরা হাসতে গেল একত্রে, কিন্তু সেই মুক্তাপংক্তি যেন এক বীভৎস চেহারার প্রকাশ পেল।

সকালের আলো ক্রমে প্রখর হয়ে উঠছে। সহসা বাইরে থোক প্রভাকরের সাড়া পাওয়াতেই ওরা কোনও কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে পলকের মধ্যে আপন-আপন বিছানায় ঢুকে লেপ মুড়ি দিল।

মাথার কাছে গুলিভরা রাইফেলটা পড়েছিল। ওটার ব্যবহার হয়নি।

সমাপ্ত